বিমল মিত্রের গল্প সম্ভার

বিমল মিত্র

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট :
শ্রীঅজিত গুপ্ত

ষোল টাকা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্ককতার জন্যে জানাই যে সম্প্রতি অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নাম যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-মহলে আমার জনপ্রিয়তার ফলেই এই দুর্ঘটনা সম্ভব হয়েছে। ও-নামে কোনও লেখক সত্যিই আছে কিনা ঈশ্বর জানেন। তিনি যদি সত্যিই সশরীরে বিরাজ করেন তো লোক-সমাজে হাজির হয়ে তাঁর সোৎসাহে ঘোষণা করা উচিত। যা'হোক, আপাততঃ অপরের প্রশংসাও যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, অপরের নিন্দা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। অথচ প্রায় প্রত্যহই আমাকে সেই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

এই লেখকের লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা

এর নাম সংসার
চার চোখের খেলা
কথা-চরিত-মানস
সাহেব বিবি গোলাম
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
একক দশক শতক
একক দশক শতক (নাটক)
কড়ি দিয়ে কিনলাম
বেগম মেরী বিশ্বাস
স্ত্রী
সাহিত্য বিচিত্রা
মিথুনলগ্ন
নফর সংকীর্তন
ও-হেনরির গল্প (অনুবাদ)
বেনারসী
শ্রেষ্ঠ গল্প
মন কেমন করে
অন্যরূপ
নিশিপালন
কন্যাপক্ষ
সরস্বতীয়া
বরনারী (জাবালি)

গল্প সম্ভার
গুলমোহর
রাণী সাহেবা
সখী সমাচার
কাহিনী সপ্তক
এক রাজার ছয় রাণী
প্রথম পুরুষ
মৃত্যুহীন প্রাণ
টক ঝাল মিষ্টি
পুতুল দিদি
মনে রইলো
দিনের পর দিন
বাহার
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
তোমরা দু'জন মিলে
তিন ছয় নয়
নিবেদন ইতি
রং বদলায়
সুয়োরাণী
নবাবী আমল
চলো কলকাতা

উৎসর্গ

শ্রীমান কমলেশ ও শকুন্তলা বসু

কল্যাণীয়াষু—

সূচীপত্র

বিমল মিত্রের গল্প

সুভাষচন্দ্র সরকার

গল্পকার বিমল মিত্রের জনপ্রিয়তার নিদর্শন এই গল্পসংগ্রহ। ইতিপূর্বে তাঁর গল্পসংগ্রহ বেরিয়েছে। তাদের থেকে বর্তমান বইটির পার্থক্য পরিমাণগত এবং আয়তনগত। বিমলবাবুর লেখা এত বেশিসংখ্যক গল্প এর আগে আর কখনও একত্র বেরোয়নি। গ্রন্থকার এবং প্রকাশক যে আট শতাধিক পৃষ্ঠার এরূপ একখানি বৃহদায়তন গল্পসংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন তা কখনই সম্ভব হ'ত না যদি বিমলবাবুর লেখা পাঠকের মর্মস্পর্শ করতে সক্ষম না হ'ত।

এই গল্পসংগ্রহ লেখকের জনপ্রিয়তার নিদর্শন বটে; সঙ্গে সঙ্গে তা বিমলবাবুর গল্পকার হিসাবে কৃতিত্বের পরিচায়কও বটে। বস্তুতঃ এই গল্পসংগ্রহ প্রকাশের ফলে সাহিত্যরসিকদের নিকট গল্পকার বিমল মিত্রের সামগ্রিক রূপটি ফুটে উঠবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন সময়ে লেখা গল্পগুলি থেকে লেখকের বিবর্তন, বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ এবং গল্প বলার ধরণ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। এ ধরণের বিচার করা তখনই সম্ভব যখন বর্তমান গল্পসংগ্রহটির ন্যায় কোন সংগ্রহ আমাদের হাতের কাছে থাকে।

এই গল্পসংগ্রহ আর একটি বিষয় অনুধাবন করতে আমাদের সাহায্য করে। কী ধরনের বিষয়বস্তু এবং গল্পবলার আঙ্গিক বাঙ্গালী পাঠকের আদরণীয়, এ গল্পগুলিতে তারও পরিচয় মেলে। যদি বাঙ্গালী মানসের যন্ত্রণা এবং আবেদন শ্রীমিত্রের লেখায় প্রতিফলিত না হ'ত তবে কখনই তিনি জনপ্রিয় হ'তে পারতেন না। বাঙ্গালীদের চিন্তাধারার গুণগত বিচার এখানে মুখ্যতঃ প্রাসঙ্গিক নয়—তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই কেবল আমরা আলোচনা করছি। জাতিয়তাবোধ একটি আধ্যাত্মিক গুণ, যার উপকরণ হচ্ছে সুপরিচিত এবং সম্পর্ক-বিশিষ্ট শব্দের মাধ্যমে একের মন থেকে অন্যের মনে প্রেরিত সাধারণগ্রাহ্য চিন্তাধারা, (কু) সংস্কার এবং অনুভূতি। বাঙ্গালীর মনের চিন্তাধারা, (কু) সংস্কার এবং অনুভূতি বাঙ্গালীকে একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে গড়ে তুলেছে। যে লেখকের লেখায় এগুলির প্রতিফলন ঘটে তিনিই পাঠকদের জনপ্রিয় হ'ন। বাঙ্গালীর মনে যুগযন্ত্রণার যে ছাপ পড়েছে তার একটি বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ আছে; তাই বাঙ্গালী আজ ভারতবর্ষের অন্য অংশের অধিবাসীদের

থেকে পৃথক ; তাই বাঙ্গালীর চিন্তাধারা আজ অন্যদের নিকট এত দুর্বোধ্য ; তাই বাঙ্গালী আজ প্রতিবেশিদের নিকট অপরিচিত। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অনেকের কাছে এসব কথা অবান্তর মনে হ'তে পারে। কিন্তু এই চিন্তাধারা ঠিক নয়, কারণ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের প্রধান মাপকাঠি—তাঁর লেখায় সামাজিক সত্য কতদূর প্রতিফলিত হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচকগণ এ বিষয়ে একমত।

"What makes good writers good is first and foremost, ability to see truth – social and individual, material and spiritual—and so present it that it cannot be escaped." বলেন বিখ্যাত সমালোচক ইসায়া বার্লিন (Isaiah Berlin) [দ্রষ্টব্য : "Tolstoy and Enlightnment" by Isaiah Berlin, in **Mightier than the Sword** (The PEN Hermon Gould Memorial Lectures 1953-61. Macmillan & Co. Ltd, London. 1964. পৃঃ ১১৭] সত্যকে দেখার ক্ষমতা এবং জনসমক্ষে সেই সত্যের সামাজিক ও ব্যক্তিগত এবং বাস্তব আধ্যাত্মিক রূপকে তুলে ধরার ক্ষমতাই যদি লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হয় তবে সে বিচারে বিমলবাবুর স্থান কোথায় ?

এই গ্রন্থে বিধৃত গল্পগুলি পড়ে পাঠক সহজেই সে সম্পর্কে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। বাঙ্গালী জীবনের বর্তমান সঙ্কট-এর প্রকৃত রূপ কী তাই তো বিমলবাবুর অন্বেষণের মুখ্য বিষয়! তবে বিমলবাবুর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এই সংকটের আভ্যন্তরীন উপাদানগুলোকে আলাদা করে বিশেষভাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কোন জিনিষকে দু'ভাবে দেখা চলে—সমগ্রভাবে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে। ছোট গল্পে অবশ্যই সংকটের জটিল রূপের সমগ্রতার চিত্র ফোটানো সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই লেখক সে চেষ্টা করেননি। তিনি সংকটের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক অপেক্ষা অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দিকটাই বেশি করে দেখবার চেষ্টা করেছেন (এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃততর আলোচনা করা হয়েছে)। তবে "আমেরিকা" এবং "তার পর একদিন" গল্পে বিমলবাবু রাজনীতির কাছাকাছি এসে পড়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক ; কারণ চিরকাল সত্যকে টুকরো টুকরো করে দেখতে গেলে সত্যের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে না ; সত্যান্বেষীকে এক সময় সত্যের সামগ্রিক রূপকটির ধারণা করতেই হবে। সাহিত্যে রাজনীতি আসতে পারে না যাঁরা মনে করেন তাঁরা ভ্রান্ত। অপরপক্ষে গণতন্ত্রের প্রসারের দিনে রাজনৈতিক চেতনাবিহীন কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিই সম্ভব নয়। সার্ত্রে এই কথাটাকেই একটু

ঘুরিয়ে বলেছেন, "When the privileged classes are settled in their principles, when their consciences are clear, and when the oppressed, duly convinced of being inferior creatures, take pride in their servile state, the artist is at his ease." (Jean-Paul Sartre : **Situations** (Translated from the French by Benita Eisler) London, Hamish Hamilton 1965. P. 206) অর্থাৎ শাসকশ্রেণী যদি বেশ শিকড় গেড়ে বসতে পারে এবং শাসকশ্রেণীর লোকেদের বিবেক যদি নির্মল থাকে এবং নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেরা যদি নিজেদের হীনতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে গর্ববোধ করে, তখন শিল্পীর মন হাল্কা থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ যুগে এই আদর্শ অবস্থা ছিল যখন শোষক এবং শোষিত পরস্পরের ভূমিকা মেনে নিয়েছিল ? ইতিহাস যতদূর পিছনে আমাদের নিয়ে যায় আমরা দেখতে পাই যে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং বঞ্চিতদের মধ্যে সংগ্রাম লেগেই ছিল। কাজেই কোন যুগেই প্রকৃত শিল্পী নিরুদ্বেগচিত্তে তাঁর শিল্পসাধনা নিয়ে থাকতে পারতেন না (বস্তুতঃ শিল্পীর মনে অভাববোধ, বেদনাবোধ সৃষ্টি না হলে তার পক্ষে কোন মহৎ সৃষ্টিই সম্ভব নয়। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিরহে কাতর হয়েই আদি কবি বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন)। দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত বর্তমানের এমন কেউ কী আছেন যিনি বলবেন যে সাত্র্‌-বর্ণিত শিল্পীর নির্বিকার থাকার মত সুসমন্বয়-বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা রয়েছে ? সব দেশেই আজ এক বিরাট সামাজিক আলোড়ন দেখা দিয়েছে যা, অবশ্যম্ভাবীরূপে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। কাজেই আজ কোন মহান্ শিল্পীর পক্ষেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়। তাই প্রখ্যাত ইংরাজ লেখক প্রিষ্টলে বলেছেন, "politics cannot be entirely omitted from a discussion of our society." অবশ্য লেখকদের এ ধরনের অনুসন্ধিৎসা শাসকগোষ্ঠীর মনঃপূত নয়। তাই সমাজসচেতন লেখকদের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠী পাঠককে সমাজ সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়ে বিপথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে। শুধু এদেশে নয়, এমন কি গণতন্ত্রের স্বর্গ ইংল্যাণ্ডেও। প্রিষ্টলে লিখছেন, "One encounters so much queer resistance, so much immediate loss of temper, so much surprising discourtesy and downright personal abuse, that it is hard not to believe that a great many English writers and readers are struggling to suppress a deep-seated irrational fear

of the contemporary situation. You are often accused of deliberately darkening your view, giving yourself up to a sour distaste for your time, merely because you recognize and comment upon the facts of this situation. But it is the false optimist, shouting down any suggestion that we are not half-way to paradise, who has the blackest pessimism in his heart, having secretly abandoned himself to despair." (J. B. Priestley: "The Writer in a Changing Society." **Mightier Than The Sword,** London, 1964. P 34-35) যারা বর্তমানের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে সাহসী হয় না সেই ভণ্ড আশাবাদীদের মধ্যেই ভবিষ্যত সম্পর্কে সবথেকে গভীর নিরাশা আছে। বর্তমানের পরিপূর্ণ জ্ঞানের ওপরেই ভবিষ্যত গড়ে তোলা সম্ভব। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে বর্তমান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত রুশ সমালোচক লুনাচার্স্কি বলেছেন যে যুগসন্ধিক্ষণেই শ্রেষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব সম্ভব; যুগপরিবর্তনের প্রতিফলনই শ্রেষ্ঠ লেখকের ধর্ম (Perhaps the great majority of outstanding literary phenomena and significant writers appear as a result of major social changes, of social catastrophies. Literary masterpieces mark these changes")।[১] বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতি এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যে চলেছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিমলবাবুর রচনায় যুগপরিবর্তনের কী প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই? যুগপরিবর্তনের অন্যতম চিহ্ন মূল্যবোধের অনিশ্চয়তা। বিমলবাবুর রচনায় এ অনিশ্চয়তা বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। পরস্পরবিরোধী শক্তির চাপে মানুষের সামনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে "ভেজাল" গল্পে জ্যাঠাইমার চরিত্রে তা সব থেকে ভালভাবে ফুটে উঠেছে। "অদ্ভুত সত্যবাদী ছিল জ্যাঠাইমা। একবার একটা সত্যি কথা বলার জন্যে একটা চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি জ্যাঠাইমার হাতছাড়া হয়ে যায়। উকীল বলেছিল—আপনার কিছু বলবার দরকার নেই, আপনি শুধু বলবেন যে, আমি এই সাক্ষীকে চিনি—আর কিছু বলতে হবে না। জ্যাঠাইমা বলেছিল—কিন্তু আমি যে ওকে চিনি না।—তা না চিনলেই বা, চিনি বলতে দোষ কী! আপনার চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তিটা যে বেঁচে যাবে, সেটা ভাবছেন না? জ্যাঠাইমা বলেছিল—না বাবা, সে আমি বলতে পারবো না, মিথ্যে কথা আমার

১। Anatoly Lunacharsky—*On Literature and Art,* Moscow, 1965 P. 214.

আসে না”—যে জ্যাঠাইমা সত্যবাদিতার খাতিরে চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন তাঁকেই যখন জামাইএর স্বাস্থ্যের খাতিরে পনেরো বোতল মদের জন্য মিথ্যা কথা বলতে দেখি তখনই বাস্তব জীবনের সঙ্কটের চিত্রটা পুরোপুরিরূপে আমাদের সামনে ফুটে উঠে। জ্যাঠাইমার স্বীকারোক্তি সকলেরই করুণার উদ্রেক করে, “জামাই মাস্তোর পায় পনেরো বোতল। পনেরো বোতলে কী চলে? তাই আমাদের সকলের নামেই পারমিট আছে। পুলিশ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি মদ খান? আমি বলেছিলুম—হ্যাঁ—এই পর্যন্ত! পনেরো বোতলে যে জামাই-এর চলে না রে। তাই তো ওই মিথ্যে কথা বলতে হলো আমাকে! চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তির জন্যে একদিন মিথ্যে কথা বলতে পারিনি, কিন্তু জামাইয়ের জন্য মিথ্যে কথাটা বেমালুম বলে ফেললুম। কী করবো বল বাবা। নইলে জামাই-এর আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে! ও কি বাঁচবে?”

দৈনন্দিন জীবনে আমরা এত অসংখ্য অন্যায়ের মুখোমুখি হচ্ছি যে আমাদের বোধশক্তিটাই তাতে ঝিমিয়ে পড়ছে। তাই জীবনের বহু অসঙ্গতি আজ আর আমাদের চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছেলে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, পনেরো বছর চাকুরী করেও টেম্পোরারী থাকছে, সামান্য শ্রমিক আন্দোলন করার জন্য দীর্ঘদিনের চাকুরী যাচ্ছে—এসব ঘটনা এদেশে তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটেই যাচ্ছে। এতে আমাদের অধিকাংশেরই মনে দাগ কাটে না। কিন্তু এ যে কতবড় উদ্ভট ব্যাপার তা একজন বিদেশীর চোখে সহজেই ধরা পড়ে। আমেরিকান পর্যটক মিঃ রিচার্ড যখন হোটেলে মেয়ে চালানকারী এ. সি. চক্রবর্তীকে জেরা করে জানতে পারলো যে সে গ্রাজুয়েট, চাকুরীহীন এবং নিতান্ত উপায়হীন হয়েই শেষ পন্থা হিসাবে ঐ জঘন্য উপজীবিকা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তখন প্রথমে মিঃ রিচার্ড চক্রবর্তীকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। চক্রবর্তীর দুঃখের কথা শুনে মিঃ রিচার্ড-এর মনে যা হয়েছিল তা ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন, বুঝলাম সমস্তই ছলনা। সমস্তই মিথ্যে কথা। সাতবছর চাকরি করার পর কেউ টেম্পোরারী থাকতে পারে? আর শুধু স্ট্রাইক করার অপরাধেও কারোর চাকরি খতম হ’তে পারে না। পাঁচ টাকা স্ট্রাইক ফাণ্ডে চাঁদা দিলেও খতম্ হতে পারে না। তোমরা আমাদের আমেরিকাকে যতবড় ক্যাপিটালিষ্টদের দেশই বলো, সেখানেও স্ট্রাইক করার জন্যে, ধর্মঘট করার জন্যে চাকরি যায় না। আমি মনে মনে বুঝলাম ছোকরা আমাকে ব্লাফ দিচ্ছে।…ভাবলাম এই মিডল-ক্লাস বেঙ্গলীজ আর ভেরি শ্লাই—এদের মত ধড়িবাজ জাত আর দুনিয়ায় দুটি নেই।…” কিন্তু মিঃ রিচার্ড শেষ পর্যন্ত

জেনেছিলেন যে চক্রবর্তী কোন কথাই মিথ্যা বলেনি। চক্রবর্তী মেয়ে সাপ্লাইএর কাজ করে অথচ হাজার ধমকিতেও সে তার নিয়োগ কর্তার নাম বলবে না; সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না আপন নিয়োগকর্তার সঙ্গে! একদিকে এত উচ্চ মূল্যবোধ, অপরদিকে নারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার মত জঘন্য কাজ—এই পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার শিকার মানুষ যে সমাজে হয় সে সমাজের ভাঙন সম্পর্কে কী কোনই সন্দেহ থাকতে পারে? চক্রবর্তী মিঃ রিচার্ডের দান নিতেও অস্বীকার করলো কারণ দান নেওয়া তার আত্মসম্মানে বাধে। এই যে মূল্যবোধের তালগোল পাকানো অবস্থা, এই আমাদের জাতীয় সংকটকে প্রকট করেছে। মিঃ রিচার্ড এই অসঙ্গতি সহ্য করতে পারছেন না, তাই তিনি বলে উঠলেন, "আমি আজ আপনাকে বলে রাখছি—দিস্ ইজ রং, দিস্ ইজ ক্রিমিন্যাল—এ অন্যায়, এ সততা পাপ—এ অনেষ্টির কোন দাম নেই মডার্ণ পৃথিবীতে···দিস্ ইজ রং—দিস্ ইজ ক্রিমিন্যালি রং—···আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো? আমরা যে লক্ষ লক্ষ টন হুইট, রাইস আর পাউডার-মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়ার গরীব লোকদের জন্যে, সেগুলো কারা নেয়? সেগুলো গরীবদের হাতে পৌঁছয় না কেন? কে তারা? হু আর দে?" ("আমেরিকা" গল্প)।

মিষ্টার রিচার্ডের প্রশ্ন ভারতবাসীর প্রশ্ন, বাঙ্গালীরও প্রশ্ন।

জীবনে নির্দিষ্ট মূল্যবোধকে আঁকড়িয়ে থাকার দাম যাদের দিতে হয় নিশিকান্ত তাদের প্রতিনিধি। সজ্ঞানে সে প্রতারণা সমর্থন করতে পারে না—এমনকি পরিবারশুদ্ধ অভুক্ত থাকতে হবে জেনেও। নিশিকান্ত বুঝলো না "যে এটা টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি। এখন সব জিনিষের মানে বদলে গেছে! অনেষ্টির মানে বদলে গেছে, ট্রুথের মানে বদলে গেছে, লাইফের মানে বদলে গেছে। আমাদের ডিক্সনারী আবার নতুন করে লিখতে হবে—নইলে বাঙ্গালীরা মানুষ হবে না। দেখছিস না, মারোয়াড়ীরা আমাদের সব ব্যাপারে হারিয়ে দিচ্ছে—সব ব্যাপারে আমরা পেছিয়ে পড়ছি—" নিশিকান্তর একটা ছেলেও মারা গেল বিনা চিকিৎসায়—তা সত্ত্বেও সে কারও কাছে হাত পাতেনি। কিন্তু মানুষের সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে—যখন ওর মেয়েটাও না খেতে পেয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় পড়লো তখন সে থাকতে না পেরে হাত পাতলো। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে হাত পাততে হ'ল এমন একজন লোকের কাছে যে নিশিকান্তের পরিত্যক্ত চাকরি করে টাকা জমিয়েছে। গোবর্ধনের মনে নিশিকান্তের কোন মূল্যবোধই ছিল না। সুতরাং ঘি এবং সরষের তেলে সাপের চর্বি মেশানো হয় দেখে সে চমকিত হয়নি,

উল্টে এই ভেজাল দেওয়ার আর্টটা খুব ভাল করে শিখে নিয়ে সে নিজেই ঐ ব্যবসা আরম্ভ করলো এবং সামাজিক নিয়ম অনুসারে অচিরেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠলো। তবে গোবর্ধনের মত লোক বিনামূল্যে কিছুই দিতে পারে না; তাই প্রাক্তন সহপাঠী নিশিকান্তের চরম অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গোবধন নিশিকান্তকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদ খেতে বাধ্য করলো। মৃত্যুমুখী কন্যার কথা স্মরণ করে নিশিকান্ত সে অবমাননাও সহ্য করলো। অবশ্য সে মেয়েকে বাঁচাতে পারলো না। এই আমাদের সমাজ। এ সমাজ কাউকে নির্দিষ্ট মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচতে দেবে না—তবে মূল্যবোধ বিসর্জন দিলেই যে কেউ বাঁচবে সে আশ্বাসও নেই। নিশিকান্তর মুখ দিয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের কাতরোক্তি বেরিয়েছে, "পৃথিবীতে কেউ নেই যে আমার কষ্টটা বোঝে···সব জায়গায় ভেজাল ভাই। হয় ঘি এ ভেজাল, নয় শিক্ষায় ভেজাল, নয়তো বুদ্ধিতে ভেজাল, নয়তো টাকায় ভেজাল। মানুষের মনে পর্যন্ত ভেজাল ঢুকেছে। ভগবানের নামেও ভেজাল দিচ্ছে সবাই!···" ("পদ্মভূষণ" গল্প)।—

যে সমাজে প্রবঞ্চক গোবর্ধনের মত লোক পদ্মভূষণ হয় এবং নিশিকান্তর মত নীতিপরায়ণ লোকের লাঞ্ছনা ঘটে সে সমাজ দুষ্ট; তার অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসা করবে কে? সমাজের রোগ দূর করবার লোক থাকলে তো আজকের এই দুর্দশা ঘটতেই পারতো না! "ট্যাকসো" গল্পে দেখতে পাওয়া যায় যে সমাজে যাঁদের ওপরেই ন্যায় এবং সত্য রক্ষার ভার রয়েছে তাঁরাও কীভাবে দুর্নীতির পরিপোষক হয়ে পড়ছেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ সৎ থাকবে স্বভাবতঃই দুষ্ট সমাজ তা হতে দিতে পারে না। এই গল্পে লেখক দুর্নীতির জন্ম এবং বিকাশ সম্পর্কে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্লভ। "নাটকীয়" গল্পে ব্ল্যাকমেলকারিণী মেয়েটি বলছে, "বাঁচতে গেলে সবই করতে হয়। কেন, আর কেউ করেনি? আজকের যারা দেশের লীডার তারা ব্ল্যাকমেল করছে না আমাদের? আপনি আপনার পাঠকদের ব্ল্যাকমেল করেন না? গান্ধী, নেহরু, লালবাহাদুর, ক্রুশ্চেভ, কেনেডি, মাও-সে-তুং, কে আমার চেয়ে কম অপরাধী বলুন তো? তারা আপনার মুখের গ্রাস, মনের শান্তি, রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে না? কই, তাদের নিয়ে তো আপনি গল্প লেখেন নি? যত দোষ করলুম আমি গেরস্থ বউ বলে? সুখে আছি বলে? সারাটা জীবন কষ্ট করে এখন একটু টাকা-কড়ির মুখ দেখছি বলে? নাকি লীডারদের বিরুদ্ধে লিখলে আপনার জেলে যাবার ভয় আছে বলেই লেখেন না। হয়তো লিখলে পদ্মশ্রী পাবার আশাও নির্মূল হয়ে যেতে

পারে, তাই লেখেন না। লেখেন যত আমার মত নিরীহ গৃহস্থ মেয়ে-পুরুষদের নিয়ে। যারা বেওয়ারিশ। যাদের হয়ে কথা বলবার কেউ নেই; যারা প্রতিবাদ করতে পারে না, প্রতিশোধ নিতে জানে না—"

"হঠাৎ," "তারপর একদিন," "তিন নম্বর সাক্ষী," "ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি গল্পের কাহিনী বিভিন্ন হলেও তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে সমাজের অসঙ্গতি, ক্রটীবিচ্যুতি এবং অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব মিঃ ক্যালাঘান স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবাসীকে অন্যায়ভাবে গালাগালি দিত, স্বাধীনতার পর সে-ই "দেশভক্ত"দের নেতা হ'ল। অশেষ মজুমদার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে শান্তি পেতে চেয়েছিল; কিন্তু সমাজ একজনের এই সৎ থাকার স্পর্ধা সহ্য করবে কেন? তাই লাঞ্ছিত মজুমদারকে শান্তির জন্য আশ্রয় নিতে হয় আত্মহত্যার। সমাজের জাঁতাকল থেকে কারু মুক্তি পাবার উপায় নেই। স্বদেশপ্রেমিক কে. ভট্টাচার্য উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার ছিলেন; তিনি স্বদেশবাসীর সেবার জন্য আরামের চাকরি ছেড়ে স্কুল গড়লেন নিজের টাকায় দেশবাসীকে মানুষ হ'তে পারার শিক্ষা দেবার জন্য। কে. ভট্টাচার্যের "ধৃষ্টতা"র জবাব সমাজ দিল তাঁকেই বিকৃত-মস্তিষ্ক সাব্যস্ত করে। অবশ্য যে সমাজের predominant value যেন তেন প্রকারেণ সবকিছু আত্মসাৎ করা, সেখানে যদি কাউকে স্বার্থত্যাগ করতে উন্মুখ দেখা যায় তাকে সমাজ বিকৃত-মস্তিষ্ক ছাড়া আর কী ভাবতে পারে! এই সমাজ মজুমদার সাহেবদের—যে মজুমদার সাহেব পিতৃঋণ অস্বীকার করে, অফিসে সকলের সঙ্গে অমানুষিক দুর্ব্যবহার করে, অফিসের মেয়েদের ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করে ("ইণ্ডিয়া" গল্প দ্রষ্টব্য)। এ সকল চরিত্র আমাদের চোখের সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রীমিত্র তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে তাদের দিকে আমাদের নজর ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য আমরা বিমলবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ।

নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবন সমস্যা বিমলবাবুকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাই তাঁর অনেক গল্পেরই উপজীব্য জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী; যেমন মল্লিকমশাই ("মিলনান্ত"), এ. সি. চক্রবর্তী, নিশিকান্ত, যোগজীবনবাবু ("শেষ শূন্য"), সুশীতল ("উপন্যাস"), অশেষ মজুমদার, আশুকাকা, ("আশুকাকা"), ইন্দ্রনাথ ("নিমন্ত্রিত ইন্দ্রনাথ"), নিরু বৌদি ("বউ"), প্রমীলা ("আমৃত্যু") সুধা সেন ("সুধা সেন") নিকুঞ্জ, বলাই ও সবিতা ("দু'কান কাটা")। এদের মধ্যে কেউ শত দুঃখ সত্ত্বেও আপন আপন মূল্যবোধ আঁকড়ে পড়ে রয়েছে; আবার কেউ কেউ সব রকমের মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে জীবনে সাফল্যলাভে প্রয়াসী (এবং,

ক্ষেত্রবিশেষে, সফল) হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে আশুকাকা, ইন্দ্রনাথ ও সুধা সেনের জীবনে আমরা তার আংশিক পরিচয় পাই। "আশুকাকা এমন একজন লোক যে বরাবর সশব্দে বেঁচে থেকেছে—চারিদিকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়িয়েছে।" "সারাজীবন কোন চাকরি বা কোন অর্থোপার্জন করেনি আশুকাকা। দরকার হলে তিন ক্রোশ দূরের কাছারিতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এসেছে, বিয়ে বাড়িতে কোমর বেঁধে পাঁচ শো লোক খাওয়ানোর ভার নিয়েছে, বারোয়ারিতলায় বসে সারারাত যাত্রার আসরে কলকে পুড়িয়েছে।" গ্রাম ছেড়ে আশুকাকা যখন কলকাতার অপরিচিত এবং বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়লো তখন আশুকাকার পক্ষে পুরানো পদ্ধতিতে বেঁচে থাকা কোনও ক্রমেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু আশুকাকাদের মত লোকেদের কাছে জীবনধারণ অপেক্ষা তার ধরনটাই অধিকতর কাম্য। তাই তারা নিজেদের নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। আশুকাকা নিজের কাছে নবনীকে খুঁজতে তার অফিসে চার দিন এসে দেখা পায় নি—তাই যখন দেখা হোল তখন আশুকাকা বললে, "ভাল কথা, তিন টাকা সাড়ে বারো আনা দাও দিকিনি, তোমার জন্যে এই চার দিনে তিন টাকা সাড়ে বারো আনা পয়সা খরচ করে ফেলেছি। বাসে, ট্রামে, রিকসায় মোট তোমার গিয়ে তিন টাকা সাড়ে বারো আনাই দিতে হচ্ছে।" আশুকাকার চাওয়ার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, কোন নীচতা নেই। সে নিজেকে সকলের মুরুব্বিরূপে কল্পনা করে নিয়েছে, সুতরাং মুরুব্বিয়ানার দরুন যা প্রাপ্য তা তো সে নেবেই কিন্তু অযাচিত মুরুব্বিয়ানার দিন চলে গেছে শহরে তো বটেই, গ্রামেও। চাকরিহীন আশুকাকার দুরবস্থা সহজেই পরিমেয়। আশুকাকা অপসৃয়মান বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভগ্নরূপ।

নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনে নিমন্ত্রণ খাওয়ার সুযোগ ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বিয়ে, পূজা পার্বণ ইত্যাদি বিশেস কোন উপলক্ষ্য ছাড়া আজ আর কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করে না। তাই পরিবারের মধ্য থেকে কেউ নিমন্ত্রিত হলে পরিবারের সকলের মধ্যেই একটা বিশেষ কিছু ঘটার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হয়েছে তার পুরানো মনিব ধরণীবাবুর বড় ছেলের বিয়ের বৌভাতে। অনিমন্ত্রিত তার স্ত্রী এবং পুত্র বাব্‌লুর মধ্যেও তার দোলা লেগেছে। ইন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ খেয়ে আসবে কাজেই স্ত্রী কুমুদ আর রাত্রিবেলার জন্য রান্নাই করলো না। দরিদ্র সংসার, সেখানে কুটোটুকুও নষ্ট হ'তে দেবার উপায় নেই। ইন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে অভুক্ত ফিরে এসেও তাই বাড়িতে স্ত্রীর কাছে খাবার চাইতে পারল না।

অপরপক্ষে টাকা খরচ করে হোটেলে খেতেও তার মন উঠলো না। সে সেই টাকায় সন্দেশ কিনে এনে স্ত্রীর কাছে নিমন্ত্রণ খাবার গল্প বানিয়ে বানিয়ে বললে এবং সে যে খুব খেয়ে এসেছে সে বিশ্বাসও উৎপাদন করাল। এই গল্পে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের জীবনে যে কী প্রচণ্ড রিক্ততা এসেছে তার এক মর্মস্পর্শী রূপ দেখতে পাই। ইন্দ্রনাথের নীরব স্বার্থত্যাগ এবং যন্ত্রণাভোগ এবং স্বামীর প্রতি কুমুদের স্নেহ সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করছে এত অসংখ্য অসুবিধার মধ্যেও বাঙ্গালী কী করে টি'কে আছে। যতদিন পর্যন্ত সংসার স্বার্থহীনতার এরূপ দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন জাতির পুনরুত্থানের আশা থাকবেই।

প্রেমের রূপবৈচিত্র্য বিমলবাবুর অনুসন্ধিৎসার অন্যতম লক্ষ্য। তাই তাঁর গল্পে প্রেমের বিচিত্ররূপের পরিচয় পাই। "জেনানা সংবাদ"এর সুজাতা স্বামীনাথনকে প্রেম অন্ধ করেছিল। তাই সে বহু আকাঙ্ক্ষিত আই. সি. এস্. পাত্রকে পরিত্যাগ করে অজ্ঞাতকুলশীল, বিধর্মী, বিজাতীয় হ্যারী স্বামীনাথনকে বিবাহ করলো। স্বামীনাথন অন্তরের দিক থেকেও সুজাতার উপযুক্ত ছিল না। হ্যারী স্বামীনাথনের বিশ্বাসঘাতকতা যখন উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় সুজাতার সামনে হ্যারীর চরিত্রকে তুলে ধরলো তখন স্বভাবতঃই সুজাতার সেই আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রইলো না। তবে হ্যারীর উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে যা করলো তা সাধারণ চিন্তাধারায় অভাবনীয় হলেও সুজাতার মত আবেগপ্রবণ চরিত্রের মেয়ের পক্ষে অসম্ভব নয়। সুজাতা স্বামীনাথন যদি স্বার্থশূন্যতার প্রতীক হয় তবে মিষ্টিদিদি স্বার্থপরতার চরম নিদর্শন ("মিষ্টিদিদি" গল্প দ্রষ্টব্য)। তিনি নিজের সুখসুবিধার জন্য এমনই ব্যতিব্যস্ত যে স্বামীপুত্রের মৃত্যুও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর। "মিষ্টিদিদি সময় পেলেই চুপচাপ শুয়ে থাকতো। পাতলা পলকা শরীর; ধবধবে রং। ফিনফিনে সিল্কের শাড়ি গায়ের ওপর থেকে খসে খসে পড়তো। ইজি চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুতো একবার, তারপর হয়তো তখনি আবার উঠে গিয়ে বসতো বাগানের দোলনায়। তারপরেই হয়তো খেয়াল হল—আর তখুনি গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গঙ্গার ধারে।......মিষ্টিদিদির সঙ্গে দিনরাত পালা করে একটা-না একটা ঝি থাকেই। রাত্রে যদি মিষ্টিদিদির ঘুম না আসে, ওই একজন ঝি পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুম পাড়াবে। শাড়ি যদি কাঁধ থেকে হঠাৎ খসে যায় মিষ্টিদিদির, তো একজন ঝি কাপড়টা তুলে দেবে যথাস্থানে। খেয়ালের তো অন্ত নেই মিষ্টিদিদির। কখন কী খেয়াল হবে মিষ্টিদিদি তা নিজেও বলতে পারে না আগে থেকে। হয়ত রাত্তির দশটার সময়েই মিষ্টিদিদির তপ্‌সে মাছ খেতে ইচ্ছে হতে

পারে। আশ্বিন মাসের দুপুর বেলাতেই ল্যাংড়া আম খেতে ইচ্ছে হতে পারে। জামাইবাবু হয়ত তখন অফিস যাচ্ছে, মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার বুকটা কেমন করছে, তুমি আজ কোথাও যেও না গো।'......মিষ্টিদিদি বলতো, 'আমি মরে গেলে তুমি যেমন খুশি যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়িও আমি দেখতেও আসবো না। কিন্তু যে দুটো দিন বেঁচে আছি, আমাকে দয়া করে শান্তিতে বাঁচতে দাও।' তা মিষ্টিদিদিকে শান্তিতে বাঁচতে দেবার জন্য জামাইবাবুও কি কসুর করতো কিছু! দুটো দিন—অথচ 'দুটো দিন' 'দুটো দিন' করে কতদিন যে বেঁচে থাকবে মিষ্টিদিদি! আমি কেবল তাই ভাবতাম .....তারপর কত পনরো দিন কেটে গেছে, পনেরো বছর কাটতে চললো, কিন্তু কিছুই হয়নি মিষ্টিদিদির। প্লেট প্লেট মাংস খেয়েছে, বাটি-বাটি আমড়ার অম্বল খেয়েছে, ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়েছে, পোনা মাছের কালিয়া খেয়েছে...... ।"

পুতুলদিদি প্রেমের বিচিত্ররূপের আর এক প্রতীক। তাঁর স্বামী ও তাঁর প্রেমাস্পদ অম্বিকা-দাও প্রেমের আর এক রূপের নিদর্শন। পুতুল দিদি স্বামীর সংসার ছেড়ে অম্বিকা-দার কাছে চলে যান, তাদের একটি মেয়েও হয়। অথচ এই পুতুল দিদিকে সংসারে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর স্বামীর কী আকুলি বিকুলি। অবাক কাণ্ড এই যে অম্বিকা-দার প্রতি ভালবাসা অটুট থাকা সত্ত্বেও পুতুলদিদি স্বামীর সংসারে মেয়ে নিয়েই ফিরে গেলেন এবং পুরোপুরি সংসারী হলেন! লেখকের সঙ্গে আমরাও ভাবি, "কত বড় দরাজ বুক হলে পরের সন্তান সুদ্ধ স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করতে পারে লোকে। কত বড় ক্ষমাপরায়ণ মন হলে এ সম্ভব হয় তাও বুঝেছি। বুঝেছি সংসারে আইন দিয়ে আর যত কিছুই বাঁধা থাক, মন বস্তুটি বড় শক্ত জিনিস, সে কারও শাসন মানে না, কোনোও আইন মানে না, কোনো বাঁধা-ধরা পথে সে চলতে চায় না। শুধু একটা জিনিষ বুঝিনি সেই পুতুল দিদিই কেন আবার তার স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে রাজী হলো...পুতুলদিদির স্বামীত্যাগ যেমন দুর্বোধ্য, স্বামীকে তার পুনঃ গ্রহণও তেমনি।" ("পুতুলদিদি" গল্প)।

নিরঞ্জন আর লাবণ্য ("ঘরন্তী") আধুনিক যুগের প্রেমিক প্রেমিকা। অবিবাহিত যুবক-যুবতী মিসেস চৌধুরীর ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আসতো দু তিন ঘণ্টার জন্য, ঘর ভাড়া নিয়ে নিরিবিলিতে নিজেদের কথা আলোচনা করার জন্য। নিরঞ্জন সামান্য চাকরী করতো, তাও হারালো। লাবণ্যও পঞ্চান্ন টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের কাজ করতো। "মিসেস চৌধুরী বলতেন

টালীগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসতো, চেতলা থেকে আসতো কল্যাণী, বেহালা থেকে আসতো টগর। কিন্তু এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে। চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে যাকে পেত ধরে আনতো। কিন্তু লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে। নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ওই লাবণ্যই তিনমাস মেসের খরচ জুগিয়েছে ওর।” লাবণ্য-নিরঞ্জন মিসেস্ চৌধুরীর ফ্ল্যাটে আসে নিজেদের একান্তে পাওয়ার জন্য; তাদের স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার সামর্থ্যও নেই বলে। একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান যদিও বা পেল তারা তার জন্য প্রয়োজনীয় এক হাজার টাকা সেলামী দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। কাজেই বাধ্য হয়েই মিসেস চৌধুরীর ফ্ল্যাটের সংগোপনতার আশ্রয় মাঝে মাঝে তাদের নিতে হয়। মিসেস্ চৌধুরীর গ্রাহকদের অন্যতম অর্থবান্ ফুলচাঁদ শেঠএর নজর লাবণ্যর ওপর—তাকে বারেকের উপভোগ করতে ফুলচাঁদ হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত। লাবণ্যকে সে প্রস্তাব জানাতে সমস্ত শুনে মাথা নিচু করে রইলো খানিকক্ষণ। “তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বলল —ওকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি মাসীমা।” খানিকক্ষণ পরে লাবণ্য ফিরে এসে ফুলচাঁদের প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। সেই প্রথম আর সেই শেষ। তারপর লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের রাস্তায় হাঁটতে আর কেউ দেখেনি। কিন্তু তা বলে পৃথিবী থেকে তাদের দুজনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। গল্পের পরিণতি পাঠকের মনে অবধারিত রূপে দোলা লাগায়।

নীরব ও গোপন প্রেমের পূজারী নিরু-বৌদি, যার স্বামী নিরুদ্দেশ। তিনি হাসিমুখে সতত বুড়ী শাশুড়ীর সেবা করে চলেছেন, মৃতদার ভাশুর ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করছেন, আত্মীয় স্বজন আসলে হাসিমুখে তাঁদের তদারক করছেন। মুখ দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে সংসারের চিন্তা ছাড়া তাঁর মনে আর কোনও চিন্তা আছে। কিন্তু তিনি যে মনের মধ্যে কী গভীর দুঃখ এবং হতাশা বয়ে চলেছেন দুদিনের জন্য আসা দূর সম্পর্কের দেওরের কাছে হঠাৎ তা প্রকাশ হয়ে পড়লো। তাঁর এই গুপ্ত প্রেমের অভিব্যক্তি যেরূপ অপরূপ তেমনি বেদনাদায়ক। “নিরু বৌদি···হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো একটা কথা বলি। আপনি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, না ভাই, অনেক তীর্থস্থানে?

“বললাম, হ্যাঁ পিসিমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় তো ঘুরতে হয়েছে—

“নিরু বৌদি বললে, মথুরা গেছেন? কাশী? বৃন্দাবন? জগন্নাথ ক্ষেত্তর?

“বললাম, হ্যাঁ—

“ওখানে অনেক সাধু-সন্নিসী আছেন না?

"—তা আছে হয়তো। কেন বলুন তো?

"নিরু বৌদি যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বললে, না, এমনি বলছিলুম—তীর্থক্ষেত্রেই তো সাধু-সন্ন্যিসীদের ভীড় হয়…

"হঠাৎ নিরু বৌদির চোখের দিকে চেয়ে যেন কেমন অবাক হয়ে গেলাম। মুখের সেই হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। নিরু বৌদির ও-চেহারা যেন আমার অচেনা। নিরু বৌদি যেন এখন আর মেয়ে নয়, মা নয়, গৃহিনী নয়, এমন কি বৌদিও নয়। হঠাৎ যেন নিরু বৌদিই এক নিমেষে এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর শুধু নারীও নয় যেন—বধূ। বউ। কোন এক বিবাগীর বউ! এত দিনের মধ্যে এমন রূপ যেন আজ প্রথম দেখলাম।" ("বউ" গল্প)।

নিভৃতে মনের মণিকোঠায় লালিত প্রেমের মহিমা অতি সহজেই আমাদের মনকে অভিভূত করে।

মনোহরের প্রেম আর এক ধরনের। লেখককে গল্পের প্লট জুগিয়ে মনোহর জীবিকা নির্বাহ করে। তার জীবনে প্রেমের প্রভাব আপাতঃ দৃষ্টিতে অকল্পনীয়। কিন্তু সেও প্রেমের স্মৃতি বয়ে চলেছে। শৈশবে মধুপুর বেড়াতে গিয়ে পুতুলের সঙ্গে মনোহরের পরিচয়। অল্পদিনেই সে পরিচয় এমন ঘনিষ্টতায় পর্যবসিত হ'ল যে পুতুলের মা পদ্মমাসী বলতো মনোহরের মাকে—"দিদি, তোমার মনোহরের সঙ্গে আমার পুতুলের কী যে ভাব, কী বলবো—দুটির বিয়ে হলে বেশ হয়!" কলকাতায় ফিরে হাওড়া ষ্টেশন থেকেই পদ্মমাসীমা মনোহরকে তাঁদের চেতলার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িতে পিসেমশায়কে আগে থেকেই অন্যরূপ লেখা ছিল বলে তখুনি চেতলা যাওয়া সম্ভব হল না। ঘটনাচক্রে পরবর্তী একত্রিশ বছরের মধ্যে একবারও আর তার পক্ষে চেতলা আসা সম্ভব হয়নি। যে গল্পলেখককে মনোহর গল্পের প্লট জোগান দিত তাঁর চেতলার বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ মনোহর গ্রহণ করলো না কেন? "আমি বুঝলাম মনোহর আর আসবে না। দশ টাকা কেন, দু'শো টাকা দিলেও মনোহর আর এপাড়ায় আসবে না। এতদিনের জমানো সম্পদ, একত্রিশ বছর ধরে যখের ধনের মতন যা আগলে বসে আছে, তার সম্বন্ধে কি এই ঝুঁকি নেওয়া চলে! যদি খোয়া যায়। যদি হারিয়ে যায়! ভেবেছিলাম মনোহর বুঝি শুধু অর্থেরই কাঙাল। কিন্তু সে যে পরমার্থেরও কাঙাল তা এতদিনে বুঝলাম।" ("গল্প লেখকের গল্প" শীর্ষক কাহিনী)।

বনলতা দেবী, সুধাময় মিত্র এবং সরবতী বাঈ-এর ত্রিভুজ প্রেম মানবমনের

আর একটি বিচিত্র রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ছাব্বিশ বছরের বনলতা দেবী তেইশ বছরের সুধাময় মিত্রের গালে হাসপাতালের সামনে চটি খুলে সপাং সপাং করে বসিয়ে দিয়েছে। বনলতার জুতোর শুকতলাটা সুধাময়ের গালে গিয়ে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।" অসমবয়সী এই দুই তরুণ তরুণীর মধ্যে প্রেম যে বিচিত্ররূপে দেখা দিল তা সাধারণ বিচারে অসম্ভব মনে হলে'ও পাঠকের চোখে এক অপূর্ব মহিমায় স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেয়। চাকরির সন্ধানে সুধাময় মিত্র সুদূর রাজপুতানার আজমীরে গিয়ে কী করে সরবতী বাঈ এর প্রেমে পড়লো সে কাহিনী যেমন বিস্ময়কর তেমনি হৃদয়বিদারক। আর তারও পরে বনলতা দেবী কী করে বনলতা মিত্রতে পরিণত হলেন তা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ না করেই পারে না। ("সরবতী বাঈ" গল্প)।

মিসেস ডি'সুজা দেহজ প্রেমের পূজারী। স্বামীকে সে ভালবাসে—কিন্তু তার ভালবাসার প্রধান উৎস দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি। স্বামীকে ভালবাসা সত্ত্বেও তাই মিলি ডি'সুজা তার দেওর জনিকে বাধ্য করেছে তার কাম চরিতার্থের উপকরণ হ'তে। ("গার্ড ডি'সুজা")

মিষ্টার সান্যালের প্রেম অসাধারণ। তিনি মিসেস কঙ্কাবতী সরকারকে খুশি করবার জন্য নিজের সব কিছু দিয়েছেন—অথচ কঙ্কাবতী সরকার তাঁকে বঞ্চনা করেছেন জেনেও তিনি তাঁকে ভুলতে পারলেন না।

"আমি শুনতে পেলাম কথাগুলো বলতে বলতে কঙ্কাবতী সরকারের গলা যেন ধরে এল। মনে হলো তিনি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

"—আপনি ছ'মাস একটা পয়সা দেননি, মেয়েদের কলেজের মাইনে বাকি পড়েছে, মাইনে না পেয়ে দুটো চাকর চলে গেছে, মাছ আসছে না তিন মাস, আমি মা হয়ে তো এসব দেখছি। আর আমারই কি মুখ ফুটে এ-সব কথা বলতে ভাল লাগছে মনে করেন?

"মিষ্টার সান্যাল বললে—আর তুমি যদি জানতে যে আমার কী বিপদ চলছে, তা হলে এত কথা বলতে তোমার সত্যিই বাধতো! আজ দুবছর হলো আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে, আমার চাকরী গেছে, আমার বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন্ হয়ে গেছে! আমি যে এখনও আসি এখানে তা কেবল একটু শান্তির জন্যে। সেই শান্তিটুকুই আজ চলে গেল—"

"অনেকক্ষণ পরে কঙ্কাবতী সরকারের গলা শোনা গেল—তার চেয়ে আপনি আর এখানে আসবেন না।

"কিন্তু না এসে কোথায় যাব ? কোথায় যাবার জায়গা আছে আমার ? আমার যে আর কোন জায়গা নাই যাবার ।······

"কঙ্কাবতী সরকার এবার রেগে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন—যেখানে খুশী যান, জাহান্নমে যান্, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ? যান্—

"আর তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেবার শব্দ হলো।

"বুঝলাম মিষ্টার সান্যালকে কঙ্কাবতী সরকার বাইরে বের করে দিয়েছেন···"

কঙ্কাবতী সরকারের পরিবার মিঃ সান্যালের "সাহায্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল ; সান্যাল সহায় সম্বলহীন হলেন। মিঃ সান্যাল সারাদিন বাড়িতেই থাকে। কিন্তু রাত আটটা বাজলেই মনটা ছট্‌ফট্ করে ওঠে। আর কিছুতেই বাড়িতে থাকতে পারে না। একটা বাঁধা রিকসা আছে, সেইটে চেপে এখানে চলে আসে। আগে গাড়ীতে আসতো, এখন রিকসায় আসে। এখানে (কঙ্কাবতী সরকার যে বাড়ীতে থাকতেন) এসে ওই একটুখানি দাঁড়ায়, তারপর আবার চলে যায়। দেখবেন, কাল যদি লক্ষ্য করেন, কালও রাত আটটার সময় মিষ্টার সান্যালকে দেখতে পাবেন। আমি তাই মিষ্টার সান্যালের নাম দিয়েছি 'রাত আটটার সওয়ারী'।" ("রাত আটটার সওয়ারী" গল্প)।

"সিসিফাস" গল্পে প্রেমের উদ্ভট রূপ দেখতে পাই। এজরা মেমসাহেব তার স্বামীখাদক অজগর সাপকে নিয়ে ঘর করছে। যতক্ষণ তিনি লেখকের সঙ্গে কথা বলেছেন ততক্ষণ কেবল তাঁর স্বর্গত স্বামী মিষ্টার এজরার কথাই বলেছেন —"দেখুন না, কী চমৎকার চেহারা মিঃ এজরার। এত ভাল চেহারা আপনি পাবেন না আমাদের জুদের কমিউনিটিতে। কেমন, ঠিক নয় ?··· আমাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। উই ওয়্যার এ হ্যাপি কাপ্‌ল—জানেন, এখানকার সবাই আমাদের হিংসে করতো।—আর ওই দেখুন ওঁর ইয়াং ডে'জএর ছবি। দেখেছেন কী চমৎকার চেহারা ! জানেন মিষ্টার মিত্র, ও-রকম হাজব্যাণ্ড হয় না।

"খাওয়া-দাওয়া তখন হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি তখন থেকে কেবল বক্‌বক্ করেই চলেছিল। তারপর আমাকে নিয়ে গেল নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে। সারি সারি সাজানো ঘর। ঘরের দেয়ালময় শুধু মিষ্টার আর মিসেস এজরার ছবি। দুজনে নানাভাবে ছবি তুলিয়েছে। নানা ঢঙে, নানা ভঙ্গিতে।

"শেষকালে একটা ঘরে গেলেন। সেটা সিসি'র ঘর। সেখানে সিসি থাকে। একটা ডবল খাট। বিছানা বালিশ। সোফা কৌচ। কাচের একটা কেস। সিসি তখন খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। আধখানা কাচের কেসের মাথায়,

আর আধখানা বিছানায় লটকে পড়ে আছে।—আসুন কিচ্ছু ভয় নেই। ও কামড়ায় না কাউকে। ভারি ভালো আমার সিসি। বলে সিসির দিকে হাত বাড়িয়ে আদর করতে লাগলো—সিসি—সিসি—মাই ডারলিং—মনে হলো মিসেস এজরা যেন সিসির মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুমু খেল···আমার তখন গা ঘিনঘিন করছে। বললাম, আমি এবার আসি মিসেস এজরা।"

পুত্ররূপে প্রতিপালন করতে যাকে এক বিধবা নারী গ্রহণ করলো তাকেই কী রূপে স্বামীরূপে বরণ করলো "বেলমোতিয়া" গল্পে তারই কাহিনী বিধৃত।

বিমলবাবুর গল্পে প্রেমিক-প্রেমিকারা নিরীহ—তাদের মনে লোভ বা একে অপরকে গ্রাস করার মনোবৃত্তি নেই। তাই গল্পে বর্ণিত প্রেম আমাদের হয় মোহিত করে না হয় বেদনায় মথিত করে। এই প্রেমের মধ্যে ঘৃণ্য, পরিত্যজ্য কিছু নেই—তার মধ্যে কোন খাদ নেই (এক মিলি ডি'সুজার প্রেম ছাড়া)। শত সহস্র দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয় নি, প্রেমের এই শান্ত, নিরুত্তাপ রূপ তারই পরিচায়ক। সকলে এখনও প্রবঞ্চক স্বার্থপর হয়নি; এখনও সমাজে প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল হয়নি। যতদিন সমাজে এই স্বার্থক্লেশহীন সমবেদনাবোধ থাকবে ততদিন সমাজের পুনরভ্যুত্থানের আশাও থাকবে।

বিমল মিত্রের গল্পের পাত্রপাত্রীর বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। এই বৈচিত্র্য কেবল চরিত্রগত নয়, ভাষাগত এবং জাতিগতও বটে। বিমলবাবু বাঙ্গালী, বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর গল্পের পাঠকও মুখ্যতঃ বাঙ্গালী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্পে বাঙ্গালী নরনারীর ভীড়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষীদের, এমন কি বিদেশীদের উপস্থিতিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "জেনানা সংবাদ" গল্পে, কৃষ্ণমূর্তি (যার মৃত্যু উপলক্ষ্যে গল্পের অবতারণা). আজাইব সিং, টি. আই.—এণ্টনী, ষ্টেশনমাষ্টার মুদেলিয়র, সিন্ধী সোনপার সাহেব, পাবলিক ওয়ে ইনস্‌পেকটর গুরুবচন মেটা, ম্যাড্রাসী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান হ্যারী স্বামীনাথন সকলেই অবাঙ্গালী। তেমনি "হোলিওয়াটার" গল্পে টিপ্‌লার সাহেব, দেহাতী মেয়ে শনিচরি, "তাজমহল" গল্পে মিষ্টার রামলিঙ্গম আয়ার, মিষ্টার ত্রিপাঠি, ডাক্তার রামপাল সিং, মিষ্টার চৌহান; "সরবতী বাঈ" গল্পে সরবতী বাঈ, রাজাসাহেব, খোজা দিলখুশা সিং, লালজী সাহেব, ঈশ্বরীপ্রসাদ, "মেনন সাহেব" গল্পে মেমন সাহেব, ত্রিবেদীজী, "মিসেস নন্দী" গল্পে মিষ্টার ভাণ্ডারী, মিষ্টার কাশ্যপ, "এক রাজার ছয় রাণী" গল্পে পাণ্ডা মহারাজ ডি. এন্. কালে, পুষ্করের দামোদর পাণ্ডে, ঠাকুর সাহেব নর্মদাপ্রসাদ, "গার্ড

ডিসুজা” গল্পে, মিসেস্ মিলি ডিসুজা, গার্ড ডিসুজার ভাই জনি এবং গার্ড ডিসুজা ; “আমেরিকা” গল্পে মিঃ রিচার্ড ; “ট্যাঙ্কো” গল্পে বদ্রীদাস আগরওয়ালা ; “হঠাৎ” গল্পে ডি. টি. এস্ ক্যালাঘান, “আসল নকল” গল্পে মিষ্টার প্রেমলানি, ঠাকুরসাহেব আর তাঁর স্ত্রী ; “ভেজাল” গল্পে বিশ্বনাথ প্যাটেল, মিষ্টার দেশপাণ্ডে ; “গল্প না লেখার গল্প” গল্পে মিষ্টার চন্দ্রগেশম, “সিসিফাস” গল্পে ছুনিচাঁদ, এজরা মেমসাহেব, “কুড়ি মিনিটের গল্প” কাহিনীতে পিপারিয়া মৌজার অশীতিপর বৃদ্ধ ঠাকুর সাহেব, তাঁর বড়ছেলে দরবারালাল এবং ছোটছেলে ছেদীলাল ; “ভদ্রলোক” গল্পে ডঃ রামলিঙ্গম ; “বেলমোতিয়া” গল্পে বেলমোতিয়া, হরবন্সলাল এবং তার ছেলে কুন্দনলাল ; ও “ইণ্ডিয়া” গল্পে জগদীশ পাটিল সকলেই অবাঙ্গালী।

কর্মসূত্রে শ্রীমিত্রকে বহুবছর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কাটাতে হয়েছে ; সেই সকল স্থানে অবশ্যম্ভাবীরূপেই তাঁকে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। বাস্তবানুগ গল্প লেখক হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সেই সম্পর্কের অভিজ্ঞতা গল্পের মধ্যে এসে পড়েছে। এতে গল্পগুলির আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি। কারণ পাত্রপাত্রীর বৈচিত্র্যের দরুণ অনেক চারিত্রিক বৈচিত্র্যও গল্পগুলিতে দেখা দিয়েছে যা কখনই সম্ভব হত না যদি কেবল বাঙ্গালী পাত্রপাত্রীই গল্পের মুখ্য উপজীব্য হ'ত। গত ত্রিশ বছরে বাংলা দেশের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব অমোঘ ভাবেই সামাজিক ব্যবস্থার উপর পড়েছে এবং তার ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে (বিদেশীদের থেকে তো বটেই) বাঙ্গালীদের আচরণের স্বাতন্ত্র্য এখনও অবশ্যম্ভাবীরূপে লক্ষ্যণীয়। সুতরাং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশিষ্ট আচার ব্যবহার আমদানীর ফলে গল্পগুলি রসবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর হয়েছে। “হোলি ওয়াটার” গল্পটি একজন বিদেশী সাহেব এবং দেহাতী মেয়ে শনিচরিয়ার মিলন ব্যতীত অকল্পনীয়। একমাত্র একজন বহির্মুখী পর্যটকের পক্ষেই এভাবে তার অতীতকে ভুলে যাওয়া সম্ভব যেভাবে টিপ্‌লার সাহেব তাঁর অতীতকে ভুলে গিয়েছিল। তেমনি ভাবে অর্ধগৃহী শনিচরিয়ার মত মেয়ে ছাড়া অজ্ঞাতকুলশীল এক বিদেশীকে এভাবে ভালবাসা অপর কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিলনা। “সরবতী বাঈ” গল্পে সরবতী বাঈ-এর যে সমস্যা—স্বামীকে অবারিত ভালবাসা সত্ত্বেও তার সঙ্গে মিলনের অক্ষমতা—তা কোন সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের জীবনে আশা করা যায় না। রাজস্থানের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশেই কেবলমাত্র সরবতী বাঈএর মত নারীর অবস্থিতি বাঞ্ছনীয়। অর্থবতী, বিধবা মিসেস্ এজরার

পক্ষেই অজগর সাপ নিয়ে থাকা সম্ভব জব্বলপুরের জঙ্গলে—কোন বাঙ্গালী এমন কি ভারতীয় মহিলাকে নিয়েও এধরণের গল্প লেখা সম্ভব নয়। অথচ এজন্য মেমসাহেব সাপ নিয়ে ঘর করছেন এটা বিশ্বাস করতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। "ট্যাকসো" গল্পে বদ্রীদাস আগরওয়ালার পরিবর্তে কোন বাঙ্গালীকে গল্পের নায়ক করলে গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য হ'ত না; কারণ আমাদের জীবনে বদ্রীদাস আগরওয়ালা বাস্তব সত্য, তাকে নিয়ে tampering আমরা গল্পেও সহ্য করতে প্রস্তুত নই।

গল্পে অবাঙ্গালী পাত্রপাত্রী আমদানীর ফলে বাঙ্গালী পাত্রপাত্রীরও চরিত্র ফুটনে বিশেষ সাহায্য হয়েছে। সুজাতা যদি মাদ্রাজী খ্রিশ্চিয়ান হ্যারী স্বামীনাথনকে না বিয়ে করে তার স্বজাতি কোন বাঙ্গালী হিন্দুকে বিয়ে করতো তবে তার যে চরিত্র "জেনানা সংবাদ" গল্পে মিঃ গুরুচরণ মেটা চিত্রিত করেছেন তা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হ'ত না। "আমেরিকা" গল্পে মিঃ রিচার্ড ছাড়া যদি অন্য কোন বাঙ্গালী বা এমন কি অবাঙ্গালী কোন ভারতীয়ের মুখে কাহিনীটি বলানো হ'ত তবে কি তা পাঠকের হৃদয় এরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারতো? "আসল নকল" গল্পে সিন্ধী ব্যবসায়ী মিঃ প্রেমলানীর কর্মচারী হিসাবে হরিবাবুর চরিত্র কি স্বাভাবিক মনে হয় না? রাজস্থানে সিন্ধী ব্যবসায়ীর বাঙ্গালী কর্মী কল্পনা করার তুলনায় বাঙ্গালী মালিকের সিন্ধী কর্মচারী কল্পনা উদ্ভট মনে হবে না কি? অথচ একজন সাধারণ কর্মচারী হিসাবে হরিবাবুর চরিত্রে বাঙ্গালীর সততার যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তাকে কোন মতেই অবাস্তব মনে হয় না।

গল্পের ঘটনাস্থল বাংলাদেশের বাইরে হওয়ায় বিচিত্র পাত্রপাত্রীর মত বিচিত্র ঘটনাবলীরও উল্লেখ সম্ভব হয়েছে। তার ফলে গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য, রসবৈচিত্র্য সমৃদ্ধতর হয়েছে। "বেলমোতিয়া" গল্পের সদ্য বিধবা বেলমোতিয়াকে স্বামীর চিতার ওপর পড়ে যে ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশে, বাংলা দেশের বাইরেও, কোন কোন বাঙ্গালী নারীর পক্ষে সে ব্যবহার অসম্ভব। কারণ মধ্যপ্রদেশের গণ্ডগ্রামেই সতীপ্রথার প্রচলন কল্পনা করা সম্ভব (বাস্তব জীবনেও সেখানে সতীদাহ এখনও ঘটে থাকে, কিন্তু বাংলা দেশে তা ঘটে না)। সতীপ্রথার প্রচলন না থাকলে বেলমোতিয়া ওভাবে শ্মশানে আসতে পারতো না এবং স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করতে পারতো না। বেলমোতিয়াকে চিতা থেকে বাঁচানোর ফলেই তার জীবনের পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে প্রথম জীবনের ঘটনার বৈপরীত্য এরূপ সার্থকভাবে ফোটানো সম্ভব হয়েছে। "ভেজাল" গল্প কখনই কলিকাতা নগরীকে নিয়ে লেখা যেত না; প্রহিবিশন (prohibition)-এলাকাভুক্ত বোম্বাই নগরীতেই সামান্য ক' বোতল মদের জন্য

সত্যাশ্রয়ী, সাত্ত্বিক, হিন্দু বিধবার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলানো সম্ভব হয়েছে। "গল্প না লেখার গল্পে" মিঃ চন্দ্রগেশম-এর যে চরিত্র লেখক এঁকেছেন তা জনপদ বিচ্ছিন্ন মহাবলিপুরমের হোটেলেই সম্ভব। কলিকাতা বা অন্য কোন নগরীর ব্যস্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে কোন হোটেল ম্যানেজার বা হোটেল অধিবাসীরই ঐরূপ গালগল্প করা সম্ভব হ'ত না যার মধ্য থেকে কর্মঠ, সৎ অথচ জীবন যুদ্ধে অসফল মিঃ চন্দ্রগেশম আমাদের সামনে পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। "কুড়ি মিনিটের গল্প" রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য হ'ত না। তেমনি এরোপ্লেনে ছাড়া কোন আমেরিকাবাসীকে "আমেরিকা"র মত গল্প বলা রত অবস্থায় কল্পনা করা যায় না। মিঃ রিচার্ড ধনী ভ্রমণকারী কলিকাতার সেরা হোটেলে উঠেছেন; একমাত্র এরোপ্লেনে ভ্রমণের সময় ছাড়া তাঁর তো কথা বলারই সময় নেই। গল্প লেখকের মত শ্রোতারই কি একজন মার্কিনী ভদ্রলোকের এত কথা শোনার সময় আছে ভ্রমণরত অবস্থায় ছাড়া?

পারিপার্শ্বিকের প্রভাব মানুষের উপর অবশ্যম্ভাবী রূপেই পড়ে। ফলে গল্পের ঘটনাস্থল বাংলা দেশের বাইরে হওয়ায় বাঙ্গালী চরিত্রেরও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত পরিবেশে "পুতুল দিদি"-র ন্যায় নারী চরিত্রের কল্পনা করা যায় না। পুতুল দিদির বাবা রেলের কাজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়েছেন এবং পুতুল দিদিও সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছেন। তাঁর ভালবাসা, বিবাহ এবং সংসার ধর্ম পালন সবই ঘটেছে এই পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে। তাই পুতুল দিদির চারিত্রিক স্খলন ঘটলেও তিনি মেয়ের বিবাহেরও ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। আগ্রার হোটেল ছাড়া কলিকাতার কোথাও কী কোন বাঙ্গালী যুবক ও যুবতী এরূপ নিরুদ্বেগ অবসরে তাদের প্রেমাভিষেক সম্পূর্ণ করতে পারতো (তাজমহল গল্প)? জামসেদপুরের মত কেন্দ্রাভিমুখী শহর ছাড়া মিসেস্ নন্দীর মত স্বল্পশিক্ষিতা রমণীর পক্ষে কখনই ঐরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব ছিল না যার ফলে তাঁর স্বামীর ঐরূপ বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। কলিকাতার মত সুবিস্তৃত নগরীতে মিসেস্ নন্দী নিতান্ত করুণার পাত্র হয়ে থাকতেন; কিন্তু ক্ষুদ্রতর শহর জামসেদপুরে তিনি মিঃ কাশ্যপ, মিষ্টার ভাণ্ডারী প্রভৃতি অফিসারদের উপর স্বচ্ছন্দেই আপনার প্রভাবের মহিমা বিস্তার করতে পারেন। তেমনি পাটনার মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বৈচিত্র্য-হীন শহরের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জীর চরিত্র ("নীলনেশা" গল্পে) ঐ ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। জনবহুল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কলিকাতা নগরীতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যেতেন। শুধু তাই নয় স্বল্প আয়ের

অধিকারী তাঁর জামাই রায়সাহেব (পরে রায়বাহাদুর) মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষেও তাঁর শ্বশুর ও অবিবাহিতা তিন শ্যালিকার ভার বহন করা সম্ভব হ'ত না।

কয়েকটি গল্পে ব্যক্তিমানসের যে বিশিষ্ট রূপ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে মানব মনের ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। "লজ্জাহর" গল্পে রমাপতি সিংহের চরিত্রে একটি লাজুক পুরুষের চিত্রটি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। রমাপতি অনেকের সামনে তার যথার্থ মনোভাব প্রকাশে কুণ্ঠিত; চারদিকের লোকেরা সেই কুণ্ঠাকে তার চরিত্রের একটা মহৎ ত্রুটী মনে করে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছালো। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশে যে রমাপতি প্রত্যাশিত ব্যবহার করে তারও উল্লেখ লেখক করেছেন রমাপতির মা স্বর্ণময়ীর মুখ দিয়ে: "তোমরা ভাবো ওর বুঝি মায়া দয়া কিছু নেই—আছে, বৌমা, সেদিন নিজের চোখে দেখলাম যে—দোতলার বারান্দায় মেজ বৌমার ছেলে ঘুমোচ্ছিল, কেউ কোথাও নেই, রমু আমার দেখি ছেলের গাল টিপে দিচ্ছে—মুখময় চুমু খাচ্ছে, সে যে কী আদর কী বলবো তোমাদের, রমু যে আমার ছেলেপিলেদের অমন আদর করতে পারে আমি তো দেখে অবাক,......তারপর হঠাৎ আমায় দেখে ফেলতেই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল—" নববধূর সঙ্গে বাসর ঘরে রমাপতির ব্যবহারে যে পুলকিত চমক জাগে এই সব ছোট ঘটনা মনে রাখলে তার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতার আমেজ থাকবে না। বস্তুতঃ নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে লেখক এই পরিণতির জন্য রমাপতি চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন। চমক্ লাগা সত্বেও যে পরিণতিটি বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে সেখানেই গল্পলেখকের কৃতিত্ব।

"সাতাশে শ্রাবণ" গল্পে একটি যুবতী বিধবার জীবনের যে ট্র্যাজেডি লেখক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তাতে কোন পাঠকই বিচলিত না হয়ে থাকতে পারবেন না। সাতাশে শ্রাবণ মা সুরবালার গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার বার্ষিকী দিন। তাই তাঁর মেয়ে জামাইরা সকলে নিমন্ত্রিত হয়েছে আরও বহুলোকের সঙ্গে। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এই বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। সমস্ত দেখাশোনার ভার কনিষ্ঠা বিধবা কন্যা সুরুচির ওপর। সুরুচির অক্লান্ত পরিশ্রমে বার্ষিকী খুবই সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হ'ল। সারাদিন সুরুচিকে দেখে কেউ মনেও করতে পারত না যে সুরুচির মনে কোন দুঃখ আছে। কিন্তু গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে মা সুরবালা দেখলেন যে বিধবার সাজ খুলে ফেলে লাল বেনারসী পরে, "স্বামীর ছবিটা সুরুচি নিয়েছে বুকে। বুকে নিয়ে সুরুচি তার বিছানায় শুয়ে আছে। সুরবালার দু' চোখ জ্বালা করতে লাগলো। তাঁরই পেটের মেয়ে সুরুচি......সমস্ত

দিনের বেলার সুরুচির সঙ্গে এ সুরুচির কত প্রভেদ। ছবিটাকে বুকে রাখলে সুরুচি, মুখের ওপর রাখলে, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো। একে একে সমস্ত গয়না খুললে। কানের দুল, হাতের চুড়ি—বেনারসী বদলে পড়লো সাদা থান একটা, সিঁদুর ঘষে ঘষে মুছে ফেললে। সুরবালা দেখলেন, সুরুচি সেই নিরাভরণ শরীরে স্বামীর ছবিটি সাজিয়ে রাখলে মেঝের এককোণে একটা জলচৌকির ওপর। সেখানে আলপনা দিয়েছে বিচিত্র করে, ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, ধূপ জ্বাললে, প্রদীপ জ্বাললে। সুরুচি উঠে বসে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সেইদিকে, গভীর ধ্যান-মৌন মূর্তি তার······সে যেন এ-জগতের সমস্ত মায়া সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়লো······"

মা সুরবালা মেয়ে মূর্চ্ছা গেছে ভেবে দরজায় ধাক্কা দিলে পর সুরুচি দরজা খুলে হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে সুরবালার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুরবালা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। —মা আমার, সোনা আমার— সুরবালার মুখ দিয়ে সান্ত্বনার ভাষা আর বেরুল না······সুরবালার চোখ দুটো শুধু জ্বালা করতে লাগলো। সুরবালার মনে ছিল না—সুরুচির হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর মুছেছিল সাতাশে শ্রাবণ। তাঁর গুরুদেবের উৎসব আর সুরুচির সর্বনাশ—সে যে একই তারিখে, সে কথা সুরবালার কেমন করে মনে থাকবে।" Suffering is individual—দুঃখের একাকীত্বের এরকম হৃদয়গ্রাহী চিত্র সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

মানুষের মনে যে কখন অভাববোধ এসে হানা দেবে তা কেউই আগে থেকে বলতে পারে না। অবিবাহিত থাকার জন্য আত্মাবমান প্রমীলার মনে কখনও ছায়াপাত করেনি ক্লাস-ফ্রেণ্ড প্রীতি সেনের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত। প্রীতি আবার প্রমীলা যে-স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ সেই স্কুলের সেক্রেটারীর স্ত্রী। ধনী স্বামীর গরবিনী স্ত্রী প্রীতির করুণা প্রিয়বঞ্চিতা প্রমীলার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। মনের মধ্যে একবার ভাঙন দেখা দিলে তা রোধ করা অসম্ভব। অপরের অনুকম্পা থেকে নিজেকে বাঁচানর জন্য প্রমীলা যে কাজ করল তা যেমনি অভাবনীয় তেমনি করুণ। ("আমৃত্যু" গল্প)।

"দড়ি" গল্পে অপরাধীকে দণ্ডদানের পর অনুভূতিশীল নতুন বিচারকের মনে অনিশ্চয়তার যে আন্দোলন ঘটে তার একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। 'আমীর ও উর্বশী" গল্পে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার চিন্তায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি যে

কীরূপ অভিনব উপায়ে তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী লোককে ঘায়েল করতে পারে সেই কাহিনী বর্ণিত আছে। এ গল্প পড়ে শিউরে উঠবেন না এমন পাঠক কম আছে।

শ্রীহরসুন্দর ভট্টাচার্য পুরুষ মানুষ—সৎ, ধার্মিক এবং সত্যবাদী বলে তাঁর সুনাম আছে। আবাগীদের পাড়ার মধ্যে চল্লিশ বছর যাবত তিনি কাঠের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের কোন দোষ নেই, তাঁর কোন সাধারণ নেশা নেই। প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিকাল পাঁচটার সময় দোকান থেকে বেরিয়ে তিনি কোথাও যান। যদি কোন কারণ বশতঃ কোন দিন তাঁর পক্ষে পাঁচটার সময় যাওয়া সম্ভব না হয় তখন তাঁকে বেশ ছটফট করতেই দেখা যায়। কোথায় উনি যান রোজ ঠিক পাঁচটা বাজলেই! আর ফেরেন ঠিক রাত সাড়ে ন'টার পর! এত হন্তদন্ত হয়ে তিনি যান অদূরবর্তী গলিতে পাশাখেলা দেখতে। অল্প বয়সে পাশা খেলার নেশা ছিল, কিন্তু বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পাশা উনি আর খেলবেন না। জীবনে সকল প্রলোভন জয় করেও পাশা খেলার প্রতি আকর্ষণটা হরসুন্দরবাবু ছাড়তে পারেননি। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি, খেলতে পারেন না, কিন্তু খেলার জায়গায় না এসেও থাকতে পারেন না—তবে শুধু খেলা দেখতেই আসেন! মানুষের মনের কী বিচিত্র গতি! ("পুরুষ মানুষ" গল্প)

সমাজে এমন একদল লোক আছে যারা নিজেদের বাহাদুরি ফলাতে এবং অপরকে অযথা হেয় প্রতিপন্ন করতে সর্বদা তৎপর। তারা নিজেদের প্রশংসায় এত মশ্গুল যে, অপরের প্রতি ন্যায়বিচার করা হ'ল কিনা এ সম্পর্কে কোন চিন্তাই তাদের মনে আসতে পারে না। রাঙা মাসীমা সেই জাতের লোক। "আমার মাসীমা" তাঁরই চরিত্রবর্ণন।

যে নারীর অতীতে কোন এক সময় পদস্খলন ঘটেছিল তার মনের অস্থিরতার চিত্র রয়েছে "যে গল্প লেখা হয়নি" কাহিনীতে। স্বামীর বন্ধুকে ভুল করে মিলি ব্ল্যাকমেলার ভেবে যে ব্যবহার করলো তাতে আমাদের সমাজে মেয়েদের অসহায়তার করুণ দিকটাই ফুটে উঠেছে।

জামনগরের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মেনন সাহেব—আপাতদৃষ্টিতে তাঁর জীবনে কোনও কিছুরই অভাব নেই। তবুও আমরা তাঁকে কাঁদতে দেখি। মানবমনে অভাববোধ যে কখন কোনখান দিয়ে ঢোকে তার সন্ধান পাওয়া কঠিন। মধ্যবয়সী মেনন সাহেব যে মায়ের প্রতি অভিমানে এভাবে মানসিক কষ্ট পেতে পারেন এ কী বাইরে থেকে তাঁকে দেখে কেউ কল্পনা করতে পারে? ("মেনন সাহেব" গল্প)

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সার্থকতালাভের যে আকাঙ্খা অন্তর্নিহিত রয়েছে এবং সেই সার্থকতালাভের প্রয়াস ব্যর্থ হ'লে মানুষের যে করুণ রূপ হয় "উপন্যাস" গল্পের সুশীতল তার মূর্ত প্রতীক। সুশীতল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে—জীবনে সে গভীর নিষ্ঠা এবং নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সব কাজ করেছে। কিন্তু তাতে জীবনে সাফল্য বা recognition পায়নি। সারাজীবন অন্যের কথা চিন্তা করে জীবনের শেষ প্রান্তে যখন সে নিজের সার্থকতালাভের চেষ্টায় ব্রতী হ'ল তা'তে তো সে ব্যর্থ হ'লই; কোন লোকের এমন কি নিজের স্ত্রী-পুত্রেরও সমর্থন তাতে সে পেল না। চাকরি জীবনের শেষে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে যখন সে নিজের মনোমত খরচ করতে গেল তখন তার স্ত্রী তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাধা দিল, কারণ ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া এবং মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু সুশীতলের দিক থেকেও কী টাকাটা খরচ করার কোন যুক্তি নেই? সুশীতল বলেছিল রায়বাহাদুর বন্ধুকে: "ও টাকার ওপর কারোর কোনও অধিকার নেই! আমি সারাজীবন কষ্ট করে চাকরি করেছি, ছেলে-মেয়েদের খাইয়েছি, এখন আমি মুক্তি চাই। এতদিন আমি নিজের সুখ-সুবিধে নিজের স্বার্থ, নিজের লাভ-লোকসান কিচ্ছু দেখিনি। সকালবেলা উঠে ছেলে পড়িয়েছি, বাজার করেছি, অফিসে গিয়েছি, তারপর সারাদিন অফিসের কাজ করেছি, রাত্রেও অফিসের ফাইল নিয়ে এসে কাজ করেছি। নিজের কথা একবার ভাববারও সময় পাইনি—কিন্তু এবার ঠিক করেছি, আর কারো কথা, আর কোনও কথা ভাববো না, এবার শুধু নিজের কাজ করবো··ছোটবেলা থেকে আমার বরাবর যা সাধ ছিল, সংসারের চাপে এতদিন তা করতে পারিনি···আমি এখন থেকে লিখবো—ছোটবেলা থেকে আমার লেখক হবার সাধ ছিল, এবার আমি লিখবো কেবল···হয়ত পাগলই বলবে তোমরা। কিন্তু জীবনে আমার একটা সাধ ছিল, সেটা না হয় মেটালামই। এতদিন সংসারের জন্যে নিজের সব কিছু তো জলাঞ্জলি দিয়েছি, এখন না হয় পাগলামিই করলাম! আমার টাকা, নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা, সেই টাকা আমি খরচ করবো, পাগলামী করবো, যা-খুশী করবো, তাতে কার কী বলবার আছে?···"

সুশীতল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি!

সীমাবদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে জীবনকে বিচার করলে আঘাত পাওয়া যে অবশ্যম্ভাবী "শেষ শূন্য" গল্পের যোগজীবনবাবু আমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেন। যোগজীবনবাবু লেখাপড়া করাকেই জীবনের পরমার্থ ভেবেছেন—বই পড়ে মহাপণ্ডিত না হয়ে, অফিসে কেরানীগিরি না করেও যে মানুষ সার্থকতা লাভ করতে পারে এ তাঁর

চিন্তার বাইরে। কাজেই যখন তাঁর নিজের ছেলে কেবল তবলা বাজানোর বিদ্যার জোরে গাড়ি কিনে ফেলল তখন যোগজীবনবাবু স্বতঃই আঘাত পেলেন। তাঁর মনোবেদনা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়: "সারা জীবন চাকরি করে আমি উনিশ হাজার টাকা জমাতে পারিনি। আর আমার ছেলে কিনা লেখাপড়া না শিখে সেই অত টাকায় গাড়ি কিনেছে ?…কী করে হলো তা তো…ভেবে পাই না, তাই ভেবে ভেবেই তো আমার এই মাথার অসুখ হয়েছে ভাই—আমি কী যে করি !"

জীবনকে কখনও সম্পূর্ণরূপে জানা হয় না। জীবনের সব জানা হয়ে গিয়েছে ভেবে যদি কেউ গর্ব অনুভব করে তাকে সময় সময় যে কী রকম বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় "মহারানী" গল্পে তারই ইঙ্গিত আছে। পরমা সুন্দরী গৌরী দেবী লেখকের নাটকে অভিনয় করতে অস্বীকার করলেন এই কারণে যে নাটকের হিরো খোঁড়া এবং তাঁর বিশ্বাস কোন সুন্দরী কোন খোঁড়াকে ভালবাসতে পারে না। খোঁড়ারাও বাস্তব জীবনে বিয়ে করে এবং স্ত্রীদের ভালবাসা পায় একথা বলতে গৌরী দেবী চটে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দেখ, যা জানো না তা নিয়ে তর্ক করো না, লাইফের ট্রুথ আর লিটারেচারের ট্রুথ কি এক ? নাটক কি লাইফের কার্বন্-কপি ?" অথচ সেই গৌরী দেবীকেই পরবর্তী কালে তাঁর এই থিয়োরীর বিরোধী কাজ করতে হ'ল।

পুত্রের চারিত্রিক অবনতি এবং সমাজবিরোধী কাজে পিতার যে মনঃকষ্ট এবং তার প্রতিকার করতে গিয়ে পিতা কী অভাবনীয় পন্থার আশ্রয় নিল তারই মর্মান্তিক কাহিনী "এমন হয় না" গল্প। মূল্যবোধ থাকার জন্যই পুত্রের অতঃপতনে পিতার মর্মবেদনা। এই মূল্যবোধই সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে। "ভদ্রলোক" গল্পে দোকানদার খাবার বিক্রী করে খায়। কিন্তু সেও নিজের খাবার এবং বিক্রীর খাবারের মধ্যে পার্থক্য করে। নিজের খাবারের অংশ থেকে কাউকে খেতে দিয়ে সে পয়সা নিতে পারে না। এই মূল্যবোধ থাকার জন্যই সেই সামান্য বাঙ্গালী দোকানদার ডঃ রামলিঙ্গম এর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মানুষের মনে দাগ কাটতে পেরেছিলেন।

"শূন্য" গল্পে জীবনে Obsession এর প্রভাব দেখতে পাই। বিত্তবান পরিবারের আধা-পাগ্‌লা ছেলে ফটিকের ধারণা সে অভ্রান্তভাবে হাত দেখে লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে সে বিচার ফলে যাওয়ায় সেই ধারণা তার মনে আরও বদ্ধমূল হ'ল। কিন্তু ফটিকের নিজের জীবনে তার নিজের গণনা খাটল না—গণনা অনুযায়ী যেদিন তার মরবার কথা সেদিন সে মরল না। এই একটি

ঘটনা তার চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটালো। "মিলনান্ত" গল্পে মল্লিক মশায়ই এর চরিত্রে এই Obsession এর করুণ রূপ আমরা দেখতে পাই।

মানুষের মনের গতি বিচিত্র—সোজা পথে যেতে যেতে হঠাৎ কখন যে উল্টো পথে যেতে আরম্ভ করবে তা আগে বোঝবার কোনই উপায় নেই। ট্যাক্সি চালক দুর্গাপ্রসাদ চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিনে অপরিচিত ভাবে আশী হাজার টাকার জিনিষ ফেরত দিয়ে এসেছিল, পুরস্কারস্বরূপ একশ টাকা দিতে চাইলে তাও নিতে অস্বীকৃত হ'ল। আর সেই দুর্গাপ্রসাদই আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভ করার পর কিনা একটি মেয়ের গলা থেকে সামান্য একটা হার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল? ("মানুষ" গল্প)।

"মনোরঞ্জন বোর্ডিং" গল্পে লেখক নির্লজ্জ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, পরগাছাজাতীয় লোকের একটি জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন।

পুষ্করের দামোদর পাঁড়ে তার অজ্ঞানতার ব্যথার ভার বয়ে চলেছে। পাঁড়ে ভোজনবিলাসী, যারা খাওয়াতে ভালবাসে তারা ওকে ডেকে নিয়ে খাইয়ে আনন্দ পেত। তার খাওয়া দেখে প্রসন্ন হয়ে ঠাকুরসাহেব নর্মদাপ্রসাদের ষষ্ঠ রাণী পানের খিলির মধ্যে চিঠি পুরে দিয়ে কী যেন জানতে চাইল। নিরক্ষর পাঁড়ে তার কোন অর্থই উদ্ধার করতে পারল না। চিঠিতে কী লেখা থাকতে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় সে ঐ চিঠি কাউকে দেখাতেও সাহস করল না। নিজে লেখাপড়া শিখতে গিয়েও পাঁড়ে ব্যর্থ হল। তারপর যখন একদিন সাহস করে চিঠিখানা অন্যকে দিয়ে পড়াতে গেল, সেদিন সে চিঠি হারিয়ে গিয়েছে। সেই অজানা রাণীর পুলকের ব্যথা বয়ে দামোদর পাঁড়ে তার জীবন কাটিয়ে দিল। ("এক রাজার ছয় রাণী" গল্প)।

আরতি রায় স্বার্থপর ভণ্ড নারী। নিজের স্বার্থই তার কাছে সব থেকে বড়। তাতে অপরের যত অসুবিধাই হোক না কেন আরতি রায় সে বিষয়ে নির্বিকার। কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও যেন একটা মনুষ্যত্ববোধ তার চরিত্রের মধ্যে উঁকি মারছে। আরতি রায়কে যদি আমরা ঘৃণা না করি তার কারণ বিকাশ গুপ্তর প্রতি তার অকৃত্রিম প্রেম। শত ঘাত প্রতিঘাত, শত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও যৌবনের প্রেমিক বিকাশ গুপ্তকে সে ভোলেনি। হয়তো এ স্মৃতিই তার মধ্যে এক অপরাধবোধ সৃষ্টি করেছে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়হীন এবং কর্কশ আচরণের মাধ্যমে। মনুষ্য চরিত্রের এই জটিলতা সম্পর্কে সজ্ঞানতা বিমলবাবুর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ("রাণীসাহেবা" গল্প)।

বিমলবাবুর গল্পে হিরো (hero) নেই। এটা গল্পের দুর্বলতা সূচিত না করে গল্পকারের ক্ষমতারই পরিচয় বহন করছে। জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ কমে আসছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অভিযান্ত্রিক (technological) বিবর্তন মানুষকে ক্রমশঃই বৃহদাকার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টেনে আনছে যার ফলে মানুষ নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলছে এবং মানুষের অসহায়তাবোধ ক্রমশঃই বাড়ছে। পরোক্ষ ঘটনাবলীর প্রভাব যতই শক্তিশালী হচ্ছে মানুষ ততই তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্যবিধানে নিত্য নতুন সমস্যার মুখোমুখী হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে আত্মবিসর্জন দিতে হচ্ছে উপায়ান্তর না পেয়ে। জীবনের এই অনিশ্চয়তার প্রতিফলন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবধারিতরূপেই পড়ছে। যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের পর হিরো (hero) আবির্ভাব অসম্ভব হয়েছে। বিখ্যাত ইতালীয়ান সাহিত্য সমালোচক মারিও প্রাজ (Mario Praz) উনবিংশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যে কোল্‌রিজ (Coleridge), ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth), ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott), চার্লস্‌ ল্যাম্ব (Charles Lamb) টমাস ডি কুইন্সি (Thomas de Quincey), ম্যাকলে (Macaulay), চার্লস্‌ ডিকেনস্‌ (Charles Dickens) থ্যাকারে (William Makepiece Thackaray), অ্যান্টনী ট্রলপ (Anthony Trollope) এবং জর্জ ইলিয়টের সৃষ্ট রচনার আলোচনা করে যে বই লিখেছেন তাঁর নাম দিয়েছেন *The Hero in Eclipse.* উনবিংশ শতক ইংরাজ ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল যুগ। তা সত্ত্বেও প্রাজ সে যুগের ইংরাজী সাহিত্যে নায়কের ছায়ান্তরাল হওয়া লক্ষ্য করেছেন। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যা-ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর জীবনে হিরোর আবির্ভাব তো আরও অকল্পনীয়।

লণ্ডনের "টাইম্‌স্‌ লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট" সাপ্তাহিক পত্রিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সমসাময়িক ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন, "One ends where one began, with regret that our novelists find it so difficult to show convincingly the details of ordinary lives. In a sense all our writers evade this, and the reality they picture is the sum of such evasions. It would be too puritanical, too much like a call for the dreariest sort of social realism, to leave it at that, but it is certainly true that the subject-matter of our best novelists in recent years, and their attitude

towards it. has been too narrowly literary." ("The Workaday World That the Novelist Never enters" in *The British Imagination* (A critical survey from the Times Literary supplement), London (Cassel and Company Ltd), 1961 P 19)। সমালোচক দুঃখ করে বলছেন যে ইংরাজী উপন্যাসগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র খুব কমই থাকে; বিশেষতঃ গল্প উপন্যাসে বর্ণিত মুখ্য চরিত্রগুলিকে যে কোন কাজ করে খেতে হয় উপন্যাস পড়লে তা মনেই হয় না। বিশেষতঃ কোন চরিত্রকেই শারীরিক পরিশ্রম করতে দেখা যায় না। ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে এই সমালোচনা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও খাটে। তার একটা কারণ কর্মজীবন সম্পর্কে মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে উদ্ভূত লেখকদের পরিচয়ের অভাব। বিমলবাবু নিজে এক সময় চাকরি করেছেন তাই চাকরিজীবন সম্পর্কে তাঁর খুবই স্পষ্ট ধারণা আছে। তাই তাঁর কয়েকটি গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের জীবন্ত চিত্র আমরা দেখতে পাই। "বাদশাহী" গল্পে তিনি সমসাময়িক সরকারী অফিসের কাজের ধরণের যে চিত্র এঁকেছেন তা কেবল সরকারী অফিসের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল লোকের পক্ষেই সম্ভব:

"একটা জরুরী কাজে সরকারী অফিসে গিয়েছিলাম। এক মাস ধরেই যাচ্ছি। সেদিনও যথানিয়মে সকাল থেকেই দাঁড়িয়ে আছি।"

"ডেসপ্যাচ সেকশনের বড়বাবু তখন সবে এসেছেন। এসে তোয়ালে পাট করে কপালের ঘাম মুছছিলেন। বললেন—শুনেছ কালীপদ, এদিকে কী কাণ্ড? কালীপদ খবরের কাগজ বিছিয়ে সবে পড়া শুরু করেছিল। বড়বাবুর গলা পেয়ে কাছে এল। বললে—কী কাণ্ড স্যার? বড়বাবু বললেন—তোমরা তো সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করলে না, তোমরা ভাবলে আমি বুঝি বাজে কথা বলছি—বলে তোয়ালেটা পাট করে ড্রয়ারের মধ্যে রাখলেন। গ্লাস-ভর্তি জলটা চুমুক দিয়ে সবটা খেয়ে নিলেন। তারপর পকেট থেকে ডিবে বের করে একটা পানও মুখে পুরলেন। তারপর ডাকলেন—ও প্রভাস—প্রভাস শোন এদিকে—প্রভাসও এল। বললে—আমাকে ডাকছিলেন স্যার—? বড়বাবু তখনও পান চিবোচ্ছেন। বললেন—নিশিকান্তকে ডাকো তো, নিশিকান্তও শুনে যাক্—নিশিকান্তও এসে দাঁড়াল। বড়বাবুর তিন জন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। কালীপদ, প্রভাস, নিশিকান্ত—তিনজনই এসে দাঁড়িয়ে রইল।

"বড়বাবু বললেন—তোমরা তো সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করলে না, তোমরা

ভাবলে আমি বুঝি বাজে কথা বলছি—কালীপদ বললে—কোন্ কথাটা স্যার? প্রভাস বললে—কোন্ কথাটা বলছেন বলুন তো স্যার? ল্যাংড়া আমের কথাটা তো? আমার শ্বশুরের বাগানে এগারোটা ল্যাংড়া আমের গাছ, আমি ল্যাংড়া আমের···বড়বাবু বললেন—দূর, ল্যাংড়া আমের কথা বলবো কেন—নিশিকান্ত বললে —সেই আপনার চিনে-বাড়ির জুতো কেনার কথা বলছেন তো? বড়বাবু জানালায় গলা বাড়িয়ে পানের পিক ফেলে বললেন—আরে না, এ একটা নতুন কাণ্ড, আজকে নিজের স্বচক্ষে দেখা—! আজকে বাজারে গিয়েছিলাম—জানো! ব'লে চাপরাশিকে ডাকলেন। বললেন—দ্বিজপদ, চা নিয়ে এস—তারপর আর একবার ভালো করে মুখ মুছে নিয়ে বললেন—বাজারে তো গেছি এই এত-বড় ইলিশ মাছ! বেশ টাটকা।···মেছুনি কী বললে জানো?······"

এভাবে বড়বাবু ও তাঁর তিন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট বাজারে ইলিশ মাছের দর সম্পর্কে আলোচনা করছেন, অথচ সামনেই যে একজন লোক কাজের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে সে বিষয়ে তাঁদের কোনই খেয়াল নেই। "সকাল থেকে আমি বসে ছিলাম। এবার সবিনয়ে বললাম—এবার আমার সেই বিল্‌টা একটু দেখবেন? এতক্ষণে বড়বাবু আমার দিকে চাইলেন। বললেন—আপনার একলার কাজ করলে তো চলবে না মশাই আমার, সকাল থেকে একটু ফুরসুত পেয়েছি, বলুন? আর একটু বসুন। বলে আবার গল্প করতে লাগলেন। বললেন—তারপরে কী কাণ্ড হলো শোন—"

"হঠাৎ বড়বাবু বললেন—দেখি আপনার রসিদটা—বিকেল তখন সাড়ে চারটে। বাড়ি যাবার সময়। রসিদটা দিলাম। বললেন—আরে, এ যে মশাই অন্য ডিপার্টমেণ্ট, আপনি ডেসপ্যাচ সেকশনে এসেছেন কেন? রেট্‌স-অফিসে যান—সেই চারতলায়—

"চারতলায়! আজ একমাস ধর্না দেওয়ার পর এই উত্তর। বড়বাবু আমার ওপর বিরক্ত হয়ে মুখ বেঁকালেন। তারপর কালীপদর মুখের দিকে চেয়ে আবার শুরু করলেন—তারপরে কী কাণ্ড হলো শোন···"

লেখক ঠিকই বলতে চেয়েছেন যে এও এক ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন বাদ্‌শাহী!

অসাধু, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা কীভাবে তাদের অফিসে কাজ করে "আর একজন মহাপুরুষ" গল্পে তার চমৎকার একটি বর্ণনা আছে। তাজপুর বড় ষ্টেশন, তার ষ্টেশন-মাষ্টার করুণাপতি মজুমদার কীভাবে কাজ করেন লেখক তার বর্ণনা করে লিখছেন, "টেবিলের সামনে টাই-স্যুট পরা করুণাপতি। বনাতের টেবিলের ওপর একটুকরো কাগজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিগ্‌রেটের টিন রয়েছে একটা, তার পাশে

জলন্ত চুরুট আধখানা। পুরোপুরি সাহেবী কায়দা-কানুন।··· চারজন মাড়োয়ারী মহাজন ওয়াগন-সাপ্লাই নিয়ে কথা বলতে ঢুকলো। করুণাপতি তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে। তারপর বললে চলো যাই—করুণাপতির সঙ্গে বাইরে এলাম। তখনও দুচারজন পেছন পেছন আসছিল। করুণাপতি বললে—আজ হবে না—কাল সকালে সব এসো—ওয়াগন এসেছে সাত-আটখানা—যেন ক্ষুণ্ণ মনে সবাই বিদায় নিলে।

নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহিনীর দৈনন্দিন জীবনের একটি বাস্তবানুগ চিত্র রয়েছে "নিমন্ত্রিত ইন্দ্রনাথ" গল্পে। "আজ রবিবার···রাত সাড়ে ন'টা হ'তে চলল।···কুমুদ বেশ আলগা করে শাড়িটা পরেছে।···ইন্দ্রনাথের একখানা মাত্র দিশি কাপড়, সেখানাকে সেলাই করতে বসেছে···একটা ঘরের মধ্যেই তিনটি প্রাণীর এই সংসার কলকাতার এক অতি-অখ্যাত গলির শেষ প্রান্তে মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলে। প্রতি-দিনকার অতি পরিচিত সূর্য বস্তির ওপাশে তেতলা বাড়িটার ছাদের ওপরে উঠে আসে। তারপর চাকা ঘুরতে থাকে। ইন্দ্রনাথের অফিস যাওয়ার আগের মুহূর্তের ব্যস্ততা, কুমুদের তাড়াতাড়ি গরম ভাতের ওপর গরম ঝোল ঢেলে দেওয়া, তারপর এক ফাঁকে এঁটো হাত ধুয়ে নিয়ে পান সেজে বোঁটার আগায় চুন লাগিয়ে দেওয়া। তারপর বাব্লুকে স্নান করানো, তাকে খাওয়ানো, নানান কাজ। বাঁধা পথের আয়েস বা অনায়াসগতি যতটুকু তার একঘেয়েমিও ঠিক ততটাই। উদয়াস্ত একটানা পরিশ্রমের ফাঁকে যখন কুমুদ একটু ভাবতে বসে, কেবল তখনই একঘেয়েমিটা ধরা পড়ে। তাছাড়া এ একরকমের অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে কুমুদের। ঠিক ভোর চারটেয় ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। যেন ঘড়ির কাঁটাও এমন নিয়ম মেনে চলে না। যখন ঝোল ভাত রান্না হয়ে গেছে কুমুদের, সেই তখন সূর্যটা ওঠে আকাশে, তখন দিন হয়, তখন পৃথিবীর লোকের কাজকর্ম শুরু হবার কথা।"

প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনার প্রতি লেখকের নিষ্ঠাপূর্ণ মনযোগ আছে বলেই তাঁর লেখাগুলো হৃদয়গ্রাহ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। বিমলবাবুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। কোন খুঁটিনাটি তার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তাঁর বর্ণনাগুণে চরিত্র-গুলো জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে দেখা দেয়। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সুধা সেন: "কাঁধ-ঢাকা ব্লাউজের বাইরে হাত দুটোর যে অংশ নজরে পড়ে, সেখানে সৌন্দর্যের আভা কি যৌবনের মাধুর্য এতটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না। গলার দু'পাশে কণ্ঠার হাড় দুটো স্পষ্ট-উচ্চারিত উদ্ধত ভঙ্গিতে আত্মঘোষণা করে। চোখের যে দৃষ্টি-থাকলে অন্তত যুবতী বলে মনের নিভৃতেও একটু চাঞ্চল্য জাগে, তাও নেই তার। সে দৃশ্যটা

আজো আমার মনে আছে। সুধা সেন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েই দাঁড়িয়েছে আমার বাঁ-পাশে। হাতে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগও আছে, পায়ে মাঝারি দামের স্যাণ্ডেলও আছে, হাতে চুড়িও আছে দু-গাছা করে। সিঁদুরের একটা টিপও দিয়েছে সুধা সেন দুটো ভুরুর মধ্যে। একটা জমকালো রঙিন শাড়িও পরেছে। অর্থাৎ সাজবার দুর্দম স্পৃহা না থাক, তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুধা সেন সেজেছে"। কাহিনীকার যখন বলছেন যে "এমন একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে চলতে সেদিন লজ্জাই হচ্ছিল মনে" তখন তা অনুধাবন করতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না।

এর সঙ্গে আপন-সৌন্দর্যে গৌরী দেবীর বর্ণনার পার্থক্য কারো দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। "হঠাৎ যেন সেন্টের গন্ধ নাকে এসে লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে আঁচলটা ওড়াতে ওড়াতে ঘরের ভেতর এসে হাজির হলেন গৌরী দেবী। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। গৌরী দেবী সামনের সোফাটায় বসলেন। বললেন—বোস তুমি—চেয়ে দেখলাম সেজেগুজেই এসেছেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁত।···আমার আর কোনও কথা বলবার রইল না। আমি চুপ করে রইলাম। গৌরী দেবীর শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে সরে পড়ে যাচ্ছিল, আর বার বার তিনি সেটাকে তুলে দিচ্ছিলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম আবহাওয়া, আর ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দু'জন, সেই কম বয়সের চোখ দিয়ে গৌরী দেবীকে যে-রকম সুন্দরী দেখেছিলাম, পরে আর কখনও কোনও মেয়েকে আমার চোখে অত সুন্দর মনে হয় নি। পায়ের আঙুলের নখগুলো রং করা, হাতের নখগুলোও রঙিন। গাল ঠোঁট শাড়ি ব্লাউজ সবই রঙিন।···" ("মহারানী" গল্প)।

"আমার মাসীমা" গল্পে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কিছু বর্ণনার মধ্য দিয়ে কিছু কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক স্বল্পবুদ্ধি বাঙ্গালী গৃহিনী, রাঙা মাসীর যে চিত্র এঁকেছেন তা থেকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের স্থিতি এবং অশান্তিজনিত দুর্বলতা উভয়েরই সন্ধান পাই। রাঙা মাসীদের মত স্ত্রীরাই সংসারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে তাঁরাই সংসারে কতবড় অশান্তির আকর তাও এই গল্প থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই স্বল্পবুদ্ধি বাঙ্গালী গৃহিনীরাই বাঙ্গালীর অধঃপতনের অন্যতম কারণ। "বড় ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত বহু লোকজন এসে খেয়ে দেয়ে গেল। হাজার লোকের খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। রাত তখন বারটা। সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে যাবার আয়োজন করছে। হঠাৎ কে যেন বললে, 'বড় বাবু তো কই খাননি।' খবর পেয়ে সবাই লজ্জিত সঙ্কুচিত।

মাসিমা খাবার ঘরের সামনে এসে অত লোকের সামনে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ গা, তোমায় অকম্মা বলি কি সাধে, খেতে ভুলে গেলে কী বলে তুমি? এইটুকু উপকার তোমায় দিয়ে হয় না, আমার কি একটা কাজ, আমি একলা মানুষ কত দিকে নজর দেব?" এই সামান্য কথা ক'টি থেকে হৃদয়হীন আত্মম্ভরিতার যে অন্তঃসারশূন্য চিত্র ফুটে ওঠে তা অবিলম্বে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

বিমলবাবুর গল্পগুলি এ গ্রন্থে মোটামুটি কালানুক্রমে সাজানো আছে। তা থেকে লেখকের মনযোগ আকর্ষণকারী বিষয়বস্তুর কালক্রমিক পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্যে পড়ে। প্রথম দিকের গল্পগুলিতে লেখক ব্যক্তি সম্পর্কেই অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। ব্যক্তি অবশ্যই সব কিছুরই কেন্দ্র। কিন্তু কোন ব্যক্তিই সমাজ বহির্ভূত নয়। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তি-মানসের অনুসন্ধানে লেখক সমাজের মধ্যে এসেছেন। ক্রমশঃই বিমলবাবুর গল্পে সামাজিক সম্পর্ক বেশি করে এসে পড়েছে। এতে লেখকের মানসিক তীক্ষ্ণতা এবং দায়িত্ববোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেই লেখকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার উৎস।

বিমলবাবুর গল্পগুলির আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, লেখক যৌন আবেদনের সাহায্য না নিয়েও কাহিনীগুলিকে এরূপ চিত্তাকর্ষকভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই বিপুলায়তন গল্পসংগ্রহের মধ্যে মাত্র একটি গল্পে যৌন আকর্ষণের উল্লেখ রয়েছে—তাও নিতান্ত পরোক্ষে ("গার্ড ডি সুজা" গল্প)। এতে যেমন লেখকের সুস্থ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি গল্পকার হিসাবে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এতে আরও প্রমাণ হয় যে বলার মত করে বলতে পারলে যে কোন কাহিনী দ্বারাই পাঠকের হৃদয় জয় করা যায়—তার জন্য সস্তা যৌন চপলতার আশ্রয় নিতে হয় না। পাশ্চাত্যে আজ যে সকল লেখক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকেরই লেখার মধ্যে যৌন আবেদনের ব্যবহারের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যেও মাঝে মাঝে কয়েকজন লেখকের মধ্যে এ ঝোঁক প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, যদিও এ দলের কেউই এখনও স্থায়ী সাহিত্যকীর্তি সৃষ্টি করতে পারেন নি। সাহিত্যে অবশ্যই যৌন আকর্ষণের স্থান আছে—যেমন আছে বাস্তব জীবনে। বাস্তব-জীবনে প্রত্যক্ষ এবং উগ্র যৌন আবেদন বা অনুভূতি কখনই কোন সুস্থ লোককে সর্বদা আচ্ছন্ন করে থাকে না—যৌন অনুভূতিতে যে-গা ভাসিয়ে দেয় সে সমাজে স্বাভাবিক বলে গৃহীত হয় না। তা ছাড়া এধরনের লোকের সংখ্যাও কম। সুতরাং যৌনবোধ কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই মুখ্য উপজীব্য হতে পারে না।

বিমলবাবু উপন্যাসে যৌন অনুভূতি এবং যৌন আবেদনের ব্যবহার করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায়ও তা মাত্রা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে যায় নি। তাঁর এই সংযম প্রশংসাযোগ্য সন্দেহ নেই।

জনৈক ইংরাজ সমালোচক বলেছেন যে আমরা তিনভাবে জীবন কাটাতে পারি। প্রথমতঃ আমরা ভাবতে পারি পৃথিবী যেভাবে চলছে চলুক, আমরা আনন্দের মধ্যে থেকে বাঁচতে পারলেই হ'ল। দ্বিতীয়তঃ আমরা সজ্ঞানে এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে যেতে পারি যে ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষই সুখী হবে। তৃতীয়তঃ আমরা ব্যক্তিগতভাবে এমনভাবে জীবনযাপন করতে পারি যাতে ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী আমরা এক স্বতন্ত্র পার্থিব সমাজের সদস্য হিসাবে বাস করতে পারি। ("Confronted with a world in which some people are rich, intelligent, or talented and others are poor, stupid or undistinguished, where some people suffer and others seem happy, and there is no clear relation between any of these things, we can adopt one of three aims. Abandoning the attempt to make sense of this situation, we shall choose to enjoy ourselves as much as possible, developing towards awareness and helping those who come into contact with us, in so far as it helps us to enjoy ourselves more deeply. We can call this trying to achieve happiness or freedom ; the name will vary, but the end will be much the same. This is the aim of atheist Existentialism. Alternatively, we may choose to work for one of two more clearly defined goals, both expressed in terms of an ideal society. The first involves working for a special sort of society which will eventually be established for the benefit of our descendants, even though we shall see none of these benefits, being dead. This, also atheist, is the Marxist attitude. Alternatively, there is the Christian aim, to train ourselves so that we can be members of a society which goes on forever in a different temporal dimension. If we were

rational in this choice our aim would depend on which of the three accounts of the world we think most reasonable." —Leon Aylen. Greek Tragedy and the Modern world, London (Methuen & Co. Ltd. 1964 p. 183)। বিমলবাবু তাঁর গল্পের মাধ্যমে বাঁচার যে বাণী প্রচার করছেন তা "এমন হয় না" গল্পের পুত্রঘাতক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর জবানবন্দীতে বলেছেন। বৃদ্ধ অন্যায় সহ্য করতে পারেন না তাই নিজের হাতে নিজের ছেলেকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত ন'ন। তিনি বাহ্যিক ন্যায়বিচারে সন্তুষ্ট ন'ন—প্রকৃত ন্যায়বিচার চান: "আমার বংশের সে একমাত্র ছেলে হলেও আজ তাকে খুন করে আমি এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলছি না তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। কারণ সে আমার বংশের কলঙ্ক। সে হাড়ের ব্যবসা করতো······আর সে শুধু একলা নয়, তার সঙ্গে আরো অনেকে আছে। তাদের নামধাম বলতে পারলে আমি খুশি হতুম।······সে মানুষের হাড় বেচতো······জীবন ধরা পড়লো। তখন মনে ভারি আনন্দ হ'লো এই ভেবে যে, ভগবান যাকে শাস্তি দেন নি, মানুষের আদালতে হয়তো সে উচিত শাস্তি পাবে। কিন্তু দেখলাম, মানুষের আদালতে ধর্মের বিচার হয় না। আর হবেই বা কী করে? দেশের মানুষও তো আজ অমানুষ হয়ে গেছে। তাই সেদিন যখন ধর্মাবতারের রায় বেরোল, যখন সে হাসিমুখে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন আমি আর থাকতে পারলাম না ধর্মাবতার। কোর্টের উঠোনের ডাবওয়ালাটার কাছ থেকে কাটারিটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে খুন করলুম।······" স্পষ্টতঃই লেখক নিশ্চেষ্ট হয়ে অন্যায় সহ্য করা পছন্দ করেন না।

গল্পের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার ন্যায় বিমলবাবুর গল্প বলার ধরণও বিভিন্ন। কোন ক্ষেত্রে তিনি সোজাসুজি গল্পটি বলে গিয়েছেন; অন্য ক্ষেত্রে তিনি ফ্ল্যাশ-ব্যাক্-টেকনিকের সাহায্য নিয়েছেন। অনেক গল্পেই লেখক আত্মজীবনীমূলক টেকনিকের মাধ্যমে কাহিনীটি বলে গিয়েছেন। আবার অনেক গল্পে গল্পেরই অন্যতম অন্য কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে গল্পটি বলিয়েছেন। "বাদশাহী" গল্পে তিনি fantasyরও আশ্রয় নিয়েছেন। লেখকের রচনারীতি বা বলার ঢং যেরকমই হোক না কেন তার প্রয়োগের সার্থকতার প্রমাণ গল্প জমেছে কিনা সেই মাপকাঠিতে। মঁপাসা'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আর একজন বিশ্ববিখ্যাত গল্পকার সমারসেট মম বলছেন যে মঁপাসার গল্পে যে ত্রুটি ছিল না তা নয়, তবে গল্প পড়ার সময় খুব কম পাঠকেরই ঐ সব বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি দেবার সময় হ'ত। কারণ মঁপাসার বর্ণনাভঙ্গী এমনই

চিন্তাকর্ষক যে পাঠকের গল্পের ঘটনা ছাড়া অন্যদিকে মন দেওয়া সম্ভবই হ'ত না। ["It is a tribute to Maupassants' skill that few readers remain so self-possessed that these objections occur to them. A great author is willing to sacrifice plausibility to effect, and the test is whether he can get away with it ; if he has so shaped the incidents he describes and the persons concerned in them that you are conscious of the violence he has put on them, he has failed."—[W. Somerset Maugham : Points of View, London (William Heinemann Ltd.), 1960 P 153] বিমলবাবুর গল্পবলার ধরণ সার্থক কিনা তা পাঠকরা নিজেরাই বিচার করতে পারবেন। বর্তমান লেখকের মত যে পাঠক আটশত পৃষ্ঠার বইটি শেষ করেছেন তাঁর কাছে বিমলবাবুর গল্প বলার কৃতিত্ব সম্পর্কে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

সুভাষচন্দ্র সরকার

নীলনেশা

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরও রায়সাহেব। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। শ্বশুর-জামাই দুজনেই রায়সাহেব, এমন যোগাযোগ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু শ্বশুর-জামাই দুজনের বহু দুর্ভাগ্যের ফলেই বুঝি এমন ঘটেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল পাটনায়।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সামান্য একজন সুপার-ভাইজার থেকে পদোন্নতি পেয়ে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। শহরে এবং অফিসে বেশ প্রতিপত্তি তাঁর। সামনের সব ক'টা উন্নতির ধাপ চোখের সামনে জলজ্বল করছে। একটিমাত্র ছেলে, রূপসী স্ত্রী আর একটি সুন্দর অট্টালিকার মালিক। ব্যাঙ্কের টাকায়, স্বাস্থ্যের জৌলুসে প্রতিপত্তির প্রসারে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গী-ই বলতে হবে।

সেই সময়ে সেই চৌদ্দবছর আগে চাকরি খুইয়ে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি মেয়ের কাছে এলেন। সঙ্গে আরো তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে। জ্যোটি, লোটি আর রুবি। জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে মিলির বাড়িতে এলেন। মিলি বড় মেয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় স্টেশনে গিয়েছিলেন মিলিকে নিয়ে। শ্বশুরকে চিনতেন। রাশভারী, শৌখিন, সাহেবী মেজাজের লোক। সস্ত্রীক রিসিভ্ করতে না গেলে কী ভাববেন তিনি।

শীতকাল সেটা। তাঁর পেটেণ্ট স্যুট্, সাহেব-বাড়ির অভিজ্ঞ টেলারের তৈরি। হাতে ষ্টিক্। বাট্‌ন্-হোলে বোকে। মাথায় ফেল্ট-হ্যাট্—বাঁকানো। মুখে লম্বা চুরুট।

চায়ের টেবিলে মিলি বললে—তুমি তা হলে চাকরি ছেড়ে দিলে বাবা?

সেই সময়ে চৌদ্দ বছর আগে চাকরি ছেড়ে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। বিশেষ করে জ্যোটি, লোটি, রুবির তখনও বিয়ে দিতে হবে। সারাজীবন মোটা মাইনে পেয়েছেন, আর দুহাতে খরচ করেছেন। না করেছেন একটা বাড়ি, না জমিয়েছেন টাকা। কেবল লাঞ্চ, পার্টি আর স্যুট্।

মিলির কথার উত্তরে বললেন—চাকরি আর করবো না রে, মিলি—

হলুম—কিন্তু এখন রায়সাহেবিটাও ছ্যা ছ্যা হয়ে পড়েছে—রামা-শ্যামা, ডিক্-হ্যারি সবাই পাচ্ছে—কোনও ইজ্জত রইল না আর আমাদের—

তার পরেই প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন তো ভালোই, না হলে নিজের রায়সাহেব হওয়ার ইতিহাসটা নিজেকেই বলতে হয়—

—'হোয়াইটম্যানে' আমার লীডার পড়েই তো প্রথম মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ চম্‌কে যায়, খাস বিলিতী বাচ্ছা কিনা, গুণের কদর করতে জানে—তার পর যখন শুনলে লিখেছে একজন বাঙালী, আরো অবাক্, একদিন নেমন্তন্ন করলে ডিনারে। বললে—বাঙালীর মধ্যেও যে জিনিয়াস্ জন্মায় এটা তোমাকে দেখবার আগে কল্পনাও করতে পারি নি মিস্টার ব্যানার্জি—ওয়েল্, তখন আমি শুধু মিস্টার-ই ছিলাম কিনা—

তার পরেও যদি প্রশ্নকর্তা আগ্রহ না দেখান, তখন নিজেকেই বলতে হয়—

—আশ্চর্য হয়ে গেলেন মেজর যখন শুনলেন আমি একটা রায়সাহেবিও পাই নি। বললেন—ওয়েল্, এটা আমারই কর্তব্য, দেখি আমি কী করতে পারি—

প্রশ্নকর্তা যদি তখন প্রশ্ন করেন—তার পর···?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। চুরুটটাকে দাঁতে চেপে সেইখানে বসেই বহুদিন আগে শেখা মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থের স্বরের অনুকরণ করে চীৎকার করবেন—মহারাজ—চা—

আগে হাতে করে চায়ের কাপ দেওয়া হতো। রায়সাহেব আসার পর ট্রের বন্দোবস্ত হয়েছে। বিকেলবেলা একটা পর্ব আছে রায়সাহেবের। সামান্য পর্ব নয়। ঝাড়া ঘণ্টাখানেক লাগে। তখন বেরোয় আলমারী থেকে নিভাঁজ স্যুট্‌গুলো। একটা একটা করে মিলি কিংবা জ্যোটি, লোটি, রুবি যে-কেউ নামিয়ে দেয়। যেটা কাল পরেছেন আজ সেটা পরতে নেই। সবগুলো বিছানার ওপর পর-পর বিছিয়ে দিতে হবে। রায় সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একটা সেট্ বেছে নেবেন তারি মধ্যে থেকে। কোনো দিন ওয়ালনাটের স্টিক, কোনো দিন অ্যাশ কাঠের। স্যুটের সঙ্গে যেন ম্যাচ করে। মাথায় লাইট নেভি-ব্লু ফেল্ট-হ্যাট্। আর ঝকঝকে চকচকে দাঁতে কামড়ানো চুরুট। পায়ে পেটেণ্ট লেদার শু। হাতের পাঁচটা আঙুলের মতন ওই চুরুটটা ছিল তাঁর শরীরের সঙ্গে একাত্ম। বাথরুমে যাবার সময়ও মুখে থাকতো চুরুট। মিলির মনে পড়ে না বাবাকে কখনও সে চুরুট ছাড়া দেখেছে। কোথাকার কোন্ লর্ড স্যলস্‌বারি নাকি মারা যাবার পর হিসেব করে দেখা হয়েছিল, জীবনে যত চুরুট তিনি খেয়েছেন তা জোড়া দিলে ছ মাইল লম্বা হয়। তা ছাড়া চুরুট খেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে! সেই লর্ড স্যলস্‌বারি বলেছিলেন—ইতিহাসে কোনও চুরুটখোরের আত্মহত্যার রেকর্ড নেই—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বলতেন—চুরুট খেতে শেখান আমাকে মিঃ অকিনলেক—এদিকে তো পণ্ডিত লোক, ইংরিজীর মাস্টার—ইংরিজী ভাষাটা গুলে খেয়েছিলেন—ওদিকে চুরুট খান আমার মতো—তাঁর কাছেই তো এই ইংরিজী বিদ্যেটা আর চুরুট খাওয়ার হাতেখড়ি আমার—

স্যুট পরে ছড়িটি ফেলতে ফেলতে যারা পাটনার রাস্তায় রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জিকে হাঁটতে দেখেছে তারা জানে সেই মন্থর অথচ দ্রুত চালের মুভমেণ্ট। প্রতি পদে সেই ইলাস্টিক স্টেপ্। দেখেই মনে হবে যেন বিরাট গাড়ি, বিরাট বাড়ি সবই আছে—সমাজে সংসারে যেন সুউচ্চ প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত। শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে একটু পদচারণা করতে বেরিয়েছেন।

একমাস পরেই হতাশার সুর বেজে উঠলো।

—নারে মিলি, যা দেখলুম তোরা পাটনায় কী সুখেই আছিস—এতদিনের মধ্যে একটা ভদ্দরলোক নজরে পড়লো না—

পেস্ট্রির ডিশ্টা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে মিলি বললে—কেন বাবা—ওই তো ইঁয়েরা রয়েছেন, হরসিংপুরের জমিদার জনক বাবুরা রয়েছেন, সব ভাই ক'টা বি-এ পাস, তার পর মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ বিলেত ফেরত—তার পর নিউ-পাটনায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট বাবুল মিত্তির এম-এ, চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট, রণধীর চৌহান···

—আরে ছি ছি—ওদের তুই বলিস ভদ্দরলোক ?

চায়ের কাপটা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে একটা 'শ্রাগ্' করলেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি।

—কেউ ইংরিজীর 'ই' জানে না, 'হোয়াইটম্যান' পড়ে না—আবার পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করতে আসে, ইংরিজী জানা লোক গোটা ভারতবর্ষেই তো আছে মাত্র আড়াইটে, একটা তোদের গান্ধী, একটা টেগোর আর আধখানা···

আধখানা যে কে তা আর বলা হলো না! হঠাৎ যেন স্বগতোক্তির সুরেই রায়সাহেব বললেন—ইংরিজীটা কি অত সহজ রে······তা যদি হতো···এই ছাখ্না আজকের হোয়াইটম্যানেই তো চারটে ইংরিজীর ভুল ধরেছি···

ইংরিজী ভাষাটাই জানতেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। তিনি নিজেই একদিন বলেছেন—কেমন করে শিখলেন বিদ্যেটা। ওটা বড় অদ্ভুত ভাষা নাকি। ভাবতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে হয়, স্বপ্ন দেখতে হয়—অনেকের আবার তাতেও হয় না। ওটা অনেকটা কবি হওয়ার মতো। সবাই কি চেষ্টা করলেই কবি হতে পারে?

তেমনি সবাই চেষ্টা করলেও ইংরিজী শিখতে পারে না। ওটা একটা ভগবান-দত্ত ক্ষমতা। না হলে তো রামা-শ্যামা টম-ডিক্-হ্যারি সবাই শিখে ফেলে বসে থাকতো। ইংরিজীটা কি অত সহজ রে!

কথাগুলো অনেকটা ধমকের মতো। না জেনে মিলি তার বাবাকে অন্য সকলের সঙ্গে সমান পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বড় শিশুর মতো সরল মন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। কিছু মনে রাখেন না। বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পরের দিন মিলি নিজে বাজারে গিয়ে বাবার পছন্দ-করা চুরুট আর এক বাক্স আনিয়ে দিলে।

কিন্তু হোয়াইটম্যানের কুড়ি বছরের চাকরিটা যাওয়ার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে।

যাঁর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্নই হলো ইংরিজী, ইংরিজীর ভুল তিনি সইবেন কেমন করে! ভুল দেখলে সইতে পারতেন না, তা সে স্বয়ং এডিটরেরই হোক, আর নিজেরই হোক। একবার নিজেরই একটা ভুল ধরা পড়লো। উঃ, সে কী আত্মগ্লানি! ছাপার অক্ষরেও বেরিয়ে গেল সেটা। সাধারণ পাঠকরা কেউই ধরতে পারলে না বটে, এডিটরও পারে নি। কিন্তু যে-টা ভুল সেটা তো ভুল-ই। কেউ ধরতে পারুক আর না পারুক। নিজেকে তিনি ক্ষমা করবেন কী করে? নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি?

গল্প হচ্ছিল ডিনার খেতে খেতে।

জ্যোটি, লোটি, রুবি আর মিলি। আর ওদিকে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন—তার পর?

মিলিও চচ্চড়ির ডাঁটা চিবোনো থামিয়ে বললে—তার পর কী করলে, বাবা?

সুপের চামচেটা মুখ থেকে নামিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে দুটো ঠোঁট মুছে নিলেন। তার পর আধখাওয়া চুরুটটা মুখে দিয়ে আবার ধোঁয়া ছাড়লেন লম্বা করে। বললেন —ঠিক করলাম আত্মহত্যা করবো, আত্মহত্যাই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! বোঝো, আমরা সে-যুগে কতখানি জীবন দিয়ে ভালোবাসতুম ইংরিজী ভাষাকে—যাক্‌গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা হলো না—

চম্‌কে উঠেছে মিলি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নিজের মনেই নিঃশব্দে খেতে লাগলেন।

ছোট মেয়ে রুবি আর চাপতে পারলে না কৌতূহল। বললে—কেন বাবা? ধরা পড়ে গেলে বুঝি?

চুরুটটা টানতে-টানতে থেমে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—এই চুরুট-ই আমার

বাঁচিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত, লর্ড স্থলস্‌বারির কথাটা মনে পড়লো—কোনও চুরুটখোর আত্মহত্যা করেছে ইতিহাসে এমন ঘটনা তো পাওয়া যায় না—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি এক স্লাইস রুটি ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন।

—তার পর এল ডানকান সাহেব। স্কচের বাচ্ছা। জঁাদরেল লোক। কিন্তু ইংরিজী ভুল। ধরলাম একদিন। অতি সাধারণ ভুল। সাহেবের হাতে অমন ভুল বড় একটা দেখা যায় না। তর্ক হলো। এডিটর বলে ঠিক—অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট বলে ভুল।···

রায়সাহেব রুটি কামড়ালেন। তার পর বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে মাংস তুলে মুখে পুরলেন—

—দিলাম চাকরি ছেড়ে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখনও রায়সাহেব হন নি। বললেন—এই সামান্য কারণে চাকরি ছেড়ে দিলেন আপনি!

—একে তুমি সামান্য বলছ, মৃত্যুঞ্জয়?

যেটা সত্যি কথা সেটা ডানকান সাহেব জানুক। আর কারুর জানবার দরকার নেই। সেই সামান্য কারণে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সাত শো টাকার চাকরি ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে এখানে চলে এলেন। মিলির বাড়িতে। নাই বা থাকলো টাকা, সাত শো টাকা মাইনের চাকরি। মিলি আছে, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—পাটনা সেক্রেটারিয়েটের স্থপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আছে। জ্যোটি, লোটি, রুবির বিয়ে মিলি-ই দেবে। তাঁর ডিনার, কেক, পেস্ট্রি, চুরুট, চা, স্যুটের খরচ মিলিই দেবে।

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

সেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বাসী মুখে বেড্-টি খাওয়া। তার পর ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে চুরুট ধরানো। 'হোয়াট্‌নট' থেকে হোয়াইটম্যান নিয়ে পড়া। পায়জামা-পরা পা দুটো হোয়াট্‌নট-এর গায়ে লাগিয়ে দেওয়া আর কাগজ পড়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পড়া। হাতের ফাউন্‌টেন পেন দিয়ে মার্জিনে দাগ দেওয়া। কোথাও ছাপার ভুল থাকলে তা দাগিয়ে দেওয়া। এই কাজেই লাগে দু'ঘণ্টা। এ-সময়ে রায়সাহেবকে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। এই দু'ঘণ্টা তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরের সমুদ্রে ডুবে যান।

তার পর পড়া, ভাবা, দাগ দেওয়া যখন শেষ হয় তখন লেটারপ্যাড নিয়ে লেখবার

টেবিলে গিয়ে বসেন। চিঠি লিখতে বসেন। লম্বা শুদ্ধ ইংরিজী চিঠি। হোয়াইট-ম্যানের সম্পাদকের নামে। কুড়ি বছর হোয়াইটম্যানের চাকরি করে এসেছেন, লেখার প্রুফ দেখেছেন। এ-কাজে তিনি অভ্যস্ত। সিদ্ধহস্ত বলা চলে। সেই অভিজ্ঞ কলম নিয়ে লিখে চলেন। চিঠির আকারে জানিয়ে দেন সম্পাদককে কোথায় সেদিনকার কাগজের সম্পাদকীয়তে ছাপার ভুল, নয়তো ইংরিজীর ত্রুটি। বিস্তারিত সমস্ত আলোচনা। মতবাদ নিয়ে, কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিয়ে, বিজ্ঞাপন নিয়ে, কাগজের প্রচার নিয়ে। কাগজের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো ডাক-খরচা দিয়ে দিয়ে চৌদ্দ বছর ধরে দিনের পর দিন এমনি সামালোচনা মৌখিক নয়, লিখিত। এ যেমন বিস্ময়কর তেমনি কৌতুকজনক।

তার পর সেই চিঠি ডাকে দিয়ে আসা। যে-সে গেলে চলবে না। মহারাজকে নিজের রান্না ফেলে চিঠি ফেলে আসতে হবে। একমাত্র বিশ্বাসী লোক সে-ই। চীৎকার করে ডাকবেন—মহারাজ—

রায়সাহেবের মেজাজী গলার আওয়াজে সমস্ত বাড়ির ঘরগুলো গমগম করে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন অফিসে যাবেন। ঠাকুর চাকর সবাই ব্যস্ত। মিলিও ব্যস্ত স্বামীর তদারকে। হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে হবে জামা, কাপড়, গেঞ্জি, রুমাল, চাবি—সমস্ত। সেই ব্যস্ত আবহাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ডাকলেন—মহারাজ—

মিলি বললে—মহারাজ নেই—

—কোথায় যায় অফিসে যাবার সময় ?

মিলি বলে—বাবা পাঠিয়েছেন ডাকের চিঠি ফেলতে—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি নিজে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মহারাজের কোনও দোষ নেই। কিন্তু এখন তিনি অফিসে যাচ্ছেন, তিনি এ-বাড়ির মনিব, তিনি অফিসে চলে যাবার পরই চিঠি ফেলতে পাঠালে হতো। কিছু বললেন না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু যেন কেমন বিরক্ত হলেন, অন্তত স্বামীর মুখ দেখে মিলির তাই মনে হলো।

আর একদিনের ঘটনা। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ড্রেসিং গাউন পরে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন চুরুট মুখে। যেমন সচরাচর করে থাকেন।

একটা চাকর এধার থেকে ওধারে যাচ্ছিল ঘর ঝাঁট দিতে। ডাকলেন তাকে।

—এই, শোন্—

চাকরটা সামনে এল বেকুবের মতো।

বললেন—গায়ে জামা দিস না কেন ?

মিলিকে ডেকে আনলেন। বললেন—তোদের এ কী সিস্টেম ? চাকর-বাকর উর্দি না পরুক, খালি গায়ে থাকে কেন ? একটা গেঞ্জি জোটে না—

সেই সময়ে একদিন পয়লা জানুয়ারি তারিখে খবর বেরুল মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রায়সাহেব হয়েছেন। শ্বশুর রায়সাহেবই ছিলেন, এবার জামাইও রায়সাহেব হলেন। বাড়ির গেট্-এ আর একটা ট্যাবলেট ঝোলাবার কথা। কিন্তু কেন জানি না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রাজী হলেন না।

সেদিন সকালেও রায়সাহেব জে.ডি. ব্যানার্জি কাগজের উপাধির তালিকাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লেন। দেখলেন কার কার প্রমোশন হলো। নতুন কে কে জাতে উঠলো। খাবার টেবিলে বসে বললেন—এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়··· আমার সময় মনে আছে, টেলিগ্রাম এসেছিল দেড় শো, আর চিঠি বোধ হয় শ তিনেক··· কয়েকটা কাগজে ফোটোও বেরিয়েছিল—চাকরিটা রেগে ছেড়ে না দিলে রায়বাহাদুরও হয়ে যেতাম···কিন্তু তোমার বেলায় এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়··· আজকালকার লোক গুণের কদর করতে কি ভুলে যাচ্ছে···

মিলিকে বললেন—তোকে বলেছিলুম মিলি তোদের এখেনে একটা ভদ্দরলোক নেই—দেখলি তো, মৃত্যুঞ্জয়কে একটা পার্টি পর্যন্ত কেউ দিলে না···আমার মনে আছে মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ···

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

তার পর চৌদ্দ বছরের প্রাত্যহিকতায় দৃশ্যপটের কতই না পরিবর্তন হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বরাবর কম কথার মানুষ ছিলেন, কথা কওয়া আরো কমিয়ে দিয়েছেন।

শ্বশুর জামাইবাড়িতে বেড়াতে এসেই থাকে, কিন্তু এমন বরাবরের মতো বে-আক্কেলে হয়ে যে থেকে যাবেন এ-কথা কে জানাতো।

একে একে জ্যোটি, লোটি এবং শেষ পর্যন্ত রুবির বিয়েটাও দিলেন জামাই। প্রত্যেক বিয়েতেই মোটা রকমের খরচ করতে হলো। নইলে পাটনার সমাজে মান থাকে না। সকলেরই বিয়ে দিলেন জাঁকজমক করে। আর তা ছাড়া টাকা খরচের প্রশ্নটাই তো বড় নয়, মেহনত কী কম !

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কিছু দেনা করতে হলো। মিলির গায়ের গয়না কিছু ভাঙতে হলো। টাউনের বাইরে কিছু খোলা জমি কেনা ছিল মিলির

নামে, সেটা সস্তা দরে ছেড়ে দিতে হলো। উপ্‌রি উপ্‌রি তিনটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। তবু রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় সেই অসাধ্যই সাধন করলেন। একটিমাত্র ছেলে ছোটবেলা থেকে দেরাদুনে থেকে পড়তো। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পর কলেজে পড়ছে সেখানে, সুতরাং খরচ পাঠানোও বেড়েছে।

এত কাণ্ড ঘটছে, এত দৃশ্যপট বদলাচ্ছে, কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি তাঁর সেই উঁচু চূড়ো থেকে একচুল নড়েন নি। সংসারের দৈনন্দিন সচ্ছলতা-অসচ্ছলতার কথা যেন তাঁর জানবার কথা নয়। তিনি যে একজন ব্যয়বহুল গলগ্রহ সে-কথা ভাববার বা বোঝবার তাঁর অবসরই নেই। জামাইকে মেয়ে দিয়েছেন বলে শ্বশুরকে ভরণ-পোষণ করাও যেন জামাইয়েরই অন্যতম কর্তব্য। আর তা ছাড়া তিনি তো এ-সংসারের একজন গর্বের ও গৌরবের পাত্র। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি তিনি, চালচলনে বলনে নামধাম-পরিচয়ে যে-কোনও জামাই-ই গৌরবান্বিত বোধ করবে। নিয়ে আসুক না মৃত্যুঞ্জয় দশটা নাইট, বিশটা রায়বাহাদুরকে এ-বাড়িতে, দেখাই যাক না তারা মোহিত বিগলিত হয় কিনা রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির আদব-কায়দায়, কেতা-দুরস্ত ব্যবহারে, ঈর্ষান্বিত হয় কিনা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর-সৌভাগ্যে! বিলেতে তিনি যান নি সত্যি, কিন্তু অন্তত দু শো লোক তো তাঁর কাছে বিলেত যাবার আগে আদব-কায়দা শিখে নিতে এসেছে। কাঁটা-চামচ থেকে শুরু করে ডিনার, ড্রয়িংরুম, বাথ, বো, স্যুট্—হাই সোসাইটির সমস্ত রকম খুঁটিনাটি।

তা সেদিন চা মুখে দিয়েই কাপ নামিয়ে নিলেন রায়সাহেব।

—মিলি, ছি ছি, তোদের টেস্ট দিন-কে-দিন কী যে হচ্ছে—

মিলি কিছু উত্তর করলে না। মিলি ভালো করেই জানে এ-চা বাবা মুখে তুলবেন না, তবু চুপ করে রইলো সে। একটু কম দাম। একটু ফ্লেভার কম। কিন্তু সব দিক ভেবেই তো চলা উচিত। উনি বলেছেন—এত দামী চা কি না-হলেই চলে না? তোমার বাবাকে তো পয়সা আয় করতে হয় না, যাকে করতে হয় সে বোঝে।

কথাগুলো তো একেবারে মিথ্যেও নয়। মিলি দেখলে বাবা চা ছুঁলেন না। বললেন—এ নিশ্চয়ই মহারাজের ভুল হয়েছে রে, কিংবা ওকে ঠকিয়ে দিয়েছে—তুই একটা স্লিপ লিখে পাঠা এখুনি—পাঠা তুই…প্রমাণ হয়ে যাক—পয়সা দিয়ে কেন খারাপ জিনিস খাবো—বল্?

বাবাকে চিনতো মিলি।

শেষ পর্যন্ত লিখতে হলো স্লিপ। স্লিপ লিখে মহারাজের হাতে দিতে যাচ্ছিল—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—আর ওই সঙ্গে আমার সেই চুরুটের কথাটা লিখে দে না, এ মাসে হঠাৎ ওই খারাপ চুরুটটা যে কেন আনালি—জানিস তো আমি চল্লিশ বছর ধরে ওই এক ব্র্যাণ্ড খেয়ে আসছি···

শেষ পর্যন্ত মহারাজকে দিয়ে ভালো চা আর চুরুটের ফরমাশ দিতেই হলো। কিন্তু বার বার কাল রাত্রের কথা মনে পড়তে লাগলো মিলির। স্বামী শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়েই বলেছিলেন—তোমার বাবা বিড়ি খেতে পারেন না—যাঁর একপয়সার মুরোদ নেই—তাঁর আবার অত শখ কেন শুনি···?

রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে মিলিকে অনেক সহ্য করতে হয় বাবার জন্যে। আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কী যে হয়েছে—বাড়িতে তিনি থাকেন কম। অফিসের আগে আর অফিসের পরে যতক্ষণ তাঁর বাড়িতে থাকবার কথা, সে-সময়টা কাটে তাঁর বাগানে। রাত্রে হ্যারিকেন আর টর্চ নিয়ে চলে তাঁর গাছের তদবির তদারক। কোনও বন্ধু এলে দেখা করেন বাগানে। মিলি সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর ওদিকে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি? যখন রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিসে বেরিয়ে যান, তখন নেমে আসেন তিনি ওপর থেকে।

চীৎকার শোনা যায় দূর থেকে—মহারাজ—

অর্থাৎ আর একবার তাঁর চা চাই।

সেই তখন থেকে যতক্ষণ না রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিস থেকে আসেন, ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর চা চাই। আর সেই দামী চা। সংসার ভেসে যাক, কারু পেট ভরুক আর না-ভরুক, রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির চুরুট, চা চাই। তা ছাড়া সকালবেলা চাই তাঁর নিজস্ব একখানা 'হোয়াইটম্যান', লেখবার প্যাড, কলম, কালি আর স্ট্যাম্প। চাই নিজস্ব ব্র্যাণ্ড টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, স্নো, পাউডার আর মাসকাবারী হাত খরচ কুড়িটি টাকা।

প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মিলি দু'খানা দশ টাকার নোট বাবার হাতে গিয়ে দিয়ে আসে।

মিলির সেদিন নজরে পড়ে। বিকেল থেকে বাবার সেদিন শুরু হয় উদ্যোগ-আয়োজন। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি আবার যেন তাঁর পুরনো ফেলে-আসা দিনগুলো ফিরে পান। আলমারি থেকে বেরোয় সেই সব চৌদ্দ-বছরের পুরনো স্যুট। কোনোটা আর শরীরের সঙ্গে এখন ফিট্ করে না। জুতোয় গোড়ালি থেকে

প্যান্টটা দু'ইঞ্চি ওপরে উঠে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় পোকায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে। অ্যাশ কাঠের সৌখিন ছড়িটা বেরোয়। বেরোয় ফেল্ট-হ্যাট্‌। মাথায় ঈষৎ বেঁকিয়ে বসিয়ে দেন। হাফসোল দিয়ে দিয়ে পেটেণ্ট লেদারের শু-জোড়ার সে গৌরব আজ অস্তমিত। তবু মাস্টার-টেলারের তৈরি সেই পোশাকে হঠাৎ রায়সাহেবের দেহটা কেমন ঋজু হয়ে ওঠে। যেমন হতো চৌদ্দ বছর আগে সাহেবী হোটেলে ডিনার খেতে যাবার সময়। চুরুটটা দাঁতে কামড়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েন তখন আর ধরতে পারার কথা নয়। খাঁটি বনেদী চাল। হোন নিঃস্ব, জামাইয়ের গলগ্রহ—একদিন আধদিন নয়, চৌদ্দ বছর ধরে—তবু চালচলন দেখে বোঝা যায় ইজ্জতদার মানুষ, খানদানী আদব-কায়দার মানুষ। সম্ভ্রমে মাথা নীচু হয়ে আসতে বাধ্য।

তার পর যেমন ভঙ্গীতে সে-যুগে হোটেলে গিয়ে ঢুকতেন, তেমনি ভাবে গিয়ে ঢোকেন পাটনার বড় একটা হোটেলে। কলকাতার হোটেলের কাছে এ হয়তো কিছু নয়। কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ভুলে যেতে চেষ্টা করেন যে, এটা পাটনার হোটেল। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে পাম্ গ্রোভ্—জাজ্ ওয়াল্জ্ আর স্যুট্-পরা স্ত্রী-পুরুষের ভিড়।

একটা চেয়ারে গিয়ে মধ্যেখানে বসেন—সকলের দৃষ্টির সামনে। তার পর যারা সেই অবস্থায় সেখানে ডিনার খেতে দেখেছে তাঁকে, তারা জানে পাকা বনেদিয়ানা কাকে বলে। তাঁর সেই ন্যাপকিন নেওয়া থেকে শুরু করে নিখুঁত সব মুভমেণ্ট লক্ষ্য করবার মতো। অন্তত পাটনার ওই হোটেলে এর আগে আর কাউকে অমন ভাবে দেখা যায় নি ডিনার খেতে।

কিন্তু মাত্র তো কুড়িটি টাকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহটাই শুধু চলে—আর বাকী সমস্তটা মাস আবার বসে থাকতে হয় পরের মাসের পয়লা তারিখটির দিকে চেয়ে। কারণ খাওয়াই কি শুধু? বকশিশ দিতেও যে মোটা বেরিয়ে যায়, আর ওটা না দিলে তো খাতিরও থাকে না।

একবার মেয়েকে বলেছিলেন—মিলি, আমার স্যুট্‌গুলো সব তো গেছে, আর অন্তত হাফ ডজন না করালে তো আর চলছে না—তোর কী ভুলো মন, তিনমাস থেকে তো কেবল করাবি বলছিস—

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সেটা ইন্সিওরেন্স-এর প্রিমিয়াম দেবার মাস। সে মাসে হয় না। সুতরাং মিলি চুপ করে থাকে। পরের মাসে ছেলের পরীক্ষার ফিস্ দিতে হলো অনেক টাকা। তার পরের মাসে মিলির বিয়ের মাস, জামাই একটা

নেকলেস কিনে দিলে স্ত্রীকে, তার পরের মাসেও একটা-না-একটা কী খরচ হয়ে গেল। সুতরাং রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির সামান্য হাফ-ডজন স্যুট, তা-ও হয়ে উঠলো না বহুদিন।

ড্রেসিং গাউনটা ছিঁড়ে যেতে বসেছে। ওই একখানাই এখন সম্বল। কোন্‌দিন পিঠের দিকটায় টান পড়লেই ফ্যাস্‌ করে যাবে। তবু সকালবেলা ওইটে পরেই হোয়াট্‌নট-এর ওপর থেকে হোয়াইটম্যান-খানা নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাগজ পড়তে থাকেন। সেটা ছোট-চা।

তার পর বড়-চা হবে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। আগে কিছু পেস্ট্রি বা বিস্কুট বা টোস্ট থাকতো সঙ্গে। আজকাল আবার পরোটায় নেমেছে। তবু সেই পরোটাই ছুরি কাঁটা দিয়ে চিবোতে চিবোতে চা খাওয়া।

আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এই বড়-চা'তে থাকেন না। তিনি তখন থাকেন বাগানে। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একাই গল্প করে যান তখন।

—জানিস মিলি, এবারকার শীতে লণ্ডনের মে-ফেয়ার-এ চৌদ্দ ইঞ্চি বরফ পড়েছিল···

মিলি একমাত্র নীরব শ্রোতা। শুধু বললে—তাই নাকি বাবা?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—এতেই তুই অবাক্‌ হচ্ছিস, কিন্তু যেবার বার্লিনে কলের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, নাইনটিন টোয়েনটিতে—তিনশো তেতাল্লিশ জন লোকের নাক যে একেবারে খসে গিয়েছিল—

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লণ্ডন, বার্লিন আর নিউইয়র্কের গল্প করে চলেন। তার পর এক সময় দেখেন মিলি কখন অজান্তে উঠে চলে গেছে, তখন আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যান। ওপরে উঠে গিয়ে লেখবার টেবিলে চিঠি নিয়ে বসেন। চিঠির তাড়া। ম্যানচেস্টার থেকে মিস্টার ক্রফোর্ড চিঠির জবাব দিয়েছেন। ফ্লীট স্ট্রীট থেকে জবাব এসেছে কোনো এক কাগজের মালিক লর্ড ফেয়ারওয়েদারের। চিঠির জবার পড়া এবং জবাবের জবাব লেখার মধ্যে হঠাৎ দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে গেল।

চীৎকার করে ডাকেন—মহারাজ—

মহারাজ এল না। সাড়াও দিল না। কী হলো সব! কিছু বুঝতে পারলেন না রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। অথচ চুরুট নিভে গেছে।

আবার ডাকেন—মহারাজ—

এবার মহারাজ এল। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—একটা দেশলাই আনো তো মহারাজ—দেশলাই একটা—

কিন্তু সোজা হুকুম তামিল না করে মহারাজ বললে—জামাইবাবু এখন অফিসে যাচ্ছেন। তিনি অফিসে বেরিয়ে গেলে দেশলাই কিনে আনবো—

সাহেবী মেজাজ হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চুরুটখোরেরা সহজে রাগে না বলেই তিনি কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

কিন্তু খাবার টেবিলে রিপোর্ট না করে পারলেন না। বললেন—আদর দিয়ে দিয়ে তুই চাকরদের একেবারে মাথায় তুলে ছেড়েছিস মিলি, কী বুদ্ধি ত্মাখ্—আমার চুরুটটা তখন নিভে গেছে, আমার দেশলাইয়ের চেয়ে জামাইবাবুর অফিসে যাওয়াটাই বড় হলো—

এখন, ঠিক এই সময়ে, এক পয়লা জানুয়ারির সকালবেলায় কাগজ পড়তে পড়তে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি থমকে গেলেন। রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রমোশন পেয়ে রায়বাহাদুর হয়েছেন।

সেই অবস্থাতেই নেমে এলেন। সেই ড্রেসিং গাউন, বাঁ হাতে চায়ের কাপ, আঙুলের ফাঁকে চুরুট।

—মিলি, মিলি—

মিলি রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—মৃত্যুঞ্জয় কোথায় রে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাগানে ছিলেন। যথারীতি চা খেয়েই বাগানে গিয়েছেন।

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে দিলেন—কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্—

ভিড় হয়ে গেল সকাল থেকেই। লোকের আসা-যাওয়া। স্যার জীবনপ্রসাদ এলেন বুইক হঁকিয়ে। চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট রণধীর চৌহান সাহেব। হরসিংপুরের জমিদার জনকবাবুরা। বিলেত-ফেরত মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বাবুল মিত্তির এম. এ।

দুপুর বারোটা নাগাদ দু'-তিনখানা টেলিগ্রামও এসে গেল।

তার পর বিকেলবেলা আর এক দফা। চা, হাসি, কথা, নমস্তের ধাক্কা একদিনেই শেষ হলো না। দু'-তিনদিন ধরেই চললো। ডাকে চিঠি আসতে লাগলো। জ্যোটি, লোটি, রুবিরা আর তাদের বরেরা লিখেছে। দেরাদুন থেকে ছেলে লিখেছে। চেতলা থেকে মাসিমারা। দিল্লী থেকে লিখেছে পরেশবাবুর স্ত্রী। ভাগলপুর থেকে

মামাবাবু লিখেছেন। বেরিলি থেকে জ্যাঠতুতো ভাই লিখেছে অনেক অনেক। চিঠি। সকলকে উত্তর দিতে দিতে মিলি বিব্রত হয়ে পড়লো।

প্রথমে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সত্যিই খবরটা দেখে প্রীতই হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো লাগলো না। ডানকান সাহেব তো কথাই দিয়েছিলেন। ওখানে চাকরিতে থাকলে এতদিনে রায়বাহাদুরিটা পেতে অন্তত দেরি হতো না। তা এত বড় রায়বাহাদুরের তালিকা তো আর কখনও বেরোয় নি। এমন বছর-বছর গাদা গাদা রায়বাহাদুর যদি বেরোতে থাকে তাহালে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন!

কিন্তু এতেও বোধ হয় বিচলিত হবার মতো কিছু ছিল না। সবই চাপা পড়ে যেত একদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েটের অফিসাররা একটা বিরাট পার্টি দেবার বন্দোবস্ত করে বসলো রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে। হাসি পেল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। এমন হাস্যকর ব্যাপার শুধু পাটনা বলেই সম্ভব বুঝি।

তা হোক, পৃথিবী কারও হাসি-ঠাট্টা, সুখ-দুঃখের ভালো লাগা না-লাগার তোয়াক্কা করে না।

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। আগামী রবিবার। হাতে আর মাত্র চারদিন। ছাপানো কার্ড বিলি হলো সকলের নামে। পাটনার রথী-মহারথীরা কেউ বাদ পড়লেন না। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নামেও আলাদা চিঠি এল একটা।

রবিবার পার্টি। আর শনিবার দুপুর পর্যন্তও কেউ জানতো না।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা বললেন মিলিকে। বললেন—কাল তো আমি থাকতে পারছি না, মিলি—আমাকে যে কলকাতায় যেতে হচ্ছে—

—কেন বাবা, হঠাৎ?··· মিলির চম্‌কে ওঠবারই তো কথা।

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ও কম চম্‌কে উঠলেন না। বললেন—কেন?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—তোমার পার্টিতে থাকতে পারবো না, মৃত্যুঞ্জয়, কিছু মনে কোরো না—ডানকান সাহেব জরুরী চিঠি লিখেছে গিয়ে দেখা করবার জন্যে—এতদিন পরে বোধ হয় ভুল ওরা বুঝতে পেরেছে···

—তোমাকে কি আবার ওরা চাকরি দেবে নাকি, বাবা?···মিলি প্রশ্ন করলে।

—কে জানে!

—কবে যাবে?

—কালই সকালে, জরুরী চিঠি লিখেছে, দেরি করা উচিত নয়।

—তা তো বটেই—রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন।

গুছিয়ে দিলে মিলি। রাত পোহালেই সকাল। সময় বড় কম। রায়সাহেব

জে. ডি. ব্যানার্জি চলে যাবেন পাটনা ছেড়ে। চাকরি পেলে আর ফিরবেন না। আর একটা দিন পরে গেলেই তো ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। নইলে জামাইয়ের সম্মানে যে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, তাতেই কিনা তিনি থাকতে পারবেন না!

যত কিছু জিনিসপত্র নিজের বলতে ছিল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির, সব গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা হলো। মিলি স্লিপ পাঠিয়ে দু' কেশ চুরুটও আনালো।

সকালবেলা উঠেই মিলি এসেছে বাবার ঘরে। হঠাৎ রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চৌদ্দ বছর আগে যেদিন তিনি এ-বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিন যেন এমনি করে মিলি কাছে এসেছিল। এমনি করে তাঁর তদারক করতো। মিলি এরই মধ্যে এক ডজন রেডি-মেড শার্ট আনিয়েছে। আনিয়েছে এক ডজন টাই। রুমাল ছ'টা। এক টিন বিস্কুট, রাস্তার খাবার।

আজই সন্ধ্যেবেলা রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টি। শহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোকের নেমন্তন্ন। কথাটা মনে পড়তেই রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লম্বা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

মিলি শেষ সময়ে বললে—বাবা, হপ্তায় হপ্তায় একটা করে চিঠি বরাবর দিয়ে যেও—তুমি চলে গেলে বাড়িও একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল—

রায়সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—ত্যাখ্‌ মিলি, জানিস রায়বাহাদুর আমিও হতুম···সব বন্দোবস্ত ঠিক—এমন সময় ডান্‌কান সাহেব এসে গোলমাল করে দিলে—

কী কথার উত্তরে কী কথা শুনে মিলি যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—তা হোক্‌কে বাবা, সেই ডান্‌কান সাহেবই তো ডেকেছে—সেই ডান্‌কান সাহেবই তো আবার তোমায় চাকরি দিচ্ছে—লোকটা ভালোই বলতে হবে—

একটা খামের মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে বাবার জামার বুকপকেটে রেখে দিয়ে বললে—এই পকেটে দু শো টাকা রেখে দিলাম বাবা, মনে থাকে যেন—

আজ আর রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নয়, আজ যেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির হুকুম তামিল করতে ছুটেছে চাকর-বাকরেরা!

ট্রেন ছাড়লো। মিলির চোখ দু'টো করুণ হেয়ে উঠেছিল। রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় হাত উঁচু করলেন। হাতের চুরুটটা দাঁতে চেপে রায়সাহেব জে. ডি.

ব্যানার্জিও হাত উঁচু করে আঙুল নাড়তে লাগলেন। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁরও একটা স্বস্তির সুদীর্ঘশ্বাস পড়লো। পাটনায় থাকলে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টিতে তাঁকে যেতেই তো হতো!

সাতদিন পরে মিলি তখন চায়ের আয়োজন করছে।

বাইরে থেকে হঠাৎ চীৎকার এল—মহারাজ—

মিলি বেরিয়ে এসে দেখলে—ট্যাক্সি থেকে নামছেন বাবা।

মিলিকে দেখে বললেন—এই ট্যাক্সি-ভাড়াটা দিয়ে দে তো মিলি—

ঘরে ঢুকে বললেন—রাজী হলাম না, বুঝলি রে······ডান্‌কান সাহেব বললে—সাত শো টাকা দেব, করো তুমি চাকরি আবার। আমি বললাম—চাকরি আমি করবো না সাহেব। তখন বললে—হাজার টাকা দিচ্ছি—। তখন আমিও বললাম—দু হাজার টাকা দিলেও করবো না—

মিলি বললে—তার পর?

—তার পর আর কি—চলে এলাম, চাকরি করবো কোন্ দুঃখে বল্—তোরা থাকতে বুড়ো বাপ চাকরি করবে—এটা কি ভালো দেখায়—লোকেই বা কী বলবে?

অফিস থেকে এসে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও শুনলেন। শ্বশুরের হাজার টাকা মাইনের চাকরি না-নেওয়ার কাহিনী।

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন—ভালো করি নি—তুমি কী বলো মৃত্যুঞ্জয়?

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চাট্টোপাধ্যায়ও মিলির মতো কোনা মতামত দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

রায়সাহেব নিজের মনেই বলতে লাগলেন—হাজার হোক, বেটারা তো আমাদের মতো নয়—গুণের কদর বোঝে—খাঁটি স্কচের বাচ্ছা—বললে—রায়সাহেব, তোমাকে আমি রায়বাহাদুর করিয়ে দেব, তুমি এসো আমার এখানে—তোমার মতন লোক রায়বাহাদুর হয় নি! এটা খুব লজ্জার কথা—কিন্তু···

কিন্তু হঠাৎ কথা বলতে বলতে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নজরে পড়লো কেউ শুনছে না। না মৃত্যুঞ্জয়, না মিলি। তারা কখন টেবিল থেকে উঠে গেছে তিনি টের পান নি। তিনি একলা।

তার পর একলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ-বাড়ির সিঁড়িগুলো আজ যেন বড় উঁচু ঠেকছে।

বংশধর

আপনারা যদি কখনো মেচাদা লোকালে চড়েন তো একটা জিনিস সম্বন্ধে আপনাদের আগে সাবধান করে দেওয়া দরকার।

ধরুন, সকাল সাতটা পঁচিশে ট্রেনটা ছাড়ে হাওড়া স্টেশনের ছ'নম্বর প্লাটফরম থেকে। অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি সকালেই আপনাকে সেদিন ঘুম থেকে উঠতে হবে। আপনি থাকেন টালিগঞ্জে। সেখান থেকে বাসে হোক, ট্রামে হোক—অনেক-খানি পথ—অন্তত পুরো এক ঘণ্টার রাস্তা। ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে, কাপড়-জামা বদ্‌লে হাতে হয়ত সময় থাকবে না বেশি।

ভেবে নিলেন, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে কিছু খেয়ে নেবেন। কিন্তু ট্রাম যখন পৌঁছুল স্টেশনের সামনে, তখন মাথার ওপর ঘড়িটার দিকে চে— আপনার খাবার ইচ্ছে মাথায় উঠেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ট্রেন তো ধরলেন। জায়গাও হয়ত পেলেন থার্ডক্লাস গাড়ির এক কোণে। তখন? তখন ট্রেনের দোলানি আর ভিড়ের গরমে আপনার হয়ত চায়ের তেষ্টা পাবে। তা চা আপনি পাবেন। ভাঁড়ে করে পবিত্র চা এক আনা দিয়ে কিনতে পারেন। উলুবেড়িয়া, কোলাঘাট এলে ঠাণ্ডা ডাব পাবেন। আন্দুলে গরম পান্তুয়া পাবেন। সাঁকরেলে 'গরম গরম' সিঙাড়া। মৌরিগ্রামে তেলেভাজা। ও-সব জিনিস আপনি কিনতে পারেন, কিন্তু একটি জিনিস পেলেও কিনবেন না। কিনে আমি ঠকেছি।

সেইটি বলি।

মেচাদা লোকালে আমি দু'বার চড়েছি।

প্রথমবার তেমন বিশেষ কিছুই ঘটেনি।

গাড়িতে খুব ভিড় ছিল। একটা খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছিলাম। চারদিকের ভিড়ে সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে আরাম করবার পর্যন্ত জায়গা নেই।

ট্রেন সাঁত্রাগাছি ছাড়তেই ক্যানভাসারের দল একের পর এক বক্তৃতা দিতে লাগলো।

অদ্ভুত সব জিনিসের বেসাতি। বারো আনার হাফপ্যাণ্ট থেকে সুরু করে সংসারের দরকারী-অদরকারী নানান জিনিসের বিজ্ঞাপন আর প্রচার। প্রচারের জন্যে অতি অল্পমূল্যে সে সব জিনিসের বিতরণ। সাধু-প্রদত্ত হাঁপানির ওষুধ, মানুষের

কল্যাণের জন্যে এ-ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে, কিন্তু তামার মাদুলির দাম বাবদ মাত্র সওয়া পাঁচ আনা নগদ-মূল্য দিতে হয়। বাজারে যে হাফপ্যাণ্ট পৌনে দু'টাকার কমে পাওয়া যায় না, 'কালীমাতা টেলারিং কোম্পানি' নামমাত্র বারো আনায় দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করতে ক্যানভাসার পাঠিয়েছেন মেচাদা লোকালের যাত্রীদের কাছে। তারপর আছে দাস কোম্পানির দাদের মলম। নাম বটে দাদের মলম, কিন্তু চর্মরোগের যম। একবার লাগালেই নির্মূল। কাপড়ে এ মলমের দাগ লাগে না। পারা-বর্জিত মলম, যাঁরা একবার ব্যবহার করেছেন, তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের উপকারের জন্যে আর এক শিশি কিনতে পারেন। আরো আছে হাসির হর্‌রা—মহাত্মা গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক-কাহিনী। নিরানন্দ মনে হাসির বন্যা ছোটাতে, শোক, দুঃখ, কান্না ভোলাতে ভবসংসারে একমাত্র কাণ্ডারী। বাপ, মা, মেয়ে, ছেলে—একসঙ্গে পড়বার মতো পুস্তক। দাম মাত্র তিন আনা। দেখতে চটি বই, কিন্তু আরব্য-উপন্যাসের চেয়ে উপাদেয় এই গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক-কাহিনী। তারপর আছে অন্ধ ভিখারীর মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে করুণ গান—'অন্ধ হয়ে ভাই কত কষ্ট পাই···'। তারপর আছে তিলোত্তমা কেমিক্যালের 'বঙ্গলক্ষ্মী সিঁদুর'। আজ থেকে দাম কমলো এ-সিঁদুরের। কাল দাম বাড়তেও পারে। কিনে ঘরে রেখে দিন। হিন্দুর ঘরে এ জিনিস অপরিহার্য। পাঁচ প্যাকেট একসঙ্গে কিনলে তিন আনা পয়সা কমিশন দেওয়া হয়। এমন সুযোগ হারাবেন না। আরো আছে নিমের টুথ-পাউডার। এ টুথ-পাউডারের দাম মাত্র দু'পয়সা। কিন্তু যাঁরা দাঁতের ব্যাধির জন্যে ডেণ্টিস্ট্‌কে হাজার হাজার টাকা দিয়েও উপকার পাননি, তাঁরা এই দু'পয়সার নিম টুথ-পাউডার কিনে পরীক্ষা করতে পারেন। বিশ্বাস করে কিনে নিয়ে যান। দুটো পয়সা কতদিন কতভাবেই বাজে খরচ হয়ে যায়! তারপর আছে···

কিন্তু আরও যা যা আছে, তত জিনিসের নাম মনে রাখা কি সম্ভব!

এ-সব ছাড়াও প্লাটফরমের ওপর ঠেলাগাড়িতে বালুসাই মিহিদানা আছে, ভাঁড়ে বা কাচের গ্লাসে পবিত্র চিনির চা আছে, কচি ডাব আছে, তেলেভাজা আছে, বাঙলা বা মিঠে পান আছে, সিগারেট আছে—বিড়ি আছে, এক কথায় কী নেই?

ধীরে ধীরে মেচাদা লোকাল এগিয়ে চলেছে। ডাইনে বাঁয়ে ছোট ছোট স্টেশন। মৌরিগ্রাম, আন্দুল, সাঁকরেল, আবাদা, নলপুর, বাউড়িয়া···এক এক স্টেশনে ট্রেন থামলেই ক্যানভাসাররা এক গাড়ি থেকে নেমে আর-এক গাড়িতে ওঠে। তারপর পরের স্টেশনে আবার আর-এক গাড়ি।

কিন্তু এবার ফুলেশ্বর আসতেই অতি বৃদ্ধ একজন লোক এল। মাথায় একটু টাক।

পাকা চুল সামান্য। গায়ে বোতামহীন খাকী শার্ট। চোখে মোটা কাচের চশমা। হাতে একটা ছেঁড়া স্যুটকেস।

—জি-জি রায়ের আবাক-জলপান নেবেন কেউ?—জি-জি রায়ের অবাক জলপান?

এত আস্তে কথা বলে, যেন শোনাই যায় না কানে। গম্ভীর মানুষ। এতগুলো ক্যানভাসারের সঙ্গে যেন কোনো মিল নেই। বক্তৃতার কলা-কৌশল এখনও আয়ত্ত হয়নি। আর, তা ছাড়া, চলতি গাড়িতে ওঠা-নামা করবার বয়েসও নয় ঠিক।

আমার পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মুখ তুললেন এবার। তারপর একবার অবাক-জলপানের মুখখানার দিকে চেয়ে কী ভাবলেন কে জানে! বললেন: দেখি একটা—

নগদ দু'পয়সা দিয়ে কিনলেন অবাক-জলপান। তারপর প্যাকেটটা খুলে ফেললেন। ওপরে খবরের কাগজ, তলায় শালপাতার তৈরি বড় পানের খিলির মতো প্যাকেট। ভেতরে কয়েকটি চিনেবাদাম, ডালভাজা, কাঠিভাজা—মশলা দিয়ে মাখা। তারপর প্যাকেটটা মুড়ে পকেটে রেখে দিলেন। আমি চেয়ে দেখছিলাম। তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে যেন স্বগতোক্তিই করলেন—বাড়ির ছেলেদের জন্যে নিলাম মশাই—

ততক্ষণে উলুবেড়িয়া এসে গিয়েছিল। আধ মিনিট থামবে এখানে।

অবাক-জলপান নামতে নামতে গাড়ি ছেড়ে দিলে। আর একটু অসাবধান হলেই বুঝি পড়ে যেত। অবাক-জলপানের দিকে চেয়ে হঠাৎ পেছন দিকটা দেখে যেন চমকে উঠলাম। মুখখানা যেন চেনা-চেনা। ভালো করে দেখবার জন্যে জানলায় মুখ বাড়িয়েছি। চেয়ে দেখি, পেছনের আর একখানা গাড়িতে তখন উঠে পড়েছে সে।

আবার নিজের সীটে এসে বসলাম। কেমন যেন সন্দেহ হলো, রায়মশাই না!

কিন্তু আমাদের গাড়িতেও তখন আর-এক কাণ্ড—

—বীরবলের অদ্ভুত মলম—বীরবলের অদ্ভুত মলম—কাটা-ঘা, পোড়া-ঘা, নালি-ঘা, প্যাঁচড়া, দাদ, চুলকানি, খোস, হাজা, সর্দি-কাসি, ঘুঙরি-কাসি, হাঁপ-কাসি, মাথা-ধরা, পেট-ফাঁপা, আমাশা, বদহজম—যাবতীয় রোগে অব্যর্থ···

এর বছর পাঁচেক পরে আর একবার মেচাদা লোকালে চড়েছি। সেইবারেই কাণ্ডটা ঘটলো।

গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক-কাহিনী, পবিত্র চিনির চা, হাফ-প্যাণ্ট—সমস্ত অত্যাচার এড়িয়ে কোন রকমে মেচাদা লোকাল থেকে নামতে পেরেছিলাম। কাজ সেরে ফিরবো সন্ধ্যের গাড়িতে। কিন্তু স্টেশন যখন এক মাইল দূরে, তখন ডিস্ট্যাণ্ট-সিগন্যালের কাছ দিয়ে ডাউন ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। একা-একা স্টেশনের প্লাট-ফরমের ওপর পায়চারি করছি। কাছাকাছি বোধ হয় আর গাড়ি নেই কোনো। জনহীন প্লাটফরম। দূরান্তবর্তী কয়েকটা সিগন্যাল-পোস্টের মাথার কয়েকটি লালের বিন্দু অদৃশ্য প্রহরীর মতো স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে পেছনে অনন্ত অন্ধকারের রহস্য। অল্প-অল্প কুয়াশার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পাতলে যেন এই নিস্তব্ধতারও এক অপরূপ শব্দ শোনা যাবে।

হঠাৎ কানে এল—জি-জি-রায়ের অবাক-জলপান নেবেন কেউ? অবাক-জলপান…জি-জি রায়ের…

প্রথমে মনে হলো, ও-শব্দ বুঝি আমার অন্তরাত্মার অব্যক্ত গুঞ্জন। তার পরে প্রখর দৃষ্টি দিয়ে একবার চারিদিক দেখবার চেষ্টা করলাম। উল্টো দিকের প্লাট-ফরমে কোনো জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, এই নির্জন প্লাটফরমে কে এমন ঘুরে ঘুরে কাদের কাছে অবাক-জলপান বেচবে! নিজের দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলাম তাকে। ছায়ামূর্তি ওভারব্রিজ পেরিয়ে এপাশের প্লাটফরমে আসছে। তখনও অনর্গল বলে চলেছে: জি-জি-রায়ের অবাক-জলপান নেবেন কেউ? অবাক-জলপান?… নেবেন কেউ?…অবাক-জলপান?…

জপমন্ত্র-উচ্চারণের মতো অবাক-জলপান হাঁকতে হাঁকতে এদিকেই আসছে। তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। নেমে নির্জন প্লাটফরমের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে যেন এদিকেই আসছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। যেন অশরীরী একটা মূর্তি অনন্তকালের ক্যানভাসারের রূপ নিয়ে অনন্তকালের যাত্রীদের কাছে তার অসামান্য বেসাতি বেচতে চলছে। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো।

কিন্তু এবার একটা লাইট-পোস্টের তলায় এসে আমাকে দেখতে পেয়েই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে চলতে লাগলো লোকটা।

আলোর সামনে ভালো করে দেখলাম তাকে আবার। সেই সেবারের দেখা মূর্তি। বৃদ্ধ মানুষ। মোটা চশমা। মাথার চুলও পেকে গেছে। একটু টাকও আছে বুঝি। মুখে যেন নিঃশব্দে কী বিড়বিড় করে বকছে। এবার চিনতে পারলাম স্পষ্ট। সেই রায়মশাই। পুরন্দর খাঁর বংশধর। কোনও ভুল নেই!

কিন্তু আমাকে যেন চিনতে পারলেন না!

সামনে এগিয়ে বললাম : অবাক-জলপান আছে?

একটি মুহূর্ত। কিন্তু সেই একমুহূর্তের মধ্যে যেন পৃথিবী-পরিক্রমা করে এলাম।

মনে আছে, প্রথম যেদিন চাকরিতে ঢুকলাম, চারদিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, যেন এক বিচিত্র জগৎ। সুধীরবাবু আমার হাতে একঠোঙা খাবার দিয়ে বলেছিলেন—নিন, ধরুন···

জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিসের খাবার?

সুধীরবাবু বলেছিলেন—পুরন্দর খাঁর বংশধর ম্যাট্রিক পাস করেছে।

তখনও কিছু বুঝিনি। পাশের হরিশবাবু বললেন—নতুন ঢুকেছেন আপনি, অনেক কিছু দেখতে পাবেন এখানে, বিখ্যাত-বিখ্যাত সব লোক আছে আমাদের অফিসে। ওই দেখুন, ওই-যে ছেঁড়া শার্ট গায়ে দিয়ে গেলাসে চা খাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডাক্তার, বাড়িতে ডাকলে চার টাকা ভিজিট নেন। আর এই-যে দেখছেন চাঁদনির স্যুট্-পরা লোকটি, ও-হচ্ছে এক বিলেত-ফেরতের ভাই, আর রেকর্ড-সেক্‌শানে গেলে আপনাকে পুরন্দর খাঁর বংশধরকে দেখিয়ে দেব।

রায়মশাইকে সেদিন প্রথম দেখলাম।

রেকর্ড-সেক্‌শানে একটা চিঠির খোঁজে গিয়েছিলাম। মোটা চশমা-পরা। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলেছেন। জামার সব-ক'টা বোতাম খোলা। ভেতরে বুকের ছাতির ওপর কাঁচা-পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখটা তুললেন। বললেন—তোমাকে আগে দেখিনি তো! নতুন ঢুকেছ? কার লোক? দাস সাহেবের?

বললাম—না।

—তবে বিনয়বাবুর?

এবারও বললাম—না।

—তবে কি ম্যাক্‌লীন সাহেবের?

এ অফিসে কারো-না-কারোর লোক না হলে ঢোকা অসম্ভব জানতাম। তবু যখন শুনলেন, আমি কারোর লোকই নই, তখন বললেন—উন্নতি করা শক্ত হবে ভাই, ওই জার্নাল-সেক্‌শানেই পচতে হবে সারা জীবন, এই আমার ব্যাপারই ছাখো না···

বলতে গিয়ে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নামটা···?

নাম শুনে বললেন—মিত্তির ? 'নয়নজোড়ের মিত্তিরদের কেউ হও নাকি ?

বললাম—না···

এবারও ছাড়লেন না। বললেন—তবে রাজা কৈলাস মিত্তিরের ফ্যামিলির কেউ ?

আমার উত্তর শুনে একটু কৃপাপূরবশ হয়েই যেন বললেন—সে কি, রাজা কৈলাস মিত্তিরের নাম শোননি ? সে কি হে ! খবরের কাগজ পড়ো না নাকি ? সেকালে মার শ্রাদ্ধে বারো লক্ষ টাকা খরচ করে সমস্ত কলকাতাকে চম্‌কে দিয়েছিলেন, সোনার হুঁকোয় রূপোর কলকে চড়িয়ে তামাক খেতেন। নামই শোননি তাঁর ? ওঁর দৌহিত্রের সঙ্গেই আমার পিসিমার দেওরের যে···

পাশ দিয়ে ভূধরবাবু যাচ্ছিলেন। আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন—কার সঙ্গে কথা বলছেন ? পুরন্দর খাঁর নাম শুনেছেন ?

বললাম—তা শুনেছি বৈকি···

রায়মশাই বাধা দিলেন—ওদের কথা তুমি ছেড়ে দাও ভাই—পুরন্দর খাঁর বংশধর হলে কি আর এই তেষট্টি-টাকা বারো-আনার চাকরিতে পচে মরি !

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে, 'তেষট্টি টাকা বারো আনা'র গল্পটা নেহাতই বিনয়ের ব্যাপার। আরো বুঝলাম, পুরন্দর খাঁর বংশধরের কাহিনীটা কিন্তু সবাই জানে। তেষট্টি টাকা বারো আনা—যা হাতে নেন, সেটা নিতান্তই দায়ে পড়ে। সওয়া ছ'লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক গঙ্গাগোবিন্দ রায় আজ জ্ঞাতি-সরিকদের ষড়যন্ত্রে বিপাকে পড়ে রেলে চাকরি করতে এসেছেন। আর এই যে ছেঁড়া পাঞ্জাবি, খাটো ধুতি, চার-পাঁচ দিন ক্রমান্বয়ে দাড়ি কামান না, আর ভবানীপুর থেকে এতদূর হেঁটে অফিসে যাতায়াত করেন, কিংবা দুপুরবেলা আধ গেলাস চা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন—এ সবই নাকি উদ্দেশ্যমূলক।

জার্নাল-সেক্‌শানের সাব-হেড্‌ পঞ্চাননবাবুর বেয়াই জামাইকে শীতের তত্ত্ব করেছিলেন। তার থেকে চারটি ফজ্‌লি আম এনে সেদিন অফিসের তিরিশটি লোককে খাওয়ালেন। ভাগে দুটো করে টুকরো পড়লো সকলের।

রেকর্ড-সেক্‌শানে টিফিনের সময় গিয়ে রায়মশাইকে বললাম—আপনি আম খেলেন না যে রায়মশাই ? বলাবলি করছিল ওরা···

রায়মশাই হাতের চিঠিপত্রের ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে গলা নীচু করে বললেন—তোমাকে আমার বলতে দোষ নেই ভাই, তুমি যেন আবার ওদের বোলো না···

সামান্য ব্যাপারে এত গোপনীয়তা কেন, বুঝলাম না। বললাম—না বলবো না, বলুন···

—তবে শোনো, ও-রকম একটুকরো আম আমাদের খাওয়ার অভ্যেস নেই ভাই, তোমাকে সত্যি কথাই বলি। এমন দিন গেছে, যেদিন একসঙ্গে অমন চল্লিশটা আম আমি নিজে সাবড়েছি, আর সে-আম আর এ-আম? এক-একটা গাছ-পাকা আম বেছে বেছে জাল-আঁকশি দিয়ে পাড়া। আমার দেশে যদি কখনও যাও দেখাবো, আর গাছ কি একটা! আমার ভাগে শুধু আম গাছই একশো তিনটে, সব কলমের। সাতটা লিচু গাছ, কাঁঠাল গাছ পঁচাশিটে—আর সে কাঁঠাল কী! গাছে ফল ফললে তলার মাটিতে গর্ত করতে হয়, নইলে মাটিতে ঠেকে যায়। আমার জীবনে কখনও আমের টুকরো খাইনি ভাই···

বললাম—সে-সব এখন কে খাচ্ছে?

রায়মশাই আবার কাজে মন দিলেন। বললেন—সে অনেক কথা, সব বলতে গেলে আঠারপর্ব মহাভারত হয়ে যাবে, কেউ বিশ্বাসও করবে না। আমি নিজে কাউকে বলেও বেড়াই না যে, আমি পুরন্দর খাঁর বংশধর। আমাকে দেখে তা কে বিশ্বাস করবে বলো না? ও না-বলাই ভালো। যারা নির্বোধ, তারাই বলে বেড়ায় সবাইকে! আমার সে-স্বভাব নয় ভাই; যারা জানে আমাদের বংশের ইতিহাস, যারা রেখেছে আমাদের খবর, তারা এখনও খাতির করে।···সে-সব গল্প কাউকে করি-ও না, সে অভ্যেসও আমার নেই। বাবা-মশাইয়ের পালকিটা এখনও চণ্ডীমণ্ডপের ধারে ভেঙেচুরে পড়ে আছে, আটজন বেহারায় বইতো সেটা, তারই একখানা পাল্লা ভেঙে নিয়ে সরিকেরা ছেলে-ঘুমপাড়ানোর দোলনা করলে, আর রাজা-বাহাদুরের পেতলের কামানটা এখনও টিউবওয়েলের পাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, এখন গেলে দেখবে তার ওপর বউ-ঝিরা সাবান কাচছে বসে-বসে···

আমি চলে আসছিলাম। ডাকলেন আবার—আর একটা কথা শুনে যাও ভাই···

ফিরে এসে বললাম—কী?

—তোমার কোনো ভালো উকিল-টুকিলের সঙ্গে জানাশোনা আছে ভায়া?

আমার নিজের দাদাই আলিপুরের উকিল শুনে বললেন—কোন্ কোর্টের উকিল—দেওয়ানী না ফোজদারী?

বললাম—দেওয়ানী।

রায়মশাই হঠাৎ যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। হাতের কাজ সরিয়ে রেখে বললেন—তোমাকে একটা উপকার করতে হবে ভাই, আমার··

তার পর হাত দুটো ধরে আবার বললেন—আমি শুধু আমার কাগজ-পত্তরগুলো একবার দেখাতে চাই তাঁকে, আমি ব্যারিস্টার কে. বোসকে আমার দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়েছিলাম একবার, তিনি দেখলেন সব, পাট্টা-কবুলিয়ত, খাজনার দাখ্‌লে-পত্তর, লর্ড ক্লাইভের আমলের সনদ—সব নকল করিয়েছি কিনা? তিনি বললেন, কাগজ-পত্তর পরিষ্কার আছে, কোথাও দাগ নেই—আদালতে একবার পেশ করতে পারলে ডিক্রী নিশ্চয় হবে, এই তোমায় বলে রাখলুম। কিন্তু···

—কিন্তু কী?—জিজ্ঞেস করলাম।

—কিন্তু খরচা। খরচা কে ছায়? এ তো আর ফোজদুরী মামলা নয়?—এ যে দু'-তিন বছরের ধাক্কা। দু'-তিন বছর ধরে আদালত-ঘর, আর উকিল-মুহুরীর খরচা। চাট্টিখানি কথা তো নয়, সওয়া ছ'লক্ষ টাকার সম্পত্তি! বাঘও যত বড়, ফাঁদও তত বড় হওয়া চাই তো! আর এ হলো গিয়ে বাঘের বাবা, যার নাম আদালত—অত টাকা কোথায়? এখন এই মাসে মাসে দু'-চার টাকা করে জমাচ্ছি, কিন্তু তেমন যদি একজন উকিল পাই···

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসতেই সুধীরবাবু বললেন—তোমাকে ওর বাড়ি যেতে বলেছে নাকি? খবরদার খবরদার, যেও না কখনও বলছি।

বললাম—কেন?

—জ্বালিয়ে খাবে। সেই ট্রাঙ্ক-ভর্তি দলিল দেখাবে, খাওয়াবে, তারপর যত রাতই হোক, সব পড়িয়ে শোনাবে। দলিলের হাতের লেখা পড়তে হবে, নক্সা দেখতে হবে, বংশ-তালিকা দেখতে হবে—তবে ছাড়বে। আমাকে গরম লুচি আর আলুভাজা খাইয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনাকেও দেখিয়েছে নাকি?

—শুধু কি আমাকে? জিজ্ঞেস করে দেখো, অফিসের কেউ আর বাদ পড়েনি। ওই জীবনবাবু, হরিশবাবু, সনাতনবাবু—এমন কি দ্বিজপদ চাপরাসীকে পর্যন্ত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়িয়ে শুনিয়েছে, ও তো পড়তে পারে না···

অফিস থেকে বেরুবার পর দেখতে পাই, সবাই বাস্‌-এর জন্যে যখন অপেক্ষা করছি, রায়মশাই তখন হাঁটা সুরু করেছেন। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, লাঠিটা নিয়ে সোজা বাড়ি যাবেন। বাড়ি ভবানীপুরে। সারাটা রাস্তা হেঁটে আসা-যাওয়া।

সুধীরবাবু বললেন—এই কষ্ট বুড়ো কেন করে জানো? সব ওর ভাইয়ের জন্যে। এই না-খেয়ে না-প'রে ভাইকে মানুষ করে তুলছে, আর সে-ও তেমনি অমানুষ হয়ে উঠছে। দু'-দু'বার ফেল করে সেবার ম্যাট্রিকটা থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে, এবার

আই-এ পাস করবে ক'বারে দেখা যাক। কিন্তু রায়মশাই বলে রেখেছেন, বসন্ত আই-এ পাস করলে তোমাদের মাংস খাওয়াবো…

রায়মশাইও বলতেন—কাউকে বোলো না ভায়া, তোমাকেই গোপনে বলছি, বসন্তকে, ইচ্ছে আছে, বি-এ পাস করিয়ে ওকালতি পড়াবো। বুঝলে না, বাড়ির উকিল—নিজে দেখে শুনে মামলা করবে। সওয়া ছ'লক্ষ টাকার সম্পত্তি, তিন বছর লাগে, চার বছর লাগে, যতদিন ইচ্ছে—মামলা করুক, আমি তো এদিকে চাকরি করতে রইলুম। তারপর একবার মামলার ডিক্রী হয়ে গেলে আমায় আর পায় কে! বসন্তকেও আর ওকালতি করে খেতে হবে না, যা আছে তাই ভাঙ্গিয়ে খেলেই সাতপুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে। আমিও তখন তেষট্টি টাকা বারো আনার চাকরির মাথায় লাথি মেরে…

রায়মশাই কখনও বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু একটু অন্তরঙ্গ হলেই মনের আর বাধা-বন্ধ থাকতো না।

একদিন বললেন—কাউকে বোলোনা ভাই, এই যে লাঠিটা দেখছো, এটা রাজা রুদ্ররামের নিজের হাতের লাঠি, শৌখিন লোক ছিলেন কিনা! মাথাটা সোনা-বাঁধানো ছিল আগে, চার পুরুষের লাঠি, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে! এই লাঠি ওঠানামাতে একদিন বর্ধমান জেলার ভাগ্যনির্ণয় হয়েছে—আর এখন রেলের কেরানীর হাতে মানাবে কেন, ভায়া? তাই দশভরি সোনা খুলে রেখেছি, বসন্তর বিয়েতে আমাকেও তো কিছু খরচ করতে হবে? ভেবেছি, পয়সা হলে একটা মুকুট গড়িয়ে রাখবো। বুঝলে না, রাজবংশের পুত্রবধূকে গিনি দিয়ে তো আর আশীর্বাদ করা যায় না?

তা রায়মশাই সত্যিই অফিসের সবাইকে মাংস খাওয়ালেন একদিন। অফিসের তিরিশজন লোক চেটেপুটে মাংস খেলে। একবারের চেষ্টায় আই-এ পাস করেছে বসন্তবল্লভ রায়।

রায়মশাই বলেন—কুমার আমরা নামের আগে লিখতে পারি, আইনে বাধে না। কিন্তু লিখিনে। তেষট্টি টাকা বারো আনার কেরানী, তার আবার……যদি তেমন সুদিন কখনও আসে ভায়া…

বসন্ত ম্যাট্রিক পাস করেছে, আই-এ পাস করেছে, বি-এ পড়বার জন্যে ভর্তি করে দেওয়া হলো, বসন্তর কবে শরীর খারাপ হলো, বসন্ত কী খেতে ভালোবাসে, বসন্ত কখন ঘুম থেকে ওঠে, কীরকম দেখতে তাকে,—সব সংবাদ আমাকে বলেন রায়শমাই।

একদিন এসে বললেন—কাউকে বোলো না ভাই, আজ বসন্ত খুব রেগে গেছলো…

বললাম—কেন ?

—এমনি ! আমাদের রায়বংশের ওটা একটা বিশেষত্বই বলতে পারো। রাজা রুদ্ররাম রাত্রে একদিন ব্যাঙের ডাকে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল বলে পুকুর-ই বুজিয়ে ফেলেছিলেন রেগে গিয়ে। রাজা দিগম্বরপ্রসাদ একবার রাগের চোটে চল্লিশখানা গাঁ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর রাজা নীলাম্বরপ্রসাদ একবার···

একদিন এসে বললেন—কাল বসন্ত সারা রাত ঘুমোয়নি, জানো ভাই ?

বললাম—কেন ?

রায়মশাই বললেন—তাস খেলেছে বন্ধুবান্ধব নিয়ে।

বললাম—সে কি ! পরীক্ষার সামনে এইরকম ভাবে সময় নষ্ট করা···আপনি কিছু বললেন না !

—প্রথমে ভেবেছিলাম বলি, কিন্তু চুপ করে গেলাম, খেয়ালী বংশ তো !···তেষট্টি টাকা বারো আনার কেরানী না-হয় হয়েছি, কিন্তু রাজরক্ত যাবে কোথায় ? নিজেকেও তো চিনি ! রাজা সর্বেশ্বর খামখেয়ালি করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, ইতিহাসের বইতেই তা দেখতে পাবে, তারপর আমার ঠাকুরবাবা রাজা কৈলাসচন্দ্র তাঁর একমাত্র মেয়ে পটেশ্বরীকে অর্থাৎ আমার পিসিমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলের সঙ্গে···সে-বেচারি রাজকন্যেও পেলে, অর্ধেক রাজত্বও পেলে।

বললাম—সে কি ! বংশ, কুলমর্যাদা···

—তা না হলে আর খামখেয়ালী কাকে বলে ? তা তাদের সঙ্গেই তো এই মামলা। বাবা মারা গেলেন, আমরা তখন নাবালক দু'ভাই, আমার অভিভাবক হয়ে বসলেন পিসেমশাই মাথার ওপর—তারপর সব বেনামী করে-করে···তুমি তো একদিন গেলে না বাড়িতে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সীলমোহর দেওয়া সনদ পর্যন্ত দেখিয়ে দেব, সব বাক্সে ভরে রেখেছি। বসন্ত একবার ওকালতিটা পাস করে নিক, তখন···কিন্তু কাউকে যেন এ-সব বোলো না, ভাই··

ভূধরবাবু একদিন বললেন—আপনার সঙ্গে তো খুব ভাব দেখছি রায়মশায়ের, রাজা রুদ্ররামের রাগের গল্প শোনেন নি ?

বললাম—শুনেছি।

—সোনা-বাঁধানো লাঠির গল্প শোনেন নি ?

—শুনেছি।

—আওরঙ্গজেবের সীলমোহর-করা সনদের গল্প ?

বললাম—তাও শুনেছি।

—একবার হাতীর পিঠে চড়ে ইছামতী পেরোতে গিয়ে কুমীর-শিকারের গল্প বলেন নি? আর, রাজা নীলাম্বরপ্রসাদের সোনার ছিপে মাছ ধরা…

বললাম—না, এ-সব শুনিনি তো…

—শুনবেন, আরো কিছুদিন যাক। সবাই শুনেছে আর আপনি শুনবেন না, তা কি হতে পারে? সকলকেই বলবেন,—কাউকে বোলো না, কিন্তু বলবেন সবাইকেই…

তা সত্যিই, ভূধরবাবু মিথ্যে কথা বলেন নি। সে-গল্পও শুনলাম একদিন রায়মশায়ের বাড়ি গিয়ে। রায়মশাই তাঁর বাড়ি যেতে বহুদিন থেকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। সেদিন গেলাম।

কিন্তু গিয়ে মনে হলো, না গেলেই যেন ভালো করতাম।

নামে ভবানীপুর। কিন্তু এ-গলির বাড়িগুলোয় ভবানীপুরত্ব নেই যেন কোথাও।

রায়মশাই একটা গামছা পরে বোধহয় নর্দমা পরিষ্কার করছিলেন। সেই অবস্থাতেই আমাকে টেনে একবারে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন।

বললেন—আসছি কাপড়টা পরে, বোসো ভাই—

কিন্তু ততক্ষণে আমি নির্বাক হয়ে ঘরের মেঝেতে দেখছি আর এক দৃশ্য। একথালা ভাত-তরকারি সারা ঘরময় ছড়ানো। কে যেন একটু আগে সবেমাত্র এখানে ভাত খেতে বসেছিল। তারপর কী কারণে যেন ভাত না খেয়েই থালায় লাথি মেরে উঠে চলে গেছে।

বড় লজ্জায় পড়লুম। মনে হলো, রায়মশায়ের লজ্জা প্রকাশিত হয়ে গিয়ে আমাকেই যেন পরোক্ষভাবে লজ্জিত করছে।

কাপড় পরে ফিরে এসেই রায়মশাই বললেন—বড় আনন্দ হলো, তুমি এসেছ। কিন্তু…

তারপর আমার কুণ্ঠিত ভঙ্গী দেখে আর আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন—আরে, তুমি কিছু ভেবো না, এ ছোট-বাহাদুরের কাণ্ড। তুমি আরাম করে খাটের ওপর পা তুলে বোসো দিকিনি ভাই আগে।

আমি তবু জিজ্ঞেস করলাম—ছোট বাহাদুর কে?

—ওই বসন্ত, আমার ছোট ভাই, ভাত দিতে একটু দেরি হয়েছিল কিনা, কোথায় মাছ ধরতে যাবে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, ট্রেনের টাইম…তা যাক্‌গে, ও-সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন কোন্‌টা আগে দেখবে বলো, দলিলপত্তর, না সনদের নকল?

আমি তখন ঘরের চারিদিকের দারিদ্র্যের এই নগ্নরূপ দেখে কুণ্ঠিত হয়ে ছিলাম। তাই রায়মশায়ের কথার কোনও জবাব দিতে পারলাম না।

রায়মশাই হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বললেন—কী ভাবছ বলো তো ভাই ?

আমি হঠাৎ অপ্রস্তুত ভাব সামলে নিয়ে বললাম—না, কিছু না, বলুন আপনি···

রায়মশায়ের দ্বিধা কাটলো না। বললেন—না, নিশ্চয় কিছু ভাবছো, আমার এই ময়লা কাপড় দেখে কিছু ভাবছো, না ?

বললাম—না না—আপনি বলুন, কিছুই ভাবছিনে আমি···

—'না' বললে শুনবো কেন ভাই ? নিশ্চয় ভাবছো। উডবার্ন সাহেব নিজেই আমাকে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল, তা তুমি তো তুমি···

—কোন্ উডবার্ন সাহেব ?

—উডবার্ন সাহেব, আলিপুরের দেওয়ানী আদালতের জজ। আদালতের ব্যাপার জানো তো ?—কেউ-ই মানতে চায় না কাউকে, তা সে রাজাই হও, আর উজীরই হও। উডবার্ন সাহেবের কাছেই আমার দরখাস্ত গিয়েছিল কিনা। হেঁটে হেঁটে পায়ের গোড়ালি ক্ষইয়ে ফেলেছি তখন। আর দানছত্তর করছি টাকার। পঁচাশি টাকা জমা দিয়েছি, সনদের নকলটা করিয়ে নেব মোক্তারকে দিয়ে। তা উডবার্ন সাহেব আমার দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেছে। বললে, তুমিই রুদ্ররামের নাতি ? যার মৃত্যুতে কেল্লায় তিনবার তোপ পড়েছিল ?

আমি করজোড়ে বললাম—হ্যাঁ হুজুর···

তারপর সাহেবও জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তোমার এ-দশা কেন ? করো কি তুমি ?

মনে আছে, সেদিন সেই বহুকাল আগে রায়মশাই, পুরন্দর খাঁর বংশধর গঙ্গা-গোবিন্দ রায়, বি-এন-আর অফিসের তেষট্টি টাকা বারো আনার চাকরি-করা রেকর্ড-সেক্‌শানের কেরানী, নগদ একটাকা তিন আনার খাবার কিনে এনে খাইয়েছিলেন আমাকে। আমি রসগোল্লা, পান্তুয়া, দরবেশ, ছানার গজা—প্রত্যেকটির দাম কষে-কষে হিসেব করে খতিয়ে দেখেছিলাম, একটাকা তিন আনার কম নয় তার দাম। হয়ত তাঁর দু'দিনের বাজার-খরচ, যিনি নিজে বাস্-ট্রামের ভাড়ার পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ছোট বাহাদুরকে উকিল করে তুলছেন, দেওয়ানী মামলার খরচ সংগ্রহ করছেন। খেতে গিয়ে আমার গলা দিয়ে যেন কিছু নামছিল না। মনে হচ্ছিল, যেন অন্যায় করছি ! চুরি করছি !

সেদিন ঘরের কোণে একটা লোহার সিন্দুক খুলে কত কাগজপত্র, কত পুঁথির পাতা, কত ঘটককারিকা-কুলকারিকা যে দেখিয়েছিলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই।

মনে আছে, তাঁরও খেতে দেরি হয়েছিল সেদিন, আমারও হয়েছিল। বোধ হয় ঘড়িতে যখন তিনটে বেজেছিল, তখন উঠতে পারি।

এর পর বেরুলো বাদশা আওরঙ্গজেবের সনদ।…

আমি একবার বললাম—আমি আজ উঠি রায়মশাই…

—না না, আর একটু, আর একটু, সব তোমায় দেখানো হলো না।

এক-একটি জিনিস কত যত্নে কত আগ্রহে লোহার সিন্দুকে রেখেছেন, দেখলে করুণা হয়। প্রত্যেকটি দলিলের কাগজ অতি সাবধানে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন। যেন কত মহামূল্য সামগ্রী!

পরের রবিবার রায়মশাইকে নিয়ে আসতে হলো দাদার কাছে। কথাবার্তার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। প্রায় পঁচিশ সের ওজনের কাগজপত্র-ভর্তি একটা পুঁটুলি নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি। ভালো অয়েলক্লথ দিয়ে বাঁধা। পোঁটলার ভারে একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছেন রায়মশাই। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে তবে যেন আবার চাঙ্গা হলেন। বললেন—এগুলো' দেখতে ছেঁড়া কাগজ, কিন্তু ভায়া, এরই দাম সওয়া ছ'লক্ষ টাকা!…

পরদিন অফিসে দেখা হতেই আমাকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। বললেন—কাউকে বোলোনা ভাই, সব ঠিক হয়ে গেল…

আমিও বিস্মিত হয়ে গেলাম। যাক, এতদিনে বুঝি সত্যিই সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু এত সহজে কেমন করে হলো?

রায়মশাই বললেন—আরে তোমরা যে নয়নজোড়ের মিত্তির, তা তো বলো নি?

—কী জানি! কোথায় নয়নজোড়! সে-নামও কখনও শুনিনি।

—আরে অতবড় বংশের ছেলে তোমরা! তুমি কেন এলে ভাই এই রেলের চাকরিতে! তোমার দাদাকেও তাই বললুম, ভারি পণ্ডিত ব্যক্তি, আইন একেবারে গুলে খেয়েছেন, নইলে কি আর শুধু শুধু পাঁচশো-এক টাকা ফী হয়? উকিল বটে, তা উনিও ওই কথাই বললেন, ব্যারিস্টার কে বোস যা বলেছিল…

—কী হলো শেষ পর্যন্ত?

—উনিও বললেন, কাগজ-পত্তর, দলিল-দস্তাবেজ পরিষ্কার—কোথাও দাগ নেই এক-ছিটে, মামলা আমার পক্ষে, রাজা রুদ্ররামের নিজের হস্তাক্ষর রয়েছে—আমার পৌত্রদ্বয় শ্রীমান গঙ্গাগোবিন্দ রায় ও শ্রীমান বসন্তবল্লভ রায় যতদিন নাবালক

থাকিবেক, ততদিন অবিভাবকরূপে রাজ্যের পরিদর্শন কার্য নির্বাহ করিতে শ্রীযুক্ত…; তা ঠিক হলো—মামলার ফল বেরিয়ে গেলে আধাআধি বখরা হবে দুজনের—তোমার দাদার অর্ধেক আর আমার অর্ধেক, অর্থাৎ আমাদের দু'ভাইয়ের ভাগে পড়লো তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার মতন আর কি, কিন্তু একটা কথা…

বললাম—কী কথা?

—উনি বললেন, মামলা আমি জিতিয়ে দেবই। হাইকোর্ট থেকেও জিতিয়ে আনব, কিন্তু তিন-চার বচ্ছর ধরে মামলা চলবে, সেজন্য ও-চাকরি আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে রায়মশাই, নইলে পেরে উঠবেন না। এ তো আর ফোজদুরী নয়, দেওয়ানী মামলা! বাঘ নয়, একেবারে বাঘের বাবা…

বললাম—তা হলে কী করবেন, ঠিক করলেন? চাকরি ছেড়ে দেবেন?

রায়মশাই বললেন—এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে চাকরির মাথায় লাথি মেরে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। আজকে হাতের কাজগুলো সেরে নিই, কালই দরখাস্ত করে দিচ্ছি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে হাজার চারেক টাকা জমেছে, তিন-চারটে বছর ওই টাকাতে সংসার-খরচটা চালিয়ে দেব। তারপর তো…কিন্তু কাউকে যেন এখন বোলো না ভাই, তোমাকে বলেই বলছি…

কিন্তু কেমন করে জানি না, সেইদিনই সমস্ত সেক্শানের লোকের কানে গেল খবরটা!

সুধীরবাবু এসে বললেন—খবরটা সত্যি নাকি রায়মশাই?

ভূধরবাবুও জিজ্ঞেস বলেন—তা হলে সত্যিই চাকরির মায়া কাটালেন রায়মশাই?

সনাতনবাবু, অবিনাশবাবু, বিলেত-ফেরতের ভাই, ডাক্তারবাবু—সবাই কৌতূহলী। সবাই রায়মশায়ের কথাতে না হোক, আমার সমর্থন পেয়ে যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমনি হলো, যেন আমাদের জানাশোনা একজন হঠাৎ লটারিতে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে গেছে। রায়মশাই রাতারাতি সকলকে অতিক্রম করে সকলের উর্ধ্বে উঠে গেছেন। সবাই ঈর্ষার চোখে—শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো আজ রায়মশাইকে।

পরের দিন কিন্তু দরখাস্ত করা হলো না।

জিজ্ঞেস করলাম—আজকেই দরখাস্তটা করছেন তাহলে?

রায়মশাই বললেন—না, আজ আর হলো কই? ছোট বাহাদুরকে একবার জিজ্ঞেস না করে কী করে করি? তারও তো মত নেওয়া চাই,—সে-ও তো বিষয়ের অর্ধেক হিস্সের মালিক?

এর কিছুদিন পরেই চাকরিতে বদলি হয়ে বিলাসপুরে চলে গেলাম আমি।

রায়মশাই বললেন—তোমার কাছে যে কী-রকম কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম, বলতে পারবো না ভাই। এ সব তোমার জন্যেই হলো, নইলে কোনোদিন যে আবার বিষয় ফিরে পাবো, এ তো কল্পনা করতে পারিনি। তা খবর তুমি পাবে—সব তোমার দাদার কাছ থেকে। আমিও চিঠি লিখবো, মনে কোরো না, বড়লোক হয়ে গিয়ে ভুলে যাবো আফিসের বন্ধুদের। রাজাই হই, আর যা-ই হই, একসঙ্গে এত বছর কাটালুম···

তারপর কয়েক বছর বাদে অফিসের কাজে একবার হেডঅফিসে এসেছি। এসে দেখেছি, রায়মশাই সেই রেকর্ড-সেক্‌শানে, সেই চেয়ারে সেই-ভাবেই কাজ করছেন। বললাম···কী হলো আপনার? চাকরি এখনও ছাড়েন নি?

রায়মশাই বললেন—ছেড়েই দিয়েছি একরকম বলতে পারো, বসন্তও মত দিয়েছে, দরখাস্তটাও লিখে টাইপ করে রেখে দিয়েছি, পেশ করার যা দেরি—আর তোমার বৌদিও বললেন···

—বৌদি আবার কী বললেন?

—তিনি বিচক্ষণ লোক, বিচক্ষণ লোকের মতোই পরামর্শ দিয়েছেন, আমিও ভেবে দেখলাম, বসন্ত ওকালতিটা পাস করে নিক আমি চাকরিতে থাকতে থাকতে। কী বলো, ভালো বুদ্ধি নয়? আরো একজন অ্যাডভোকেটকে দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়েছি—তিনিও এক কথাই বললেন, কাগজপত্তর পরিষ্কার—দাগ নেই···

এর আরো কয়েক বছর পরে এসেছি হেড-অফিসে। এসে দেখেছি, রায়মশাই সেই রেকর্ড-সেক্‌শানে, সেই-চেয়ারে সেই-ভাবেই কাজ করছেন। আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। ভূধরবাবু প্রমোশন পেয়েছেন। অবিনাশবাবু বদ্‌লি হয়ে গেছেন। সুধীরবাবু রিটায়ার করেছেন। অফিসের অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু রায়মশাই···

এবারও জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো, চাকরি এখনও ছাড়েন নি?

রায়মশাই বললেন—এই যে, এইবার সব ঠিক করে ফেলেছি, বসন্তর বিয়েটাও দিয়ে দিয়েছি, ভারি সুলক্ষণা মেয়ে, মুলোজোড়ের বিখ্যাত দত্তবংশের নাম শুনেছ তো? সেই বংশের মেয়ে এনেছি ঘরে। এইবার এক চান্সে আইনটাও পাস করে ফেলেছে বসন্ত—এই দরখাস্তটা এনেছি আজ, বিকেলবেলা দাস-সাহেবকে নিজের হাতে দিয়ে আসবো,—আজ দিনটাও ভালো, পাঁজি দেখে নিয়েছি। এইবার চাকরির মাথায় লাথি মেরে···

ভূধরবাবু আমাকে বললেন—আরে আপনিও যেমন, একবার এ-খাঁচায় ঢুকলে আর কারো বেরুবার সাধ্যি আছে ? তা তিনি রাজাই হোন, আর নফরই হোন···

এর বছর তিনেক পরে এসে শুনলাম, একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়, ঠিক পঞ্চান্ন বছর পুরিয়ে রায়মশাই রিটায়ার করে গেছেন। এক বছরের এক্সটেন্‌শনের দরখাস্তও করেছিলেন, মঞ্জুর হয়নি। তাও প্রায় সাত মাস হয়ে গেল আজ। চেয়ে দেখলাম, সেই জায়গায় আর একটি ছোকরা বসে কাজ করছে। পুরনো লোকের মধ্যে এখন কেবল ভূধরবাবু আছেন। বললেন—রাজা গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের খবর শুনেছেন ?

ব্যাকুলভাবে বললাম—না তো ! কী খবর ?

—তিনি রিটায়ার করে গেছেন, শুনেছেন ? এক্সটেন্‌শন চেয়েছিলেন কিন্তু মঞ্জুর হয়নি। শুনেছেন ?

—তা শুনেছি, এখানে এসে শুনলাম।

—আর কিছু শুনেছেন ?

বললাম—না।

—তবে কিছুই শোনেন নি। ছোট রাজাবাহাদুর বসন্তবল্লভ রায় বিখ্যাত মূলোজোড়ের দত্তবংশের বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছেন, শুনেছেন ?

—সে কি !

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভবানীপুরে সে বাড়িভাড়া নিয়েছে, ওকালতি করে আলিপুর কোর্টে, রায়মশায়ের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সাড়ে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত মেরে দিয়ে, দাদা-বৌদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন সুধীরবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো। তিনি বললেন, রায়মশায়ের নাকি ভারি দুরবস্থা ! তাঁরা ছেলেপুলে নিয়ে হাওড়া জেলার কোন্ একটা গ্রামে আছেন—খেতে না-পাবার মতন একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। একটা পয়সা নেই, সাবালক ছেলে নেই, দুটো আইবুড়ো মেয়ে ঘাড়ের ওপর···

দীর্ঘকালের এত সব ঘটনার পর আজ মেচাদা লোকাল থেকে নেমে নির্জন প্লাটফরমে হঠাৎ রায়মশায়ের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হলাম। কিন্তু আমার কথা যেন তাঁর কানে গেল না। আমি আবার বললাম—অবাক-জলপান আছে ?

রায়মশাই এবার যেন শুনতে পেলেন। বললেন—আছে।

বলে ছেঁড়া স্যুটকেসটা খুলে একটা প্যাকেট আমাকে দিলেন। আমিও দুটো পয়সা দিলাম তাঁর হাতে।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম—আমাকে চিনতে পারেন, রায়মশাই ?

রায়মশায়ের চোখ দুটো নির্বিকার নিষ্পলক। আমিও ভালো করে দেখতে লাগলাম তাঁকে। নিস্তব্ধ প্লাটফরমের পরিপ্রেক্ষিতে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো তাঁকে। মুখে বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছেন। চোখের দৃষ্টিও উদ্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন !

হঠাৎ রায়মশাই অন্য দিকে চোখ রেখেই বলে উঠলেন—ভালো উকিল-টুকিল জানা-শোনা আছে আপনার ? ভালো উকিল ?

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে উল্টো-দিকে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো।

হারিকেন লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে জনকতক লোক এসে হাজির হলো।

একজন বললে—এই যে, মামাবাবু এখানেই···

আর একজন বললে—বার বার করে বলেছি তোমাদের, পায়ে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে রাখবে, তা তো শুনবে না···

কলকাতার ট্রেনে উঠে পকেট থেকে অবাক-জলপানের প্যাকেটটা বার করলাম। এতক্ষণে মনে পড়লো ওটার কথা। ওপরে খবরের কাগজের মোড়ক। তলায় শালপাতা নেই। কিন্তু সমস্তটা খুলে হতবাক্ হয়ে গেছি। চিনেবাদাম, ডালভাজা, কাঠি-ভাজা—কিছুই নেই। শুধু খানিকটা ধুলো-বালি আর কাঁকর···

অবাক্ জলপানই বটে !

সেগুলোর দিকে চেয়ে মনে হলো, ওগুলো ধুলো-বালি আর কাঁকর নয় শুধু, ও যেন রায়মশায়েরই জীবনের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ !

লজ্জাহর

রামায়ণের যুগে ধরণী একবার দ্বিধা হয়েছিল। সে-রামও নেই, সে-অযোধ্যাও নেই। কিন্তু কলিযুগে যদি দ্বিধা হতো ধরণী, তো আর কারো সুবিধে হোক আর না-হোক —ভারি সুবিধে হতো রমাপতির।

সত্যি, অমন অহেতুক লজ্জাও বুঝি কোনও পুরুষ মানুষের হয় না।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সবাই গল্প করছি—

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো ননীলাল। বললে—ঐ আসছে রে—

কিন্তু ওই পর্যন্ত! আমরা সবাই চেয়ে দেখলাম—রমাপতি আমাদের দেখেই আবার নিজের বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সবাই বুঝলাম—রমাপতির যত জরুরী কাজই থাক, এখনকার মতো এ-রাস্তা মাড়ানো ওর বন্ধ। বাড়িতে ফিরে গিয়ে হয়তো চুপ করে বসে থাকবে খানিকক্ষণ। তার পর হয়তো চাকরকে পাঠাবে দেখতে। চাকর যদি ফিরে গিয়ে বলে যে রাস্তা পরিষ্কার, তখন আবার বেরুতে পারবে।

বললাম—চল আমরা সরে যাই, ওর অসুবিধে করে লাভ কি?

ননীলাল বললে—কেন সরতে যাবো? এ-রাস্তা কি ওর? লেখাপড়া শিখে এমন মেয়েছেলের বেহদ্দ—আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলবো?

এমনই রমাপতি! রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে পাছে কেউ জিজ্ঞেস করে বসে—কেমন আছ? তখন-যে কথা বলতে হবে। মুখ তুলতে হবে। চোখে চোখ রাখতে হবে!

সমবয়সী বৌদিরা হাসে। বলে—ছোট ঠাকুরপো বিয়ে হলে কী করবে…

মেজ বৌদি বলে—আমাদের সামনেই মুখ তুলে কথা বলতে পারে না, তো বউ-এর সঙ্গে কী করে রাত কাটাবে, ভাই—

বাড়িতে অনেকগুলো বৌদি। কেউ কেউ কমবয়সী আবার। তারা নিজের নিজের স্বামীর কথাটা কল্পনা করে নেয়। যত কল্পনা করে তত হাসে। অন্য সব ভাইরা সহজ স্বাভাবিক মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু রমাপতি।

শুনতে পাই বাড়িতেও রমাপতি নিজের নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ঘরের মধ্যে বসে কী করে কারো জানবার কথা নয়। খাবার ডাক পড়লে

একবার খেয়ে আসে। তরকারিতে নুন না-হলেও বলবে না মুখে। জলের গ্লাস দিতে ভুল হলেও চেয়ে নেবে না। পৃথিবীকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন ভালো।

এক এক দিন হঠাৎ বাড়ি আসার পথে দূর থেকে দেখতে পাই হয়তো রমাপতি হেঁটে আসছে। সোজা ট্রাম-রাস্তার দিকেই আসছে। তার পর আমাকে দেখতে পেয়েই পাশের গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। পাঁচ মিনিটের রাস্তাটা ত্যাগ করে পনেরো মিনিটের গলিপথ দিয়েই উঠবে ট্রাম-রাস্তায়।

কিন্তু তবু অতর্কিতেও তো দেখা হওয়া সম্ভব!

গলির বাঁকেই যদি দেখা হয়ে যায় কোনও চেনা লোকের সঙ্গে! হয়তো মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন পাড়ার প্রবীণতম লোক। জিজ্ঞেস করে বসলেন—এই-যে রমাপতি, তোমার বাবা বাড়ি আছেন নাকি?

নির্দোষ নির্বিরোধ প্রশ্ন। আততায়ী নয় যে ভয়ে আঁতকে উঠতে হবে। পাওনাদার নয় যে মিথ্যে বলার প্রয়োজন হবে। একটা 'হাঁ' বা 'না'—তাও বলতে রমাপতির মাথা নীচু হয়ে আসে, কান লাল হয়ে ওঠে; কপালে ঘাম ঝরে। সে এক মর্মান্তিক যন্ত্রনা যেন। তার পর সেখান থেকে এমন ভাবে সরে পড়ে, যেন মহা বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।

ছোটবেলায় রমাপতি একবার কেঁদে ফেলেছিল।

তা ননীলালেরই দোষ সেটা।

একা-একা রমাপতি চলেছিল কালীঘাট স্টেশনের দিকে। ও-দিকটা এমনিতেই নিরিবিলি। বিকেলবেলা ট্রেন থাকে না। চারিদিকে যতদূর চাও কেবল ধু-ধু ফাঁকা। বড় প্রিয় স্থান ছিল ওটা রমাপতির। আমরা জানতাম না তা।

দল বেঁধে আমরাও ওদিকে গেছি। ধূমপানের হাতেখড়ির পক্ষে জায়গাটা আদর্শস্থানীয়। হঠাৎ নজরে পড়েছে সকলের আগে বিশ্বনাথের। বললে—আরে, রমাপতি না—?

সকলে সত্যিই অবাক্ হয়ে দেখলাম—দূরে রেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে একা-একা চলেছে রমাপতি। আমাদের দিকে পেছন ফেরা। দেখতে পায় নি আমাদের।

দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চাপলো ননীলালের। বললে—দাঁড়া, এক কাজ করি—ওর কাছা খুলে দিয়ে আসি—

যে-কথা সেই কাজ। তখন কম বয়েস সকলের। একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে পারার উল্লাসে সবাই উন্মত্ত। ননীলালের উপস্থিতি টের পায় নি রমাপতি। ননীলালের রসিকতার সিদ্ধিতে সবাই মাঠ কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠেছি।

কিন্তু রমাপতির কাছে গিয়ে মুখখানার দিকে চেয়ে ভারি মায়া হলো। রমাপতি হাউ হাউ করে কাঁদছে।

সে-গল্প বিয়ের পর প্রমীলার কাছেও করেছি।

প্রমীলা বলে—আহা বেচারা, তোমরাই ওকে ওমনি করে তুলেছ—

সেদিন প্রমীলা বললে—ওই বুঝি তোমাদের রমাপতি—এসো এসো—ছাখো—দেখে যাও —

বললাম—ওকে তুমি চিনলে কী করে?

প্রমীলা বললে—ও না হয়ে যায় না, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি—একবার মুখ তুলে পর্যন্ত চাইলে না ওপর দিকে, ও-বয়সে এমন দেখা যায় না তো—

বারান্দার কাছে গিয়ে দেখি সত্যি ঠিকই চিনেছে। রমাপতিই বটে।

বললাম—সরে এসো, নইলে মূর্ছা যাবে এখনি—

তা অন্যায়ের কিছু বলি নি আমি।

ক্লাস সেভেন এ গুড-কন্‌ডাক্টের প্রাইজ পেয়েছিল রমাপতি। মোটা মোটা তিনখানা ইংরিজি ছবির বই। সেই প্রথম আমাদের স্কুলে ও-প্রাইজের প্রচলন হলো। স্কুলের হল্‌-এ লোকারণ্য। আমরা স্কুলের ছাত্রেরা সেজেগুজে গিয়ে একেবারে সামনের বেঞ্চিতে বসেছি। আমরা খারাপ ছেলের দল সবাই। কেউ প্রাইজ পাবো না। কমিশনার ম্যাকেয়ার সাহেব নিজের হাতে সবাইকে প্রাইজ দিচ্ছেন। এক এক জন করে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর প্রাইজ নিয়ে প্রণাম করে নিজের জায়গায় এসে বসছে।

তার পর ম্যাকেয়ার সাহেব ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিন্‌হা···

কেউ হাজির হলো না।

সাহেব আবার ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিন্‌হা—

সেক্রেটারি পরিতোষবাবু এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। হেডমাস্টার কৈলাস-বাবুও একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন আমাদের দিকে, তার পর নীচু গলায় কী বললেন সাহেবকে গিয়ে। তার পর থেকে গুড-কন্‌ডাক্টের প্রাইজটা বরাবর রমাপতিই পেয়ে এসেছে। কিন্তু কখনও সভায় এসে উপস্থিত হয় নি। সে-সময়টা কালীঘাট স্টেশনের নিরিবিলি রেল-লাইনটার পাশের রাস্তা ধরে একা-একা ঘুরে বেড়িয়েছে সে।

এর পর আমরা একে একে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে ঢুকেছি। একা রমাপতি আই-এ পাস করেছে, বি-এ পাশ করেছে। আমাদের সঙ্গে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা যদিই-বা হয় তো সে একতরফা!

দেখা না হলেও কিন্তু রমাপতির খবর নানাসূত্রে পেয়ে থাকি। চুল ছাঁটতে ছাঁটতে কানাই নাপিত বলেছিল—ছোটবাবু, দাড়িটা এবার কামাতে সুরু করুন—আর ভালো দেখায় না—

আমরা তখন সবাই ক্ষুর ধরেছি। কিন্তু রমাপতি তখনও একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে দিব্যি মুখ ঢেকে বেড়ায়।

কানাই এ-বাড়ির পুরনো নাপিত। পৈতৃক নাপিত বলা যায়। রমাপতিকে জন্মাতে দেখেছে।

বললে—নতুন ক্ষুরটা আপনাকে দিয়েই বউনি করি আজ—কী বলেন ছোটবাবু?

রমাপতি মুখ নীচু করে খানিকক্ষণ ভেবে বলেছিল—না না, ছিঃ—লোকে কী বলবে—

কানাই নাপিত বলেছিল—লোকের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেইতো—আপনার দাড়ি নিয়ে যেন মাথা ঘামাচ্ছে সব—

—না থাক রে, সামনে গরমের ছুটি আসছে সেই সময় কলেজ বন্ধ থাকবে—তখন দিস বরং কামিয়ে—

হঠাৎ যেদিন প্রথম দাড়ি-গোঁফ-কামানো চেহারা দেখলাম—সেদিন ঠিক চিনতে পারি নি। ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকে চলেছে রমাপতি। আমাকে দেখে হঠাৎ গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে। নতুন জুতো পরতে লজ্জা! নতুন জামা পরতে লজ্জা! ওর মনে হয় সবাই ওকে দেখছে যেন।

উমাপতিদার বিয়েতে বৌভাতের নিমন্ত্রণে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—সেজদা, রমাপতিকে দেখছিনা যে—সে কোথায়—

সেজদা বললে—সে তো সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, সব লোকজন বিদেয় হলে রাত্তিরের দিকে বাড়ি ঢুকবে—

এ পাড়ায় মেয়েরা পরস্পরের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাসটা রেখেছে। যেদিন দুপুরবেলা কেউ এল বাড়িতে, রমাপতি বাইরের সিঁড়ি দিয়ে টিপি-টিপি পায় বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। রাস্তায় বেরিয়ে কোনও রকমে ট্রামে-বাসে উঠে পড়তে পারলেই আর ভয় নেই। সব অচেনা লোক। অচেনা লোকের কাছে বিশেষ লজ্জা নেই তার!

বড় যদুপতির শ্বশুর এ বাড়িতে কাজে-কর্মে ছাড়া বড় একটা আসেন না। মেজ উমাপতির শ্বশুরমশাই মারা গেছেন বিয়ের আগে। সেজ ভাই উমাপতির শ্বশুর নতুন—মেয়ে এখানে থাকলে রবিবার রবিবার দেখতে আসেন। তিনি আবার একটু কথা বলেন বেশি।

বাড়ির সকলকে ডাকা চাই। সকলের সঙ্গে কথা কওয়া চাই। সকলের খোঁজ খবর নেওয়া চাই। মেয়েকে বলেন—হ্যাঁরে, তোর ছোট দেওরকে তো কখনও দেখতে পাই না—এতদিন ধরে আসছি—

মেয়ে বলে—ছোট ঠাকুরপোর কথা বোলো না বাবা, তুমি রবিবারে আসবে শুনে সকালবেলাই সেই যে বেরিয়ে গেছে বাইরে—আর আসবে সেই দুপুরবেলা বারোটার সময়, তা-ও বাড়ির বাইরে থেকে যদি বুঝতে পারে তুমি চলে গেছ—তবে ঢুকবে, নইলে একঘণ্টা পরে আবার আসবে—

উমাপতিদার শ্বশুর হাসেন। বলেন—কেন রে, আমি কী করলাম তার!

মেয়ে বলে—তুমি তো তুমি, বাড়ির লোকের সঙ্গেই কখনও কথা বলতে শুনি নি—ছোট ঠাকুরপো বাড়িতে থাকলেই টের পাওয়া যায় না ঘরে আছে কি নেই—

উমাপতির শ্বশুর কী ভাবেন কে জানে! কিন্তু এ বাড়ির লোকের কাছে এ ব্যাপার গা-সওয়া।

মা বলেন—তোমরা কিছু ভেবো না বৌমা, রমা আমার ওই রকম—আমার সঙ্গেই লজ্জায় বলে কথা বলে না—

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও একেবারে মিথ্যে নয়।

স্বর্ণময়ীর সেবার ভীষণ অসুখ হয়েছিল। ছেলেরা রাতের পর রাত জেগে মায়ের সেবা করতে লাগলো। বউদেরও বিশ্রাম নেই। ডাক্তারের পর ডাক্তার আসে। ইনজেকশন, ওষুধ, বরফ—অনেক কিছু!

একটু সেরে উঠে স্বর্ণময়ী চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন—রমা কোথায়?

রমাপতি তখন ঘরে বসে বই পড়ছিল দরজা ভেজিয়ে দিয়ে।

বড়দা একেবারে ঘরে ঢুকে বললেন—মার এতবড় একটা অসুখ গেল, আর তুমি একবার দেখতেও গেলে না—

দাদার কথায় রমাপতি অবশ্য গেল দেখতে মাকে। রোগীর ঘরে তখন বাড়ির লোক, আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। রমাপতি কিন্তু কিছুই করলো না। কিছু কথাও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। চুপচাপ গিয়ে খানিকক্ষণ সকলের পেছনে দাঁড়ালো সসঙ্কোচে। তার পর কেউ দেখে ফেলবার আগেই পালিয়ে এসেছে আবার নিজের ঘরে।

স্বর্ণময়ীর সে-কথা এখনও মনে আছে। বলেন—তোমরা ভাবো ওর বুঝি মায়া-কিছু নেই—আছে, বৌমা, সেদিন নিজের চোখে দেখলাম যে—দোতলার বারান্দায় মেজ বৌমার ছেলে ঘুমোচ্ছিল, কেউ কোথাও নেই, রমু আমার দেখি ছেলের গাল

টিপে দিচ্ছে—মুখময় চুমু খাচ্ছে, সে যে কী আদর কী বলবো তোমাদের, রমু যে আমার ছেলেপিলেদের অমন আদর করতে পারে আমি তো দেখে অবাক,···তার পর হঠাৎ আমায় দেখে ফেলতেই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল—

প্রতিবেশীরা বেড়াতে এসে বলে—তোমার ছোট ছেলের বিয়ে দেবে না, দিদি— ?

স্বর্ণময়ী বলেন—রমুর বিয়ের কথা ভাবলেই হাসি পায় মা,—ও আবার সংসার করবে, ছেলেপিলে হবে ! যার কাছা খুলে যায় দিনে দশবার, তরকারিতে নুন না হলে বলবে না মুখ ফুটে, এক গেলাস জল পর্যন্ত চেয়ে খাবে না, একবারের বদলে দু'বার ভাত চেয়ে নেবে না···

তা এই হলো রমাপতি। রমাপতি সিংহ। একে নিয়েই আমাদের গল্প।

আমার এক আত্মীয় একদিন টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন বাড়িতে।

বললেন—তোমাদের পাড়ায় রমাপতি সিংহ বলে কোনো ছেলেকে চেন ?

বললাম—চিনি, কিন্তু কেন ?

তিনি বললেন—ছেলেটি কেমন ? আমার রেবার সঙ্গে মানাবে ?

রেবাকে চিনতাম। আই-এ'তে দশটাকার স্কলারশিপ পেয়েছিল। থার্ড ইয়ারে পড়ছে। বেশ স্মার্ট মেয়ে। বাবার কাছে মোটর চালানো শিখে নিয়েছে। অটোগ্রাফের খাতায় জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে কোনও লোকের সই আর বাদ নেই। নিজে ক্যামেরায় ছবি তোলে। ভায়োলিন বাজিয়ে মেডেল পেয়েছে কলেজের মিউজিক কমপিটিশনে। মোট কথা, যাকে বলে কালচার্ড।

আমি সেদিন সম্মতি দিলে বোধ হয় বিয়েটা হয়েই যেত। পাত্র হিসেবে রমাপতি খারাপই বা কী ! নিজে শিক্ষিত। কলকাতায় নিজেদের তিনখানা বাড়ি। সংসারে ঝামেলা নেই কিছু। বোনদেরও সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। চার ভাই-ই বেশ উপার্জনক্ষম। ভাইদের মধ্যে মিলও খুব।

রেবার মা বলেছিলেন—কিন্তু কেন যে তুমি আপত্তি করছো বাবা, বুঝতে পারছি না—

আমি বলেছিলাম—রেবাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন মাসিমা, এ-সব শুনেও যদি মত দেয় তো···

কিন্তু রেবাই নাকি শেষ পর্যন্ত মত দেয় নি।

আজ ভাবছি সেদিন সম্মতি দিলেই হয়তো ভালো করতাম। শেষ পর্যন্ত রেবার

বিয়ে হয়েছিল এক বিলেত-ফেরত অফিসারের সঙ্গে, তার পর সে ভদ্রলোক শেষকালে···কিন্তু সে-কথা এ-গল্পে অবান্তর।

এর পর ননীলাল এসে খবর দিয়েছিল—ওরে, রমাপতির বিয়ে হচ্ছে যে—

আমরা সবাই অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—সে কি! কোথায়?

ননীলাল বললে—খবর পেলাম, এবার আর কলকাতায় সম্বন্ধ নয়—জব্বলপুরে—

জব্বলপুরে কার মেয়ে, মেয়ে কী করে—সব খবর ননীলালই বার করলে।

শেষে একদিন বললে—ভাই, চোখের ওপর নারীহত্যা দেখতে পারবো না—আমি ভাঙচি দেবো—

সত্যিসত্যি-ই ননীলাল ঠিকানা যোগাড় করে বেনামী চিঠি দিলে একটা: আপনারা যাকে পছন্দ করেছেন তার সম্বন্ধে কলকাতায় এসে পাড়ার লোকের কাছে ভালো করে সংবাদ নেবেন। নিজেদের মেয়েকে এমন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেবেন না—ইত্যাদি অনেক কটু কথা।

বিয়ে ভেঙে গেল।

শুধু সেইবারই প্রথম নয়। যতবারই ননীলাল বা আমরা কেউ সংবাদ পেয়েছি, চিঠি লিখে বিয়ে ভেঙে দিয়েছি। আমাদের সত্যিই মনে হয়েছে রমাপতির সঙ্গে বিয়ে হলে সে মেয়ের জীবনে বিড়ম্বনার আর অবধি থাকবে না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিনা-ঘোষণায় রমাপতির বিয়ে হয়ে গেল।

কেউ কোনও সংবাদ পায় নি। মাত্র একদিন আগে আমার কানে এল খবরটা।

প্রমীলাও বহরমপুরের মেয়ে। বললাম—বহরমপুরের কমল মজুমদারকে চেন নাকি? খুব বড় উকিল? তাঁর মেয়ে প্রীতি মজুমদার?

প্রমীলা চম্‌কে উঠলো।

—প্রীতি? আমরা তাকে ডাকতাম বেবি বলে।—বহরমপুরের বেবি মজুমদারকে কে না চেনে—একটা চোদ্দ বছরের ছেলে থেকে সুরু করে ষাট বছরের বুড়ো সবাই চিনবে তাকে, বেবি টেনিসে তিনবার চ্যাম্পিয়ন, ওকে চিনবো না—

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। চিঠি লিখে জানালেও একদিন পরে খবর পাবে। ননীলাল শুনে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

তবু যেন কেমন সন্দেহ হলো। তারা শেষকালে আর পাত্র পেলে না খুঁজে! শেষে এই আকাট ছেলেটার হাতে পড়বে! আর কোনও প্রীতি মজুমদার আছে নাকি বহরমপুরে?

প্রমীলা বললে—মজুমদার অবিশ্যি আরো আছে ওখানে—কিন্তু খবর নাও দিকিনি ওর নাম বেবি কিনা—

তখন আর খবর নেবারই বা সময় কোথায়।

প্রমীলাও যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে—বেবির সঙ্গে বিয়ে হবে শেষকালে তোমাদের রমাপতির—সে-যে ভারি খুঁতখুঁতে মেয়ে—গোঁফওয়ালা ছেলেদের মোটে দেখতে পারতো না, ওর প্রাইভেট টিউটার ছিল বদ্যিনাথবাবু, তাকেই ছাড়িয়ে দিলে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোর মাস্টারকে ছাড়ালি কেন? ও বলেছিল—বড্ড বড় বড় গোঁফ বদ্যিনাথবাবুর, ওই গোঁফ দেখলে আমার ভয় পায়।—তা তুমিও তাকে দেখেছ তো—

বললাম—কোথায়?

—কেন, সেই-যে বাসরঘরে?

বাসরঘরে কত মেয়েই এসেছিল, সকলকে মনে থাকার কথা নয় আজ। তবু মনে করতে চেষ্টা করলাম।

প্রমীলা আবার মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করলে—মনে পড়ছে না তোমার? সেই-যে কালো জমির ওপর জরির-কাজ করা শিফন শাড়ি পরে এসেছিল, লংস্লিভের সাদা লিনেনের ব্লাউজ পরা, খুব কথা বলছিল ঠেস দিয়ে-দিয়ে—মনে নেই?

তবুও মনে পড়লো না!

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—বিয়ের পরদিন মা জিজ্ঞেস করেছিল—কেমন জামাই দেখলে, বেবি! বেবি বলেছিল—ভালো। কিন্তু আমাকে বলেছিল—তোর বর ভালোই হয়েছে মিলি, কিন্তু আর একটু লম্বা হলে ভালো হতো—

যে-মেয়ে এত খুঁতখুঁতে, তার সঙ্গে রমাপতির কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না!

প্রমীলাও সন্দেহ প্রকাশ করলো। না না, সে মেয়ে হতেই পারে না—অন্য কোনো প্রীতি মজুমদার হবে, দেখো—

কখন বিয়ে করতে গেল রমাপতি—কেউ জানতে পারলো না। ভোরের ট্রেন। রাত থাকতে থাকতে উঠে একজন পুরুত আর দু'চার জন আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেছে। বউ যখন এল তখনও বেশ রাত হয়েছে। অনেকেই তখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বার ব্যবস্থা করছে। শাঁখের আওয়াজ পেয়ে প্রমীলা উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো একবার। আমিও উঠে গেলাম।

বাড়ির লোকজনের ভিড়ের ভেতর ঘোমটা-টানা বউটিকে দেখতে পেলাম না

ভালো করে। আর রমাপতিও যেন টোপরের আড়ালে নিজেকে গোপন করে ফেলতে চেষ্টা করছে। মনে হলো—লজ্জায় চোখদুটো সে বুঁজিয়ে ফেলেছে। কোনও রকমে এতদূর এসেছে সে বরবেশে, কিন্তু পাড়ার চেনা লোকের ভিড়ের মধ্যে সে যেন মর্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করছে।

আমাদের বাড়ি থেকে একা আমারই নিমন্ত্রণ ছিল।

অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি ফিরতেই প্রমীলা ধরলে—কেমন বউ দেখলে—আমাদের বেবি নাকি ?

বললাম—কী জানি, চিনতে পারলাম না—কিন্তু যার বিয়ে তারই দেখা পেলাম না—

—সে কি ?

—সে যে কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে—অনেক চেষ্টা করলাম দেখতে, কিছুতেই দেখা পেলাম না।

পরদিন সেই কথাই আলোচনা হলো।

ননীলালকে জিজ্ঞেস করলাম—বউ দেখলি রমাপতির ?

ননীলাল যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর। বললে—বউটার কপালে দুঃখ্যু আছে ভাই—বেচারি ওর হাতে পড়ে মারা যাবে দেখিস—

জিজ্ঞেস করলাম—রমাপতিকে দেখলি কাল ?

কেউ দেখতে পায় নি। সমস্ত লোকজন আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি থেকে সরে গিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রইল রমাপতি, সেই-ই এক সমস্যা। বিশ্বনাথ বললে—সে-ও দেখে নি।

কিন্তু কনক বললে—আমি দেখেছি।

—কোথায় ?

—দেখলাম, মিষ্টির ভাঁড়ারে গেঞ্জি গায়ে ওর পিসির কাছে তক্তপোশের ওপর বসে রয়েছে—জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে—

কানাই নাপিতকে চেপে ধরলাম। সে বরের সঙ্গে গিয়েছিল।

সে তো হেসে বাঁচে না। বলে—ছোটবাবুর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক্ সেখানে—

—সে কী রে—

—আজ্ঞে, সবাই বলে বর বোবা নাকি ? কনের বাড়ির মেয়েছেলেরা খুব নাকাল

করেছেন ছোটবাবুকে সারা রাত, মাঝরাতে বাসরঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছোটবাবু আমার কাছে হাজির। আমি ছাতের এক কোণে ঘুমোচ্ছিলাম, ছোটবাবু চৌপর রাত সেই ছাতে বসে কাটাবে আমার কাছে—কিন্তু মেয়েছেলেরা শুনবেন কেন? তাঁরা আমোদ-আহ্লাদ করতে এয়েছেন···

কিন্তু পরদিন প্রমীলার কাছে যা শুনলাম তাতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল। প্রমীলা ভোরবেলা উঠেই ওদের বাড়ি গিয়েছিল। আর ফিরে এল বেলা দশটার সময়।

বললাম—এত দেরি হলো? দেখা হয়েছে?

প্রমীলা বললে—গেছি বউ দেখতে, আর না-দেখে ফিরে আসবো? গিয়ে বললাম—মাসিমা, তোমার বউ দেখতে এলাম—কাল শরীর খারাপ ছিল আসতে পারি নি—

মাসিমা বললে—ছেলে-বউ তো এখনও ঘুমোচ্ছে—তা বোস মা একটু—

তা দরজা খুললো বেলা ন'টার সময়। তোমার বন্ধু তো আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল কোথায়। বেবি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছে। আমাকে দেখেই বললে—মিলি, তুই—!

তার পরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো আমায়। দেখলাম—সমস্ত বিছানাটা একেবারে ওলোট পালোট। নতুন খাট-বিছানা; নয়নসুখের চাদর, বালিশের ওয়াড়। পাশাপাশি দুটো বালিশ একেবারে সিঁদুরে মাখামাখি। বেবির মুখে-গালেও সিঁদুরের দাগ।···বিছানায় শুকনো ফুল ছড়ানো—

আমি হাসছিলাম দেখে বেবি জিজ্ঞেস করলে—হাসছিস যে?

বললাম—সারা রাত ঘুমোস নি মনে হচ্ছে—

বেবি বললে—ঘুমোতে দিলে তো—বলে মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

আমিও স্তম্ভিত। বললাম—বললে ওই কথা?

—তার পর শোনোই তো—

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—তার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোর বর কেমন হলো? তা শুনে কী উত্তর দিলে জানো?

বললাম—কী?

প্রমীলা বললে—প্রথমে বেবি কিছু বললে না, মুখ টিপে হাসতে লাগলো, তার পর আমার কানের কাছে মুখ এনে হাসতে হাসতে বললে—বড় নির্লজ্জ, ভাই···

জেনানা সংবাদ

বিলাসপুরের ডি-এল-এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তি মারা গেল। মারা গেল যত হঠাৎ, তত হঠাৎ, কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়লো না। কৃষ্ণমূর্তি যতখানি ছিল বাঙালী-বিদ্বেষী ঠিক ততখানি ছিল মাদ্রাজী-বিদ্বেষী। অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্তির বউ ছিল বাঙালী মেয়ে।

কথা উঠলো—দায়িত্বটা নেবে কে। এমন ক্ষেত্রে না 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন' না 'সাউথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' কারোরই মাথাব্যথা হবার কথা নয়। কারণ কৃষ্ণমূর্তি না-বাঙালী না-মাদ্রাজী। তার আট-দশটা নাবালক ছেলেমেয়ে আর বিধবা বাঙালী বউ-এর ভারটা নেবে তা হলে কে? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কয়েকশো টাকা ছাড়া বেচারার নির্ভর করবার আর কিছু নেই। বিগতপ্রাণ কৃষ্ণমূর্তি আর তার বিগতশ্রী পরিবারের প্রসঙ্গটা ঘটনাক্রমে রটনায় পর্যবসিত হলো।

রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের করিডরে বসে অফিসারদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আজাইব সিং বললেন—বাঙালী মেয়েরা কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আইডিয়াল—

টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—আমি তা হলে সত্যি কথাই বলি—তেমন বাঙালী মেয়ে যদি পেতাম তা হলে আমাকে আর আজীবন ব্যাচিলর থাকতে হতো না—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার। বললেন—কিন্তু যাই বলো—বাঙালী মেয়েরা বড় ঘর-কুনো, ওই স্বামীটি আর নিজের সংসারটিই কেবল চেনে তারা—

সোনপার সাহেব সিন্ধী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল বাঙালী। গান জানতো। শান্তিনিকেতনে পড়া। বললেন—আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে মুদেলিয়ার গারু, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও অজ পাড়াগাঁয়েও যদি কোনো ভারতীয় মহিলাকে দেখতে পান, জানবেন সে বাঙালী মেয়ে—

মুদেলিয়ার দমবার পাত্র নন। দুপাশে মাথা হেলাতে লাগলেন। বললেন—তা হলে বলুন-না কেন মাহেঞ্জোদারোতে যে নাচওয়ালীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে-ও বাঙালী মেয়ের কঙ্কাল—

পাশের হল্-এ বিলিয়ার্ডখেলার গোলমাল শোনা যায়। আর করিডর-এর খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নজরে পড়ে ইন্‌ষ্টিটিউটের বিরাট লন। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। তীব্র আলো জ্বালিয়ে লন-এর ওপর দুদলের ব্যাডমিণ্টন খেলা চলছে।

আর দিল্লী স্টেশনের উর্দু-ঠুংরি গান চলেছে রেডিওতে। এতক্ষণে বোধ হয় ওয়ান-ডাউন এল, আজ বুঝি বম্বে-মেল লেট্। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে টিমটিমে ল্যাম্প জেলে সার সার টাঙ্গাগুলো শনিচরী বাজারের দিকে ছুটে চলেছে।···

সোনপার সাহেব বললেন—আপনি কিছু বলছেন না, মেটা সাহেব—গুরুবচন মেটা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এখানকার পি-ডব্লিউ-আই, রেল-লাইনের তদারক করা কাজ তাঁর। আজীবন ব্যাচিলর। শেয়ালকোটের কোন্ গ্রাম থেকে কবে সি-পি'তে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন কেউ জানে না। তবু রসিকপুরুষ হিসেবে বন্ধুমহলে তাঁর সুখ্যাতি আছে।

স্টেশনমাস্টার মুদেলিয়ার বললেন—আপনি কিছু মতামত দিন মেটা সাহেব—

জুন মাসের মাঝামাঝি। এবার এখনও 'মনসুন' আরম্ভ হলো না! গুরুবচন মেটা আকাশের দিকে চেয়ে সকলের গল্প শুনছিলেন।

বললেন—আমি ব্যাচিলর মানুষ, তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকা অপরাধ—তা ছাড়া বেঙ্গলে কখনও যাই নি—কলকাতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছুই নেই—বাঙালী মেয়ে বলতে দেখেছি শুধু সরোজিনী নাইডুকে—জব্বলপুরে যেবার কংগ্রেসের মিটিং-এ এসেছিলেন—

টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—সরোজিনী নাইডু? হার এক্সেলেন্সী···

গুরুবচন মেটা বললেন—তবে অনেক বছর আগে একজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—জব্বলপুরে—

সবাই বললেন—বলুন, বলুন—

গুরুবচন মেটা বলতে শুরু করলেন—আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, সমস্ত বাঙালী মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো ভুল করবেন। মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা কম, তার ওপর বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কম। কারণ প্রথমত আমি বাঙালী নই, বাঙলাদেশে কখনও যাই নি—তার পর আমার অভিজ্ঞতা শুধু একটিমাত্র বাঙালী মেয়েতেই সীমাবদ্ধ—

টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—তা হোক—বলুন মিঃ মেটা—ভেরি ইণ্টারেস্টিং—

মেটা বললেন—আমার মতে আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় যে, সব প্রদেশ-বাসীরাই বাঙালী মেয়েদের বউ করে পেতে চায়, তো তার প্রধান কারণ হলো বাঙালী মেয়েদের রান্না। অমন সুস্বাদু রান্না করতে আর কোনও জাতের মেয়েরা পারে না—

—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং—তার পর? বুড়ো এণ্টনি বললে।

—তবে একটা কন্‌ডিশন, গল্পটা আমি যেখানে শেষ করবো, তার পরে আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না—আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয় জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক—কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে—সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়—তাতে আপনারা রাজী ?—গুরুবচন মেটা সকলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন।

সোনপার সাহেব সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—রাজী আমরা—আপনি বলুন—

রেডিওতে বুঝি এবার ইংরিজী প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। রেকর্ডে জ্যাজ্ অর্কেস্ট্রা। সামনের লন-এ ব্যাডমিণ্টন খেলা বন্ধ হলো। কাট্‌নি ব্রাঞ্চের শেষ গাড়িটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। এতক্ষণে সেখানা বোধ হয় পেণ্ড্রা রোডের পথে অমরকণ্টকের রেঞ্জ-এর গা দিয়ে টানেল পার হচ্ছে। পূর্বদিকে প্লাটফরমের উপর গোস্ রুটি আর চায় গরমের হল্লা নেই। প্লাটফরমের তালগাছপ্রমাণ লাইট-পোস্টটার আগাপাস্তলা শুধু পোকায় পোকা।···

গুরুবচন মেটা বলতে আরম্ভ করলেন—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা —আমি তখন থাকি আমাদের জব্বলপুরের বাড়িতে। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে সবে লায়ালপুরে চলে গেছে—আমি থাকি সারা বাড়িটাতে একলা—মাঝে মাঝে বাবার দালালী ব্যবসাটা নিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়—কখনও নাইনপুর, গণ্ডিয়া, ছিন্দোয়াড়া, আর বালাঘাট—ন্যারো গেজের সমস্ত সেক্‌শনগুলো.. আবার কখনও ভুসাওয়াল, ইগ্‌তপুর, বীণা, এলাহাবাদ-কট্‌নি···সাতদিন আটদিন পরে হয়তো একদিন বাড়ি এলাম···আবার একদিন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি টুপ করে—

কাজের মধ্যে কাজ ওই দালালী ব্যবসা, আর ফুর্তি বলুন আর যাই বলুন একমাত্র রিক্রিয়েশন শিকার করা···

তা বাবারও ছিল শিকারের শখ, আমারও তাই। বাবার দুটো ডবল-ব্যারেল বন্দুক পেয়েছিলাম আমি, একটা বারো বোরের আর একটা ষোলো বোরের···আর নিজে কিনেছিলাম একটা রাইফেল—ফোর-ফিফ্‌টি—

যখনি ট্যুর-এ যেতাম—ওটা থাকতো সঙ্গে। কখনও কখনও তেমন জায়গায় গিয়ে পড়লে হাতিয়ার-অভাবে যেন বেকুব না হই। একবার অনুপপুর থেকে নেমে মাইল তিনেক দূরে এক নদীর ধারে মাচা বাঁধা হলো বাঘ মারবার জন্যে—উত্তর আর

পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা আর শোণ সেখানে এসে মিশেছে—জায়গাটা বাঘ শিকারের পক্ষে আইডিয়াল……বিকেলবেলা উঠলাম গিয়ে মাচার ওপর আমি, পেণ্ড্রা-রোডের ঠাকুরসাহেবের ছেলে নর্মদাপ্রসাদ—সে-ও ভালো শিকারী—আর আমাদের 'কিল্'টা রাখা হলো ঠিক…

কিন্তু যাক্‌গে, আমার গল্পে ও-সব অবান্তর প্রসঙ্গ। আমার এ-গল্প তো শিকার-কাহিনী নয়, এ-গল্প মেয়েমানুষ নিয়ে—সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি—

আপনারা হাওহাগ স্টেশন দেখেছেন? স্টেশনে নেমে সোজা পূবদিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে—ডাইনে বাঁয়ে ছোট-বড় অনেক রাস্তাই গেছে—কিন্তু যে-রাস্তাটা বি-এন-আরের মস্ত প্রকাণ্ড মাঠটা ঘুরে বেঁকে সোজা গেছে দক্ষিণ-মুখো, আমি সেই রাস্তাটার কথা বলছি…এখন অবশ্য অনেক বাড়ি হয়েছে ওখানে, রেফিউজিরা ভিড় করেছে, আশেপাশের জলাজমিগুলোও ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ও-তল্লাট অমন ছিল না—ওই রাস্তায় ঢোকার মুখে ডানদিকে ছিল শুধু 'সানি-ভিলা', কতকগুলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকতো ওই বাড়িটাতে, আর তার পর ঝোপ-জঙ্গল, কয়েকটা কবর আর সামনে বি-এন-আরের জমিতে বিরাট বিরাট আম গাছ—আর তারই বাঁকে পশ্চিম-মুখো 'শিয়ালকোট লজ'—আমার বাড়ি। সামনে ধরুন বাগান এককালে ছিল, কিন্তু তখন তত কিছু বাহার ছিল না, শুধু গোটাকতক আগাছা ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। তবু দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের রাস্তা আর আশেপাশের সব কিছুই দেখা যায়।

একদিন আমার একতলাটায় একটা ভাড়াটে এল।

এ-পাড়ার দিকে ভাড়াটে বড় একটা আসে না। কারণ এখান থেকে ফ্যাক্টরি অনেক দূর। তার পর জি-আই-পি স্টেশন থেকে এখানে আসতে গেলে রিক্সা করতে হবে। বাজার-হাট সব দূর। বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে গেলে তখনকার দিনে আরো অসুবিধে।

কিন্তু তবু একটা ফ্যামিলি এল। বাঙালী ফ্যামিলি।

কুড়ি টাকা ভাড়া। একমাসের ভাড়া অ্যাডভান্স-ও দিয়ে দিলে। রসিদটার নীচে সই দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন নিজে। বাড়িভাড়া হয়েছে স্ত্রীর নামে—

আজাইব সিং বললেন—স্বামীনাথন! বাঙালী 'সারনেম' তো অমন শুনি নি কখনও, ব্রাদার—

সোনপার সাহেব বললেন—হয়—হয়—মেটা ইজ রাইট—আমার ফার্স্ট ওয়াইফ-

এর কাছে শুনেছি—বাঙালী জাতটা যেমন পিকিউলিয়র, ওদের সারনেম-গুলোও তেমনি পিকিউলিয়র—আমি জানি আমার ওয়াইফ-এর একজন কাজিন ছিল, তার সারনেম 'গোস্'—

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন—তা কেন—স্বামীনাথন কখনও কোনও বাঙালীর সারনেম হতে পারে না—ওটা আমাদেরই একচেটে—

সোনপার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—ওটা একটা মাইনর পয়েণ্ট—আপনার সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পটা বলুন, মিস্টার মেটা—

গুরুবচন মেটা বললেন—সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পই তো বলছি, স্বামীনাথন হলো তার হাসব্যাণ্ড-এর সারনেম—মিসেস স্বামীনাথন একজন বাঙালী মেয়ে, বিয়ে করেছিল হ্যারি স্বামীনাথনকে—ম্যাড্রাসী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান—

টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—সো ভেরি ইন্টারেস্টিং······আমাদের ডি-এল-এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তির মতো—তার পর—তার পর ?

গুরুবচন মেটা বললেন—কিন্তু তার আসল নাম হলো—

বলতে গিয়ে গুরুবচন মেটা নিজেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন—আসল নামটা আপনাদের আগে বলে দিয়ে আর একটু হলে ভুল করছিলাম। কারণ আসল নামটা কি আমারই জানবার কথা ? একদিন কি দুদিন মাত্র দেখেছি ওদের—তা-ও দু' এক সেকেণ্ডের জন্যে—সুতরাং নাম জানা দূরে থাক, চেহারাটাও ভালো করে দেখা হয় নি। আর আমি বাড়িতেই বা থাকি কতক্ষণ—মাসের মধ্যে যে দশ-বারো দিন বাড়ি থাকি তা-ও ওই শিকার নিয়ে কাটে—তবে এক এক দিন শুনতাম বটে—যেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থাকতাম—বাঙালী স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান-ম্যাড্রাসী স্বামীকে গান শেখাচ্ছে—বাঙলা গান—গানটার একটা লাইন আমার এখনও মনে আছে—পরে শুনেছিলাম পোয়েট টেগোরের লেখা গান—হে নাটারাজ—হে নাটারাজ···

সোনপার সাহেব বললেন—এ গানটা আমার ফার্স্ট ওয়াইফ গাইতো—বেঙ্গলীদের টিউন ভেরি পিকিউলিয়র—

—তার পর শুনুন—গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন।

—একদিন সাইকেল নিয়ে 'চৌকে' গেছি কী কিনতে, দেখা হলো সুবেদার কেদার সিং-এর সঙ্গে। কেদার আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাড়িতে একতলায় নতুন এক ভাড়াটে এসেছে দেখলাম—নতুন জেনানা—

আমি বললাম—হ্যাঁ—এক ম্যাড্রাসী ফ্যামিলি—

—ম্যাড্রাসী নয়—আমি চিনি ওকে—চাইবাসায় থাকতো ওর বাবা, ফরেস্ট

অফিসার, ওর নাম মিস সুজাতা দাশ, ওর বাবা ছিলেন মিস্টার দাশ, রেইস্ আদমি—খানদানী বংশের লোক—কিন্তু সঙ্গের ও-লোফারটা কে ?

আমি বললাম—ও ওর হাসব্যাণ্ড—হ্যারি স্বামীনাথন—

সুবেদার কেদার সিং বললে—শেষকালে কিনা ওর সঙ্গে বিয়ে হলো !

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন সুবেদার সাহেবের মনঃপূত নয়। সুবেদার সাহেবের কাছেই শুনলাম—মেয়েটি নাকি ভারি খুবসুরৎ ছিল আগে। ভারি বলিয়ে কইয়ে, নাচিয়ে গাইয়ে। চাইবাসার সব লোকই নাকি ভালোবাসতো সুজাতাকে। বড়লোক বাপ। ঘোড়া ছিল, মোটর ছিল, আবার মাঝে মাঝে সাইকেলও চড়তো ও। কখনও পরতো শাড়ি, কখনও সেরোয়ানি, কখনও শালোয়ার, কখনও পরতো চোদ্দহাত মাদ্রাজী শাড়ি কাছা-কোঁচা দিয়ে, আবার কখনও পরতো স্রেফ ব্রিচেস আর নেকটাই-এর সঙ্গে ট্রাউজার শার্ট।

আমারও দেখে মনে হলো ভারি মজবুত গড়নের মেয়ে। ভইষের দুধ, ঘি আর মাঠা না খেলে অমন চেহারা হয় না। তার ওপর আছে তাকত্ আর মেহন্নত। মোটর চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর সাইকেল পেটা—

সেদিন প্রথম আলাপ হলো।

সন্ধ্যে তখনও হয় নি। হরিশঙ্কর রোডে গিয়েছিলাম বিল্ কালেক্‌শনে, মহাসামুন্দের পি-ডব্লিউ-আই শুক্লাজী ছাড়লো না। একটা বুল্-ডিয়ার মেরে নিজের ট্রলি করে রায়পুর পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। তার পর সেটা নিয়ে গণ্ডিয়া জাংশানে ন্যারো-গেজ ট্রেন ধরে সন্ধ্যের কিছু আগে আমার 'শিয়ালকোট-লজে' এসে পৌঁছুলাম। এবার বাড়িতে প্রায় দিন কুড়ি গরহাজির ছিলাম—

আমার চাকর আমার আগে-আগে বুল-ডিয়ারটা নিয়ে ঘরে গেছে। আমি ধীরে সুস্থে আস্তে-আস্তে আসছি। কদিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম—দীনদয়ালকে বলে দিয়েছিলাম—মাঠা যেন তৈরি রাখে—গিয়েই একগ্লাস খেয়ে নেবো—

কিন্তু গেট্ দিয়ে ঢুকতেই দেখি মিসেস স্বামীনাথন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করলে।

বললে—জয় রামজী কি—

তারপর সামনে এসে দাঁড়াতেই বললে—আপনি শিকারপ্রিয় লোক আমি জানতাম না—

আগাগোড়া ক্রেপ্-সিল্কের বুটিদার শাড়ি-ব্লাউজ মিসেস স্বামীনাথনের পরনে। জরিদার একজোড়া পা-ঢাকা চটি—দুদিকের ব্লাউজের নীচে থেকে সমস্ত হাতদুটো মাস্‌ল্-ওয়ালা—মোদ্দা কথা আমাদের গুজরানওয়ালা লাহোরের মেয়েদের পর্যন্ত হারিয়ে দিতে পারে পাঞ্জায়—এমনি তাকত-ওয়ালা জেনানা—দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

তার পরেই আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে রীতিমতো বাগিয়ে ধরলে—

বললে—ষোলো বোরের বন্দুক ব্যাভার করেন আপনি?

বললাম—তিনরকমই আছে, যখন যেটা সুবিধে সেইটে নিই—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—আমার আর আপনার দেখছি একই—হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড—আপনি কী কার্টিজ কেনেন?

—তার কিছু ঠিক নেই, আজকের বুল-ডিয়ারটা মেরেছি বাকশটে—যখন যেটা সুবিধে হয়, কখনও এল-জি, কখনও এস-জি—

—অ্যাল্‌ফা ম্যাক্স—?

—তারও কোনো ঠিক নেই—তবে অ্যালফা ম্যাক্স-ই আমি পছন্দ করি—

মিসেস স্বামীনাথন বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, ট্রিগার টিপছে, কাঁধের ওপর রেখে 'এইম্' করছে—হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা যেন জখম হয়ে আছে। আঙুলটা কাটা।

দীনদয়ালকে দিয়ে দোস্ত-দোস্তালি সকলের কাছে কিছু কিছু মাংস পাঠিয়ে দিলাম। সুবেদার কেদার সিংএর কাছে, এতোয়ারিতে মুন্সিজীর কাছে, আরো অনেকের কাছে,—আর পাঠালাম একতলায় মিসেস স্বামীনাথনের কাছে।

সেইদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা শুরু হলো। সকালবেলায় সাইকেল চড়ে মিসেস স্বামীনাথন যখন বাজার করে ফেরে তখন বেশ দেখায়। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিল্কের ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটা জুট-সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি আর সামনের বেতের বাস্কেটের মধ্যে আলু, ভিণ্ডি, পরবোল আর ভাজি—এই সব—

হঠাৎ সেদিন আমাকে নেমন্তন্ন করে বসলো মিসেস স্বামীনাথন—

গোয়াড়িঘাট থেকে গ্রীন পিজিয়ন্ মেরে এনেছে দু'তিন ডজন। নতুন বটফল পাকতে শুরু করেছে—বর্ষা শুরু হয়ে গেছে কিনা।

বললে—আজ সকাল-সকাল হ্যারি টাউনে বেরিয়ে গেছে—হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়েছিলুম আমার বন্দুকটা নিয়ে, মতলব ছিল 'ডাক্' মারবার, কিন্তু···আজ সন্ধ্যে সাতটায় আসছেন তো, হ্যারিকে বলেছি সে-ও আসবে তার আগেই—

সেদিনকার নেমন্তন্নটা বিশেষ করে মনে আছে, এই পঁচিশ বছর পরেও কারণ অমন মাংসের রোস্ট্ জীবনে আর খেলুম না—আর খাবোও না। শুনেছিলাম মিসেস স্বামীনাথন নিজে রান্না করেছিল—

সন্ধ্যে সাতটার সময় নেমন্তন্ন। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সাতটা বুঝি আর বাজে না! কারণ তখন দীনদয়ালের রান্না খেয়ে-খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। আর তা ছাড়া গ্রীন পিজিয়ন্টা বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। তার কাছে কোথায় লাগে মাটন, কোথায় লাগে ফাউল। যা হোক্, ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি একতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। মিসেস স্বামীনাথন সেদিন পুরোপুরি বাঙালী সাজে সেজেছিল। একটা পীককের গায়ের রঙের মতো ব্রাইট জর্জেট-শাড়ি ফিগারটাকে লেপ্টে জড়ানো, আর চিতাবাঘের মতো ডোরা-ডোরা ছিটের ব্লাউজ কাঁধ পর্যন্ত, তার নীচেয় বাচ্চা হরিণের মতো নরম মোলায়েম দুটো হাত। বন্দুক হাতে যে-মিসেস স্বামীনাথনকে দেখেছি গুজরানওয়ালার মেয়েদের মতো কর্কশ-কঠিন, কী জানি কেমন করে কেউটে-সাপের ফণার মতো হাতের মাস্ল্গুলোকে সেদিন সে লুকিয়ে ফেলেছে।

আমি যেতেই পরদা সরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলে। বললে—আসুন মেটাজী—

বললাম—মিষ্টার স্বামীনাথন কোথায়?

—হ্যারি এখনই এসে পড়বে, বোধ হয় কোনো কাজে আটকে পড়েছে, সেলস্ম্যানের কাজ বড় বিশ্রী কাজ মেটাজী, প্রত্যেককে প্লীজ করতে করতে অস্থির—

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

বললাম—ওঁর ব্যবসা তো অনেক ভালো, আর আমাদের দেখুন তো, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়—শরীরের আর কিছু থাকে না—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—তা হোক, কিন্তু হ্যারি যে বাইরেই যেতে চায় না, বিয়ের আগে ওর ভালো একটা চাকরি ছিল, ছ শো টাকা মাইনে পেতো—সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন এই মোটরের সেলস্ম্যানশিপ ধরেছে। এখন কত বলি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো—তা যাবে না—আমাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে একটা রাত কাটাতে পারেনা ও—এমন ঘরকুনো—

হেসে বললাম—সে তো যে-কোনো স্ত্রীর পক্ষেই ঈর্ষার বিষয়, মিসেস স্বামীনাথন, —কিন্তু ছ শো টাকার চাকরিটা ছাড়লেন কেন—আজকালকার বিজ্নেসের বাজার যে-রকম—

—না ছেড়ে যে উপায় ছিল না মেটাজী, তখন এমন ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, চাকরি তো চাকরি, হ্যারির জীবন নিয়ে টানাটানি, আমার রীতিমতো ভয় হয়ে গিয়েছিল—

—কেন ?

—হয়তো আত্মহত্যা করে বসতো। বলা তো যায় না—

—কেন, আত্মহত্যা করবার কী হয়েছিল ?

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির পাগলামির কথা তো সব জানেন না—পুরুষ-মানুষ যে অমন সেন্টিমেণ্টাল হতে পারে তা হ্যারির সঙ্গে মেশবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না—জানেন, তিনবার ও সুইসাইড করতে গিয়েছিল—

—কেন ! আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

—আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলে—হাসতে হাসতে মিসেস স্বামীনাথন বললে।

তার পর বললে—আমরা হলাম গোঁড়া হিন্দু বাঙালী—বাবা সাহেবী খানা খেলেও হিন্দুয়ানি আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে শেকড় বসিয়েছে, আর তা ছাড়া তখন আমার হাতে চা খেতে বি-সি-এস থেকে শুরু করে আই-সি-এস পর্যন্ত পাঁচ ছ'জন ক্যাণ্ডিডেট তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মোটর ড্রাইভ করে রোজ সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ি আসছে···আর হ্যারি ভারি তো ছ শো টাকা মাইনের মার্কেনটাইল ফার্মের একাউনটেণ্ট—আমাকে কিনা বিয়ে করবার সাধ তার—সেন্টিমেন্টাল না তো কী বলব ওকে বলুন—

বেশ আগ্রহ হচ্ছিল গল্প শুনতে। মিসেস স্বামীনাথনের গল্প বলবার সময়ে ঠোঁটের যে অপূর্ব ভঙ্গী হচ্ছিল তাতে সেন্টিমেন্টাল হ্যারি কেন, যে-কোনো পুরুষের আত্ম-হত্যার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম—তার পর—

খিল খিল করে হেসে উঠলো বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন। বললে—তার পর তো দেখছেনই এখন মিসেস স্বামীনাথন হয়েছি—কিন্তু হ্যারি ওমনি ছাড়ে নি আমাকে—অমন নাছোড়বান্দা পুরুষমানুষও আমি দুটো দেখি নি, মেটাজী—এই দেখুন না—বলে হাতের কাটা আঙুলটা দেখালে উঁচু করে—

বললে—সারা শরীরে আমার খুঁত নেই কোথাও—অন্তত আমার অ্যাডমায়ারাররা তাই বলতো—কিন্তু সারা জীবনের এই খুঁতটি আমার করে দিয়েছে হ্যারি—

গল্প আরো জমে উঠেছে। বললাম—কেন ?

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে চাইলে মিসেস স্বামীনাথন।

বললে—রাত নটা বাজতে চললো এখনও তো হ্যারি আসছে না—

বললাম—আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, মিসেস স্বামীনাথন—

—তা হোক কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়, আসুন আমরা আরম্ভ করে দিই—হ্যারি নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে গেছে—

তার পর শুরু হলো ডিনার। অপূর্ব রান্না, অপূর্ব তার টেস্ট। জীবনে সেই ডিনারের কথা আর কোনোদিন ভুলবো না। খেতে খেতে আমাদের গল্প চলতে লাগলো। বললাম—তার পর, বলুন—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—সেইদিনের ঘটনাটা বলি—মজুমদার আসবার কথা আছে, আসবার কথা আছে দীপেন, কুমার আর অলকের—কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হ্যারি দুপুরবেলা বাড়িতে এসে হাজির ওর মোটর-বাইক নিয়ে—অফিস থেকে পালিয়ে এসেছে হ্যারি—

যেতে হবে শিকারে। ঠিক ছিল ফিরে আসবো সন্ধ্যের আগে। কিন্তু হলো না। নোয়ামুণ্ডির জঙ্গলে গোটাকতক তিতির মেরে ফিরে আসছি—হ্যারি বললে বড়বিল সাইডিং-এর ধারে একটু বিশ্রাম নিতে; বিশ্রাম আর নেব কী বলুন, নোয়ামুণ্ডি থেকে চাইবাসায় আসতে ইঞ্জিন চালাতেও হবে না—এমন ঢালু রাস্তা, শুধু চেপে বসলেই হলো এমন গড়ানে, তবু হ্যারি নাছোড়বান্দা, বললে—একটু বিশ্রাম করতেই হবে—সেইখানে বসেই হ্যারি কাণ্ডটা বাধালে—

বললাম—কোন্ কাণ্ড ?

মিসেস স্বামীনাথন আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি আর একটু দো-পেঁয়াজি নিন মেটাজী—আপনার হয়তো লজ্জা হচ্ছে—

খানিক পরে মিসেস স্বামীনাথন আবার বলতে শুরু করলে—সেইখানে বসে আমরা চা-পান শেষ করলাম, তার পর বোধ হয় একটু ক্লান্তি এল হ্যারির শরীরে—ও শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। তাতেও দোষ ছিল না, কারণ কোলটা আমার হলেও, কেউ-না-কেউ শোবার জন্যেই তো হয়েছে ওটা—সুতরাং আমি আপত্তি করি নি—কিন্তু বিপদ ঘটলো তার পর। হ্যারি বললে, আমি যদি হ্যারিকে বিয়ে না করি তো ও আত্মহত্যা করবে। তা কী করে হয় বলুন, আমরা হলুম হিন্দু বাঙালী আর ও হলো মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান। আর তা ছাড়া মজুমদারকে প্রায় একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেছে—কিন্তু হ্যারি বললে আমার কোলে শুয়েই সে আত্মহত্যা করবে, আমাকে না পেলে ওর নাকি মরা-ই ভালো। তা ভালো তো ভালোই, কি বলুন, কিন্তু আমার সামনে আর আমার কোলে শুয়েই বা

আত্মহত্যা করা কেন—আড়ালে করলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট···আপনাকে আর স্লাইস রুটি দেব, মেটাজী—

খানিক থেমে মিসেস স্বামীনাথন আবার আরম্ভ করলে—আমি বিরক্ত হয়ে কোল থেকে হ্যারির মাথাটা দিলাম সরিয়ে। ও-ও আপত্তি করলে না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই আমার বারো বোরের বন্দুকটায় একমুহূর্তে একটা এল-জি পুরে নিয়ে নিজের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলে—আর সঙ্গে সঙ্গে—আপনি আর-একটু কারি নিন, মেটাজী—কিছুই খেলেন না দেখছি···

বললাম—ও কথা থাক, আপনি বলুন তার পর কী হলো—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—দশটা বাজতে চললো, এখনও দেখছি হ্যারি আসছে না—নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে পড়েছে—কী বলেন—

বললাম—তার পর বলুন—

—তার পর আর কি—এই তো আমার মাঝখানের আঙুলটা দেখছেন, আধখানা উড়ে গেছে, এ ওই হ্যারিকে কেবল বাঁচাবার জন্যে—আমিও তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ধরে বাধা দিতে গেছি, কিন্তু দেরি হয়ে গেল একটু—হ্যারি বাঁচলো এইটুকুর জন্যে, কিন্তু আমার আঙুলটা···বাইরে যেন সাইকেল-রিক্সার ঘণ্টা বাজলো, না মেটাজী ?

মিসেস স্বামীনাথন টেবিল ছেড়ে উঠলো। বললে—এক্সকিউজ মি—এতক্ষণে বোধ হয় হ্যারি এল—

সত্যিই হ্যারি সাইকেল-রিক্সায় এল। কিন্তু সেই সময়, ঠিক আমাদের গল্পের চৌমাথায় পৌঁছুবার আগেই হ্যারি না-এলেই যেন ভালো করতো। পরে অনেকবার ভেবেছি, সেদিন আমার সামনে অমন অবস্থায় মিসেস স্বামীনাথনের স্বামী কেন এল। কেন এল-না আরো অনেক পরে, যখন খাওয়াদাওয়া সেরে আমি আমার ঘরে চলে আসতুম। তা হলে মিসেস স্বামীনাথনও অমনভাবে ধরা পড়তো না।

সেই রাত্রে মিসেস স্বামীনাথনের যে-ব্যবহার দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। আর সে ব্যবহার কিনা করলো আমারই উপস্থিতিতে।

রিক্সর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিসেস স্বামীনাথন মাতাল হ্যারিকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। হ্যারি তখন বেশ টলছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ভালো করে।

আমাকে চিনতে পেরে হ্যারি বললে—হ্যাল্লো বয়—

তার পর কী একটা বেয়াদবি করতেই মিসেস স্বামীনাথন এক কাণ্ড করে বসলো। দেখলাম মিসেস স্বামীনাথনের শরীরে আবার সেই কর্কশ-কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। চীৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল···

তার পর হ্যারির চুলের মুঠি ধরে সে কী ঝাঁকুনি! অচৈতন্য হ্যারির চেতনা ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা হলো। শেষে আমার দিকে একবার কাতর চাউনি দিয়ে হ্যারিকে বেড্‌রুমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—

পাশের ঘরে যেতে যেতে হ্যারি আমার দিকে ফিরে বললে—চিয়ারিউ, বয়—চিয়ারিউ—

তখনও বাকি ছিল পুডিং আর কফি। আমার ডিনার শেষ হলো না। মিসেস স্বামীনাথনকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি নিঃশব্দে ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। মনে হলো—মিসেস স্বামীনাথনের অপমান যে-ই করুক—তা দাঁড়িয়ে দেখাও যেন অপরাধ।

টি-আই বুড়ো অ্যান্টনি বললে—সো ভেরি ইন্টারেষ্টিং—তার পর, মিষ্টার মেটা—

মুদেলিয়ার বললেন—ড্রান্‌কার্ডস আর অলওয়েজ স্কাউণ্ড্রেলস্—ঠিকই হয়েছে—

সোনপার সাহেব বললেন—বাজে কথা, আমি ত বরাবরই ড্রিঙ্ক করি, তবে মডারেট ডোজে—কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়াইফ কখনো আপত্তি করেন নি—বরং—

মুদেলিয়ার বললেন—তা তো করবেই না, আমি শুনেছি বেঙ্গলী গার্লরা কোলকাতার হোটেলে পাবলিক্‌লি স্মোক আর ড্রিঙ্ক করে—

সোনপার সাহেব বললেন—আই টেক সিরীয়স অবজেক্‌সন টু ইট—

টি-আই অ্যান্টনি বললে—চুপ করুন আপনারা—তার পর বলুন মিঃ মেটা—

গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন। বিলাসপুর রেলওয়ে কলোনি তখন নিস্তব্ধ। রাস্তার আলোগুলো চুপচাপ প্রহরীর মত ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু বিলাসপুর ইয়ার্ডে শান্টিং-এর শব্দ মাঝে মাঝে আকাশকে চমকে দেয়। আর, এই ইন্‌ষ্টিটিউটের ভেতরে বিলিয়ার্ড খেলা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু দিল্লীর রেডিওতে তখন দরবারী কানাড়ায় খেয়াল ধরেছে কোনো ওস্তাদজী।

মেটাজী বললেন—তার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল মিস্টার স্বামীনাথনের সঙ্গে বাড়ির বাইরে। আমি ট্রেন থেকে নেমে 'কিংসওয়ে'তে খেতে গেছি—রাত্রের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়ার মতলব—কারণ ট্রেন লেট্ ছিল আর এত দেরিতে আবার দীনদয়াল কেন কষ্ট করবে এই ভেবে। হঠাৎ দেখি, হ্যারি স্বামীনাথন দূরে একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে—বাঙালী নয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—

আমাকে দেখতে পেয়েই হ্যারি নিজের বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে এল। এসে আমার সামনের চেয়ারেই মুখোমুখি বসল। বললে—গুড্ ইভনিং, বয়—

দেখলাম, নেশা বেশ হয়েছে। এবং ক্রমে আরও হবার আশা আছে—

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—আমি উঠি—

—সে কি, একটু খাবেন না—

আমার আপত্তিতে হ্যারি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। বললে—ভালো কথা, একটা কথা আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করবো ভাবি—

—কী কথা—

—এই-যে রাত্রে বাড়িতে ফিরে সুজাতার সঙ্গে আমি প্রায়ই ঝগড়া করি, আপনি টের পান? কী যে ওর স্বভাব মশাই। সকলে সব জিনিসে রস পায় না, তা না পাক, ধরুন আমার মদ খেতে ভালো লাগে, সুজাতার ভালো লাগে না। তোমার ভালো লাগেনা তুমি খেও না, কিন্তু আমি যদি খাই তুমি বাধা দেবার কে—ঠিক কিনা বলুন—এখন এই নিয়ে রাত্রে মশাই রোজ আমাদের ঝগড়া হয়—

বললাম—এবার তা হলে উঠি—

—কিন্তু আপনি উত্তর দিলেন না তো?

—কীসের উত্তর?

—ওই আপনি টের পান কিনা—

—কেন বলুন তো, আমি পেলেই বা···

—সেই কথাটা সুজাতাকে একবার বোঝান দিকি, আমিও যত বলি মেটাজী টের পেলেই বা, সুজাতা বলে—তুমি শেমলেস্ হতে পারো কিন্তু আমার লজ্জা করে। অর্থাৎ আমি যে মদ খাই এটা যেন দোষের নয়, দোষটা হলো আপনার টের পাওয়াতে—

বললাম—মিসেস স্বামীনাথন যখন চান না—তখন আপনি ওটা খান কেন?

—আপনি বুদ্ধিমান হয়ে এই কথা বলছেন—হ্যারি বোতল হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার পর বললে—আপনি আমাদের হিষ্ট্রি কিছু জানেন না, আমি ছ শো টাকার চাকরি ছেড়েছি সুজাতার জন্যে, জানেন—নইলে আজ আমি মোটরগাড়ির পেটি সেল্‌স্‌ম্যান—তিনবার আমি সুইসাইড করতে গেছি—তিনবার সুজাতা আমাকে বাঁচিয়েছে—সুজাতা কি আমায় কম ভালোবাসে ভেবেছেন! ওর সব ভালো, অমন সতী স্ত্রী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? একরাত্তির আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না—আমি যেমন ওর জন্যে আমার চাকরি, আমার সব

ত্যাগ করেছি, ও-ও আমার জন্যে ওর বাবার প্রচুর সম্পত্তি স্যাক্রিফাইস্ করেছে—শেষে মজুমদারকে এড়াবার জন্যে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে—অমন একনিষ্ঠ ভালোবাসার তুলনা হয় না, মেটাজী—কিন্তু ওর ওই এক দোষ—আমার মদ খাওয়া মোটে পছন্দ করে না—কিন্তু ন্যান্সীকে দেখুন—ওই যে বসে আছে—

দূরের টেব্‌লে বসা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখালে হ্যারি।

বললে—ওই ন্যান্সীকে দেখুন—ওকে আমি যত খাওয়াবো তত খাবে—একবারও 'না' বলবে না—ও এক পিপে মদ খাওয়ালে খেতে পারে—সুজাতাকে কত বলেছি খেতে—কিছুতেই খাবে না, মাতাল দেখলে এক শো হাত দূরে পালিয়ে যাবে—ওদের আর সব ভালো মশাই, বাঙালী মেয়েরা ওই এক ব্যাপারে ভারি কন্‌জারভেটিব—

সেদিন অনেক কষ্টে মাতালের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি চলে আসতেই হ্যারি আবার ন্যান্সীর টেব্‌লে গিয়ে বসলো।

কিন্তু বাড়ি এসে একটু সকাল সকাল শোবার ব্যবস্থা করছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। হাওবাগের এ-দিকটা সন্ধ্যে থেকেই অবশ্য নিরিবিলি হয়ে যায়। তারপরে ক্লান্তও ছিলাম খুব। দীনদয়াল এসে খবর দিলে—একতলার মেমসাহেব সেলাম দিয়েছে—

অত রাত্রেই গেলাম নীচেয়। মিসেস স্বামীনাথন একলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বললে—এবার আপনি অনেকদিন বাইরে ছিলেন মেটাজী—

বললাম—আমার ব্যব্‌সায় শুধু ওই ঘোরাই সার—লাভ বিশেষ কিছু নেই—কিন্তু মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়?

মিসেস স্বামীনাথনকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। বললে—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি, মেটাজী—

বললাম—হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছেন—

—না, কিন্তু ক'দিন থেকেই বেশি রাত্রে ফিরছে হ্যারি—দিন দিন ওর যেন অত্যাচারটা বাড়ছে—দেখুন না, এখন এগারোটা বাজলো, এখনও এল না—আপনার সাইকেলটা একবার দিতে পারেন মেটাজী—আমারটা পাঙচার হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে—

—কিন্তু এত রাত্রে সাইকেল কী করবেন—জিজ্ঞেস করলাম আমি!

—আমি হ্যারিকে খুঁজতে যাবো—

—এতবড় শহরে কোথায় খুঁজবেন তাকে?

—জব্বলপুরে যত মদের দোকান আছে, সব জায়গায় খুঁজবো—আজ একটা

গাড়ি বিক্রি করবার কথা ছিল ওর—পাঁচ হাজার টাকার 'কার'—আজ কয়েক শো টাকা ওর হাতে আসবার কথা, সেই সকালবেলা বেরিয়েছে, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, তার পর এই এত রাত হলো···আপনি সাইকেলটা আনিয়ে দিন আমি ততক্ষণে কাপড়টা বদ্‌লে নিই—

বলে মিসেস স্বামীনাথন ভেতরে চলে গেল সেই মুহূর্তে। আমি দীনদয়ালকে ডেকে সাইকেলটায় বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। খানিক পরেই মিসেস স্বামীনাথন বেরিয়ে এল অপূর্ব পোশাক প'রে। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় মিসেস স্বামীনাথনের যে অপরূপ রূপ দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। শালোয়ার আর সেরোয়ানি পরা পাঞ্জাবী মেয়ে হাজার হাজার দেখেছি। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের সেই পোশাকে আমার ব্যাচিলর মনে সেই রাত্রে যে-মোহ বিস্তার করেছিল তা অসহ্য। অত রাত্রে ওই জ্বালা-ধরা পোশাক পরে মাতাল স্বামীকে মদের দোকানে দোকানে ঘুরে খুঁজে বেড়ানো বড় রোমান্টিক মনে হয়েছিল আমার সেই তরুণ বয়েসে।

মিসেস স্বামীনাথন সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে··জেণ্টস্ সাইকেল বলেই এই পোশাকটা পরলাম—এতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য কিন্তু নেই আমার, মেটাজী—

আমি একবার বললাম—এত রাত্রে আর নাই-বা বেরুলেন, মিসেস স্বামীনাথন—

—ভয়? ভয়ের কথা বলছেন?

মিসেস স্বামীনাথন হেসে উঠলো। বললে—এর চেয়েও অ্যাভ্‌ভেঞ্চারাস কত কাজ আমায় জীবনে করতে হয়েছে·· আর তা ছাড়া আপনি মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন, মেটাজী—হাসব্যাণ্ড যদি মনের মতো না হয়, তার চেয়ে বড় অশান্তি মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই—

তার পর সাইকেলের প্যাডেলে একটা পা রেখে বললে—এ ছাড়াও আপনার তিনমাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকার অভাবেই দিতে পারা যায় নি—কথা ছিল এই টাকাটা পেয়ে ওটা মিটিয়ে দেব—কিন্তু আজ যদি সবটাই উড়িয়ে দেয়, কী সর্বনাশ হবে বলুন তো মেটাজী—হয়তো আমি গিয়ে পড়লে কিছু টাকা অন্তত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল মিসেস স্বামীনাথন।

আমি বললাম—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হ্যারি হয়তো মদের দোকানে নেই—অন্য কোথাও···

'কিংসওয়ে' হোটেলে হ্যারি স্বামীনাথনকে যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সীর সঙ্গে মদ খেতে দেখেছি সে-কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি।

কিন্তু প্রখর-বুদ্ধি মিসেস স্বামীনাথন আমার কথার তাৎপর্য ধরে ফেলেছে এক নিমেষে। কথাটা শুনে যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনো উত্তর বেরুল না। যেন নিজেকে তার পরাজিত মনে হলো, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। বললে—আপনি যা ভাবছেন তা হতে পারে না, মেটাজী—হতে পারে না, কখনও হতে পারে না—ওই হ্যারি তিনবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল আমার জন্যে, ও জানে আমি ওর জন্যে কী-ই না স্যাক্রিফাইস্ করেছি···হ্যারি অমন আন্‌ফেথফুল হতে পারবে না—এখনও যে রাত্রে আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না···কিন্তু···

কথাটা বলে কিন্তু তখনও খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস স্বামীনাথন। মনে হলো যেন হঠাৎ এক বিদ্যুৎ-ঘোষিত মৌসুমী ঝড় তার মনের আকাশে বইতে সুরু করেছে, তার পর কেউটে-সাপের মতো ফণাটা হঠাৎ বিস্তার করে বললে—আপনি ঠিক বলেছেন···সত্যিই তো কিছুই অসম্ভব নয়···সাইকেলটা একবার ধরুন তো মেটাজী—

মিসেস স্বামীনাথন হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বারো বোরের বন্দুকটা বার করে নিয়ে এল। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন শরীরের বাঁ দিকে।

সেই অবস্থায় সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—আমাকে একটা এল-জি ধার দিতে পারেন, মেটাজী—

—কেন, এল-জি কী করবেন?

—আগে দিন, তার পরে বলবো—একটু শীগ্‌গির করুন মেটাজী—

দীনদয়ালকে বলে আমার বাক্স থেকে একটা এল-জি কার্ট্রিজ আনিয়ে দিলাম মিসেস স্বামীনাথনের হাতে।

—এবার বলুন এল-জি কী করবেন?—আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির জন্যে আমারও সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি, কিন্তু গড্ ফরবিড্ আপনার কথা যদি সত্যিই হয়, মেটাজী, তখন আমি কী করবো! হ্যারিকে গুলী করা ছাড়া আমার কী উপায় আছে বলুন—ওর মদ খাওয়া আমি তবু টলারেট করেছি, কিন্তু মেয়েমানুষ জড়িত থাকলে আমি ওকে ক্ষমা করবো কী করে, মেটাজী—ওকে আমি খুন করবো এই আপনাকে বলে রাখছি—ওর সঙ্গে যদি

মেয়েমানুষ থাকে তো ওকে আমি খুন করবো—হ্যাতিয়ার সঙ্গে রাখলুম—যাতে দেরি না হয়—

তার পর একটা কথাও না বলে সাইকেলে উঠে মিসেস স্বামীনাথন অন্ধকারে অন্তর্হিত হলো।

বুড়ো টি-আই এণ্টনি বললে—স্প্লেনডিড্, মিস্টার মেটা, স্প্লেনডিড—তার পর—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার বললেন—আমার ছোট ছেলের পড়ার বইতে পড়ছিলাম 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জর দ্যান ফিকশন'—কথাটা নেহাত মিথ্যে নয় তা হলে—

সোনপার সাহেব বললেন—জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা আপনার মুদেলিয়ার গারু, চোদ্দ বছর বয়েসে রেলে ঢুকেছেন, খেয়েছেন চারুপানি আর ঘষতে ঘষতে আজ বিলাসপুরের স্টেশনমাস্টার—ভাবছেন চরম স্যাল্ভেশন পেয়ে গেছেন—কিন্তু জীবনের জনেলেন কী—একটু মদও খেলেন না—একদিন অফিস কামাইও করলেন না, কখনও বে-নিয়মও করলেন না জীবনে—

গুরুবচন মেটা বললেন—অন্য কথা থাক, গল্পটা শেষ করে নিই—রাত অনেক হয়ে গেল···

ইন্‌স্টিটিউটের সমস্ত ঘর অন্ধকার। পেণ্ড্রা রোডের দিক থেকে একটা মালগাড়ি ক্লান্ত গতিতে আসছে। দূরে লোকো-শেডের দেয়ালে ইঞ্জিন-গর্জনের প্রতিধ্বনি বার বার রেল-কলোনির নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। প্লাটফরমের চায়ের দোকানটি পর্যন্ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল কিন্তু মনসুন এখনও শুরু হলো না।···

—তার পর সেই রাত্রে ওপরে নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে অনেকবার ভেবেছি। ভেবেছি—'কিংসওয়ে' হয়তো এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি সেখানে নেই। হয়তো ন্যান্সীর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের একী ভয়াবহ কাণ্ড। সারাদিন হ্যারির নাওয়া-খাওয়া নেই তাই মিসেস স্বামীনাথনও উপোস করেছে সারাদিন। তার পরে এই ক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় এত রাত্রে বারো বোরের বন্দুক আর ধার-করা এল-জি কার্ট্রিজ নিয়ে পরের সাইকেল চড়ে স্বামীর খোঁজে মদের দোকানে দেখতে যাওয়া—এ-নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে তো মনে হবে গাঁজাখুরি, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমার মনে হলো—আর কোনো দেশের মেয়েরা এমন করে এমন অবস্থায় বেরুতে পারতো না, এক বাঙালী মেয়েরা

ছাড়া। আর আমার নিজের জাত শিয়ালকোট-গুজরানওয়ালার মেয়েদের কথা জানি—তারা ওই দূর থেকেই যা—

সে যা হোক—সে রাত্রে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে-শুয়েই জেগে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম—ওদের ফেরার খবর পাব বলে। হ্যারি রাত্রে ফিরবেই এমন ধারণা আমার ছিলই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সী সঙ্গে থাকলেই শুধু বিপদ ঘটবে তাও জানতাম। আর এ-ও জানতাম হ্যারিকে খুন করতে পেছপাও হবার মতো মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন নয়। কারণ হ্যারিকে মিসেস স্বামীনাথন যেমন গভীর করে ভালোবাসে তেমন করে ক'জন মেয়েমানুষ তাদের স্বামীকে ভালোবাসতে পারে?

কিন্তু কোথা দিয়ে কখন সে-রাত্রে চোখে ঘুম নেমে এল টের পাই নি। পরের দিনও আবার সকাল হবার আগেই জব্বলপুর ছেড়ে ভোরের ট্রেন ধরে ভুসাওয়াল যেতে হলো।

কয়েকদিন পরে যখন ফিরে এলাম 'শিয়ালকোট-লজ'-এ, তখন সে-প্রসঙ্গ বাসী হয়ে গেছে। সুজাতা স্বামীনাথনকে দেখি সাইকেল চড়ে বেতের বাস্কেটে করে বাজার করে আসে। তার পর হ্যারি স্যুট্ টাই পরে সাইকেল-রিক্সয় চড়ে কোথায় বেরিয়ে যায়। আবার ফেরে অনেক রাত্রে। একটা টিমটিম আলো জ্বালিয়ে সাইকেল-রিক্সয় চড়ে।

সেদিন সেই রাত্রে তবে কি হ্যারিকে 'কিংসওয়ে'তেই পাওয়া গিয়েছিল? ন্যান্সী কি ছিল না সঙ্গে? আমার ব্যাচিলর মনে এ-সব প্রশ্ন মাঝে মাঝে আলোড়ন করতো।

সেদিন সুজাতা স্বামীনাথন সোজা চলে এল ওপরে আমার এলাকায়।

বললে—একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম—মেটাজী—

বললাম—বসুন, আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে—আপনার কথাটাই আগে বলুন—

সুজাতা বললে—তাই বলি। আপনার সেই এল-জি কার্ট্রিজ-টা আমার কাছেই রয়েছে—কাজে লাগে নি—ওটা এখনও কিছুদিন থাক আমার কাছে—দরকার না হলে ফিরিয়ে দেব আপনাকে—আপত্তি নেই তো—

বললাম—এবার আমার কথাটা বলি—সেদিন রাত্রে আপনাকে বন্দুক-হাতে একলা ছেড়ে দিয়েছিলাম—পরে মনে হলো সঙ্গে গেলে হতো—ঝোঁকের মাথায় কী হয়তো করে বসবেন—দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমার এখনও ভালো জ্ঞান হলো না, মিসেস স্বামীনাথন—

সুজাতা বললে—দেখুন, হ্যারিকে যদি আমি কোনওদিন খুন করি তো সে একা আমার দায়িত্বে—এ ব্যাপার সম্পূর্ণ আমার আর হ্যারির, এতে কোনও থার্ড পারসন নেই—

বললাম—আপনি কি সত্যই ও-বিষয়ে সিরীয়স—

—নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না মেটাজী, আমি অন্য বাঙালী মেয়ের মতো মানুষ হই নি—আমার শিক্ষা-দীক্ষা সব আলাদা—সেদিন রাত্রে হ্যারির খোঁজে বেরিয়েছিলাম আপনার সাইকেল আর এল-জি নিয়ে, ভাববেন না ঠাট্টা করতে বা ভয় দেখাতে—আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি হ্যারি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না—ওই মদের ওপরেই যা দুর্বলতা আছে ওর—আর কোনও কিছুতে নেই, মেটাজী—হ্যারি মিছে কথা বলবার লোক নয়—কিন্তু যদি···

বললাম—সেদিন শেষ পর্যন্ত কোথায় দেখা পেলেন ওর—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—ও বাড়ির দিকেই আসছিল—সারাদিন সেই মোটর বিক্রি নিয়ে এমন পরিশ্রম গিয়েছিল যে, বাড়িতে এসে খাবার সময় পর্যন্ত পায় নি—তবে স্বীকার করলে ও যে মদ খেয়েছিল—এই নিন চার মাসের বাকী ভাড়া—একটা রসিদ সময় মতো পাঠিয়ে দেবেন—

কী জানি কেন তখনও সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সীর কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

কিন্তু যাবার সময় সুজাতা বললে—কিন্তু এ-ও বলে রাখছি মেটাজী, যদি কোনো-দিন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাই, সেদিন আমি হ্যারিকে······আমার ওই বারো বোরের বন্দুকে এল-জি লোড্ করে রেখেছি—ওকে আমি খুন করবোই—আপনিই সেদিন আমার প্রথম চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন—

বললাম—না না, মাফ করবেন সুজাতা-বাঈ, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই দেখি নি—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—না, শুধু আপনি নন, আরো অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে, হ্যারিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু আমি নিজে যদি কোনওদিন চোখে দেখতে পাই তো খুন করবো ওকে। আমি আমার বাবা মা ভাই বোন আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি পায়ে ঠেলে শুধু ওর টানে চলে এসেছি। শেষকালে সেই হ্যারি যদি আন্‌ফেথফুল হয় তা হলে···সে আপনি ব্যাচিলর মানুষ ঠিক বুঝবেন না···

গুরুবচন মেটা আবার আরম্ভ করলেন—ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে। ঠিক

তার পরদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। সেদিনও জুন মাস, মনসুন আরম্ভ হয় নি। চুপচাপ ওপরের পশ্চিমমুখো বারান্দায় বসে আছি। কোনো কাজ নেই হাতে। সামনের বাগান পেরিয়ে বি-এন-আরের আমবাগানের দিকে চেয়ে ছিলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল। দীনদয়াল একগ্লাস ঠাণ্ডা মাঠা দিয়ে গেছে। তাও খাওয়া শেষ করে খালি গেলাসটা পাশের চেয়ারের ওপর রেখে দিলাম। সানি-ভিলার দিকে হাওবাগ স্টেশনে বুঝি কোনো মালগাড়ি এল। ওদিকের আকাশটা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আসছে। আমার সামনের বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম, সুজাতা স্বামীনাথন সাইকেল চড়ে চৌক থেকে ফিরলো মার্কেটিং করে। ওপর দিকে চাইতেই দুজনে উইশ্ করলাম। তার পর আধঘণ্টাও কাটে নি, দেখি একটা সাইকেল-রিক্স আসছে আমারই 'শেয়ালকোট লজ' লক্ষ্য করে। দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায় নি। গেট্-এর মধ্যে সাইকেল-রিক্সটা ঢুকতেই নজরে পড়লো হ্যারি একলা নয়। প্রচুর মদ খাওয়ার জন্যে নিজে একেবারে অর্ধ-বেহুঁশ, আর সঙ্গে সেই ন্যান্সী—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। সে-ও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হলো না।···

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলো না। এখানে ন্যান্সীকে নিয়ে এল কেন? তবে হয়তো ওর খেয়াল নেই। দুজনে কিংসওয়ে থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে এসেছে। কিংবা হয়তো পুরনো রিক্সওয়ালা। রোজকার অভ্যাসমতো বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা দুজনেই জানে না, কোথায় কোন্ বাড়িতে এসে ওদের নামিয়েছে রিক্সওয়ালা—

উত্তেজনায় সমস্ত নার্ভ আমার শিথিল হয়ে এল। এখনি যে বিপদ ঘটবে, তা ওরা কেউ জানে না। অথচ কালকেও আমার কাছে সুজাতা স্বামীনাথন যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে—ও মেয়ে তো সে-কথা ভোলবার নয়!

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার থরথর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো, এখনি একতলায় একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে আর তার পর দুটো না হোক, একটা লাইফ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক 'এইম্' করে মারতে পারলে একটা টাইগারের লাইফ-এর পক্ষেও একটা এল-জি যথেষ্ট।

কথাটা মনে পড়তেই আরো আতঙ্ক হলো আমার। ওটা তো আমার এল-জি। যদি প্রমাণ হয়, আমিই সুজাতাকে ও এল-জি'টা দিয়েছি, তা হলে মার্ডার চার্জে তো আমিও পড়বো। হ্যারির বডি থেকে যদি এল-জি'টা বেরোয়। তার পর সুজাতা স্বামীনাথনের সঙ্গে ব্যাচিলর বাড়িওয়ালা গুরুবচন মেটার একটি কল্পিত সম্পর্ক খাড়া করে দিয়ে হ্যারি স্বামীনাথনকে খুনের অপরাধের···

আর ভাবতে পারলাম না।

কান পেতে রইলাম উদ্‌গ্রীব হয়ে। নীচেয় ওদের তুমুল ঝগড়া চলেছে। মাঝে মাঝে সুজাতার গলা। তার পর হ্যারির। হ্যারি মদ খেলেও মনে হলো যেন সেন্স ঠিক আছে তার। এইবার বুঝি সুজাতা স্বামীনাথনের বারো বোরের বন্দুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে উঠবে···

গুরুবচন মেটা থামলেন।

আজাইব সিং বললেন—থামলেন কেন, মেটাজী—

বুড়ো টি-আই এণ্টনি বললে—শেষ হয়ে গেল নাকি—

সোনপার সাহেব বললেন—বন্দুকের শব্দটা শেষ পর্যন্ত হলো কিনা বলুন মেটাজী, আর দেরী করবেন না—

মুদেলিয়ার বললেন—সুজাতা কি তুইজনকেই মারলো, না, একজনকে মারলো—

সোনপার সাহেব বললেন—আপনার যেমন চারুপানি-খাওয়া বুদ্ধি, মুদেলিয়ার গারু! এল-জি তো একটা শুনে আসছেন। তুজনকে মারবে কী করে—

মুদেলিয়ার বললেন—তবে কি নিজেই আত্মহত্যা করলো নাকি সুজাতা? বড় সমস্যায় ফেলেছেন—উঃ—

গুরুবচন মেটা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। বললেন—আপনারা এ-কাহিনীর যত কিছু পরিণতি ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু আমার ধার কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারবেন না, এই আমি বলে দিলাম।

টি-আই বুড়ো এণ্টনি সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—আর বাজে কথা বলবেন না স্যার, শেষটা বলে দিন দয়া করে—

গুরুবচন মেটা বললেন—আপনাদের আমি গোড়াতেই বলেছি যে, গল্পটা যেখানে আমি শেষ করবো তার পরে আমাকে আর কেউ কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ ব্যাপক, কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে। সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। আমার সেই শর্ততে আপনারা রাজী হয়েছিলেন, মনে আছে বোধ হয়···যা হোক এখনই শেষ অধ্যায়টা বলি··

একটু থেমে মেটাজী বলতে লাগলেন—সেই রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে বারান্দায় ছটফট করছি, কী হবে, কী হবে! ভাগ্যিস দীনদয়াল বাড়ি ছিল না, চৌকে গিয়েছিল

ভইষের খড় কিনতে, নইলে সে-অবস্থায় আমাকে দেখলে হয়তো পাগল ভাবতো। তার আসতে প্রায় একঘণ্টা দেরি। হঠাৎ মনে হলো নীচেকার গোলমাল যেন থেমে এল।—পাশের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে অবাক্ হয়ে গেছি! আর কেউ নয়। মিসেস স্বামীনাথন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে উঠছে। মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায়, পরাজয়ের কলঙ্কে অপমানে একেবারে খ্যরোলি অন্যরকম দেখাচ্ছে, চোখ ফেটে জল বেরুবে এখনি—

সুজাতা স্বামীনাথন আমাকে কথা বলবার অবসর দিলে না পর্যন্ত। ছুটে এসে আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে—দেখেছেন তো হ্যারির কাণ্ড—

তার পর আমাকে টানতে টানতে বললে—কাম্ অন্ মেটাজী, কাম্ অন—

আমি হতবাক্ হয়ে সুজাতা স্বামীনাথন-এর পেছনে চলতে লাগলাম···

তার পর আমার শোবার ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে—মেটাজী, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আমি···আমি এর প্রতিশোধ নেব··· বলে একমুহূর্তে ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে সজোরে খিল লাগিয়ে দিলে।

পুতুল দিদি

এতদিন পরে যে আবার পুতুল দিদির কথা মনে পড়লো, এ পুতুল দিদির মেয়ের বিয়ে বলে নয়। কিংবা তার মেয়ের বিয়েতে এত পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে বলেও নয়। মনে পড়ার আরও একটি কারণ আছে।

কারণটা পরে বলবো।

পুতুল দিদিকে জানি খুব ছোটবেলা থেকে। ছোটবেলায় পুতুল দিদির ওপর ভার পড়তো আমার তদারকের।

বাবার চাকরিতে খুব ঘন ঘন বদ্‌লি হতো তখন। আজ মীরাট, কাল দিল্লী, পরশু জব্বলপুর, আবার তার পরদিনই হয়ত কলকাতা। বদ্‌লি হবার মুখে বাবা আমাদের সবাইকে মামার বাড়ীতে রেখে একলা চলে যেতেন। তারপর বাড়ী বা কোয়ার্টার ঠিক করে আবার আমাদের নিয়ে যেতেন সেখানে।

তা এই সূত্রে বড় ঘন ঘন মামার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ ঘটতো আমাদের।

মামার বাড়িতে গেলেই আমার ভার পড়তো পুতুল দিদির ওপর! তা শোয়ানো, খাওয়ানো, জামা পরিয়ে বেড়াতে পাঠানো—সমস্ত করতো পুতুল দিদি। আমার অন্য ভাইবোনদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো মা। তাই যে-ক'দিন মামার বাড়ি থাকতাম, সে-ক'টা দিনই পুতুল দিদির হেপাজতে থাকতে হতো।

মনে আছে দালানে সবাই সার সার শুয়ে আছি। মাঝরাত্রে আমার ঘুম ভেঙেছে। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছে। ডাকলাম—পুতুলদি···

ডাকতে গিয়েও যেন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। যদি ধমক দেয়! যদি মারে! পুতুল দিদি মারতো খুব। মেরে আমার গালে পিঠে বুকে একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিত।

বলতো—পিসিমা, তোমার বড় ছেলেটাকে একেবারে বাঁদর করে তুলেছ—

মনে আছে, যখন আমার খুব অল্প বয়েস, পুতুল দিদিকে যেন ফ্রক্ পরতে দেখেছি। স্মৃতির সিন্দুক খুললে এখনও অস্পষ্ট আবছা-আবছা সে-চেহারাটা মনে পড়ে। খুব মোটা-মোটা গোলগাল থলথলে চেহারা ছিল তখন। আর ধবধব করছে গায়ের রং। আমাকে কোলে করে নিয়ে বারান্দায় এ-পাশ থেকে ও-পাশে ঘুরতো। তারপর সেই পুতুল দিদি শাড়ি পরতে শুরু করলে। তখন গায়ের থলথলে ভাবটা কমে গেছে। রংটা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। গায়ে আরো জোর হয়েছে। পুতুল দিদি একটা চড় মারলে সমস্ত মাথাটা আমার ঝিমঝিম করতো।

কিন্তু যত বিপদ হতো রাত্রে। পুতুল দিদি আমার পাশেই শুতো। ঘুমোতে ঘুমোতে কখন আমার গায়ে পা তুলে দিয়েছে খেয়াল নেই। কিন্তু তবু নড়তে পাবো না।

পুতুল দিদি মাকে বলতো—পিসিমা, জানো, যত দুষ্টুমি ওর রাত্রে—

সত্যি, রাত্রেই আমার কেমন একলা কলতলায় যেতে ভয় করতো। সমস্ত বাড়িটা তখন নিষুতি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশেপাশে ভাইবোনদের নিশ্বেস ফেলবার শব্দ আসছে। আবার একবার আস্তে আস্তে ডাকতাম—পুতুলদি···

শেষ পর্যন্ত যখন কলতলায় নিয়ে যেত আমাকে, তখন রাগের চোটে আমার ওপর দুমদুম করে কিল বসিয়ে দিত।

বলতো—রাত্তিরে যে একটু ঘুমবো তারও উপায় নেই তোর জ্বালায়—

এমনি প্রতিদিন।

আবার বলতো—আজ যদি রাত্তিরে আবার উঠিস তো, কাল তোকে কিছু খেতে দেব না, উপোস করিয়ে রাখবো—দেখিস ঠিক—

কিন্তু তারপরেই বিকেলবেলা যখন জামা-কাপড় পরিয়ে পার্কে বেড়াতে পাঠাতো ঝি-এর সঙ্গে, তখন সে এক অন্য চেহারা। পাউডার স্নো মাখিয়ে, কপালে একটা খয়েরের টিপ পরিয়ে দিয়ে আমার কড়ে আঙুলের ডগাটা আলতো করে কামড়ে দিয়ে ছেড়ে দিত।

বলতো—সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন—

কিন্তু আমাকে ভালো-ও বাসতো খুব পুতুল দিদি। কেউ আমাকে বকলে কি মারলে পুতুল দিদি এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বলবে—পল্টুর ওপরে তোদের এত গায়ের জ্বালা কেন রে—ও তোদের কী করেছে রে শুনি—

এমনি করে মীরাট থেকে জব্বলপুর, জব্বলপুর থেকে কাট্‌নি, কাট্‌নি থেকে কোথায় কোথায় বাবার সঙ্গে আমরাও বদ্‌লি হয়ে চলতে লাগলুম। আর মাঝে মাঝে এক এক বার প্রায় পাঁচ-ছ'মাসের মতো মামার বাড়ি গিয়ে থাকি।

তখন পুতুলদি আরো বড় হয়েছে। ভালো ভালো শাড়ি পরে। গায়ে সাবান মাখে, এসেন্স মাখে। পুতুল দিদি যখন আদর ক'রে কাছে টেনে নেয়, আমি বুক ভরে এসেন্সের গন্ধ শুঁকি। পুতুল দিদির কাছে-কাছে থাকতে ভালো লাগে। পুতুল দিদির পুতুলের বাক্সতে হাত দিতে দেয় তখন। বেড়াতে যাবার আগে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে এক এক দিন একটা আধলা দেয়। বলে, কাউকে বলিসনি পল্টু—তোকে আমি এমনি দিলুম—

আমি আবার সেই আধলা দিয়ে হয়ত চিনেবাদাম কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে দিতুম পুতুলদিকে।

পুতুলদি বলতো—আজ লালার দোকানের কচুরি আনতে পারবি, পল্টু—

বলতুম—কেন পারবো না—

—কাউকে বলবিনা বল্—

বলতুম—না, সত্যি বলছি কাউকে বলবো না পুতুলদি—

—মাইরি বল্, মা কালীর দিব্যি বল্—

তাই বলতাম। শেষে সেই গরম গরম তেলেভাজা হিঙের কচুরি নিয়ে এসে ছাদের ওপরে চিলেকুঠরির কোণে বসে দুজনে খাওয়া।

এমনি করে কতবার কতরকম নিষিদ্ধ খাওয়া খেয়েছি দুজনে। কেবল আমি আর পুতুল দিদি। পুতুলদি আমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড়। তবু আমাদের বন্ধুত্বে বাধেনি কোথাও।

একবার মামার বাড়িতে গিয়ে দেখলুম পুতুলদি আরো বড় হয়েছে। ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে পেয়ে পুতুলদি যেন একটা কাজ পেলে হাতে। পুতুল-খেলা তখন ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ে খালি। লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ে। আমি গিয়ে বই নিয়ে আসি পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে চেয়ে। পুতুলদির পড়া হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসি। বেশির ভাগ সময় পুতুলদি ছাদের ওপরে বসে বসে পড়তো।

পুতুলদি একমনে পড়তো আর আমি বসে পাহারা দিতাম।

পুতুলদি বলতো—ওখানে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাক্, কেউ এলেই আমাকে বলে দিবি—

সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ হলেই আমি ইঙ্গিত করতাম পুতুলদিকে, আর পুতুলদি বইটা লুকিয়ে ফেলতো কাপড়ের মধ্যে। তখন একেবারে ভালোমানুষ যেন। পুতুলদি এক এক সময় গান গাইতো গুনগুন করে। আর আমি হাঁ করে শুনতাম। গানের খাতায় কত যে গান লেখা ছিল পুতুল দিদির! পুতুলদির বিছানার তলায় সে-সব লুকোনো থাকতো। এক আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না সে-কথা।

আমাকে কেবল সাবধান করে দিত পুতুল দিদি—খবরদার, আমি যে গান গাই, বই পড়ি—কাউকে বলবি নে—বললে তোর হাড় মাস আর আস্ত রাখবো না কিন্তু—

তা পুতুল দিদির পক্ষে সবই সম্ভব। প্রত্যেক কথাতেই মারতো আমাকে। বেড়াতে গিয়ে হয়ত প্যাণ্ট-এ ময়লা লেগেছে, দেখামাত্র মার! পুতুল দিদি নিজে গান গাইতো বটে, কিন্তু আমি গাইলে আর রক্ষে নেই।

বলতো—খুব যে ওস্তাদ হয়ে গেছিস পন্টু—এই বয়েসেই গান ধরেছিস—

কিংবা হয়ত বলতো—বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেশা হয়, না? তোমার আড্ডা মারা আমি বন্ধ করছি—

কখনও হয়ত গাল টিপে দিয়ে বলতো—লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বই পড়ছিলি—এই বয়েসেই নবেল পড়া দেখাচ্ছি তোমার—

কিন্তু সেবার এক কাণ্ড হলো।

হঠাৎ মামাবাবু আপিস থেকে বাড়ি এল একদিন দুপুরবেলা। আমি তখন ঘুমোচ্ছি। মামিমা জেগে ছিল বোধহয়। একটা আচম্কা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি একতলায় মামাবাবু পুতুলদিকে খুব মারছে। সে কী মার! দেখে আমার কান্না পেতে লাগলো। পুতুলদি চুপ করে মার সহ্য করছে। আর

মামাবাবু বেত দিয়ে পিঠের ওপর সপাং সপাং করে মারছে। মারতে মারতে পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

সবাই এসে কাছে ভিড় করে দাঁড়ালো। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। মামা-বাবুর সামনে কারও কথা বলার সাহস নেই। মামিমাও হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা-ও হতভম্ব হয়ে গেছে। আমরা ভাইবোনরা সব ভয়ে নির্বাক হয়ে দেখছি।

মামাবাবু বললে—আজ আমি ওকে আস্ত রাখবো না আর—ও মেয়ে মরে যাওয়াই ভালো—

মামিমা কাঁদছিল। বললে—ও মেয়ে আমার একদিন মুখ পোড়াবে ঠিক, দেখে নিও তোমরা—

মা বললে—চেঁচিও না বউ, লোক জানাজানি হলে আমাদেরই মুখ পুড়বে—ওর আর কী—

মামিমার কান্না তখনও থামেনি। বলতে লাগলো—এইটুকু মেয়ের পেটে পেটে এত বুদ্ধি মা, আমি কতবার বলেছি বিয়ে দিয়ে দাও ও-মেয়ের—তখন কেউ কথা শুনলে না আমার,—এখন হলো তো—

মা বললে—দিন কাল খারাপ পড়েছে বউ, এ হাওয়ার দোষ, আমার পল্টু হয়েছে ওই বয়েসে—বিয়ে দিলে ও-মেয়ে তিন ছেলের মা হতো এতদিনে—

তা পুতুলদির বয়েস তখন তেরো, আর আমার বয়েস সবে আট।

সেই তেরো বছর বয়েসের পুতুল দিদি সেদিন কী অপরাধ করেছিল বুঝিনি, কিন্তু যে-শাস্তিটা পেয়েছিল তা এখনও মনে আছে। মনে আছে, সেদিন কয়লা রাখবার একটা ঘরে সারাদিন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল পুতুল দিদিকে; খেতে দেওয়া হয়নি, ঘুমোতে পায়নি। একগ্লাস জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সেদিন পুতুল দিদিকে। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পুতুল দিদির কথা। কান্না পেয়েছিল পুতুলদিদির অবস্থা ভেবে। কিন্তু ভয়ে কয়লার ঘরটার কাছে যেতে পারিনি একবারও। যদি কেউ দেখতে পায়!

পরের দিন পুতুল দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওরা তোমাকে অত মারলে কেন, পুতুল দিদি? কী দোষ করেছিলে তুমি?

পুতুল দিদি ভীষণ রেগে গিয়েছিল,—বললে—তোর অত খবরে দরকার কী রে—বড় জ্যাঠা হয়েছিস তো তুই—লেখাপড়া নেই, খালি—

তারপরে পুতুল দিদির বিয়েতে আবার একবার এলাম মামার বাড়িতে। পুতুল দিদি তখন অনেক বড় হয়েছে। তখন বোধহয় বছর যোলো বয়েস। ভারিক্কী

হয়েছে চেহারা। বেনারসী আর চন্দনের টিপ পরে সে রীতিমতো অন্য চেহারা। বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা চারদিকে আলো জ্বলছে। বাজনা বাজছে। লোকজন আত্মীয়-স্বজন। লুচিভাজার গন্ধ।

আমি পুতুল দিদিকে একলা পেয়ে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার ভয় করছে না, পুতুলদি?

পুতুলদি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ভয় করতে আমার বয়ে গেছে—

বললাম—তুমি তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে এবার—

পুতুল দিদি বললে—যাচ্ছি বৈকি—যাবোই তো—তোর কী রে—

কী জানি আমার যেন কেমন কষ্ট হচ্ছিল। সমস্ত বাড়ীর কলকোলাহল আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আমার মন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিল পুতুল দিদির কথা ভেবে। মামার বাড়িতে একটা মাত্র লোভ, একটা মাত্র আকর্ষণ ছিল—সে পুতুল দিদি। পুতুল দিদির হাতে মার খেতেও যেন কত আনন্দ! পুতুল দিদির গালাগালিও যেন কত মিষ্টি! মামার বাড়িতে এলে এবার থেকে কে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেবে। কে পাহারা দেবে আমায়। আমি নভেল পড়ছি কিনা কে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখবে? আমার ভালো-মন্দের জন্যে কে অত মাথা ঘামাবে?

পুতুল দিদি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখছিল। একবার এদিক একবার ওদিক। নতুন গয়না পরে কেমন দেখাচ্ছে, তাই।

পুতুল দিদি বললে—দেখিস তো—কেউ যেন আসে না এদিকে—

বিয়েবাড়িতে রাজ্যের লোক। দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলাম। কেউ আর দেখতে পাবে না। পুতুল দিদি আপন মনে সাজগোজ করতে লাগলো চুপ করে। আমি যে একটা মানুষ তা যেন গ্রাহ্যই নেই। শাড়িটাকে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে নানাভাবে নানান কায়দায় পরেও সোয়াস্তি নেই। কিছুতেই যেন পছন্দ আর হয়না নিজেকে। নিজের রূপ নিয়ে নিজেই বিভোর। একবার ঘোমটা দিলে। একবার ঘোমটা সরিয়ে দিলে। একবার ঠোঁটে রং দিলে। আবার ঘষে রং মুছে ফেললে। কিছুতেই আর পছন্দ হচ্ছে না।

শেষকালে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে—

পুতুল দিদির দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু। আমার মনে হলো যেন অপূর্ব। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা—সব নামগুলো একসঙ্গে মনে এল।

পুতুল দিদি বুঝতে পারলে। বললে—আমার দিকে অমন করে চাইছিস কেন রে—আমি না তোর দিদি হই—খবরদার, কিল মেরে পিঠ ভেঙে দেব—

ব'লে কথা নেই বার্তা নেই আমার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিলে দুম করে।

বললে—এইসব শিক্ষা হচ্ছে, না ?···

বললাম—আমি কী করেছি—

—আবার কথা ? আমি বুঝিনা কিছু !—মেয়েমানুষের দিকে অমন করে তাকাতে আছে ?

পিঠের ব্যথায় আমার চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছিল।

পুতুলদি বললে—আবার ছিঁচকাঁদুনি আছে ঠিক—বিদেশে থেকে থেকে এইসব যত বদ শিক্ষা হচ্ছে—

আমার বড় অভিমান হয়েছিল সেদিন মনে আছে। খিল খুলে বাইরে চলে আসছিলাম।

পুতুল দিদি বললে—কোথায় যাচ্ছিস শুনি—

—বাইরে—

পুতুল দিদি হঠাৎ হাতটা ধরে এক টান দিলে। বললে—এইটুকু বয়েস থেকেই এত শয়তানি—যেতে হবে না বাইরে—একটা কাজ কর্—দাঁড়া এখানে—

তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখনি বর আসবে। ঘরের বাইরে লোকজনের গলা শোনা যায়। সবাই কাজে ব্যস্ত। এখনি বরযাত্রীরা এসে পড়বে। জামা-কাপড় পরে সবাই তৈরি হয়ে নিয়েছি। পুতুল দিদি হঠাৎ একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। একমনে কী-সব লিখলে খানিকক্ষণ। তারপর চিঠিটা খামে পুরে জিব দিয়ে খামের মুখটা ভিজিয়ে সেঁটে দিলে। বললে—এই চিঠিটা দিয়ে আয় তো—

আমি চিঠিটা নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম।

পুতুল দিদি থামিয়ে দিলে। বললে—কাকে দিবি—

বললাম—তুমি যাকে বলবে—

—তবে শোন্, বড় রাস্তার মোড়ে যেখানে একটা জিউলি গাছ আছে, তার গায়ে একটা এতবড় ফোকর দেখবি, সেই ফোকরের মধ্যে তুই রেখে দিয়ে আসবি—পারবি তো ? কেউ যেন না দেখে—

বললাম—কেউ দেখতে পাবে না—

—যদি কেউ দেখতে পায়—তা হলে ?

—তা হলে তুমি আমায় দশঘা কিল মেরো—

তখন আমার সমস্ত শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুতুল দিদির

একটা জরুরী গোপন কাজ করতে পেরেছি। পুতুল দিদি আমায় বিশ্বাস করেছে। আমার আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু পুতুল দিদি এক কাণ্ড করে বসলো সেই মুহূর্তে। সেই আতর স্নো পাউডার, সেই নতুন সোনার-গয়না, সেই বেনারসী, জরি জড়োয়া নিয়ে হঠাৎ আমার মুখটা ধরে গালে একটা চুমু খেলে। আদরে পুতুল দিদির মুখের চেহারা একমুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেল। বললে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার—কেউ যেন না দেখে, বুঝলি তো—

বললাম—কেউ দেখবে না, পুতুলদি—তুমি দেখে নিও—

—যদি ভালো মতন চুপি-চুপি দিয়ে আসতে পারিস চিঠিটা—তো আবার তোকে একটা চুমু দেব—

সেদিন চিঠিটা যথাস্থানে নিঃশব্দে গোপনেই রেখে এসেছিলাম। একবার কৌতূহল পর্যন্ত হয়নি কার নামে লেখা সে চিঠি, কে সে-চিঠিটা নিলো বা কী রকম তার চেহারা। তার সঙ্গে পুতুল দিদির কিসের সম্পর্ক। ন্যায় অন্যায় কোনও বিচারের চিন্তা মনে ঘেঁষেনি। যেন কর্তব্যটা সম্পাদন করতে পারলেই আমার পাওনা উপহারটা মিলবে—এইটেই ছিল আমার লক্ষ্য।

কিন্তু পুতুল দিদির কাছ থেকে সে-চুমু আমার আর পাওয়া হয়নি সেদিন। শুধু সেদিনই নয়—সে-পাওনা আমার বরাবরই বকেয়া রয়ে গেছে। তার পর যখন দেখা হয়েছে…

কিন্তু সে-দেখা না হলেই বুঝি ভালো হতো।

পুতুল দিদি তো শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। আর তার পরদিন আমরাও চলে গেলাম মীরাটে। বাবা তখন জব্বলপুর থেকে মীরাটে বদ্‌লি হয়েছিলেন। পরের বছরে গরমের ছুটিতে আর আসা হয়নি মামার বাড়িতে। দেয়ালির ছুটিতেও যাওয়া হলো না।

মনে আছে একদিন পোস্টকার্ড এল একটা।

মা চিঠি পেয়েই পড়তে লাগলো। আফিস থেকে বাবা এলে বাবাকেও দেখালে।

চিঠি পড়ে বাবারও মুখের ভাব কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। জামা-কাপড় ছাড়তে ভুলে গেলেন অনেকক্ষণ।

রান্না-বান্না পড়ে রইল মার। মা বললে—পোড়ারমুখী আমাদের বংশের নাম ডোবালে গো—এখনও যে দাদার দু'মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি—

বাবা বললেন—আজকাল ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মেলামেশা তো এইজন্যেই পছন্দ করিনে—

মা বললে—অমন সব্বনেশে রূপ দেখেই বুঝেছিলাম কপালে ওর দুঃখু আছে অনেক—রূপসী মেয়েরা কখনও সুখী হয় জীবনে—

রান্নাঘরে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছে, মা ?

—কিসের কী রে ?

—কার কথা বলছিলে তখন বাবাকে ?

মা হঠাৎ রেগে গেল। বললে—তোমার সব কথায় কান দেওয়া কেন শুনি ? নিজের লেখা-পড়া নেই ?

কিন্তু কেন জানিনা মনে বড় ভয় হলো। মনে হলো নিশ্চয়ই পুতুল দিদির কিছু হয়েছে। রূপসী বলতে তো পুতুল দিদিকেই বোঝায়। অমন রূপসী আর মামার বাড়িতে কে আছে !

মার নামে আবার চিঠি এল। মা সে-চিঠিটাও আড়ালে নিয়ে অনেকক্ষণ পড়লে। তারপর বাবা আপিস থেকে আসতেই বাবাকে পড়ালে। আমি আসেপাশে ঘুর-ঘুর করছি। কী কথা বলে শুনবো।

মা বললে—তুই এখেনে কেন রে, যা পড়্‌গে যা—

আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে যেন শান্তি। কিন্তু মনে মনে ভারি কষ্ট হতে লাগলো। সে কষ্ট কার জন্যে কিংবা কেন তা জানি না। কিন্তু মনে হলো যেন পুতুল দিদিকে নিয়েই বাবা-মা'তে আলোচনা চলছে। পুতুল দিদি যেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুতুল দিদিই যেন মামার বাড়ির বংশে কালি দিয়েছে।

তারপর বহুদিন আর মামার বাড়ি যাওয়া হয় না। বাবা বদ্‌লি হন আর আমরা সঙ্গে-সঙ্গে যাই। মা বলেন—না, ছেলেমেয়েরা তো ওইসব শুনবে, তখন কী ভাববে বলো তো—

তারপর পাঁচবছর পরে একটা মারাত্মক অসুখের পর বাবা যেবার ছুটি নিলেন, সেবার আবার মামার বাড়ি গেলাম।

মামাবাবু তখন আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। মামীমাও অথর্ব। মামার বাড়িতে গিয়ে আর সে-আদর সে-যত্ন পেলাম না। মামার বাড়ির সে-আবহাওয়া বদ্‌লে গেছে। মামাতো ভাইবোনরাও বড় হয়ে গেছে সব। মামাবাবুর সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। আগে কত লোকজন আসতো। বৈঠকখানা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতক্ষণ ধরে আসর বসতো। কেউ আর আসেনা দেখলাম। মামাবাবু একলা নিজের ঘরে বসে কেবল তামাক খান। পুরনো চাকর রামধনি নিজেই সব করে। বাজার করা থেকে তামাক সাজা পর্যন্ত সমস্ত।

বাড়িতে ঢুকেই ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—পুতুল দিদি কোথায় রে ?

ফটিক যেন ভয় পেয়ে চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে থেমে গেল। কেউ কিছু বলে না।

বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় মা বললে—পণ্টু যেন তরুয়ার দিকে না যায়, দেখিস রামধনি—

মামার বাড়িটা ছিল শনিচরি বাজারে যাবার রাস্তার ওপরেই। আর সোজা রাস্তা ধরে পুব দিকে গেলেই তরুয়া। তরুয়াতে আগে কতবার গেছি। ওখানে আড়পা নদীর ধারে রেলের পাম্পিং স্টেশনে গিয়ে খেলা করেছি। ওপারে পেয়ারা-বাগানে গিয়ে মালীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে পেয়ারা খেয়েছি। আর, এবার তরুয়াতে যেতে কেন এত আপত্তি কে জানে।

রামধনি বুড়ো মানুষ। কিন্তু সে-ও কিছু বললে না।

বললে—ও-সব কথা বলতে নেই—

কিন্তু শেষে বললে অন্তু।

বললে—কাউকে বলবেনা বলো—মা-কালীর দিব্যি বলো—নইলে মা কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দেবে একেবারে—

বললাম—বলবো না, বল্ তুই—

—মা মঙ্গলচণ্ডীর দিব্যি করে বলো—

—মা মঙ্গলচণ্ডীর দিব্যি।

অন্তু বললে—পুতুলদি না—শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—

—পালিয়ে এসেছে ! কোথায় আছে ?

—ওই-যে বড়রাস্তার মোড়ে থাকতো অম্বিকা-দা, সেই আমাদের ল্যাবেনচুষ কিনে দিত ? তাতে আর পুতুলদিতে তরুয়ার একটা বাড়িতে আছে—

—তরুয়ার কোন্ বাড়িতে ?

—অ্যাডাম্স ব্লকে। পুতুলদির একটা মেয়ে হয়েছে, ভাই—

—আর জামাইবাবু ?

জামাইবাবুর খবর অন্তু রাখে না।

অন্তু বললে—একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছিলুম পুতুলদিকে দেখতে—কী নোংরা ঘর, ভাই—ময়লা কাপড় পরে তখন রান্না করছিল, আমাকে মুড়ি খেতে দিলে—আমার খুব কষ্ট হলো দেখে—

—তারপর ?

—তারপর পুতুলদি জিজ্ঞেস করলে বাবা কেমন আছে, মা কেমন আছে—সবাই কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে—

জিজ্ঞেস করলাম—আমার কথা জিজ্ঞেস করেনি পুতুলদি ?

—না ভাই, তোমার কথা জিজ্ঞেস করেনি।

বললাম—আজ যাবি আমার সঙ্গে, অন্তু ? আমায় বাড়িটা একবার দেখিয়ে দিবি।

অন্তু বললে—না। বাবা মা বকবে। সেদিন আমাকে বাবা যা মেরেছিল—

মনে আছে কতদিন কতবার মনটা তরুয়ার দিকে যাবার জন্যে ছটফট করেছে। ইস্টিশনে যাবার রাস্তার বাঁ দিকে পড়ে তরুয়া। তরুয়ার ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে গেলেই বড় বড় দুটো আমগাছের তলায় অ্যাডাম্‌স ব্লক। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। কোথাও কোনো বাড়ির জানলার ফাঁক দিয়ে যদি পুতুল দিদিকে দেখা যায়। অ্যাডাম্‌স সাহেবের বাড়িটা ছিল দোতলা। আর তার ডান দিকের সার-বাঁধা ছ'টা বাড়ি ছিল একতলা। সেগুলোতে থাকতো ভাড়াটেরা। অ্যাডাম্‌স সাহেবকে চিনতাম। বুড়ো গার্ডসাহেব। চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়ি করেছিল ওখানে। বিয়ে-থা করেনি। সাইকেল করে টিকিয়ে টিকিয়ে সকাল-সন্ধ্যেয় গিয়ে রানিং-রুমে গার্ডদের সঙ্গে আড্ডা দিত। কিন্তু মার ভয়ে কোনওদিন ওদিকে যেতে পারিনি। কেবল মনে হতো পুতুলদির কাছে আমার একটা পাওনা বাকি আছে। সেদিন সেই জিউলিগাছের কোটরের মধ্যে সেই চিঠিটা তো আমি রেখেই এসেছিলাম ঠিক। তারপর বিয়েবাড়ির 'হৈ চৈ'-এর মধ্যে বোধ হয় পুতুলদি সে-কথা ভুলে গেছে।

কিন্তু আবার মনে হতো অম্বিকাদাকে কী করে পছন্দ হলো পুতুল দিদির। পুতুল দিদির বরকে তো ভালোই দেখতে। মামাবাবু কত খোঁজ করে, কত খরচ করে ভাগলপুরে বিয়ে দিলেন।

সেদিন বুক ঠুকে সকালবেলাই চলে গেলাম তরুয়ার দিকে। কোন্ বাড়িতে পুতুল দিদি থাকে জানি না। তবু চলেছি। মনে হলো যা-হয় হোক—মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলেও পুতুল দিদির সঙ্গে দেখা করা চাই আমার।

সামনে আলকাতরা মাখানো জাফরি-দেওয়া ঘর। ভেতরের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। মনে হলো যদি পুতুল দিদি আমাকে দেখতে পায় নিশ্চয় ডাকবে। বার বার রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা করলাম—কেউ ডাকলে না। রাস্তায় ছোট ছোট মাদ্রাজীদের ছেলেরা খেলা করছিল—তাদেরও জিজ্ঞেস করি-করি করে জিজ্ঞেস করা হলো না।

পরের দিন আবার একবার বিকেলের দিকে যাব ভাবলাম। কিন্তু বাবার টেলিগ্রাম এসে হাজির হলো সেদিন। সকালবেলার নাগপুর প্যাসেঞ্জারেই রওনা হয়ে গেলাম বাবার কাছে।

যে-ক'দিন ছিলাম মামার বাড়িতে, দেখেছিলাম মামাবাবুর কাছে এক সাধু আসতো রোজ। মামাবাবু খুব ভক্তি করে অভ্যর্থনা করতেন। মামাবাবুকে আগে কখনও সাধুসন্ন্যাসী নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

রামধনি বলেছিল—মস্তবড় তান্ত্রিক সাধু উনি—জিনিস হারালে জিনিস পাইয়ে দেন—দুষমন থাকলে, দুষমন নষ্ট করেন—

ফটিক বললে—ও লোকটা শ্মশানে গিয়ে পূজো করে পুতুলদির জন্যে—

বললাম—কেন ?

ফটিক বললে—ও বলেছে, পূজো করলে আবার জামাইবাবুর বাড়িতে পুতুলদি ফিরে যাবে—

কিন্তু ফিরে সেবার যায়নি। যখন ফিরেছিল তখন পুতুল দিদির মেয়ে আরো বড় হয়েছে। মামাবাবু সে-ঘটনা দেখে যেতে পারেন নি। মেয়ের শোকেই প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তিনি মারাও গিয়েছিলেন। আমরা তখন কানপুরে।

শুনলাম—পুতুল দিদি নাকি বরের কাছে ফিরে গেছে—

আমি তখন চাকরিতে ঢুকেছি সবে। ফটিকও চাকরি করছে রেলে।

ফটিক লিখেছিল—জামাইবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের বউ মারা যাবার পর একবার এসেছিল মামার বাড়িতে—এসে কান্নাকাটি করতে পুতুল দিদি রাজী হয়েছে শ্বশুরবাড়ি যেতে। মেয়েকে নিয়েই পুতুল দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

আমি লিখেছিলাম—আর তোর অম্বিকা-দা ?

ফটিক লিখেছিল—অম্বিকা-দা সেই তরুয়ার বাড়িতেই আছে একলা—কার সঙ্গে মেশে, কী করে তাও জানি না।

তখন বড় হয়েছি আমরা। সব জিনিস বুঝতে শিখেছি। অতীতের ঘটনার নতুন অর্থ করেছি। তবু আমার কাছে অবাক্ লেগেছে কেমন করে এ সম্ভব হলো। ভেবেছি—কত বড় দরাজ বুক হলে পরের সন্তান-সুদ্ধ স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করতে পারে লোকে। কত বড় ক্ষমাপরায়ণ মন হলে এ সম্ভব হয় তা-ও বুঝেছি। বুঝেছি সংসারে আইন দিয়ে আর যত কিছুই বাঁধা যাক, মন বস্তুটি বড় শক্ত জিনিস, সে

কারও শাসন মানে না, কোনও আইন মানে না সে, কোনো বাঁধা-ধরা পথে সে চলতে চায় না। শুধু একটা জিনিস বুঝিনি—সেই পুতুল দিদিই কেন আবার তার স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে রাজী হলো। বুঝিনি বটে, কিন্তু বুঝতে চেষ্টাও যে করেছি তা-ও নয়। ভেবেছি স্বামী-স্ত্রীর মনের অন্তস্তলে কোথায় কোন্ দুর্ভেদ্য রহস্য লুকিয়ে আছে তা বোঝবার চেষ্টা করাও যেন বৃথা। পুতুল দিদির স্বামিত্যাগও যেমন দুর্বোধ্য, স্বামীকে তার পুনর্গ্রহণও তেমনি। সে সম্বন্ধে বাইরের লোকের মতামত শুধু নিরর্থকই নয়, মিথ্যেও বটে। তাতে সুবিচারের নামে অবিচারই তো ঘটতে দেখি সংসারের সর্বত্র। সুতরাং সে-চেষ্টাও আর করিনি।

মামাবাবুর মৃত্যুর পর থেকে মামার বাড়ি যাওয়া আমাদেরও কমে গেল বটে, কিন্তু সম্পর্ক ঠিক-ই ছিল। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে দেখা বা চিঠি লেখা হতো। আমাদের বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও জটিল হয়ে উঠলো।

ফটিকের ঘাড়েই তখন সংসারের ভার পড়েছে। তিন বোনের বিয়ে, দুই ভাইকে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করানো থেকে বাড়িটা দোতলা তোলা। তা ছাড়া লোক-লৌকিকতা খাওয়া-পরা, এই সামান্য রেলের চাকরি থেকে করা সামান্য কথা নয়।

সেবার অন্তুর বিয়েতে গিয়েই দেখলাম—এলাহী কাণ্ড করে বসেছে ফটিক। রোশনচৌকি, ব্যাণ্ড, খাস-গেলাসের আলো, বাজি ফাটানো আর বিলাসপুর ঝেঁটিয়ে সমস্ত বাঙালীদের সপরিবারে খাওয়ানো কি কম খরচের ব্যাপার! দেখে মনে হলো—ফটিক কি চাকরিতে মোটা ঘুষ পায় নাকি?

বলেছিলাম—ধার-দেনা হলো বোধহয় তোর অনেক—

ফটিক বললে—আমি ধার করবার পাত্তোরই বটে—আমার তো ওই চাকরি, জানিস তো তুই—দশ আনা রোজ—ওদিকে মিণ্টুর বরকে বিলেত পাঠানো হয়েছে জানিস তো—আর এবারে বাড়িটাও তেতলা তোলা হবে—ঘরে আর কুলোচ্ছিল না—

বললাম—তা তো বটে—

ফটিক বললে—এবার পূজোতে আত্মীয়-স্বজনকে কাপড় দেওয়া হলো। সবাই খুশি, দিতে পারলে সবাই ভালো—কী বল্—

বললাম—কিন্তু এমন করে টাকা ওড়ানোর দরকার কী—

ফটিক বললে—এ-সব কি আমার ইচ্ছে—বললে যে পুতুলদি শোনে না—

—পুতুলদি?

—হ্যাঁ, পুতুলদি-ই তো অন্ত-তন্তর বিয়ে-টিয়ে দিলে, যাবতীয় খরচ করছে সে, পুতুলদি ছিল বলে আবার বিলাসপুরে বাঙালী সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি, ভাই—পুতুলদির জন্যেই একবার মাথা হেঁট হয়েছিল আমাদের, আবার ওই পুতুলদি-ই আমাদের মাথা উঁচু করিয়ে দিয়েছে, এবার এখানকার দুর্গোপূজোয় আটশো টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছিল, খুব খুশি সবাই—আবার বলেছে এখানকার 'লেপার হোম'-এর জন্যেও কয়েক হাজার টাকা দেবে—টাকার তো অভাব নেই জামাইবাবুর—

—অত টাকা কী করে হলো ?

—ব্যবসায়ে জানিস তো উঠ্‌তি পড়্‌তি আছে। এখন উঠ্‌তির সময় চলছে—দু'হাতে টাকা উপায় করছে জামাইবাবু—

জিজ্ঞেস করলাম—পুতুলদির ছেলেমেয়ে কী ?

—ওই সেই মেয়ে একটা—লক্ষ্মী। আর তো হলো না—

এ-সব ঘটনা অনেক দিনের। পুতুল দিদির জীবনটা পূর্বাপর আলোচনা করে যেমন কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাইনি, তাৎপর্য খোঁজবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। এখন বুঝেছি ফরমুলা দিয়ে বাঁধা যায় গল্প-উপন্যাসকে—মানুষের জীবন ফরমুলার ধার ধারে না। নইলে সেই পুতুল দিদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যবসা তুলে দিয়ে আবার কেন বিলাসপুরে আসে! কোতোয়ালির সামনে আবার বিরাট প্রাসাদ তুলেছে পুতুল দিদি। স্বর্গত বাবার নামে বাড়ির নাম দিয়েছে 'জানকী-ভবন'। যে-মামাবাবু পুতুল দিদির ব্যাপারে লজ্জায় অপমানে দেহত্যাগ করলেন, সেই মামাবাবু—জানকীনাথ বসু-ই অমর হয়ে রইলেন বিলাসপুরে। এখন জানকীবাবুর নামডাক খুব। বাবার নামে হাসপাতাল করে দিয়েছে পুতুল দিদি। ট্রেজারির পাশে কাছারির মুখোমুখি মস্ত দু'শো বিঘে জমির ওপর 'জানকীনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল'। জানকীবাবুর নাম করলে এখন হাজার মাইল দূরের লোক পর্যন্ত চিনতে পারে। হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে—ধন্য মেয়ে জন্মেছিল বটে।

আর তা ছাড়া গুণও কী কম!

মারহাট্টিদের গণেশপুজো, মাদ্রাজীদের পঙ্গল, বাঙালীদের দুর্গাপুজো, ছত্রিশ-গড়িয়াদের ছট্ পরব,—এক একটা উৎসবে হাজার হাজার লোক কাপড় পায় একখানা করে। আর সিধে।

অথচ খুব বেশিদিনের কথাও তো নয়। কিন্তু মানুষ চিনি, মানুষের সব জানি বলে বড়াই-এরও তো অন্ত নেই আমাদের। কী করে কী হলো—এসব ভাবতে গেলে কেমন যেন উপন্যাস পড়ছি বলে মনে হবে।

সেই কথাই ভাবছিলাম লক্ষ্মীর বিয়েতে এসে। পুতুল দিদির একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে আজ। ঘটার শেষ নেই। জাঁকজমকের অন্ত নেই।

পুতুল দিদিকে দেখলাম অনেকদিন পরে। একটা তসরের থান প'রে বসে আছে। চারিদিকে সাত্ত্বিক সতীলক্ষ্মী বিধবা-সধবা আত্মীয়-স্বজন তোষামোদ করছে তাকে ঘিরে। পাশে লক্ষ্মী বসে আছে।

আন্নাদিদি বলছে—তুই কিছু মুখে দে, পুতুল—আমরা তো আছি—দেখছি সব—

কাল একাদশী করেছে পুতুল দিদি। নির্জলা একাদশী করে আজ এতটা বেলা মুখে কিছু দেয়নি বলে আত্মীয়াদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। কিন্তু একটা জিনিস দেখে অবাক্ লাগলো। সকাল থেকে পুলিশ-কনস্টেবলে ছেয়ে গেছে বাড়ির চারিদিক।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ-পাহারা কেন রে?

ফটিক বললে—ও একটা ব্যাপার আছে—পরে বলবো—

বাড়ি আবার সরগরম হয়ে উঠেছে। অন্তু এসেছে, নন্তু এসেছে। জামাইরাও এসে বাড়ি আলো করেছে। ভাই ভাজ ভাইপো, বোন বোনঝি বোনঝি-জামাই —সব।

পুতুল দিদি বললে—ছেলেদের নিয়ে এলিনা কেন শুনি—? কতদিন তাদের দেখিনি—বউকেও নিয়ে এলি নে—বড় হয়ে সব পর হয়ে গেলি নাকি তোরা?

রাত্রের দিকে পুলিশ-পাহারা আরও বাড়লো।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ-পাহারার বন্দোবস্ত কেন?

ফটিক ব্যস্ত ছিল। তবু গলা নীচু করে বললে—পুতুলদি কোতোয়ালির বড় দারোগাকে বলে নিজে এ-ব্যবস্থা করেছে—

—কেন?

—ওই লক্ষ্মীর জন্যে। ভাগলপুরে যতদিন ছিল, ওখানকার পাড়ার ছেলেরা ভালো নয়, লক্ষ্মীও ঠিক নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারেনা তো, সে-বয়েসও হয়নি, একবার এক ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপরে অনেক কষ্টে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে—

কেমন যেন অবাক্ হয়ে গেলাম।

ফটিক বললে—তা এইবার বিয়ের সম্বন্ধ হবার পর চোখে-চোখে রাখতে হচ্ছে। ওকে উড়ো চিঠিও দিয়েছে একটা, তাই পুতুলদি নিজের কাছে বসিয়ে রেখেছে সমস্ত দিন—

কিন্তু মনে হলো—বরও তো আশ্চর্য ছেলে!

ফটিক বললে—তাকেও সব বলা হয়েছে, সব শুনেই সে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে—

—খুব ভালো বলতে হবে তাকে—

ফটিক বললে—টাকায় সব হয় ভাই, শাশুড়ীর একমাত্র মেয়ে জানে তো—টাকার লোভটাও আছে বৈকি।

তা যা হোক, কখন বিয়ের ধুমধামের মধ্যে সমস্ত দিন কাটলো। বর এল। শাঁখ বাজলো। হুলুধ্বনি উঠলো। হাজার-হাজার লোক পাত পেড়ে লুচি তরকারি খেয়ে কখন বিদায় নিলে, কিছুই বোঝা গেল না। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে কাটলো সন্ধ্যেটা। কোনও বিঘ্ন ঘটতে পারেনা জানতাম। বিঘ্ন হলোও না।

আমি এক ফাঁকে সরে পড়লাম।

ফটিক ধরলে—এখুনি যাবে কেন, গাড়ি তো তোমার কাল ভোরবেলা—

বললাম—সেই ভোর চারটেয় ট্রেন, তারপর আবার শীতকাল—অত সকালে স্টেশনে যাওয়া—স্টেশন কি এখানে নাকি—

—তোমাকে আমি গাড়ি করে পৌঁছে দেব, কোনো ভাবনা নেই—

তবু আমি থাকতে রাজী হইনি। খাওয়া-দাওয়া চুকলেই বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রে গিয়ে ওয়েটিং-রুমে আরাম করে শুয়ে থাকবো। তারপর ট্রেন আসবার ঘণ্টা শুনলেই উঠে পড়া যাবে। শীতকালের রাত। রাত চারটে মানে শেষ রাত্তির। আর বিলাসপুরের আপার-ক্লাস ওয়েটিং-রুমটা ভারি নিরিবিলি। দোতলার ওপর। বেশী লোকজন থাকে না। ভোরের ট্রেনে যেতে গেলে বরাবর এমনি রাত্রে গিয়ে শুয়ে থেকেছি সেখানে। এ আজ নতুন নয়। কিংবা প্রথমও নয়।

একটা টাঙ্গা নিয়ে উঠে পড়লাম স্টেশনের দিকে।

তা এই ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই সে-রাত্রে যা ঘটলো তার পরে দেখলাম সত্যি আমার এতদিনের চেনা পুতুল দিদি রীতিমতো একটা গল্পে দাঁড়িয়ে গেছে বেশ।

সেই ঘটনাটি-ই বলি এখানে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কুলীর মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে দোতলায় ওয়েটিং-রুমে তো গিয়ে হাজির। লোকজন বিশেষ তখন কেউ নেই। কেবলমাত্র একজন ভদ্রলোক ভালো খাটটা জুড়ে বসে আছেন।

কুলীকে বলে দিলাম গাড়ি আসবার লাইন-ক্লিয়ারের ঘণ্টা হলেই যেন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় আমার। তারপর শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম।

শোবার আগে ভদ্রলোকের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম।

বললাম—আলো নিভিয়ে দিলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে—

ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন—কেন?

—না, আমার আবার আলো জ্বললে ঘুম আসেনা কিনা—

ভদ্রলোক বললেন—আমি এখুনি চলে যাবো, এই সাড়ে এগারোটার গাড়িতে—আপনি বরং এই খাটটায় এসে শোন্—এইটেই মজবুত, শুয়ে আরাম পাবেন—আমি সারাদিন ছিলাম এখানে—

বলে ভদ্রলোক সত্যিই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুলী ডেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ওঁর খাটটি দখল করে শুয়ে পড়লাম। শুধু বাইরের সিঁড়িতে একটা আলো জ্বলতে লাগলো। ভারি শীত পড়েছিল। আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম কখন টের পাইনি।

আর তারপর মনে হলো বোধহয় মিনিটখানেকও হয়নি। গাঢ় ঘুমের মধ্যে দু'ঘণ্টাকেও যেন একমিনিট সময় বলে ভুল হয়েছে তো কতবার।

অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ যেন কে ডাকতে লাগলো—দাদাবাবু গো—ও দাদাবাবু—

প্রথমটায় অস্পষ্ট। তারপর যেন মনে হলো রামধনির গলা। মামাবাবুর বুড়ো চাকর রামধনির গলার মতন। কিন্তু এত রাত্রে আমাকে কেন ডাকে! বললাম—হুঁ—

রামধনি বললে—দিদিমণি বড় রাগ করছিল আপনার ওপর, গেলেন না একবার, তাই খাবার পাঠিয়ে দিলেন—আর এই চিঠিটা—

কেমন যেন অবাক্ লাগতে লাগলো।

রামধনি বললে—আমার আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে দাদাবাবু, যাই আজ্ঞে আমি—খাবার রইল, খাবেন কিন্তু—নইলে, দিদিমণি পই পই করে বলে দিয়েছে···

সত্যিসত্যিই আরো দু'একবার ডেকে রামধনি চলে গেল। অনেক রাত হয়ে গেছে। সে-ও ক'দিন ধরে নাগাড়ে খাটছে। তাকে আবার অনেকদূর সিটিতে ফিরে যেতে হবে এই শীতের রাতে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আলো জাললাম। একটা টিফিন কৌটোতে থরে

থরে লুচি পোলাও মাংস মাছ মিষ্টি যত্ন করে সাজানো। আর একটা ভাঁজ-করা চিঠি। চিঠিটা খুলতেই নীচে নজর পড়লো পুতুল দিদির নামসই।

পুতুল দিদি লিখছে: চিরটা কাল তোমার এমনি অভিমান করেই কাটলো, তাতে লাভটা কী হলো বলতে পারো? কাল সকালে খাবারগুলো বাসী হয়ে যাবে তাই রাত্রেই রামধনিকে দিয়ে পাঠালাম। তোমার জন্যে কি মানুষকে লজ্জা-সরম সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে বলো! এত খরচ করে ও-শাড়ি দেবার কী দরকার ছিল? তোমারও যেমন মেয়ে, আমারও তো তেমনি। আমি তো দিয়েইছি। আমার দিলেই তোমারও দেওয়া হলো। আজ রাত্রের ট্রেনেই চলে যেও না; অনেকদিন পরে এলে, দেখা করে যেও। আমার হাতে টাকা নিতেও তো তোমার বাধে, পর পর ক'বারই মনি-অর্ডার ফেরত এল। ব্যাপার কী! বুড়ো বয়সে কি আবার রাগ অভিমান ভাঙাতে হবে নাকি! দেখবার লোক তোমার কেউ নেই, এটা মনে রেখে শরীরটার দিকে নজর রেখো,······

আত্মহত্যা

চল্লিশ-জোড়া চোখ একদৃষ্টে প্রমীলার দিকে চেয়ে আছে। প্রমীলা বই থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চেহারার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। একদিন ওদের মতো বয়েস ছিল প্রমীলার। ওদেরই মতো শাড়িটাকে আঁটসাঁট করে প'রে দশটা বাজতে-না-বাজতে এসে বসতো ফার্স্ট বেঞ্চে। তারপর কী মনোযোগ দিয়েই না পড়ানো শুনেছে টিচারদের! একে একে ইংরিজী, হিস্ট্রী আর অঙ্কের ক্লাসের পর আধঘণ্টা টিফিনের ঘণ্টা—তারপর আবার একে একে সমস্ত ক্লাসের শেষে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি যাওয়া।

—বাসন্তী—

বাসন্তী ঘোষাল পেছনের বেঞ্চে বসে পাশের মেয়েটির সঙ্গে ফিসফিস করে গল্প করছে আর হাসছে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে আসছিল প্রমীলা।

—বাসন্তী—

প্রমীলা আবার তাকালে। সব মেয়েরা পেছন ফিরে দেখলে। প্রমীলা যখন ওদের মতো ছাত্রী ছিল, তখন এমন করে কোনওদিন টিচারদের পড়ানোর সময় গল্প করেনি।

করুক্‌গে গল্প। লেখাপড়া করেই বা তার কী হয়েছে! হয়ত বাসন্তী ঘোষাল আর পড়বেই না কাল থেকে। হয়ত বিয়ে হয়ে যাবে আজকালের মধ্যে। মস্তবড় ঘরেই হয়ত পড়বে। বলতে গিয়েও কিছু বলা হলো না বাসন্তীকে।

বোর্ডিং-এর দালানে বসে প্রমীলা তরকারি কুটছিল।

গৌরী এল। বললে—প্রমীলাদি একটা সুখবর আছে—ওর বাবা রাজী হয়ে গেছে—

প্রমীলা মুখ তুললে। বললে—তা হলে মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে বল্—

—সত্যি প্রমীলাদি, আমি ভাবতেও পারিনি—আজ সকালবেলা ইস্কুলে গেছি তখনও জানি না, দুপুরবেলা চিঠি এসেছে—এতদিন পরে ওর বাবা মত দিলে—

—মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে শুনি—

—বা রে, ও আসুক, ওকেই ধোরো-না তোমরা—শনিবার তো আসছে—

ক'মাস মাত্র গৌরী এসেছিল এ-ইস্কুলে। বড় দুঃখও নেই কোনো, বড় আশাও ছিল না কখনও হয়ত। শৈলেশকে ভালোবাসা ছাড়া জীবনে আর কোনও উদ্দেশ্য ওর নেই। শেষ পর্যন্ত শৈলেশের বাবা মত দিয়েছে—এ-যে কত বড় সুখবর, এ শুধু গৌরীই বোঝে।

গৌরীর মতো ক'রে ক'জন সুখী হতে পারে!

আভা তখনও ফেরেনি। ইস্কুলের পর দুটো টুইশ্যানি করতে হয় ওকে। শীলা এতক্ষণ বোধ হয় আহ্নিক করছে ওর ঘরে। রেবা হয়ত চিঠি লিখতে বসেছে। সপ্তাহে অন্তত দুটো করে চিঠি আসে রেবার নামে। এত চিঠিও ওরা দুজনে দুজনকে লিখতে পারে!

—বামুন-দি—

প্রমীলা আলাদা করে একটা বাটিতে কপির টুকরোগুলো তুলে রাখলে।

—এই রইল শীলার নিরিমিষ তরকারি—আর এই মাছের কালিয়ার আলু কুটে দিলাম—আভার জন্যে ঝাল দিয়ে এগুলো রেঁধো—ও আবার ঝাল না-হলে খেতে পারে না, জানো তো—

প্রতিদিনের খাবার দিকটা প্রমীলাকেই দেখতে হয়। ওদের সকলের বয়েস কম।

বাপ-মা, ভাইবোনদের ছেড়ে এতদূর বিদেশে চাকরি করতে এসেছে। জীবনে প্রমীলা কারও স্নেহ-ভালবাসা পেলেনা বলে ওদের সে-স্নেহ থেকে কেন বঞ্চিত করবে।

—শীলা, আজ নিরিমিষ কপির তরকারিটা কেমন হয়েছে রে—আমি নিজে রেঁধেছি—

—আভা, রোজ রোজ তোমার খাবার নষ্ট হয়—বড়লোক ছাত্রীর বাড়িতে রোজ রোজ খেয়ে এলে এদিকে যে নষ্ট হয়—আগে বলে যেতে পারো না—

—গৌরী, তুই এমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস, তোর শৈলেশ ভাববে প্রমীলাদি বুঝি ভালো করে খেতে দেয় না—ও তো জানে না, শৈলেশের কথা ভেবে ভেবে রোগা হচ্ছিস—

গরমের দিনে রবিবারের তুপুরে আভা দৌড়ে এসেছে এ-ঘরে।

—প্রমীলাদি, আইসক্রীম-ওয়ালা যাচ্ছে—আইসক্রীম খাওয়াবে ?

বামুনদিদি খবর পাঠালে মালীকে। মালী নিয়ে এল আইসক্রীম।

—একি, তুমি খাবেনা প্রমীলাদি ?

আভা, রেবা, গৌরী তুটো তুটো করে নিয়েছে। প্রমীলা ছ'টা আইসক্রীমের দাম বার করে দিলে ব্যাগ থেকে।

—তুমি খেলেনা প্রমীলাদি, তবে আমরাও খাবো না—

আভা রেবা গৌরী রাগ করলে। প্রমীলাদি-ই যদি না-খাবে, তবে কিসের এই আনন্দ। তুমি আমি সকলে মিলে খেলেই তো মজা। এ যেন খেতে চেয়েছি বলে খাওয়ানো।

—আর যদি কখনও খাই তো কী বলেছি—গৌরী মুখ বেঁকিয়ে বসলো।

—আরে না না—রাগ করিসনি তোরা—আজ শীলার একাদশী কিনা—

সবাই বুঝলো। তা তো বটেই। শীলার আজ নির্জলা একাদশী, ও জলটা পর্যন্ত ছোঁয় না। এতোটুকু মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে একী নিষ্ঠুর কৃচ্ছ্রসাধনা ! স্বামীর স্মৃতিকে হয়ত এমনি করেই চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। তা সে যা-হয় হোক—প্রমীলা শীলার এই একাদশীর দিনে কেমন করে এই বিলাসিতা করতে পারে। শীলার মা এখানে নেই—তিনি থাকলে তিনিই কি মেয়ের নির্জলা উপোসের দিনে আইসক্রীমের নিষ্প্রয়োজন বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন ? প্রমীলার বয়েস যাই হোক—পদমর্যাদায় প্রমীলাই বা সকলের মার চেয়ে কম কিসে।

বোর্ডিং-এর সমস্ত টিচারদের সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য সব দেখতে হবে প্রমীলাকে। শুধু-যে বয়েসে বড় তা বলে নয়। বহুদিনের গুরুদায়িত্বের অভ্যাসে এটা তখন

কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। ওদিকে সেক্রেটারি রায়সাহেব যদুনাথ চৌধুরী আছেন। ইস্কুল সম্বন্ধে যা-কিছু তাঁর করণীয় সব করতে হবে প্রমীলাকেই।

—এই টেক্সট্ বইগুলো পড়ে দেখো প্রমীলা, চলবে কিনা—পাবলিশার বড্ড ধরেছে আমাকে—

—ইস্কুলের নতুন খানপঞ্চাশেক বেঞ্চ দরকার, দেখো তো প্রমীলা এই কোটেশন-গুলো—

—ইস্কুল ফাণ্ডের সেই যে ছ'হাজার টাকা পড়েছিল বাজে একটা ব্যাঙ্কে, ভাবছি ওটা তুলে নেব, চারদিকে যেমন ফেল হচ্ছে ব্যাঙ্ক—কোন্‌টায় রাখি বলো তো—

রায়সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন। একদিন কী খেয়ালে একটা ছোট চালাঘরে মেয়েদের ইস্কুল করেছিলেন। পাঠশালার মতো দুজন পণ্ডিতমশাই নিয়ে। বাঙলাদেশের বাইরে বাঙলা শেখাবার আগ্রহটা ছিল মনে মনে। রামমোহন, ভূদেব মুখুজ্যের ভক্ত ছিলেন; বড় কিছু না হোক, ছোটখাটো একটা কীর্তি রেখে যাবেন এমন বাসনাও ছিল বোধ হয়। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। বিশেষ করে বোমার হিড়িকে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে যায় আশাতীত। তারপর অনেকে রিটায়ার করে এখানেই বাস করছেন। এখানকার পোস্ট-অফিস, রেলস্টেশন, বাজার-হাটের মতো ইস্কুলটা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

রায়সাহেব বলেন—এই যে, এইটিই আমার হেড-মিস্ট্রেস।—প্রমীলা, এঁকে প্রণাম করো, ইনি হলেন পুরনো বন্ধু আমার, রিটায়ার্ড সাবজজ···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গোলগাল, মোটাসোটা বড় শরীরটা নিয়ে ছোট একটু প্রণাম করে প্রমীলা—

কোথাও সভা-সমিতি বা সম্মিলনীর আয়োজন হলে রায়সাহেব উদ্যোক্তাদের বলেন—কমিটির মধ্যে ওঁকেও নিও, আমার হেডমিস্ট্রেসকে···প্রমীলা, প্রমীলা দেবী, —একজন মহিলা সভ্যা থাকা ভালো···কী বলো—

অনেক দূর দূর থেকে মেয়েদের গার্জেনরা আসেন। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেব্‌লের সামনে বসে বলেন—আপনার নাম শুনেই আসা—শুনেছি এখানে শিক্ষাটা ভালো হয়—আমার মেয়েটি আবার একটু দুষ্টু কিনা—

ওই সুনামটা বজায় রাখতে প্রমীলাকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা চারদিকে নজর রাখতে হয়। মেয়েদের খাবার জলের জায়গাটা ঢাকা রইল কিনা; মেয়েদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে কি না—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার দিকেও দেখতে হয়। ইস্কুলের মধ্যে মেয়েদের পান খাওয়া নিষেধ। চীৎকার, গোলমাল, জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখা—সমস্তই বারণ।

আভার সেদিন সন্ধ্যেবেলা পড়াবার কাজ নেই। এসে বললে—প্রমীলাদি, গৌরী আমাদের সিনেমা দেখাচ্ছে—

—ও, বিয়ের আনন্দে বুঝি—

— না, আমরাই তো ধরেছি সবাই, রেবাটা আজ চেপে ধরেছে, হাতে পয়সা নেই বলতে পারবে না—আজই মাইনে পেয়েছে—চলো, বা রে—শেষকালে দেখছি তোমার জন্যেই দেরি হয়ে যাবে—

রেবাও এসে গেল। নিখিলের পূজোয়-দেওয়া শাড়িটা পরেছে আজ। আজ যেন রেবা আর ইস্কুল-মিস্ট্রেস নয়। প্রমীলা চেয়ে দেখলে। বেশ মানিয়েছে রেবাকে। কতদিন ধরে মাস্টারি করছে রেবা। আর, কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে নিখিলের জন্যে। নিখিলের একটা ভালো চাকরি হলেই ও ছেড়ে দেবে এ-চাকরি। তারপর দুজনে মিলে এক জায়গায় নীড় বাঁধবে। ছোট সংসারের নিবিড় পরিবেশে দুজনে করবে স্বর্গ-রচনা।

রেবা বললে—অনেকদিন পরে এ-ছবিটা এল প্রমীলাদি, নিখিল লিখেছে এ বছরে অ্যাকাডেমী প্রাইজ পেয়েছে ছবিটা, ওরও খুব ভালো লেগেছে,—তৈরি হয়ে নাও প্রমীলাদি—গৌরী বাথরুমে ঢুকেছে—এল বলে—

প্রমীলা মৃদু হেসে বললে—কিন্তু আমি তো যেতে পারবোনা রে তোদের সঙ্গে—

—কেন? বা রে, তা হলে আমরাও···আমি বলছি প্রমীলাদি, ছবিটা তোমার ভালো লাগবেই—নিখিল লিখেছে যে···কে কে আছে জানো ছবিতে—

প্রমীলা হাসলো। বললে—বলুক্‌গে তোর নিখিল—বরং তুলসীদাস কি মীরাবাঈ এলে দেখা যাবে—তা হলে শীলাও যাবে আমাদের সঙ্গে···আমরা সবাই যাব আর ও-ই একলা বোর্ডিং-এ থাকবে—সে কেমন করে হয়—

শেষপর্যন্ত হৈ হৈ করতে করতে ওরা চলে গেল।

অনেক রাত্রে প্রমীলা শীলার ঘরে গিয়ে হাজির।

—এই ছাখো ক্লাস টেন-এর মেয়েরা এমন বানান ভুল লিখেছে, আমি এদের কেমন করে পাস করাই বলো তো, প্রমীলাদি—বিশ্বাস না হয় তো নিজের চোখেই ছাখো—

শীলার ধবধবে সাদা থানের মতো বিছানার চোখ-ধাঁধানো সাদা চাদরের ওপর প্রমীলা বসলো। শীলার কাছে শীলার বিছানার ওপর বসতেও যেন কেমন সঙ্কোচ হলো প্রমীলার। শীলাকে দেখলেই যেন কেমন চোখে ধাঁধা লেগে যায়। শীলার অকাল-বৈধব্য তাকে যেন এই ইস্কুল-মিস্ট্রেসদের বোর্ডিং-এর আবহাওয়ার মধ্যে

এক অপরূপ স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। দল বেঁধে আইসক্রীম খাওয়ার দলে সে নেই, সিনেমায় যাওয়ার পার্টিতে সে নেই। কিন্তু তবু প্রমীলাকে কেবল এই দুটো দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। সংসারে বুঝি এই স্কুল ছাড়া শীলার আর কোথাও কিছু আকর্ষণ নেই। এই এক জায়গায় দুজনের যেন অপূর্ব মিল! যখন গরমের দীর্ঘ ছুটিতে সবাই যে-যার বাড়িতে চলে যায়, শীলা পড়ে থাকে এই বোর্ডিং-এ। আর থাকে প্রমীলা। একজন কুমারী আর একজন বিধবা। ইস্কুলের উন্নতির চিন্তায়, মেয়েদের মানুষ করবার মহৎ প্রেরণায় ওরা জীবন-যৌবন জলাঞ্জলি দিচ্ছে—ওদের দেখে এমনি ধারণা পোষণ করাও বুঝি অন্যায় নয়।

শীলা বললে—এবার সামার-ভেকেশনের সময় আমি কোচিং-ক্লাস করবো প্রমীলাদি—এরকম হলে আমাদের স্কুলের যে বদনাম হবে—

সেদিন আভা বললে—জানো প্রমীলাদি—আমার টুইশ্যানি কমলো একটা—

—কেন—

—বাসন্তী ঘোষালের বিয়ে। বিয়ের পর কে আর পড়ে বলো—তা মেয়েটার ভাগ্যি ভালো, স্বামী বুঝি কোন্ মেজর একজন—দেখতেও চমৎকার—কলকাতায় নিজেদের বাড়ি—

আভার তিরিশ টাকার টুইশ্যানি যাওয়ার চেয়ে বাসন্তী ঘোষালের বিয়ের সংবাদ-টাই বড় মনে হলো প্রমীলার কাছে! দেখতে বাসন্তীকে কি খুবই ভালো? লেখা-পড়ার ধার দিয়েও যেত না কখনও। এম-এ পরীক্ষার পর বি-টি দেবার সময় প্রমীলারও মনে এ-কথা উদয় হয়েছিল একবার। সঙ্গে যারা পড়তো একে একে সবাই যখন সরে পড়লো, নিজেকে তখন বিজয়িনীই মনে হয়েছিল। তারপর মোটা চশমার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও মোটা হয়ে এল। পদোন্নতি হলো। প্রতিষ্ঠা হলো। সময় গড়িয়ে চললো কুটিল গতিতে। নিজেকে কৃপা করবার অবসর আর মিললো না।

রায়সাহেব ডেকে পাঠালেন সেদিন। বললেন—তুমি মা, রেবা ভাদুড়ীকেও একমাসের ছুটির রেকমেণ্ড করেছ—ইস্কুল চলবে কেমন করে—এম্নিতেই কম স্টাফ নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে—

প্রমীলা ফাইলটা হাতে নিয়ে পাখার তলায় বসেও ঘামতে লাগলো।

—এই সেদিন গৌরী চ্যাটার্জি বিয়ের জন্য ছুটি নিয়ে গেল, তাও তিন মাস হয়ে গেছে—এখনও তো এল না—আর আসবেও না বোধ হয়—

শৈলেশের বড়লোক বাবার মত হওয়াতে গৌরীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে কেন আর এই সাতশো মাইল দূরে চাকরি করতে আসবে? প্রমীলা তাকে বাধা দেবার কে! তারপর এই রেবা। নিখিল যে একটা চাকরি জুটিয়েছে।

সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করলেন—এই তো সামার-ভেকেশন গেল সেদিন—বাড়ি থেকে এল সবাই—এরি মধ্যে আবার ছুটির দরকার হলো কিসে—এরও কি বিয়ে নাকি, মা—

—হ্যাঁ—একটু হেসে মাথা নীচু করলে প্রমীলা।

—সে তো ভালো কথাই, মা—ভালো-ই কথা—কিন্তু···সামনে টেস্ট পরীক্ষা—ক্লাস-প্রমোশনের সময়—

কিন্তু সেক্রেটারির যুক্তিটায় যেন জোর কম বলে মনে হলো। কিংবা বিবাহিত রায়সাহেব বুঝি অবিবাহিত হেড-মিস্ট্রেসের সামনে তা নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না।

বাইরে নিখিল দাঁড়িয়ে আছে। হেড-মিস্ট্রেসের অফিসে চেয়ারে বসবার অবসর-টুকুও যেন নেই তার। রেবাকে দেখবার আগ্রহে বুঝি এতই অধীর সে।

রেবা পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করলে। বললে—বিয়েতে যেতে চেষ্টা কোরো, প্রমীলাদি—

মালকোঁচা করে ধুতিটা পরা। গায়ে একটা নীল শার্ট। চুল ওলটানো। পায়ে কাবলী জুতো। রেবার বিছানার বাণ্ডিল আর স্যুটকেসটার পাশে দাঁড়িয়ে রেবার জন্যেই অপেক্ষা করছে। তারপর একটা সাইকেল-রিক্সা ডেকে দুজনে গিয়ে ট্রেনে উঠবে। শৈলেশও একদিন ওমনি করে এসেছিল গৌরীকে নিতে। গৌরীর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিও এসেছিল। তারপর আভাও হয়ত একদিন চলে যাবে। অবস্থা খারাপ বলেই এতদিন চাকরি করতে হচ্ছে। কিন্তু তার পর? তারপর শীলা! শীলা আর সে।

কিন্তু এত কথা ভাববার সময় নেই প্রমীলার।

অনেক রাত হয়ে গেছে। বোর্ডিং-এর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পশ্চিমের রাত। শুকনো আবহাওয়া। হাওয়া নেই কোথাও। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। মাটি আর আকাশ যেন এদেশে এসে বন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্তত প্রমীলার কাছে তাই মনে হয়। শীলার মতো সর্বাঙ্গে বৈধব্যের সাজ এখানকার মাটিতে আর আকাশের গায়ে।

ছোট বাড়িতে এত ছাত্রী ধরতো না। তাই সেক্রেটারির বাড়ির পাশে ইস্কুলের

নতুন দোতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে। ছাত্রী আরো বেড়েছে—প্রমীলার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আরো বেড়েছে। প্রমীলা শরীরের চাপে না-হোক দায়িত্বের চাপে আরো ভারি হয়েছে ইদানীং। আশেপাশের আরো অনেক শহরে নাম ছড়িয়ে পড়েছে বিলাসপুরের ইস্কুলের আর তার হেড-মিস্ট্রেস প্রমীলা সরকারের।

দূর থেকে হেড-মিস্ট্রেসকে আসতে দেখলে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায় ছাত্রীরা। বড় কড়া লোক এই প্রমীলা সরকার।

গার্জেনরা বলে—এই-ই তো ভালো—একটু শাসনের মধ্যে না থাকলে কী ছেলেই বলো আর মেয়েই বলো—সৎশিক্ষা পায়—

কিন্তু এত অমায়িক ব্যবহারও আবার আর কারও কাছে পায় না ছাত্রীরা।

বাবা মারা গেছে, ছ'মাসের মাইনে দিতে পারেনি—এমন ছাত্রীকে ফ্রি-শিপ করিয়ে দিতে আর কে পারতো। রায়সাহেব এখন বৃদ্ধ হয়েছেন আরো, নিজের ব্যবসার কাজে আরো সময় পান না--স্বাস্থ্যেও তেমন কুলোয় না। প্রমীলাকেই একলা সেক্রেটারির কাজ, স্কুল-কমিটির সমস্ত কাজ দেখতে হয়। নতুন বিল্ডিং হবে তার কনট্রাক্ট দেওয়া, ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ম্যাট্রিকে মেয়েদের পরীক্ষার সেণ্টার নিয়ে চিঠিপত্র লেখা, চাকরির অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা—সমস্তই করতে হয় প্রমীলাকে। সেক্রেটারি শুধু তলায় নামসই করে দিয়েই খালাস।

শীলা এল। বললে—প্রমীলাদি, আমার একমাসের ছুটি রেকমেণ্ড করতে হবে—

ছুটি!—প্রমীলা অবাক্ হয়ে গেল। গৌরী গেছে, রেবা গেছে। আভাও একদিন বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। ভাই নেই, সব ক'টাই বোন। ছ'টি-সাতটি ছোট ছোট বোনের তদবির তদারক, এক কথায়, বোনদের মানুষ করতে একমাত্র আভাই ছিল সকলের মাথার ওপর। এখানে যতগুলো টাকা মাস্টারি আর টুইশ্যানি করে উপায় করতো সব পাঠিয়ে দিত সংসারে। তারও একদিন চিঠি এসেছে। বিয়ে হয়ে গেছে তার। তা হলে শীলারও কি গোপন টান আছে কোথাও?

শীলার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে প্রমীলা। সারা দেহে তার বৈধব্যের প্রশান্তির প্রলেপ। ওকি তবে ছদ্মবেশ! ওর ভেতরেও কি আগুন ছিল!

—প্রাইভেটে এম-এ'টা দেবো—তারপর যদি পারি তো বি-টি'টাও—

শীলাও শেষপর্যন্ত একদিন চলে গেল বিলাসপুরের বোর্ডিং ছেড়ে। অন্য কিছু না হোক, শিক্ষয়িত্রী হিসেবে উন্নতি করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তারও আছে। যে একদিন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিলাসপুরের এই স্কুলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সামার-ভেকেশনে বোর্ডিং ছেড়ে একরাত্রির জন্যেও যার যাবার কোনও ঠাঁই ছিল না—সে-ই

আবার ফিরে গেল যেন তার ফেলে-আসা সংসারে। শীলার ট্রেনটা যখন ছেড়ে গেল, তার পরেও অনেকক্ষণ প্রমীলা সরকার, বিলাসপুরের "বাণী বিদ্যায়তন"-এর হেড-মিস্ট্রেস, প্লাটফরমের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।···

নতুন নতুন মিস্ট্রেস, নতুন ছাত্রী, শহরে অনেক নতুন লোক এসেছে। প্রমীলা বুঝি আজকাল আরো মোটা আর ভারি হয়েছে। আরো মোটা চশমা উঠেছে চোখে। কাজ আরো বেড়েছে—সুনাম বেড়েছে ততোধিক।

সকালবেলা নিয়ম করে সেক্রেটারির বাড়ি একবার ফাইল নিয়ে যেতে হয়। সেখানে প্রায় একঘণ্টা কাটে স্কুলের দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায়। তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে এগারোটার মধ্যে স্কুল।

ইতিহাসের ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রমীলা ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বলতে থাকে—

"···তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে—দেখবে, ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে এক বিরাট যুদ্ধ হয়···সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে···তার নাম হেলেন·· অপরূপ রূপসী সেই হেলেনের ভুবনবিজয়ী রূপ-ই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়—ঐতিহাসিকরা বলেন—হেলেনের রূপের আগুনেই ট্রয় নগরী নাকি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল···ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল আর একবার আমাদের এই ভারতবর্ষে···পাঠান যুগে···যখন···"

সেক্রেটারি সেদিন বললেন—এবার থেকে আমাকে ছুটি দাও, মা। আমি বৃদ্ধ হয়েছি—আমার ছেলে আসছে বদ্‌লি হয়ে, এবার থেকে সে-ই সব দেখাশোনা করবে তোমার কাজ···

রায়সাহেবের একমাত্র ছেলে বহুকাল পরে বদ্‌লি হয়ে এখানে আসছে। সরকারী চাকরিতে নতুন কী একটা প্রমোশন পেয়েছে। এতদিন বাইরে বাইরে কাটিয়েছে প্রদ্যোৎ, এবার অনেক তদবির করে বাড়িতে আনিয়েছেন তাকে নিজের জেলায়।

রায়সাহেব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গ্রামের জমিদারিতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। প্রদ্যোৎ চৌধুরী মানুষটি ভালো। বললেন—বসুন, আমি তো কিছুই বুঝিনা ও-সব —যেমন আপনি করছেন—তেমনিই করবেন, আমি শুধু···

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীও এসেছে। সেদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই প্রমীলা চম্‌কে উঠেছে। প্রীতি সেন। পাঁচশো মাইল দূরের বহুদিন আগের বন্ধু, ক্লাস-মেট।

—একি, প্রমীলা তুই—ঝলমল করে উঠলো প্রীতি সেন।

—চেন নাকি এঁকে—প্রদ্যোৎ চৌধুরী স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন।

—বা রে, প্রমীলা আমাদের ক্লাসের ইটার্নাল ফার্স্ট মেয়ে—

তারপর কাছে এসে একেবারে প্রমীলার হাতদুটো ধরেছে। সেই প্রীতি সেন। লেখাপড়ায় বরাবর ছিল কাঁচা। ক্লাসে আসতো দেরিতে। একবার পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে নাকাল হয়েছিল খুব। তবে একটা গুণও ছিল ওর। মিশুক ছিল ভারি। বাবার পয়সাও ছিল বোধহয় বেশ। ক্লাসময় মেয়েদের রেস্টুরেন্টে খাওয়াতো খুব।

—থাক্ তোমাদের কাজের কথা, তুই আয় তো প্রমীলা···আরে, তুই আমাদের স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস তাকি জানি ছাই—

টানতে টানতে একেবারে নিজের খাস-কামরায় নিয়ে এসেছে প্রীতি। সেক্রেটারির বাড়ির ভেতরে কখনও আসেনি প্রমীলা।

—আয় বোস্ এখেনে, এই কোচটায়, ফার্নিচার-টার্নিচার কিছুই এখনও প্যাক্ খোলা হয়নি ভাই—দ্যাখ্ না—ড্রেসিং বুরোটা এখনও এসে পৌঁছুলো না, পিয়ানোটার কী দশা হয়েছে কে জানে—এমন অসুবিধে হচ্ছে—

তারপর সামনে আঙুল দিয়ে দেয়ালের একটা ছবির দিকে দেখালে—ওই তো আমার বড়-মেয়ে বেবি—দেরাদুনে পড়ে—ওইটুকু তো মেয়ে—তুই ওর ইংরেজী গান শুনলে হাসতে-হাসতে তোর পেটে খিল ধরে যাবে—উনি বলেন—

উনি কী বলেন, তা আর বলা হলো না, প্রীতি মিহি গলায় ডাকলে—দায়ি—ও দায়ি—

ঝি আসতেই প্রীতি বললে—আমাদের দু'কাপ চা খাওয়াতে পারিস, দায়ি—আর দ্যাখ্, কালকে বেকারী থেকে কী কী এসেছিল নিয়ে আয় তো আমার কাছে···

অনেক কথা। অনেক হাসি। প্রীতি কথার বন্যায় একেবারে ভাসিয়ে দিলে। প্রীতিকে দেখে মনে হয়, বয়েস যেন প্রীতির অনেক কমে গেছে। এত সুন্দরী তো ও ছিল না আগে! টেবলের ওপর প্রদ্যোৎ চৌধুরী আর প্রীতির কাঁধে কাঁধ লাগানো একখানা জোড়া ফটোগ্রাফ। কোথায় কোন্ ঘটনাচক্রে এদের দুজনের বিয়ে হলো কে জানে।

—হ্যাঁরে, কত পাস তুই এখানে?

চা এসে গেছলো। চায়ে চুমুক দিয়ে প্রীতি উঠলো। বললে—দাঁড়া আমার অ্যালবামটা তোকে দেখাই···এবার মুসৌরি গিয়েছিলাম সামারে—সেখানে গিয়ে কী কাণ্ড হলো শোন্—

প্রীতি একমিনিট চুপ করে থাকতে জানে না।

প্রমীলা বললে—এবার উঠছি, প্রীতি—

—সে কি রে, না না, আজ ইস্কুল কামাই করে দে—তোর কথা কিছু শোনাই হলো না···

—তা ওই মাইনেতে তোর চলে— ?

প্রীতি সহানুভূতিতে এক সময়ে শান্ত হয়ে এল। বললে—তোর জন্যে ভাই আমার দুঃখ্যু হচ্ছে···অত খেটে রাত জেগে লেখাপড়া করলি—বিয়ে-থা'ও হলো না—আর এখন তো যা মোটা হয়েছিস!—ভালো কথা—তোর সেই উত্তম রায় এখনও আমাকে চিঠি লেখে জানিস—আমিও ছেড়ে কথা বলি না জানিস তো—আমি তোকে বলেছিলাম···

প্রমীলা বললে আচ্ছা—আজ তাহলে উঠি রে··

প্রীতি নিজের কথার জের টেনে বললে—আমিও উত্তমকে বলেছিলাম যে, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল—প্রমীলার সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ—

সিঁড়িতে তাড়াতাড়ি নামতে-নামতে বললে—ভালো করিনি, কী বলিস তুই—তোর জন্যে সত্যি-ই আমার দুঃখ্যু হয় ভাই—সত্যিই তো আজ তোর এই অবস্থার জন্যে উত্তম ছাড়া আর কে দায়ী বল্—ওর জন্যেই তো তুই···

দরজার কাছে এসে প্রমীলা বললে—আচ্ছা, আসি ভাই—

রাস্তায় নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে। কিন্তু তবু প্রমীলার মনে হলো সে যেন আজ বিলাসপুরের সকলের কাছে বড় কৃপার পাত্রী হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে সবাই আজ থেকে তাকে অনুকম্পা করছে। একটি সামান্য কারণে তার সমস্ত শিক্ষা শ্রম নিষ্ঠা ধূলিসাৎ হয়ে গেল এক-নিমেষে। সে যেন আশ্রিত। নেহাত পৃথিবীর কোনও কোণে তার মাথা গোঁজবার জায়গা নেই বলেই এখানে সে মেয়েদের মানুষ করবার অছিলায় স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেছে। আজ প্রমীলার কাছে এই কথাটাই প্রকট হয়ে উঠলো যে, তার এই হেড-মিস্ট্রেস পদের কোনও গৌরবই নেই, বরং লজ্জা অপমান আর বিড়ম্বনাই কেবল সার হলো তার।

বোর্ডিং-এ এসে মাথাটা খুব ভারি মনে হলো।

—বামুন-দি—

একটা ছোট স্লিপে এক লাইন লিখে দিয়ে বললে—এইটে মালীকে গিয়ে দাও তো, বামুনদি—বলো ছোট দিদিমণির হাতে গিয়ে যেন দেয়—আর যেন বলে যে আমার শরীর খারাপ, আমি আজ স্কুলে যেতে পারবো না—

সেদিন মাথাটা আর কিছুতেই ছাড়লো না।

সেক্রেটারি সেদিন বোর্ডিং-এ এলেন! বললেন—ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেব'খন—এখন তাড়াতাড়ি ইস্কুলে যাবার দরকার নেই, আপনি বরং বিশ্রাম নিন দিনকয়েক—

দিনকয়েক বিশ্রামই নিতে হলো। কিন্তু এ বড় বিড়ম্বনা। বরং সারাদিন কাজের তাগিদে ব্যস্ত থাকা, সে এর চেয়ে অনেক ভালো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। নিজেকে ভুলে যেতে পারা যায়। সমস্ত অতীতটা এমন মুখর হয়ে তাকে পীড়া দিতে পারে না।

শেষে একদিন গা-হাত-পা ঝেড়ে উঠলো। এমন করে আর ক'দিন ধ'রে পড়ে থাকা যায় বিছানায়। হঠাৎ বামুনদি ঘরে এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। নতুন সেক্রেটারির বাড়ি থেকে এসেছে। প্রদ্যোৎ চৌধুরীর মনোগ্রাম-করা খাম।

কিন্তু সেক্রেটারি নয়। লিখেছে প্রীতি :

"··শুনলাম তুই একটু ভালো আছিস······আজকে একবার বেড়াতে বেড়াতে আয়-না আমাদের বাড়িতে······উত্তম রায়ের একটা চিঠি এসেছে······তাকে লিখেছিলাম যে, তুই এখানে আছিস······সে কী লিখেছে জানিস······যা হোক, তুই এলেই তোকে দেখাব'খন চিঠিটা······আজকে যখনি সময় পাবি একবার আসিস··· বুঝলি—"

আপমানে ধিক্কারে প্রমীলার কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে উঠলো।

একটা কাগজ-কলম নিয়ে বিকেলবেলাই লিখতে বসলো। লম্বা একটা দরখাস্ত।

সন্ধ্যের পর সেক্রেটারি এলেন।

বেড়াবার ছড়িটা নিয়ে নীচের বসবার ঘরে বসে আছেন। প্রমীলা খবর পেয়ে নীচে নেমে এসে নমস্কার করলে—

সেক্রেটারি বললেন—লম্বা ছুটির দরখাস্ত করেছেন, কিন্তু ইস্কুলের কাজে বড় গোলমাল দেখা দিয়েছে—সেকেণ্ড টিচার সব পেরে উঠছেন না···অবশ্য বিশ্রাম আপনার চাই স্বীকার করি···

প্রমীলা বললে—আমার ছুটিটার জরুরী দরকার ছিল—আমি কলকাতায় যাবো—

সেক্রেটারি বললেন—সেইটেই তো মুশকিল হয়েছে, আপনি ছুটিতে থাকলেও দরকারের সময় আপনার কাছে সাহায্য পাওয়া যেতো···কিন্তু কলকাতায় চলে গেলে—

প্রমীলা চুপ করে রইল।

সেক্রেটারি বললেন—অবশ্য দরখাস্তে কিছু কারণ দেননি—বোঝা যায় বিশ্রামই দরকার আপনার—কিন্তু তবু কমিটির কাছে একটা যা-হোক কিছু কারণ···

প্রমীলা মুখ তুললে। তারপর মুখ নীচু করে বললে—আমার বিয়ে—

প্রদ্যোৎ চৌধুরী ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ছড়ি নিয়ে হয়ত সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এমন ঘটনার মুখোমুখি হবেন ভাবতে পারেন নি। তাহলে হয়ত প্রস্তুত হয়ে বেরুতেন। কিন্তু প্রমীলার মনে হলো যেন প্রদ্যোৎ চৌধুরী নয়, প্রীতি চৌধুরীকেই সে তার কথা শোনাচ্ছে।

সেক্রেটারি বললেন—কিন্তু···আমি শুনেছিলাম—

প্রমীলা শেষ করতে দিলে না। সেক্রেটারি কী বলবেন, তা যেন সে আগে থেকেই জানতো। বললে—আপনি ভুল শুনেছিলেন—

প্রমীলার এই হঠাৎ বাঙ্ময় আত্মঘোষণা প্রদ্যোৎ চৌধুরীর কাছে যেমন আকস্মিক, তেমনই অস্বাভাবিক। তাই মুখ দিয়ে তাঁর কোনও কথাই বেরুল না।

প্রমীলাই আবার বললে—গত দশবছরে একদিনও কামাই করিনি বা ছুটি নিইনি —ইস্কুলটা গড়ে তোলবার দিকেই মন ছিল, নিজের কথা আর ভাববার সময়ই পাইনি, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারছি না—তা ছাড়া···উত্তেজনার চোটে আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে।

নাটকীয় ভঙ্গীতে বলা কথাগুলো হুবহু আজই প্রীতি নিশ্চয় শুনবে। প্রদ্যোৎ চৌধুরী দরখাস্ত মঞ্জুর করে দিয়ে উঠলেন।

প্রদ্যোৎ চৌধুরীর গাড়িটা শব্দ করে চলে যাবার পরও প্রমীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল। তাকে এখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কেউ আসবে না সত্যি। তাকে একলা গিয়েই ট্রেনে উঠতে হবে। তার পর? তারপর হাওড়া স্টেশনে নেমে ভাবা যাবে কোথায় উঠবে সে।

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমে যখন প্রমীলা প্রথম এসে নেমেছিল সেদিনও সে জানতো না যে, শেষপর্যন্ত এখানে এসেই আশ্রয় মিলবে তার।

বউবাজারে একটা গলির মধ্যে নোনাধরা ইঁটের পুরনো বাড়িটাতে এতদিন কাটলো কেমন করে, এ কথা প্রমীলা নিজেই ভাবতে পারে না।

ইন্দু-মাসিমা অনেক দেরি করে বাড়ি আসেন। সারাদিন ইস্কুলে পড়ানোর পর

চলে যান ছাত্রীদের বাড়ি। একটা, দুটো, তিনটে জায়গায় টুইশ্যানি সেরে ফিরতে একটু দেরি হয়। বিধবা মানুষ। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই।

ইন্দু-মাসিমা বলেন—হ্যাঁরে প্রমীলা—কী ঠিক করলি—

জমানো কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিল প্রমীলা। বিলাসপুরে বিশেষ খরচ ছিল না—কিছু টাকা জমেছিল। তাও এমন কিছুই নয়। বসে খেলে কুবেরের ভাঁড়ারও শেষ হতে কতক্ষণ লাগে!

প্রমীলা বলে—ভাবছি আর ফিরে যাবো না, মাসিমা—এখানেই একটা চাকরি-টাকরি কিছু যোগাড় করে দিন।

ইন্দু-মাসিমা এসেছিলেন হাওড়া স্টেশনে কোন্ ছাত্রীদের ট্রেনে তুলে দিতে। সেইখানেই দেখা। সাত-আট দিন থাকবে, সেইরকম ঠিক ছিল—তার বদলে সাতমাস হয়ে গেল।

রান্নাবান্না করে ইন্দু-মাসিমা দশটার মধ্যেই বেরিয়ে যান। তারপর প্রমীলাও বেরিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো জায়গায় দেখা করাও হয়ে গেছে। দরখাস্তও পাঠিয়েছে অনেক জায়গায়।

প্রীতি চিঠি লিখেছে—তোর বিয়ের খবর শুনে খুব সন্তুষ্ট হলাম—আগে জানালে যেতাম—কবে আসছিস—দুজনে আসিস—আলাপ করবো—

সেক্রেটারিও একটা চিঠি লিখেছেন—হেড-মিস্ট্রেসের পদটা এখনও খালি রাখাই হয়েছে—প্রমীলার কাছ থেকে সঠিক জবাব পেলে অন্য ব্যবস্থা করবেন—

প্রমীলা অনেক গর্ব করে চলে এসেছিল বিলাসপুর থেকে—আবার সে কেমন করে সেইখানেই ফিরে যাবে!

গৌরী চিঠি দিয়েছে: "প্রমীলাদি, বিয়েতে তো তুমি এলে না···দীপুর অন্নপ্রাশনে নিশ্চয় আসতে চেষ্টা করবে—যদি একান্তই না আসতে পারো—তোমার আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিও—"

রেবারা বদ্‌লি হয়ে গেছে জব্বলপুরে! নতুন জায়গার বিবরণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে রেবা। নিখিলের নাকি আর-একটা প্রমোশন হয়েছে চাকরিতে।

আভাও ভালো আছে। বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে লেখা চিঠিটা এতদিন পরে হাতে এল। সব চিঠিগুলোই বিলাসপুরের পোস্ট-অফিসে ঘুরে এখানে এসেছে।

আস্তে আস্তে সব টাকাগুলো প্রায় ফুরিয়ে এল। অথচ কোনো কিছুর ব্যবস্থা হলো না।

ইন্দু-মাসিমা সেদিন আরো ভাবিয়ে দিলেন—

—ওরে প্রমীলা, খুব মুশকিল হয়েছে রে—আমার চাকরি বোধহয় গেল—

—কী রকম—প্রমীলা ভাবনায় পড়ে গেল।

—এবার রিটায়ার করতে বলছে আমাকে—বলছে, অনেক বয়েস হলো, এবার বিশ্রাম নিন—ছাখ্ তো মা, আমার না-আছে সংসার, না-আছে কেউ—সারাজীবন ওই ইস্কুল নিয়েই রইলুম—শেষে কিনা···

তা ইন্দু-মাসিমার তেমন ভাবনা নেই। চাকরি গেলেও ছাত্রীরা ইন্দু-মাসিমাকে সবাই ভালোবাসে। পুরনো ছাত্রীদের কত বড় বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে—যার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, সে-ই মাথায় তুলে রাখবে—

কিন্তু প্রমীলার নিজের ভাবনাটাই বাড়লো সেইদিন থেকে।

একদিন ইন্দু-মাসিমা বললেন—হ্যাঁরে, এমনি করে কাটিয়ে দিলি—বিয়ে-থা'ও করলি নি—

মাসিমা নিজের মায়ের মতন। তাঁর কাছে লজ্জা নেই। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুয়ে-শুয়ে-গল্প করছিল প্রমীলা। হারিকেনটা নেভানো। অন্ধকার ঘর। প্রমীলা বললে—করলুম না নয়, মাসিমা—হলো না—

সেদিন আর-এক কাণ্ড ঘটে গেল। এমন করে দেখা হবে ভাবা যায়নি।

—প্রমীলা-দি—

হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে···

সে-ই আর পাশে আর-একটি স্যুট্-পরা লোক। শীলার পরনে শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর।

—তোমার সঙ্গে এমন করে দেখা হবে ভাবিনি, প্রমীলাদি—কবে এলে বিলাসপুর থেকে ?

যেন শীলার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হবে তা প্রমীলাই ভাবতে পেরেছিল !

—জানো প্রমীলাদি, লেক কলেজে প্রফেসারি করছি আজকাল—

তারপর যাবার সময় বললে—এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই, প্রমীলাদি—

রাত্রে বাড়ি এসে প্রমীলা বললে—ইন্দু-মাসিমা, কাল সকালবেলা ট্রেন—

—সেকি ! কোথায় চললি তুই ?—ইন্দু-মাসিমা অবাক্ হয়ে গেলেন।

—রাজপুতানা—

এত জায়গা থাকতে রাজপুতানার নাম মুখ দিয়ে কেন বেরুল, কে জানে। ইতিহাসের পাতায় তো আরও অনেক দেশের নাম আছে। কিন্তু শীলার সিঁথির ওপর সিঁদুরের শিখাটা তখনও যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

প্রমীলার মনে পড়লো রাজপুতানার মেয়েরাই তো জহর-ব্রত করতো—ইতিহাসে লেখা আছে।

সেক্রেটারি প্রদ্যোৎ যথারীতি সকালবেলা নিজের অফিস-ঘরে বসে ছিলেন। হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন। কিংবা দেখলেও বুঝি লোকে এত চম্‌কায় না।

—একি!—এর বেশি কিছু মুখ দিয়ে বেরুল না তাঁর।

—বসুন—

প্রমীলা বসলো। বললে—আপনি লিখেছিলেন—তাই আবার আমি এলাম—

ভালোই করেছেন—কিন্তু···বেশী কিছু বলতে পারলেন না প্রদ্যোৎ চৌধুরী—

খবর পেয়ে ঝলমল করে দৌড়ে এল প্রীতি। ঘরে ঢুকে সে-ও পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেছে। প্রমীলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কী যে সে বলবে বুঝতে পারলে না। তারপর সামনে এগিয়ে এসে প্রমীলার হাতদুটো ধরলে।

প্রীতির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বললে—কী করে হলো, ভাই—

প্রীতি প্রমীলাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললে—কী করে হলো, ভাই—

—হঠাৎ হলো—কিছু টের পাইনি—প্রমীলা মাথা উঁচু করে বললে।

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—অমন স্বাস্থ্য—অমন লম্বা-চাওড়া চেহারা—কিছুতেই ভাবতে পারিনি—দশবছরে একদিনের জন্যে একটু মাথাধরারও খবর পাইনি—সেই লোক কিনা···

বলতে বলতে প্রমীলা মাথা নীচু করলে।

প্রীতি জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারেরা কী বললে—

—ডাক্তারেরা আর কী বলবে—কোনও ডাক্তার আর বাকি ছিলনা ডাকতে—সাতদিন সর্বস্ব খুইয়ে ফতুর হয়ে গেলাম—

বোর্ডিং-এ এসে প্রমীলা আবার তার পুরনো ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো।

সাদা থান, সাদা শেমিজ, পায়ে সাদা কেড্‌স্। পুরনো ছাত্রীরা সবাই এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ভালোই আছে। এবার আর কেউ তো কৃপা করবে

না, অনুকম্পা করবে না—সমস্ত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রমীলা পড়ায়ঃ

"...তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে, দেখবে ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে একবার এক বিরাট যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে...তার নাম হেলেন...অপরূপ-রূপসী হেলেনের ভুবন-বিজয়ী রূপ-ই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়...ঐতিহাসিকরা বলেন, হেলেনের রূপের আগুনেই নাকি ট্রয় নগরী পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল...ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দেশে—এই ভারতবর্ষে...আলাউদ্দিন খিলজী পদ্মিনীর রূপে উন্মাদ হয়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করলে...কিন্তু পদ্মিনী...ঐতিহাসিকরা বলেন...পদ্মিনীর সেদিনকার আত্মত্যাগের ফলে দেশেকে শত্রুর অত্যাচার থেকে তিনি বাঁচাতে পারেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন—পদ্মিনী সেদিন জহর-ব্রত করেছিলেন।—জহর-ব্রত কাকে বলে জানো...তুমি জানো...অনুপমা তুমি জানো...উৎপলা তুমি—ইলা তুমি...তুমি...তুমি...তুমি...তুমি...তুমি......"

উত্তেজনায় প্রমীলার কণ্ঠস্বর ক্রমে পরদায় পরদায় উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে লাগলো।

মিলনান্ত

বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ, আমি জীবনে কখনও থিয়েটার করিনি—

সবাইকেই হতাশ করতে হলো। বিলাসপুরের রেল-কলোনির ছেলেরা বড় আশা করে আমার কাছে এসেছিল। তিন দিন ধরে থিয়েটার, নাচ, গান। চাঁদাও উঠেছে বহু টাকা। কোলিয়ারির মালিকরাই দিয়েছে সাতশো। কলকাতা থেকে ড্রেসার পেণ্টার আসছে।

আবার বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ তোমরা, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

কিন্তু ছেলেরা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠলাম। তবে কি ছেলেরা অন্তর্যামী! কী করে জানলে ওরা? আমি তো মিথ্যে কথাই বললাম। জানলার বাইরে দেখলাম বুধবারী-বাজারের দিকে ছেলেরা চলে যাচ্ছে। টাউনের রাস্তায় ইলেকট্রিক বাতিগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। ডাউন বম্বে-মেল

আসবার সময় হয়েছে বুঝি। টাঙ্গাগুলো সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। নিজের প্রায়-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। ওদের কাছে আমি মিথ্যে কথাই তো বলেছি। সত্যিই তো অভিনয় করেছি আমি। ছোট এক-অঙ্কে-সমাপ্ত একখানা নাটক। স্টেজ নেই, দৃশ্যপট নেই, ড্রেসার পেণ্টার রিহার্শাল কিছুই নেই। তবু তো সেদিন অভিনয় করতে আমার বাধেনি!

ছেলেদের ডাকা হলো না। সেইখানে বসেই যেন মল্লিক-মশাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মল্লিকমশাই বললেন—কেমন জামাই দেখলে, মুকুন্দ ?

বললাম—খাসা, চমৎকার—

মল্লিকমশাই আবার বললেন—আমি জানতুম জয়ন্ত রাজী হবেই, এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এর পর পরীক্ষাটা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে···কিন্তু তুমি খেয়েছো তো ? পেট ভরেছে ?

এবারও বললাম—হ্যাঁ—

—মাংসটা কেমন হয়েছিল ?

এবারও বললাম—ভালো।···কিন্তু এবার আমি আসি মল্লিকমশাই, এর পর গেলে আর ট্রেন পাবো না হয়ত—

কোনও রকমে মল্লিকমশাই-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাইরে আসতেই আদিনাথ ধরেছিল।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না ?

মনে আছে আদিনাথের হাতদুটো ধরে বলেছিলাম, কিছু মনে কোরো না তুমি—কিন্তু খেতে আমাকে বোলো না, ভাই—

—অন্তত গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি—যা জোটে ?

কিন্তু কুড়ি বছর আগের এ-ঘটনা এমন করে মাঝখান থেকে বললেই কি সব বোঝানো যায় ? এখানে এই পাঁচশো মাইল দূরে বিলাসপুর রেল-কলোনির বি-টাইপ কোয়ার্টারে বসেও ঘনায়মান অন্ধকার অতিক্রম করে যেন শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কুড়িবছর আগের আওয়াজ এখানে পৌঁছুতে কি এত সময় লাগে ? তারপর তো কত দেশ, কত নদী, কত পাহাড় নিঃশব্দে পেরিয়ে এসেছি—কিন্তু সে-দিনের সে-ঘটনা এমন করে ভুলতেই বা পেরেছিলাম কী করে!

তবে গোড়া থেকেই বলি—

হঠাৎ ভৈরবগঞ্জে এসে ট্রেনটা থেমে গেল। শুনলাম—ট্রেন আর যাবে না।

এখানেই রইল। কালও যেতে পারে, পরশুও যেতে পারে—কিংবা তার পরদিনও যেতে পারে। ইছামতীর জল বেড়ে রেলের লাইন ডুবে গেছে। জল না নামলে কিছু বলা যায় না।

যে-যার মালপত্তর নিয়ে নেমে পড়ল।

ভৈরবগঞ্জ ছোট স্টেশন। না আছে ওয়েটিং-রুম, না আছে ভালো রকমের প্লাটফরম। না আছে একটা কুলী। টিমটিম করছে একফালি একটা স্টেশন-ঘর। কাঁকর-বিছানো প্লাটফরমের ওপর রাত কাটানো যায় না।

স্টেশনমাস্টার টেলিফোন নিয়েই ব্যস্ত। কথা বলবার সময় নেই তাঁর।

হাত নেড়ে বললেন—এখন মরবার সময় নেই স্যার, তিনখানা আপ, দুখানা ডাউন-গাড়ি সেক্‌শানে আট্‌কে গেছে—

তারপর পাশের টিফিন-ক্যারিয়ারটা দেখিয়ে বললেন—ওই স্বচক্ষে দেখুন বাড়ি থেকে হালুয়া করে পাঠিয়েছে—মুখে দিতে পারিনি—

বলে আবার 'হ্যালো হ্যালো' করতে লাগলেন।

চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিকেল হয়েছে। এ জায়গায় রাত কাটাবার কথাটা মনে আসতেই ভয় পেয়ে গেলাম। শনিবারের দুপুরবেলা শেয়ালদ' থেকে উঠেছি, আবার সোমবারে ফিরে গিয়ে অফিস করতে হবে।

প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছি। হঠাৎ স্টেশনের একপ্রান্তে পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে 'ভৈরবগঞ্জ' লেখাটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল।

ভৈরবগঞ্জ!

এই ভৈরবগঞ্জেই তো মল্লিকমশাই-এর বাড়ি। কতদিন যেতে বলেছেন। কিন্তু কখনও আসা হয়ে ওঠেনি। গ্রামের নামটাও মনে আছে 'ছুটিপুর'। এই ছুটিপুর থেকেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতেন মল্লিকমশাই।

বলতেন—একবার তো সময়ই হলো না তোমার মুকুন্দ, কিন্তু মিনুর বিয়ের সময় কোনও ওজর-আপত্তি শুনবো না।

বলেছিলাম—নিশ্চয়ই যাবো মল্লিকমশাই, দেখে নেবেন, মিনুর বিয়ের সময় নিশ্চয়ই যাবো।

তারপর মল্লিকমশাই হতাশাভরে আবার কাজে মন দিতেন—হ্যাঁ, তুমি আর গিয়েছ!

সত্যিই, কত অকাজে কত দিকেই গিয়েছি, কিন্তু মল্লিকমশাই-এর ছুটিপুরে

যাবার আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমার। হঠাৎ ভৈরবগঞ্জ স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আবার মনে পড়ে গেল মল্লিকমশাই-এর কথা বহুদিন পরে।

স্টেশনের পেছনেই একটা পান-বিড়ির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বললে—ছুটিপুর? তা পোয়া-তিনেক রাস্তা হবে এখেন থেকে আজ্ঞে—সামনে খাঁটুরোর বিল পেরিয়ে সোজা পেঁপুলবেড়ের আল-পথ ধরে চলে যান,—যাবেন কার বাড়ি?

তারপর অবশ্য সেই বিকেলবেলা দশজনকে জিজ্ঞেস করে-করে গিয়ে পৌঁছেছিলাম শেষপর্যন্ত ছুটিপুর। চারদিকে সন্ধ্যে নেমে এসেছে তখন। দু'পাশে ধান বোনা হয়েছে, জলে থইথই করছে ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে পেছল আলের পথ। অনেক উঁচুতে পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাদুড় উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। সামনের আমবাগানের ঢালু জমিটার ওপর দিয়ে শেষ গরু ক'টা জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে মিশে গেল। ছুটিপুরে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন বেশ অন্ধকার।

একজন কৃষাণ গোছের লোক বললে—এ হলো মালো-পাড়া, মল্লিকমশাই থাকেন পুবপাড়ায়—এই বাঁশঝাড়ের পাশ বরাবর গিয়ে পড়বেন বারোয়ারি-তলায়, তার ডানধার পানে পুবপাড়া—

চলতে চলতে ভাবছিলাম—বলা নেই কওয়া নেই, হয়ত মল্লিকমশাই খুব অবাক্ হয়ে যাবেন। একদিন কত পীড়াপীড়ি করেছেন এখানে আসবার জন্যে। তখন আসা হয়নি। সেই মল্লিকমশাই অফিস থেকে রিটায়ার করলেন, ফেয়ারওয়েল হলো তাঁর—তখনও কথা দিয়েছিলাম—যাবো মিনুর বিয়েতে, নিশ্চয় যাবো, কথা দিচ্ছি—

মল্লিকমশাই বলতেন—আগের দিন খবর দিও, আমি পুকুরে ঝোরা দিয়ে মাছ ধরিয়ে রাখবো, আর উমেশ ময়রাকে কাঁচাগোল্লার বরাত দিয়ে রাখবো, তাই খাবে—শেষে মিনুর গানও শুনিয়ে দেব—

আশ্চর্য, এই এতখানি পথ হেঁটে বত্রিশ বছর ধরে কেমন করে একটানা চাকরি করে এসেছেন মল্লিকমশাই! ভোরবেলা সাতটা বাজতে বেরুতেন বাড়ি থেকে আর ফিরতেন রাত আটটায়। আর তারই মধ্যে ইট পোড়ানো, বাড়ি করা, পুকুর কাটানো—ক্ষেতখামারের তদারক···

আমার সঙ্গে কেমন করে যে অমন বন্ধুত্ব হয়েছিল কে জানে। অথচ আমি তো প্রায় তাঁর ছেলেরই বয়সী।

মনে আছে প্রথম দিন আমাকে বলেছিলেন—এটা ক্যামেরা নাকি, মুকুন্দ? তুমি নিজে ছবি তুলতে পারো?

তারপর বলেছিলেন—তা দাও-না মিনুর একটা ছবি তুলে ভায়া, ওর ভারি ছবি তোলার শখ—একদিন তুমি চলো আমাদের দেশে—যা দাম লাগে আমি দেব—

ভূধরবাবু বলতেন—মল্লিকমশাই, আপনি যে এত মেয়ে-মেয়ে করেন—মেয়ে তো বিয়ে হলেই পর হয়ে গেল—

ওপাশ থেকে সুধীরবাবু বলতেন—এই ত্যাখোনা আমার জামাইএর আক্কেলটা, যতবার ছেলে হবে আমার কাছে পাঠাবে, আর মেয়েও তেমনি হয়েছে—আসে আসুক কিন্তু একেবারে খালি হাতে! আমার তো এই মাইনে—সব দিক সামলাই কী করে?

সনাতনবাবু বলতেন—কথাতেই তো আছে—জন-জামাই-ভাগ্না তিন নয় আপ্না—

বুঝতে পারতাম মল্লিকমশাই কথাগুলো, শুনে অপ্রসন্ন হতেন। চুপি চুপি বলতেন—জয়ন্ত আমার সেইরকম জামাই নাকি তোমরা ভাবো, অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

মল্লিকমশাই বললেন—তা একরকম হওয়াই বলতে পারো—শুধু দেরি হচ্ছে ওর চাকরির জন্যে—সীতানাথবাবুকে বলে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ইছাপুরে, সেখান থেকে বদ্‌লি হয়েছে জব্বলপুরে, এইবার একটা প্রমোশন হলেই ফোরম্যান একেবারে—

বললাম—তা বলে বিয়েটা করে রাখতে দোষ কী?

মল্লিকমশাই বলতেন—আমিও তো তাই বলি—সেবার ছুটি নিয়ে সেই কথা বলতেই গিয়েছিলাম জব্বলপুরে, বেশ জায়গা, সাহেবদের বাঙলো পেয়েছে, চাকর-বাকরে রান্না করে—আমি বললাম—কেন তোমার এ-সব হাঙ্গামা করা, মিনু এলে একদিনেই তোমার ঘর-সংসারের শ্রী বদ্‌লে যাবে—কেউ নেই তোমার সংসারে, তুমি কার পরোয়া করবে? তা, কী বলে জানো?

বললাম—কী?

—বলে—টাকা জমাচ্ছি আমি, বিয়েতে আপনাকে একপয়সা খরচ করতে দেব না, কাকাবাবু।

—আপনি কী বললেন?

—আমি আর কী বলবো, আমি চলে এলাম, তা তুমি কী ভাবছো আমি কিছু খরচ না-করে পারি? আমার তো এদিকে সব তৈরি, সেদিন যে ইট পোড়ালাম,

সে বাড়ি তো জামাইএর জন্যেই—সব তৈরি—খাট, আলমারি, ড্রেসিং আয়না, ষোলোভরির গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে রেখেছি—দানের বাসন কিনেছি এক একটা করে, গায়ে-হলুদের কাপড় পর্যন্ত কিনে রেখেছি—মিনুর মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে—সাধে কি আর বলি, জামাই তো অনেকেরই দেখছো—আর বিয়ের সময় আমার জামাইকেও দেখো—খবর দেব তোমাকে—

সুধীরবাবু বলতেন—তুমি ওই বুড়োর কথা বিশ্বাস করো নাকি, মুকুন্দ? আজ পাঁচবছর ধরে শুনে আসছি ওই এক কথা। আমি কতদিন বলেছি—একটা ভালো পাত্র আছে, আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন বিয়ে, আপনার মেয়ে সুন্দরী, একটা পয়সা নেবে না; তা উনি বলেন—না, মেয়ের আমার পাত্র ঠিক হয়ে আছে—

একদিন সরাসরি বলেই ফেলেছিলাম—আচ্ছা মল্লিকমশাই, ভগবান না করুন—যদি জয়ন্ত শেষপর্যন্ত বিয়ে না-ই করে—এতদিন হয়ে গেল—

মল্লিকমশাই-এর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস। বলতেন—তুমি বলো কি মুকুন্দ, জয়ন্তকে আমি চিনি না! আমি ওকে মানুষ করলাম, ছোটবেলায় বাপ-মা মারা গিয়েছিল, আমি না দেখলে ও কি বাঁচতো? ইস্কুলের মাইনে দিয়ে পড়িয়ে চাকরিতে ঢোকানো ইস্তোক সব যে আমি করেছি—নইলে ধর্মে ওর সইবে—মাথার ওপরে ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো?

সুধীরবাবু সব শুনে বললেন—শুনলে তো, এখন কী জবাব দেবে দাও—

তারপর একটু থেমে বললেন—ওর মেয়েটি কিন্তু ভারি সুশ্রী ভাই, লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো চেহারা, এমন চমৎকার তার ব্যবহার, একবার দেশে গিয়ে দেখেছিলাম। জয়ন্ত গান ভালোবাসে বলে মেয়েকে উনি মাস্টার রেখে গান শিখিয়েছেন, জয়ন্ত ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসে বলে নানান্ রকমের রান্না শিখিয়েছেন—

এক এক দিন দেখতাম মল্লিকমশায় মনোযোগ সহকারে চিঠি লিখছেন।

আমি কাছে যেতেই বললেন—জয়ন্তকে আর একটা চিঠি লিখলাম—

বললাম—আগেকার চিঠির উত্তর পেয়েছেন নাকি?

বললেন—না, সেইজন্যেই তো লিখছি আবার—

—আপনার চিঠির উত্তর দেয় না, এটাই বা কী রকম?

—তা ভাই, এ তো আর আমাদের মতো কেরানীগিরির চাকরি নয়, অফিসে বড় খাটুনি ওর, সময়ই পায় না—

তবু কখনও মনে পড়েনা জয়ন্ত একটা চিঠিরও উত্তর দিয়েছে।

একদিন এমনি করে রিটায়ার করবার দিনও এল। চাঁদা তুলে ফেয়ারওয়েল

দেওয়া হলো মল্লিকমশাইকে। যাবার দিন মল্লিকমশাই-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছাড়তে কষ্ট হয় বৈকি! আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—মিনুর বিয়েতে তোমার যাওয়া চাই কিন্তু ভাই—

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—দিনস্থির হয়ে গেছে নাকি?

—ওই দিনস্থির করাটুকুই যা বাকি—নইলে বিয়ে ওদের একরকম হয়েই গেছে ধরে নিতে পারো, ওদের ছুটি পাওয়া খুব শক্ত কিনা, বিয়ের ছুটি তা-ও দেবেনা বেটারা, তা বলাও যায় না, একদিন হয়ত হুট্ করে এসে বলতে পারে—এখুনি বিয়ে হয়ে যাক, একদিনের ছুটি হয়ত মেরে-কেটে পেয়েছে।

বললাম—একদিনের মধ্যে সব যোগাড় যন্ত্র করেত পারবেন?

মল্লিকমশাই এবার হেসে ফেলেছিলেন—যোগাড় তো সব করেই রেখেছি ভায়া, মায় ফুলশয্যার বন্দোবস্তও শেষ—শুধু কাঁচা বাজারটা, তা সে আমার ভাইপো আদিনাথ আছে, সব করে ফেলবে সে।··

এ-সব পাঁচবছর আগের ঘটনা। মল্লিকমশাই রিটায়ার করবার পরও পাঁচবছর কেটে গেছে। আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। জানি বেঁচে আছেন। এই পর্যন্ত।

ভাবছিলাম—এতদিন পরে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ আমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন কে জানে!

কিন্তু পূবপাড়ায় পৌঁছে আর বেশী দেরি হলো না। ছাড়া ছাড়া বাড়ি, চারদিকে গাছপালার জঙ্গল। বেশ ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে ঢোল আর শানাই বাজছে, ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজও আসছে। বোধহয় কোনো উৎসব চলেছে কোথাও।

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই একজন বেরিয়ে এল।

বললে—মল্লিকমশাই? তাঁর তো অসুখ—

বললাম—অসুখ! কী অসুখ?

—অসুখ—মানে···

ছেলেটি যেন কেমন আমতা-আমতা করতে লাগল।

তারপর বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—কলকাতা। বলোগে মুকুন্দ এসেছে। বি-এন-আর অফিস থেকে—

অফিসের নাম শুনে যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ছেলেটি।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কী?

—আদিনাথ।

—তুমি কি মল্লিকমশাই-এর ভাইপো ?

আদিনাথ আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে—জানলেন কী করে ?

বললাম—আমি জানি সব—কিন্তু মল্লিকমশাই-এর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে—

—কিন্তু···

আদিনাথ তবু যেন কেমন দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—তিনি চোখে দেখতে পান না—

—সেকি !—আমার তখন বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

—হ্যাঁ, আজ চারবছর অন্ধ হয়ে গেছেন, শুধু চুপচাপ বসে থাকেন নিজের ঘরে—

বললাম—তা হোক, আমাকে তিনি অনেকবার এখানে আসতে বলেছেন——একবার দেখা না-করে যাবো না—

আদিনাথ তবু যেন কোন উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু এবার অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম তার মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে এল। হারিকেনের মৃদু আলোয় তার দু'চোখের পাতাগুলো কেমন ছলছল করছে।

হঠাৎ কান্নার মতন করে যেন আদিনাথ ককিয়ে উঠলো।

বললে—আপনি যেন কিছু বলবেন না তাঁকে—কাকাবাবুর হার্ট বড় দুর্বল। ডাক্তারে কেবল বিশ্রাম নিতে বলেছে—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি··

হঠাৎ ছেলেটির এই ব্যবহারে কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই স্বল্পালোকিত পরিবেশে, চারদিকে ঝিঁঝিপোকার শব্দ আর অদূরের ঢোল আর শানাইয়ের মূর্ছনার সঙ্গে একমুহূর্তে সমস্ত অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আদিনাথ বললে—চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু আপনি যেন কিছু বলবেন না—

আমি মন্ত্র-চালিতের মতো পেছন পেছন চলতে লাগলাম। সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির অন্দরমহলেও কোনো লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যেন মৃত্যু-পুরীর অলিন্দ দিয়ে আমি কোন্ অনাবিষ্কৃত অনন্তের সন্ধানে চলেছি।

আমি সামনে এগিয়ে একবার বললাম—বাড়িতে কোনও বিপদ চলছে নাকি ?

আদিনাথ হাতের সঙ্কেত করে বললে—চুপ, কাকাবাবু শুনতে পাবেন—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। গলা নীচু করে বললে—উনি যা বলবেন আপনি 'হ্যাঁ' বলে যাবেন—আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাবেন—

বললাম—কী হয়েছে? কিছুই বুঝতে পারছি না যে—

আদিনাথ তেমনি গলা নীচু করে বললে—আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না—আপনাকে সব বলবো পরে—কাকাবাবুর মেয়ের আজকে বিয়ে—

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম—কার? মিনুর?

আদিনাথ কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। ঘরের ভেতর থেকে মল্লিকমশাই-এর গলা শোনা গেল—কে? কে? কে ওখানে কথা কয়?

আদিনাথ আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—আমি কাকাবাবু!

—সঙ্গে কে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

—ইনি এসেছেন মিনুর বিয়েতে কলকাতা থেকে। আপনি বলেছিলেন নেমন্তন্ন করতে—বি-এন-আর অফিসের লোক।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকমশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কে?—সুধীর? সনাতন? মুকুন্দ?

এগিয়ে গিয়ে বললাম—মল্লিকমশাই, আমি মুকুন্দ।

আমার উত্তরটা শুনেই মল্লিকমশাই যেন উত্তেজনায় আনন্দে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগেলেন। বললেম—মুকুন্দ! মুকুন্দ তুমি এসেছ? —আর, ওরা এল না—সুধীর, সনাতন?

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে বললে—ইনি বলছিলেন, ওঁদের আসবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অফিসে ছুটি পাননি।

এবার ঘরের ভেতরে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মল্লিকমশাই একটা তক্তপোশের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সমস্ত শরীরে চাদর ঢাকা। মাথার পেছনে টেবিলের ওপর একটা হারিকেন জ্বলছে। কয়েকটা ওষুধের শিশি, জলের গ্লাস।

আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম—আপনার চোখ-খারাপ হয়েছে জানতাম না তো।

মল্লিকমশাই হাসলেন। বললেন—বয়েস হয়েছে, যাবারও সময় হয়ে এল মুকুন্দ, কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ্যু নেই, আমার মিনুর বিয়েটা যে শেষপর্যন্ত হলো, তাতেই আমার সব দুঃখ্যু মিটে গেছে, ভায়া—

তারপর থেমে বললেন—তুমি যে এসেছ মুকুন্দ, আমি তাইতেই ভারি খুশি হয়েছি। চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলে?

আদিনাথ আমার দিকে চাইলো।

আমি বললাম—হ্যাঁ, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম, আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মিনুর বিয়েতে আসবো—

মল্লিকমশাই এবার বললেন—আদিনাথ—মুকুন্দকে তুমি ফার্স্ট ব্যাচেই খাইয়ে দেবে। ওর আবার ট্রেনের সময়—

আমি কেন জানিনা বলে ফেললাম—আমার খাওয়া হয়ে গেছে, মল্লিকমশাই।

মল্লিকমশাই যেন তৃপ্তি পেলেন, শুনে বললেন—ভালোই করেছ। মাংসটা কেমন খেলে ? আর, উমেশ ময়রার কাঁচাগোল্লা ?

বললাম—খাসা—চমৎকার।

মল্লিকমশাই বললেন—আদিনাথ, তুমি নিজে খাবার সময় কাছে ছিলে তো ?

আদিনাথ টপ করে বললে—হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি নিজে খাইয়েছি ওঁকে—

মল্লিকমশাই আবার বললেন—বর দেখলে, মুকুন্দ—জয়ন্তকে দেখলে ? কেমন জামাই করেছি বলো ? তখন তো সবাই তোমরা ঠাট্টা করতে ? বলতে জয়ন্ত বিয়ে করবে না—কিন্তু মাথার ওপর একজন ভগবান আছেন এ-কথা মানো তো ? তোমরা আজকালকার ছেলে ভগবান-টগবান মানো না—কিন্তু আমার অসীম বিশ্বাস ছিল ভাই, ছোটবেলা থেকে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—ওই-যে যে-বাড়িতে বসে তুমি খেলে, ওই বাড়িটাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করলাম ভাই, ওটা দিয়ে যাবো মেয়ে-জামাইকে, আর এই বাড়িটে হচ্ছে আমার পৈতৃক, শরীরটা খারাপ বলে ওইসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি আর গেলাম না—আমি আদিনাথকে বললাম—আমি নিরিবিলিতে এখানেই থাকবো—তা আদিনাথ একাই সব করছে—

বললাম—ভালোই করছেন—

মল্লিকমশাই বললেন—ছাখো ভাই, ভগবানের ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল বলে বরাবর আমি বিশ্বাস করতুম জয়ন্ত রাজী হবেই—এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এবার ফোরম্যান হয়েছে, এর পর একটা পরীক্ষা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে—তা জয়ন্তকে আমি কিছু খরচ করতে দিইনি—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমি পনেরো হাজার টাকা পেয়েছিলাম জানো তো, সেটা সব খরচ করলাম মিনুর বিয়েতে—

তারপর আদিনাথকে লক্ষ্য করে বললেন—আদিনাথ, ওদিকে কোনো গোলমাল হচ্ছেনা তো ? সবদিকে নজর রাখবে, কেউ যেন না-খেয়ে চলে যায় না—টাকার জন্যে ভেবো না—

আদিনাথ বললে—না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকাবাবু, আমি সব দেখছি—

আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। বললাম—এবার আমি আসি মল্লিকমশাই, এরপর গেলে আর ট্রেন পাবোনা হয়ত—

মল্লিকমশাই বললেন—আচ্ছা, এসো ভাই—খুব কষ্ট হলো তোমার।—আদিনাথ, মুকুন্দর যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিও—

সেই নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে মল্লিকমশাইকে রেখে সোজা উঠে বাইরে এলাম। তারপর অন্ধকারে পা ফেলে-ফেলে একেবারে সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছুলাম। আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চেয়ে দেখি আদিনাথও হ্যারিকেনটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

আদিনাথও যেন আমার মতো নির্বাক্ হয়ে গেছে।

তার চোখে চোখ পড়তেই দেখলাম আদিনাথ কাঁদছে।

মুখ দিয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বেরুল না।

আদিনাথ-ই মুখ খুললে। বললে—আপনি যেন কাউকে কিচ্ছু বলবেন না!

এতক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছি। বাইরে অন্ধকার। চারদিকে বাঁশঝাড় আর জঙ্গল। কোনও দিকে কিছু স্পষ্ট দেখা গেল না। শুধু অদূরের ঢোল-শানাইয়ের শব্দ ভেসে আসছে। দু'-একবার শাঁখও বেজে উঠছে। মনে হলো—শানাইটা বিনিয়ে বিনিয়ে কেবল বুঝি বিসর্জনের সুরই বাজাচ্ছে।

হঠাৎ মুখ ফেরালাম।

আদিনাথও আমার দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাতদুটো চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম—কিছু মনে কোরো না তুমি—কিন্তু এর পর খেতে আমাকে তুমি বোলো না, ভাই—

—অন্তত গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি যা জোটে—

সেদিন অভুক্ত অবস্থায়ই চলে এসেছিলাম মনে আছে। বারোয়ারি-তলা পর্যন্ত আদিনাথ আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমাকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছিল। কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম।

বললাম—তোমাকে আর আসতে হবেনা ভাই, তুমি মল্লিকমশাইকে গিয়ে ছাখো—

আদিনাথ বলেছিল—কিন্তু, কাকাবাবু জানতে পারলে রাগ করবেন—

—কিন্তু জানাবে কেন তাঁকে?

এ-কথার উত্তরে আদিনাথ কোনো জবাব দেয়নি। আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন কোনও নতুন প্রশ্নের অপেক্ষা করছিল।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—জয়ন্ত কি চিঠি দিয়েছিল তোমাদের—শেষ পর্যন্ত?

আদিনাথ বললে—না, কাকাবাবুর একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি—

—সে কি জব্বলপুরেই আছে? একবার গেলে না কেন সেখানে?

—গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হয়নি—

—কেন?

—তার চাকর ঢুকতেই দিলে না বাড়ির ভেতর। দুটো কালো-কালো কুকুর তাড়া করে এল কামড়াতে—

—তার চাকর কী বললে?

—চাকরটা বললে—মেমসাহেব মানা করে দিয়েছে। আমিও শুনলাম জয়ন্ত এক মেমসাহেবকে বিয়ে করেছে, ছেলেও হয়েছে—

—তার পর—? যেন নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে নির্বোধের মতো প্রশ্ন করে বসলাম।

আদিনাথ বললে—তারপর আর কি, কাকাবাবুও অবুঝ, তাঁরও হার্ট খারাপ হয়ে গেছে,—এ-খবর দিতে পারিনি তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবু বারণ করেছিলেন—। কিন্তু আর বেশিদিন চেপে রাখাও যাচ্ছিল না—ওঁকে বাঁচাবার জন্যে এই পথ নিতে বাধ্য হলাম, এ ছাড়া আর গতিও ছিল না—আমার মা এই বুদ্ধি-ই দিলেন—

বারোয়ারি-তলার বিরাট বিরাট বটগাছের তলায় কেমন নির্বোধের মতন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশেপাশে চারদিকে পাকা-পাকা ফলগুলো টপ টপ করে পড়ছে। মনে হলো—যেন কারও চোখের-জল-পড়ার শব্দ ওটা। তবে কি নির্জীব গাছটাও সব জানে! চেয়ে দেখলাম—আদিনাথ তখনও কাঁদছে। মনে পড়লো—মল্লিকমশাই বলেছিলেন—'মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন, তা মানো তো?'

হঠাৎ বললাম—এবার আসি, ভাই—

আদিনাথ হারিকেনটা উঁচু করে ধরলো।

সে-আলোয় সামনের পথটা একটু ঘোলাটে হয়ে এল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম। যে-মেয়েটিকে নিয়ে এত-কিছু কাণ্ড, এত মুখর অভিনয়, তার কথা তো এতক্ষণ একবারও মনে আসেনি। মল্লিকমশাই-এর দিকটাই সবাই

দেখেছে। কিন্তু তার কথা তো কেউ ভাবছে না। ওই ঢাক-ঢোল-শানাইয়ের মূর্ছনা আর শাঁখের মঙ্গলধ্বনির অন্তরালে সে-ও কি একজন অন্যতম অভিনেত্রী হয়েই আছে? জয়ন্তর জন্যে তার গান শেখা আর রান্না শেখার কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস কি আজ এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিল? মনে হলো—ও বটফল নয়, ও যেন সেই মেয়েটিরই চোখের জল—আমাদের আশে পাশে চারদিকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। ওকে শুধু জয়ন্তই উপেক্ষা করেনি—মল্লিকমশাই, আদিনাথ, আদিনাথের মা—সকলের কাছেই সে উপেক্ষিতা।

আদিনাথ আলোটা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

কাছে গিয়ে বললাম—আর···আর··

আদিনাথ আমার দ্বিধা ভেঙে দিয়ে বললে—বলুন—

—আর সেই মল্লিকমশাই-এর মেয়ে? সে জানে?

আদিনাথ বললে—মিনুর কথা বলছেন? তার মত আছে, সে তো কাকাবাবুর মতো অবুঝ নয়! তা ছাড়া এ-পাত্রও তো খারাপ নয়, দেড়শো বিঘে ধানজমি আছে, এক বিঘের ওপর জমিতে বাস্তবাড়ি, বছরের খাবার ঘরেই হয়, শুধু আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে—তা এত কাণ্ডের পর একজন যে রাজী হয়েছে, এই তো সৌভাগ্য বলতে হবে মিনুর পক্ষে—

দড়ি

বংশীর মুখখানা পাংশু কঠিন হয়ে এসেছে। চোখদুটো স্থির। এখনি যেন স্খলিতমূল গাছের মতো ভেঙে পড়বে! ভয়ার্ত মুখখানা এক বীভৎস দৃশ্যের মতো স্মৃতির পরদায় আনাগোনা করে। সেই মুখখানাকে স্মরণ করতে গিয়ে এই মধ্যরাত্রির অন্ধকারেও সুপ্রিয় শিউরে উঠলো।

সুপ্রিয়র জীবনে প্রথম ফাঁসির হুকুম।

আগেও খুনের আসামী এসেছে। মেয়েমানুষের রেষারেষি নিয়ে দুই বন্ধুর খুনোখুনি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিতে হয়েছিল সেবার। কিন্তু সে তবু ভালো। তবু এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের সংস্পর্শ পাওয়া যাবে। পরমায়ু

হয়ত ক্ষয় হবে, কিন্তু দম বন্ধ করে আইনের দোহাই দিয়ে হত্যা—সে বড় ভীষণ! ফাঁসি কখনও দেখেনি সুপ্রিয়। ফাঁসির আসামীরা ফাঁসির সময় কী ভাবে কে জানে। শেষমুহূর্তে কত হাস্যকর অনুরোধ করে ফাঁসির আসামীরা। কে একজন ফাঁসির আগের দিন চেয়েছিল একছড়া ফুলের মালা, একটা আদ্দির পাঞ্জাবি আর একশিশি আতর।

কিন্তু আর ভাবা যায় না। সমস্ত মাথাটা যেন পাথরের মতো ভারি হয়েছে। ফাঁসির রায় দেবার পর সুপ্রিয় আইন-মাফিক চোখদুটো বন্ধ করেছিল, তারপর তার দোয়াত আর কলম সরিয়ে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু তিনটে অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি খেয়েও সমস্ত শরীর যেন কেমন অসহনীয় হয়ে উঠেছে! সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে আর থাকতে পারেনি সুপ্রিয়। চা খেয়েই একলা বেরিয়ে পড়েছে। নদীর ধারের নিরিবিলিতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা হালকা হওয়ারই কথা। কিন্তু এই এখানেও বংশীর পাংশু কঠিন মুখখানার চেহারা মনে পড়ে! চোখদুটো স্থির। এখনি এই অন্ধকারের দৃশ্যপটে বংশীর সহস্র মুখ যেন নিঃশব্দে অট্টহাস্য করে উঠছে!

কাল সারা রাত জেগে রায় লিখেছিল সুপ্রিয়। তারপর আজকের বংশীর আর্তনাদ আর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়া। ঠিক তারপর থেকেই সুরু হয়েছে মাথাধরা।

কিন্তু বিচারে যদি ভুল হয়ে থাকে! দণ্ডবিধির সূক্ষ্ম বিচারে যদি কোথাও গলদ থেকে থাকে। এমন হতে পারে, পুলিশ মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়েছে। তা অবশ্য হবে না। কিন্তু এমন হতে পারে—খুন করার ইচ্ছে হয়ত বংশীর ছিল না। শুধু প্রতি-হিংসার বশে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বংশী আর মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল লক্ষ্মণকে! ওই একটু তফাতের জন্যে বংশীর বেঁচে থাকা আর মরার প্রশ্ন নির্ভর করছে।

পকেট থেকে সিগরেট কেস বার করে একটা সিগ্‌রেট ধরালে সুপ্রিয়।

এই প্রথম ফাঁসির হুকুম! চাকরিতে প্রোমোশন পেয়ে প্রথম মামলা। আজ প্রমীলার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি সুপ্রিয়। কোথায় বংশীর বউ বাসন্তী হয়ত খুব কাঁদছে। সাক্ষ্য দিতে এসেছিল বাসন্তী। কাঠগড়ায় বংশীর দিকে চেয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

জেরায় বাসন্তী বলেছিল—সব দোষ আমার হুজুর, আমাকে নিয়েই ওদের গণ্ড-গোল—আমাকে জেলে দিন, হুজুর—

সিগ্‌রেটের শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুপ্রিয় বাড়ির দিকে ফিরলো।

এ-দিকটা নির্জন। বড় বড় শিশুগাছ দু'পাশে। মাঝখান দিয়ে অন্ধকার রাস্তা। জনহীন রাস্তায় চলতে চলতে স্বপ্রিয়র যেন মনে হলো পেছনে নিঃশব্দ পদে কে তাকে অনুসরণ করছে। অথচ সত্যি-সত্যি তো আর ফাঁসি বংশীর হয়নি এখনও। এখনও অনেক সূর্যের অনেক আলোর তাপ পড়বে এই পৃথিবীর ওপর। অনেক বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে বংশী দাস।

এখানে এসে রাস্তাটা বাজারের দিকে ঘুরে গিয়েছে। ওদিকে উকিল-পাড়া। ভবনাথবাবু বংশী দাসের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণে এমন কিছুই ছিল না, যাতে বংশী দাসকে বাঁচানো যায়। কিন্তু স্বপ্রিয়র ক্ষমতা কতটুকুই বা!

সাক্ষী ভূষণ গাজীর কথাগুলোও মনে পড়লো। সে দেখেছে সব। তিনবার ছোরা চালিয়েছিল বংশী দাস লক্ষ্মণের বুকে! তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে হঠাৎ কী মনে হয়েছে বংশীর। জামা-কাপড় বদ্‌লে আবার বেরিয়েছে—

বাসন্তী বলেছিল—ভাত বেড়েছি—খেয়ে যাও—

—দাঁড়া আসছি—বলে বংশী নাকি আবার এসেছিল এইখানে। এই শিশুগাছের জঙ্গলের পথে। তার পর সেই মৃত লক্ষ্মণের দেহটা নিয়ে· ·

—নমস্কার—

চম্‌কে উঠেছে স্বপ্রিয়। ভবনাথবাবু সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বপ্রিয়ও দু'হাত তুলে নমস্কার করলে।

ভবনাথবাবু বললেন—একটা কথা ছিল স্যার, আপনার সঙ্গে—

স্বপ্রিয় কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইলে। বংশী দাসের কথা! বংশী দাসের সঙ্গে জেলে দেখা করতে চেয়ে ওর বউ কাল নাকি দরখাস্ত করেছিল। তা স্বপ্রিয় কী করতে পারে! বংশী দাস জেলখানায় আছে পুলিশির হেফাজতে। এখন বংশী দাসের জীবন ভারি দামী! অত্যন্ত যত্ন আর অত্যন্ত সাবধানতা নেওয়া হবে বংশী দাসের জীবনের জন্যে। যখন সে স্বাধীন ছিল তখন সে খেতে পাচ্ছে কি উপোস করছে, তা দেখবার কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আসামী সে। যে-সে আসামী নয়, খুনের আসামী। তার খাওয়া, থাকা, বাঁচার ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশের ত্রুটি হবে না।

স্বপ্রিয় বললে—বলুন—

ভবনাথবাবু বললেন—এখানে র‍্যাশনের দোকানে কাপড় যা এসেছে স্যার, পরা যায় না—ভেতরে ভেতরে ভালো কাপড়গুলো ব্ল্যাক-মার্কেট হয়ে যাচ্ছে খবর পেলাম—

গোটাকতক বাজে কথা বলে ভবনাথবাবু চলে গেলেন। আশ্চর্য লাগলো স্বপ্রিয়র। তার মক্কেলের আজ ফাঁসির রায় বেরুল, আর আজই নিশ্চিন্ত মনে

ভবনাথবাবু কাপড়ের কথা ভাবছেন! সুপ্রিয় ভাবলে একবার ডাকবে নাকি ভবনাথ-বাবুকে? প্রবীণ উকিল তিনি। পনেরো দিন সময় দিয়েছে সুপ্রিয় আপীলের জন্যে। আপীল করবার কথাটা একবার মনে করিয়ে দিলে হতো। কিন্তু ভবনাথবাবু তখন অনেকদূর চলে গেছেন।

বাড়ি ফিরে নিজেকে যেন কেমন দুর্বল মনে হলো সুপ্রিয়র।

প্রমীলা গায়ে হাত দিয়ে বললে—একি, গা যে গরম তোমার—জ্বর হলো নাকি—

সকালবেলাই জ্বর বেড়ে গিয়ে একশো তিন ডিগ্রীতে দাঁড়াল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সমস্ত মাথাটা যেন কে কেটে ফেলছে! প্রমীলা বললে—পরশু রাত জেগেই তোমার এই হয়েছে—

রাত জাগার জন্যে যে জ্বর হয়নি সুপ্রিয় তা ভালো করেই জানে। তবু শরীর তার সহজে সারবে না মনে হলো। সেইদিনই লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দিল সুপ্রিয়।

লম্বা তিনমাসের ছুটি। কলকাতায় এসে সুপ্রিয় বিশ্রাম নিল অনেক দিন। জ্বর আজকাল আসে না। এখানে এসে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো। প্রচুর বই পাওয়া যায়—কিন্তু ভয় হয় মনের ভেতর। আবার যেতে হবে ফিরে। আবার সেই শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভবনাথবাবু—সেই আদালত!

বংশী দাস আপীল করেছে হাইকোর্টে।

খবরটা পেয়ে অনেকটা স্বস্তি পেলে সুপ্রিয়।

প্রমীলা গাড়ি নিয়ে বেরোয় এদিক-ওদিকে। নানা লোকের সঙ্গে তার দেখা করা দরকার। সুপ্রিয়র চাকরিতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে—খবরটা বোধ হয় চারিদিকে প্রচার করা দরকার। আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত সকলের ঈর্ষার উদ্রেক হলে প্রমীলার সার্থকতা প্রমাণ হবে!

সিনেমার শেষ শো'তে গিয়ে বসেছিল সুপ্রিয়। কখন আরম্ভ হয়েছে, কখন শেষ হলো বুঝতে পারা যায়নি। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ট্যাক্সি করা চলতো। কিন্তু গ্রীষ্মকালের রাত। আবার অনেকদিন পরে অন্ধকারে একলা একলা হাঁটতে ইচ্ছে হলো সুপ্রিয়র।

চৌরঙ্গি ধরে হাঁটতে লাগলো সুপ্রিয়। বড় নির্জন রাস্তা। হঠাৎ অনেক দূর এসে সুপ্রিয়র মনে হলো কে যেন নিঃশব্দপদে তাকে অনুসরণ করছে। পেছন ফিরে চাইলে সুপ্রিয়। কেউ তো কোথাও নেই! অনেকদিন আগের সেই শিশুগাছের জঙ্গলের রাস্তার কথা মনে পড়লো। সেদিন রায় দিয়েছে সুপ্রিয় বংশী দাসের খুনের

মামলায়। বংশী দাস! নামটা মনে পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠলো সুপ্রিয়। কিন্তু সে তো এখনও হাজতে! এখনও পুলিশ-প্রহরী পাহারা দিচ্ছে বংশী দাসের অমূল্য পরমায়ুকে! সে তো এখনও বেঁচে আছে! সে আপীল করেছে। হাইকোর্ট পুজোর ছুটির পর খুললেই আবার তার মামলার আপীলের শুনানি হবে।

কে জানে! হয়ত অবিচার হয়েছে বংশী দাসের ওপর। ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো-দুই ধারা প্রয়োগ করা হয়ত অন্যায় হয়েছে!

অনেক দূর আসতে আসতে ভবানীপুরের রাস্তায় সুপ্রিয় দেখলে এখানে রাত অনেক হয়েছে। দু'-একটা পানের দোকান তখনও খোলা আছে। এবার একটা ট্যাক্সি করলে হয়।

হঠাৎ সুপ্রিয় দেখলে—জনহীন রাস্তার ওপর দিয়ে অত্যন্ত মৃদু গতিতে সাইকেল চালিয়ে চলেছে একটা পুলিশ-সার্জেণ্ট আর তারই পেছন পেছন চলেছে আর-একটা কনস্টেবল একটা ছোট থলি হাতে নিয়ে। থলির ভেতরে যেন ভারী কিছু রয়েছে।

মন্থরগতি সাইকেলের ওপর পুলিশ-সার্জেণ্ট এদিক-ওদিক চাইছে।

হঠাৎ গতি থেমে গেল সাইকেলের। ফুটপাথের একধার থেকে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ শব্দে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।

সার্জেণ্টের ইঙ্গিত পেয়ে পিছনের কনস্টেবল তার থলি থেকে কী একটা জিনিস ছুঁড়ে ফেললে কুকুরটার দিকে। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে নিমেষের মধ্যে মুখে পুরে দিলে। বোধহয় লোভনীয় মুখরোচক কোনো খাদ্যপিণ্ড। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করে কুকুরটা বনবন করে চরকির মতো ঘুরতে লাগলো। তার কিছুক্ষণ পরে আর নড়ল না কুকুরটা—

কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলে সুপ্রিয়।

সার্জেণ্টের ইঙ্গিত পেয়ে কনস্টেবলটা এসে সুপ্রিয়কে বললে—বাবুজী, ওদিকে দেখবেন না—সরে যান—

মাথাটা সত্যিই সেদিনকার মতো আবার ঘুরতে সুরু করেছে সুপ্রিয়র। অনেক দূরে গিয়ে সুপ্রিয়র মনে হলো ঠিক আগেকার মতন যেন আর-একটা কুকুরের বিকট একটা চীৎকার উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ। তবে কি সারা রাত এমনি চলবে?

সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে উঠে পড়ল সুপ্রিয়। আজ আর হাঁটার শক্তি নেই তার।

প্রমীলা গায়ে হাত দিয়ে বললে—একি, আবার তোমার জ্বর এল—রাত্রে হেঁটে

বেড়িয়েই তোমার অসুখ করেছে—কী-যে তোমার হাঁটার শখ—গাড়ি থাকতে এত হাঁটা—

রাস্তায় হাঁটার জন্যে যে জ্বর হয়নি তা সুপ্রিয় ভালো করেই জানে। তবু শরীর তার সহজে সারবে বলে মনে হলো না। অথচ ছুটিও তার ফুরিয়ে এসেছে। আবার সেই আদালত, শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভবনাথবাবু—সেই বংশী দাস, বাসন্তী··· লক্ষ্মণের মৃত আত্মা···

সব জিনিস সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিদেশে অনেক জিনিস পয়সা থাকলেও সময়মতো পাওয়া যায় না। ছোটখাটো স্টেশনারী জিনিস—টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে তোয়ালে, গামছা, পাপোশ, ঝাড়ন—যাবতীয় সংসারের খুঁটিনাটি জিনিস।

তারপর আছে প্রমীলার শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না···

সুপ্রিয়র নিজের স্যুট্, ছাতা, জুতো, ফ্লাস্ক—কী নয়?

প্রমীলা নিজের জিনিসগুলো সুযোগ মতো নিজেই কিনে নিয়েছে। সুপ্রিয়কে কিনতে যেতে হলো টুকিটাকিগুলো। সকালবেলা বেরিয়ে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে কিনতে হলো সব। আবার প্রায় বহুদিনের মতো যাওয়া। হয়ত একবছর পরে কলকাতায় আসবার সুযোগ হবে।

সুপ্রিয় জিনিসগুলো কিনে যখন বাড়ি ফিরল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

চাকরটা গাড়ি থেকে মালপত্র এনে নামিয়ে রাখল।

প্রমীলা বললে—এটা কী গো! দড়ি একগাছা কিনেছ কী করতে?

—দড়ি!

নিজেই অবাক্ হয়ে গেছে সুপ্রিয়। দড়ি কেনবার তো কথা ছিল না। দড়িটা কখন সে কিনলে! সরু সাদা সুতোর তৈরী চমৎকার কয়েক গজ দড়ি! সুপ্রিয় চম্‌কে উঠলো। এতখানি দড়ি সে কেন কিনেছে!

প্রমীলা বললে—দড়ি নিয়ে কি গলায় দেব নাকি?

তাই তো বটে! সুপ্রিয়র যেন মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। চক-চকে ঝকঝকে দড়িটা যেন জীবন্ত একটা সাপের মতো সুপ্রিয়র দিকে ফণা তুলে চেয়ে দেখছে! মাথাটা কি আবার ব্যথা করে উঠছে! আবার বোধহয় তার জ্বর আসবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুপ্রিয় ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলো। সকাল থেকে আজ খবরের কাগজ দেখাও হয়নি একবার।

কাগজটা খুলেই চম্‌কে উঠলো সুপ্রিয়!

বড় বড় হেড-লাইনে লেখা রয়েছে—কোনো এক ফাঁসির আসামী আত্মহত্যা করেছে। ফাঁসির প্রাক্কালে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা পড়তে পড়তে হঠাৎ সুপ্রিয়র বংশী দাসের কথা মনে পড়লো। বাসন্তী তো বংশীকে বাঁচাতে পারে। দেখা করবার সময় লুকিয়ে বিষ নিয়ে গিয়ে দেখা করতে পারে সে। তারপর আর জেলের ফাঁসির দড়ি তাকে স্পর্শ করবে না। অব্যাহতি পাবে বংশী। ফাঁসির দড়ির অপমান থেকে অব্যাহতি পাবে! তা ছাড়া শুধু কি বংশী-ই অব্যাহতি পাবে? সুপ্রিয়কেও তো অব্যাহতি দিয়ে যাবে! প্রতিদিনের এই মানসিক অশান্তির উপদ্রব থেকে বংশী তাকে অব্যাহতি দিতে পারে।

ছুটি ফুরিয়ে গেছে। রাত্রের ট্রেনে যাওয়া। আবার সেই আদালত—সেই শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভবনাথবাবু···

প্রমীলা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি দেখা করতে চলে গেছে।

সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা খবরে সুপ্রিয়র চোখ আটকে গেল।

বংশী দাসের মামলার আপীলের রায় বেরিয়েছে। সুপ্রিয়র সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চ হলো। পুজোর ছুটির পর হাইকোর্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে বংশী দাসের বিচার সুরু হয়েছিল। এতদিনে তার যবনিকাপাত হয়েছে। সুপ্রিয় একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেললে। হঠাৎ তার মনে হলো যেন বহুদিন পরে রোগমুক্ত হয়েছে সে। জানলা দিয়ে শরতের রোদ এসে মেঝেতে পড়েছে। সেই রোদের সোনা যেন বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে হলো সুপ্রিয়র কাছে।

পাশের বারান্দায় চাকরটা মালপত্র বাক্স-বিছানা গুছিয়ে রাখছিল। সুপ্রিয় সেখানে গেল। সেই সেদিনের কেনা দড়িটা দিয়ে একটা বিছানার বাণ্ডিল কষে-কষে বাঁধছে চাকরটা। সুপ্রিয়ই দড়িটা কিনে এনেছিল। কিন্তু চাকরটা সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিয়র আর কোনো দায়িত্বই নেই—

অনেক দেরি করে প্রমীলা ফিরে এল। একতলায় প্রমীলার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে···

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে সুপ্রিয়র মনে হলো অবিচার তবে সে করেনি। আইন পাশ করা তার তবে ব্যর্থ হয়নি। বংশী দাসের ফাঁসি হয়েছে, সুপ্রিয় বেঁচেছে! অন্তত তার মান-মর্যাদা বজায় রইল। তার বিচার নির্ভুল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সুপ্রিয়।

আর একজন মহাপুরুষ

"যে মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি এই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের জীবন গঠন করে—তাঁর জীবনদর্শনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তবেই আমাদের আজকের এই সভা সার্থক। আমি সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন এই মহাপুরুষের সাধনাকে সফল করতে চেষ্টা করেন। বাঙলাদেশ আজও নিঃস্ব হয় নি···আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে, করুণাপতিবাবু আমাদের এই বাঙলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন···রামমোহন বিবেকানন্দের বাঙলা দেশ, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাঙলা দেশ, নেতাজী দেশবন্ধুর বাঙলা দেশ—এই বাঙলাদেশ-ই আর একজন—আর একজন মহাপুরুষের জন্মভূমি—ধন্য বাঙলাদেশ, ধন্য করুণাপতিবাবু—ধন্য আমরা···"

এক এক জন বক্তৃতা দেন আর প্রচুর হাততালি।

করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিরাট সভা বসেছে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা করুণাপতি মজুমদারের জন্মবার্ষিকী। ওপাশে করুণাপতিবাবুর বিরাট অয়েল-পেন্টিং ঝুলছে। তার ওপর প্রকাণ্ড ফুলের একটা মালা ঝুলছে। লাল শালু আর হলদে চাদরের ওপর পদ্মফুল-আঁকা শামিয়ানা! ডায়াস-এর ওপর গণ্যমান্য কয়েকজন লোক। ফুড-মিনিস্টার প্রধান সভাপতি। জেলখাটা কয়েকজন দেশনেতা, কয়েকজন সাহিত্যের পাণ্ডাও উপস্থিত।

একে একে অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গীত। তার পর সভাপতি বরণ। নন্দীপাঠ, প্রধান অতিথি! সভার উদ্বোধন! মাল্যদান। তারপর কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, একক সঙ্গীত, বক্তৃতা। শোনা গেছে শেষে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থাও নাকি আছে।

করুণাপতির বড় ছেলে তথাগত মজুমদার বড় ব্যস্ত। তাঁকেই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বর্ধমানের এস-ডি-ও। তারপরের ছেলে রাতুল মজুমদার বেহারের সিভিল সার্জেন। তারপরের ছেলে পল্লব মজুমদার রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। তার পর আরও অনেক আছে। সকলের নাম জানি না—মুখ চেনা। সবাই কৃতবিদ্য। সাত ছেলে, তিন মেয়ে। সবাই আজ চারদিক থেকে এসে জুটেছে। বাবার জন্মবার্ষিকীতে তাদেরই তো খাটবার কথা। তবু মহাপুরুষরা কোনও দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তাই দেশের লোকেদের দায়িত্বও কম নয়?

ওপাশে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সার বেঁধে খাতা পেনসিল নিয়ে বসে লিখছে। বাঁ-পাশে মহিলাদের জায়গা। তিন মেয়ের সঙ্গে প্রধান শিক্ষয়িত্রীও বড় পরিশ্রম করছেন। গণ্যমান্যরা যদি অভ্যর্থিত না হন, জলযোগের আগেই যদি তাঁরা চলে যান! তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সব দিকে।

তথাগত একবার কাছে এসে নীচু হয়ে বললে—কাকাবাবু, আপনাকে কিছু বলতে হবে—

মুখ তুলে চাইলাম। অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। সঙ্গে আর একটি ছেলে। বললাম—এটি কে—তোমার ছেলে নাকি?

তথাগত বললে—না, ছোট ভাই—দেখেন নি একে—এর নাম পরাশর—

পরাশর হাত জোড় করে নমস্কার করলে! বয়েস বেশি নয়। দেখে মনে হলো যেন চিনি-চিনি।

করুণাপতির সব ছেলেমেয়েদেরই চিনতাম। সাতটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। যতদূর মনে পড়ে, তখন কিন্তু নামের এত বাহার ছিল না। কিন্তু পরাশর? এ কবে হলো?

বললাম—একে তো কখনও দেখি নি—

তথাগত বললে—এ আমার ছোট ভাই·· তা হলে এর পরেই কিন্তু কাকাবাবু আপনাকে বাবার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে—

তখন দেশসেবকদের একজনের বক্তৃতা চলছিল। করুণাপতিবাবুর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কত গোপন দান ছিল তাঁর। কত বিধবার ভরণপোষণ করতেন। দেশের ছেলেমেয়েরা কেমন করে একদিন মানুষ হবে, সেই চিন্তাই সারাদিন করতেন তিনি। আজীবনের সমস্ত উপার্জন কেমন করে এই 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ে'র জন্যে দান করে গেছেন। নীরব, একনিষ্ঠ কর্মী তিনি—কখনও যশের জন্যে লালায়িত হন নি। ইনিয়ে-বিনিয়ে তিনি প্রমাণ করতে লাগলেন করুণাপতিবাবু আমাদের দেশের আর-একজন মহাপুরুষ—

একে একে সকলের বক্তৃতা হয়ে গেল।

তথাগত এবার কাছে এসে মুখ নীচু করে বললে—এবার আপনার পালা কিন্তু—

সভাপতি ফুড-মিনিস্টার নাম ঘোষণা করলেন—

আমি উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

করুণাপতির সম্বন্ধে আমি কী যে বলবো! অথচ এই সভায় আমার চেয়ে তাঁকে আর কে অমন করে জানতো! প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।

তখন দুজনেরই রেলের চাকরি। সিভিল সার্জেনের বাড়িতে আমাদের তাসের আড্ডা ছিল। সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছে—তার পর রাত এগারোটাও বাজতে চললো। কম্পাউণ্ডার হরনাথ তখন বেশ কিছু মোটারকম জমিয়ে নিয়েছে। সিভিল সার্জেন হেরেছে, আমিও তাই। আর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর রামলিঙ্গমের না-হার, না-জিত। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।

এমন সময় সিভিল সার্জেনের বাড়ির কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো।

সিভিল সার্জেন বললে—ছাখ্ তো ফলাহারি, কে ডাকে—

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি নেমেছে। খেলাটাও তখন বেশ জম-জমাট। কারুরই তখন ওঠবার ইচ্ছে নেই। আর বাড়িও কারও দূরে নয়! দু'পা গেলেই যে-যার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়া।

ভয় ছিল সিভিল সার্জেনের। কিন্তু শমন এল আমারই।

স্টেশনের জমাদারকে পাঠিয়েছে করুণাপতি। স্ত্রীর ভীষণ অসুখ। এখনি যেতে লিখেছে। জমাদার রামভক্ত হ্যাণ্ড-সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকার বারান্দায় নীল-কোট-পরা জমাদারকে যেন যমদূতের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু তা হোক—তবু যেতে হবে। যেতেই হবে। স্টাফের অবশ্য মিথ্যে অসুখ করে। একদিন পরে দেখতে গেলেও চলে। শেষ পর্যন্ত একখানা আন্‌ফিট সার্টিফিকেটের পরোয়া। তাতে বড়জোর লাভ একটা রুইমাছ, নয়তো কলকাতা থেকে আনিয়ে-দেওয়া এক সের পটোল। কিন্তু করুণাপতির সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ। এক জেলার মানুষ। এক স্কুল থেকে পাস-করা।

জিজ্ঞেস করলাম—ডাউন-গাড়ি কিছু আছে নাকি যাবার?

রামভক্ত বললে—কণ্ট্রোল অফিসে খবর নিয়ে এসেছি—'টু-নাইন্‌টিন' অর্ডার হয়েছে সাড়ে বারোটায়। সেইটেতে যাওয়াই সুবিধে।

মালগাড়ির ব্যাপার। সাড়ে বারোটায় যদি অর্ডার হয়ে থাকে, তা হলে সাড়ে বারোটাতেই যে ছাড়বে, তার কোনও ঠিক নেই। শেষ মুহূর্তে ড্রাইভার 'সিক্ রিপোর্ট' করতে পারে। গার্ড ঘুম থেকে উঠতে দেরি করতে পারে। কত রকমের হাঙ্গামা।

তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুলাম। ঘটনাচক্রে গাড়িও রাইট টাইমে ছাড়লো। মালগাড়ির ব্রেক-ভ্যানের মধ্যে টিমটিম করছে হারিকেনের আলো। দুটি ছোট ছোট বেঞ্চি। গার্ড নিজের বিরাট বাক্সটার ওপর বসতে বললে। রামভক্তও দরজাটা ভেজিয়ে কমোড্‌টার পাশে হাঁটু জুড়ে বসলো। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

থ্রু ট্রেন। ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে। উড়ে চলুক আর নাই চলুক—অন্তত ভেতরে বসে আমাদের তাই মনে হলো। ঝনঝন কটকট শব্দ আর দুলুনি। ঠিক দুলুনি নয়, ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনির জ্বালায় বাক্সটা দু'হাতে ধরে বসে আছি। কণ্ট্রোল অফিসে বলা ছিল যে বড়মুণ্ডায় যেন থামানো হয় গাড়ি। বড়মুণ্ডার স্টেশনমাস্টার করুণাপতি।

ছোট স্টেশন বড়মুণ্ডা। রাত্তিরবেলা স্টেশনটাকে দেখাই যায় না। ছোট্ট একটা ঘর। জানলার কাচ দিয়ে হারিকেনের আলোটা পর্যন্ত বৃষ্টির জন্যে দেখা যাচ্ছে না। মালগাড়ির ব্রেকটা থামলো স্টেশন থেকে একমাইল-টাক দূরে। সাবধানে দুটো ধাপ নেমে রেলের লাইন আর দু'পাশে জড়ো-করা ব্যালাস্ট। ক্রেপ-সোলের জুতো দুটো লাইনের মধ্যেকার জলে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করে। চারিদিকে জলা আর আগাছা। আর ধু-ধু করছে মাঠ। ঝড়ের ঝাপটা। ব্যাঙের আর ঝিঁঝির ডাকে ভয় করে ওঠে। কেবল বিন্দুর মতো দূরের সিগন্যালের লাল আলোটা স্থির হয়ে জ্বলছে। নামবার পরেই লাল বিন্দুটা নীলে রূপান্তরিত হলো—আর গাড়িটা একটা ঝাঁকানি দিলে। তার পর চাকায়, স্প্রিংএ, ব্রেকে, ওয়াগনে, ইঞ্জিনে মিলে সে এক বিচিত্র ঝঙ্কার দিতে-দিতে চলতে শুরু করলো।

স্টেশন থেকে দোতলা সমান নীচুতে করুণাপতির কোয়ার্টার। রামভক্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল।

করুণাপতি জাফরিওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—এসেছ ভাই—বাঁচালে—

সামনে জাফরি-দেওয়া বারান্দা। বারান্দা মানে একফালি জায়গা। বৃষ্টির ছাটে ভেতরে সব ভিজে যায়। কিন্তু তারই ভেতরে ঘুঁটের বস্তা, একটা তেলচিটে ডেক-চেয়ার, দুখানা দড়ির খাটিয়া, বেতের দোলনা, ছেলেমেয়েদের জুতোর আণ্ডিল—সব

ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে করুণাপতি যেন বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললে। বললে—কোথায় যে তোমাকে বসতে দিই—

বললাম—বসতে তো আসি নি, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—

বললে—না, না, তবু—ওই ছাখো-না—ঘর দেখছ তো—

ঘরের ভেতর চেয়ে দেখলাম। বারান্দার আলোটা ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত ঘরটা জোড়া ময়লা মশারি। ঘরের ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই।

রামভক্ত ওষুধের ব্যাগটা নামিয়ে দিয়েছে।

করুণাপতি বললে—তুমি আর দাঁড়িয়ে ভাবছো কেন রামভক্ত, সারাদিন তো তোমার খাটুনির শেষ নেই—যাও একটু গড়িয়ে নাও গে—কাল সকাল থেকেই আবার ডিউটি—এখন তো ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। বুঝলে ভাই, রামভক্ত আছে বলে তাই দুটি ভাত পাচ্ছি—নইলে কী যে হতো—

বললাম—সে কথা থাক্—বউদিকে দেখি চলো—

পাশের ঘরটাতেই রোগী শুয়ে। সাত ফুট বাই ছয় ফুট একখানা ঘর। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটা ছোট টেবিল-ল্যাম্প। খাটের ওপর গিয়ে বসলাম।

বললাম—জ্বরটা নেওয়া হয়েছে নাকি—

—জ্বর নেব কী করে, থারমোমিটার কি আছে? একটা সাবান কিনতে গেলেও সেই বিলাসপুরে যেতে হয়—আর কিনলেই কি থাকবে অপোগণ্ডদের জ্বালায়—একটি-দুটি নয় তো—দশটি যে—সোজা কথা!—গাছ যে ওদিকে খুব ফলন্ত—বুঝলে কিনা—

জ্বর রয়েছে খুব। বুক পরীক্ষা করলাম। জিভ দেখলাম। একটু বরফ থাকলে ভালো হতো। সাদা ফ্যাকাশে চোখদুটো। চোখের তলাটা টেনে দেখলাম—রক্তহীন। সমস্ত শরীরটাই যেন বড় নীল-নীল বলে মনে হলো। হাতের পায়ের শিরাগুলো নীল হয়ে বাইরে ফুটে উঠেছে।

করুণাপতিকে জিজ্ঞেস করলাম—কখন থেকে এরকম হলো—

বললে—এই পরশু এমনি সময় থেকে, প্রথমে ভাবলাম পড়ে-ফড়ে গেছে বুঝি··· ···তার পর কাল সকাল থেকে এমন হলো যে, কাপড় একেবারে ভেসে গেল, ভাই—শয্যাশায়ী একেবারে, ভাবলাম কী করি—আমি বইটা খুলে দেখে দিলাম দু'ডোজ ক্যামোমিলা টু-হান্‌ড্রেড—শেষে আজকের অবস্থা দেখে আর ভরসা হলো না—রামভক্তকে পাঠালাম তোমার কাছে—

জিজ্ঞেস করলাম—ক'মাস হলো—

করুণাপতিও জানে না—স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁগো, ক'মাস হলো তোমার—শুনছো—ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন ক'মাস হলো—

কোনও উত্তর না পেয়ে করুণাপতি শেষে নিজেই বললে—পাঁচ-ছ' মাসের বেশি নয়—

বললাম—বরফ যখন নেই, তখন কপালে জলপটি দিতে হবে, আর একটু গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারো—তলপেটে সেঁক দিলে ভালো হতো—

রামভক্তকে আবার ডাকতে হলো। করুণাপতি বললে—তোমার কষ্ট হলো রামভক্ত—কিন্তু আমি যে-বিপদে পড়েছি, কী করবে বলো—

সঙ্গে করে মিকশ্চার এনেছিলাম। দিলাম এক দাগ খাইয়ে। কোনো রকম চোট না লাগলে এমন হবার তো কথা নয়।

একটু পরেই রোগীর যেন বেশ আরাম হলো। দেখলাম ঘুম এসেছে—

করুণাপতি বললে—এবার বাইরে একটু বসবে চলো—তোমাকেও খুব কষ্ট দিলাম—

বাইরে ডেক-চেয়ারটায় বসলাম। করুণাপতি সামনে টুল নিয়ে বসে আর-একটা বিড়ি ধরালে। বাইরে তেমনি অঝোর বৃষ্টি। কলকল শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

করুণাপতি বললে—সেরে যাবে—কী বলো ডাক্তার—

—দেখা যাক্—

করুণাপতি আবার বললে—কপাল, সবই কপাল—এত লোকই তো বিয়ে করেছে—কিন্তু এমন বছর বছর ছেলে-হওয়া কখনো দেখেছ, ভাই—এ যেন ঠিক কাঁঠাল গাছ—আজ বারো বছর বিয়ে হয়েছে, প্রথম দুটি বছর কেবল ফাঁক গিয়েছিল, তার পর সেই যে শুরু হলো, আর থামতে চায় না—নাগাড়ে চলেছে একটানা—কী খেয়ে যে এমন স্বাস্থ্য করেছে কে জানে বাবা, এমন ফলন্ত মেয়েমানুষ আমি আর দেখি নি—অথচ মাসের মধ্যে তো অর্ধেক রাত ঘরেই শুই না, নাইটডিউটি করতে হয়—

মশারির মধ্যে ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল।

করুণাপতি উঠলো।

—ওই বাঁশী বেজেছে—ও নিশ্চয়ই ক্ষেন্তি—করুণাপতি মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে কেমন টান পড়ে মশারির দুটো কোণ খুলে গেল।

—দুত্তোর ছাই—এমন জানলে কোন্ শালা বিয়ে করতো—দু'হাতে মশারিটা টেনে বাইরে সরিয়ে দিলে করুণাপতি। দেখলাম—গড়া গড়া ছেলে-মেয়েরা শুয়ে আছে। একজন আর-এক জনের ঘাড়ে পা দিয়ে। গুণে দেখলাম দশটি। সাতটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দুটো-তিনটে ছেলে বিছানা বুঝি ভিজিয়ে দিয়েছিল। করুণাপতি সেই ভিজে বিছানার ওপরেই পিঠ চাপড়ে ক্ষেন্তিটার ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলে। ছোটটির বয়েস ছ'মাসের বেশি নয়। করুণাপতির দিকে চেয়ে দেখলাম। ও তো এমন ছিল না আগে। ও কি পৃথিবীর কিছু খবরই রাখে না! আজকাল তো কত রকমের উপায় বেরিয়েছে। খবরের কাগজেও তো সে-সব জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকে।

ঘুম পাড়িয়ে উঠে এল করুণাপতি। আবার একটা বিড়ি ধরালে।

বললে—বিয়ের পর বোঁচা যখন প্রথম হলো, ভাবলাম আর নয়, একটি ছেলে—সামান্য যা চাকরি, একটি ছেলেকে ভালো করে মানুষ করে যাবো—কিন্তু বউ বললে আর একটি মেয়ে হলে হতো—তা হোক বাবা, তোমার যখন শখ, তখন হোক—কিন্তু পরের বছরেই হলো একটা ছেলে—তার পর থেকে আর কামাই দেয় নি ভাই—তাই বলি বউকে মাঝে মাঝে যে, তুমি কোনো বড়লোকের ঘরে পড়লে ভালো হতো—ছেলেমেয়েগুলো অন্তত পেট পুরে তো খেতে পেতো—এ আমার কাছে এসে শুধু ব্যাঙাচির মতো বাঁচা—একটা ভালো জামা কিনে দিতে পারি না—পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—তার পর যদি বাঁচে, তো লেখাপড়া শেখাবোই বা কেমন করে, আর মেয়ে-তিনটের বিয়েই বা দেব কী করে ভগবান জানেন—

ফস ফস করে করুণাপতি বিড়িতে টান দিলে কিছুক্ষণ।

—এদিকে ভাই, চাকরিটাও যদি একটু ভদ্রলোকের মতন হতো তো বাঁচতুম—হেড-অফিসে মুরুব্বি তো তেমন নেই কেউ—এখন কেবল মাদ্রাজীর রাজত্ব, এই ছ্যাখোনা ছিলাম রায়গড়ে, দু পয়সা হচ্ছিল্, দিন গেলে কিছু-না-হোক তিন-চারটে টাকার মুখ দেখতে পেতুম, কারবারী মহাজন দু'পাঁচজন দিত হাতে গুঁজে, ওয়াগন-ভর্তি মুড়ি বুক্ হতো, মুড়িও পেতুম, ওয়াগন পিছু চার আনা হিসেবে আবার……তা ধরো তোমার গিয়ে বেশ ছিলাম সেখানে, মাইনেটায় হাত পড়তো না,—কিন্তু তেলেঙ্গীদের চক্ষুশূল হলো, হেড-অফিসের আয়ার-সাহেবকে ধরে ভেঙ্কটরাও সেখেনে গিয়ে এখন রাজত্ব করছে আর আমায় বদ্‌লি করে দিয়েছে এই বুড়মুণ্ডায়, এখানে প্যানটি পর্যন্ত কিনে খেতে হয়—দুঃখের কথা আর কী বলবো ভাই—

রামভক্ত এসে বললে—এবার মা ঘুমোচ্ছে—আর কি জলপটি দিতে হবে?

করুণাপতি বললে—না থাক্, এবার তুমি একটু বিশ্রাম করোগে যাও, রামভক্ত—কাল ভোরবেলা থেকেই তোমার তো আবার ডিউটি—

রামভক্ত চলে যাবার পর করুণাপতি বললে—এই রামভক্তকেই ছ্যাখোনা—বেটা অনেক টাকার মালিক—সুদে খাটায়—এখনও আমার কাছে শত-খানেক টাকা পায় বেটা—বিনা-টিকিটের প্যাসেঞ্জাররা ছিট্‌কে-ছিট্‌কে ট্রেন থেকে নেমে এদিক-ওদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, ও গিয়ে ধরে, তা মাসে ওর পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপরি আয়…দেশে বউ আছে, ছেলেপিলের বালাই নেই—টাকা পাঠিয়ে দেয়, আর এখানে একজন জোয়ান দেখে জাতওয়ালীকে রেখেছে, সে-ই রান্নাবান্না করে, রোগ হলে সেবা করে…… আর রোগ না হলে আরামসে পা টেপায়—

গল্প করতে করতে একটু যেন তন্দ্রার মতন আসছিল। হঠাৎ করুণাপতির ডাকে উঠে বসলাম। যন্ত্রণায় ছটফট করছে রোগী। উঠে ঘরে গেলাম। অবস্থা দেখে বড় ভয় হলো। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। মুখ নীল হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়ে আসে একবার, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। হাতের কাছে আর কোনো ওষুধও নেই। কিন্তু কেন এমন হলো!

বললাম—এখন বিলাসপুরে যাবার কোনো গাড়ি আছে, করুণাপতি—একটা ওষুধ আনলে হতো—

বৃষ্টির মধ্যেই করুণাপতি দৌড়ে একবার স্টেশনে গেল। তখুনি আবার ফিরে এসে বললে—সেই ভোরের আগে আর তো গাড়ি নেই, ডাক্তার—কী হবে—

সেদিন সেই রাত্রে মনে আছে, করুণাপতির স্ত্রীকে বাঁচাবার সে-কী আপ্রাণ চেষ্টা আমার! যে-ওষুধটা দরকার শেষ পর্যন্ত সেটা আনানোও হয়েছিল বিলাসপুর থেকে! কিন্তু রোগীর সমস্ত শরীর যেন ক্রমেই নীল হয়ে আসছিল।

করুণাপতি বলেছিল—টাকা থাকলে কি আজ আমার ভাবনা—

বললাম—টাকা দিয়ে কি জীবন পাওয়া যায় নাকি—

করুণাপতি বললে—টাকা নেই বলেই তো এই বড়মুণ্ডায় পড়ে আছি—এখনি যদি হেড-অফিসে গিয়ে হাজার খানেক টাকা নিতাইবাবুর হাতে গুঁজে দিতে পারতাম—আর আয়ার-সাহেবকে হাজার-চারেক, তা হলে দেখতে ওই ভেঙ্কটরাওয়ের জায়গায় আমিই গিয়ে বসতাম—বউও বাঁচতো, ছেলেপুলেগুলোকেও খাওয়াতে পরাতে, লেখাপড়া শেখাতে পারতাম—

সেদিন শেষ রাত্রে করুণাপতির স্ত্রী শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিল। সমস্ত শরীরে কী যে একরকম বিষক্রিয়া শুরু হলো, কেমন সন্দেহ হলো আমার। এ তো সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়!

সেদিন আমার হাতদুটো ধরে শোকসন্তপ্ত করুণাপতির কী অঝোর ধারে কান্না! বললে—তোমাকে বলেই বলছি ভাই—বউটাকে আমি-ই মারলাম আজ—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

করুণাপতি বলতে লাগলো—দশটা ছেলেমেয়ের পর একদিন যখন শুনলাম আবার নাকি একটা হবে—তখন ভাই, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ আনলাম একটা—সেইটে খাওয়ার পর থেকেই—

করুণাপতি কথা শেষ করতে পারলে না।

অবস্থা নিজের চোখে তো আমি দেখছি। তখনও ছেলেমেয়েরা সেই স্বল্পপরিসর

ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে, করুণাপতির ছেঁড়া ফতুয়া আর ঘন ঘন বিড়ি খাওয়া, আর ওই নির্বান্ধব নিঃস্ব বড়মুণ্ডা স্টেশন—যেখানে স্টেশনমাস্টারকে পয়সা দিয়ে কিনে পান খেতে হয়।

সেদিন-যে ডাক্তার হয়েও মিথ্যে ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম আমি, সে শুধু করুণাপতির মুখের দিকে আর তার অসংখ্য অপোগণ্ডদের দিকে চেয়েই।

কিন্তু সেদিন আমিই কি ভেবেছিলাম যে, সেই করুণাপতিকেই আবার কয়েক বছর পরে রঙ্গমঞ্চের আর-এক দৃশ্যে আর-এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পাবো। কিন্তু অন্য ভূমিকা হলেও চামড়ার নীচের রক্তটা ছিল দুজনেরই এক জাতের।

আমি সেদিন একটা আলু-চুরির মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে ফিরছি। যুদ্ধ তখন বেশ ঘোরালো হয়ে বেধেছে। সিভিল টাউন থেকে বিকেলবেলা ফিরলাম তাজপুর জংশনে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাজপুর একটা বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। আশেপাশে ধানের আর কাপড়ের মিল। বড় বড় চার-পাঁচটা শহরতলির কাছাকাছি। শহরতলির আশেপাশে দুটো ডলোমাইট-এর খনি আছে ছ মাইল দূরে। তার পর আছে চামড়ার কারবার। সিভিল টাউনটাই দেখবার মতো। সিমেণ্ট-করা রাস্তা। আর একদিকে চলে গেছে ডিহিরির ব্রাঞ্চ লাইন। জি-আর-পি'তে গিয়ে মিশেছে। ঘি, দুধ আর ছানার দেশ। স্টেশনের সামনে বুকের পাঁজরার মতো অসংখ্য লাইন মাইল দুই জুড়ে পড়ে আছে। কালো গ্র্যানাইট পাথরের স্টেশন-বিল্ডিং। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর ইউরোপিয়ানদের কলোনি। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাড়োয়ারী, মহাজন—কিছুরই অভাব নেই।

দোতলার ওয়েটিংরুমের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ওইসব দেখছিলাম।

একজন বেয়ারা এসে বললে—বড়সাহেব সেলাম দিয়া—

—কোন বড়সাহেব?

—টিশন-মাস্টার—

স্টেশনমাস্টার! কোন্ সাহেব? তাজপুর জংশনের স্টেশনমাস্টার বরাবরই সাহেব। আগে ছিল ম্যাক্‌মারকুইস, তার পর আসে লী-বেনেট, তার পর কে ছিল জানি না। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট আরো কয়েকটা স্টেশনের মধ্যে তাজপুর জংশন একটা।

বেয়ারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে—মজুমদার সা'ব—

ভাবলাম তারক মজুমদার হয়ত। ওয়ালটেয়ারে ছিল। হয়তো প্রোমোশন পেয়ে

এখানে এসেছে। আমাকে চেনে। একবার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করেছিলাম তার। আমার হাতে জীবন ফিরে পেয়েছে।

খসখস-দেওয়া ঘরে ঢুকে কিন্তু দেখলাম করুণাপতি মজুমদারকে—

বলাই বাহুল্য যে, অবাক্ হয়েছিলাম। সামনে অ্যাশ-ট্রে'তে চুরুটটা রেখে উঠলো করুণাপতি। উঠলো আমাকে অভ্যর্থনা করতে।

সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললে—শুনলাম তুমি এসেছিলে কোর্টে—শুনেই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু খবর পেলাম ওয়েটিং-রুমে আরো অনেক প্যাসেঞ্জার রয়েছে, সে যা হোক—আজকে থাকছো তো—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে—

তারপর আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে, চকচকে পালিশ করা পেতলের কলিং-বেল্টা বাজিয়ে দিলে করুণাপতি। বেয়ারা আসতেই হুকুম হয়ে গেল—ডাক্তারসা'ব কা সামান মেরা বাঙলোমে পৌঁছা দেও, ঔর পঁয়তালীকে মেরা পাশ ভেজ দেও—

পঁয়তালী এল। করুণাপতি বললে—ডাক্তার-সাহেব খাবেন আজকে—বেশ মুখোরোচক রাঁধো দিকি নি কিছু—

আমার অবশ্য অবাক্ হবারই কথা। টেবিলের সামনে টাই-স্যুট্ পরা করুণাপতি। বনাতের টেবিলের ওপর একটুকরো কাগজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিগ্রেটের টিন রয়েছে একটা, তার পাশে জ্বলন্ত চুরুট আধখানা। পুরোপুরি সাহেবী কায়দাকানুন। যেন ভিক্টোরিয়ান যুগের রোমান্টিক লেখকের লেখা কোনো উপন্যাসের গল্পের মতন। বিশ্বাস না-হবার গল্প।

দু চারজন মাড়োয়ারী মহাজন ওয়াগন-সাপ্লাই নিয়ে কথা বলতে ঢুকলো।

করুণাপতি তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে। তারপর বললে—চলো যাই—

করুণাপতির সঙ্গে বাইরে এলাম। তখনও দু চারজন পেছন পেছন আসছিল। করুণাপতি বললে—আজ হবে না—কাল সকালে সব এসো—ওয়াগন এসেছে সাত-আটখানা—

যেন ক্ষুণ্ণ মনে সবাই বিদায় নিলে।

এ-বাঙলোয় আগে সাহেবরা বাস করে গেছে। সাহেবদের জন্যেই তৈরী বাঙলোয় ঢুকতেই একজন এসে করুণাপতির হাতের টুপিটা আর গায়ের কোট খুলে নিলে। একটা গোল টেবিলের সামনে বসলাম দুজনে। বললাম —সাতটায় যে আমার ট্রেন, করুণাপতি—

—জানি—করুণাপতি বললে—কিন্তু এ-ও জানি যে তোমার আজ না-গেলেও চলবে—

তার পর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা সরবত এল। করুণাপতি বললে—রাত্রে তোমার জন্যে ভাত না রুটি, কী হবে ডাক্তার—

বড়মুণ্ডা স্টেশনের সেই ছোট রেলের খুপিটার কথাই আমার বার বার মনে পড়তে লাগলো। সাত ফুট বাই ছ'ফুট ঘর-দুটোর চেহারা এখানে বসে মনে পড়া যেন অন্যায়। কিন্তু ক'টি বছরই-বা কেটেছে! এরই মধ্যে কী এমন ঘটেছে যে এমন আমূল পরিবর্তন হতে হয়। যুদ্ধ অবশ্য বেধেছে—যুদ্ধে আমাদের পক্ষে হারও হচ্ছে বটে—জিনিসপত্রের দর বাড়ছে এই যা—বাঙলাদেশে একটা দুর্ভিক্ষও হয়ে গেছে—এ দূরদেশে সে খবরও পেয়েছি। কিন্তু তারা কোথায় সব? বাড়িটা যেন বড় নিস্তব্ধ মনে হলো। কোথায় বোঁচা-ক্ষেন্তির দল?

বললাম—ছেলেমেয়েদের কাউকে দেখছি নে যে—

—তারা তো কেউ এখানে থাকে না আর—তথাগত এবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে ল-তে—ভাবছি ওকে দেব সিবিল সার্ভিসে, আর রাতুল তো এবার ফাইন্যাল এম-বি দিয়েছে, এখনও রেজল্ট বেরোয়নি—আর সেজ ছেলে পল্লবকে দিয়েছি শিবপুরে···আর সবগুলো হোস্টেলে-বোর্ডিংএ থেকে পড়ছে—জানো তো এখানে থাকলে লেখাপড়া কিছু হবে না—তাই···

শুধু বললাম—ভালোই করেছ—কিন্তু···

করুণাপতি যেন বুঝতে পারলে আমার মনের কথাটা। বললে—তুমি ভাবছ ডাক্তার——এ-সব কেমন করে হলো—কেমন করে যে হলো—আমিও ঠিক তোমায় বোঝাতে পারবো না—সেই যে বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রী···খুন-ই তাকে করলাম বলতে পারো—সেই হলো আমার শুরু—সেই স্ত্রী মরার পর থেকেই আমার সময় ভালো হলো, ভাই—

তবু বুঝতে পারলাম না—

করুণাপতি বললে—আয়ার-সাহেব রিটায়ার করলে আর রস্ সাহেব হলো এস্টাবলিশ্মেন্টের কর্তা—আর তখন হাতে ছিল বউএর গয়নাগুলো। সেইগুলো সব বেচলাম—কয়েক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গেলাম হেড-অফিসে—নিতাইবাবুও এখন রিটায়ার করেছে—তখন সেই চেয়ারে প্রোমোশন পেয়েছে রতনবাবু। লোকটা বরাবর মাতাল জানতাম—সোজা একেবারে বাড়িতে নিয়ে গেলাম দুটি আসল মাল—বোতলের চেহারা দেখেই চোখদুটো চকচক করে উঠলো রতনবাবুর—

করুণাপতি থামলো।

বললাম—তার পর—

—তোমাকে বলেই বলছি—আর কাউকে তো এসব বলাও যায় না—তা ছাড়া যত সহজে বলছি, জিনিসটা তো অত সহজও নয় ভাই,—কিন্তু আমার যে তখন সঙিন অবস্থা, হয় এসপার নয়তো ওসপার—শেষে যে কী করে কী হলো—চাকা আমি গড়িয়ে দিলুম—আর সে-ও গড়িয়ে চললো—। নইলে সেই রতনবাবু, যে আগে দেখা হলে কথাই বলতো না—এক গ্লাসের বন্ধু হয়ে গেলাম—আর শুধু কি তাই—সেই বাঘের-বাচ্ছা রস্ সাহেব, যাকে দেখলেই ভয় হতো, শেষকালে সে-ও নেশার ঝোঁকে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে লাগলো—

করুণাপতি গল্প বলে আর থামে একটু।

কেমন করে করুণাপতি বড়মুণ্ডা থেকে বদ্‌লি হলো নবাবগঞ্জে, সেখানে দিন গেলে তিন-চারটে টাকা হতো—সেখান থেকে বদ্‌লি হলো ভাটাপাড়ায়—সেখানে দিন গেলে গড়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকা—তার পর যুদ্ধ শুরু হলো। সেখান থেকে বদ্‌লি নাইনপুরে, তার পর বিলাসপুরে, তার পর টাটানগরে—তার পর এই তাজপুরে। দিন গেলে এখানে তিনশো-চারশো টাকাও হয় কোনো-কোনো দিন। এক-একটা ওয়াগন-পিছু দু শো-তিন শো করে ঘুষ!

করুণাপতি বললে—গয়না বেচে সাত হাজার টাকা দিইছি বটে দুজনকে—সেটা ঘুষও বলতে পারো—কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ আসলে ভাগ্য—কই, কত লোকই তো এখন ঘুষ দেবার জন্যে তৈরি—কিন্তু ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া কি অতই সহজ হে—

করুণাপতি আবার বললে—এই ছাখোনা, আড়াই শো টাকা তো মোটে মাইনে পাই মাস গেলে, কিন্তু দশটা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার পেছনেই মাসে সাত শো টাকা পড়ে যায়—তার পর আজকালকার বাজারে হোস্টেল-বোর্ডিং-এর খরচটা ভাবো একবার—তা রস্ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—বছরে বড়দিনের সময় পচিশ হাজার টাকা মেমসাহেবের কাছে দিয়ে আসি—কখনও আমায় বদ্‌লি করবে না এখান থেকে—আর দেবার মধ্যে আর একটা জিনিস দিতে হয়েছে—জেনারেল ম্যানেজারকে একখানা নতুন ক্যাডিলাক্—কাজটা একেবারে পাকা করে নিয়েছি, ভাই—

বাইরে অন্ধকার হয়ে এল। সামনের বাগানটায় অনেক ফুলের বাহার।

কথাবার্তার মধ্যেও কয়েকজন মহাজন দেখা করে গেল। সকলের একই বক্তব্য। ওয়াগন। যে কোনও প্রকারে ওয়াগন চাই। করুণাপতির বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা বসে মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি মানুষের একটিমাত্র পরমার্থ কাম্য—তা হচ্ছে 'ওয়াগন'। ওয়াগনের যে এত চাহিদা, এত বাজারদর—তা কে জানতো। এক

একটা ওয়াগনের জন্যে দু শো-তিন শো টাকা অগ্রিম দিয়ে যায়। রেলের পাওনা যা, তা পরে হবে—আগে তো গেট্-ফি দাও, পরে দর্শন।

সন্ধ্যেবেলা করুণাপতি বললে—যেজন্যে তোমায় ডাকা—সেইটে এবার বলি—

করুণাপতি কেমন গলাটা নামিয়ে আনলো।

—বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রীর বেলায় একবার সেই ভুল করেছিলাম—খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ওষুধ খাইয়ে বউটাকে তো মেরেই ফেললাম—কিন্তু এবার আর ওই রিস্ক্ নেব না—তোমার সঙ্গে দেখা না-হলে তোমাকে আমি খবর পাঠাতাম—

অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি কি আবার বিয়ে করেছ নাকি—

—না, বিয়ে নয়, কিন্তু তবু ও-ঝঞ্ঝাটে দরকার কী?

আমি কিছু বলবার আগেই করুণাপতি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিয়েছে।

চকবাজারের কাছে এসে একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামলো। নেমেই করুণাপতি বললে—এসো ডাক্তার—চলে এসো—

মাথা নীচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। কিন্তু ওপরে উঠে ভারি ভালো লাগলো। করুণাপতিকে দেখে ঝি-চাকর ছুটে এসেছে। করুণাপতি গিয়ে একেবারে খাটে বসে নির্মলাকে খবর দিতে বললে। সাদা ধবধবে উজ্জ্বল আলো। খানিক পরে নির্মলা এল।

করুণাপতি বললে—ডাক্তার, এর-ই। এরই কথা বলছিলাম—

এই সুদূর দেশে বাঙালী মেয়েকে কোথা থেকে সংগ্রহ করলে করুণাপতি!

করুণাপতি বললে—এমন ওষুধ দেবে ডাক্তার, যাতে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হয়—কী বলো, নির্মলা—আজ তিনমাস মাত্র হয়েছে—বেশী ভয়ের ব্যাপার নয়—এ-তোমার পাঁচ-ছ মাস নয় যে…

নির্মলা আমার দিকে একবার ভয়ে-ভয়ে তাকাল। তার পাণ্ডুর চোখের দিকে চেয়ে আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। চোখের সামনে নিজের ভাবী হত্যাকারীকে দেখলে কেমন ভাব হয় মনে, বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হলো—চাউনিটা যেন অনেকটা সেই রকম—

করুণাপতি বললে—তাজপুর বড় শহর—যা-কিছু ওষুধপত্তর লাগবে, এখানে তোমায় আমি সব যোগাড় করে দিতে পারবো—তার জন্যে কিছু ভেবো না—তবে

দেখো ভাই, আমার ওই একটা অনুরোধ—এমন ওষুধ দেবে যাতে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি না হয়—কী বলো, নির্মলা—

নির্মলাকে সাক্ষী মানা হচ্ছে, কিন্তু নির্মলা যেন কাঠের পুতুলের মতো মুখ নীচু করে চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসে রইল। সুডোল ফরসা দু'টো পা যেন থরথর করে কাঁপছে মনে হলো।

—তা হলে ওই কথাই রইল—কাল ওষুধপত্তর যোগাড় করে একেবারে নির্মলাকে দেখে যাবে—কী বলো—করুণাপতি আবার বললে।

অনেকদিন আগেকার কথা। তবু স্পষ্ট সব মনে আছে। সেদিন আর ফিরে যাওয়া হয় নি, পরদিন রাত্রের ট্রেনে গিয়েছিলাম। করুণাপতির হাজার অনুরোধও আমাকে টলাতে পারে নি। যা হোক, পরদিন সকালে করুণাপতি যেতে পারে নি চকবাজারের বাড়িতে। ওষুধপত্র নিয়ে আমি একলাই গিয়েছিলাম। ওর বুঝি হঠাৎ কাজ পড়ে গেল একটা।

নির্মলার সেদিনকার কথাগুলো যেন এখনও আমার কানে বাজছে—

নির্মলা অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলেছিল—আপনাদের দুজনে খুব বন্ধুত্ব বলে মনে হলো—কিন্তু আপনার বন্ধুকে একটা উপদেশ দিতে পারবেন?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কী? কী উপদেশ—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল নির্মলা। আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয় নি—।

তবু বার বার প্রশ্ন করার পর শুধু বলেছিল—না থাক্, উনি বড়লোক, কথাটা ওঁর কানে গেলে ক্ষতি-ই হবে আমার, মিছিমিছি মাঝখান থেকে হয়তো রেগে গিয়ে মাসোহারা বন্ধ করে দেবেন। দেশে আমার মা উপোস করবে, বাবার চিকিৎসা হবে না, ভাই-বোনদের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যাবে—তার চেয়ে আপনি যা করতে এসেছেন তাই করুন—

নির্মলার চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম—তবে কি এতে তোমার অনিচ্ছে আছে?

নির্মলা বলেছিল—আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন কেন তুলছেন—আমার তো স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে নেই—আমার কাছে আমার বাবার চিকিৎসা, মার সংসার-খরচ, ভাইবোনদের মানুষ হওয়ার প্রশ্নটাই বড়—যাক্, কী করতে হবে আমায় বলুন—

দুপুরবেলা ফিরে এসে করুণাপতিকে বলেছিলাম—হলো না করুণাপতি—

করুণাপতি অবাক্ হয়ে গেল। —কেন?

—তিনমাস বাজে কথা—দেখে বুঝলাম ছমাস—এখন কোনও রকম রিস্ক্ নেওয়া উচিত নয়। জীবনহানি হতে পারে—

—তা হলে কী হবে?—করুণাপতি যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো।

—একটা উপায় আছে।

করুণাপতি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

—একটা উপায়। নির্মলা মেয়েটি তো ভালো মেয়ে বলেই মনে হলো, আর তোমারও তো ঘরে স্ত্রী নেই—বিয়ে করো-না কেন ওকে—

হো-হো করে সাড়ম্বরে হেসে উঠেছিল করুণাপতি। বিয়ে? পাগল নাকি! এতগুলো ছেলের বাবা হয়ে! হো-হো করে করুণাপতি সেদিন হেসে উঠেছিল।

সেই রাত্রের ট্রেনেই আমি তাজপুর ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

তার পর করুণাপতির সঙ্গে আর দেখা হয় নি। চাকরি থেকে রিটায়ার করে করুণাপতি কলকাতায় বাড়ি করেছিল। দেখা কচিৎ হতো। একবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, তার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে একজন সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী হেড মিস্ট্রেস চাই। তেমন হেড-মিস্ট্রেস পেয়েছিল কিনা, সে খবর পাই নি। তবে শুনেছিলাম ছেলেমেয়েরা কৃতী হয়েছে।

রাস্তায় ঘটনাচক্রে একদিন দেখা হয়েছিল করুণাপতির সঙ্গে। বললে—ভালো হেড-মিস্ট্রেস পাচ্ছি না, ভাই—তোমার সন্ধানে আছে কেউ?

তার পর বলেছিল—গোটা-পঞ্চাশেক ফ্যান কিনবো, মোটা কমিশন দেবে এমন কোন পার্টি আছে—আর গোটা-ছয়েক সেলাইএর কল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—রিটায়ার্ড-লাইফ কেমন লাগছে তোমার, করুণাপতি?

করুণাপতি বললে—রিটায়ার আর করলাম কোথায়, ভাই—এখন ওই ইস্কুল চালাচ্ছি—তা মাস গেলে ফেলে-ছড়িয়ে শ'-পাঁচ-ছয় থাকে—আর অনারেবল্ প্রফেসন তো বটে—

সেই শেষ দেখা। তার পর বোঁচা কবে 'তথাগত' হলো, ক্ষেন্তি কবে 'তপতী' হলো—সে খবর কানে আসে নি।

বহুদিন পরে এবার কলকাতায় আসতে 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ে' করুণাপতির জন্মবার্ষিকী উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়ে গেল।

সভায় ডায়াস-এর ওপর বসে ভাবছিলাম পুরানো সব কথা। তথাগতর পাশে

ওর ছোট-ভাই পরাশর—অনেকটা যেন নির্মলার মতোই মুখের আদলটা। তবে শেষ পর্যন্ত নির্মলাকে কি বিয়ে করছিল করুণাপতি? কিংবা……কিংবা……কিন্তু সে কথাটা কল্পনা করতেও লজ্জা হলো।

তা হোক—করুণাপতি আসলে যাই হোক, পৃথিবী হয়তো তাকে মহাপুরুষ বলেই একদিন জানবে। আমি নগণ্য ডাক্তার—আমি চিরকাল বাঁচবো না। করুণাপতির কলঙ্কময় অতীতের সব সাক্ষ্য যখন একেবারে মুছে যাবে—তখন আমিই-বা কোথায়? কলকাতার কোনো বড় রাস্তা হয়তো করুণাপতির নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। ভেজাল ঘি-তেল খাইয়ে যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের কত মর্মরমূর্তি কলকাতায় রাস্তায় পার্কে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা। তবে, মাঝখান থেকে আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকি? আগামী-কালের স্কুলের ছাত্ররা হয়তো পাঠ্যপুস্তকের পাতায় করুণাপতির জীবনী পড়ে নতুন আদর্শ গ্রহণ করবে—তাতে আমি বাধা দেবার কে?··

কী জানি কী-যে হলো, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও বললাম: 'করুণাপতিকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতাম, করুণাপতি ছিলেন সত্যকার করুণা-পতি—সদাশয়, মহৎ, মহৎপ্রাণ পুরুষ। অতি ছোট অবস্থা থেকে কেবলমাত্র পুরুষকার, আত্মবিশ্বাস ও কর্মনিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে তিনি বড় হয়েছিলেন—তাঁর জীবনে অসত্যের বা মিথ্যার কোনও স্থান ছিল না। তাঁর জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সত্যের জয় একদিন অনিবার্য—সত্যনিষ্ঠ মানুষ একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই। বহুদিন আগে বহুবার করে বহু মহাপুরুষ ওই এক-ই কথা বলে গেছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, গান্ধী—তাঁরা যা বলে গেছেন, করুণাপতি নিজের জীবন দিয়ে তাই-ই কাজে পরিণত করে গেছেন—করুণাপতি বার বার বলতেন, 'ফাঁকি দিয়ে কিছু লাভ হয় না'—মহাপুরুষের এই বাণী-ই করুণাপতিকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখবে…"

রাণীসাহেবা

মানুষের সংসারে কত চরিত্রই যে দেখলাম। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছি। পৃথিবীতে সব মানুষ সব কিছু পায় না, সেজন্যে আমার অভাববোধ হয়ত আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। আমি গোয়া-বাগানের মেসে সুধা সেনকে দেখেছি, বিলাসপুরের বাণীবিত্যায়তনে প্রমীলা সরকারকে দেখেছি, দেখেছি রাণী দে, রুনু রায়, লিলি পালিতকে। দেখেছি মিসেস সুজাতা স্বামীনাথন্‌কে জব্বলপুরের শিয়ালকোট লজ-এ। আরো দেখেছি 'নীলনেশা'র রায়-সাহেবকে, প্রফেসরপত্নী কণিকা দেবীকে। আর, আরো দেখেছি সব্‌জিবাগানের সুরুচি আর সদানন্দবাবুকে। ওদের সকলকে নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখেছি—কিন্তু আরো কতজনকে নিয়ে যে আমার আজো লেখা হয়নি তাও তো বলে শেষ করা যায় না।

এই যেমন আজকের রাণীসাহেবা।

রাণীসাহেবাকে আজ এতদিন পরে আবার বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে দেখতে এলাম। দীর্ঘ পঁচিশ-তিরিশ বছরের সম্পর্ক। মনে হলো, ভবিষ্যতে যদি কাউকে নিয়ে গল্প লিখি তো সে এই রাণীসাহেবাকে নিয়েই লেখা উচিত।

সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে আমরা এসেছি। লাহেড়িয়া সরাইতে নেমে মোটরে তিরিশ মাইলের রাস্তা। মৃণালিনীর বিয়ে—রাণীসাহেবার একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী।

অনেকদিন পরে যখন হবেনা-হবেনা করে প্রথম সন্তান হলো, গোকুল জিজ্ঞেস করেছিল—কী নাম রাখা যায় রে মেয়ের?

তখন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। নাম দিয়েছিলাম—শকুন্তলা।

কিন্তু সে-নাম টেঁকেনি। শেষ পর্যন্ত মা'র ইচ্ছের কাছে বাবার ইচ্ছের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই নামের ব্যাপারেই শুধু নয়। গোকুল যখন নামে-প্রতিভায় প্রতিষ্ঠায় বড় হলো, রায়সাহেব হলো, তখনও কঠোর হাতে পেছন থেকে যে-মানুষটি শাসন করতো সে মৃণালিনীর বাবা নয়, তার মা—আজকের এই রাণীসাহেবা। কত সম্বর্ধনা-সভায় উঠে বক্তৃতায় বলেছে গোকুল—আমার উন্নতির মূলে রয়েছে, আমার স্ত্রী—তিনি আমায় দিয়েছেন তাঁর একনিষ্ঠ ভালবাসা, তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন, তাঁর ঐকান্তিকতা—

সত্যিই বিয়ের আগে কী ছিল গোকুল আর পরে কী-ই না হয়েছিল। এ তো যুদ্ধের হিড়িকে ফুলে-ফেঁপে বড়লোক হওয়া নয়, ধাপে ধাপে কেবল উঠেছে গোকুল, শুধু আরো বড় ধাপে ওঠবার জন্যেই। চেম্বার অব কমার্স, এম. এল. এ. সেনেট-সভা, স্বদেশ-বিদেশ সমস্ত জুড়ে মরবার শেষ দিনটি পর্যন্ত কেবল সাফল্য আর সাফল্য। যাতে হাত দিয়েছে, তাতেই লাভ। সমস্তর মূলে নাকি গোকুলের স্ত্রী। ওর স্ত্রীর ভালবাসা।

আমি শুনতাম। কিন্তু ভেবে পেতাম না, শুনে হাসবো না কাঁদবো!

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক।

কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রাণী-সাহেবার মেয়ের বিয়েতে এসে যদি সেদিনকার সব কথা, সব ইতিহাস মনে পড়ে যায়, তো মনকে দোষ দিই কী করে।

বিরাট বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়, প্রাসাদই বটে। শুনলাম, সাতানব্বই বিঘের ওপর বাড়িখানা। বিয়ে কাল, কিন্তু সকাল থেকে যে-ব্যাপার চলেছে তাতে কে বলবে দেখে যে, বিয়ে আজকে নয়। আমরা যাঁরা অতিথি তাঁদের আদর আপ্যায়নের আয়োজন চূড়ান্ত। দশখানা গ্রামের হাজার হাজার প্রজা সকাল থেকে পাতা পেড়েছে। লাড্ডু, পেড়া, গুলজামুন, বালুসাই, পুরি, বরফির ছড়াছড়ি চারিদিকে। মুনশীজী এক-একবার এসে খবর নিয়ে যায় সকলের কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না।

পরের দিন কখন বর এল, কখন বিয়ে হলো, ভিড়ের মধ্যে কিছু দেখাই গেল না। তবু দেখবার চেষ্টা করেছিলাম বৈ কি। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের এক-মাত্র উত্তরাধিকারিণী যে, তার স্বামীকে দেখবার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বিয়ের পরদিন মুনশীজীকে বললাম—একবার রাণীসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে পারা যায় না?

মুনশী হয়ত প্রথমে অবাক হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা করবে বলে শেষ পর্যন্ত অন্দর মহলে খবর পাঠালে। খবর যেতে-আসতে তাও প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। সত্যিই তো বিয়ে-বাড়ি—সবাই ব্যস্ত। এখন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে কারই-বা অবসর হবে। কিন্তু তা নয়। মুনশীজী বললে—না হুজুর, রাণীসাহেবার কড়া হুকুম আছে, পুরুষ মানুষ কেউ যেন অন্দরমহলে না ঢোকে।

মুনশীজীর কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি, তা পরেই টের পেলাম। সদর আর অন্দরের মাঝামাঝি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালো। দক্ষিণদিকে একটি মাত্র

দরজা। দরজার ওপাশেই অন্দরের সীমানা। দরজায় পর্দা খাটানো। ঘোমটা দিয়ে একজন ঝি এসে দাঁড়ালো দু'ঘরের মাঝখানে।

মুনশীজী আমায় ইঙ্গিত করলে—রাণীসাহেবা এসেছেন—যা বলবার শীগ্‌গির বলে দিন—বড় ব্যস্ত উনি।

এমন অবস্থার জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। এমন দিনও গেছে, যেদিন রাণী-সাহেবার সামনাসামনি বসে কথা বলেছি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে বাঙলা দেশ ছেড়ে এসে বেহারের এই জমিদারীতে বসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিগত স্বামীর বৃদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে এই সঙ্কোচ, এই আয়োজন, এ আমার পছন্দ হলো না। এমন জানলে আমিই কি এমন প্রস্তাব করতাম! নিজেকে যেন অপমানিত মনে করলাম। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের বিধবা স্ত্রীর অগাধ সম্পত্তি থাকতে পারে—কিন্তু আমরা দুজনে এক সময় তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম। সে-বন্ধুত্বের দাবীও কি কিছুই নয়!

মৃণালিনীর বিয়েতে দেবার জন্য কলকাতা থেকে একটা শাড়ি এনেছিলাম। সেখানা মুনশীজীর হাতে দিয়ে বললাম—না আমার কিছু কথা বলবার নেই—এইটে রাণীসাহেবাকে দিয়ে দিও।

বলে আর কালক্ষেপ না করে সোজা বাইরে চলে এলাম। তখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে একটা টাঙ্গা ডাকিয়ে নিয়ে স্টেশনে রওনা দিলাম। আজ অবশ্য গোকুল বেঁচে থাকলে এমন ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে এখানে কিসের টানে এত দূরদেশে এসেছিলাম, তাই ভেবেই নিজের মনকে ধিক্কার দিলাম। কে রাণীসাহেবা! কোথাকার রাণী! আমার কে তারা? মনে পড়তে লাগলো গোকুলের কথাগুলো। অর্থের অভাব গোকুলের কখনও অবশ্য হয়নি। বিয়ের পর থেকেই বৃহস্পতি তুঙ্গী হয়েছিল ওর জীবনে। ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায় বন্ধুদের মধ্যে আর কে অমন সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু অমন হতভাগ্যও আমি জীবনে তো কম দেখেছি!

কোন মহিলা-সভার সম্পাদিকা একবার চাঁদার খাতা নিয়ে এসেছিলেন গোকুলের বাড়িতে। ধনবান গোকুলের কৃপাপ্রার্থী তাঁরা। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে গোকুল কথা বলছিল, এমন সময় ভেতরের পর্দা ঠেলে এই রাণীসাহেবা বেরিয়ে এসেছিলেন!

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—বের করে দাও এঁকে, এখনি বের করে দাও—গোকুল যতখানি স্তম্ভিত, তার চেয়ে বেশি স্তম্ভিত মহিলা-সভার সম্পাদিকা।

রাণীসাহেবা বলেছিলেন—তুমি যদি বের করে না দাও, আমারও বের করে দেবার অধিকার আছে—দারোয়ান—দারোয়ান—

চীৎকার করে দারোয়ানকে ডাকতে লাগলেন রাণীসাহেবা। ঘরের মধ্যে আরো-দু'জন ভদ্রলোক, একজন টাইপিস্ট, আশেপাশে চাকর, দারোয়ান, ঝি, ঠাকুর। কারোর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কলকাতার ধনীসমাজে তখন সবেমাত্র প্রভাব প্রতিপত্তি শুরু হয়েছে গোকুলের। বৌবাজারের ছোট দোতলা বাড়িটা ছেড়ে লেক রোডের চারতলা বাড়িটা সবে তুলেছে। হাওড়ায় দু'দুটো জুট মিল চলছে আবার সেই সঙ্গে গিরিডির একটা অভ্রখনিও কিনেছে। ওদিকে কাউনসিলের ইলেক্‌শনে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে—অবস্থাটা এই রকম। মোটকথা সেদিনকার সেই ঘটনাটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপমানজনক। কোনও সূত্রে প্রকাশ্যে বাইরের ঘরে তাঁর আসবার কথাও নয়।

দারোয়ান এখনি এসে যাবে! কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রীর আচরণে হতবাকও বটে, ক্ষুব্ধও বটে। গোকুল উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কাকে সে নিবারণ করবে! স্ত্রীর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আর যারই থাক গোকুলের নেই।

সম্পাদিকা পর্দানশীনা নন। দশ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা আছে। ব্যাপারটা বুঝলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা, আমি এখন উঠি তা হলে স্যার। একদিন সময়মত অফিসে দেখা করব বরং—

বাঘের মতন লাফিয়ে উঠলেন স্ত্রী।

—তা তো করবেনই—কিন্তু খবরদার বলছি, ও হাসি আমি চিনি—হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে এলোখোঁপা দুলিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে তা-ও জানি—আরো ভালো লাগে যদি সে-মানুষটি দেখতে ভালো হয়, লক্ষ টাকার মালিক হয়। চাঁদা চাইবার নাম করে···ছি ছি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি যে···

—আঃ, কী হচ্ছে মিণ্টু—ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে গোকুল।

—তুমি থামো দিকি। আমি না থাকলে কবে তুমি এদের পাল্লায় পড়ে মারা যেতে। ছি ছি তোমাকে আমি দোষ দিই না—কিন্তু সংসারে এমন সরল হলে কি করে চলবে?

মহিলাটি তখন এক ফাঁকে সরে পড়েছেন।

কিন্তু পরদিন থেকে ব্যবস্থা হলো অন্যরকম। গোকুলের ড্রাইভারের পাশে দিবারাত্র আর একজনকে দেখা যেতে লাগলো।

গোকুল মোটরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলে—তোর পাশে ও-কে রে যজ্ঞেশ্বর !

যজ্ঞেশ্বর পুরোনো ড্রাইভার। বললে—আজ্ঞে সৌরভীর বড় ভাই।

মোটরে ওঠবার সময়ে গোকুলকে নমস্কার করেছিল একবার। মনে পড়লো এখন। লোকটা আর একবার পেছন ফিরে নমস্কার করলে। বললে—আমার নাম হরিশ স্যার, সৌরভী আমার ছোট বোন হয়।

স্ত্রীর ডান হাত সৌরভী। সেই সৌরভীর বড় ভাই।

অফিসে ঢুকে বসেছে গোকুল। কাজ করছে। মাঝে মাঝে অকারণে হরিশ ঘরের ভেতর উঁকি মারে।

—কিছু দরকার আছে ?

উত্তর দেয় না হরিশ। টুপ্ করে মাথাটা সরিয়ে নেয়। এক-একদিন ইচ্ছে হয় অফিস থেকে বেরিয়ে একবার সিনেমায় যায়। কিন্তু স্ত্রীর কড়া বারণ আছে ওতে। সিনেমা মানেই তো ওই। দেয়ালে প্ল্যাকার্ডগুলো দেখ না। বাইরে যার ওই, ভেতরে যা আছে তা কল্পনা করেই নাও। আগে না বলে-কয়ে কয়েকদিন ঢুকেছে ভেতরে। মাথাটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় বেশ। কিন্তু হরিশ আসার পর থেকে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় গোকুলের।

স্ত্রী বলেন—কেন, গাড়িতে হরিশ থাকা তো ভালো, রাস্তায়-ঘাটে কতরকম বিপদ-আপদ আছে, দেশে ধর্মঘট তো রোজ লেগেই রয়েছে—আর তা ছাড়া তোমার সুবিধের জন্যেই তো রাখা।

যত কাজই থাক রাত আটটার পর গোকুলের আর বাইরে থাকবার হুকুম নেই। একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকতে হবে। সে-নিয়ম যেমন কঠোর তেমনি অমোঘ।

স্ত্রী বলছেন—রাত্তির বেলায় যারা ব্যবসা চালায় তাদের বলে বেশ্যা। অমন পয়সায় দরকার নেই আমার। একবেলা খাবো, ভিক্ষে করে পেট চালাবো' তাও ভালো—তবু—

গোকুল আমাদের বলেছে—না ভাই, ও-সব জিনিস তর্ক করবার নয়—ও যা চায় না, তেমন কাজ না-ই বা করলাম।

স্ত্রীর মতেই চলেছে গোকুল সারাজীবন, স্ত্রীর পরামর্শ মতই কাজ করেছে। একটা পয়সা কাউকে চাঁদা বা ধার দিতে গেলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তবে দিয়েছে। বাড়িতে এসে সারাদিন কোথায়-কোথায় গিয়েছে, কার-কার সঙ্গে দেখা করেছে বা দেখা হয়েছে, সমস্ত সবিস্তারে বলেছে স্ত্রীকে। টাকা, পয়সা, আধলা, পাইটি পর্যন্ত স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছে।

একবার খুব অসহ্য হওয়াতে ডাক্তার সেনগুপ্তের কাছে ও গিয়েছিল।

গোকুল সমস্ত খুলেই বলেছিল—দেখুন, আমার স্ত্রী আমাকে বড় সন্দেহ করেন। সন্দেহ মানে তিনি মনে করেন আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্বসংসারের সমস্ত নারী জাতি বুঝি উন্মুখ হয়ে আছে—আমার মত সুপুরুষ কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই—এ-রোগের কি চিকিৎসা—

—ছেলেপুলে হয়েছে আপনার? ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—না।

—ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে—কিছু ভাববেন না। যাতে ছেলে হয় বরং সেই চিকিৎসা করান।

সে-চিকিৎসা করাতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ কয়েক বছর পরেই মেয়ে হলো গোকুলের।

মেয়ে হবার পর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন কেমন চলছে গোকুল, ব্যাধি কমেছে?

—না ভাই, বরং আরো বেড়েছে—গোকুল ম্রিয়মান হয়ে জবাব দিলে।

—সে কি?

আমার কিন্তু বরাবর মনে হতো গোকুল হয়ত ঠিক সত্যি কথা বলে না। কোথায় যেন একটা গর্ববোধ আছে মনের ভেতরে। অন্যের স্ত্রীরা যেন ওর স্ত্রীর তুলনায় কম সতীসাধ্বী! কম পতিপ্রাণা! ওর মনে হতো ওর উন্নতির মূলে আছে ওর স্ত্রীর একনিষ্ঠতা। বুঝি ওর স্ত্রীর কল্যাণেই ওর সমস্তিপুরের একটা সুগার মিল, হাওড়ার দুটো জুট মিল, ওর রায়সাহেব উপাধি, ওর কলকাতার সাতখানা বাড়ি, লাহেড়িয়াসরাই-এ ওর জমিদারী—সব!

যা হোক, সেই গোকুল মিত্তির—লেট রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের মেয়ে মৃণালিনীর বিয়ের নিমন্ত্রণে 'না' বলতে পারিনি। পুরনো বন্ধুত্বের টানে পাঁচশো মাইল দূর থেকে এই বয়সে এই পল্লীগ্রামে এসেছি। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মধ্যে চুপচাপ বসে-বসে মনে হলো আমি না এলেই বা কে কী মনে করতো! কার কী এমন ক্ষতি হতো!

এখনো ট্রেন আসতে দু'ঘণ্টা দেরি।

হঠাৎ মুনশীজী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলো!

বললে—রাণীসাহেবা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে—আপনি চলে যাবেন না। এই চিঠিটা রাণীসাহেবা পাঠিয়েছেন আমার হাতে।

মনে হলো বলি—রাণীসাহেবা তোমাদের রাণীসাহেবা, আমার কে? কিন্তু নিজেকে শান্ত করে চিঠিটা পড়লাম। অনেক অনুনয় করে লিখেছেন—'আপনি এমন রাগ করে চলে গেলে মিনুর অকল্যাণ হবে। বর কনে চলে যায়নি এখনও। অতিথি দেবতার সমান। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু কথা ছিল—বর কনে চলে যাবার পর বলবো ইচ্ছে ছিল। এ-সুযোগ হয়ত আর পাবো না, দয়া করে ফিরে আসবেন, আমার মান রাখবেন—'

রাণীসাহেবার মোটরে করে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই আবার ফিরে আসতে হলো।

বিদায়ের সময় ভালো করে বরকে দেখলাম। শুনলাম মতিহারীর লোক। ওখানেই ওদের জমিদারী। রাণীসাহেবার চেয়েও বড় জমিদার ওরা। ছেলের বয়েস যেন মৃণালিনীর চেয়ে কমই মনে হলো। বেহারে তিন-চার পুরুষের বাস। এখানে থাকতে থাকতে চেহারায় পুরোপুরি বেহারী হয়ে গেছে। পাশে মৃণালিনীর বিরাট ঘোমটা, তা-ও যেন কেমন অবাক লাগলো। 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন' থেকে আই. এ. পাস করেনি বটে কিন্তু কিছুদিন তো সেকেণ্ড ইয়ারে ক্লাশ করেছিল। সেই মেয়ে যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সে-ই বা অমন অতখানি ঘোমটা কেমন করে দিতে পারলো!

বর কনে চলে গেল। বিয়ের উৎসব কিন্তু তখনও এতটুকু কমেনি। গ্রামের হাজার-হাজার লোক নাকি ক'দিন ধরে এমনি খাওয়া-দাওয়া করবে। রাণীসাহেবার একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তার হয়ত এই শেষ উৎসব।

সন্ধ্যাবেলা রাণীসাহেবা লিখে পাঠালেন—আজ রাত্রিটা আমায় ক্ষমা করবেন—আমার মন বড় খারাপ, কাল দিনের বেলার ট্রেনে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব এবং যদি সকালে আপনার অসুবিধে না হয়, সেই সময়ে সাক্ষাৎ হবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক পুরনো কথা মনে আসতে লাগলো।

পুরনো বলে পুরনো!

সে প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা। শুধু ঘটনা বললে ভুল বলা হবে! আমার জীবনে সে এক দুর্ঘটনাই বটে। আর রাণীসাহেবা! কিন্তু তখন তো তিনি রাণীসাহেবা হননি—তখন তিনি জামসেদপুরের আরতি রায়। সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী।

গোকুল মিত্তিরের বিয়ের খবরটাও বন্ধুমহলে সেই সময়ে হঠাৎ শোনা গেল।

বরযাত্রীরা কলকাতা থেকে দল বেঁধে বরের সঙ্গে যাবে টাটানগর। আর আমি? আমি তখন কাকার বারো নম্বর সি-রোডের কোয়ার্টারে সামনের ঘরটায় ছুটি কাটাতে

গেছি। হঠাৎ গোকুলের চিঠি পেলাম—তোর সামনের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছি—তৈরী থাকিস্, সদলবলে পরশু বিকেলবেলা হাজির হবো।

তখন নজরে পড়লো, সত্যি সত্যি সামনের ষোল নম্বরের বাগানে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে বটে! সামনের বাড়িতে যেন উৎসবের ছোঁয়াচ লেগেছে এরি মধ্যে। সামনে ছু' তিনটে মোটর, লোকজন।

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেদিনই একলা একলা অনেক রাত পর্যন্ত একখানা বই নিয়ে পড়ছিলাম। কাকা কাকীমা সবাই ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অত্যন্ত মৃত্বস্বরে দরজায় একটা টোকা পড়লো। তারপর আর একবার। উঠে ব্যাপারটা ভালো করে গায়ে দিয়ে দরজাটা খুলে পর্দাটা সরাতেই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছি!

সেই শীতের ঠাণ্ডা রাত—চারিদিকে অন্ধকার—মনে হলো মানুষ নয় যেন পরী। বাইরের কুয়াশা যেন পরী হয়ে ঘরের মধ্যে আগুন পোয়াতে এসেছে।

মেয়েটির কত বয়েস হবে? আঠারো-উনিশ। আমার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে কী অঝোরে কান্না। এমন ঘটনায় বিভ্রান্ত না হয়ে কি উপায় আছে?

বললাম—কে আপনি, কী চান?

ছু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকবার প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্নে কান্না তার আরো করুণ হয়ে উঠলো। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কী চায়, কেন এসেছে সে এত রাত্রে।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। সব কথা মনে নেই আজ।

তবু কাঁদতে কাঁদতে সে-রাত্রে মেয়েটি যা বলেছিল তা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি কৌতুকপ্রদ। তেরো নম্বর সি-রোডের বাড়িতে যে ছেলেটি থাকে, তাকে আমায় তখুনি ডেকে দিতে হবে। তার নাম নাকি বিকাশ। বাড়ির সামনে যে-ঘর, তার পুব দিকের জানালায় গিয়ে ডাকলেই সে আসবে। তার সঙ্গে সেই রাত্রে দেখা হওয়া মেয়েটির নাকি বিশেষ দরকার।

মেয়েটি বললে—আমি গেলে কেউ দেখতে পাবে। আপনি দয়া করে একবার বিকাশকে ডেকে আনুন। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আরতি তাকে ডাকছে—আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি।

আরতি বসলো আমারই বিছানায়।

আর আমি তার নির্দেশমত অগত্যা সেই শীতের মধ্যে ডাকতে গেলাম তেরো নম্বরের অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশকে। সেদিন ভারি রহস্যময় মনে হয়েছিল এই ঘটনা।

বিকাশ যখন এল, আরতির চোখে সে কী ব্যাকুল ভয়ার্ত আবেদন। বিকাশকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার কী কর্তব্য ভাবছিলাম, মেয়েটি বললে—আপনি দয়া করে বাইরে একটু বসুন, একটু কষ্ট দেব আপনাকে।

আমার ঘরের বিছানায় ওদের তু'জনকে বসিয়ে আমি নির্বোধের মত বাইরে চলে এসে বারান্দায় বেতের চেয়ারটায় বসলাম।

তারপর সেই শীতার্ত রাত কেমন করে কাটলো তা আজ আমার মনে থাকবার কথা নয়। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, সমস্ত রাত ওদের ঘরের আলো জ্বলছে আর আমি না-ঘুম না-জাগরণে সেই বেতের চেয়ারে বসে পলে-পলে শীতে জমে বরফ হয়ে গেছি। তারপর কখন কাকার ওয়ালক্লকটায় বারোটা বেজেছে, একটা বেজেছে, তুটো বেজেছে, তিনটেও বেজেছে—সব টের পেয়েছি। ঘরের ভেতরের টুকরো টুকরো কথা, কান্নার আভাস বাইরে ভেসে এসেছে। পাশের চেরি গাছটার পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে শিশির ঝরে পড়েছে সারা রাত। আমার গায়ে শুধু একটা পুলওভার। জামশেদপুরের সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা শীতকে সে-পুলওভার কতটা আর আটকাতে পারে।

ভোর হবার আগে ওরা যখন বেরিয়ে যায়, আমার সঙ্গে কোন কথা বলা বা আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেনি। মনে আছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার প্রায় বেলা নটা বেজে গিয়েছিল।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হওয়ার বুঝি তখনও আমার অনেক বাকি ছিল। বরযাত্রীর দলবল নিয়ে গোকুল এল বিয়ের দিন সকালে। কিন্তু বিয়ের আসরে বউ দেখতে গিয়ে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল!

আরতি রায়! সেই রাত্রে আমার ঘরে আসা সেই মেয়েটি!

গোকুল বোধ হয় বউ দেখে খুশীই হয়েছিল। বরযাত্রীর দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু নিজের বিবেকের সঙ্গে যে-বিরোধ সমস্ত মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল—তা কেমন করে চেপে রেখেছি সারাজীবন, তা আমার অন্তরাত্মাই জানে।

বৌভাতের দিন বন্ধুরা এক একটা উপহার তুলে দিয়েছে নববধূর হাতে। কারোর দিকে মুখ তুলে চায়নি নববধূ। আমি কিন্তু আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম সেদিন সেই সুযোগে। মনে হলো ধুতির নরুন পাড়ের মত সাদা মুখে একটা বিষাদ, পাউডার আর স্নোর প্রান্তে আলতোভাবে ঝুলছে। সেই বিষাদটুকুই নববধূর সমস্ত অবয়বে একটা অভিনব মাধুর্য এনে দিয়েছে যেন, সেদিন মনে হয়েছিল—আমিই কি ভুল করেছি না ও শুধু আমার নিজস্ব একটা ভাষ্য—যার পেছনে যে-যুক্তি আছে তাও

বুঝি আমার মনগড়া। অনেকবার মনের গোপন সংবাদটা বিশ্বস্ত বন্ধুদের বলি-বলি করেও বলা হয়নি। গোকুলকে বলা তো দূরের কথা।

পরে অনেক দিন গোকুল বলেছে—ভারি ইনটেলিজেণ্ট, জানলি—কিন্তু তোর ওপর খুব রাগ। কেন বলতো ?

বলতাম—ব্যাচিলরদের ওপর বন্ধুর বউদের ওরকম একটু রাগ থাকেই।

তারপর আস্তে আস্তে গোকুল বড়লোক হলো। অল্পবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে ধনী, ধনী থেকে কোটিপতি! সে-ইতিহাস এখানে অবান্তর! কখনও ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হতো, আবার কখনও ঘন ঘন। অত বড় ব্যবসাদার, নানান কাজের মানুষ। কিন্তু বরাবর দেখে এসেছি রাত আটটার পর কখনও বাইরে থাকেনি।

বলেছে—না ভাই ও সব তর্ক করবার জিনিস নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম।

সম্বর্ধনা-সভায় দাঁড়িয়ে গোকুল বলেছে—আমার এই উন্নতি—যার জন্যে আপনারা আমাকে সম্মান দিচ্ছেন, সে-সম্মান আমার প্রাপ্য নয়, তার অনেকখানিই প্রাপ্য আমার স্ত্রীর। আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি এমন স্ত্রী, এমন স্ত্রীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভালবাসা সেবা ও যত্ন না পেলে আমি জীবনে কিছুই করতে···ইত্যাদি—

সংবাদপত্রে সে-রিপোর্ট সবিস্তারে ছাপা হয়েছে। আমি পড়েছি। আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু নিজের কৌতূহল আর, আর সেই রাত্রের গোপন ঘটনাটির কথা মারণমন্ত্রের মত বুকে পুষে রেখে নিজের মনেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। বহুদিন পরে একবার টাটানগরে গিয়েছিলাম। সেই অজ্ঞাতকুলশীল্ বিকাশের খোঁজও করেছিলাম। কাকার বাড়ি সি-রোড থেকে তখন এফ্-রোডে বদলি হয়েছে। কিন্তু জীবনে অনেক জিনিস হারিয়ে যাওয়ার মত বিকাশও সেদিন হয়তো সৌভাগ্য-ক্রমে হারিয়েই গিয়েছিল এবং অনেকদিন পরে যখন দেখা হলো···কিন্তু সে কথা এখন থাক। নইলে রাণীসাহেবাকে নিয়ে আজ গল্প লেখবার এই চেষ্টাই বা কেন!

এরপর গোকুল মিত্তির বৌবাজার থেকে লেক রোড, লেক রোড থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে থিয়েটার রোড-এ! ধাপে ধাপে উঠে গেছে। সাধারণ লোক থেকে রায়সাহেব হয়েছে। দশজনের একজন ছিল, ক্রমে দশজনের শীর্ষে উঠেছে। বাইরে থেকে আমরা দেখেছি গোকুলকে। বাহবা দিয়েছি! কিন্তু গোকুল বরাবর বলেছে—না না আমি কিছু নয় ভাই—এর পেছনে আছে মিসেস মিত্তির—আরতি—মিণ্টু—

আমরা যখনি আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছি, গোকুল

সাপ দেখার মতন লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি, তামাশা হয়েছে।

আমার স্ত্রী বলেছে—কেন, হাসির কী আছে, ওই তো ভালো। তোমাদের যেমন মেয়েমানুষ দেখলেই জিভ দিয়ে নাল পড়ে ?

চাঁদা চেয়ে বা ধার চেয়ে কখনও কেউ হতাশ হয়নি গোকুল মিত্তিরের কাছে। তবু মহিলা-সমিতি, গার্ল স্কুল কিংবা দুঃস্থা বিধবা—এসব ব্যাপারে একটি পয়সা কখনও দেয়নি গোকুল, এক আমাদের 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন' ছাড়া। গোকুল বলতো—কী করবো, আরতির আপত্তি যে—

গোকুলের উন্নতির সঙ্গে আমি যদিও বরাবর জড়িত ছিলাম—কিন্তু ওর চরিত্রের ওই দিকটার কথা মনে হতেই কেমন যেন করুণার চোখে দেখতাম ওকে। মনে হতো ইচ্ছে করলেই এক দণ্ডে গোকুলের জীবন বরবাদ করে দিতে পারি। ও হয়ত আত্মহত্যা করবে শুনে। কিন্তু আবার এক একবার মনে হতো আমারই ভুল। আমার মনের কিংবা চোখের ভুল। মনে হতো, সেদিন সেই শীতের রাত্রে বারো নম্বর সি-রোডের সামনের ঘরটার ঘটনা, শুধু নিছক বিভ্রম মাত্র—আর কিছু নয়। আসলে গোকুলের ক্রম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের কৌতূহলের মাত্রাটাও দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে বেড়েই চলেছিল।

এর পরের ঘটনা আরতি রায়কে নিয়ে নয়। আরতি তখনও রাণীসাহেবা হননি। তখন কেবল মিসেস মিত্র। প্রচুর প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠে রায়সাহেব গোকুল মিত্তির যখন মারা গেল হঠাৎ, তখন কারবার নিজের হাতে নিলেন মিসেস মিত্র। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যেমন আড়ালে থেকে স্বামীকে পরিচালনা করতেন, তেমনি আড়ালে থেকেই তখন থেকে ব্যবসা পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি।

ঘটনাটা সেই সময়ের।

শকুন্তলা নয়—মৃণালিনী। মৃণালিনী ম্যাট্রিক পর্যন্ত পর্দা-স্কুলে পড়েছে। গোকুল মিত্তির ওই মৃণালিনীর স্কুলে যাওয়ার জন্যেই পালকি গাড়ি কিনেছিল। রবারের টায়ার লাগানো চাকা। জানালা দরজার খড়খড়ি বন্ধ। দুটো মোটা ওয়েলার ঘোড়া। দুটো মোটর থাকতেও কেন যে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করতে গোকুল বলেছিল—ও-সব কথা থাক ভাই—আরতি যখন চায় তখন ও নিয়ে আর—

তারপর ভর্তি হলো আমাদের 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'। গীতি-পাঠ, স্তোত্র-পাঠ আর তার সঙ্গে আই, এ-র কোর্স। এখানে ভর্তি হওয়ার পেছনে মিসেস মিত্রের নিশ্চয়ই

সম্মতি ছিল। কারণ স্ত্রীর বিনা-পরামর্শে কোনও কাজ করবার পাত্র গোকুল নয়।

তখন গোকুল বেঁচে নেই। সমস্ত কাজ কারবারের কলকাঠি মিসেস্ মিত্রের হাতে। সেই সময়ে একদিন আগুন জ্বলে উঠলো।

মৃণালিনী সেদিন কলেজে নিয়মমত গেছে। ক্লাস বসে গেছে। হঠাৎ মিসেস্ মিত্রের চিঠি নিয়ে এসে হাজির মিসেস মিত্রের দারোয়ান। পিওন-বুকে সই দিয়ে চিঠি নিলাম। চিঠি খুলে পড়তে গিয়ে মাথায় বজ্রাঘাত হলো।

সিল করা চিঠি। বিশেষ জরুরী এবং গোপনীয়।

টাইপ-করা তিন পৃষ্ঠা চিঠি। নিচেয় মিসেস্ মিত্রের সই।

পত্রের বিবরণে প্রকাশ—মিসেস্ মিত্রের মেয়ে মৃণালিনী নাকি প্রেমপত্র লিখেছে 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'র ইংরাজীর প্রফেসার বিভূতি ঘোষালের কাছে এবং বিভূতি ঘোষাল সে-চিঠির জবাবও দিয়েছে। এমন একখানা দু'খানা নয়, অনেকদিন ধরে অনেক চিঠিই লেখা হয়েছে। কিন্তু মিসেস মিত্তির এখন ধরে ফেলেছেন সমস্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃণালিনীর কলেজে আসা বন্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এখন জানতে চেয়েছেন বিভূতি ঘোষালের মত প্রফেসারকে কেন এখনি বরখাস্ত করা হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন'কে এখনি ভেঙে দেবে না। যেখানে মেয়েদের শিক্ষার নামে চরিত্রহীনতার এমন হাতেখড়ি দেওয়া হয় এবং যে-প্রতিষ্ঠানে অসচ্চরিত্র লম্পট শিক্ষকদের বেছে বেছে নিযুক্ত করা হয় মেয়েদের প্রলুব্ধ করার জন্যে—সে-প্রতিষ্ঠান তুলে দেবার জন্যে কোনও আইন দেশে আছে কি না—এবং না থাকলে সে-আইন এখনি কেন প্রবর্তন করা হবে না তাই জানতে চেয়েছেন। সুশিক্ষার নামে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভদ্রঘরের যুবতী মেয়েদের যে এইভাবে অনাচার ও দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তা বহুলোক বহুদিন ধরেই সন্দেহ করে আসছেন। কিন্তু ভদ্রবেশী গুণ্ডাদের কূটনীতিতে এতদিন সকলের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে ছিল। 'সুনীতি শিক্ষা-সদনে'র এ দৃষ্টান্ত এবার সকলকে…ইত্যাদি…

তিন পৃষ্ঠাব্যাপী অভিযোগ। শেষে লিখেছেন—দেশবাসী তথা বিশ্ববিদ্যালয় এর কোনও প্রতিবিধান না করলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন।

এর একখানা নকল তিনি পাঠিয়েছেন ভাইস-চ্যানসেলারের কাছে—আর একখানা চ্যানসেলারের কাছে। এবং লিখেছেন যে, উত্তরের জন্যে তিনি পনেরো দিন অপেক্ষা করবেন—জবাব না পেলে তিনি অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

গোকুল বেঁচে নেই। তবু গোকুল বেঁচে থাকলেও কোন সুরাহা হতো বলে মনে

হয় না। কারণ মিসেস্ মিত্রের কথাই শেষ কথা জানতাম! কিন্তু চিঠিটা পড়ে হাসিও পেল। কারণ জামশেদপুরের সেই বারো নম্বর সি-রোডের ঘটনা তো নিছক কল্পনাও নয়।

কিন্তু চিঠিটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেও পারলাম না। তখনি বিভূতি ঘোষালকে ডেকে পাঠালাম। ছোকরা মানুষ। ওদিকে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে রত্নও বলা যায়। অনেক দেখে শুনেই তাকে ভর্তি করেছিলাম! ইংরেজী, হিস্ট্রি আর ইকনমিক্‌সে এম, এ, দিয়েছে। তিনটেতেই ফার্স্ট। চিরকাল এখানে চাকরি করবে না। আরো উন্নতি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে যে কথা সে বলেছিল, তাতে তার বিশেষ কোনও দোষ আমি পাইনি।

এক কথায় সে বলতে চেয়েছিল—তারা দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসে—

সেদিনকার মৃণালিনীকেও আজ মনে করতে চেষ্টা করলাম! খড়খড়ি বন্ধ পালকি-গাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে আসতো রোজ। মিসেস মিত্রের কড়া নজর আর কচুয়ান, চাকর, ঝি, দারোয়ানের নজরবন্দী হয়ে থেকে থেকে বোধ হয় কলেজের এলাকায় ঢুকেই সে জীবন ফিরে পেত। চটুল চলা আর কথা বলার ভঙ্গী থেকে বুঝতাম এখানেই একমাত্র সে বুঝি মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তার লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় ওঠা, ক্লাসের বাইরে দুর্দম ছোটাছুটি আর তারপর ঠিক বাড়ি যাবার আগে পালকি-গাড়িটা যখন ঘেরা কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতর এসে ঢুকতো তখন অকারণে বাড়ি যেতে দেরি করা আর যাবার আগে তার সেই চেহারা বিষাদ-মলিন হয়ে যাওয়া—সমস্তর যেন একটা মানে ছিল। আজ সেই মেয়েকেই দু'হাত নিচু ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তার চেয়ে কম বয়সী স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখে তাই অত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যা হোক চিঠিটা পেয়েই মিসেস মিত্রের বাড়ি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেখাও হলো।

কিন্তু কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই আরতি রায়কে। সাদা থান, তুষার ধবল গায়ের রং আর প্রচুর স্থূল মাংসপিণ্ডের তলায় জামশেদপুরের সে-মেয়েটি বুঝি কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যতক্ষণ ছিলেন সামনে বসে, একবারও আমার চোখে চোখ রাখলেন না। হয়ত ভেবেছিলেন যদি চোখের জাফ্‌রি দিয়ে সেই কুমারী আরতি রায় হঠাৎ এক ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে ফেলে। কিংবা যদি আমি চিনে ফেলি সেই আরতি রায়কে।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—যাদের হাতে ছেলেমেয়ের চরিত্রগঠনের দায়িত্ব, তারাই যদি এমন করে তাদের সর্বনাশ করে তাহলে বাপ মায়ের মনে কতখানি দুঃখ হয় তা ভাবুন তো একবার—

আমার অবশ্য চুপ করে শোনবারই পালা। যিনি কথা বলছেন তিনি তখন আর বন্ধুপত্নী নন রায়সাহেব গোকুল মিত্রের প্রচুর সম্পত্তিশালিনী বিধবা স্ত্রী।

বললেন—আপনারা ও-স্কুল উঠিয়ে দিন। যদি না দেন তবে জানবেন ও আমিই উঠিয়ে দেব—দেহের ধর্মনাশ, আর মনের ধর্মনাশ, ও একই কথা।

তার পর পাশের দিকে চেয়ে ডাকলেন—প্রফুল্লবাবু—

গোকুলের পুরনো টাইপিস্ট প্রফুল্ল কাজ করছিল একপাশে। মিসেস মিত্রের ডাকে উঠে এল কাছে।

মিসেস্ মিত্র কপালের চুলগুলো ডানহাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন—একশো সাতের সি ফাইলটা আনুন তো একবার।

ফাইলটা আসতেই মিসেস্ মিত্র সেখানা খুললেন। বললেন—প্রফুল্লবাবু এই তেত্রিশের ফোলিওটা দেখে রাখুন। মাসে মাসে 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'র নামে যে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা বরাদ্দ আছে, আজ একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট করে দেবেন ওটা ক্যান্‌সেল্‌ড্‌ হবে—আর ওদের ওখানে যে পঞ্চাশখানা পাখা দেওয়া আছে ওগুলোও ফেরত দেবার কথা লিখে দেবেন ওই সঙ্গে।

তারপর বাঁ পাশে দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন—সৌরভী!

সৌরভী এল।

বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে একবার ডেকে দে তো।

যজ্ঞেশ্বর সামনে আসতেই বললেন—যজ্ঞেশ্বর শুনে রাখ্‌, কাল যখন আপিসে যাবি একবার খগেনবাবু, আমাদের একাউন্‌টেন্টকে দেখা করতে বলবি তো—আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করেন বাড়িতে—বলবি বিশেষ দরকার।

তারপর সৌরভীর দিকে চেয়ে আবার বললেন—হ্যাঁরে মিনু বার্লি খেয়েছে, না এখনও···একবার জ্বরটা দেখলে হতো যে······যজ্ঞেশ্বর শোন্ ইদিকে।

যজ্ঞেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বললে—মা।

—এবার বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দে তো—গাড়ি নিয়ে যা, নইলে দেরী হবে—বলবি এখনি যেন আসেন—প্রফুল্লবাবু, আপনি এ-মাসে ডাক্তারবাবুর দোকানের বিলগুলো এখনও দেননি কেন? কাজে আপনাদের বড় গাফিলতি হয়—আমি যেদিকে না দেখবো···

দশটা কাজের মধ্যে মিসেস্ মিত্রকে যেন কেমন দিশেহারা দেখলাম। ঠিক যেন সামঞ্জস্য করতে পারছেন না জীবনের সঙ্গে। কোথায় কোন্ ফুটো দিয়ে বুঝি সব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার দিকে না চেয়েই আমাকে বললেন—ও আপনি এখনও বসে আছেন—আপনাকে চা আনিয়ে দিচ্ছি,—সৌরভী চা নিয়ে আয় তো এক কাপ।

কী জানি হঠাৎ মিসেস্ মিত্রের চিঠিটা পেয়ে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, সামনা-সামনি ওঁকে প্রত্যক্ষ দেখে তেমনি ওঁর ওপর করুণা হলো। অর্ধমৃতের ওপর আঘাত করতে ইচ্ছে হলো না। মিসেস মিত্র কি সত্যি সত্যিই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ!

সেদিন বাড়ির বাইরে এসে বাড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেছিলাম। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জেলখানার মত। অমন রক্ষা-ব্যবস্থা কিসের জন্যে? জানালাগুলোর সামনে দেড় হাত জায়গার ব্যবধানে খড়খড়ির আবরণ দেওয়া। চন্দ্র-সূর্যও যেন ওখানে প্রবেশ করতে না পারে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'র মাসিক মোটা চাঁদাটা বন্ধ হয়ে গেল। গোকুল মিত্রের ধার দেওয়া পঞ্চাশখানা পাখা, তাও একদিন ওদের লোক এসে খুলে নিয়ে গেল। তবু টিম্ টিম্ করে চলতে লাগলো প্রতিষ্ঠান। শেষে একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর একদিন কার কাছে যেন শুনেছিলাম যে মিসেস্ মিত্র মেয়েকে নিয়ে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর জমিদারীতে গিয়ে বাস করছেন। জনতা, কোলাহল, শহর সভ্যতা থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে তিনি হয়ত আত্মরক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। কুমারী জীবনে নিজে যে দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছেন আরতি রায়, মিসেস্ মিত্র হয়ে তিনি সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্তই হয়ত করে গেলেন এবং নিজের কন্যার মধ্যে যাতে তাঁর কোন বিগত দুর্বলতার ছাপ না পড়ে, তার সেই শুভ প্রচেষ্টাই হয়ত তাঁকে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর দুর্গম বন্দীনিবাসে আবদ্ধ করেছে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, তা আজ মৃণালিনীর লম্বা ঘোমটা আর তার কমবয়েসী স্বামীকে দেখেই বুঝতে পারলাম।

মুনসীজীও বলছিল—ওঁরা হুজুর বড় ভারি জমিন্দার, বনেদী বংশ ওদের, ওদের বংশের নিয়মই আলাদা, বউ শ্বশুরবাড়ি গেলে জীবনে আর কখনও বাপের বাড়িতে আসতে পারবে না। এই যে আজ শ্বশুরবাড়ি ঢুকলো তো ঢুকলোই—আর বেরুবে না—বড় ভারি বনেদী জমিন্দার ওঁরা হুজুর।

সকাল বেলা নিয়মিত জলযোগের পর ডাক পড়লো।

মহলের পর মহল পেরিয়ে মুনসীজী আজ একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছে। আজ আরতি রায়ও নয়, মিসেস্ মিত্রও নয়, আজ রাণীসাহেবা! সেই দুর্গম পল্লী-প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্দরমহলের একটি ঘর দেখলাম পরিপাটি করে সাজানো। চারপাশে কলকাতার সোফা কোউচ। দেয়ালের সারা গায়ে গোকুলের নানা বয়সের নানা ভঙ্গীর ফটো। দুটো মানুষ-সমান অয়েলপেণ্টিং। একটা গোকুলের আর একটা রাণীসাহেবার।

খানিক পরে পাথরের প্লেটে ফল আর মিষ্টি এল। আর তার পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন রাণীসাহেবা।

বহুদিন পরে দেখছি। বিচলিত হলাম। সত্যি এ-যেন অন্য মানুষ!

এসেই বললেন—ওটা খেতে আপত্তি করবেন না। ওটা প্রসাদ—আমার বিগ্রহ দেওকীনন্দনের।

তারপর সামনে বসলেন। আরো শুচি-শুভ্র আর তুষার-ধবল হয়েছে তাঁর অবয়ব। একটু আগেই স্নান সেরে পূজো সেরে আসছেন বোধ হয়। কপালে চন্দন-চর্চিত জোড়া ভৃগুপদরেখা। হাতে নাম-জপের থলি। ভেতরে আঙুলটা নিঃশব্দে নড়ছে। বুঝি ইষ্ট-নাম জপ করেছন।

বললেন—কেমন জামাই দেখলেন আমার?

তারপর খানিক থেমে বললেন—জানেন, মিনুর বিয়ের জন্যে আমার ভারি ভাবনা ছিল—আজ আমি সত্যিকারের স্বাধীন।

দেওয়ালের অয়েল পেণ্টিংখানা দেখিয়ে বললেন—উনি বলতেন বটে যে আমিই নাকি ওঁর উন্নতির মূলে। কিন্তু উনি ছিলেন দেবতা, ওঁর স্পর্শ পেয়ে আমিই বরং ধন্য হয়ে গেছি। ওঁর ভালবাসা না পেলে কি আজ মিনুকে ঠিক নিজের মনের মতন করে মানুষ করতে পারতুম—নিজের পছন্দমত ঘরে-বরে দিতে পারতুম। আজ উনিও নেই—মিনুও গেল—আপনারা সবাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাই কোন বাধা এল না, তা ছাড়া—

আরো এমনি দু' একটা কথা হলো। আশ্চর্য হলাম। এ-যেন সে-মানুষ নন। আরতি রায়, মিসেস্ মিত্র আর আজকের এই রাণীসাহেবা, এরা যেন একজন নয়—তিনজনের তিনটি বিভিন্ন রূপ। অথচ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ওঁকে চিনে এসেছি, তবু মনে হলো চেনার যেন আর শেষ নেই। যেন এ-চেনার শেষ হবেও না। কবেকার কোন্ আরতি রায়—সে কি আজ রাণীসাহেবাকে দেখলে চিনতে পারবে? কিংবা

হয়ত রাণীসাহেবাও আজ আরতি রায়কে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আরতি রায়কে দেখে রাণীসাহেবাও আজ বুঝি লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে থাকবে। নইলে অমন করে অসঙ্কোচে আমার চোখে চোখ রেখে কথাই বা কেমন করে বলতে পারছেন এই রাণীসাহেবা!

মামুলি বিদায় অভিনন্দনের পর চলে আসছিলাম।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল—আর একবার শুনুন—

ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি হাসি মুখ! হাসি দেখে কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। হাসি তো কখনও দেখিনি ওঁর মুখে।

বললেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতুম—

—বলুন না কী কথা?

—আপনি একদিন আমার মেয়ের নাম রাখতে চেয়েছিলেন শকুন্তলা—আমি রেখেছি মৃণালিনী। আপনার দেওয়া নামে আমার আপত্তি ছিল, কেন জানেন?

—না, কেন?

—আপনি আগে বলুন, কী মনে করে আপনি ওর নাম শকুন্তলা রেখেছিলেন?

—আমি কিছু মনে করে ও নাম রাখিনি কিন্তু—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

—আপনি সত্যি কথা বলছেন?—রাণীসাহেবা হঠাৎ যেন বড় ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি হঠাৎ এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। ভয় হলো—ধরা পড়ে গেলাম নাকি! ওকি হাসি নয়, তবে—ভ্রূকুটি!

তারপর আমার দিকে তেমনিভাবে চেয়েই রাণীসাহেবা বললেন—আমার স্বামীকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক ছিল না—যদি এতদিনের পরিচয়েও সেটা না-বুঝে থাকেন তো···

বলতে বলতে থেমে গেলেন রাণীসাহেবা।

তারপর একসময়ে আশেপাশে চেয়ে নিয়ে বললেন—আজ আমি স্বাধীন। উনিও নেই, মিন্টুও জন্মের মত পর হয়ে গেল, আজ আর বলতে দোষ নেই—কেন আপনি শকুন্তলা নাম রেখেছিলেন তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছিলাম।

—আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন আপনি—

—কিন্তু আপনি যে ক্ষমার যোগ্যও নন, শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের দেশের একটা সাত বছরের মেয়েও জানে—বলতে বলতে বিদায় সম্ভাষণ না করেই চলে

গেলেন দরজার পর্দার আড়ালে। আর আমি খানিকক্ষণ হতবাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।

—ট্রেনে আসতে আসতে ভেবেছি কত কথা। ভেবেছি—অল্প বয়সের ত্রুটির জন্যে যাঁকে সারাটা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, সমস্ত বিলাসব্যসন শহর, সভ্যতা ছেড়ে যিনি আত্মবিবরে মুখ লুকিয়ে মুহ্যমান মৃতকল্প হয়ে আছেন, আজ রাণীসাহেবার সেই পরিপূর্ণ রূপটাই যেন দেখবার সৌভাগ্য হলো। গোকুল অবশ্য ছিল হতভাগ্য কিন্তু এই রাণীসাহেবাকে দেখলাম আজ তার চেয়ে আরো শতগুণ হতভাগ্য!

মনে মনে সঙ্কল্প করলাম রাণীসাহেবাকে নিয়ে এখন গল্প লিখব না। ওই মৃণালিনী যখন শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারে আত্মধিক্কারে উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করবে—তখনই রাণীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখার উপযুক্ত সময় হবে।

সেই আমার রাণীসাহেবার সঙ্গে শেষ দেখা। এর পর আর দেখা হয়নি।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা নয়। এর পর যে ছোট ঘটনাটি ঘটলো সেটি না ঘটলে রাণীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার কোনও সার্থকতাই থাকে না। এতদিনের সমস্ত দেখা একটি মুহূর্তে যেন ভুল-দেখায় পরিণত হলো। সেই ঘটনাটা বলি!

এক সুগার মিলের শেয়ার বিক্রি করতে এক ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে এসে হাজির।

সকাল বেলা। লোকটি কিন্তু বড় স্মার্ট!

বললে—শেয়ার আপনাকে আমি এখনি কিনতে বলছি না, কিন্তু আমাদের প্রস্পেক্টাসখানা একবার পড়তে অনুরোধ করি—ম্যাক্‌স্‌ইনি ব্রাদার্স লিমিটেডের সমস্ত কনসার্ন আমাদের বি. কে. গুপ্ত এণ্ড কোং কিনে নিয়েছেন—ম্যানেজিং এজেন্টস্ নতুন হলেও ফার্ম বহুদিনের, প্রেফারেন্‌শিয়াল শেয়ারে ডিভিডেণ্ড এইট পারসেণ্ট আর অর্ডিনারী শেয়ার হলো…

উল্টে পাল্টে দেখলাম। 'নরকটিয়াগঞ্জ সুগার ম্যানুফ্যাক্‌চারিং এণ্ড ট্রেডিং কনসার্ন—ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি. কে. গুপ্ত এণ্ড কোং'—। সাদা এ্যাণ্টিক পেপারে রয়্যাল আট পেজি বুকলেট। শেষের পাতায় ব্যালান্স শিট।

ছোকরাটি বললে—আপনি হয়ত ভাববেন নতুন ম্যানেজিং এজেণ্টস্—কিন্তু বি. কে. গুপ্তকে যারা জানেন তাদের যদি একবার জিজ্ঞেস করে দেখেন…মিস্টার গুপ্ত আমেরিকা আর জাপানে কুড়ি বছর ধরে এই সুগার টেক্‌নোলজি নিয়ে জীবনপাত করেছেন। এতদিন পরে ইণ্ডিয়াতে ফিরে এসে আজ ক'বছর হলো এইটে হাতে

নিয়েছেন। অদ্ভুত ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার মশাই। ছোটবেলার একজন নিজের পয়সা খরচা করে ওঁকে জাপানে পাঠায়, অত্যন্ত গরীবের ছেলে ছিলেন কিনা—

খানিক পরে ছোকরাটি বললে—আর একটা ভেতরের কথা তা হলে আপনাকে বলি—বেহারের রাণীসাহেবার নাম শুনেছেন ?

চমকে উঠলাম।

—তিনি নিজে এর পেছনে আছেন। তিনি একাই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছেন এরি মধ্যে, আবার দরকার হলে আরো লক্ষ লক্ষ টাকার···

বললাম—রাণীসাহেবা ?

আমার চোখে মুখে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বেহারের রাণীসাহেবা বলতে ওই একজনকেই তো বোঝায়। আপনি চেনেন নাকি ? তা সেই রাণীসাহেবাই কুড়ি বছর ধরে ওঁর আমেরিকায় জাপানে পড়বার খরচ চালিয়ে এসেছেন। ফরেন্ কোন ডিগ্রী আর বাকি নেই। দেশে ফেরবার আর ইচ্ছেই ছিল না, রাণীসাহেবাই ওঁকে ডেকে এনে ওইতে নামিয়েছেন। আসলে কোম্পানীটা রাণীসাহেবারই বলতে পারেন। অথচ দেখুন মিস্টার গুপ্ত ছোটবেলায় কী গরীবই ছিলেন ! জামশেদপুরে পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়েছেন।

—কী নাম বললেন ? আমি শিরদাঁড়া সোজা করে চেয়ারে উঠে বসলাম।

—আজ্ঞে আমাদের ম্যানেজিং এজেণ্টস্-এর নাম ? মিস্টার গুপ্ত।

—পুরো নাম ?

—মিস্টার বি. কে. গুপ্ত।

—না না, ইনিশিয়াল নয়, পুরো নামটা কী ?

—বিকাশ গুপ্ত।

ঘরন্তী

এ-গল্পটা হয়তো না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম। কিন্তু লেখক জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া নিজের সুখ-অসুখের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না, কারণ মিসেস্ চৌধুরীর বিশেষ অনুরোধেই এটা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে যেভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেভাবে শেষ আমি করতে পারবো না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন, এ গল্প যদি পড়েন, যেন আমায় ক্ষমা করেন।

সত্যি, সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস্ চৌধুরী যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। জানি না এই বই তাঁর হাতে পড়বে কি না। তবু যদিই তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভালো আছে, লাবণ্যর একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য ছেলের নাম রেখেছে…

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মিসেস্ চৌধুরীর হয়তো মনে নেই সে-সব কথা। কিন্তু আমার আছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শেষে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। বৃদ্ধা না হোন, মিসেস্ চৌধুরীকে যুবতী বলা চলে না। তবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেণ্টের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। রুজ-মাখা গাল আর লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে হঠাৎ কালি লেপে দিয়েছে।

বললেন—একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে একটা গল্প লিখতে হবে বিমল—

বললাম—ব্যাপার কী? কী হলো?

—তুমি কথা দাও লিখবে? তুমি অনেককে নিয়ে লিখেছ, এ-ও তোমারই সাবজেক্ট।

—খুলে বলুন, কী ব্যাপার?

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—লাবণ্যকে নিয়ে তোমার একটা গল্প লিখতেই হবে।

—লাবণ্য কে?

—বলবো তোমাকে সব, কিন্তু আগে কথা দাও—লিখবে?

অগত্যা কথা দিতেই হলো।

মিসেস চৌধুরী বললেন—যত বদনাম শুধু আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবু তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই দোষ থাক, আমরা চরিত্রহীনা নই। আমার বাড়িতে যারা আসে, কিম্বা আমি যাদের কাছে যাই—তারা কেউ আমাকে সতী-সাবিত্রী বলে না জানুক, আমাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। অন্তত সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ-কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কেউ বলতে পারবে না আমার ঘরে এসে কাউকে পুলিশের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি কিছু জানে না? জানে বৈ কি। সব জানে। আমার কিসের কারবার, আমার পেট চলে কিসে, সবই জানে। কিন্তু তবু বলেনা কেন? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিশের থানা। তাদের নাকের ওপরই তো আমার কারবার চলছে, তবু কিছু বলে না কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর মিসেস চৌধুরী অবশ্য আশা করেন না। তাই, আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরীর আধাপাকা চুলের খোঁপা খুলে পড়লো। দু হাতে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—এই রাত্তির বেলা তোমার ঘরে বসেই বলছি, আমায় কেউ কুলত্যাগিনী বলে জানে, কেউ বা বলে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে। আমি সব জানি সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে সতী-সাবিত্রী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তা-ই। আমার স্যুটকেস্-এর মধ্যে যেদিন মিস্টার চৌধুরী এক প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন, সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করি নি। তা ছাড়া তোমরা তো জানো, একগ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ভুল বকতে শুরু করি।

কথা বলতে বলতে যেন হাঁপাতে লাগলেন।

বললেন—তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বরাবর জানো নিশ্চয়ই সন্ধ্যে বেলা তিন কাপ চা খেয়ে তবে আমার নেশা কাটে, আজ সত্যি বলছি তোমায় এক-কাপ চাও জোটে নি কপালে।

তার পর লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—তোমার চাকরকে একবার জাগাও, চা করুক।

সত্যি মনে হলো মিসেস্ চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে-আঘাতে নেশার খোরাক খেতেও ভুলে গেছেন তিনি—এমনি কঠোর তার যন্ত্রণা। নইলে মিসেস্ চৌধুরীর মত মেয়েমানুষ এই রাত্রে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন! অথচ সে-আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অক্ষম আক্রোশে তিনি যেন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। আমিই বুঝি এখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র। গল্প লিখে যেন আমিই একমাত্র তার প্রতিকার করতে পারি।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস্ চৌধুরী। বললেন—আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আর আছে বলো! আরো যেমন দশজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে—লাবণ্যও তেমনি। এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক! কত মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, গুজরাটি, বাঙ্গালী আসে—মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কেউ একঘণ্টা, কেউ দু ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউ বা সারা রাত ঘর ভাড়া করে। তিনখানা ফারনিশ্‌ড ঘর আমার, ভাড়া নেয়—আবার কাজ ফুরোলে চলে যায়। লাবণ্যও ওদের মত একজন, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিসের?

লাবণ্যর সঙ্গে যদি কোনও সম্পর্ক নেই, তবে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, নিয়ে এই গল্প লেখানোর প্রচেষ্টা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—কিন্তু তা বলে কি তোমরা আমায় অর্থপিশাচ বলবে? এই যে তোমরা আমার ঘরে যাও, নিজের পয়সা খরচ করে খাও-দাও ফুর্তি করো, কখনও ঘর-ভাড়া চেয়েছি? ছোটবেলায় এককালে কবিতা লিখেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ওসব হলো না। না হোক, সকলের সব জিনিস হয় না, ওই বাড়ি-ভাড়া থেকে যে ক'টা টাকা আসে, তাইতেই আমার শেষ জীবনটা একরকম করে কাটিয়ে দেব—

মিসেস্ চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে এ তাঁর বিনয়ের কথা। যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দেবার মত জীবন তাঁর নয়। এ ক'বছরে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—ফুলচাঁদকে তুমি দেখেছ?

বললাম—দেখেছি।

—তার মতন অত বড়লোক, সে এক কথায় দশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে, সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যর জন্যে আটশো টাকা খরচ করবে বলেছিল, আমি রাজী হইনি। আমি যত বড় ব্যবসাদার মেয়েমানুষই হই না কেন, এককালে তো আমিও ঘরের বউ ছিলাম. রোজ সকালে স্নান করে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমিও তো প্রণাম করেছি—আমিও তো ছেলেমেয়ের মা ছিলাম। আজ না-হয় তোমরা আমায় দেখছ অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ মাখি, তোবড়ানো গালে রুজ মাখি—

হঠাৎ মিসেস্ চৌধুরীর মুখে এ কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগলো!

বললেন—যাক গে, এ-সব কথা। আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তুমি আমার ওখানে চলো—সব গল্পটা তোমায় বলবো।

—এখন? এত রাত্রে?

—তাতে কী হয়েছে?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি যাই নি। অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস্ চৌধুরীই সমস্ত গল্পটা আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় তিনটে!

চলে যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, এটা তোমায় লিখতেই হবে। তবে, ওই শেষকালটা শুধু বদলে নিও। যেমনভাবে বললাম ওইভাবে শেষ করো—কেমন?

তার পর ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বলেছিলেন—তা হলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছো তো ?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাই নি। দরজায় তালা দেওয়া। শুনেছিলাম, মিসেস্ চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয় নি। অনেক গল্পের সূচনায় যখন কী নিয়ে লিখবো ভেবেছি, তখন মিসেস্ চৌধুরীর গল্পটার কথাও মনে হয়েছে বার বার। মনে হয়েছে—নিরঞ্জন আর লাবণ্যর গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন তেমনি করেই না হয় শেষ করি। মিসেস্ চৌধুরী যেখানেই থাকুন, এ গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পারে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—সে-স্নেহ সে-ভালবাসার কিছুটা অন্তত তা হলে পরিশোধ হয়। কিন্তু মন সায় দেয় নি।

ট্রামে বাসে সিনেমায় সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গীর ধারে গালে সস্তা পাউডার আর আলতা মাখা ঠোঁট দেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। ভেবেছি—এই-ই বোধ হয় মিসেস্ চৌধুরীর লাবণ্য ! লাবণ্যর জীবন হয়তো এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের শান্ত সান্ধ্য পরিবেষ্টনীতে—পুত্র-কন্যার আনন্দ পরিবেশে—গৃহিণীর দিকে চেয়ে চোখ আমার অপলক হয়ে গেছে। এই-ই কি লাবণ্য ? হয়তো নিরঞ্জনের উদার প্রেমের প্রাচুর্যে সে-লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটে নি কোথাও। মিসেস্ চৌধুরীর কল্পিত পরিণতির সঙ্গে, লাবণ্যের বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসঙ্গতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনদিন তার কোনও সমাধান খুঁজে পাই নি।

তা নিরঞ্জনের মত পুরুষকে তো আজো দেখি সকালবেলা বাসে চড়ে অফিসে যেতে। টেনেবুনে একশো টাকাই না হয় মাইনে পাক। টুইলের শার্ট আর মিলের কাপড়। এক কথায় মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। একটা পেট একশো টাকায় একরকম করে চলে যায় বৈকি ! আর লাবণ্য !

মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মত সাদাসিধে—পঞ্চান্ন টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস্—

তা সত্যি। আমিও ভাবি, ও-মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে করা যায়। বিশেষ করে মেসের খরচ, বাসভাড়া, টিফিন। তার পর দু একদিন কি সিনেমাতেও যেত না?

কেমন করে ওদের আলাপ হলো কে জানে। গ্রহচক্রের কোন্ ষড়যন্ত্রের ফলে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে দুজনে দুজনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলো একদিন। তারপর ওদের আর ছাড়াছাড়ি হলো না কেন, তাই বা কে জানে? ওদের নিয়ে একদিন গল্প লেখাতে হবে এ-ধারণা থাকলে মিসেস্ চৌধুরী সে কথা নিশ্চয়ই জেনে রাখতেন। কিন্তু আর যা-ই হোক পছন্দের বাহবা দিতে হবে বটে নিরঞ্জনের।

মিসেস্ চৌধুরী বলেন—লাবণ্য রোগা হলে কী হবে, ওর গালের তিলটার জন্যে সকলেরই ওকে খুব পছন্দ হতো।

তা লাবণ্যকে আমিও কল্পনা করে নিতে পারি বৈ কি! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে অনেক সময় বাসের ট্রামের মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ একশো লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের ওপর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে একসঙ্গে যেতে দেখলে কেমন যেন মনে হয় ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আজ চলেছে মিসেস্ চৌধুরীর ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের বাড়িটার দিকে! মাসের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে একঘণ্টার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসে ঘনিষ্ঠ হবে—একান্ত হবে—।

এক একদিন পেছন পেছন অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কি মিসেস্ চৌধুরী আবার ব্যবসা শুরু করেছেন! সেই আগেকার মতন! সাহেব, মেম, মোটর দোকান-পত্তর পেরিয়ে সামনের নিরঞ্জন আর লাবণ্য পাশাপাশি চলেছে। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে মোটা কাবুলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে আজ। আর তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা স্কার্ট শাড়িটা পরেছে আজ। কানের একটা দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। রাস্তার জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে, ভালো করে দেখা চাই! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে আজো এদের কোনও অমিল নেই যেন। লাবণ্যের পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কি সেই চটিটাই পরছে! নিরঞ্জনও কি দশ বছর আগের সেই টুইলের শার্টটাও বদলায় নি আজ পর্যন্ত।

সেই বিকেলের আলো-ছায়ার মধ্যে জনবহুল রাস্তার স্রোতে মিসেস্ চৌধুরীর কাছে শোনা নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হলো আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভাল দেখাচ্ছে কিন্তু—

—কত দাম নিলে এর?

আরো পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও দিই নি, চেনা-শোনা দোকান—মাসে মাসে দু টাকা করে দিলেই চলবে।

লাবণ্য বললে—কিন্তু কেন কিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো বহুদিন ধরে ছিঁড়ে গেছে, জুতো একজোড়া কিনলে হতো তোমার।

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চাকরিটা পাকা হলে কিনবো, তার আগে নয়।

লাবণ্য বলে—কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানোও আমাদের দরকার। তা না হলে আর কতদিন মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে; গত মাসে দুদিনের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে!

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার ভালো করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎ-হীন দিন-যাপনের ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন কোথাও এক টুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা। একটা স্বাধীন দু ঘর-ওয়ালা ফ্ল্যাট। তিরিশ কিংবা চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তার পর যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন সুদিন আসে, সেদিন···

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি, জানো?

লাবণ্য চমকে ওঠে—কত ভাড়া?

—ভাড়া বেশি নয়, পঞ্চাশ, কিন্তু—

—সেলামী চায় বুঝি?

সেলামী ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয়? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়! চেষ্টা কি আর নিরঞ্জন কম করেছে? আজ দু বছর ধরে চেষ্টা তো করেই চলেছে।

অনেক দিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। একটা বাড়ি পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তা হলে এমন করে আর মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্যে

টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে এখানে চার দিন এলেই তো চার-পাঁচে কুড়ি টাকা চলে গেল। এক-এক মাসে পাঁচদিন ছ দিনও এসেছে! তবে মিসেস্ চৌধুরী লোক ভালো। ব্যবহার ভালো তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তা ছাড়া ক'ঘণ্টাই বা থাকে তারা। বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে আসতে হয়। তার পর আবার কতদিন পরে দেখা হবে! চলতে চলতে লাবণ্যের হাতটা ধরে নিরঞ্জন।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষের ভিড় আর দোকানপত্রের সার পেরিয়ে কখন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়। একলা একলা মিসেস্ চৌধুরীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন স্বপ্নও ভেঙে যায়! সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে একদল সাহেব মেম সেজেগুজে বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ির সেই নেপালী দারোয়ানটা আর সেলাম করলে না আগেকার মত!

মিসেস্ চৌধুরী বলতেন—টালীগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসতো, চেতলা থেকে আসতো কল্যাণী, বেহালা থেকে আসতো টগর। কিন্তু এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে। চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে যাকে পেত ধরে আনতো। কিন্তু লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে। নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ওই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ জুগিয়েছে ওর।

ঘর ভাড়া হয়তো শহরে আরো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন রুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। সামনে অর্কিড আর মর্নিং গ্লোরি দিয়ে ঘেরা। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোণাকোণি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতর যেতে হবে। একটা ঘরে ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ব্যবস্থা পুরোদস্তর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস্ চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন।

জর্জেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে গোলমাল কিসের—আমায় তাস দিয়ো না ভাই।

বাইরে থেকে যেন খানিকটা বচসার শব্দ কানে এল।

তার পর প্রচণ্ড শব্দ করে ডেকে উঠলো মিসেস্ চৌধুরীর অ্যালসেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস্ চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম—ব্যাপার কী?

—আর বলো কেন, শেঠজী এসেছিল। ফুলচাঁদ শেঠ। মদে চুর একেবারে —একদিন বারণ করে দিয়েছি, তবু—

নির্বিকারভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্, থ্রি ডায়মণ্ডস্—

সেদিন অনেক দিন পরে সেই ফুলচাঁদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল, লম্বা-চওড়া একটা গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়ালো। দেখি ফুলচাঁদ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললেন—কী খবর স্যার?

আমিও আশা করছিলাম কিছু খবর পাবো। কিন্তু ফুলচাঁদই প্রশ্ন করলে—মিসেস্ চৌধুরীর খবর কিছু জানেন স্যার?

ফুলচাঁদ শেঠের ভাবনা নেই। হয় এ-পাড়ায় নয় ও-পাড়ায়, যেখানে হোক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস্ চৌধুরী না থাক, মিসেস্ সরকার আছে। নার্সিং হোম আছে। কত কী আছে কলকাতা শহরে। ছোকরা বয়েস। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে ফুলচাঁদের। তিনটে আসল আর দুটো ভেজাল ভেজিটেবিল ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সত্যি সত্যি বসলাম কলমটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস্ চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সাপ্লাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যের অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্যও চমকে উঠেছে কম নয়। বললে—একি, তুমি?

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার।

—তা হোক, তবু এলাম, মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাবো, আজ বড়ো যেতে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা? টাকা এনেছো? আমার তো হাত খালি, শুধু বাস-ভাড়াটা—

—সে এক-রকম বলে কয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে তোমায়—জানো লাবণ্য, আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সে কী?

মিসেস্ চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যের সে কৃচ্ছ্র-সাধনের ইতিহাস। ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া লাবণ্যের বন্ধ হলো সেই দিন থেকে। শুরু হলো সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে চড়া। টিফিন বন্ধ। এক-একদিন নিজের জলখাবারটা রুমালে করে বেঁধে নিয়ে ভাগ করে খেয়েছে মিসেস্ চৌধুরীর ঘরে দরজা বন্ধ করে। চুলে তেল পড়তে লাগলো একদিন অন্তর। স্নো ফুরিয়ে গেল, আর কেনা হলো না।

মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—ওদের জন্যে দিলাম কনসেশন করে। আমার ঘরের ভাড়ার রেট পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্যে ঠিক হলো তিন টাকা। তাও সব সময় নগদ দিতে পারত না, বাকি পড়ত।

কিন্তু ওদিকে টালিগঞ্জের বাসন্তীর গায়ে তখন ঢাকাই শাড়ি উঠেছে। চেতলার কল্যাণী নতুন এক ছড়া হার গড়ালো। বেহালার টগরও ব্রোঞ্জের চুড়ি ভেঙে গিনি সোনার কঙ্কণ গড়িয়েছে। বাজার গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস্ চৌধুরীই বা ছাড়বেন কেন? ঘর-ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হলো। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। খদ্দের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস্ চৌধুরীর টেলিফোন সারা দিন রাত এনগেজড্ থাকে!

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি।

দুপুরবেলা। খাওয়া দাওয়া করে মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওঁকে এক কপি উপহার দেবো। তার পর ওঁরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাব জায়গায় জায়গায়। মিসেস্ চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন, সাহিত্য-রসিক। ওঁকে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু দূর থেকে দেখি বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ফুটপাতের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিশও সেখানে দাঁড়িয়ে। মনে হলো—নিশ্চয় কোনও গোলমাল, কোনও কেলেঙ্কারী বেধেছে। এবারে মিসেস্ চৌধুরীর আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডা ভাঙলো বুঝি।

যাবো কি যাবোনা ভাবছি। শেষকালে আমরাও কি জড়িয়ে পড়বো?

কথাটা ভাবতেই কেমন লজ্জা হলো। ছি-ছি। আমরা কি বিপদের দিনে ওঁকে এমনি করেই ফেলে পালাবো! সেই দিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হলো, মিসেস্ চৌধুরী কতখানি একলা। বুঝলাম পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারা জীবন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য হয়।

মিসেস্ চৌধুরী আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি—সে দিন আপনার জন্যে আমার মায়া হয়েছিল সত্যি!

থাক্ সে কথা। আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম।

আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কৌচে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

কিন্তু উদ্বেগের লেশ মাত্র ছায়াও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বললাম—বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিশের হাঙ্গাম,

পুলিশের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার কৌচে হেলান দিয়েছিলেন।

—কিন্তু কী?

—কিন্তু দেখলাম ফুটপাথের ওপর বাঁদর-নাচ হচ্ছে।

আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সেসব ভয় নেই, পুলিশ আমার কিছু করবে না। তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমার আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা! কিন্তু ভয় অন্য ব্যাপারে—

—অন্য কী ব্যাপার?

—ভয় লাবণ্যর জন্যে—বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করি নি—কে লাবণ্য! কী তার পরিচয়!

আপনার হয়তো মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ বহুদিন থেকে চাইছে। দুশো পর্যন্ত খরচ করতে রাজী—আমিই রাজী হই নি—শেষে কোন্ দিন না—

মনে আছে এবারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—লাবণ্য কে?

আপনি সে-প্রশ্নের জবাব দেন নি। আপনি তেমনি কৌচে হেলান দিয়েই বলেছিলেন—ফুলচাঁদ যদি বাসন্তীকে চাইতো আপত্তি করতাম না, কল্যাণীকে চাইলেও চলতো, টগরের বেলাতেও কিছু বলবার ছিল না! আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম, কিন্তু তা বলে লাবণ্য? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝেছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করি নি। সেদিন মিসেস্ চৌধুরীই কি জানতেন তাঁর সেই লাবণ্যকে নিয়ে গল্প লেখানোর জন্যে একদিন রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতেই আসতে হবে!

হয়তো মিসেস্ চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যের মধ্যে। হয়তো সেই জন্যেই ফুলচাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চান নি! কে জানে?

তাই ফুলচাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—দু'শো কেন, পাঁচশো টাকা দিলেও লাবণ্যকে পাবে না। ওর দিকে তুমি নজর দিও না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেন নি। ফুলচাঁদ শেঠ জাত ব্যবসাদার, সাত পুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে, তা সে জানে। সেও তাই ধাপে ধাপে উঠেছে। পাঁচশোতে রাজী না হয় সাতশো। সাতশোতে রাজী না হয় আটশো—আটশোতে রাজী না হয়···

আজো যেন চেষ্টা করলে দেখতে পারি। দেখতে পারি, তেতলার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে নিরঞ্জন। পাশে লাবণ্য!

লাবণ্য যেন খুশীতে উচ্ছল। বললে—দেখেছ, একটু মাটি নেই কোথাও বাড়িটাতে।

নিরঞ্জন বুঝতে পারলো না। বললে—কেন, মাটি দিয়ে কী হবে?

—একটা তুলসী গাছ পুঁততাম। হিন্দু গেরস্থের বাড়িতে তুলসীর গাছ রাখতে হবে যে—

নিরঞ্জন বললে—তা সে একটা টবে পুঁতলেই চলবে—এই রান্নাঘরের পাশে।

—কিন্তু শোবার-ঘর কোন্‌টা করবে?

—দক্ষিণের ঘরটাই তো ভালো সব চেয়ে, জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়।

—একটা খাট কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সবুর করো, সবে তো চাকরি হলো, আস্তে আস্তে হবে সব—আগে বাড়িটাই হোক।

বাড়ির মালিক বললেন—আমার এক কথা—ভাড়া চল্লিশ টাকা, যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

মালিক এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন—ব্যবসায় আমার অনেক

লোকসান গেছে এদানি, এখন ওই বাড়ি ভাড়াতেই সংসার চলছে একরকম, তা সেলামী কিছু দিতে হবে আপনাদের।

নিরঞ্জন দমে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এমন ঘটনা প্রথম নয়। আগে জানতে পারলে—

তবু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করল—কত ?

যেন কম-সম হলে দিতে তৈরী সে।

মালিক বললেন—বেশি না, আর সব টেনেণ্ট যা দিয়েছেন, তা-ই দেবেন—তার এক পয়সা বেশি নেব না। আমার কাছে সবাই সমান।

সাম্যবাদীর মতন পরম নিস্পৃহ ভঙ্গী করলেন তিনি।

—তবু কত ?

—পুরোপুরিই দেবেন, ভাঙা-ভাঙতি ভালোবাসি না আমি।

তবু তিনি দুর্বোধ্য হচ্ছেন দেখে দয়া করে খুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিই নে।

ফুলচাঁদ সেদিন সেই কথাই বললে—আটশোতে রাজী না হয় হাজার—

সংখ্যাটা পুরোপুরি হলে যেন অন্য রকম শোনায়। কিন্তু নিজের কানকে আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন মিসেস্ চৌধুরী। তাই হয়তো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন নি। তবু কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না। আপনি তেমনি নির্বিকারভাবেই টফি চুষতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই কি লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে যেতে হয়। রাত তখন সাড়ে ন'টা। চটি ফটাস্-ফটাস্ করতে করতে চলেছে লাবণ্য। সারাদিন অফিসের খাটুনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়। আপনার ভাষাতেই বলি—আপনার মনের হলো—ও তো লাবণ্য নয়, ও যেন আপনার বিগত-জীবন, আপনার পরিশুদ্ধ আত্মা আপনাকে ব্যঙ্গ করে আপনার দিকেই পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না কোনও দিন।

আপনি সেখানে বসেই নেপালী দারোয়ানকে ডাকলেন—জঙ্গী।

জঙ্গী তিন লাফে এসে য়্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে স্যালিউট্ করার পর আপনি বললেন—লাবণ্যকে ডেকে দে তো।

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আত্মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং সেই বোধ হয় প্রথম আর শেষবার।

তার পর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে ফুলচাঁদের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হলো, পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে আজ পর্যন্ত যত মানুষের পদচ্ছায়া পড়েছে, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসমুদ্রের তরঙ্গ যদি আবার উদ্বেলিত হয় তো হোক। নক্ষত্র-নীল আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আবার কক্ষচ্যুত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যদি দিকভ্রান্ত হয় তো হোক। তবু আপনার আত্মা অচল অটল থাকবে! লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শুনে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তার পর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি মাসিমা।

মর্নিং গ্লোরির আড়ালে অন্ধকারে একলা অপেক্ষা করছিল নিরঞ্জন। লাবণ্য সেখানে গেল। তার পর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন পরামর্শ হলো দুজনে। দূর থেকে কিছু শোনা গেল না। তবু আভাসে বোঝা গেল—একজন বুঝি কেবল বোঝাতে চাইছে আর একজন যেন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে—আমি

কথাটা বোধ হয় লাবণ্য একটু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন—ঘরের ভেতর ফুলচাঁদ সে কথা শুনে নতুন ধরানো সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর, আপনি যে আপনি, আপনারও মনে হলো বারান্দায় চেইনে-বাঁধা অ্যালসেসিয়ানটা যেন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বললাম—তারপর?

মিসেস্ চৌধুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার একবার খুলে গেল। এবার সেটাকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর? তার পর সেই প্রথম, আর সেই শেষ। আর আসে নি তারা আমার বাড়িতে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের লোকেরা আর কোনও দিন সে রাস্তায় হাঁটতে দেখে নি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে কোথায় গেল তারা?

মিসেস্ চৌধুরী বলেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হতো—সেও বোধ হয় অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে। টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি, বেহালার টগরকে জিজ্ঞেস করেছি—তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারে না কোথায় গেছে তারা—এমন কি ফুলচাঁদও না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়তো ওই ঘটনায় পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে।

—তাও ভেবেছি অনেকবার। হয়তো অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিরঞ্জন আর ওদিকে আত্মধিক্কারে হয়তো আত্মহত্যা করেছে লাবণ্য। নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরিছি জেনে মনে মনে খুব খুশীই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খুব খুশী হয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরী যেদিন বিয়ের পর আমার স্যুটকেসের মধ্যে একটা প্রেম আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তার পর জীবনে এই প্রথম এমন খুশী হতে পারা—সে যে কী আনন্দ! সে আনন্দে সেদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তিন কাপের বদলে তিন্-ত্রিক্কে ন'কাপ চা-খেয়ে ফেললাম!

মিসেস্ চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়ে তাঁর গালের রুজ ঠোঁটের লিপস্টিক চোখের সুর্মা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখি নি। কী যে করবো বুঝতে পারলাম না।

তার পর মিসেস্ চৌধুরী হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

আমার দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তার পর এতদিন পরে আজ সকাল বেলা এই চিঠি, চিঠি পড়ে আমি তো অবাক!

দেখলাম নিরঞ্জন আর লাবণ্যর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পনেরোর সি কালী সরকার রোড, তেরো নম্বর স্যুট। আজকের তারিখ।

আমি মিসেস্ চৌধুরীর দিকে নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন—এখন সেখান থেকেই আসছি।

বললাম—কী দেখলেন?

—দেখলাম বিয়েতে যেমন হয় তেমনই, লাবণ্য সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে, পরে চন্দনের ফোঁটা। নিরঞ্জনের গায়েও গরদের পাঞ্জাবি, মাথায় টোপর। হঠাৎ কে থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন কোথায় ছিল তারা সব জানে! আজ হঠাৎ ওদের শুভাকাঙ্ক্ষীর আর আশীর্বাদকের অভাব নেই। বাড়িট ভালো, রান্নাঘরের পাশে একটা টবে তুলসীগাছ প্রতিষ্ঠা, শোবার ঘরে একটা খাট দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়। আয়োজনও করেছে প্রচুর—কি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম—ফুলচাঁদের স্পর্শের কলঙ্ক কোথাও নেই এতটুকু—

চন্দনের ফোঁটায় সব ঢেকে গেছে। কিন্তু আমার যেন কিছু ভালো লাগলো না। আমি জলস্পর্শ না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তার পর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত কলকাতাটা টো টো করে ঘুরে এখন এই রাত বারোটার সময় তোমার এখানে।

গল্প বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরী যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। মনে হলো, এখনি যেন তিনি নিভে যাবেন।

বললাম—তা হোক, তবু নিরঞ্জনের উদারতা আছে বলতে হবে।

মিসেস্ চৌধুরী দপ্ করে উঠলেন—তা থাকগে উদারতা, কিন্তু গল্পে তুমি ওদের বিয়ে দিতে পারবে না—শেষটুকু তোমায় বদলাতেই হবে।

—কেন ?

মিসেস্ চৌধুরী দম নিয়ে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, আগাগোড়া সব ঠিক রেখে শেষকালটাতে বদলে দেবে। বিয়ে ওদের কিছুতেই দিতে পারবে না তোমার গল্পে—ওর আত্মায় ঘুণ ধরেছে যে—আমি মিসেস্ চৌধুরী তার সাক্ষী।

বললাম—কিন্তু আত্মা তো মরে না।

—নিশ্চয় মরে, আলবৎ মরে, আমার আত্মা মরেছে—লাবণ্যর মরেছে, বাসন্তী, কল্যাণী, টগর সকলের মরেছে। আর তা ছাড়া যদি বিয়ে দিতেই হয় তো দুদিন বাদেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিও। তারপর ধাপে লাবণ্যকে কল্যাণী, বাসন্তী আর টগরের পর্যায়ে আনবে, আর তার পর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে লাবণ্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আমার মতন...পারবে না করতে ? লক্ষ্মীটি, শেষটুকু ট্র্যাজেডি করে দিও।

আবাব জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন ?

—ধরে নাও আমার শখ, আর কিছু নয়। একদিন আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাকো, আমিও যদি তোমার কোনদিন কোনও উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই। আর তা ছাড়া 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর'—এ কথাটা মানো তো ?

অতীতের সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই আজ। তবু বলতে পারি, দশ বছর ধরে এ-গল্প লেখবার জন্যে আমার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বন্ধুবান্ধবের কাছে কতবার গল্প করেছি—কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করে নি। কিন্তু মানুষের সংসারে

চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এত পরিবর্তন দেখেছি—এত অভাবনীয় বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে যে, তা বলা যায় না। তবু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখেছি আজো জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজো তো ফরমুলা মেনেই চলি। তাই সধবা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করতে হয়, বিধবা রমাকে কাশী পাঠাতে হয় আমাদের। তাই—বিশ্বাস করুন মিসেস চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতই গল্পটা শেষ করবো ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিতে পারলে আমিও আপনার মতই খুশী হতাম। তাতে গল্পটা 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর' এই সাধারণ প্রবাদ-বাক্যটারও একটা উদাহরণস্থল হয়ে থাকতো। জীবনে না হোক, সাহিত্যে অন্তত তাই-ই ঘটে! সেই জন্যেই তো বলছিলাম যে এ গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম।

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ চৌধুরী, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুরোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন পারলাম না, তারও একটা কারণ আছে বৈকি।

সেই কারণটা বলি। লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে আমার মাথা নিচু হয়ে এলেও আমাকে তা বলতেই হবে!

সেদিন কলকাতার বাইরে সি. পি.-র একটা কোলিয়ারী অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। একটা লাইব্রেরীর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি পদের ভার নিয়ে।

সভা হলো।

সভার শেষে ভিড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার মজুমদারের বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভারি অতিথিপরায়ণ। ছোট্ট বাঙলো। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ বোঝা গেল—গৃহের সর্বত্র গৃহিণীর একটা সুনিপুণ কল্যাণ হস্তের স্পর্শ লেগে আছে। চা পরিবেশন করতে লাগলেন মিসেস্ মজুমদার।

মিস্টার মজুমদার বললেন—মিসেস্ মজুমদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—ওই দেখুন আপনার সব ক'টা বই-ই কিনেছেন।

মিসেস্ মজুমদার, সলজ্জভাবে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পাশের আলমারিতে অন্যান্য বই-এর সঙ্গে ক'টা রয়েছে দেখে নিয়েছি আগেই।

মিস্টার মজুমদার আবার বললেন—এখানকার মহিলা-সমিতিটা ওঁরই তৈরী, আর

আজকে যে লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলো এ-ও ওঁরই চেষ্টায় বলতে পারেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সাজেস্ট করেন।

নিজের প্রশংসায় মিসেস্ মজুমদার যেন বড় লজ্জিত হচ্ছেন বলে মনে হলো।

হয়তো তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়লো। হঠাৎ চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো একটি পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। সুন্দর দেহশ্রী। ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। সভায় এই ছেলেটিই আমার গলায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে মার কোলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বললাম—এটি আপনার ছেলে বুঝি? কী নাম তোমার খোকা?

কাছে ডাকলাম তাকে।

ছেলেটি বিশুদ্ধ বাঙলায় বললে—নীলাব্জ মজুমদার।

—নীলাব্জ! বড় সুন্দর নাম দিয়েছেন তো।

মিস্টার মজুমদার এবারও স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেসে বললেন—এ নাম ওঁরই দেওয়া, ও নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে জানেন, আমাদের দুজনের নামের প্রথম দুটো অক্ষর নিয়ে ওর নাম হয়েছে নীলাব্জ।

ওঁদের দুজনের নাম জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাবিরুদ্ধে হবে কিনা ভাবছি।

মিস্টার মজুমদার নিজেই আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আর ওঁর নাম লাবণ্য কিনা—তাই থেকে নীলাব্জ। কিন্তু আপনি আর একটা সিঙ্গাড়া নিন—কি আর একটা সন্দেশ···

আমি কিন্তু ততক্ষণে নির্বাক হয়ে দেখছি। দেখছি মিসেস্ মজুমদারকে। এতক্ষণে তো নজরে পড়ে নি। তাঁর চিবুকের ওপরে ডান দিকে একটা কালো তিল জ্বল জ্বল করছে।

সাতাশে শ্রাবণ

শেষ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের পাত্তা পাওয়া গেল। বৈকুণ্ঠ আর বাড়ির ঠাকুর দু'জনে মিলে রাঁধলে কোনও অসুবিধে হবে না। ভাঁড়ার বার করে দেবে সুরুচি, সমস্ত দিকে তদারকও করবে সুরুচি। সুরুচি থাকতে আবার ভাবনা! সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নিবারণবাবুই প্রথম দুঃসংবাদটা শোনালেন কোর্ট থেকে এসে।

—কাল শুনলাম 'মিটলেস্-ডে' নাকি, মাংসই শুনছি পাওয়া যাবে না কাল। এখন যা ভাল বোঝ কর।

হতাশার ভঙ্গিতে কোটের গলার বোতামটা খুলে ফেললেন নিবারণবাবু।

সুরবালা যেন নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনেছেন এমনি স্বরে বললেন—তাহলে আর বৈকুণ্ঠ ঠাকুরকেই বা ডাকা কেন! মাছের কালিয়া, মাছের পোলাও ওসব আমাদের বাড়ির ঠাকুরই তো পারবে।

নিবারণবাবু তখন খালি গা হয়ে পাখার তলায় আরাম করছেন। বললেন—তাহলে বারণ করে দি বৈকুণ্ঠকে আসতে, বটু যাক তাহলে আজ রাত্রে বারণ করে আসুক। দু'টাকা বায়না নিয়েছিল, সেই টাকা দুটোই গচ্চা গেল।

সুরবালা ঝংকার দিয়ে উঠলেন—ওমনি রাগ হয়ে গেল, রাগের কথা কি বলেছি, মাংস যদি না পাওয়া যায় তো মাছই চার-পাঁচ রকমের করতে হবে। কমলার ছেলেরা মাংস খেতে ভালবাসে তাই মাংস মাংস করছিলাম।

সুরুচি ঘরে এল। বললে—বাবা মিষ্টির দোকান থেকে লোক এসেছে, বলেছি বসতে।

—বসুক, বলে নিবারণবাবু উঠলেন। তারপর কলঘরে যেতে যেতে থেমে বললেন—ক্ষীরকদম্ব বলে একরকম নতুন খাবার উঠেছে শুনছিলাম। কী জানি খেতে কেমন, দেব অর্ডার?—জিজ্ঞেস করলেন সুরবালাকে।

সুরবালা বললেন—তাহলে যে ন'রকম মিষ্টি হয়ে যায়, একটা ক্ষীরের খাবার ক্ষীরকান্তি তো রয়েছেই, আবার ক্ষীরকদম্ব! তা হোক, বছরে তো একটা দিন।

বছরে একটা দিন: সাতাশে শ্রাবণ!

এই সাতাশে শ্রাবণই সুরবালার মন্ত্র-দীক্ষা নেবার দিন। তিন বছর আগে হিমালয় থেকে গুরুদেব এসে সুরবালাকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যা করে আবার হিমালয়ে

চলে গিয়েছিলেন। প্রতি বছর সেই তারিখটি স্মরণ করার উপলক্ষ করে তাঁর গুরুদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানোই স্বরবালার উদ্দেশ্য। গুরুদেবের একটি ছবি টাঙানো আছে লক্ষ্মীর ঘরে। রোজ সেখানে ধূপ ধুনো দিয়ে প্রদীপ জেলে সন্ধ্যাবেলা জপ করেন স্বরবালা। প্রতি সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টা সময় ওখানেই কাটে স্বরবালার। আর সাতাশে শ্রাবণ হয় উৎসব—সেদিন গুরুদেবের ভোগ হয়—নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আত্মীয়স্বজনরা প্রসাদ পায়। সেই দিন বিভিন্ন তিনটি দেশ থেকে স্বরবালার তিনটি মেয়ে—ছেলেমেয়ে জামাইদের সঙ্গে নিয়ে স্বরবালার বাড়িতে আসে। ছ'বার ভালো করে উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবার তৃতীয় বার্ষিকী!

স্বরবালার আগেই ঘুম থেকে উঠে স্বরুচি কাজে হাত লাগিয়েছে। ঝি চাকর ঠাকুরকে তুলে দিয়েছে। উনুনে আগুন দিইয়েছে। বাবার দাড়ি কামাবার গরম জল, চায়ের জল, মায়ের চোখের ওষুধ, ছোট ঘড়িটাতে দম দেওয়া, স্নান, সব কিছু সেরে কাপড় বদলে কালকের উৎসবের আয়োজন করতে লেগে গেছে!

অতগুলো লোক আসবে, থালা গেলাস বাটি গুণে গুণে সিন্দুক থেকে বার করলে। করে কলতলায় ফেলে দিলে। বললে—এগুলো মেজে ফেলো তো লক্ষ্মীর মা, কাজের ভিড়ে কাল আর হয়ে উঠবে না।

তারপর কত কাজ স্বরুচির। তিন দিদির তিনটি ঘর সাজানো কি সোজা কথা! দরজায় পর্দা টাঙানো থেকে শুরু করে বালিশ বিছানা মশারি খাটানো।. বড় জামাইবাবু শৌখীন লোক। দেয়ালে ছ'চারখানা ছবি টাঙালে। জানালায় সবচেয়ে বাহারি পর্দা ঝুলিয়ে দিলে। দরজার চৌকাঠে একটা ভালো কার্পেট পেতে দিলে। বড়দি স্বরুচিকে খুব ভালবাসে। সেবারে যখন এসেছিল তখন তার জন্যে একটা বেনারসী সিল্কের থান এনেছিল।

স্বরবালা ঘরে ঢুকে বললেন—হ্যাঁ মা, কত খাটছিস তুই, কিছু মুখে দিসনি তো?

স্বরুচি বললে—চা তো খেয়েছি মা।

—আমি গুরুদেবকে রোজ তোর জন্যে বলি, উনি তো সবই দেখতে পান, দেখবি তোর ভালো করবেন উনি। এই যে তাঁকে সেবা করছিস এতে তিনি তোর মঙ্গল করবেন!

স্বরুচি বললে—তা'হলে দক্ষিণের ছ'টো ঘরই মেজদি আর ছোড়দিদের দিই?

—ওমা, তুই তাহলে কোথায় শুবি? উত্তরের ঘরে? ওঘরে পাখা নেই যে মা, গরম হবে না?

—তা হোক, ওরা দু'দিনের জন্যে এসে কেন কষ্ট করতে যাবে···মেজদির চাদরটা একটু ময়লা হলো, তা হোক গে, কী বল মা ?

সুরবালা বলেন—কাল এক স্বপ্ন দেখলুম মা, যেন গুরুদেব এসেছেন, এসে আমার চোখ দু'টো চেপে ধরলেন, চেপে ধরতেই—কী বলবো মা, যেন চারদিক আলোয় আলো হয়ে গেল, দেখলুম গুরুদেব নেই, তাঁর বদলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে স্বয়ং নারায়ণ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি তো মা আনন্দে প্রণাম করতেই ভুলে গেলুম। মূর্ছা যাচ্ছিলুম, হঠাৎ গুরুদেব চোখ দুটো ছেড়ে দিলেন, দেখি আমার গুরুদেব আবার আমার সামনে বসে হাসছেন। বললেন—চিনলি আমাকে ?

সুরুচি বললে—মেজদিদির একটা বালিশ কম পড়ছে কিন্তু, আমার বালিশটাতেই মেজদি শোবে'খন। আর ঘরে লোক না থাকলে কি ঘরের শ্রী থাকে, কী বলো মা ? কতদিন এ সব ঘরে ঢোকা হয়নি, ভূতের রাজ্য হয়ে আছে—বলে সুরুচি ঝাঁটা নিয়ে ঝুল ঝাড়তে লাগলো।

কমলার বর লখ্‌নৌর উকিল। তাদের গাড়ি আসবে সকাল ছ'টায়। বিমলার বর থাকে পাটনায়—সে ডাক্তার। তাদের গাড়ি আসবে ন'টার সময়। তারপর অমলার বর থাকে মালদ'য়—জমিদার। তারা আসবে বেলা এগারোটায়।

সুরবালার সকালের জপ শেষ হয়েছে। এবার জলযোগ করে পাঠ আরম্ভ হবে। মোহন কথক রোজ এসে ভাগবত গীতা পাঠ করেন। কোনও কোনও দিন পাড়ার দু'একজন বুড়ি এসে জড়ো হয়। কথা শুনতে শুনতে সুরবালার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। যতবার এক একটা অধ্যায় শেষ হয়, আর সুরবালা ততবার গলায় আঁচলটা দিয়ে গুরুদেবের ছবির তলায় মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করেন।

সুরুচি এসে বলে—মা, বাজারে রুই মাছ পায়নি, ইলিশ মাছ এনেছে। কি করবো ?

সুরবালা যেন বিরক্ত হন, বলেন—ওসব লক্ষ্মীর মা যা ভালো বোঝে করবে'খন। তুই একটু আয় না মা, বসে দু'টো কথা শোন না, তোর কেবল সংসার আর সংসার !

সুরুচি ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে ঠাকুরকে বকতে শুরু করেছে—তোমার আক্কেল-খানা কী ঠাকুর, আঁশের উনুনে তুমি নিরামিষ কড়াটা কী বলে চাপালে ? তুমি কি আজ নতুন মানুষ এলে এ-বাড়িতে ?

তারপর উঠোনের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীর মাকে বলে—তুমি বাপু ওই কাচা কাপড়ে

নর্দমা পরিষ্কার করছো, আমি কিন্তু ও-কাপড়ে তোমাকে শিল ছুঁতে দেব না। মা'র না হয় এসব দিকে নজর নেই, কিন্তু আমি তো কানা হইনি।

সমস্ত দিকে নজর না রাখলে কী চলে ? বাবাকে খাইয়ে দাইয়ে কোর্টে পাঠিয়ে সুরুচি বাবার ঘরটা পরিষ্কার করতে গেল।

বিছানা, টেবিল, আলনা গুছোতে গুছোতে সুরুচি পুরনো চিঠি-পত্রের বাক্সটাও গুছোতে বসলো। অনেকদিনের অনেক বাজে চিঠি জমে অকারণে ভারি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ঢুকে লুকলো কোথাও। পেছন ফিরে দেখে—না, তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নাতে। সুরুচির বহুদিনের আগের কথা মনে পড়াতে ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

চেয়ারের ওপরে উঠে আলমারির মাথাটা পরিষ্কার করলে। কয়েকটা লাল রঙ-এর চিঠি বেরুল, সুরুচির বিয়ের চিঠি। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললো সেগুলো। যত সব বাজে জঞ্জাল !

তারপর মতিলালকে ডাকলে। বললে—বালতি করে জল নিয়ে আয়, আর ঝাঁটা নিয়ে আয়, ঘর ধুতে হবে।

দু'জনে মিলে তারপর সমস্ত ধোয়া, মোছা, ঝাড়া, সে এক কাণ্ড।

সুরবালা দেখে বলেন—এ কী কাণ্ড মা তোর ? আমি গুরুদেবকে কাল তাই বলছিলাম—আমার রুচির কষ্ট আর আমি দেখতে পারিনে বাবা। গুরুদেব বললেন —ওকেও দেব দীক্ষা। সেবার আমার সঙ্গে একসঙ্গে দীক্ষা নিলে কেমন হতো বল দিকিনি। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে—আহা মা আমার।

সুরুচি বলে—তুমি সরো দিকি এখান থেকে, আমি এত কষ্ট করে ধুচ্ছি আর আর তুমি কাদা পা দিয়ে সব নোংরা করে দিচ্ছ।

সমস্ত দিন ধরে আয়োজন করেও মনে হয় কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গেল। গুরুদেব ফুল ভালবাসেন, দশ টাকার ফুলের মালার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পাঠককে বলা হয়েছে তিনবার গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে—একবার সকাল ছ'টায় আর একবার ন'টায়, আর শেষবার এগারটার সময়।

প্রথম দু'বার হাওড়ায়, শেষবার শিয়ালদ'য়।

অনেক রাতে সমস্ত কাজ সেরে বিছানায় শুয়েও শান্তি নেই সুরুচির। কত ভাবনা ! ভাঁড়ার ঘরের তালাটা বন্ধ করে একবার টেনে দেখেছে তো ? পেছন দিকে বারান্দার আলোটা নিবিয়েছে তো ? ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করা হয়েছে তো ? তারপর ভোরবেলা মতিলালকে পাঠাতে হবে একঘড়া গঙ্গাজল আনতে,

পাঠক হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরবার পথে কলাপাতা আর ফুলের মালাগুলো নিয়ে আসবে, সুখলালের দোকানে মিঠে পানের অর্ডার দেওয়া হয়েছে—সে কি আর সকালবেলা পাওয়া যাবে! কত ভাবনা সুরুচির!

সুরুচির ডাকাডাকিতে সুরবালার ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলা।

আজ সত্যিই অনেক কাজ সুরবালার। এখনি স্নান করতে হবে, করে গরদের শাড়ি পড়তে হবে। পরে নিজের হাতে গুরুদেবের জন্যে ভোগ রাঁধতে হবে। নিজের হাতে ভোগ রেঁধে তিনি পূজোর ঘরে ঢুকবেন, ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবেন। সকাল থেকে শুরু করে গুরুদেবকে ভোগ দেওয়া পর্যন্ত কোনও পুরুষের মুখ দেখা নিষিদ্ধ। এমন কি নিবারণবাবুও নাকি সামনে থাকতে পারবেন না।

সুরবালার আজ কেবলই ভয়—কখন বুঝি ত্রুটি হয়ে যায়! বর্ষাকাল—ঝম্ ঝম্ করে দিনরাতই বৃষ্টি লেগে আছে। তবু মুখে বলছেন—তাঁর কাজ তিনিই দেখছেন, আমি তো উপলক্ষ মাত্র।

সুরুচি ঘুরে ঘুরে একবার মাকে সাহায্য করছে, একবার ভাঁড়ার দেখছে আর একবার সমস্ত বাড়িটার কোথায় কী হচ্ছে দেখে বেড়াচ্ছে।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর পাকা লোক। এসেই শুনেছিল মাংস পাওয়া যাবে না। তারপর নিজেই বেরিয়ে কোথা থেকে পাঁচ টাকা সের দরে মাংস নিয়ে এসেছে।

ভাঁড়ার ঘরে এসে বলে—খুকিদিদি, এক সের আদা চাই।

দুটো বড় বড় মাটির উনুনে রান্না হচ্ছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আরো দু'জন সহকারী নিয়ে সেখানে আগুনের তাতে বসে ঘামছে।

পাঠক স্টেশন থেকে খালি গাড়ি নিয়ে ফেরত এল। বললে—খুকিদিদি ছ'টার গাড়িতে বড় দিদিমণিরা আসেননি।

সুরবালা রাঁধছিলেন। শুনে বললেন—তখনই জানি, ওরা আসবে না, কমলাই যদি না আসবে তাহলে কার জন্যই বা এত আয়োজন, কার জন্যেই বা কী?…যাক্, আমি কে—তাঁর কাজ তিনিই দেখবেন।

সুরুচি বলে দিলে—ন'টার গাড়িতে মেজদি'মণিদের আনতে যেও আবার। দেখ, আসবার সময় সুখলালের দোকান থেকে মিঠে পান আর বাজার থেকে ফুলের মালা আনতে ভুলো না।

বড় বড় রুই মাছ এসে উঠোনে পড়েছে। দু'জন জেলে-বৌ বড় বড় বঁটি নিয়ে মাছ কুটছে। সুরুচিকে দেখে একজন বলে—ও খুকিদিদি, এই মাছের দাগাটুকু নিচ্ছি আমার মেয়ের জন্যে—বলে এক টুকরো মাছ নিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখালে।

মাংস রান্নার তীব্র গন্ধ এসে সুরুচির নাকে লাগলো। সেই গন্ধে সমস্ত শিরা উপশিরা তার শিথিল হয়ে এল। পেঁয়াজ, রসুন বাটা হচ্ছে তাল তাল। এক একটা তরকারী রান্না হচ্ছে আর পাত্র করে তুলে এনে রাখছে ভাঁড়ারের ভেতর। একটা নিরামিষ ভাঁড়ার, একটা আঁশের একটা মিষ্টির। মিষ্টির ভাঁড়ারে কলাপাতা, মাটির গেলাস, কুশাসন জড়ো হয়েছে। তিনটে ভাঁড়ারের চাবি নিয়েছে সুরুচি নিজের কোমরে।

—ওমা, সুরুচি, পুজোর ঘরের দরজাটা খুলে দে মা।

একটা ভোগ রান্না হয়েছে। সুরুচি পুজোর ঘরের শেকলটা খুলে দিলে। গঙ্গাজল দিয়ে সমস্ত ঘরটা সুরবালা নিজের হাতে ধুয়েছেন। এক একটা ভোগ রান্না হবে আর এই ঘরে এনে তুলতে হবে। ঘরের ভেতর একটা পেতলের প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে। ফুলের মালা এলে গুরুদেবের ছবিটা একেবারে ফুলে ফুলে ঢেকে যাবে। ধুপ-ধুনোর গন্ধ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। একটা চন্দনকাঠের বাক্সের ভেতরে ভাগবত-গীতা সাজানো আছে। কড়িকাঠে একটা ইলেট্রিক পাখা ঝুলছে। চার দেয়ালে চারটে বড় বড় আয়না, একটা তাকে একটা লক্ষ্মীর সিঁদুর-চুবড়ি। মাথার ওপর ধানের শুকনো শিষ ঝুলছে। একপাশে জলচৌকির ওপর আলপনা দেওয়া। তাতে রুপোর পঞ্চপ্রদীপ, ধুপদানি আর দুটো রুপোর হাণ্ডেল-দেওয়া সাদা চামর আর তারই একপাশে পঞ্চমুখী শাঁখ একটা। ফল কেটে নৈবেদ্য সাজিয়ে আগেই রাখা হয়েছে জলচৌকির সামনে। একটা পেতলের কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল।

বৈকুণ্ঠ এসে বলে—ও খুকিদি, পোলাও-এর চাল বার করে দাও, আর আখ্‌নির জলের মসলা আর নতুন কাপড় এক টুকরো।

লোকজন এখনও এসে জড়ো হয়নি। এরি মধ্যে জলে-কাদায় প্যাচ-প্যাচ হয়ে গেল সারা বাড়ি। লক্ষ্মীর মাকে ডেকে বললে—নতুন ঝিকে দিয়ে একবার জায়গাটা মুছিয়ে নাও না লক্ষ্মীর মা, পিছলে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে।

তারপর নতুন 'ঠিকে' লোকদের বললে—তোরা এবার চা-জলখাবার খেয়ে নে। চা চিনি দুধ দিচ্ছি, বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের কাছে চা তৈরী করে নে; আর এক এক টুকরো কলাপাতা নিয়ে সব বোস দিকিনি, মিষ্টি দিচ্ছি।

বাইরে মোটরের শব্দ হলো। মেজ মেয়ে বিমলা, মেজ জামাই, নাতি-নাতনি এসে হাজির।

নিবারণবাবু খবর পেয়ে নিচে এলেন। সুরুচি এগিয়ে গিয়ে জামাইবাবুর পায়ে

হাত দিয়ে প্রণাম করলে। প্রণাম করা-করির পালা শেষ হলে নিবারণবাবু বললেন—চল চল, সব ওপরে চল।

বিমলা বললে—কি রে রুচি, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন!

সুরুচি বলে—তা বলে তোমার মত মোটা হবো নাকি কেবল?

বিমলা বলে—সত্যি ভাই কী মোটাই হচ্ছি! তোর জামাইবাবু ডাক্তার হলে কী হবে। হ্যাঁ রে, তোদের এখানে আজকাল কী সিনেমা হচ্ছে রে?

—কী জানি বাপু, সিনেমার খবর রাখিনে। তা, এসেই একেবারে বায়স্কোপ যাওয়া! এতদিন পরে এলে, একটু গল্প-টল্প কর।

বিমলা বলে—না বাপু, গল্প-টল্প পরে অনেক হবে'খন। চান করে ভাত খেয়ে নিয়েই বেরুব—কতদিন বেরুতে পাইনি।

খানিক পরে ট্যাক্সি করে বড় মেয়ে কমলারা এলো।

বলে—ট্রেন ফেল করে এই দুর্গতি। কোথায় রে, বাবা কোথায়, মা কোথায়, ওমা কী রোগা হচ্ছিস তুই দিন দিন···বিমলা অমলা ওরা এসেছে?

তারপর বলে—উঃ, ট্রেনে কী ভিড় ভাই, কোমর ফেটে গেছে বসে বসে। আমি বাপু আজ কোনও কাজই করতে পারবো না। আমি কেবল বসে বসে তরকারি

বিমলা খবর পেয়ে এল—ওমা বড়দি, কখন এলে? আমরাও এই এলুম। রুচিকে এসেই তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম, কানের এটা কবে করালে দিদি, বেশ হয়েছে, একটা কঙ্কণ গড়াতে দিয়েছিলুম, আসবার সময় সেকরা বেটা দিতেই পারলে না, ছ'গাছি করে এই বেঁকি গড়িয়েছি এবার; মেড়োর দেশে এই-ই নতুন ডিজাইন।

পাঠক ফুলের মালা আর খিলি পান নিয়ে এসেছে। ফুলগুলো মাকে দিয়ে এল।

সুরুচি দেখলে মার কোনও দিকে নজর নেই। ভোগ সব রান্না হয়ে গেছে। পুজোর ঘরে থরে থরে সাজিয়েছে। সুরবালা ফুলের মালা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন; খুলবেন দুপুর বারোটার পর।

ছোড়দিরা এসে গেল সাড়ে এগারোটায়, এসেই বললে—হ্যাঁ রে, বড়দি সেজদি ওরা এসেছে?—বলেই উঠে গেল ওপরে।

দোতলায় দিদিদের ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি চালিয়েছে—দুপদাপ শব্দ সুরুচির কানে এল। সমস্ত ব্যবস্থাই ওদের ঠিক করে রেখেছে সুরুচি। বাথরুমে তোয়ালে, গামছা

সাবান, তেল, দাঁতমাজা, সব—সব! কতদিন পরে বাপের বাড়িতে এসেছে। ওদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুরুচিরই তো দেখা উচিত।

তিন বোনের কত কাপ চা লাগবে হিসেব করে চা তৈরি করে দিয়ে এল।

কমলা বললে— তোর জন্যে কী এনেছি দেখলি না রুচি?

—আসছি বড়দি, ওদের ঘরে চা দিয়ে আসি। বলে সুরুচি মেজদির ঘরে এল। মেজদিরা স্নান সেরে কাপড় বদলেছে। মস্ত বড় একটা ট্রাঙ্ক খুলে কাপড়চোপড় জিনিষপত্তর গুছোচ্ছে। সুরুচিকে দেখে মেজদি বললে—দেখতো রুচি, কোন্ কাপড়টা পরি। তোরা বাপু শহরে থাকিস্, কোন্‌টা ফ্যাশন কোন্‌টা ফ্যাশন নয় তোরাই ঠিক বলতে পারিস।

মেজদিরা সিনেমায় যাবে, তারই আয়োজন হচ্ছে। ট্রাঙ্ক ঝেড়ে একগাদা পোশাকী কাপড় বার করে দিলে মেজদি। বললে— দে ভাই, তুই একটা বেছে দে।

তারপর বললে—আর ভাই, সেবার এসে যতগুলো ব্লাউজ তৈরি করে নিয়ে গেলাম সব ছোট হয়ে গেল, একেবারে নতুন রয়েছে, কিন্তু একটাও গায়ে হয় না।

—হ্যাঁ রে এ শাড়িখানা কেমন বলতো? আশী টাকা দিয়ে কিনেছি এবার!

মেজদির শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না, সব সুরুচিকে দেখতে হলো। তারপর এলো ছোড়দির ঘরে।

ছোড়দি বললে—হ্যাঁ রে রুচি, গাড়িটা এখন একবার দিতে পারবি ভাই, আমার এক ননদ থাকে শ্যামবাজারে, একবার দেখতে যাবো ভাবছি।

তারপর সুরুচির সঙ্গে একান্তে অনেক কথা হলো ছোড়দির—আসবার সময় শাশুড়ী বললে—বৌমা যাচ্ছো, আমার তো শরীরের এই অবস্থা, কাজ হয়ে গেলেই চলে আসবে। আমি ভাই বছরের মধ্যে এই একবার যা বেরুতে পাই, তা-ও বেরুতে দেবে না শাশুড়ী মাগী। তুই ভাই বেশ আছিস রুচি…

তারপর আবার বললে—পর পর তিনটে মেয়ে হয়েছে, উঠতে বসতে শাশুড়ীর কথা শুনতে হয়। বলেন—পাড়ার কত বৌ-ই দেখছি, তোমার মতন এমন মেয়ে-বিউনি দেখিনি আমার জন্মে, স্বর্গ থেকে এক ফোঁটা জল পাবে না পূর্বপুরুষরা, আমি বেঁচে থাকতে এ-ও দেখতে হবে চোখ মেলে। তুই বেশ আছিস ভাই রুচি, বেশ আছিস।

সুরুচি আবার বড়দির ঘরে এলো।

বড়দি বললে—আসবার সময় তোর জন্যে কী নিয়ে আসি ভেবে ভেবে অস্থির আমরা।

সুরুচি বলে—বারে, আমার জন্যে আনতেই হবে তার কি মানে আছে ? আমার তো সবই আছে।

—তা সে কত দোকানই ঘুরলাম, কেবল এনামেল করা পানের কৌটো, জর্দার কৌটো, গয়নার বাক্স, নয়ত সিঁদুর কৌটো—আর আছে সব খেলনা আতরদান, সুর্মাদান। তোর জামাইবাবু আর আমি বাজারে ঘুরে ঘুরে হয়রান।

সুরুচি হাসলো।

—শেষকালে এই গরদের থানটা নিলুম। একটা চাদর হবে, একটা কাপড় করবি। তোর তো আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার আছে! কেমন হয়েছে রে, পছন্দ হয়েছে তো ?

সুরুচি থানটাকে বুকে তুলে নিয়ে বড়দির পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল। বড়দি ডান হাতে সুরুচির গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কোলে টেনে নিলে—ছি ভাই, পায়ে হাত দিতে নেই। তোর কথা সেখানে বসে কত যে ভাবি, তুই তার কী বুঝবি। আমরা চার বোন, চার বোন চারদিকেই তো চলে গিয়েছিলাম, বাবা মা'র কাছে থাকবার কেউ ছিল না, হঠাৎ তুই ফিরে এলি। বাবা মা'কে দেখবার তবু একজন লোক হোল। কিন্তু যেদিন খবরটা শুনলুম, সারাদিন কেবল হা হা করে বুকের মধ্যে হাহাকার উঠেছে।

সুরুচি বললে—আমি উঠি বড়দি।

—কেন, কী এত কাজ, একটু বোস না, সকাল থেকে তো আজ কিছুই খাসনি, আজ সারাদিন তো তোর উপোস। মা'র উৎসব, তা তোর এ উপোস কেন বলতো রুচি ?

—আমি উঠি বড়দি,···ওদিকে কী যে হচ্ছে কে জানে।—ধড়ফড় করে উঠলো সুরুচি।

যা ভেবেছে তাই। কলাপাতাগুলো আধোয়া পড়ে রয়েছে, কাক উড়ে এসে রান্নার জলে মুখ দিয়েছে, বাসন মেজে এনে জলসুদ্ধ বাসন রেখে দিয়েছে ঝি, বলবার কেউ নেই বলে মোছা হয়নি। নিজে না করলে কোনও কাজটা যদি হয়! পরের ওপর আবার ভরসা।

এখনি মা বেরুবে পুজোর ঘর থেকে। দিদিদের ছেলেমেয়েরা খেতে বসবে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর রান্না মোটামুটি সব শেষ করে এনেছে।

বড়দি এল নিচে, বললে—কিছু কাজ থাকে তো দে, বসে বসে করি।

সুরুচি বললে—তুমি কেন কাজ করতে যাবে বড়দি, এসেছ একদিনের জন্যে।

—একদিনের জন্যে এসেছি বলেই তো কাজ করবো। ওরা কোথায় রে, বিমলা, অমলা—

—মেজদি সিনেমায় যাচ্ছে আর ছোড়দি যাবে শ্যামবাজারে ওর ননদের বাড়ি। বড়দি তুমি ওঠ, এখানে আমি ছেলেমেয়েদের খাবার জায়গা করি।

—ও খুকি, খুকি রে—ওপর থেকে নিবারণবাবু ডাকলেন সুরুচিকে।

ওপরে গিয়ে সুরুচি দেখে—বাবা একেবারে অসহায়, কলমে কালি ফুরিয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা ঘরের মধ্যে বই কাগজ খুলে নিবিষ্ট মনে লিখতে লিখতে হঠাৎ কলমের কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল। সুরুচি না থাকলে নিবারণবাবুর কলমে কালি যে কে দিত সে একটা ভাবনার বিষয়!

—রুচি, রুচি—মা ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েছেন।

—যাই মা—বলে নিচেয় নেমে এল এক দৌড়ে।

—এই সব প্রসাদ ঘরে তোল মা, বাইরে কোন অসুবিধে হয়নি তো···বিমলা, কমলা, অমলা এসে পড়েছে সব? কেমন আছে সব, ভাল? কর্তা ডাকছিলেন কেন? বছরে একটা কাজের দিন, তা-ও একটু ফুরসুৎ নেই, কলমে বুঝি কালি ফুরিয়েছিল?

সুরুচি সব প্রসাদ ভাঁড়ারে তুলে চাবি তালা দিয়ে দিলে।

বিমলা এল। বললে—মা আমরা এসে পড়েছি—

নিচু হয়ে তারা পায়ের ধুলো নিলে।

মা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন—এই' রুচিকে এখনি তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। এই দেখ মা, গুরুদেবের আশীর্বাদে সব কাজই তো নির্বিঘ্নে হচ্ছে, এখন কী জানি কী তাঁর মনে আছে। সবই তো তাঁর ইচ্ছে।

তারপর আবার বললেন—গুরুদেবকে তাই বলেছিলাম আমার কোন সাধই তো অপূর্ণ রাখনি বাবা, একটা শুধু কষ্ট আছে মনে, আমার মা রুচির মনে সুখ দিও। তা জানিস বিমলা, গুরুদেব রাজি হয়েছেন, বলেছেন ওকেও দীক্ষা দিয়ে আসবো। এখন ওর কপাল।

সুরুচি বললে—মা এবার তুমি জল খেয়ে নাও।

সমস্ত কাজই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। সুরুচির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেকটির দিকে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা হবার উপায় নেই। কিন্তু বিকেল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সমস্ত পণ্ড করে দেবার জন্যে আকাশে মেঘ করে এলো। তারপর ঝড় উঠলো—তারপর এলো বৃষ্টি।

সে এক প্রলয় কাণ্ড! এমন বৃষ্টি বোধ হয় কত বছর হয়নি, আর দিন বুঝে কিনা আজই হলো।

সুরবালা বললেন—কি হবে মা রুচি?

আকাশ বাতাস ভেঙ্গে যেন বৃষ্টি নামছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের উনুনের ওপর ত্রিপল ছিঁড়ে হুড়হুড় করে জল পড়তে শুরু হলো। রান্না বন্ধ। বর্ষাকালের উৎসব, যথাবিহিত চারিদিকে ঢাকা হয়েছিল মজবুত করে। কিন্তু হাওয়ার যা প্রবল ঝাপটা, বৃষ্টির যা ভীষণ বেগ, সমস্ত কোথায় ওলটপালট হয়ে গেল। বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের দলবল আটা, ময়দা, ঘি, তেল নিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলে। বৈকুণ্ঠ বললে—কাজের বাড়িতে অনেক বৃষ্টি দেখেছি খুকিদিদি কিন্তু এমন বৃষ্টি কখনও দেখিনি।

সামনের রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল।

আটটা বাজলো। এখনি তো সব লোক আসবার সময় হয়েছে—কিন্তু বুঝি সব পণ্ড হলো।

সুরবালাই সবচেয়ে চিন্তিত হলেন। এ কি করলে গুরুদেব! আমি কী অপরাধ করেছি যে এমন করে সমস্ত পণ্ড করে দিলে।

বৃষ্টি যে ছাড়বে কখনও, আকাশ দেখে এমন আভাস পাওয়া গেল না। মেজদি'রা দুপুরবেলাই বায়স্কোপ দেখে এসেছে। ছোড়দি'রা শ্যামবাজার থেকে বৃষ্টির জন্যে আসতে পারেনি।

বাড়ির সামনে রাস্তায় এমন জল জমেছে যে গাড়ি চলতে পারছে না।

নিবারণবাবুর কোর্টের কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাঁদের জন্যে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর এসে বললে—যে-রকম বৃষ্টি, তাতে আজ ছাড়বে বলে তো মনে হচ্ছে না! রান্নাঘরের মধ্যে নতুন উনুন পাতি, কী বল খুকিদিদি?

ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুরুচি চুপ করে দেখছিল সব! সকাল থেকে এত পরিশ্রম করে, এত তদারক করে, শেষকালে কি এখন সমস্ত নষ্ট হবে? প্রায় আড়াই শ' লোকের আয়োজন হয়েছে; মা, দিদিরা, বাবা, সবাই সুরুচির মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত ভাবনা ও দায়িত্ব তার ওপর ফেলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত তারা।

হঠাৎ কিন্তু এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো।

বৃষ্টি থেমে গেল। আর হঠাৎ এক সময় সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আকাশে তারা উঠলো, যেন সমস্ত এক যাদুকরের ইঙ্গিতে সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। রাস্তায় জল কমে গেছে। নিবারণবাবুর বন্ধুরা এসে গেলেন। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আবার রান্না চাপালে। একে একে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা এসে হাজির হলেন।

স্বরুচি ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সমস্ত তদারক করছিল; কার ড্রাইভারের খাবার দিতে হবে, কে শুধু মিষ্টি খাবে, কে নিরামিষ, আর ময়দা মাখতে হবে কি না, কত লোকের খাওয়া হলো, এখনও কত লোক বাকি—

—খুকিদিদি, ময়দা আরো দু'সের দিতে হবে আর পাঁপড় সেরটাক।

—ও খুকিদিদি, বাগবাজার থেকে সতীশবাবুর বাড়ির মেয়েরা এসেছে, ওদের গাড়িভাড়াটা—

—বড় মাসিমার ছেলের জন্যে একটা মিষ্টি দাও তো খুকিদিদি, বড় কাঁদছে···

ছোড়দি'র মেয়ের দুধ গরম করা, অনেকদিন পরে ছোট পিসিমা এসেছেন, একবার ডাকছেন স্বরুচিকে, তাঁকে প্রণাম করে আসা—

রাত্রি দশটা বাজলো, একটু যেন পাতলা হোল ভিড়। একে একে সব বিদায় নিচ্ছে। স্বরুচি এবার সকলকে তাড়া দিতে লাগলো। রাত কি বারোটা করবে নাকি সবাই?

স্বরবালা এলেন, বললেন—দেখলি মা, গুরুদেবের আশীর্বাদে কিছুই তো আটকালো না, সবই তাঁর ইচ্ছে···হ্যাঁ মা তুই কিছু খাসনি? যা এবার শুগে যা, আমরা দেখছি সব।

কিন্তু তবু যাব বললেই যাওয়া হয় না স্বরুচির। ঠাকুরদের খাবার দিয়ে ঝি-চাকরদের বসিয়ে বাড়ির সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ করে স্বরুচি উঠলো। এবার এই প্রথমে সে নিজের ঘরে ঢুকবে। কত তার কাজ এখন। স্বরুচির সমস্ত শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। ঘরে ঢুকে স্বরুচি দরজায় খিল দিয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে আবার উঠে পড়লেন স্বরবালা। চোখে ওষুধ দেওয়া হয়নি।

সুরবালার চোখের ওষুধ থাকে আলমারির ড্রয়ারে, তার চাবি থাকে সুরুচির আঁচলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর উঠতে আর ইচ্ছে করে না। তবু উঠতে হলো সুরবালাকে। উঠে আলো জ্বালালেন না, নিবারণবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। বারান্দায় এসে প্রথমে পড়ে কমলার ঘর। আলো নিবে গিয়েছে সে ঘরে। তারপর মেজ মেয়ে বিমলার ঘর। ওদের ঘরেও আলো নিবেছে। কিন্তু তখনও মেজ মেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে, ওরা জেগে আছে এখনও। তারপর সেজ মেয়ে অমলার ঘর। সে ঘরেও আলো জ্বলছে এখনও, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। তিন মেয়ের ঘর পেরিয়ে তিনি এলেন উত্তর দিকের ছোট মেয়ে সুরুচির ঘরে। সুরুচির ঘরের দরজা বন্ধ। আস্তে আস্তে দরজা ঠেললেন সুরবালা। সাড়া পেলেন না। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশ্চিমের বারান্দা দিয়ে সুরবালা জানালার কাছে এলেন। জানালা ঠেলতেই খুলে গেল।

সুরবালা দেখলেন আলো জ্বলছে! তারপর ভেতরে চেয়ে যা দেখলেন তা'তে সুরবালা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চমকে উঠেছেন।

সুরুচি একখানা বেনারসী শাড়ি পরেছে। সারা গায়ে পরেছে গয়না, মাথায় সিঁথি, হাতে চুড়ি, কঙ্কণ, কানে দুল আর সিঁথিতে দিয়েছে আগুনের মত উজ্জ্বল সিঁদুর। বিয়ের সময়কার সমস্ত অঙ্গাবরণ তার গায়ে। সুরুচি যেন নববধূ সেজেছে—যেন নতুন করে তার বিয়ে হচ্ছে আজ!

সুরবালা নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন।

সুরুচি তাঁর মেয়ে। তাকে যেন এতদিন চিনতেই পারেননি সুরবালা। আজ নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন নতুন এক সুরুচিকে। সুরুচি যেন আজ তার নতুন করে দৃষ্টি ফুটিয়ে দিয়েছে!

স্বামীর ছবিটা সুরুচি নিয়েছে বুকে। বুকে নিয়ে সুরুচি তার বিছানায় শুয়ে আছে। সুরবালার দু'চোখ জ্বালা করতে লাগলো। তাঁরই পেটের মেয়ে সুরুচি···সমস্ত দিনের বেলার সুরুচির সঙ্গে এ সুরুচির কত প্রভেদ।

ছবিটাকে বুকে রাখলে সুরুচি, মুখের ওপর রাখলে, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো। একে একে সমস্ত গয়না খুললে। কানের দুল, হাতের চুড়ি—বেনারসী বদলে পরলে সাদা থান একটা, সিঁথির সিঁদুর ঘষে ঘষে মুছে ফেললে।

সুরবালা দেখলেন, সুরুচি সেই নিরাভরন শরীরে স্বামীর ছবিটি সাজিয়ে রাখলে মেঝের এককোণে একটা জল চৌকির ওপর। সেখানে আলপনা দিয়েছে বিচিত্র

করে, ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, ধুপ জ্বাললে, প্রদীপ জ্বাললে। স্থরুচি উঠে বসে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সেইদিকে, গভীর ধ্যানমৌন মূর্তি তার···সে যেন এ-জগতের সমস্ত মায়া সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। স্থরবালার মনে হোল যেন স্থরুচি মূর্ছা গেছে, আর উঠবেনা।

জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন স্থরবালা—ও রুচি, মা আমার।

দরজা খুলল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্থরবালা আর স্থরুচি—আর মাঝখানে একটি দোদুল্যমান মুহূর্ত! একটি মুহূর্তের ব্যবধান! মার মুখের দিকে চেয়ে স্থরুচি হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে স্থরবালার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্থরবালা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

—মা আমার, সোনা আমার—স্থরবালার মুখ দিয়ে সান্ত্বনার ভাষা আর বেরুল না···স্থরবালার চোখ দু'টো শুধু জ্বালা করতে লাগলো।

স্থরবালার মনে ছিল না—স্থরুচির হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর ঘুচেছিল সাতাশে শ্রাবণ। তাঁর গুরুদেবের উৎসব আর স্থরুচির সর্বনাশ—সে যে একই তারিখে, সে কথা স্থরবালার কেমন করে মনে থাকবে।

আশুকাকা

আশুকাকা তিনদিন আমার খোঁজে বাড়িতে এসেছিল এবং তিনদিনই আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে।

কথাটা শুনেছি বাড়ির লোকদের কাছ থেকে কিন্তু বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করি নি। আশুকাকাকে যারা জানে তারা বলতে পারে যে, আশুকাকার এই দেখা করতে আসা আমার কোনও উপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তবু এমন একটা চরিত্র আমাদের আশুকাকা, যার সান্নিধ্য বিশেষ পীড়াদায়কও নয়। আশুকাকার দাবী সামান্য। একটু খাতির একটু মাতব্বরি করতে দেওয়া বা বড় জোড় টাকাটা সিকেটা।

আমাদের দেশে এখন জানাশোনা বলতে কেউ নেই। আশুকাকাও আর সকলের মত একদিন চলে এসেছে সপরিবারে। খবর পেয়েছি অন্য সূত্র থেকে

কোন এক বস্তিতে আছে আশুকাকা সস্ত্রীক। সারাজীবন কোনও চাকরি বা কোন অর্থোপার্জন করে নি আশুকাকা। দরকার হলে তিন ক্রোশ দূরের কাছারিতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এসেছে, বিয়ে বাড়িতে কোমর বেঁধে পাঁচ শো লোক খাওয়ানোর ভার নিয়েছে, বারোয়ারিতলায় বসে সারারাত যাত্রার আসরে কলকে পুড়িয়েছে। অর্থাৎ আশুকাকা এমন একজন লোক যে বরাবর সশব্দে বেঁচে থেকেছে—চারি দিকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়িয়েছে।

অথচ, সেই সদম্ভ আত্মঘোষণা করবার অধিকারই যেন আছে আশুকাকার।

যতদিন গ্রামে ছিল আশুকাকা, যখন ছুটিতে দেশে গেছি, দেখেছি একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নয়, ব্যতিব্যস্ত। হন হন করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আশুকাকা।

বলি—আশুকাকা, কোথায় চলেছ ?

—কে ? নবনী ? যাচ্ছি একবার ছিন্নাথপুর, ওখানে মল্লিকদের পুকুরের তলায় নাকি গাজনের শিব উঠেছে। যাই দেরি হয়ে গেল।—বলে হন হন করে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর একদিন ওমনি।

—কোথায় চলেছ আশুকাকা ?

ভোর তখন ছ'টা। হাঁটা দেখে মনে হবে বুঝি পাঁচ ক্রোশ দূরে মাজদে ইষ্টিশনে ট্রেন ধরতে চলেছে কাকা। কিন্তু তা নয়।

—কে, নবনী ? যাবে আমার সঙ্গে ? এবার বর্ষায় গাজনার বিলে নাকি জল একেবারে থৈ থৈ করে উপচে উঠেছে। চল না দেখে আসি—

তার পর বারোয়ারিতলায় যাত্রার বায়না করে আসা, অটল চক্রবর্তীর বেয়াই বাড়িতে গিয়ে জামাই-এর খোঁজখবর নিয়ে আসা, গঞ্জ থেকে হরিসভার খোল কিনে আনা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কাজের মানুষ আশুকাকা।

সেই আশুকাকা একদিন গাঁ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছে। দরিদ্র সংসারের মালপত্র যা কিছু এনেছে, তার সঙ্গে এনেছে একটা ছিপের বাণ্ডিল, হুঁকো-কলকে আর কাকিমাকে।

শান্ত-শিষ্ট মানুষটি এই কাকিমা।

যার কাছে গল্প শুনেছি, কতদিন খেতে বসে আশুকাকা দুটি-দুটি করে হাঁড়ির সমস্ত ভাত চেয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

—মাছের টকটা ভারি চমৎকার রেঁধেছ বড় বৌ, আর দুটি ভাত দাও তো।

সতী-সাধ্বী কাকিমা নিজের ভাগের ভাত-ক'টিও স্বামীর পাতে ভক্তি সহকারে তুলে দিয়েছে। তার পর কে আবার নিজের জন্যে রাঁধে। এমনি করে কাকিমার কতদিন উপোস করে কেটেছে আশুকাকা তার খবরই রাখে নি।

আজো মনে আছে আশুকাকা সকালবেলা গাড়ু নিয়ে মাঠে যেত। ফেরবার সময় কোঁচড়ে কিছু কাঁচা লঙ্কা, পটল, গাড়ুর মুখে একটা পাকা আম বসানো। আর ডান কাঁধের ওপর একটা বিরাট মানকচু কিম্বা মোচা। সকালবেলাই সারা-দিনের খাওয়ার যোগাড়টা হয়ে থাকতো। দুপুরবেলা বারোয়ারিতলায় বটগাছের ছায়ায় বাঁশের মাচার ওপর ভিজে গামছা কাছে নিয়ে দিবানিদ্রা। জীবনের পঞ্চান্নটা বছর এমনি করে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিয়ে আশুকাকা অবস্থা চক্রে পড়ে গ্রাম ছেড়ে হঠাৎ একদিন কলকাতায় চলে এল।

রাস্তায় একদিন কার মুখে যেন শুনেছিলাম আশুকাকারা এসে কলকাতার বরানগরে না টালিগঞ্জে কোথায় উঠেছে। সে অনেক দিন হলো। তারপর কতদিন কেটে গেল। এতদিন পরে আবার আশুকাকার সংবাদ পেলাম।

শুধু পেলাম নয় সশরীরে আমার বাড়িতেই এসে গেছেন শুনলাম।

সেদিন আমার অফিসেই—

আমার অফিসের ঠিকানাটা আশুকাকার জানার কথা নয়। কিন্তু ঠিকানা যোগাড় করে দেখা করতে আসা, এ-শুধু আশুকাকার পক্ষেই সম্ভব।

চেয়ারটা নির্দেশ করে বললাম—বোস আশুকাকা।

বসবার আগে অফিসের চারি দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখে নিলে। মাথার ওপর পাখা, দেয়ালের গায়ে ঘড়িটা, টেবিলের ওপর পেতলের 'কলিং বেল', ইস্পাতের আলমারি ইত্যাদি ইত্যাদি—

আশুকাকা চেয়ারে বসে অন্যদিকে দেখতে দেখতে বললে—বেশ জায়গায় অফিস তোমার নবনী, বেশ সাজানো অফিস, কিন্তু আসতে যেতে পেরাণ বেরিয়ে যায়, এক পিঠের বাসভাড়াই কাণ মুলে চোদ্দ পয়সা নিয়ে ছাড়লে।

হঠাৎ যেন কাজের কথা মনে পড়ে গেল। বললে—ভাল কথা, তিন টাকা সাড়ে বারো আনা দাও দিকি নি, তোমার জন্যে এই চারদিনে তিন টাকা সাড়ে বারো আনা পয়সা খরচ করে ফেলেছি। বাসে, ট্রামে, রিক্সায় মোট তোমার গিয়ে তিন টাকা সাড়ে বারো আনাই দিতে হচ্ছে।

কাছারিতে সাক্ষী দিতে গিয়ে যেমন জলখাবার, রাহাখরচ নেওয়া স্বভাব আশুকাকার, এও তেমনি। এ আমার জানা ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে নির্বিবাদে

টাকাটা বার করে দেওয়াই নিয়ম। আর আশুকাকা চারখানা এক টাকার নোট কোঁচার খুঁটে বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখবে—এটাও তেমনি পরিচিত দৃশ্য। এ-নিয়ে আমার প্রশ্ন বা বিস্ময়-প্রকাশ করবার কথা নয়।

শুধু জিজ্ঞেস করলাম—বাড়ির সব খবর কী কাকা?

—বাড়ির খবর পরে শুনো, আর তা ছাড়া তা শুনেই বা কী করবে! সে থাকগে, যে কাজের জন্য আমি এসেছি—

এই কথাটিই আশুকাকার আসল কথা। আশুকাকার পথ বড় সোজা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলতে জানে না আশুকাকা। সরল কথার মানুষ। মনের আর মুখের কথার মধ্যে কোন তফাত থাকতে নেই আশুকাকার।

বললে—অটলদার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে?

বললাম—হ্যাঁ কাকা, হয়েছে তো।

ম্রিয়মান নয়, অভিমান নয়, লজ্জা দুঃখ কিছু নয়। আশুকাকা যেন পরের শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছে।

বললে—তোমারও হয়েছে?

বললাম—তোমার নেমন্তন্ন হয় নি কাকা?

স্বগতোক্তির সুরে আশুকাকা বলে যেতে লাগল—ব্যাপারটা কি রকম হলো বলো তো? শ্যামবাজারের পেরবোধদার বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদের নেমন্তন্ন হয়েছে, টালিগঞ্জের অশ্বিনীদার বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদের নেমন্তন্ন হয়েছে, বালিগঞ্জের সিধুদার বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদেরও হয়েছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

আশুকাকা বললে—অথচ বলতে পারবে না যে আমার ঠিকানা জানে না। সিধুদার ছেলেকে দিয়ে আমার বাসার ঠিকানাটাও ওদের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

তা হলে? মহাসমস্যার কথা আশুকাকা তুলেছে!

ভেবে বললাম—আচ্ছা এমন তো হতে পারে যে, ওরা নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু পোস্টাফিসের গোলমালে—

—সে-কথা বললে হবে না, নিজে রোজ পোস্টাফিসে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি, আজও গিয়েছিলাম।

আরও ভাবিয়ে তুললে আশুকাকা।

বললে—এই নিয়ে সবসুদ্ধ চারদিন হোল। তিনদিন গেছি তোমার বাড়িতে,

শেষে তোমার অফিসে এসে হাজির হলাম। খবরটা শুনে পর্যন্ত রাত্তিরে নবনী, আমার ভাল ঘুম হয় না।

এই ব্যাপারে আশুকাকার মত লোকের ঘুম না-হওয়ারই কথা।

আশুকাকা আবার বলতে লাগলো—অথচ ভাবো একবার, অটলদা তখন বেঁচে। বড় মেয়ের বিয়ের সময় কলাপাতা থেকে শুরু করে পান পর্যন্ত এই আশু ঘোষ একলা যোগাড় করেছিল।

তার পর খানিক থেমে আবার বললে—তার পর বড় ছেলের বিয়েতে যখন শেষ পর্যন্ত ছানা এসে পৌছল না সন্ধ্যাবেলা, মনে আছে অটলদা মুখ কালি করে আমার হাত দুটো জাপটে ধরলে, বললে—কী হবে আশু?

সে-সব দিনের সুখ-স্মৃতি বোধ হয় আশুকাকাকে বিচলিত করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এত সহজে মুষড়ে পড়বার লোকও আশুকাকা নয়।

বললে—যাকগে নবনী, সেই খবরটা নিতেই এতদূরে তোমার কাছে আসা। পরশু বিয়ে, অথচ আজ সকাল পর্যন্ত কোনও খবরাখবর না পেয়ে···যাকগে—

যেন হতাশায় বিরক্তিতে ও-প্রসঙ্গ আর আলোচনা করবে না এমনিভাবে মুখের কথাটাকে অসম্পূর্ণ রেখে থেমে গেল আশুকাকা।

বললাম—তোমার খাওয়া হয়েছে নাকি? বেলা তো দুটো বাজতে চললো।

আশুকাকা সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে অনেক তালে। সুতরাং খাওয়া আর কেমন করে হবে। এখানে এই শহরের ব্যস্ত আবহাওয়াতে এসেও আশুকাকার ব্যতিব্যস্ত ভাবটা কাটেনি।

হোটেলে যেতে যেতে বললাম—কাকিমা কেমন আছে কাকা?

—তোমার কাকিমার কথা বোল না নবনী, তিনি মারা গেছেন।

আমি যেন চমকে উঠলাম। নিঃসন্তান আশুকাকা বিপত্নীক হলো কবে? কিন্তু এমন নিঃসঙ্কোচে স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদটাই বা কে দিতে পারে এক আশুকাকা ছাড়া।

জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছিল শেষকালে?

—হবে আবার কি, একরকম না খেতে পেয়েই মারা গেল বলতে পারো। তা সে কথা থাক, অটলদার বাড়িতে এদানি গিছলে নাকি তুমি?

বললাম—এই তো কালই গেছি। আমার বিয়েতে ওরাই সব করেছিল, এখন আমি না গেলে খারাপ দেখায়, তাই যাওয়া। কদিন ধরে প্রায়ই যাচ্ছি···যাবতীয় কেনা-কাটা—

আশুকাকা কথাটা লুফে নিলে। বললে—খাওয়া-দাওয়ার কী রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে দেখলে?

যা-যা হচ্ছিল বললাম।

শুনে আশুকাকা ভীষণ দমে গেল! বললে—সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। অটলদা নেই, আমাকেও নেমন্তন্ন করলে না, কী যে হবে—

আশুকাকা মাথায় হাত দিয়ে বসবার যোগাড়। বললে—কিন্তু মাছের কী হচ্ছে?

—মাছ তো দেখলাম আমার সামনেই অর্ডার দিলে।

—ক'রকম মাছ?

বললাম—একরকম মাছের কথাই তো শুনলাম। আমার সামনে দেড় মন মাছেরই তো অর্ডার দেওয়া হলো।

আশুকাকা বলে উঠলো—সব পণ্ড হবে নবনী, এই তোমায় বলে রাখছি, দেখো। অটলদা বেঁচে নেই, আমি নেই, কী যে করবে ছেলে ছোকরারা। বদনাম হয়ে যাবে মাঝখান থেকে, দেখে নিও—

বললাম—আর দইঅলা এসেছিল, তাকেও বুঝি দই-এর অর্ডার দেওয়া হলো।

—কী দই?

—তা জানি নে কাকা।

আশুকাকার জন্যে ভালো করে মাংসের অর্ডার দিয়েছিলাম আর পরোটা। ভেতর থেকে গন্ধ আসছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল আশুকাকা। একজন ওয়েটার এসে যথারীতি ময়লা ন্যাতা দিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করে গেছে। মনে হোল আশুকাকার যেন লোভ সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নিজের ধুতির কোঁচাটা দিয়ে পরিপাটি করে টেবিলটা সাফ করতে লাগলো আশুকাকা। বললে—বড্ড ময়লা টেবিলটায়।

মাংস এল। পরোটা এল।

আশুকাকা বললে—খাঁটি পাঁঠার মাংস তো নবনী? দেখো, আমরা সেকেলে লোক।

অভয় দিতেই আশুকাকার মুখ ভর্তি হয়ে উঠলো মাংসে।

তার পর আস্তে আস্তে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আশুকাকার ক্ষিদেও খাঁটি, আশুকাকার খাওয়ার রীতিটাও খাঁটি, কারণ আশুকাকা মানুষটাই যে খাঁটি। প্রত্যেকটি গ্রাসের সে কী ভঙ্গী, প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তু নিয়ে সে কী কসরত! নিঃশ্বাসে,

প্রশ্বাসে, ঝোলে, ঝালে, আঙুলে, প্লেটে, মুখে, ঠোঁটে, সবার ওপর চোখের দৃষ্টিতে সে কী সামঞ্জস্যময় মুভমেণ্ট।

আমি দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা মাংসের হাড় জিভ আর দাঁত দিয়ে কায়দা করতে করতে আশুকাকা সখেদে বললে—তোমার কাকিমা না খেতে পেয়ে মরেছে, এ-কথাটা আমি ভুলতে পারি নে নবনী।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খেয়ে এক সময়ে খাওয়া শেষ হলো আশুকাকার।

হাত ধুয়ে এসে বসল আবার। বললে—বেশ খাওয়াটা হলো আজ, অনেক দিন পরে মাংস খেলাম সত্যি। সেই আড়াই বছর আগে বারোয়ারিতলায় তুগ্গো পুজোর সময়, মহাষ্টমীর দিন···

পরিতৃপ্তির একটা সশব্দ উদ্গার তুললো আশুকাকা। কিন্তু মনে মনে বুঝলাম আশুকাকার সমস্যার কোনও আশু সমাধান যেন হলো না।

আশুকাকা বিদায় নেবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম। আমিই গিয়ে প্রস্তাব করবো নাকি। বাড়িতে কত আত্মীয়-অনাত্মীয়, অনাহূত-রবাহূত আসবে। তাদের সঙ্গে আশুকাকার নামটা জুড়ে দিতে যদি আপত্তি না থাকে, নাম মাত্র একটা নেমন্তন্নর চিঠি—তাতেও কি আটকাবে? নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন হতে চায় আশুকাকা। তার সেই বাসনা কি অযৌক্তিক, কিংবা একান্তই হাস্যকর? অপরের শুধু বিপদে নয় উৎসবেও যে তার একটা অধিকার আছে। আজ অটলদা নেই বলেই কি আশুকাকার সমস্ত অধিকার লুপ্ত হবে? নাকি আশুকাকা আজ ঠিকানাহীন বলেই এই অবজ্ঞা!

কিন্তু আমার অবাক হতে তখনও অনেক বাকি ছিল বুঝি।

বিয়ের দিন নয়, বৌভাতের দিনের ঘটনা। একটু সকাল সকালই গিয়েছিলাম। নেহাত নিমন্ত্রণ রক্ষা করা নয়। সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছেছি।

গিয়ে পৌঁছুতেই প্রথমে আশুকাকা ছাড়া আর কার সঙ্গে দেখা হবে? ফরসা একটা পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে এগিয়ে এল আশুকাকা। এসেই ধমকের সুরে বললে—এই গিয়ে এখন তোমার আসা হোল নবনী! তোমরা বাড়ির লোক হয়ে যদি আসতে এত দেরী কর—

—দাঁড়াও আসছি—বলেই আশুকাকা বাড়ির ভেতর সোজা চলে গেল! এবং তার একটু পরেই ফিরে এল আবার।

বললে—রান্নাটা নিজে তদারক করছি কিনা, পোলাওটা নাবলো, একটু চেখে

এলাম। আজ রান্নাটা খেয়ে দেখো যদি ফার্স্ট কেলাস না হয়তো আমি কান মুলতে মুলতে না খেয়ে চলে যাবো এ-বাড়ি থেকে।

আরো কয়েকখানা গাড়ি এসে পড়লো। আশুকাকা দৌড়ে গেল ওদিকে অভ্যর্থনা করতে।

বড় ছেলে ছবি। ছোট ছেলে রবি। রবির বিয়ে। কর্তা ব্যক্তির মধ্যে ছবিই একলা। অভ্যর্থনা আয়োজন চূড়ান্ত হয়েছে। আলো, লোকজন, গাড়ি, ফুলের মালা —কোনও ত্রুটি নেই। চাকর-বাকর, কর্মচারী, দারোয়ান, লোক-লস্কর কিছুরই শেষ নেই। কিন্তু সকলের ওপরে আছে আশুকাকা। আশুকাকার নজর সবদিকে।

আশুকাকা একবার দৌড়ে ভেতরে যায়, আবার বাইরে আসে!

—ওরে অসোময়, মাটির গেলাসগুলো ধুয়ে সাজিয়ে রাখ বাবা।

—হ্যাঁ রে নেবুগুলো কাটবো কি আমি?

—ঠাকুর, লুচির কড়া চড়িয়ে দাও, সাতটা বেজে গেছে।

—এই যে আসুন, আসুন। বড় আনন্দ হোল, অটল দাদা আজ নেই, তিনি থাকলে দেখে যেতে পারতেন তাঁর ছেলের বিয়েতে কোনও ত্রুটি আমরা হতে দিই নি।

সমাগত অভ্যাগতদের মধ্যে বসে বসে ভাবছিলাম কেমন করে কী হলো। কোনও খুঁতই নেই কোথাও। আশুকাকাও তো ঠিক শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছেন। তবে কি তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল নাকি? আশুকাকার আচরণ দেখে তো মনে হচ্ছে এখানে তাঁর বহুদিনের যাতায়াত। অন্দরমহলেও অবাধ গতি। কিন্তু তিনদিন আগেও তো টের পাই নি।

আশুকাকা হঠাৎ ইঙ্গিতে আড়ালে ডাকলে। কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়েছে। হাতে চায়ের কাপ। এরই মধ্যেই তিন-চার কাপ খেয়ে শেষ করতে দেখলাম।

কানের কাছে মুখ এনে আশুকাকা বললে—তুমি বলছিলে শুধু রুই মাছের কালিয়ার কথা, ভেটকি মাছের ফ্রাইটাও করিয়েছি। কারিগর ভালো, খেয়ে দেখো মন্দ করে নি। এই লুচির কড়াটা নামলেই পাতা সাজিয়ে দেবো।

—আর একটা কথা—

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে—মাংস হবার কথা ছিল না, আমিই ছবিকে বলে করালাম। বললাম, কতই বা খরচ তোমার, মাংসটা করা চাই, অটলদা খেতে ভালবাসতেন।

আবার চায়ে চুমুক দিলে।

একটু থেমে বললে—নতুন বিলিতি বেগুনের একটা চাটনিও করিয়েছি দেখো, একটু ঝাল-ঝাল। কিছু ভাবনা নেই, আমি তোমার পাশেই বসবো'খন, কোনটার পর কী কতটা খেতে হবে—সব বলে দেব'খন—কিছু ভাবনা নেই তোমার নবনী।

আশুকাকা যেন আমার পরম উপকার করলে, এমনি একটা বিশ্বাস আশুকাকার বক্তব্যের পেছনে। আশুকাকা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে নেমন্তন্ন বাড়িতে কাউকে অগ্রিম খাওয়ার তালিকা জানিয়ে দেওয়া একটা পরম উপকাবের সামিল।

কিন্তু যে-প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বিঁধছে সেটা আর উত্থাপন করবার ফুসরত পেলাম না।

হঠাৎ আশুকাকা বৈঠকখানায় ঢুকলো দুহাত জোড় করে।

—তা হলে এবার উঠতে আজ্ঞে হোক—

—ঠাকুরমশাই উঠুন, বিধুদা ওঠো ওঠো। ও হরিদাস, গা তোল ভাই, অশ্বিনীদা বসে রইলে যে; ওঠ, তোমাকে তো সেই আবার টালিগঞ্জে যেতে হবে—

—ওই যে, সামনের বারান্দায় ঢুকেই ডানদিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি, বরাবর উঠে পড়ুন। ও অসোময়, মাটির খুরি গেলাসগুলো ওপরে নিয়ে এসো। আর ঠাকুরকে বলো ভাঁড়ার থেকে আরো সের পাঁচেক ময়দা নিয়ে যাক। আমি ভাঁড়ারে বলে দিয়েছি।

—ও খোকা, তোমার নাম কি ভাই—বেশ বেশ—যেমনি বসবে সবাই, একজন গরম লুচির ঝুড়ি নিয়ে এদিক থেকে ঘুরে যাবে, আর ওদিক থেকে আর একজন পেতলের বালতি নিয়ে নিরামিষ ঘি-ভাত দিতে থাকবে। তার পর—

তেতলার ছাদে সবাই বসে গেছি। আশুকাকা নিজে এসে বসিয়ে দিয়ে গেছে তার নির্দিষ্ট আসনে। আমার পাশের কুশাসনে নিজের তোয়ালেটা রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ আশুকাকার জন্য আসন সংরক্ষিত রইল।

সবাই বসে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে দুই সারি নিমন্ত্রিতের মধ্যে আশুকাকা একলা তদারক করতে বেরিয়েছেন। প্রধান সেনাপতির সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের মত।

—ও অসোময়, হাঁ করে কি দেখছো ওখানে দাঁড়িয়ে, কারুর গেলাসে যে জল নেই, দেখতে পাচ্ছ না?

—ওহে তোমার নাম কি—শোন ইদিকে—এর পরে মাংসের পোলাওটা নিয়ে আসবে তুমি, আর বসন্তকে বলবে তার আগে নিরিমিষ মুগের ডালটা গামলায় যেন ঠিক করে রেডি রাখে। তারপর ছোলার ডালের মুড়িঘণ্ট—

—সিধুদা তুমি মোটে কিছু খাচ্ছো না—গরম দুখানা লুচি দিক—তুমি তো বরাবর মাংসের পোলাওটা খেতে ভালবাসতে—ফেলে রাখলে যে—

—ও হরিদাস খাও খাও—তোমাদেরই তো খাবার বয়েস—তোমাদের বয়সে আমরা এক একটা আস্ত পাঁঠা একলা খেয়ে হজম করেছি।

—অশ্বিনীদা'কে ভাল করে পরিবেশন করা হচ্ছে না, এ কী খাওয়া হচ্ছে—যেদিকে দেখবো না, সেইদিকেই বে-বন্দোবস্তো।

—ওহে—এবার মাছ নিয়ে এস—কালিয়াটা—ফ্রাইটা কেমন হয়েছে ঠাকুর মশাই ? নিজে তদারক করে করিয়েছি—আমার হাতের কারিগর পেলে অবিশ্যি আরো ভালো হতো।

এবার আশুকাকা সোজা এসে তোয়ালে তুলে কুশাসনে বসে পড়লো। বললে—পরের ব্যাচে বসলেও চলতো, কিন্তু থাকি অনেক দূরে।

বলে ভাজা দিয়ে লুচি মুখে পুরে বললে—কী করছ নবনী, শাক ভাজা কুমড়োর ঘঁাট দিয়েই পেট ভরিয়ে ফেললে, ওদিকে ভাল ভাল জিনিসগুলোই যে এখনও বাকি রয়ে গেছে !

বাড়ির আসল কর্তা ছবি। কিন্তু আশুকাকার কাছে যেন তারা ম্রিয়মান হয়ে গেছে। ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে তদারক করছে, কিন্তু কার্যকর তদারক হচ্ছে না যেন।

খেতে বসেও আশুকাকার শান্তি নেই।

—ও অসোময় গেলাসগুলো একবার দেখো—কার জল চাই, না-চাই—

—এইবার মাংসের পোলাওটা দিয়ে মাংসের কালিয়াটা নিয়ে এস চট্ করে।

আশুকাকা মুখ দিয়ে খায়, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে চারদিকে ! কিসের পরে কী কী পরিবেশন করতে হবে, কার পাতে কী নেই—কে খাচ্ছে কে খাচ্ছে না—সমস্ত।

—ওহে বসন্ত, মাংসের কালিয়াটা এই রো'তে আর একবার দেখিয়ে নিয়ে যাও তো ! খাও নবনী, বেশ মাংস দেখে দেখে গোটা চার পাঁচ দাও দিকি এ-পাতে—খাও, খেয়ে কেমন রান্না হয়েছে বলতে হবে।

ওজর আপত্তি শুনলে না। আমার পাতেও ঢালালে, নিজেও নিলে অনেকখানি আশুকাকা। আশুকাকা খাইয়ে-মানুষ।

ছবি একবার সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার সামনে এল। একবার চেয়ে দেখল আমার পাতের দিকে। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিল, আশুকাকা বাধা দিলে।

বললে—অটলদা, বুঝলে ছবি, অটলদা আর আমি দুজনেই মাংস খেতে ভালবাসতাম। একবার কাছারির কাজ শেষ করে অটলদা বললে, আশু, চল আজ

একটা খাসী কাটা যাক। অটলদা'র যে-কথা সে-কাজ, খাসী কাটতে হবে। গেলাম মোছলমান পাড়ায়, গিয়ে দেখি···

গিয়ে আশুকাকা কী দেখলে বলা হলো না। রসময়ের পা লেগে আশুকাকার জলশুদ্ধ গেলাসটা উল্টে গেল।

তারপর সে এক হৈ হৈ কাণ্ড।

জলে, পাতায়, কুশাসনে, এঁটোয় একেবারে একাকার।

আশুকাকা ফেটে পড়লো—দেখলে নবনী, কাণ্ডটা দেখলে!

কিন্তু তা হোক্। আশুকাকার খাওয়া তা বলে নষ্ট হলো না। তখন সবে মাংসের কালিয়া পড়েছিল, তার পরও অনেক কিছু বাকি।

একে একে টোম্যাটোর চাট্নি, পাঁপড়ভাজা, দই, মিষ্টি সব এল। আশুকাকা সকলকে খাওয়ালে এবং নিজেও খেলে কম নয়।

হাত ধুয়ে মুখ মুছে পান চিবোচ্ছিলাম। এবার যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

আশুকাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—নবনী, তুমি যেন চলে যেও না, একটু দাঁড়াও, তোমার গাড়ীতে যাবো যে।

—অসোময়, একটা চাঙারীতে বেশ করে সব রকম খাবার সাজিয়ে দাও তো—না, ওর দ্বারা হবে না—দাঁড়াও নবনী, নিজেই গিয়ে দেখে শুনে আনতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম—কী আনবে কাকা?

আশুকাকা চলতে চলতে বললে—তোমার কাকিমার জন্মে কিছু খাবার নেবো বেঁধে, দেখি।

উর্ধ্বশ্বাসে আশুকাকা দৌড়ে ওধারে চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। ছবি এসে দাঁড়াল পাশে। বললে—কে ও ভদ্রলোক, নবনী?

আমি প্রশ্ন শুনে অবাক, কিন্তু আমার উত্তর দেওয়াও হলো না। আশুকাকা সেই মুহূর্তেই এসে পড়েছে। হাতে গামছায় বাঁধা বিরাট এক পোঁট্লা। বললে—চল নবনী।

উঠে বসলো আশুকাকা।

গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

আশুকাকার নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চলেছে।

গাড়ি চলেছে, আর আশুকাকা পোঁটলাটা দুইহাতে ধরে বসে আছে।

বললে—সব নিয়েছি নবনী, নেবুর কুচিটাও বাদ দিইনি, থরে থরে খুরিতে মাটির গেলাসে সাজিয়েছি, মালশায় নিয়েছি পোলাও, আর···

নিস্তব্ধ রাত। আর একটু পরে নিশুতি হয়ে যাবে সব। গাড়ির ঘূর্ণ্যমান দুটো রবারের চাকার শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে আসে না। জ্বলন্ত হেডলাইট সামনের অন্ধকারের পাথরে উজ্জ্বল লিপি খোদাই করতে করতে চলেছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা কাকা, শেষ পর্যন্ত রবিরা তোমাকে নেমন্তন্ন করেছিল তা হলে?

কাকা চমকে উঠলো—কই না, করে নি তো! কখন করলে?

—করে নি?

আমি যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে আশুকাকা বললে—না, করে নি তো।

কী জানি কেন, হঠাৎ আশুকাকা নিজের মনেই বলে উঠলো—না করলেই বা—

অন্ধকারের মধ্যেই আশুকাকার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান চিবোচ্ছে। সঙ্কোচ, লজ্জা, কিছু নেই ও-মুখে।

বললে—না করলেই বা নবনী, ওরা কি আমায় চেনে?—অটলদা চিনতো, অটলদা বেঁচে থাকলে আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলতো না। তা যাক, ওরা না হয় ছেলেমানুষ, তা বলে আমি তো আর ছেলেমানুষ হয়ে রাগ করে দূরে থাকতে পারি নে।

থামলো আশুকাকা।

গাড়ি মোড় ঘুরছিল। সোজা রাস্তায় পড়ে আশুকাকা আবার আরম্ভ করলে—অনেক ভাবলাম, বুঝলে নবনী, সেদিন তোমার অফিস থেকে ফিরে গিয়ে অনেক ভাবলাম। বুঝলাম ছবির তো দোষ নেই, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আমায় চেনে না, কিন্তু আমি যদি ছেলেমানুষী করে নেমন্তন্ন করে নি বলে না যাই তা' হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে যে, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সগ্যে থেকে অটলদা সব তো দেখছেন—বলবেন, আমার মায়ের পেটের ভাই না হয় না হলো কিন্তু মায়ের পেটের ভাই-এর চেয়ে কম ছিল কিসে? অনেক ভাবলাম, জানো নবনী, শেষে বৌভাতের দিন ভোরবেলাতেই গিয়ে হাজির। নিজের পরিচয় দিলাম নিজেই, কী করবো বলো?

আশুকাকা যা বলে, তা সত্যিই বিশ্বাস করে।

—এবার কোন্ দিকে যাবো কাকা?

আশুকাকার উত্তর দেবার আগেই মোড়ের মাথায় হঠাৎ ব্রেক কষতে হলো। ওদিক থেকে আর একখানি গাড়ি অজান্তে সামনে এসে পড়েছে।

কিন্তু সেই হঠাৎ ব্রেক কষার আকস্মিকতায় আশুকাকার হাত থেকে পোঁটলা ছ খুলে, আর মাথাটা গিয়ে ঠোকর খেয়েছে সামনের কাঁচের সঙ্গে।

তার পর সে এক কাণ্ড। ডালে-ভাতে, দই-চাটনিতে, মাছ-মাংসে অত সাজানো ারি হঠাৎ উল্টে পড়েছে গাড়ির মেঝেতে। ছত্রাকার খাদ্যসামগ্রী জুতোর ধুলোর র মাখামাখি।

—এ কী হোল নবনী ?

গাড়ির ভেতরের আলোটা জ্বেলে নেমে দাঁড়ালাম। আশুকাকার চোখে কখনও দেখি নি। এবারও জল নেই, কিন্তু এর চেয়ে বুঝি জল বেরুনো ভাল ছিল।

—এ কী হলো নবনী ?

তারপর আশুকাকা নিজের হাতে সেই দই, সেই পোলাও, মাংস, মাছ, লুচি, , যাবতীয় জিনিস আবার ধুলো থেকে আলগোছে তুলতে লাগলো। আর আমি াক সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। তার পর প্রত্যেকটি ভাত যখন ় নেওয়া শেষ হলো, আশুকাকা বললে—নবনী, তুমি তাহলে এসো অনেক রাত গেছে। আমি এটুকু বেশ হেঁটে যেতে পারবো।

আশুকাকা পুটলি নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলো।

গাড়িটা পাশের গলির ভেতর ঢুকিয়ে মোড় ঘুরিয়ে নেব। ছোট গলি। অতিকষ্টে ড়টা ঘোরালাম।

মনে মনে ভাবছিলাম। আশুকাকা বলেছিল, কাকিমা মারা গেছে, না খেতে য় মারা গেছে। তবে এ কোন্ কাকিমার খাবার বেঁধে নিয়ে গেল কাকা। মিথ্যে বলবার লোক তো নয় আশুকাকা। তবে কি কাল সকালে উঠে নিজেই খাবে ? বা হয়তো সে-কাকিমার মৃত্যুর পর আবার এক কাকিমার আবির্ভাব হয়েছে। শুকাকা হয়তো বিয়ে করেছে দ্বিতীয় পক্ষে। হয়তো মাথার দিব্যি দিয়ে বিয়ে তে বলে গিয়েছিল কাকিমা মরবার সময়। হয়তো অরক্ষণীয়া শ্যালিকাই দ্বিতীয়-ক্ষর স্ত্রী হয়ে এসেছে। কী জানি!

গলি থেকে বেরিয়েই ডানদিকে বড় রাস্তা একটা।

সেইখানে সেই রাত্রির দ্বিপ্রহরে আমি যেন ভূত দেখলাম।

একটা ডাস্টবিনের ধারে বসে আশুকাকা পুঁটলী বাঁধছে। থরে থরে মাছ, মাংস, োলা, সন্দেশ, দই, সাজিয়ে রাখছে চাঙারিতে। আশুকাকার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর

জন্যেই হয়তো। গাড়িটা থামিয়ে দেখলাম। দেখতে লাগলাম। আশুকাকাই তে
কোনও সন্দেহ নাই।

—আশুকাকা—ডাকলাম!

আশুকাকা আমার দিকে চাইলে। বড় কাতর সে চাউনি।

—কে? নবনী?—বেশ স্পষ্ট মনে আছে আশুকাকার গলা।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখানে?

গাড়ির দরজা বন্ধ করে নামলাম। কৌতুহলের সীমা ছিল না আমার।

কিন্তু কাছে যেতেই একটা ধব্‌ধবে সাদা লোমওয়ালা কুকুর আমাকে দেখে ভ
ওদিকে পালিয়ে গেল।

চোখের কানের কী মর্মান্তিক ভুল। আশুকাকা নয়, ছিঃ ছিঃ ছিঃ—লজ্জ
আমার মাথা কাটা গেল।

নিমন্ত্রিত ইন্দ্রনাথ

আজ রবিবার। শুক্রবারে পাওয়া নেমন্তন্ন খেতে ইন্দ্রনাথ সেই সন্ধ্যেবেলা বেরি
গেছে। এখন রাত সাড়ে ন'টা হতে চলল। এখনও দেখা নেই ইন্দ্রনাথের।

কুমুদ বেশ আলগা করে শাড়িটা পরেছে। এলিয়ে দিয়েছে পা জোড়া। হে
দিয়েছে দেয়ালে। ইন্দ্রনাথের একখানা মাত্র দিশি কাপড়, সেখানাকে সেলাই ক
বসেছে। তা বলে সেলাই করাটা কুমুদের একটা ছুতোই বলতে হবে। কুমুদ সে
করতে করতেই হাসলে। চারখানা কাপড়ে যাকে বছর চালাতে হয়, তার কাপ
সেলাই করা ছাড়া উপায় কি? ডাকলে—বাব্‌লু, ঘুমুলি নাকি—

মুখ তুলে চেয়ে দেখলে কুমুদ। খোকা বই পড়ছে উপুড় হয়ে শুয়ে।

বাব্‌লু যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে প্রশ্ন করলে—নেমন্তন্ন খেতে বাবার এত দে
হচ্ছে কেন মা?

একটা ঘরের মধ্যেই তিনটি প্রাণীর এই সংসার কলকাতার এক অতি-অখ্যা
গলির শেষ প্রান্তে মন্থরগতিতে গড়িয়ে চলে। প্রতিদিনকার অতি পরিচিত

য়র ওপাশে তেতলা বাড়িটার ছাদের ওপরে উঠে আসে। তারপর চাকা ঘুরতে ক। ইন্দ্রনাথের অফিস যাওয়ার আগের মুহূর্তের ব্যস্ততা, কুমুদের তাড়াতাড়ি ম ভাতের ওপর গরম ঝোল ঢেলে দেওয়া, তারপর এক ফাঁকে এঁটো হাত ধুয়ে য় পান সেজে বোঁটার আগায় চুন লাগিয়ে দেওয়া। তারপর বাব্‌লুকে স্নান করানো, কে খাওয়ানো, নানান কাজ। বাঁধা পথের আয়েস বা অনায়াসগতি যতটুকু তার ঘেয়েমিও ঠিক ততটাই। উদয়াস্ত একটানা পরিশ্রমের ফাঁকে যখন কুমুদ একটু বতে বসে, কেবল তখনই একঘেয়েমিটা ধরা পড়ে। তাছাড়া এ একরকম অভ্যেসে ড়িয়ে গেছে কুমুদের। ঠিক ভোর চারটেয় ঘুম ভেঙে যায় তার। যেন ঘড়ির টাও এমন নিয়ম মেনে চলে না। যখন ঝোল ভাত রান্না শেষ হয়ে গেছে কুমুদের, ই তখন সূর্যটা ওঠে আকাশে, তখন দিন হয়, তখন পৃথিবীর লোকের কাজকর্ম হবার কথা।

ইন্দ্রনাথের ছাপাখানার চাকরি।

আটটার সময় হাজিরা। চেতলার এই বস্তিটা থেকে ইন্দ্রনাথের ছাপাখানা ান্ না মাইল সাতেক রাস্তা হবে। হেঁটে যেতে দু'ঘণ্টা সময় লাগে বটে কিন্তু কেণ্ড ক্লাস ট্রামের ছ'টা পয়সা তেমনি যে বাঁচে। সেই ছ'টা পয়সাই কি কম! টু শীত পড়লে ছ'পয়সায় এক কাপ চা খেতে পারে, না হ'ল ত চার ছয় চব্বিশ সায় একসের রেশনের চাল হবে। যুদ্ধে যাদের আয় বাড়েনি, তাদের অত হিসেবি হলে চলবে কেন?

সুতরাং···

সুতরাং ইন্দ্রনাথকে ভোর ছ'টার সময় বেরিয়ে আটটার সময় ছাপাখানায় হাজরে ত হয়।

বাব্‌লু বই থেকে মুখ তুলে আবার বললে—বাবার আসতে এত দেরি হচ্ছে ন মা?

হয়তো প্রথম ব্যাচে বসতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। লাজুক মানুষ তো আসলে। ডাকলেও যে উঠে পড়ে দলে ভিড়ে গিয়ে পড়তে হয়, সে কথা কে শেখাবে! যাকে কাল ভোরবেলাই আবার ছ'টার সময় ঝোল ভাত মুখে গুঁজে সে বেরুতে হবে, তার অত শখ করে এত রাত্তির পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া কি ত! হয়তো দেখা হয়ে গেছে পুরোন বন্ধুর সঙ্গে! বসে বসে আড্ডাই দিচ্ছে সত্যি য। বাড়ির মানুষদের কথা একেবারে ভুলে গেছে।

কুমদ সেলাই করতে করতে বাইরের দিকে চেয়ে রাতটা একবার আন্দাজ করলে।

আজকের এই দিনটা, এই রবিবারটা—কত বছর পরে যেন একটা বির ব্যতিক্রম। এমন ক'রে সমস্ত বিকেলটা সমস্ত সন্ধ্যেটা পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেল দিয়ে কখনও তো কাটায়নি কুমুদ।

আজ কেমন নিশ্চিন্তে কাটিয়েছে সমস্ত বিকেলটা। রান্নাটা সকাল বেল সেরে নিয়েছে। দু'বেলার রান্না একবেলা সেরে রাখলে কত সুবিধে। ইন্দ্রন এবেলা আজ খাবে না বাড়িতে। শুক্রবারে বিকেল বেলাই, নেমন্তন্ন করে রেখে ইন্দ্রনাথের পুরোন ছাপাখানার মনিব ধরণীবাবু। মাঝখানে একটা দিন শুধু শনিবা শনিবারে আধরোজের ছুটিতে সাবান কিনে আনা, জুতোর কালিটা ফুরিয়ে এসেছি সেটা কেনা, তারপর···

তারপর সবটাই করেছিল কুমুদ। সোডা আর সাবান দিয়ে গরম জলে ইন্দ্রনা পাঞ্জাবি আর একটা ধুতি কলতলায় আছাড় দিয়ে কাচা, ভাতের মাড় দিয়ে, দিয়ে বিছানার তলায় পাট করে রেখে 'ইস্ত্রি' করে দেওয়াটা পর্যন্ত।

ইন্দ্রনাথ এবেলা বাড়িতে খাবে না, সুতরাং কাজই বা কি কুমুদের। অন্য দিনের মত গা ধোয়া আর চুল, বাঁধার সময় না পাওয়ার ব্যাপার নয়। শাড়ি হলুদে, এঁটোতে, কাঁটাতে একাকার। বলতে পারো, ভারি তো দু'টি প্রা সংসার, তার আবার ভাবনা কিসের। কিন্তু ওই তো ইন্দ্রনাথের নব্বুইটি টা ওপর ভরসা। ওই ক'টি টাকার মধ্যে তো সব করতে হবে। একটু টেনে সবদিক সামলে না চললে হবে কেন? দুধ তো বাব্‌লু ভালোই বাসে। একটু ওকে দিতে না পারলে কুমুদের বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। পাশের মাঠটা বিকেলে যখন বাব্‌লু খেলা করে, তখন অনেকদিন কুমুদ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে বাব্‌লু যেন একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে দম নেয় অনেকক্ষণ ধরে।

আর ইন্দ্রনাথ! কতদিন পরে যে আবার তার কপালে এই নেমন্তন্ন খাওয়া, হিসেব রেখেছে। যদি হয়ে থাকে তো সে যুদ্ধের আগে। যখন সাধারণ বাড়িতেই তিন-চারশো লোকের খাওয়ার আয়োজন হ'ত। তখন টেক্কা দিয়ে হাঁড়ি দই, পঞ্চাশটা ল্যাংড়া আম আর তার সঙ্গে তিন কুড়ি 'লেডিগেনি' খাও যুগ। সে যুগে কুমুদ নিজেও কতবার নেমন্তন্ন খেয়েছে।

অবশ্য ইন্দ্রনাথের নিজের বিয়ের বৌভাতটাই হল না। মানে সবই হ'ল, খাওয়া দাওয়া উৎসবটিই বন্ধ রইল। তারও কারণ ছিল। সে অনেক কথা।
কুমুদের বাপের বাড়িতে খাওয়ানো-দাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। জ্ঞাতি গো

অনেক বড় পরিবার। আজ এ-বাড়িতে অন্নপ্রাশন, কাল ও-বাড়িতে বৌভাত, শ্রাদ্ধ, জ্ঞাত্-ভোজন। নিজের বাড়িতে কুমুদ কতবার ভোজ খেয়েছে। বিয়ে হবার সাত দিন আগে থেকে জুটতো এসে আত্মীয়-কুটুমরা। তারপর কোথা দিয়ে কাটতো দিন আর রাতগুলো। ভিয়েন ঘর, বাসর ঘর, আর ছাদ্নাতলা। এখনও একলা ভাবতে ভাবতে কুমুদের মনে হয় যেন লুচি ভাজার তীব্র একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। শানাই বাজচে, বর এসে গেছে—দানের সামগ্রী সাজানো রয়েছে আর তারই পাশে হচ্ছে সম্প্রদান, কনের বাপ গরদের জোড় পরে খালি গায়ে মন্ত্র পড়ছে—ওদিকে বেগুন ভাজা পড়ে রয়েছে কলাপাতার ওপর। লোক বসে গেছে ছাদে, গরম গরম লুচি ঝুড়ি ভর্তি নিয়ে এসে দু-চারখানা করে ঝপাঝপ দিয়ে যাওয়া! কুমুদ তখন ছোট। ছেলেদের মধ্যেই বসে পড়েছে খেতে। শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, তারপর আসত নিরামিষ একটা তরকারি। হয় বাঁধাকপি নয়ত কুমড়োর ছক্কা। তারপর একটা ছ্যাঁচড়া। চমৎকার খেতে সেটা। তারপর মাছের কালিয়া। চিংড়ি মাছের মালাই কারি। তারপর একে একে দু'রকম চাটনি, পাঁপড় ভাজা, দই, সন্দেশ, পান্তুয়া দরবেশ ··শেষকালে বাঁ হাতে পান, আর দু'চারখানা লাল গোলাপী কাগজে ছাপানো পদ্য—রুমাল পদ্য···

ভাবতে ভাবতে কুমুদ পনেরো বছর আগে পেছিয়ে গেল স্মৃতির উজান ঠেলে···

···সেই একবাড়ি লোক, আলো, হাসি, ফুলের মালা, বর-কনে, আর সকলের ওপর লুচিভাজার গন্ধ, হোক নিজের বাড়ি, না হয় হোক পরের বাড়ি—তবু ওই পরিবেশ, ওই স্মৃতি, কুমুদের সারা মনকে উদাস করে দেয়। আজ সেই রাতে ইন্দ্রনাথের পুরোন দিশি কাপড় সেলাই করতে করতে হঠাৎ কুমুদের কী যে হোল। তার মনে হোল ইন্দ্রনাথ এত দেরিই বা করছে কেন অকারণে। পেট ভরে খেয়েছে ইন্দ্রনাথ অনেকদিন পরে। হয়ত একটা পান চিবোচ্ছে। তারপর হেঁটেই আসছে ট্রাম রাস্তা ধরে। কেন মিছিমিছি পয়সা খরচ করবে ট্রামে চড়ে। বাবলুও জেগে রয়েছে। সে-ও বুঝি বাবার কাছে বিয়ে-বাড়ির গল্প শুনবে বলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

ইন্দ্রনাথের তিনকুলে কেউ নেই, তাই একটা নেমন্তন্ন হয় না কুমুদের। তা একপক্ষে ভালো। পরে যাবার মত একটা ভালো শাড়ি বা ভালো গয়না তা-ই কি কুমুদের আছে নাকি। ইন্দ্রনাথকেই বা কী করে দোষ দেওয়া যায়। যুদ্ধের দৌলতে এত লোকের মাইনে বাড়লো, এত লোক অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে, বেচারী ইন্দ্রনাথের আগেও যা ছিল, এখনও তাই। নব্বুই টাকা মাইনে। নব্বুই টাকার

হিসেব করতে গেলে ভয় করে কুমুদের। এত বড় যুদ্ধটা যেন ইন্দ্রনাথকে স্পর্শই করলে না। ইন্দ্রনাথ অপাংক্তেয় রয়ে গেল যেন এই যুদ্ধে। তবু ইন্দ্রনাথ খেতে পারে। ভালো খাওয়া খেতে ভালবাসে। মিষ্টি চাটনি হলে থালা চেটে চেটে খায়। সেই ইন্দ্রনাথ এতগুলো বছরের পর বিয়ে-বাড়ি খাবার নেমন্তন্ন পেয়েছে। সকাল থেকে ইন্দ্রনাথের তাই ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে হতে পারে, তাই দুপুর বেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। বাবলুকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে গেলে ভালো হতো। অনেক-দিন ভালো মন্দ কিছু খায়নি, আজ খেয়ে আসতো। কিন্তু ধরণীবাবু কি ভাববেন।

তা ধরণীবাবু লোকটি ভালো। ধরণীবাবুর ছাপাখানাতেই তার প্রথম চাকরি। তিনিই একরকম মানুষ করে দিয়েছেন ইন্দ্রনাথকে। এই যে আজ ইন্দ্রনাথ 'এরিয়ান প্রেসে' নব্বুই টাকা মাইনে পাচ্ছে, এ ওই ধরণীবাবুরই শিক্ষার গুণে। ধরণীবাবুর ওখানেই ছ'মাস বিনা মাইনেয় কাজ করে সাত মাস থেকে পনেরো টাকা করে পেতে শুরু করে।

সেই ধরণীবাবুর সঙ্গে হাজরা রোড়ের মোড়ে সেদিন হঠাৎ দেখা।

ধরণীবাবু মোটরে করে আসছিলেন, আর ইন্দ্রনাথ রাস্তা পার হচ্ছিল।

ধরণীবাবুর ডাকে ইন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়াল। গাড়িটা ততক্ষণে দশ হাত দূরে গিয়ে থেমেছে। ইন্দ্রনাথ দৌড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ধরণীবাবু বলেছিলেন—পুলিনের—মানে আমার বড় ছেলের বিয়ে আজ, রোববারে বৌভাত, যেয়ো ইন্দ্রনাথ—ভুলো না—

তারপর···

—কেমন আছো, কোথায় কাজ করছ আজকাল···ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধরণীবাবু মোটরে ব'সে আর ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে।

শব্দ করে ধোঁয়া উড়িয়ে ধরণীবাবু মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তখনও ইন্দ্রনাথ সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। এ তার হোল কি। কাল রাত্রে স্বপ্নেও তো ভাবেনি কেউ তাকে নেমন্তন্ন করবে। বহুদিন পরে সুযোগ পাওয়া যাবে ভালো মন্দ খাওয়ার।

এই হলো নেমন্তন্নর ইতিহাস।

এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না! ক্বচিৎ কদাচিৎ। সেই শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ইন্দ্রনাথের আয়োজন। একটা ফরসা ধোপদুরস্ত ধুতি, একটা পাঞ্জাবি আর জুতোর কালির। হলোই বা ধরণীবাবুর পুরোন প্রুফ-রীডার। সে যুগের পনেরো

টাকার প্রুফ-রীডারের ছাপ তো আর গায়ে লেগে নেই। আর দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যেন এক হয়ে একাকার হয়ে যাওয়া যায়। একসঙ্গে খেতে বসলে তো তার পাতায় একটা সন্দেশ কম পড়বে না তা বলে।

কুমুদ সেলাই করতে করতে আর একবার জানালার বাইরের দিকে চেয়ে রাতটা আন্দাজ করলে।

কিন্তু এত রাতই বা কেন হচ্ছে মানুষটার। বাব্‌লু একমনে পড়ে চলেছে। বাবার জন্যে সে-ও জেগে রয়েছে এত রাত পর্যন্ত। বড় রাস্তার খাবারের দোকানের রেডিওটা এখন বন্ধ হয়ে গেল। রাত গভীর হচ্ছে।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো—খটাখট—খটাখট্—

—খোকা।

ইন্দ্রনাথের গলা। ইন্দ্রনাথের গলা যেন কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট। একমুখ পান খেয়ে ডাকলে যেমন হয়।

বাব্‌লু উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে।

কুমুদ কাপড়টা পাশে সরিয়ে উঠে দরজা খুলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্রনাথ ঢুকলো।

কুমুদ দেখলে, যা ভেবেছে সে তাই, সত্যি একমুখ পান। কালো ঠোঁট জুড়ে পানের লালিমা। পান চিবুচ্ছে ইন্দ্রনাথ। নড়তে পারছে না সে। পেট ভরে খেয়ে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে এলে যেমন হয়। ইন্দ্রনাথ যেন ক্লান্ত। ভরপেট খাওয়ার ক্লান্তি।

বিছানার ওপর বসে পড়ে ইন্দ্রনাথ বললে—ঘুমোওনি তোমরা এখনও ?

তারপর বাব্‌লুর দিকে ফিরে বললে—তুমি এখনও জেগে আছ বাবা।

বলে খোকার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

—এই তোমার কাপড়টা সেলাই করছিলাম—কাপড়টা কুঁচিয়ে তুলতে তুলতে বললে কুমুদ।

—কী রকম খাওয়ালে বাবুরা—জিজ্ঞেস করলে কুমুদ।

ইন্দ্রনাথ হাই তুলছিল আরাম করে। হাই তোলা শেষ করে বললে— বেশ খাওয়ালে, রান্নাবান্না বেশ হয়েছিল।

বাব্‌লু জিজ্ঞেস করলে—পদ্য আনোনি বাবা ?

—পদ্য ? আজকাল কি পদ্য হয় রে বোকা ছেলে—ইন্দ্রনাথ আদর করলে একটু অনুকম্পার স্বরে।

কুমুদ তখন পাশে বসে পড়েছে। বললে—বাড়িটা খুঁজতে কষ্ট হয়নি তো? নতুন বাড়িতেই বিয়ে হোল তো?

—না কষ্ট হবে কেন—ইন্দ্রনাথ বললে—বিয়ে বাড়ি খুঁজতে কি কষ্ট হয়, আধ মাইল দূর থেকেই লুচি ভাজার গন্ধ আসে নাকে।

—লুচি গরম ছিল?—কুমুদ জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ।

ইন্দ্রনাথ বললে—প্রথম যে ক'খানা পাতে দিল সেগুলো ঠাণ্ডা, পরে গরম এল; দু'চারখানা ক'রে গরম গরম দিয়ে যেতে লাগলো—পরে পোলাও দিয়ে গেল—সরু বাঁকতুলসী চালের পোলাও—চপ্‌চপে ঘি—

শুধু লুচি নয়, পোলাও হয়েছিল। তা' ধরণীবাবু শৌখীন বড়লোক, খাওয়াবেন বৈকি! তা'তে আবার বড় ছেলের বিয়ে। পোলাওটা না করলেই বরং অস্বাভাবিক হোত।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?

—কখন—কুমুদ উত্তর দিলে।—কোন্ সকালে খেয়ে দেয়ে বাসন মেজে মায়ে পোয়ে জেগে বসে আছি।

—কেন জাগতে গেলে আমার জন্যে—আমার তো খাওয়ার হাঙ্গামা নেই, কাল থেকে তো আবার সেই রাত চারটের সময় ওঠা।

কুমুদ কিছু বললে না। চুপ করে বসে রইল।

ইন্দ্রনাথ বললে—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও তো, পোলাওতে খুব ঘি দিয়েছিল কিনা, কেবল জল টানছে।

জল এনে দিলে কুমুদ। জিজ্ঞেস করলে—কী কী খাওয়ালে ওরা?

—সবাই যেমন খাওয়ায়, বেগুন ভাজা থেকে শুরু করে দই রাবড়ী।

—গোড়া থেকে বলো না গো, একেবারে প্রথম থেকে—কলাপাতা থেকে আরম্ভ কর।

ইন্দ্রনাথ বললে—কলাপাতা তো পাতাই ছিল, তার ওপর একখানা করে বেগুন ভাজা, একমুঠো শাক ভাজা আর খান কয়েক ঠাণ্ডা-লুচি—একটু নুন, আর এক-টুকরো লেবু।

—তারপর?

—সবাই গিয়ে বসলুম। বসবার পর এক ভদ্রলোক বললেন—এবার তবে আরম্ভ

করা যাক্—যেমন বলা আর দেরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে লুচি ছেঁড়ার শব্দ—বেগুন ভাজাটিকে নুন দিয়ে মেখে……

ইন্দ্রনাথ থামলো।

—থামলে কেন, বল—বললে কুমুদ।

—তারপর একজন ঝুড়িভর্তি গরম লুচি নিয়ে জিজ্ঞেস করে করে ঘুরে গেল। আর ওদিক থেকে ডালের গামলা নিয়ে পাতে ডাল দিতে দিতে চললো আর একজন।

—নিরামিষ না মুড়িঘণ্ট ?

—দু'রকমই, নিরামিষটা মুগের আর মুড়িঘণ্ট ছোলার ডালের—দু'টোই খেলাম।

কুমুদ হঠাৎ কথার মাঝখানেই বললে—মুড়িঘণ্ট ফেলে কেউ নিরামিষ খায়! আমি হলে তো…তা যাক্, তারপর ?

—তারপর আর কি—এল একটা বাঁধাকপির তরকারি, কড়াইশুঁটি দিয়ে!

—চোতমাসে বাঁধাকপি ?—কুমুদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখন তো বাঁধাকপি আর ঘাস সমান, কুমড়োর ছক্কা তো বাপু করা উচিত ছিল, বেশ ছোলা দিয়ে—ঝালঝাল তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে—যেমন টুনিদি'র বিয়েতে খেয়েছিলাম, এখনও মুখে লেগে আছে যেন।

বিয়ের নেমন্তন্নয় কুমড়োর ছক্কা না হওয়াতে কুমুদ যেন মুষড়ে পড়লো।

—যাক্, থামলে কেন বল।

ইন্দ্রনাথের উৎসাহ যেন কমে এসেছে। বললে—তারপর মাছ…

—শুধু মাছ বললেই হোল, কি মাছ, নাম নেই ? কালিয়া না কোর্মা…আমার ন'দা নেমন্তন্ন খেয়ে এসে এমন চমৎকার গল্প করতো, আমরা জেগে বসে থাকতুম ন'দার খাওয়ার গল্প শুনবো বলে। তুমি যেমন খেতেও জানো না খাওয়ার গল্পও করতে পারো না।

ইন্দ্রনাথ আরম্ভ করলে—কালিয়া আর কোর্মা, দুই-ই রুই মাছের।

—কেমন রেঁধেছিল কোর্মাটা ? কোর্মার রঙ হয়েছিল ?

—হয়েছিল, কিন্তু চিংড়ির মালাই-কারিটা ভাল হয়নি—ইন্দ্রনাথ ঢেকুর তুললে একটা।

—এঃ আসল জিনিসটাই খারাপ করলে ? কেন নুন বেশী হয়েছিল বুঝি ? কুমুদ এবার রীতিমত মুষড়ে পড়লো। যেন এ তার নিজের বাড়ির কাজ।

—কেন জানিনে—ইন্দ্রনাথ বললে—কিন্তু মুখে ভাল লাগলো না, এক টুকরো কামড়ে আর খেতে পারলুম না।

চিংড়ির মালাই-কারি ইন্দ্রনাথ এক টুকরো কামড়ে আর খেতে পারেনি, এ দুঃখ যেন ইন্দ্রনাথের নয়, কুমুদের। যেন কুমুদই অভুক্ত থেকে চলে এসেছে। বললে—আর সবাই? আর সবাই খেলে?

—কেউ না, কেউ খেতে পারলো না—ইন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় বললে।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো কুমুদ। বলে—তারপর।

—তারপর চাটনি, পাঁপর ভাজা, দই।

কুমুদ জিজ্ঞেস করবার আগেই ইন্দ্রনাথ বললে—দু'রকম চাটনি, একটা আলুবখরার আর একটা আদার।

অবাক হয়ে গেছে কুমুদ। বললে—কি বললে? আদার?

—হ্যাঁ, আদার চাটনি—এক নতুন ধরনের। তারপর এল মিষ্টি···ছ'রকমের।

—ছ'রকম? কুমুদের গলার স্বরে এবার অদম্য বিস্ময়।

—হ্যাঁ গুনেছি আমি, ছ'রকম। তিন রকমের সন্দেশ, একটা কড়াপাক, একটা কাঁচাগোল্লা, আর একটা জয়-হিন্দ্ সন্দেশ, আর মিহিদানা, লেডিগেনি আর শেষে হলো দরবেশ···যে যতো পারে—

কুমুদ স্তম্ভিত। মুখে আর কথা নেই। চোখ দুটো পলকহীন করে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। এ-ও কি সম্ভব! সার্থক ধরণীবাবু আর সার্থক তার ছেলের বিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে কুমুদের মুখে কথা বেরুল।

—ক'টা খেলে তুমি?

ইন্দ্রনাথ টপ্ করে জবাব দিতে পারলে না। একটু থেমেই রইল। তারপর প্রশান্ত গলায় বললে—একটাও না।

একটাও না। কুমুদের দয়া হোল স্বামীর ওপর।

—গোড়াতেই ছাইভস্ম দিয়ে বুঝি বোকার মতন পেট ভরিয়ে ফেলেছিলে?

—না।—ইন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বললে।

—তবে?

ইন্দ্রনাথ পকেটে হাত দিলে। পকেট থেকে বার করলে ছোট একটা পুঁটলি। রুমালে বাঁধা জিনিসটা কুমুদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে খুলে দিয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল। বললে—লুকিয়ে লুকিয়ে সবগুলো পকেটে পুরেছিলুম।

বাব্লু এতক্ষণ পরে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া যেন সশরীরে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে—মা, দেখি।

কুমুদ দুই হাতের আঙুল দিয়ে রুমালের গেরোগুলো খুললে। কিন্তু সব মিষ্টিগুলো পকেটের চাপে পড়ে এক বৃহৎ পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। সন্দেশ, লেডিগেনি, মিহিদানা, দরবেশ মিলে একাকার। তা'হোক মিষ্টি তাতে বিশেষ খারাপ হয় না। কুমুদ দেখলে, বাব্লুকে দেখালে, অনেকক্ষণ ধরে। তারপর নাকের কাছে রুমালসুদ্ধ উঁচু করে ধরে নামিয়ে নিয়ে বললে—বিয়ে বাড়ির মিষ্টির গন্ধই আলাদা, দেখেছো ?

বিয়ে বাড়ির মিষ্টির গন্ধ সত্যিই আলাদা কিনা ইন্দ্রনাথও একবার শুঁকে দেখলে।

তারপর বাব্লুকে বললে—খোকন, একটা সন্দেশ খাবি ?

রাত তখন দেড়টা কি দু'টো। ইন্দ্রনাথ বিছানা ছেড়ে উঠলো। চারিদিক নিশুতি।

অত্যন্ত সন্তর্পণে মশারি তুলে বাইরে এল। ছোট জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরের বিছানায় পড়েছে। কুমুদ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত সে! ভোর চারটের সময় উঠে আবার তাকে উনুনে আগুন দিয়ে ভাত রেঁধে দিতে হবে। খোকা ঘুমোচ্ছে। মাথার বালিশের কাছে কাঁসার বাটি ঢাকা দেওয়া তার সন্দেশ রয়েছে। রাত্রে সে খায়নি। বোধ হয় সকালবেলা সদর-দরজায় বসে পাড়ার ছেলেদের দেখিয়ে চেটে চেটে খাবে।

ইন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরের পূব কোণে চলে এল। একটা গেলাস নিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলে। গেলাসটা সম্পূর্ণ উপুড় করে শেষ ফোঁটা পর্যন্ত খেলে। কিন্তু তবু যেন পেটটা ভরলো না, তার মনে হলো। আবার এক গ্লাস জল গড়ালো। কুমুদ না জেগে উঠে আবার দেখে ফেলে তাকে। দ্বিতীয় গ্লাসটা সম্পূর্ণ শেষ করলে। তবু যেন পেটটা ভরলো না মনে হলো।

তৃতীয় গ্লাস জলটা খেয়ে যেন শান্ত হলো হুতাশন।

মশারি তুলে বিছানায় ঢুকতে যাচ্ছিল, একটু শব্দ হওয়াতে কুমুদ চমকে জেগে উঠেছে।

—কে, কে—কে ?

—আমি, তেষ্টা পেয়েছিল, জল খেলাম উঠে।

—এত জল তেষ্টা, এই তো জল খেয়ে শুলে !

ইন্দ্রনাথ বললে—পোলাওটা বেশী খেয়ে ফেলেছি, খুব ঘি দিয়েছিল কিনা তাই জল টানছে।

কুমুদ ঘুমের ঘোরে ইন্দ্রনাথের উত্তরটা বোধ হয় আর শুনতে পেলো না!

তবু পরদিন সকালেও সত্যি কথাটা বলতে বাধলো ইন্দ্রনাথের। ধরণীবাবু তার পুরোন মনিব, বিরাট বড়লোক। শেষকালে তাঁর বড় ছেলের বৌভাতে কিনা, এক গ্লাস করে ডাবের জল আর পান সিগারেট খাইয়ে ছেড়ে দিলেন। পকেটে ভাগ্যিস দুটো টাকা ছিল তাই তো সে দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনতে পেরেছে।

আমীর ও উর্বশী

জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং-এর জীবনরাম বললেন—কিছু খেয়ে নিলে হোত না হরিপদ?

হরিপদ তৈরীই ছিলো। বললে—এই রোথকে, রোথকে।

ফিটন গাড়িটা থেমে গেলো।

—তাহলে এই দোকানেই ঢোকা যাক, কী বলেন, বেশ নিরিবিলি আর মাংসটা আপনার গিয়ে খুব ভালো করে এরা।

হরিপদ সম্মতির অপেক্ষা করতে লাগলো।

তা জীবনরামের আপত্তি নেই। হরিপদ যখন বলছে, তখন আর তাঁর আপত্তি করবার কী আছে। কলকাতা শহর সম্বন্ধে হরিপদর চেয়ে কে আর বেশী জানে? এখানে এই শহরে হরিপদই তো জীবনরামের ভরসা। হরিপদর হাতেই জীবনরাম নিজের ভালমন্দের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত।

—নেমে আসুন স্যার—হরিপদ গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়ালো।

—দেখবেন স্যার, খুব সাবধান।

জীবনরামকে একরকম হাত ধরেই নামিয়ে নিলে হরিপদ।

জীবনরাম বললেন—ওগুলো নিলে না?

—কিছু ভাববেন না স্যার, আমি যতক্ষণ আছি আপনি কিছু ভাববেন না—বলে হরিপদ গাড়ির ভেতর থেকে গোটা তিন-চার বোতল জামার পকেটে আর বগলে তুলে নিলে। বললে—আসুন স্যার, আমার পেছনে পেছনে আসুন।

নিরিবিলি একটা ঘেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে হরিপদ বললে—বসুন এখানে আরাম করে আপনি।

তারপর বাইরে গিয়ে একজন 'বয়'কে সঙ্গে নিয়ে এসে বললে—সেলাম কর বাবুকে, সেলাম কর বেটা, কোটিপতি বাবু, বুঝলি, চক্ষু সার্থক করে নে। তোদের এই দোকানের মত দশটা দোকান কিনে নিতে পারেন। আজ বেটা তোর ভাগ্যি ভালো, মোটা বকশিষ পাবি—সেলাম কর।

জীবনরাম বিব্রত বোধ করলেন—থাক হরিপদ, থাক।

—না, থাকবে কেন মশাই, করলেই বা সেলাম, পুণ্যি হবে বেটার, কটা কোটিপতি দেখেছে মশাই ও! সত্যি কথাই বলবো মশাই, আমিই বা কটা কোটিপতি দেখেছি? এ আমার বাপের ভাগ্যি যে, আপনার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই—নইলে আমরা কি আপনার পায়ের ধুলোরই যুগ্যি?

জীবনরাম প্রশান্ত মুখে হাসতে হাসতে বললেন—কী যে তুমি বল হরিপদ।

হরিপদ জীবনরামকে বললে—না, খুব বিশ্বাসী লোক, বুঝলেন? আমি এখানে যখন আসি, এর হাতে ছাড়া খাইনে…এখন কী খাবেন বলুন তো…এখানে আপনার সব পাওয়া যাবে।

জীবনরাম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন…

তার আগেই হরিপদ বললে—তুই-ই একটু বুদ্ধি খরচ করে নিয়ে আয় দিকিন, বেশ ঝাল-ঝাল মিঠে-মিঠে—যা খেলে শরীরটা চাঙা হয়ে ওঠে…কী বলেন স্যার?

হরিপদ দেখলে, জীবনরাম যেন উসখুস করছেন। পাখাটা জোরে ঘুরছে… আদ্দির পাঞ্জাবির হাতা দু'টো মিহি গিলে করা। মিনে করা হীরের বোতাম চারটে ঝিক্‌মিক্ করছে, আর গলার বোতামটা খোলা, তারই উল্টো পিঠে বেগুনি মিনেতে লেখা 'জে. কে.' অর্থাৎ ডিমুচেরালির সুবিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর মালিক জীবনরাম কুণ্ডু। খাঁটি কালো গায়ের রং। হরিপদর উপরোধে আজ মুখে স্নো আর পাউডার মেখেছেন।

হরিপদ বললে—আর একটু ঢালবো নাকি স্যার? এখনি ঝিমিয়ে পড়লে চলবে কেন?

জীবনরাম বললেন—শেষকালে ডোজ বেশী হয়ে যাবে না তো হরিপদ?

—বলেন কি স্যার, আমি যতক্ষণ আছি, আপনি কিছু ভাববেন না, চলুন না, এই যাবার মুখে মাথুরামের বেনারসী পানের দোকানে মৃগনাভি দেওয়া খিলি খাইয়ে দেব, দেখবেন শরীর একেবারে চাঙা হয়ে উঠেছে, ঠিক পঁচিশ বছরের ছোকরার মতন, আমি তো আছি। আপনার ভয় কিসের।

তা বটে। আজ সকাল থেকেই জীবনরাম যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছেন। বহু অভাব দুঃখ কষ্ট গেছে জীবনরামের জীবনে। এককালে ঢাকায় খবরের কাগজ ফেরি করতে হয়েছে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে কত রাত কাটাতে হয়েছে। কত বিনিদ্র রাত কেটেছে জীবনরামের উপোস করে। তখন অবশ্য আগুন লাগেনি ভাতের, কিন্তু দেশের সেই সুদিনেও তাঁর কতদিন ভাত জোটেনি। কিন্তু একনিষ্ঠা আর অধ্যবসায়, ওরই জোরে 'জীবনরাম কুণ্ডু কোং'-এর একদিন প্রতিষ্ঠা হলো।

হরিপদ গ্লাসটা এগিয়ে ধরলে। বললে—বেশ অল্প করে সোডা দিয়ে দিয়েছি, চোঁ চোঁ করে ঢালুন তো গলায়—ঢেলেই সিগ্রেটে টান দিন, ওই সিগ্রেটটা টানতে যেন দেরি করবেন না স্যার, তাহলেই সব ফুর্তি একেবারে মাটি।

জীবনরাম বললেন—কিন্তু ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো হরিপদ?

—আজ্ঞে, দেরি কোথায়, হরিপদর ঠিক হিসেব আছে, আটটার সময় যাবার কথা, এখন বেজেছে ছটা—দু'ঘণ্টা এখন মাজ্ঞা-দিয়ে শরীরটাকে চনচনে করে তুলুন না।

হরিপদ জীবনরামের দিকে চোখ টিপে একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলে।

সরু দেরাদুন চালের ভাত আর ফাউল-কারী।

জীবনরাম মুরগীর ঠ্যাংটা নিয়ে আর সামলাতে পারছেন না। ঝোলে-ঝালে জীবনরামের হাত আর মুখ একাকার হয়ে গেছে। হরিপদ দেখতে লাগলো। দেখতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো। তেরশ' পঞ্চাশের শ্রাবণ মাস সেটা। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি···সারা গাঁয়ে এককণা চাল নেই কারু কাছে। আগের বোশেখে মেজো ছেলেটা মারা গেছে পেটে ঘা হয়ে, তারপর পড়ল ছোট মেয়েটা জ্বরে। জ্বর থেকে উঠে পথ্য করবার চাল নেই। জীবনরাম বলেছিল—একটু বেশী রাত করে এস হরিপদ, চাল দেব তোমাকে।

রাত করেই হরিপদ গেলো। দরজার বাইরে টোকা দিতেই কয়াল এসে দরজা খুলে দিলে।

জীবনরাম অত রাত পর্যন্ত টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হরিপদকে দেখে বললেন—মুকুন্দ, ধুচুনীতে ভাল চাল একপো রাখা আছে, দাও তো এনে হরিপদকে, সস্তা দরেই তোমাকে দিলাম হরিপদ, আশি টাকার দরে তুমি চাল পাবে না এ তল্লাটে।

হরিপদ বলেছিল—একপো চালে আমার কী হবে, অন্তত সের দশেক—

জীবনরাম হেসে উঠেছিলেন হো হো করে—নিজের খাবার চাল থেকে দিলাম

কিনা, ছোট মেয়ে পথ্য করবে বললে—বলে সোনা চাইলে সোনা দিতে পারি, চাল কোথায় ?

কিন্তু কতদিন স্টেশনে যাবার পথে ডিমুচেরালির ঘাটে গিয়ে দেখেছে হরিপদ 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর গুদাম থেকে দু'মনি বস্তা পাচার হচ্ছে বজরা নৌকোয়। নৌকো ভর্তি হয়ে সে চাল কোথায় যেত কে জানে। চাটগাঁ, কলকতা, দিনাজপুর না যশোর কে জানে। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত লম্প জেলে কাজ হতো। 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর নতুন গুদাম তৈরী হলো, পনেরখানা বজরা তৈরী হলো। আর গাঁয়ের লোক উচ্ছন্ন হয়ে গেলো না খেতে পেয়ে। সে-সব তেরশ' পঞ্চাশ সনের কথা। কতদিন হয়ে গেলো তারপরে জীবনরাম কুণ্ডুর কলকাতায় চারখানা বাড়ি, দেশে চারটে গ্রামের পত্তনি, অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

জীবনরাম বললেন—দেরাদুন রাইস দিয়েছে হে হরিপদ ; আহা বেশ গন্ধ, এই চাল, এর জন্যে কী কাণ্ডটাই না হয়েছে, কি বল হরিপদ।

হরিপদ বললে—তা যা বলেছেন স্যার, মরেছে যতো হতভাগারা, পাপ করেছিলো আর জন্মে, তার ফল ভোগ করলে, তা মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনার তো চালের অভাব হয়নি।

জীবনরাম মুরগীর হাড় চুষতে চুষতে বললেন—আমি আর কী করেছি হরিপদ, দেখগে যাও নাড়াজোলের রায়েদের। মনে করলাম আর দর বাড়বে না, ষাট টাকার দরে ছেড়ে দিলাম, নইলে সেই দুশো বস্তায় আমারও বেকসুর দু'লক্ষ টাকা আসতো। দর যখন বাড়লো, তখন নাড়াজোলের রায়েরা ধুলোমুঠোকে সোনা মুঠো করছে আর আমি বুড়ো আঙুল চুষছি ; এখন ভাবি আর কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করে।

ভাত আর ফাউলকারীর শেষে এল চিকেন রোস্ট।

হরিপদ বললে—এইটে খুব চুষে চুষে খান স্যার, এটা খেলে একেবারে খাঁটি রক্ত করে ছেড়ে দেবে, খাওয়ার পর মৃগনাভি দেওয়া একখিলি পান খাইয়ে দেব, দেখবেন শরীরটা কেমন চাঙা হয়ে ওঠে।

জীবনরাম বললেন—সেদিন সন্ধ্যায় পানটা খেয়ে খুব ভাল ফল দিয়েছিলো হরিপদ।

হরিপদ বললে—আজ্ঞে ওটা পানের গুণ নয়, যা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছি ও আপনার গিয়ে কোটিতে একটা পাবেন কিনা সন্দেহ, এই রাত্রে যাচ্ছেন তো, গেলেই টের পাবেন!

জীবনরাম যেন বিগলিত হয়ে গেছেন, বললেন—চোখ দুটো ওর ভারি মন-মাতানো কিন্তু হরিপদ।

হরিপদ বললে—কোনটা মন-মাতানো নয়, বলুন তো স্যার, আপনি তো সকালে দু'ঘণ্টা কথা .বললেন, চুলটা কেমন বলুন দিকি, ঠোঁঠ দুটো, গাল, নাক আর গায়ের রং—ইহুদী মেয়েকে হার মানিয়ে দেবে, মশাই .

জীবনরাম বললেন—বাড়িতে কে কে আছে ওদের ?

—ওই তো বুড়ো মা, বড় ভাই আর ছোট একটা বোন। বড় ভাইটা কি মানুষ ? মানুষ নয় স্যার, কোনও দিন বাড়ি আসে, কোনও দিন আসে না, এদের চলে কি করে বলুন তো ? ওই মেয়েটা কলেজে পড়ে, কিন্তু পয়সা নেই, আমি ভিক্ষে-টিক্ষে করে টাকার যোগাড় করে দেই, তাই চলে। আমাকেই ও-বাড়ির একরকম অভিভাবক বলতে পারেন।

জীবনরাম বললেন—বাড়িটা বড় ঘুপ্‌সির মধ্যে হরিপদ, পাড়াটাও ভালো নয়।

হরিপদ বললে—ওই বাড়িরই ভাড়া আজ্ঞে পঞ্চাশ টাকা, আপনার যদি কৃপা হয়, তবে বাড়ি বদলাতে কতক্ষণ ? কলেজের মাইনে দু'মাসের বাকি পড়েছে, ছোট বোনটার অসুখ, ডাক্তারের খরচ দিতে পারে না। বড় ভাইটা কেবল রেস্‌ আর তাশ খেলে বেড়ায়, আজকালকার বাজারে বাড়িভাড়া দিয়ে কলকাতা শহরে থাকতে কতো খরচ আপনি বলুন তো—

জীবনরাম বললেন—সকালবেলা দু'জন মোটরে করে কারা এসেছিলো হরিপদ ? ওই যে খুব বিরাট একটা গাড়ি, দুজন ভদ্রলোক—খুব বড়লোক বোধ হয়, হাতে ফুলের তোড়া।

ঠোঁট দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে হরিপদ বললে— আরে রামো, বড়লোক না হাতি, আপনার পায়ের যুগ্যি নয় ওরা স্যার, আপনাকে চিনতে পারলে ভয়েই পালিয়ে যেত, আমি তো দেখতে লাগলুম ওদের কাণ্ড—ফুল নিয়ে দিলে, দিনরাত এই সবই করছে, চকোলেট আনে, গয়না আনে, শাড়ি দেয়, কত জিনিস কিনে দেয়, ওরা সব দালাল স্যার···দালাল লেগেছে পেছনে। বুঝেছে যে বাড়িতে কোনোও পুরুষমানুষ নেই।

জীবনরাম বুঝতে পারলেন না।

—দালাল ? কিসের দালাল হরিপদ ?

—আজ্ঞে, সিনেমা কোম্পানির রেকর্ড কোম্পানির দালাল সব। হাজার টাকা মাইনে দিতে চায়, বলে—গাড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবো, দিয়ে যাবো। যেখানে

যাবে, মা সঙ্গে থাকবে, ছ'টার পর ছুটি দেবো ; কত লোভ দেখায় ! আহা, ছোট মেয়ে তো, কতই বা বয়েস, এই শ্রাবণে আঠারোয় পড়েছে। লোভও হয়, একদিন হয়েছে কি জানেন, এক বায়োস্কোপ কোম্পানীর যে খোদ মালিক, সে-ই এসেছে গাড়ি করে, এসে বলে—অনিতা আমার মেয়ের মত, ওর ভাল-মন্দ আমারও ভাল-মন্দ—বলে মাকে তো রাজী করিয়েছে।

জীবনরাম যেন নিজের ব্যবসার একটা লোকসানের সংবাদ শুনে ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বললেন—বল কি হরিপদ, রাজী করিয়েছে···সবনাশ করেছে, খবরদার খবরদার, ভদ্রলোকের গেরস্থ ঘরের মেয়ে—শেষকালে কি বায়োস্কোপে নাচবে নাকি ! ছি, ছি, তুমি থাকতে হরিপদ, ভদ্রলোকের মেয়ের এই গতি হবে, আর আমরা চোখ মেলে দেখবো !

হরিপদ বললে—ওতো তবু ভালো মশাই, আর একদিন হয়েছিলো কি জানেন না, ওদের কলেজের একটা চ্যারিটি শো-তে নাচতে গেছে, নাচ হচ্ছে স্টেজে, সোনাগড়ের কুমারবাহাদুর নাচ দেখে একেবারে পাগল—একেবারে পাগল মশাই। কী চেহারা ! রাজার ছেলে, হবে না কেন, যেমন রং তেমন গড়ন আর তেমনি মুখের কথা, একটা সোনার মেডেল দিলে অনিতাকে ; তারপর গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলে।

জীবনরাম বললেন—বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলো !

—তবে আর মজাটা হোল কি। শুনুন না বলি, ড্রাইভারকে দিয়ে খাবার কিনে আনালে, তারপর সবাই মিলে খাওয়া হলো, তার পরদিন এলো, আবার তার পরদিন এলো, এই রকম রোজ আসে। রাজার ছেলে, এরাও কিছু বলতে পারে না, শেষে একদিন দারোয়ান দিয়ে চুপি চুপি অনিতার নামে একটা পাঁচশো টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছে···

জীবনরাম এবার সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে পাঁচশো টাকার চেক ? খুব বড়লোক নাকি ?

—আরে রাম, ওকে বলেন আপনি বড়লোক, স্টেট তো উল্টে যেতো, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে চলে গেছে। এখন রিসিভারের কাছ থেকে এক এক ছেলে মাসোহারা পায় দু'হাজার করে, কিন্তু চরিত্রহীন যারা, তাদের আপনার দু'হাজার টাকায় কি হবে বলুন স্যার ?

জীবনরাম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

—তারপর সেই পাঁচশো টাকার চেকটা ?

—আজ্ঞে, চেকটা তো অনিতা নিলে, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে তো কিছু করবে না, আমার ভারি রাগ হয়ে গেল স্যার, আমি ওর মাকে বললুম—এসব কী কাণ্ড! গেরস্থ ঘরের মেয়ের নামে একেবারে টাকা পাঠানো, এ তো ভালো কথা নয়, এরপর কত কী হবে, হ্যাঁ বুঝতাম, দিতো এসে নিজে মার হাতে তুলে—যে তোমাদের অভাব, আমি কিছু সাহায্য করছি ইত্যাদি, সে এক আলাদা জিনিস।

জীবনরাম বললেন—এসব লোকদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে হরিপদ।

—না, এই যে সকালে আপনি আমাকে হাজার টাকা দিয়েছেন, আপনি তো অনিতার হাতেই দিতেই পারতেন। তা না দিয়ে আমাকে দিলেন কেন? আমি সেই টাকা নিয়ে সোজা অনিতার মাকে গিয়ে দিলাম—বললাম ভগবান কুণ্ডুবাবুকে যেমন টাকা উপায় করবার মাথা দিয়েছেন, তেমনি দান করবার হৃদয়টুকুও দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে খিচুড়িখানা করেছিলেন, পরের জন্যে আপনি ফতুর—সত্যি কথাই সব বললাম স্যার, বললাম—নাও, এই হাজার টাকাতে যতদিন চলে চালাও। তারপর কুণ্ডুবাবুর কাছে হাত পেতে কখনও কেউ হতাশ হয়নি।

জীবনরাম বললেন—আরো যদি টাকার দরকার থাকে তো আমাকে বলো হরিপদ।...তা ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন করে?

—সে এক ইতিহাস স্যার, বেনেটোলা লেনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ দেখি, একটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি থেকে একটা মেয়ে লাফিয়ে পড়লো, লাফিয়েই আমাকে দেখে আমার দিকে এসে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো। অমন-সুন্দর চেহারা, ভাবলুম—এ কি রে বাবা! চেয়ে দেখি, গাড়ি থেকে আরো দু'জন লোক নেমে পড়লো ওর পেছন পেছন। কিন্তু আমাকে দেখে আর কাছে এগুলো না। আমি বললাম—কী হয়েছে? মেয়েটা বললে—একলা বেরিয়েছিলো, ওরা পেছন নিয়েছিলো। তারপর নিরিবিলি দেখে এক সময়ে এক গলির মধ্যে জোর করে ওই গাড়িতে তুলে নিয়ে আসছিলো, এইখানে সুযোগ পেয়ে মেয়েটা লাফিয়ে নেমে পড়েছে, তারপর বাড়িতে নিয়ে এলুম। আমার তো জানেন বৌ নেই, ছেলেপিলে নেই—

জীবনরাম বললেন—চাকর সঙ্গে না নিয়ে বেরুনোই অন্যায়।

—আমার তো চাকর রাখবার সামর্থ্য নেই স্যার। আপনি আছেন, আপনি দেখুন, আপনার কৃপা হলে চাকর, দারোয়ান, গাড়ি, ঘোড়া সব হবে অনিতার। সেই সব কথাই আজ বললাম অনিতাকে।

জীবনরাম প্রীত হলেন। বললেন—বললে নাকি হরিপদ ?

—বললাম বৈকি স্যার, সবই বললাম অনিতাকে—বললাম কুণ্ডুবাবুর আর কে আছে, আপন বলতে তো কেউ নেই। বউ, ছেলে, মেয়ে সে তো সবারই থাকে কিন্তু সারা জীবন ব্যবসা নিয়েই মত্ত। অফুরন্ত টাকা দিয়েছে ভগবান, ভোগ করবার লোক নেই। তা একটু স্নেহ-ভালবাসা, একটু আদরযত্ন—এর জন্যেই কুণ্ডুবাবু আকুল।

জীবনরাম বললেন—তা ঠিকই বলেছো হরিপদ; ছোটবেলায় যেমন দুঃখ কষ্ট পেয়েছিলাম বড় হয়ে তেমনি টাকার অভাব হয়নি, দুহাতে টাকা উপায় করেছি। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে বুঝতেই পারিনি, নজর ছিলো কেবল কেমন করে ব্যবসা আরো বড় হবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গদির উপর কাটিয়ে রাত্রে বাড়ি গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি, আবার সকাল হলেই উঠে গদিতে গিয়ে বসেছি, যেন এক ঘুমেই যৌবনটা কাটিয়ে দিয়েছি। এখন ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি এ এক বিচিত্র জগৎ, কখন বয়েস হয়ে গিয়েছে টের পাইনি, এখন দেখছি কিছুই ভোগ করা হোল না, শুধু চিনির বলদের মত টাকা উপায় করেই গেলাম। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কত জিনিসই নজরে পড়ে, মনে হয় কিছুই পাইনি। দু' একটা চুল পেকেছে মাথার, কপালে খাঁজ পড়েছে, দাঁত নড়তে শুরু করেছে—তাই হঠাৎ বায়োস্কোপে গিয়ে থিয়েটারে গিয়ে সামলাতে পারি না। মনে হয়—আমার সব গেছে, আমি বাতিল হয়ে গেছি।

হরিপদ বললে—কী আর আপনার বয়েস হয়েছে স্যার এমন, এখনও দুটো বিয়ে করা চলে ও বয়সে, অনিতা আপনার বয়েসের কথা জিজ্ঞেস করছিলো সকালবেলা…

—তাই নাকি ? তুমি কী বললে হরিপদ ?—জীবনরাম প্রশ্ন করলেন।

—সত্যি কথাই বললাম স্যার, বললাম—আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশে পড়বে এবার; তা পুরুষ মানুষের আবার বয়েস, পয়সার জোরই আসল জোর, পয়সার জোর থাকলে পঞ্চাশ বছরেও ছোকরার মত শক্তি থাকে।

পঞ্চাশ বছর বয়সের জীবনরাম কুণ্ডুকে চল্লিশ বছর বয়সের যুবকে পরিণত করাতে জীবনরামের মুখটা কেমন আনন্দে বিগলিত হয়েছে তাই দেখতে লাগলো হরিপদ। জীবনরামের কালো মুখের উপর ততোধিক কালো বসন্তের দাগগুলো যেন কুৎসিত ব্যাধির দাগের মত দেখাচ্ছে। হরিপদ নিজের চোখের ক্রুর দৃষ্টিকে মোলায়েম করে জীবনরামকে দেখতে লাগলো।

সরলার শেষ সময়ের কথাগুলো মনে পড়লো হরিপদর। মরবার আগে হরিপদ গিয়েছিলো সরলাকে দেখতে।

সরলা বলেছিলো—ওগো ওরা আমাকে একমুঠো চাল দেয়নি, আমার ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরলো, কত খোসামোদ করেছি—ওদের ভগবান শাস্তি দেবে না ?

সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে মাথুরামের বেনারেসী পানের দোকান থেকে মৃগনাভি দেওয়া খিলি আনলে হরিপদ।

বললে—এই খিলিটা খান, দেখবেন, কেমন তাজা বোধ করছেন।

জীবনরাম বললেন—বোতলগুলো শেষ হয়ে গেছে, না আছে কিছু ?

—আজ্ঞে, আর খাবেন না, নইলে মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুবে, মদটা অনিতা পছন্দ করে না কিনা।

গাড়িটা ধর্মতলা স্ট্রীটের পাশ দিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলো। বাইরে সবে অন্ধকার হয়েছে। রাস্তায় লোকের ভিড়। চলমান জনতা। জীবনরাম উসখুস করছেন। হরিপদ চেয়ে দেখলে। ওষুধের ফল হয়েছে।

উজ্জ্বল ফর্সা রং-একটি মেয়ে। চোখে মুখে ঠোঁটে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য। দেহের চলাফেরাতে এক অদ্ভুত মাদকতা এনে দেয়—জীবনরাম কল্পনায় অনিতাকে দেখতে লাগলেন। সকালবেলায় একটু আলাপ করে এসেছেন। তারপর রাত আটটায় যাবার কথা। অর্থ—প্রচুর অর্থ নিয়ে জীবনরাম করবেন কি—সব ব্যর্থ, যদি ভোগই না হলো। নির্জীব প্রাণহীন দেহ আর ভোগহীন জীবন—জীবনরামের কাছে যেন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর গদিতে বসে যৌবন চলে গেছে অজ্ঞাতে, আজ লুপ্ত যৌবনকে আবার বুঝি ফিরে পেয়েছেন। কান দুটো তাঁর গরম হয়ে এলো, চোখ দুটো জ্বালা করে, সমস্ত শরীরে শিরায় শিরায় আজ লাল রক্ত চলাচল যেন নতুন করে আবার শুরু হয়েছে। জীবনরাম জোরে জোরে পান চিবুতে লাগলেন।

হরিপদর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

জীবনরাম বললেন—গাড়িটা বড় আস্তে আস্তে চলছে হে হরিপদ, একটু জোরে চালাতে বলো না।

হরিপদ জোরে হাঁকাবার হুকুম দিলে।

দুটো তিনটে গলি পেরিয়ে গাড়িটা অন্ধকার একটা সরু গলির সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার হয়েছে চারদিকে। গলির ভেতর গাড়ি ঢোকে না। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে হবে ভেতরে।

হরিপদ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বললে—আপনি গাড়িতে বসুন স্যার, আমি আগে গিয়ে দেখে আসি।

হরিপদ নেমে গেলো। জীবনরাম দেখলেন, অন্ধকারের ভেতর হরিপদর চেহারা মিলিয়ে গেলো।

তারপর গাড়িতে হেলান দিয়ে একটা সিগ্রেট ধরালেন। অন্ধকারে সিগ্রেটের আগুনটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। বাইরে কোন বাড়িতে কারা বুঝি উনুনে আগুন দিয়েছে···ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। উত্তেজনায় জীবনরাম উন্মাদ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু হরিপদ আর আসে না। জীবনরাম আর একটা সিগ্রেট ধরালেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় না, কিন্তু জীবনরামের মনে হলো—ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন পাকে পাকে অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরেছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন তাঁর দ্বিগুণ ক্ষমতা নিয়ে আজ সজাগ হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয়গুলোর অনুভূতি আজ তীব্রতর হয়ে তাকে পীড়ন করতে লাগলো। জীবনরাম সেই অন্ধকার পরিবেশে গাড়িতে বসে বসে প্রতীক্ষার আলস্যে অসহ্য হয়ে উঠলেন। মনে হলো যেন মুহূর্তগুলো ধীর পদক্ষেপে তাঁর কাছে এসে অস্ত্রধারী মুমূর্ষু সৈনিকের মত নিশ্চল হয়ে এলো। সময়ের পাখা যেন অপ্রত্যাশিত ব্যাধের আক্রমণে হঠাৎ থেমে গেছে। তাঁর মনে হলো যেন হরিপদ আর আসবে না।

কিন্তু হরিপদ খানিক পরেই এল।

বললে—মুশকিল হয়েছে স্যার, ওর এক দূর সম্পর্কের কাকা হঠাৎ এসেছে বাড়িতে।

যেন পাহাড়ের চূড়োয় উঠিয়ে কে তাঁকে সেখান থেকে ঠেলে নিচেয় ফেলে দিলো। বললেন—তা হলে দেখা হবে না ?

—দেখা হবে না কি মশাই! হরিপদ যখন আছে তখন আপনি কিছু ভাববেন না।

হরিপদ অভয় দিলে।

—কিন্তু একটা অসুবিধে হয়ে গেছে স্যার! কথা বলতে পারবেন না, চুপি চুপি সব সারতে হবে, আর আলোও জ্বালাতে পারবেন না—বলে হরিপদ জীবনরামের মুখের দিকে উৎসুক হয়ে তাকালে।

—তা হোক, অন্ধকারই ভাল, কথা নাই-বা বললাম—জীবনরাম বললেন। জীবনরাম উত্তেজনায় তখন অস্থির হয়ে উঠেছেন।

—তাহলে চলে আসুন, আপনাকে চুপি চুপি অন্ধকারে ঢুকিয়ে দেব, অনিতা ওই ঘরেই আছে—বলে হরিপদ সামনের দিকে চলতে লাগলো। জীবনরাম পেছন পেছন গেলেন।

অন্ধকার গলি এঁকেবেঁকে গিয়েছে। জীবনরাম হরিপদর ছায়া অনুসরণ করে চললেন। এক জায়গায় এসে হরিপদ বললে—এই যে দরজা, এই ঘরে ঢুকুন। আলো জ্বালবেন না, তাহলে ওর কাকা টের পাবে, আমি বাইরে আছি···ডাকলেই সাড়া দেব।

জীবনরাম অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই কে যেন বাহুবেষ্টন করে তাঁকে আলিঙ্গন করলে···

অনেকক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরুবার সময় জীবনরাম একটা সিগ্রেট ধরালেন। দেশলাই-এর কাঠিটা জ্বালাতেই তার আলোয় হঠাৎ যেন সামনে ভূত দেখে চমকে উঠলেন তিনি। এ কে? কে এ? এতক্ষণ তবে···কিন্তু এ তো অনিতা নয়! মুখখানার সামনে আর একটা কাঠি জ্বালালেন। ভয়ে আঁতকে উঠলেন জীবনরাম। মুখখানা বিকৃত, নাকের ওপর ফুটো হয়েছে, মাংস গলে পচে ঝুলছে, চুল উঠে গেছে আর্ধেক···কুষ্ঠ, কুষ্ঠব্যাধি! এতক্ষণ কুষ্ঠরোগীর বাহুবেষ্টনে তার সময় কেটেছে নাকি! জীবনরামের ঠোঁটে মুখে সমস্ত শরীরে কৃমির মতন যেন কতকগুলো পোকা কিলবিল করতে লাগলো। জীবনরাম নিরুপায় হয়ে আর্তনাদের মত চীৎকার করে ডাকলেন—হরিপদ, হরিপদ······

জীবনরামের কণ্ঠস্বর সেই অপরিসর ঘর আর সংকীর্ণ গলির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল শুধু······

হোলি ওয়াটার

টিপলার সাহেবের গল্পটা মহারাজগঞ্জে গিয়ে শুনেছিলাম। কিন্তু আজো, যখন চলতে চলতে কোথাও থামি, ক্লান্ত হয়ে কোথাও বসি দুদণ্ড, আড্ডা দিতে দিতে কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যাই, তখনই টিপলার সাহেব আর শনিচরিয়ার গল্পটা মনে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠি। মনে হয় টিপলার সাহেবের মত আমিও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে বুঝি 'হোলি ওয়াটার' খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়লাম। শনিচরিয়ার মত একদিনের চাকরি করতে এসে মন-প্রাণ বিকিয়ে দিয়ে ফেললাম, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। মনে হয় টিপলার সাহেবের মতই বুঝি সোজা রাস্তায় চলতে চলতে পথ ভুলে আমিও মহারাজগঞ্জে এসে তলিয়ে গেলাম।

কিন্তু তখনকার মহারাজগঞ্জ এমন ছিল না। এখন তো একত্রিশটা সাইকেল রিক্শা, পাঁচখানা ট্যাক্সি, তিপান্নটা দোতলাবাড়ি, হাসপাতাল, বিড়ি-ফ্যাক্টরি কত

কি হয়েছে। রাস্তায় ইলেকট্রিক লাইট, পানের দোকানে রেডিও বাজে। সিনেমা আর সার্কাস কোম্পানী তাঁবু ফেলে কয়েকদিন খুব মাতিয়ে দিয়ে যায়। দোকানে গিয়ে দাড়ি কামাবার ব্লেড, টর্চের ব্যাটারি—কী পাবেন না? হোটেলও একটা হয়েছে। আগে থেকে খবর দিলে গাধার দুধ পর্যন্ত জোগাড় করে দেয় হোটেলওয়ালা।

ম্যানেজার বটুক চাটুজ্যে বলেছিলেন—আপনি শুধু মুখের কথাটি খসান না মশাই, দেখবেন মাল একেবারে আপনার ঘরের ভেতরে এসে হাজির।

অথচ যেদিন প্রথম মহারাজগঞ্জে গেলাম, হোটেলের খাতায় নাম লেখালাম, সেদিন তেমন আমলই দেন নি। খদ্দের না খদ্দের! বোর্ডার না বোর্ডার! অমন বোর্ডার হামেশা আসছে মশাই এখানে। সবে-ধন-নীলমণি এই হোটেল—এখানে না উঠে যাবে কোথায়! আসতেই হবে এখানে। খাতায় নাম লেখাতে হবে সবিস্তারে। শুধু নাম নয়, ধাম, নিবাস, পিতার নাম, উদ্দেশ্য, পেশা—

ওই পেশাতে এসেই আটকে গেলেন বটুক চাটুজ্যে।

বললেন—মশাই-এর কী করা হয়?

বললাম—কিছু না।

বটুক চাটুজ্যে অবাক হয়ে এতক্ষণে আমার দিকে চাইলেন।

বললেন—বলেন কি মশাই, কিছুই করেন না? চলে কী করে?

এবার চুপ করে রইলাম।

বটুক চাটুজ্যে নিজে থেকেই বললেন—কিছু করেন না অথচ বেড়াতে এসেছেন—পৈত্রিক জমিদারী আছে বুঝি?

বললাম—না।

আমার উত্তর শুনে আরো অবাক হয়ে গেলেন বটুক চাটুজ্যে। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। একবার আমার চেহারার দিকে চেয়ে আমার পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে পেশাটা অনুমান করতেও চেষ্টা করলেন। আমার মালপত্রগুলোর দিকে চেয়েও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শেষে কী জানি খাতায় কি লিখলেন! তা নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাতে হয় নি।

কিন্তু কদিন পরে হাওয়া একেবারে উল্টে গেল।

একদিন সকালবেলা লিখতে বসেছি নিজের ঘরে। টেবিলে, চেয়ারে, বিছানায়, চারি দিকে বই ছড়ানো। হঠাৎ দরজা দিয়ে উঁকি দিলেন বটুক চাটুজ্যে।

বললেন—আসতে পারি স্যার?

বললাম—আসুন।

বটুক চাটুজ্যে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু এ-চেহারা যেন অন্য রকম। চলা বলায় হাব-ভাবে যেন হর্ষ-বিনয়-কৌতূহল।

বললেন—আপনি যে গপ্পো লেখেন তা তো আগে বলেন নি মশাই!

বটুক চাটুজ্যের মুখ বিনয়ের হাসিতে ভরে উঠলো, বললেন—অবিশ্যি আপনার এই বই-এর গাদা দেখেই তা আন্দাজ করেছিলাম আর তা ছাড়া লেখকদের কখনও তো চোখে দেখি নি কি না—

তার পর বললেন—তা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম, করবো? আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

বললাম—মনে করবো কেন—বলুন না।

বটুক চাটুজ্যে বললেন—মানে, চোখে লেখকদের না দেখলেও, আপনাদের হালের লেখা গপ্পোর বই তো কিছু কিছু পড়েছি মশাই—তা একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ভারি—

আবার অভয় দিলাম।

বললাম—বলুন না আপনি।

বটুক চাটুজ্যে বললেন—আচ্ছা, মানে, আপনারা এই যে গপ্পো লেখেন সব—এ-সব কি বই দেখে দেখে লেখেন?

এ-কথার কোনও জবাব দিতে পারলাম না। তবু বললাম—এ ধারণা আপনার হলো কেমন করে?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—হালের গপ্পোর বইগুলো পড়ে আমার তাই তো মনে হয় মশাই—বই দেখে দেখে না লিখলে গপ্পোগুলো এমন হবে কেন? সংসারে যা দেখি, সংসারে যা ঘটে, তার সঙ্গে কোথাও মেলে না কেন তার—

সত্যিই, কথাটা ভাববার মত!

তার পর একটু থেমে বললেন—এই দেখুন না, আজ ছবচ্ছর ম্যানেজারি করছি এই হোটেলে, কত রকম ঘটনা ঘটতে দেখলুম, কত ঘটনা ঘটতে শুনলুম, বয়েসও কম হলো না মশাই, কিন্তু তেমন ঘটনা তো বই-এর গপ্পোতে ঘটে না। গোড়াটা আরম্ভ হয় ঠিকই—কিন্তু···এই মহারাজগঞ্জের টিপলার সাহেবের গপ্পোর মত গপ্পোও তো কই পড়ি নি—তেমন ঘটনা নিয়েও তো আপনারা কেউ লেখেন না।

বললাম—টিপলার! টিপলার সাহেব কে?

বটুক চাটুজ্যে এবার জুত করে নড়ে বসলেন চেয়ারে। বললেন—আহা,

সাহেবের মত সাহেব ছিল বটে মশাই টিপলার সাহেব! টিপলার সাহেব বলতো—চাটুজ্যে, ও লণ্ডনই বলো আর প্যারিসই বলো, মিউনিক, বার্লিন, আর তোমাদের কাশ্মীরই বলো, এই মহারাজগঞ্জের তুল্য দেশ কোথাও নেই—এ একেবারে প্যারাডাইস যাকে বলে,—(প্যারাডাইস মানে স্বর্গ—বুঝলেন তো!)—

তা টিপলার সাহেবের গল্পটা গোড়া থেকে সবটা বলি শুনুন। তখন তো আর মহারাজগঞ্জ এইরকম ছিল না। মাছি ভন্ ভন্ করতো চারি দিকে। রাস্তার দু পাশে এঁদোপড়া নর্দমা। মোষের আর গরুর গাড়ি চলে চলে রাস্তার দফা একেবারে রফা। হাঁটে কার সাধ্যি! সাইকেল চালাই আর মাঝে মাঝে সাইকেল কাঁধে করে নিয়ে হাঁটতে হয়। বাজারে তখন মাত্র দুখানা টিনের চালা। একটা আবগারির দোকান আর একটা দিশী ভাটিখানা। তা এইরকম যখন অবস্থা তখন একদিন টিপলার সাহেব এই মহারাজগঞ্জে এসে হাজির।

তখন সন্ধ্যে হবো হবো। আমরা তিন বন্ধু—আমি কেদার আর তারক আবগারির দোকানের পৈঁঠেতে বসে বসে জটলা করছি। রোববার দিন কোথায় মাছ ধরতে যাওয়া যায় তাই ভাবছি। সময় তো কাটাতে হবে মশাই। আমাদের তখন হাতে তো অফুরন্ত সময়।

তারক বললে—ভুলুবাবুর বাগানে চল্—ইয়া বড় বড় মাছ পুকুরে দেখেছি ঘাই দেয়—

ভুলুবাবু জনকপুরের জমিদার। নীলকুঠির প্ল্যাণ্টার বুচার সাহেব যখন সব সম্পত্তি-টম্পত্তি বেচে বিলেত চলে গেল, তখন ভুলুবাবু সস্তা দরে বগানাটা কিনে নিয়েছিলেন। সেই থেকে পড়েই আছে। তারকের কাছে চাবি থাকে বাগানের। পেয়ারা পাকলে পেড়ে খাই। মাছ ধরবার ইচ্ছে হলে ধরি। আর অন্য কোনও দরকার হলেও তারক চাবি খুলে দেয়।

কথাটা বলেই তারক বললে—দে, তবে আর একটা বিড়ি দে।

কেদার বললে—তা হলে শনিচরিকে বলতে হবে চার বানাতে—

দেহাতী মেয়ে শনিচরি ছিল বড় চালাক চতুর মেয়ে। ভুলুবাবুর বাগানের আশ-পাশ থেকে তাল, বেল, পেয়ারা কুড়িয়ে এনে আবার আমাদেরই বেচতো। বলতো—চার আনা পয়সা দিতে হবে কিন্তু বাবু—

পয়সার যম ছিল মাগী। পয়সা ছাড়া কথা নেই মুখে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো—বেরিলিগঞ্জের রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পারিস ছোকরি?

শনিচরি বলতো—আগে পয়সা দে, তবে বলবো—

তা পয়সাও আমরা দেব না শনিচরিকে, অথচ মাছ ধরবার চারও পাওয়া চাই— কী করলে তা সম্ভব, তাই আমরা আবগারির দোকানের পৈঠেতে বসে ভাবছিলাম! হঠাৎ ফট্ ফট্ শব্দ করতে করতে সেই ভর্ সন্ধ্যেবেলা মশাই একটা মটর সাইকেল চড়ে টিপলার সাহেব এই মহারাজগঞ্জে এসে হাজির।

আমরা তো সাহেব দেখে অবাক।

সাহেবটা তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে আমাদের কাছে এসে বললে— এখানে রেস্টহাউসটা কোন দিকে বাবু?

রেস্টহাউস! বলে কী সাহেবটা! একটা আড্ডা দেবার মত চায়ের দোকান নেই এখানে, তায় আবার রেস্টহাউস্! তখন আমাদের আস্তানার অভাবে মাঠে ঘাটে আড্ডা দিয়ে বেড়াতে হয়। গাছতলাই আমাদের আড্ডাস্থল। এ হোটেল তখন কোথায়। আর বেহারীরা তখন চা-ই খেতে শেখে নি। গোবিনপুরের ভূষণ ঠাকুর একটা চায়ের দোকান করবার চেষ্টা করেছিল বাজারের মধ্যে। স্টার্টও করে দিয়েছিল। কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই উঠে গেল আমাদের আড্ডা। সব বাকির খদ্দের কি না!

তা তারক একটু ইংরিজী জানতো। সে-ই এগিয়ে গেল সাহেবের সামনে।

বললে—এখানে মহারাজগঞ্জে রেস্টহাউস্ পাবে কোথায় সাহেব—রেস্টহাউস্ আছে বেরিলীগঞ্জে—

বেরিলীগঞ্জ! মোটাসোটা বুট পায়ে, গায়ে মোটা গেঞ্জি, পরনে হাফ্ প্যাণ্ট— মাথায় টুপি, চোখে গগলস্! আবার কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা। সাহেব ব্যাগ থেকে ম্যাপ্ বার করে দেখতে লাগলো কোথায় বেরিলীগঞ্জ! এখান থেকে কতদূরে।

কেদার সাহস পেয়ে ততক্ষণে সামনে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম।

তারক বললে—বেরিলীগঞ্জ এখান থেকে দেড় শো মাইল দূর—রাস্তা খারাপ, সেখানে পৌছতে তোমার রাত তিনটে বাজবে সাহেব—

কথাটা শুনে টিপলার সাহেব কি যেন ভাবতে লাগলো।

তারক আবার বললে—আর পথে বুনো শুয়োর আছে—ফট্-ফটিয়ার আওয়াজ পেলে তোমার পেট দুফালা করে ছেড়ে দেবে সাহেব!

শুনে সাহেব আরো চিন্তিত হলো।

তারক বললে—কোত্থেকে তুমি আসছো সাহেব?

টিপলার সাহেব বললে—ডেনমার্ক।

ডেনমার্ক! সে আবার কোথায়! আমি তারকের মুখের দিকে তাকালাম। তারক ইংরিজী জানে।

জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায় রে তারক ?

তারক বললে—চুপ কর না, শুনছিস বিলেত থেকে আসছে।

কেদার বললে—তারক, একটু তোয়াজ টোয়াজ কর মাইরি, খাঁটি সাহেব-বাচ্ছা, চাকরি করে দিতে পারে আমাদের।

টিপলার সাহেব আবার বললে—আমি ওয়ার্লড টুরিস্ট—পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছি—

তারক জিজ্ঞেস করলে—কোথায় কোথায় ঘুরেছ ?

সাহেব বললে—চার বছর আগে ডেনমার্ক থেকে বেরিয়েছি, ইয়োরোপ ঘুরে, আফ্রিকায় গিয়েছিলাম—তারপর ডাবলিন থেকে জাহাজে চড়ে ওখাপোর্টে নেবে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, নর্থ ইণ্ডিয়া, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ঘুরে এবার সাউথে যাবো—

তারকের মুখে-চোখে গদ-গদ ভাব। তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে পৈঠেটা ঝেড়ে দিয়ে বললে—এখানে একটু বোসো সাহেব—

টিপলার সাহেব পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমাদের দিলে। তার পর নিজেও একটা ধরালে।

তারক বললে—তা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছ সাহেব, কিন্তু এত দেশ থাকতে মহারাজগঞ্জে এসে পড়লে কী করে ? মহারাজগঞ্জ তো পৃথিবীর বাইরে।

টিপলার সাহেবও হাসলে।

বললে—পথ ভুলে এসে পড়েছি বাবু—স্রেফ পথ ভুলে। পথে খুব ঝড় বৃষ্টি হলো—ধুলোর ঝড় উঠলো আর কিচ্ছু দেখতে পেলুম না চোখে—

কেদার বললে—তারক, এইবার চাকরির কথাটা বল মাইরি।

টিপলার সাহেব বললে—তা এখানে কোন য়ুরোপীয়ান নেই ? কোনও প্ল্যাণ্টার—শুনেছিলাম বেহারে অনেক প্ল্যাণ্টার্স থাকে—আমাদের স্বজাতি—

তারক বললে—ছিল এখানে একজন সাহেব, তা সে বুচার সাহেব তো জমিজমা বাগানবাড়ি বিক্রী করে দিয়ে কবে পাত্‌তাড়ি গুটিয়েছে—তার নীলের কুঠি ছিল, সে-ও ভুলুবাবু কিনে নিয়েছে—এখন সেখানে দুব্বো ঘাস গজায় কেবল।

টিপলার সাহেব বললে—তা যে কোনও একটা ঘর হলেই চলবে—একটা তো রাত শুধু থাকবো—তার পর কাল চলে যাবো পাটনায়।

তার পর একটু থেমে বললে—তার পর পাটনা থেকে বেঙ্গল আসাম দেখে চলে যাবো স্ট্রেট্ সাউথে।

কেদার বললে—তারক, আর দেরি করিস নি মাইরি, চাকরির কথাটা বল, অন্তত একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট—সাহেবদের সার্টিফিকেটের দাম আছে ভাই।

তারক বললে—দিতে পারি ঘর তোমাকে সাহেব—কিন্তু পাঁচটাকা ভাড়া লাগবে এক দিনের জন্যে—

টিপলার সাহেব বললে—ভেরি গুড্—

ভুলুবাবুর বাগানবাড়িটা তো পড়েই আছে এমনিতে। শুধু দুব্বো ঘাস গজাচ্ছে। কোনও কাজে লাগে না। না হোমে না যজ্ঞে। ভুলুবাবুও টাকার ক্রোকোডাইল।

তারক আমাদের বললে—পাঁচটা টাকাই তো আমাদের লাভ—অনেকদিন তো ও-সব ইয়ে খাই নি—

কেদার বললে—কেন মাইরি তারক তুই টাকা চাইতে গেলি, শেষকালে হয়তো ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিতে চাইবে না—

তারক বললে—তুই থামতো, ভ্যাজর ভ্যাজর করিস নি, সাহেব দেখলেই তোর জিব দিয়ে নাল পড়ে—দেখ না কী করি—

টিপলার সাহেব বললে—আর একটা সারভেণ্ট জোগাড় করে দিতে পারো বাবু,—টাকা দেবো, আমার মোজা-গেঞ্জি-রুমাল সব ময়লা হয়ে গিয়েছে—একটু সাবান দিয়ে কেচে দেবে—খানা বানিয়ে দেবে—

তারক বললে—কত টাকা দেবে?

টিপলার সাহেব বললে—যা চায়—

তারক বললে—মেড-সারভেণ্ট হলে চলবে? মানে ঝি—

টিপলার সাহেব বললে—যা হয় তাই সই—

তা তাই হলো। থাকবার ব্যবস্থা হলো ভুলুবাবুর বাগানবাড়িতে। একটা রাত শুধু থাকবে সাহেব। বুচার সাহেবের খাটবিছানা চেয়ার টেবিল আয়না সবই আছে। শুধু ধুলো জমে খারাপ হয়ে আছে। আমরা গিয়ে সব পরিষ্কার করে দিলাম। একটা রাত তো শুধু থাকা। কাল সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে রওনা দেবে সাহেব। জীবনে আর দেখা পাওয়া যাবে না তার।

সাহেব বললে—ইণ্ডিয়া দেখে চলে যাবো চায়না, চায়না থেকে জাপান, তার পর জাপান থেকে আমেরিকা—তার পর নিজের বাড়ি—

কেদার বললে—তা হলে সার্টিফিকেটটা আজই নিয়ে নে তারক—

তারক বললে—তুই থাম তো—বড় তাড়াহুড়ো করিস—এসব কাজে তাড়াহুড়ো করলে চলে না—

সাহেব বললে—একটা দিন শুধু মিছি মিছি এই মহারাজগঞ্জে পথ ভুলে এসে নষ্ট হয়ে গেল—

যে টিপলার সাহেব একদিন একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল বলে হা-হুতাশ করেছিল, আশ্চর্য, সেই টিপলার সাহেবই শেষকালে…

তা সে কথা এখন থাক মশাই। ভুলুবাবুর বাগানবাড়িতে সাহেবের তো থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। খাবার সাহেবের সঙ্গেই ছিল। পাঁউরুটি আর শুকনো মাংস। সেই খেয়েই রাতটা কাটালো।

কিন্তু কথাটা শনিচরিকে বলতেই শনিচরি বললে—টাকা আমার আগাম চাই কিন্তু—

তারক বললে—তা সাহেব কি তোকে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ছুঁড়ি?

সাহেব শুনে বললে—টাকাটা আগামই দিয়ে দাও না—এই নাও টাকা—বলে একটা দশটাকার নোট এগিয়ে দিলে শনিচরির হাতে।

শনিচরি তবুও খুশী নয়। বললে—কিন্তু এই সাবানকাচা আর ঘর ঝাঁট দেওয়া, আর সকালবেলার রান্না ছাড়া আর কিচ্ছু করবো না—তা বলে রাখছি—

কেদার বললে—খাঁটি বিলিতি সাহেব, তাকে চটাচ্ছিস, তুই কি ভাবছিস তোর ভালো হবে এতে?

শনিচরি বললে—আমার ভালো আমি বুঝবো—তোদের কী!

তারক বললে—টাকাটাই তোর কাছে সব হলো রে, আর একটা অতিথি এখেনে এসে যে অনাথ হয়ে পড়লো, তার জন্যে তোর একটা দয়া-মায়া নেই—এমন পিশাচ তুই শনিচরি।

শনিচরি বললে—গতর আছে বলেই তো আমার এত খাতির, যখন গতর থাকবে না, তোরা খেতে দিবি?

তার পর শনিচরি বললে—কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি—সাহেবের এঁটো আমি ছোঁব না।

তারক বললে—সে কি রে, তা হলে সাহেবের বাটি থালা গেলাস কে মাজবে?

শনিচরি বললে—যে মাজে সে মাজবে—আমি পারবো না—

—তা হলে কে মাজবে বল? ও তো আর কাঁসার থালা নয়, চিনেমাটির ডিস্—সাবান ঘষে শুধু পরিষ্কার করে দিবি—

শনিচরি বললে—না বাবু, জাত আমি দিতে পারবো না টাকার জন্যে। টাকার জন্যে আর সব দিতে পারি, জাত দিতে পারবো না—হাজার টাকা দিলেও না।

তাই এখনও ভাবি মশাই। কোথায় থাকে জাতের বড়াই, কোথায় থাকে টাকার গরম আর কোথায় থাকে গতরের ঠ্যাকার! শনিচরিকে এখনও বাজারের দিন দেখতে পাই কিনা। কাঁঠাল গাছের তলায় করলা উচ্ছে শিম নিয়ে বেচে। বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে গেছে। মাথায় পাকা চুলে তেলও পড়ে না আজকাল। দেহাতী মাগীদের সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়াও করে, আবার এখানকার সুগার মিলের সাহেবদের সঙ্গে গড়-গড় করে ইংরিজিও বলে······

তা সে-কথা পরে বলবো অখন।

আমরা তো টিপলার সাহেবের থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে যে-যার বাড়ি ফিরে এলাম। আসবার সময় টিপলার সাহেব অনেক থ্যাঙ্কস দিলে। ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে দিলে।

বললে—বাবুরা, কালকে এখানে তোমাদের লাঞ্চের নেমন্তন্ন রইল সব—ঠিক বারোটার সময় আসবে সবাই—ঠিক আসবে—ভুলো না যেন।

কেদার বললে—তারক তুই দেখছি, সব গুবলেট্ করে দিবি—কালকে কি আর সময় হবে অত—খেয়ে উঠেই তো চলে যাবে সাহেব।

তারক বললে—তা কাল তোর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পেলেই তো হলো?

কেদার বললে—ওই সার্টিফিকেটটার জন্যেই আমার সুগারমিলের চাকরিটা আটকে যাচ্ছে ভাই—

ভগবানের পৃথিবীতে মশাই কার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট কে দেয় কে জানে! দিন-দুনিয়ার মালিক ছাড়া কিছু দেনেওয়ালা তো কাউকে দেখলাম না। তবে আপনারা লেখক মানুষ আমার চেয়ে বেশি জানেন। তা তখন আমাদের হাতে পাঁচটা টাকা এসে গেছে।

তারক পাঁচটা টাকা বাজাতে বাজাতে বললে—মুফত পাঁচটা টাকা তো রোজগার হলো—চল বাজারে—

বাজারে মানে···। তবে আপনাকে খুলেই বলি মশাই, সেই বয়েসেই আমরা একটু বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়তুম মাঝে মাঝে। সোমলতা চেনেন? সোমলতার নাম শুনেছেন? যার থেকে সোমরস হয়? আমরা ছোটবেলায় বাঙলা দেশেই ছিলুম। আমার কাকা ছিল মস্ত কবিরাজ। সংস্কৃত জ্ঞান ছিল খুব। কাকার কাছে শুনেছি—সোমকে নাকি ওষধিপতি বলা হয় শাস্ত্রে। শাস্ত্র টাস্ত্র তো জীবনে পড়ি নি মশাই। শুধু শুনেই এসেছি কাকার মুখে। দেবতারা নাকি সোমরস পান করতেন। সোম খেয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের গায়ে এমন জোর হলো যে তিনি নাকি

বৃত্রকে শুধু হারিয়ে দিয়েছিলেন তা-ই নয়—বধও করেছিলেন। ঋষিরাও সোম খেতেন। বেদে নাকি লেখা আছে সোমরস খেলে অমর হওয়া যায়। অমরতা দিতে পারে বলেই সোম-যজ্ঞের এত মাহাত্ম্য। তাই সোমেরই আর এক নাম অমৃত। ঋষি কাশ্যপ এই সোমকেই উদ্দেশ্য করে স্তোত্র লিখেছিলেন—যত্রানুকামং চরনং···সব মনে নেই মশাই—অর্থাৎ মোদ্দা কথা এই যে, সেই তৃতীয় দ্যুলোকে যেখানে যথাকাম মুক্তভাবে বিচরণ করা যায়, যেখানে লোকসকল জ্যোতিষ্মান সেইখানে হে সোম, তুমি আমাকে অমৃতপদ দাও—

তা আমি মশাই ও-সব সোমলতা-টতা বলে কিছু দেখি নি, সোমরসও খাই নি,—আমাদের এখানে এই মহারাজগঞ্জে মহুয়া বলে একরকম জিনিস পাওয়া যায় তা থেকে একরকম মদ হয়, আমরা তা খেতাম মশাই। খেলে অমর হওয়া যায় বলে কখনও শুনি নি। তবে খেতে ভালো লাগে বলে খেতাম। আমরা দেবতাও নই ঋষিও নই—শুধু বেকার বখাটে ছেলে তখন। চাকরি-বাকরি নেই, কাজ পেলুম তো বেঁচে গেলুম। এমনি অবস্থা।

সেদিন তো আমাদের তিনজনের সেই পাঁচ টাকাতে মন্দ কাটলো না।

পরদিন বেলা বারোটার সময় ভুলুবাবুর বাগানে গেলাম তিনজনে। টিপলার সাহেব দাড়ি কামিয়ে মুখ চুনকাম করে ফরসা কোটপ্যাণ্ট পরে তো আমাদের অভ্যর্থনা করলে।

সাহেব বললে—আজ শনিচরিকে তোমাদের ইণ্ডিয়ান খানা তৈরি করতে বলেছি বাবু—কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে—

দেখলাম টিপলার সাহেবকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস। সুন্দর স্বাস্থ্য, টক্ টক্ করছে ফরসা গায়ের রঙ।

শনিচরি তখন রাঁধছিল। মাংস রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছে। পোলাও রান্না হয়েছে। পেঁয়াজ রসুন, মশলার গন্ধ।

শনিচরি বললে—আমি রান্না-টান্না করে দিলাম, কিন্তু বাসন-কোসন ধোবার জন্যে যেন আমায় বলিস নি তোরা—

বললাম—কেন, তুই-ও তো মাংস পোলাও খাবি শনিচরি—

শনিচরি রেগে গেল। বললে—আমি ও-সব খাই ?

—খাস নি তো আজ খা। খেলে আর ভুলতে পারবি না জীবনে।

শনিচরি আবার মনে করিয়ে দিলে আমাদের—আমি কিন্তু বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবো—তা বলে রাখছি এইবেলা।

সবাই খেতে বসলাম। সাহেব বললে—তোমরা আমার অতিথি—কিন্তু তোমাদের আমি ভালো করে অতিথি-সৎকার করতে পারলুম না বাবু—আমি দুঃখিত—আমার সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু ড্রিঙ্ক বাদ দিয়ে তো লাঞ্চ হয় না—

কি আর করা যাবে।

টিপলার সাহেব আবার কী যেন একটু ভেবে নিয়ে বললে—আচ্ছা, তোমাদের এখানে ও সব কিছু পাওয়া যায় না?

তারক না-বোঝবার ভান করলে।

বললে—কী?

টিপলার সাহেব বললে—ড্রিঙ্কস!

তারক মুচকি হেসে আমার দিকে চাইলে।

কেদার বললে—এইবার সেই ক্যারেকটার…

তারক বললে—তুই থাম, ড্রিঙ্ক খেয়ে যদি ক্যারেকটার ঠিক থাকে তো তখন দেখা যাবে।

তারপর টিপলার সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—ড্রিঙ্ক আছে সাহেব, কিন্তু সে-সব দিশী মাল, তোমার কি চলবে?

টিপলার সাহেব বললে—আমার না-চলে না-চলবে—তোমরা আমার অতিথি, তোমাদের চললেই হলো—জিনিসটা কী? কাণ্ট্রি?

তারক বললে—হ্যাঁ সাহেব, একেবারে খাঁটি কাণ্ট্রি, মহুয়া। মহুয়ার থেকে তৈরি—

অগত্যা যেন উপায় না পেয়েই টিপলার সাহেব বললে—তা তাই আনো।

শনিচরিকে টাকা দিলে টিপলার সাহেব। এসে গেল মহুয়া।

তারক বললে—তুমি এ খাবে না সাহেব?

টিপলার সাহেব বললে—আমার কাণ্ট্রিটা সহ্য হয় না বাবু—তবে একটু ছোঁব সামান্য—নইলে তোমরা হয়তো কী মনে করবে—

আমরা সবাই নিলাম। কালকে রাত্তিরেও বেশ হয়েছে। আজকেও হলো। পর-পর দুদিনই ফোকোটে। পরের পয়সায়।

টিপলার সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কেমন লাগছে?

তারকের মুখ দিয়ে শুধু একটা আওয়াজ বেরোল—আঃ—

তারক বললে—তোমাকে একটু দেব সাহেব? একটু চেখে দেখবে?

টিপলার সাহেব বললে—না না আমাকে দিও না, তোমরাই খাও—তোমাদের জন্যেই এনেছি বাবু—শেষকালে আমি এক ফোঁটা নেব অখন—

টিপলার সাহেব মাংস খেতে খেতে বললে—ড্রিঙ্ক আমি বেশি করি না বাবু, আমার বাবা মদ খেয়ে খেয়ে মরে গেছে, এত মদ খেত যে লিভার পচে গিয়েছিল, তাই মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, যেন বেশি না খাই—

তার পর বললে—আফ্রিকায় গিয়ে অনেক যায়গায় ব্রাণ্ডি হুইস্কির অভাবে দিশী খেতে হয়েছে কিন্তু ও-খেলেই আমার বড্ড মাথা ধরে, ও আমার পেটে সহ্য হয় না—

তারক বললে—তবু একটুখানি নাও সাহেব! এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে আর—বলে টিপলার সাহেবের গেলাসে ঢেলে দিতে যাচ্ছিল।

টিপলার সাহেব হা হা করে উঠলো—অতো না, অতো না—সামান্য দাও বাবু—এক ফোঁটা—

তা এক ফোঁটা কি আর সত্যি সত্যি দেওয়া যায়।

টিপলার সাহেব বললে—বড় বেশি দিয়ে ফেললে—নষ্ট হবে, আমার মাথা ধরবে—

তার পর অত্যন্ত সঙ্কোচে টিপলার সাহেব গেলাসে একটু চুমুক দিলে। যেন নাক মুখ বুঁজে তেতো ওষুধ খাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম মশাই, আস্তে আস্তে মুখ-চোখের ভাব বদলে গেল। মুখে হাসি বেরোল যেন। আবার চুমুক দিলে। আবার। আবার!

টিপলার সাহেব বললে—আরে, এ যে হোলি ওয়াটার—আর একটু দাও বাবু—বলে টিপলার সাহেব হেসে উঠলো।

তারক আরো ঢেলে দিলে। বললে—আর দেব?

টিপলার সাহেব বললে—দাও—গ্লাস ভর্তি করে দাও—

তার পর টিপলার সাহেব আরো এক গ্লাস খেলে।

বললে—আরো দাও বাবু, একেবারে পিওর হোলি ওয়াটার—আমি ব্রাণ্ডি খেয়েছি, জিন্ খেয়েছি, হুইস্কি খেয়েছি, শেরি শ্যাম্পেন ভড্‌কা খেয়েছি—কিন্তু তোমাদের এই হোলি ওয়াটারের আর তুলনা নেই—একেবারে তুলনাহীন! আরো দাও বাবু—

খেতে খেতে কী যে হলো মশাই সাহেবের। শেষকালে টিপলার সাহেবকে নিয়ে প্রাণান্ত! বন্ধ করা দায়। যত খায়, তত চায়।

তারক বলে—সাহেব, অত খেলে মটর সাইকেল চালাতে পারবে না আজ—

শেষে মহুয়া ফুরিয়ে গেল। শনিচরিকে আবার পাঠাতে হলো বাজারে। গজ্ গজ্ করতে গেল সে আনতে। দশ টাকায় তাকে অনেক খাটানো হয়েছে। আর খাটতে চাইছে না শনিচরি।

যাবার সময় শনিচরি বললে—বিকেল হলে আর এক দণ্ডও থাকবো না কিন্তু বাবু—তোদের কথার খেলাপ যেন না হয়—

এবার সাহেবের আরো উৎসাহ। আরও খাওয়া চলতে লাগলো, আরো উত্তেজনা। আরো আনন্দ। বলে—পিওর হোলি ওয়াটার—আর একবার দাও—

শেষকালে সেবারও ফুরিয়ে গেল মহুয়া!

টিপলার সাহেবের প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। বেসামাল। বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

বললাম—চারটে যে বাজে—আজ পাটনায় যাবে না সাহেব?

টিপলার সাহেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—কাল যাবো, আজকে বড় টায়ার্ড—কাল যাবো ঠিক।

কিন্তু শনিচরিকে নিয়েই হলো বিপদ। আর এক মিনিটও থাকতে চায় না।

বলে—অন্য লোক দেখ তোরা—আমি পারবো না—

তারক বুঝিয়ে বললে—দেখছিস তো সাহেবের অবস্থা, এ সময়ে কি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত—ভিন্‌দেশি মানুষ, তুই যদি এ-রকম অবুঝ হোস তো কাকে বোঝাবো—কী করে চলবে—কে দেখবে সাহেবকে?

শনিচরি বললে—সাহেবকে কে দেখবে তার আমি কী জানি! সাহেব আমার কে? সাহেব মোলো কি বাঁচলো তা আমার দেখার কী দরকার? টাকা নিয়ে আমার ফুরিয়ে গেল কাজ—আর টাকা দেবে আমায় কে?

তারক বললে—দেবে, দেবে, দেখছিস না সাহেব কত ভালো লোক, কত খরচ করলে সকাল থেকে! সাহেবকে যদি সেবা করে খুশী করতে পারিস তো তোরই ট্যাঁক ভর্তি হয়ে যাবে—

শনিচরি যেন রেগে গেল—তা তোরাই তো মহুয়া খাইয়ে সাহেবকে মজালি—

তারক বললে—তুই তো বুঝিস শনিচরি, যে মজে সে এমনিই মজে—মজবার জিনিস না পেলেও মজে—আমরা যে এতদিন খাচ্ছি, মজেছি? না তুই মজেছিস?

শনিচরি ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমি মজবার লোকই বটে!

তা পরদিন সকালবেলা আবার আমরা টিপলার সাহেবকে দেখতে গেলাম। বেশ খাসা দিব্যি তাজা হয়ে উঠেছে আবার। দাড়ি কামিয়ে আবার স্বাভাবিক মানুষ।

আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালে।

বললে—মেনি থ্যাঙ্কস্ তোমাদের বাবু—তোমরা কাল খুব কষ্ট পেয়েছ—

তারক জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে কেমন ছিলে সাহেব?

টিপলার সাহেব বললে—খুব ভালো—খুব ভালো—তোমাদের মেড সারভেণ্টটা আমার খুব সেবা করেছে—

তারক বললে—আজ যাচ্ছ তো সাহেব ?

টিপলার সাহেব বললে—হ্যাঁ আজই যাবো—

কেদার বললে—তারক, এইবার ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের কথাটা বল না তুই।

টিপলার সাহেব বললে—আজকে শেষবারের মত তোমাদের হোলি ওয়াটার খেয়ে নেওয়া যাক—কী বলো—আনবো ?

তা আমাদের আবার কিসের আপত্তি! আবার মহুয়া এল। সেদিনও সাহেব পেট ভরে খেলে। তার পর যখন সেদিনও অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা তখন সাহেব বললে—আজ আর যাব না বাবু, কাল বিকেলে যাবো—

বললাম—তার পর ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—তার পর মশাই সেই টিপলার সাহেবের 'কাল যাবো' 'কাল যাবো' করে আর তার যাওয়া হলো না। একদিন পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিল জোয়ান বয়েসে, কত দেশ, কত জনপদ পেরিয়ে, পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি অতিক্রম করে শেষকালে পথ ভুলে সেই যে মহারাজগঞ্জে এসে আটকে গেল, সে আর নড়লো না। ভুলুবাবুর বাগানবাড়িটা তো এমনিতে পড়েই ছিল, সেটা ভাড়া নিয়ে নিলে সাহেব। কুকুর পুষলে, বেড়াল পুষলে—

বললে—তারক, তোমাদের মহারাজগঞ্জ প্যারাডাইস্—একেবারে প্যারাডাইস্ অন্ আর্থ—

ওদিকে মটর সাইকেলটা পড়ে পড়ে মরচে ধরতে লাগলো। তাতে আর চড়ে না সাহেব। বিক্রি করে দিলেও চলতো। নতুন অবস্থায় বেচলে কিছু অন্তত দামও আসতো। শেষে একদিন সেই টিপলার সাহেব আমাদের ধুতি পায়জামা পরতে শিখলে। চুলে সরষের তেল মাখতে শিখলে, খিস্তি করতে শিখলে, বাঙলা গান শিখলে, তবলা বাজাতে শিখলে, দুগ্যা ঠাকুর দেখলে পেন্নাম করতো, সত্যনারায়ণের সিন্নি খেতো, আর একেবারে, বলবো কি মশাই, আমাদের জাত-ভাই হয়ে গেল।

—আর শনিচরি ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—আর শনিচরির গায়েও তখন ফরসা সেমিজ, ফরসা শাড়ি, পায়ে আলতা পরে, ইংরিজি বলে—সাহেবের কাছে থেকে থেকে ইংরিজি শিখে গেছে তখন।

জিজ্ঞেস করলাম—শনিচরি জাত দিলে শেষ পর্যন্ত ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—জাত দেবার কথা কী বলছেন মশাই ? আমরা যখন দেখলাম সাহেব পটকে গেছে তখন ভাবলাম শনিচরিকে যদি ভাগিয়ে দিই তো টিপলার সাহেব বোধ হয় আবার ভালো হয়ে যেতে পারে—

শনিচরিকে গিয়ে তারক বললে—তুই বেরো এখান থেকে শনিচরি—তোর জন্যেই তো সাহেবের এই দুর্গতি—

শনিচরির তখন ঠেকার কত। বললে—আমার জন্যে না তোদের জন্যে ? তোরাই তো আমার সাহেবকে মহুয়া খেতে শেখালি—আমার সাহেবকে তোরাই তো খারাপ করলি—

দেখতাম টিপলার সাহেবের যখন অসুখ-টসুখ হতো শনিচরি মাথায় বরফ লাগিয়ে দিচ্ছে। স্নান করিয়ে দিচ্ছে, খাইয়ে দিচ্ছে। সাহেবের কী খেতে ভালো লাগে, কী পরতে ভালো লাগে, কী চায় সাহেব—সব দিকে নজর শনিচরির।

কতদিন টিপলার সাহেবের জন্যে বাজারের ভাঁটিখানা থেকে মহুয়ার মদ নিয়ে এসে দিয়েছে। রান্না করে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অনেক রাতে সাহেবের এঁটো বাসন মেজেছে পুকুরঘাটে বসে বসে।

স্বজাতিরা কেউ কেউ বলেছে—হ্যাঁরে, তা বলে টাকার জন্যে তুই জাত-ধম্ম দিলি ?

শনিচরি পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছে—শতেকখোয়ারীরা আমাকে জাত দেখাচ্ছে—তোদের জাতের মাথায় আমি······

এর পর তার মুখের ভাষা আর শোনা যেত না মশাই। কানে আঙুল দিতে হতো। কিন্তু টিপলার সাহেবের ব্যাপার দেখে আমরাও অবাক হয়ে গেলাম। ও-সাহেব যে কেন বাড়ি-ঘর ছেড়ে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিল কে জানে। পথ ভুলে গেলেই বা, তা বলে মানুষ অমন করে সব ভুলে যায় ! প্রথম প্রথম দেড় শো মাইল দূরের এক গির্জায় যেত রবিবার দিনগুলো। শেষে তাও গেল। গির্জা-টির্জা মাথায় উঠলো সাহেবের। কেবল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনতো আর মহুয়া খেত।

যেদিন রাস্তাতেই নর্দমার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো সাহেব, খবর পেয়ে শনিচরি সেই দশাসই মানুষটাকে ধরে তুলে নিয়ে আসতো। আপাদ-মস্তক বালতি বালতি জল ঢেলে ধুয়ে দিত সর্বাঙ্গ। জামা-কাপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। তার পর যখন আস্তে আস্তে টাকা ফুরিয়ে এল সাহেবের, শনিচরি ঘুঁটে দিয়ে পাড়ায় বিক্রি করতো, গরুর দুধ বিক্রি করতো, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম বিক্রি করতো।

বলতো—পাড়ার বখাটে ছোঁড়ারাই আমার সাহেবকে খারাপ করে দিলে—

বলতো—যারা আমার সর্বনাশ করেছে—তাদের ভালো হবে না, তাদের তিনকুলে বাতি দেবার কেউ থাকবে না—তাদেরও সর্বনাশ হবে—মরলে মুদ্দফরাসেও তাদের ছোঁবে না—এই বলে রাখলুম—

শনিচরি আপন মনে কেবল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাল দিত আর বাসন মাজতো।

কিন্তু একদিন অবস্থা আরও খারাপ হয়ে এল টিপলার সাহেবের। শোচনীয় অবস্থা হয়ে উঠলো। রাস্তায় টিপলার সাহেবকে দেখলে আমরাই ভয়ে পালাতুম মশাই।

সাহেব আমাদের দেখলে বলতো—এই তারক, হোলি ওয়াটার খাওয়া দোস্ত্—

আমাকে একলা দেখতে পেলে বলতো—চাটুজ্যে, হোলি ওয়াটার খাওয়াবি একটু?

কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতে দেখতে পেলেই শনিচরি রেগে চীৎকার করে বলতো—ওই বদমাইশদের সঙ্গে আবার মিশছো তুমি? আবার ওদের কাছে মদ চাইছো?

টিপলার সাহেব বলতো—আমার হাতে যে আর পয়সা নেই—

শনিচরি বলতো—তোমার পয়সা নেই তাতে কি হয়েছে—আমার পয়সা আছে। আমি কিনে দেব—আমি মদ খাওয়াবো তোমাকে—

শেষকালে আস্তে আস্তে যখন সবাই ত্যাগ করলো টিপলার সাহেবকে, দোকানদার সিগারেট দেয় না, মুদি তেল নুন বেচে না, রুটি দেয় না, তখন শনিচরিই রইলো টিপলার সাহেবের সঙ্গে। সেবা করতে লাগলো সাহেবের। যেমন করে হিন্দু ঘরের বউএরা সোয়ামীর সেবা করে তেমনি করেই সেবা করতে লাগলো।

সেই টিপলার সাহেবকে নিয়ে আমরা কত মজা করেছি মশাই। আমাদের সঙ্গে হোলির দিন আবীর মেখে হুল্লোড় করেছে। শালপাতা চেটে চেটে সত্যনারায়ণের সিন্নি খেয়েছে। সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছে। একদিন টিপলার সাহেবের পয়সায় আমরা কত ফুর্তি করেছি, আর পরে সাহেবের অবস্থা খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে সরে এসেছি। কিন্তু সাহেবের শেষ দিন পর্যন্ত যে সেবা করেছে, সাহেবের ময়লা সাফ করেছে, সে ওই শনিচরি। টাকা না ফেললে যে কুটোটি সরাতো না, সেই শনিচরি নিজে পরের বাড়ি গতর খেটে সাহেবকে খাইয়েছে, পরিয়েছে।

আমরা মজা করবার জন্যে যখন বলতাম—এই টিপলার, সাংহাই যাবি না? টোকিও যাবি না? বার্লিন যাবি না?

কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত টিপলার সাহেব। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে উঠে চলে যেত নিজের বাড়ি।

বলতো—মাথা ধরেছে বড্ড—বাড়ি যাই—

কিংবা কখনও গল্প করতে করতে যখন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত—জানিস যখন ডেনমার্কে ছিলাম—

বলতে গিয়েই যেন কথা আটকে যেত তার মুখে। চোখ দুটোর দৃষ্টি কোথায় উধাও হয়ে যেত। বরফ ঢাকা দেশের মাটির মত টিপলার সাহেবের চোখেও বুঝি বরফ জমে আসতো। খোলা চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখতো কোন দেশের কোন সার্টিনের গাউন পরা ষোড়শীকে। তারা বুঝি তাকে ডাকতো হাতছানি দিয়ে। অনেক দূরের পপ্‌লার্‌ আর পাইন গাছের মর্মর শব্দ যেন কান পেতে শুনতে পেত টিপলার সাহেব। তার পর আড্ডার মাঝপথেই উঠে চলে যেত বাড়ি। গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মধ্যে না-খেয়ে না-দেয়ে শুয়ে পড়ে থাকতো কতদিন। তার পর শনিচরির পীড়া-পীড়িতে উঠতো একদিন। শেষে আবার ফাঁক পেলেই দৌড়ে আসতো আড্ডায়। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতো—দে ভাই একটু হোলি ওয়াটার দে—অনেকদিন খাইনি—

আমরা দিতাম।

কিন্তু শনিচরি টের পেলেই আমাদের গালাগালি দিতে দিতে সাহেবের গলা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যেত।

টিপলার সাহেবের অবস্থা দেখে আমাদের কান্না পেত মশাই। কাকার কাছে শুনেছি—এক এক রাজা এক-এক দিকের অধিপতি। কে জানে মশাই—শাস্ত্র-টাস্ত্র তো পড়ি নি। রাজা ইন্দ্র হলো পূর্বদিকের, রাজা যম হলো দক্ষিণদিকের, আর রাজা বরুণ হলো পশ্চিমদিকের। সোমদেবতা ভূলোকেও থাকে না, গোলোকেও থাকে না—থাকে দ্যুলোকে। তা শেষকালে আমাদের টিপলার সাহেবও পুরাপুরি সেই দ্যুলোকের বাসিন্দেই হয়ে গেল। লাজ-লজ্জা-ভয়-সঙ্কোচ-ঘেন্না আর কিছু রইল না। এক-একবার মনে হতো কেন এমন হলো! আমরাও তো খাই। খেয়ে তো এমন পরিণতি হয় নি আমাদের। যে টিপলার সাহেবের কাছে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পাবার জন্যে কেদার অত লাফিয়েছিল সেই সাহেবের ক্যারেকটার দেখে কেদারই বলেছিল—মাইরি, টিপলার সাহেবেই ক্যারেকটারটা নষ্ট করলে শেষকালে—

কিন্তু আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, কেন এমন হলো! আমরাও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছি—কেন এমন হলো! সে কি মহুয়া! সে কি তুচ্ছ মহুয়ার

মদ ! সে তো আমরাও খাই ! তবে কি শনিচরিয়া ! সেই ময়লা নোংরা কাপড়পরা চুলে তেল না দেওয়া কালো দেহাতী মেয়ে !

বললাম—তার পর ?

বটুক চাটুজ্যে চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিলেন। আবার বসলেন।

—তার পর কী করলুম জানেন মশাই—

বটুক চাটুজ্যে একটু থেমে আবার বললেন—তার পর কি করলুম জানেন মশাই—একদিন তিনজনে মিলে পরামর্শ করলুম টিপলার সাহেবকে বাঁচাতে হবে—টিপলার সাহেবকে একদিন বললাম—চলো সাহেব, বেরিলীগঞ্জে বেড়িয়ে আসি—

টিপলার সাহেব বললে—কেন ?

তারক বললে—তোমাকে হোলি ওয়াটার খাওয়াবো—চলো—

টিপলার সাহেবের মহা ফুর্তি। সাহেবকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তো টাঙ্গায় তুললুম। অনেকদিন পরে আবার খেতে পাবে !

ভোরবেলা বেরিয়েছি। বেরিলীগঞ্জে পৌছলুম যখন, তখন পরের দিন ভোর হয়ে আসছে।

বেরিলীগঞ্জে তখনও কয়েকটা প্ল্যাণ্টার সাহেব আছে। জমি-জমা ক্ষেত খামার করে দু একটা সাহেব তখনও রয়েছে। দেশে ফিরে যাবো-যাবো করছে।

টিপলার সাহেবকে নিয়ে গিয়ে তুললাম তাদের বাড়ি।

টিপলার সাহেবকে দেখে ডি'সুজা সাহেব সামনে এগিয়ে এল। ডি'সুজা সাহেবের মেমও এগিয়ে এল। পেছন-পেছন ছেলে-মেয়েরাও এগিয়ে এল। আমাদের সঙ্গে টিপলার সাহেবকে দেখে তারাও অবাক হয়ে গেছে।

ডি'সুজা সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলে টিপলার সাহেবের দিকে। টিপলার সাহেবের মুখেও হাসি ফুটলো যেন। গুড মর্নিং হলো। হ্যাণ্ড শেক্ হলো। কোথা থেকে আসছো ! কী নাম, ধাম, কোথায় নিবাস, কোন গোত্র,—কুলপঞ্জী। সবই আদান-প্রদান হলো। কত বছর পরে আবার স্বদেশের লোক পেয়েছে—একেবারে আহ্লাদে আটখানা। আমাদের দিকে আর কেউ ফিরে চায় না। শেষে যে-ই ওরা চা খেতে ঘরে ঢুকলো আমরাও টুপ করে সরে পড়লাম সেখান থেকে।

ভাবলাম এবার যাহোক একটা হিল্লে হয়ে যাবে সাহেবের। ফিরতি টাঙ্গাতে সোজা চলে এলাম চলে এলাম একেবারে মহারাজগঞ্জে।

শনিচরি আমাদের এসে ধরে। বলে—সাহেবের কী হলো রে ? সাহেব কোথায় গেল ?

তারক বললে—আমরা কী জানি—

কিন্তু ও মশাই, ভবি ভোলবার নয়। একদিন পরেই দেখি দৌড়তে দৌড়তে টিপলার সাহেব এসে হাজির। আমরাও অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কী রে? ফিরে এলি যে?

টিপলার সাহেব বললে—দূর, ওখানে কখনও মন টেঁকে! ভারি মন কেমন করতে লাগলো ভাই তোদের জন্যে—চলে এলাম।

বললাম—তার পর?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—তার পর আর কি! এমনি করে চোদ্দ বছর এইভাবে কাটিয়ে টিপলার সাহেবের একদিন শরীর ভেঙে পড়লো। হঠাৎ পাটনা থেকে একদিন জোনাথান সাহেব এখানে কাজে এসেছিল—ম্যাজিস্ট্রেট, নতুন বিলেত থেকে এসেছে। এসে সব শুনে দিল্লীর কন্সাল অফিসে একটা চিঠি লেখে দিলে। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। টিপলার সাহেব তখন অজ্ঞান অচৈতন্য—আর শনিচরি দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাশে বসে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে এক নাগাড়ে সেবা করে যাচ্ছে।

আমরা ভাবলাম এবার এ-যাত্রায় বুঝি টিপলার সাহেব বেঁচে গেল।

একদিন সকাল বেলায় হঠাৎ কয়েকটা মটরগাড়িও মহারাজগঞ্জে এসে হাজির। নতুন মুখ সব। দিল্লীর কন্সাল অফিসের পরোয়ানা এসে গেছে এতদিনে। এবার বিনা খরচে টিপলার সাহেবকে জাহাজে করে সরকার নিজের দেশে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু হলে কি হবে মশাই—বলে বটুক চাটুজ্যে এবার নতুন ধরনের হাসি হেসে উঠলেন।

বললেন—টিপলার সাহেব তার আগের দিনই মারা গেছে।

বললাম—মারা গেছে?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—হ্যাঁ,—মারা গেছে—মরে একেবারে সত্যিকারের দ্যুলোকবাসী হয়ে গেছে।

বললাম—আর শনিচরি?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—শনিচরি আর যাবে কোথায়। এখানেই আছে। আরো বুড়ি থুথ্‌ড়ি হয়ে গেছে। বাজারে গেলে দেখতে পাবেন কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে এখন করলা উচ্ছে শিম বেগুন বিক্রি করে। কিন্তু এখনও বড় তেজ মশাই—ইংরিজি পেটে গিয়েছে কি না—আমাদের দেখলে জ্বলে যায়—যেন টিপলার সাহেবের আমরাই

সব্বনাশ করেছি—তা আমাদের কী দোষ বলুন—সাহেব ওয়ার্লড্ টুর করতে বেরিয়ে পথ না ভুললে তো আর এমন হতো না—আর পথ ভুলে আসবি তো আয় একেবারে এই মহারাজগঞ্জে—

আমি চুপ করে রইলাম।

বটুক চাটুজ্যে বললেন—তাই তো আপনাকে বলছিলাম মশাই, হালের গপ্পোগুলো তো সব পড়ি, কিন্তু মনে হয় যেন সব বই দেখে দেখে লেখা—আপনি টিপলার সাহেবের গপপো শুনলেন তো, আরম্ভটা ঠিক বই-এ লেখা গপপোর মত—কিন্তু শেষকালটাই গোলমাল হয়ে যায়—শেষটাই কারো হয় না—শেষে গিয়েই আপনাদের গপপো একেবারে গুলিয়ে যায়—জীবনের সঙ্গে কিচ্ছু মেলে না তার—

বটুক চাটুজ্যে আরো সব কী যেন বলতে লাগলেন। কিন্তু আমি তখনও টিপলার সাহেবের কথাই ভাবছি। মনে হলো—আমরা সবাই-ই যেন এক-একজন টিপলার সাহেব। একদিন ওয়ার্লড টুর করতেই বেরিয়েছিলাম সবাই—তার পর ছোট ছোট মহারাজগঞ্জে এসে সব আটকে গিয়েছি চিরকালের মত। আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমাদের। আর যাওয়া হবেও না।

বউ

সাধু দেখতে পেলাম আবু পাহাড়ে। নানা রকম সাধু। তিন শো বছর বয়েস কারো। উলঙ্গভাবে ভোলা মহেশ্বর হয়ে গুহায় ধ্যান করছেন। আবার দেখলাম কেউ তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদ ধরেছেন এক মনে। পাশে এক শিষ্য পাখোয়াজ বাজাচ্ছে। আবার কোথাও দেখলাম গুহার ভেতর ইলেকট্রিক আলো, রেফ্রিজারেটার। হাতের দশ আঙুলে দশটা হীরে পান্না মুক্তোর আঙটি, সিল্কের গেরুয়া কাপড় গায়ে, প্লেটে করে আঙুর খাচ্ছেন। পাশে বসে সিল্কি এক মহিলা শিষ্যা পাখার বাতাস করছেন।

দেখবার জিনিসের অভাব নেই আবু পাহাড়ে। তবু সাধু দেখে দেখে সত্যিই আর আশ মেটে না আমার।

গাইডকে জিজ্ঞেস করি—আর কোনও সাধু-সন্নিসী নেই এখানে?

আমার গাইড এমন যাত্রী আগে কখন দেখেনি। বড় বড় জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী টুরিস্টের সার্টিফিকেট আছে তার কাছে। তারা সবাই দিলওয়ারা মন্দির, সানসেট পয়েণ্ট, অচ্ছল-মহাদেবের মন্দির দেখে বেড়িয়েছে। আমি শুধু দেখে বেড়াই সাধু-সন্নিসী। ও কী করে জানবে কেন আমার অত আগ্রহ সাধুদের দেখবার জন্যে।

কিন্তু যোগানন্দ স্বামীর দেখা আমি আজও পাইনি। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, কুম্ভমেলা, পুষ্করতীর্থ, কেদারনাথ, গোমুখী কিছু আর বাকি রাখিনি। তবু যোগানন্দ স্বামীকে আমার পাওয়া চাই-ই। আমি যে কথা দিয়েছি নিরু বৌদিকে।

আজ নয়। আজ থেকে বহু বছর আগে কোথাকার কোন বোয়ালমুড়ি গ্রামের একটি বউয়ের গল্প। এঁদো-পড়া গ্রাম। না আছে একটা পোস্টাপিস, না আছে একটা ইষ্টিশান। রেলস্টেশন থেকে নেমে বাইশ মাইল গরুর গাড়িতে গিয়ে তবে পৌছতে হয় সে-গ্রামে। গ্রামও তেমনি। সকাল হতে না হতে দুপুর গড়িয়ে আসে, আর বিকেল হতে-না হতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। বাঁশঝাড় আর বাদুড়ের রাজ্য। মানুষ-জন আছে বৈকি। বাঁশের লাঠি হাতে দু-একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। তাও ক্কচিৎ-কদাচিৎ। কাশির শব্দ পেলে তবেই বোঝা যায় মানুষ-জন আছে কোথাও কাছাকাছি।

গরমের ছুটি হয়েছিল।

বিধবা পিসিমার জমি-জমা যা কিছু সব ওই বোয়ালমুড়িতে। খাজনা-পত্তর দিয়ে যদি পাঁচটা টাকাও আসে ঘরে তো তা-ও লাভ। বছর-বছর গিয়ে সময়মত আদায়পত্র করলে বিধবার হাতে তবু কিছু আসে। কিন্তু আসলে যাওয়ার লোকেরই অভাব।

সেবার আমিই গেলাম। গিয়ে উঠলাম পিসিমার আমলের কাছারি-বাড়িতে!

রাঙা জ্যাঠাইমা বুড়ো হয়ে গেছে। চোখে দেখতে পায় না। অন্ধ মানুষ উঠোনে রোদে বসে ছিল। বললে—থাক থাক বাছা, পায়ে হাত দিতে হবে না—

তারপর চিৎকার করে উঠল, অ বৌমা, বৌমা, কোথায় গেলে, দেখ যতীনের ছেলে এসেছে—

কিন্তু বৌমাকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না।

গোটাকতক ছোট ছেলেমেয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হল সামনে।

বললাম, ফটিকদা কোথায়?

জ্যাঠাইমা বললে, কাঁকুড়গাছিতে গেছে চোত কিস্তির সময়, বাবুদের বাড়ির

কাজে তার খাবার-নাইবার সময় নেই এখন। গেল শনিবারে বাড়িই আসতে পারেনি।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, বৌমা, অ বৌমা—কোথায় গেলে—যতীনের ছেলে এসেছে দেখ—অ বৌমা—

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিল আমাকে। তাকে কোলে তুলে আদর করতেই সে ভাঁা করে কাঁদতে শুরু করেছে। সভয়ে নামিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাছারি-বাড়িতে চলে আসছি। উঠোনের আতা গাছের কাছে আসতেই কে যেন ডাকলে—ঠাকুরপো—

পেছন ফিরতেই দেখি দরজার এক পাশে মস্ত একগলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিরু বৌদি। হাসি-হাসি মুখ।

বললে, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপটা খালি পড়ে আছে, ওখানেই থাকবেন আপনি—

বললাম, কেন, কাছারি-বাড়িতেই তো ভাল—

নিরু বৌদি বললে, ওখানে মানুষ-জন থাকে নাকি! সাপখোপ আছে।··· আপনি চা খান তো?

আধ ঘণ্টা বাদে একটা ছোট ছেলে এসে ফালিতে বাঁধা একটা চাবি দিয়ে গেল, বললে, আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন—চা পাঠিয়ে দিচ্ছে মা।

প্রথম দু-এক দিন প্রজাদের খবরাখবর দিতেই কেটে গেল। মালোপাড়া, মুসলমানপাড়া, পশ্চিমপাড়া, কৈবর্তপাড়া—সকলকে জানাতে হল আমি এসেছি। যার কাছে যা আদায় যেন দিয়ে যায় রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এসে। সারা গাঁয়ের লোক জ্বরে ধুঁকছে। নজর দিয়ে দেখাও করে গেল কেউ-কেউ।

সবাই বললে, এবার মা-ঠাকরুণকে এই নিয়েই রেহাই দিতে বলবেন হুজুর; জ্বর-জারির জন্যে এবার আমরা খেত-খামার দেখতেই পারিনি, বিলের কলমিশাক খেয়েই বেঁচে আছি শুধু, হাতে কিছু নেই হুজুর—

রাঙা জ্যেঠাইমা শুধু এক জায়গায় বসে থাকে দিনরাত।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শুনতে পাই বুড়ি চিৎকার করে বলছে, অ বৌমা, বৌমা, বলি গেলে কোথায়—আমাকে ঘরে তুলে দাও—রোদে পিঠ পুড়ে গেল যে—

মণি এসে ডাকে, কাকাবাবু, খেতে আসুন—মা ভাত দিয়েছে—

খেতে বসে রাঙা জ্যাঠাইমা দূর থেকে বলে—কী দিয়েই বা খাবে বাবা তুমি। দুধ নেই, মাছ নেই, পোড়া দেশে আকাল পড়েছে একেবারে। আমার চোখ গিয়ে সংসার একেবারে নয়-ছয় হয়ে গেল বাবা, কেবল অপচো-নষ্ট হচ্ছে সব—

তারপর আবার বলে, ফটিক বলে, মা তুমি চুপ করে বসে থাকো এক জায়গায়, তোমার কিচ্ছু করতে হবে না। তা কি পারি বাবা—আমরা সে-কালের মানুষ একা হাতে ক্ষার কেচেছি, ধান সেদ্ধ করেছি, মুড়ি ভেজেছি, শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাইয়েছি, হাড়ি ঠেলেছি, আর ওই সব আজকালকার বউ ধিন্ ধিন্ করে সারাদিন কেবল নেচে বেড়ায়—এই যে তুমি এসেছ কী খাবে না-খাবে, তারপর আমি একটা অন্ধ মানুষ, কোনও কিছু চোখে দেখি না, শুধু ধেই ধেই করে নাচলেই হল! তা আর দুটো ভাত নেবে বাবা?

তারপর হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। বলে, অ বৌমা, বৌমা, কোথায় গেলে—বলি অ…

সারা দিনরাত রাঙা জ্যাঠাইমা বৌমাকে ডাকে।

অন্ধ শাশুড়ী, তিন-চারটে ছেলেমেয়েদের তদারক। তারপর রান্না করা, ঘর দোর উঠোন ঝাঁট দেওয়া, ধান সেদ্ধ, মুড়ি ভাজা, বাসন মাজা, সারাদিন নিরু বৌদির কাজের আর শেষ নেই। অনেক দিন রাত্রে পুকুরঘাটে লম্ফ জলতে দেখেছি একটা। আর লম্ফর সামনেই ঘোমটা দেওয়া ঝাপসা একটি মূর্তি। ঘস্ ঘস্ করে বাসন মাজার শব্দ শুনতে পাই অনেক রাত পর্যন্ত।

সেদিন খেয়ে আসবার সময় আতা গাছটার পাশে আসতেই দরজার কাছ থেকে আবার ডাক এল, ঠাকুরপো।

পেছন ফিরতেই দেখি একগলা ঘোমটা দিয়ে নিরু বৌদি দাঁড়িয়ে। হাসি-হাসি মুখ। বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটা আরো একটু টেনে বললে, আমার একটা কাজ করে দেবেন ভাই ঠাকুরপো?

একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম, কী কাজ বলুন বৌদি—নিশ্চয় করে দেব—

তেমনি ঘোমটা টেনে হাসতে হাসতেই বললে, এখন না ভাই—রাত্তিরে—আপনার সময় হবে তো?

পাঁচ নয়, দশ নয়—প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। আমারও সেই কম বয়েস। এখনও মাঝে মাঝে নানান কাজ-কর্মের ভিড়ে নিরু বৌদির কথা মনে পড়ে। নিতান্ত আটপৌরে সংসার—কোথাও সচ্ছলতার কোনও নিদর্শন নেই। একটা শাড়িকে ক্ষার কেচে শুকিয়ে পরতে হত। বাসি কাপড় ছেড়ে কাচা কাপড়ে বিধবা শাশুড়ীর রান্না সারতে হত সকাল সকাল। তারপর ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে ছোট একপাল ছেলেমেয়ের তদ্বির তদারক। ভাসুর কাজ করত বিদেশে জমিদারী

সেরেস্তায়। সপ্তাহে কখনও একবার আসত বাড়িতে। মাসকাবারী গুড়, তেল নুন, হলুদ, মশলা এনে ফেলত। আবার কখনও এক মাসের ধাক্কা। কোনও খবরই নেই। কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না, তা-ও জানবার উপায় নেই। রাত দুপুরের সময় হয়ত পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে বসেছে খাওয়া-দাওয়া সেরে, ছেলেমেয়ে-গুলোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও খেয়ে নিয়েছে। এমন সময় গোলাম মোল্লার গাড়িতে মাল বোঝাই নিয়ে এসে হাজির ফটিকদা। মা জেগে উঠেছে। উঠেই কান্না।

বলে, দরকার নেই মা অমন চাকরীতে, একটা কাকের মুখে একবার খবরটা পর্যন্ত নিসনে আমি মলুম কি বাঁচলুম।

ফটিকদা মাতৃভক্ত ছেলে। মার জন্যে পান-সুপুরি, খই, আখের গুড় এনেছে সঙ্গে করে। সব একে একে নামিয়ে বলে, কেমন আছ মা আজকাল?

বুড়ি তখন আর কান্না রাখতে পারে না, বলে—এবার কোন্‌দিন এসে দেখবি মরে গেছি, কৈবর্তপাড়ার ছেলেরা কাঁধে করে গাঙের ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে, তখন আর আমাকে দেখতে পাবি না—

ফটিকদা গাড়ু নিয়ে হাত-পা ধুতে ধুতে বলে, কেন? আবার তোমার কী হল?

—হবে আবার কী? আমার মরণ হলেই তো বাঁচি—

এ-কথার পর ফটিকদার আর কিছু বলার থাকে না। নিজের মনেই একবার জিজ্ঞেস করে, মালোপাড়ার কেদার সর্দার কেমন আছে মা? সেবার বাতের অসুখে মর-মর দেখেছিলাম—

তারপর একটু থেমে বলে, পশ্চিমপাড়ার উমেশ ঢালীর ছেলেটার সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিল, কেমন আছে শুনেছ নাকি কিছু?

মা বলে, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, কার খবর রাখি বল্। আমার কে আছে যে খবর নেয়। কটা ছেলে কটা বউ আছে শুনি? তুই পড়ে রইলি বিদেশ-বিভুঁইয়ে, আর আমার অমন সোনার বউ, সে-ও রইল না। আর একটা ছিল ছেলে, তাও চলে গেল বিবাগী হয়ে ওই অলুক্ষুণে বউয়ের জ্বালায়—

তারপর চোখের জল মুছে কান্না থামিয়ে বলে, যিনি আছেন তিনি তো পটের বিবিটি। আমার সাহস কি ওঁকে হুকুম করি মা। বলে রেঁধে দেয় তাই কত খোঁটা—

ফটিকদা বলে, তা ছোটবউমা তো তোমার সেবা করে মা—

কানে কথাটা যেতেই শাশুড়ী লাফিয়ে ওঠে। যেন সাপ দেখে আঁতকে ওঠার

মতন। বলে, সেবা করবে আমাকে, তবেই হয়েছে। পেয়েছে আমার মত শাশুড়ী তাই, নইলে—

নইলে যে কী তা আর বলা হল না। ছোটবউ একগলা ঘোমটা দিয়ে সামনে গরম তেলের বাটিটা নিয়ে হাজির হল। বললে, আপনার মালিশের তেলটা এনেছিলুম মা, একটু মালিশ করে দেব?

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রাঙা জ্যাঠাইমা।

বললে, দেখ্, এই তোকে দেখে এখন শাশুড়ীর সোহাগ হচ্ছে। রোজ এই বললে বিশ্বেস করবিনে ফটিক, চৌপর দিন হা-তেল হা-তেল করে মরেছি—বলি কথা বলতে কষ্ট হয়, একটু মালিশ করলে যদি সারে তবু—তেলটা গরম করে দিলে আমি নিজেই মালিশ করে নিতে পারি—তাও পাইনে, এখন তোকে দেখেছে আর আমায় সোহাগ করতে এসেছে—

ছোটবউ ঘোমটার ভেতর থেকেই বলে, সন্ধ্যেবেলা যে আমাকে আপনি বললেন শোবার আগে তেলটা মালিশ করে দিতে—তাই তো—

—চোপরা কোর না মা, শাশুড়ীর সঙ্গে চোপরা করতে নেই। শাশুড়ী গুরুজন হয়; চোপরা করলে আমার আর কী মা, তোমারই জিভ খসে যাবে। আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলি—

তারপর আবার খানিকটা কেঁদে নিয়ে বললে, কপালই মন্দ আমার, নইলে—জিজ্ঞেস করো ওই ফটিককে, ও সাক্ষী আছে, সোনার বউ ছিল আমার, মুখের কথা খসতে না খসতে সব কিছু হাজির করত সে। আমারই কপাল, নইলে নিজের পেটের ছেলে কি না বিবাগী হয়ে যায়। কিসের দুঃখু ছিল তার বলো—অনেক পাপ করেছিলুম মা—

ছোটবউ শাশুড়ীকে চেনে। তবু গরম তেলটা নিয়ে শাশুড়ীর বুকে মালিশ করতে গেল। কিন্তু তার আগেই শাশুড়ী তেলের বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে উঠোনের মধ্যেখানে।

বলে, আমার মালিশটাই কিনা বড় হল এখন। দেখছিস-রে ফটিক দেখ, তুই তো বিদেশে থাকিস, আমি কী সুখে ঘর করি দেখ তুই। আমার ছেলে বিদেশে থেকে খেটে খুটে এল, খিদেয় বাছার প্রাণ আইঢাই করছে, তার ভাতটা আগে চড়িয়ে দেবে না আমার মালিশ। ছেলে তো আর পেটে ধরলে না, নাড়ীর টান বুঝবে কেমন করে মা—

বউ বলে, ভাত নামিয়েছি, এবার ঝোলটা চড়ালুম মা—

ফটিক হয়ত সব শুনছিল। বললে, না না, আমার জন্যে রাঁধতে হবে না মা, আমি তো খেয়ে এসেছি কেষ্টগঞ্জ থেকে। শশী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হল, না খাইয়ে ছাড়লে না তারা, বলতেই ভুলে গেছি—

মা আরো কেঁদে উঠল।

—তা তো খেয়ে আসবেই বাছা, জানে তো বাড়িতে কেউ নেই। আমার চোখ থাকলে কি আজ সংসারের এই দশা হয় বাছা। মরুক, ঝরুক, সব ভেসে যাক, গোল্লায় যাক। ছোট ছেলেটা গেছে এবার তুইও বিবাগী হয়ে যা। আমি আর ক'টা দিনই-বা, তারপর ওই রাক্ষুসী·· বলি অ বৌমা, বলি শুনছ, অ বৌমা, অ—

এমনি প্রত্যহ।

খেতে বসে মণি এক-একদিন জিজ্ঞেস করেছে, কাকাবাবু, আর দুটো ভাত নেবেন? মা জিজ্ঞেস করছে—

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই হাসিমুখ। ঘোমটায় মুখ ঢেকে অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখছে।

কোন দিন মণি বলে, জানেন কাকাবাবু, আজ মা পড়ে গেছল—

—পড়ে গেছল? কী সর্বনাশ! কোথায়?

—পুকুরঘাটে। খুব রক্ত পড়েছিল মাথা থেকে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

—কে ওষুধ দিলে? খুব লেগেছে?

—না না, মার কি লাগে, মা কি ছোটছেলে নাকি! মা কি কাঁদে খুকুর মতন, শুধু হাসতে লাগল। মা বললে, ঠাকুমাকে বলিসনি কিছু। আমি ঠাকুমাকে কিছু বলিনি, শুধু গ্যাঁদা ফুলের পাতা এনে দিলুম মল্লিকদের বাগান থেকে, মা থেঁতো করে টিপে লাগিয়ে দিলে কপালে—

কদিন আর ছিলাম বোয়ালমুড়িতে। সেখানে সেই আমার প্রথম আর শেষ যাওয়া। সেই বাঁশঝাড় আর বাদুড়ের রাজ্যে। বাত আর সান্নিপাতিকের পীঠস্থান, দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনার কেন্দ্রভূমি। কিন্তু বোয়ালমুড়ি গ্রামের রায় বাড়ির সেই চরিত্রটির কথা আজো ভুলতে পারিনি। নিরু বৌদি আমাকে আজীবন অনুসরণ করে চলেছে। চোখ বুজলেই সেই হাসি যেন কানে শুনতে পাই।

জ্যাঠাইমা বলত, মুখপুড়ির হাসি দেখ না, হাসি শুনলে গা জলে যায়। জোয়ান মেয়ের এত হাসি কেন লা। তবু যদি সোয়ামী ঘরে থাকত, কোলে ছেলে দিত ভগমান—

রাত তখন প্রায় বারোটা। একলা-একলা বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম।

হঠাৎ যেন বাইরে কার পায়ের শব্দ হল।

নিরু বৌদির গলা শোনা গেল, ঠাকুরপো কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

শশব্যস্তে উঠে দরজা খুলে দিলাম।

বললাম, আসুন আসুন বৌদি। এত রাত হল, আমি তো ভাবলাম আর এলেন না বুঝি—

নিরু বৌদি বললে, এই তো এখন ছাড়া পেলাম ভাই। বাসন মেজে ঘষে মুছে, রান্নাঘর ধুয়ে, খুকুর .কাঁথা বদলে, শাশুড়ীর মাথার কাছে জলের ঘটি রেখে তবে আসছি। কাজ কি কম ভাই—

বলে হাসতে লাগল নিরু বৌদি। দেখলাম—লালপাড় শাড়িটা গায়ে বেশ করে জড়িয়ে ঘরে ঢুকেছে। আস্তে আস্তে একহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিরু বৌদি বিছানার এক কোণে আলগোছে বসল।

বললাম, আপনি বরং ভাল করে বিছানায় পা তুলে বসুন বৌদি, আমি এই চেয়ারটায় বসছি।

নিরু বৌদি বললে, তবেই হয়েছে, এত খাতির আর করে না আমাকে। ভারী তো দুটো দিনের জন্যে এসেছেন, শেষে ফিরে গিয়ে বলবেন, এমন দেশে গিছলুম খাতির যত্ন কিচ্ছু জানে না—জংলী মানুষ সব। বাড়ি গিয়ে বোয়ালমুড়ির নিন্দে করবেন তো খুব—?

—তা বলে আপনার নিন্দে কিন্তু কেউ করতে পারবে না, তা আমি বলে দিচ্ছি বৌদি—

নিরু বৌদি বললে. আপনাদের তো মুখের কথা! আপনাদের খুব চেনা আছে। কলকাতার লোক কি কম নাকি!

—কলকাতার লোকেরা বুঝি খুব খারাপ বৌদি?

নিরু বৌদি গালে হাত দিয়ে হাসতে লাগল, ওমা, আমি কি তাই বললুম নাকি? আমি আবার কখন খারাপ বললুম আপনাকে? আমিই বলে কত ভাবছি আপনার হয়ত খেয়ে পেট ভরছে না, কী দিয়ে যে রোজ ভাত দিই তাই-ই ভেবে পাইনাবলে—

এক মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে গেল নিরু বৌদির। দূরে বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে একটা শেয়াল ডেকে উঠল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়ালের সমবেত কণ্ঠ। চকিতে যেন নিরু বৌদির সম্বিত ফিরে এল।

বললাম, কই, আপনার কাজের কথাটা তো বললেন না—

নিরু বৌদি বললে, আপনাকে একটু কষ্ট দোব ভাই—কিছু মনে করবেন না
ন—

—না না কষ্ট কিসের, আপনি বলুন না কী কাজ !

নিরু বৌদি যেন তবু দ্বিধা করতে লাগল।

বললে, সত্যি বলছেন, কিছু মনে করবেন না আপনি ? সত্যি বলুন, তিন সত্যি
করুন—

—আগে বলুনই তো কী কাজ।

নিরু বৌদি বললে, না ভাই, কাউকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। কষ্ট দিলে তো
আমারই লোকসান। বলুন, পরকে কষ্ট দিলে তো পরের জন্মে আমাকেই কষ্ট পেতে
হবে। আর কেউ না জানুক চিত্রগুপ্তের খাতায় তো সব হিসেব লেখা থাকবে—

আমি কিছু বললাম না। শুধু বললাম, আপনাকে যে সবাই কষ্ট দেয় ?

নিরু বৌদি যেন অবাক হয়ে গেল। বললে, কই, কে কষ্ট দেয় ?

বললাম, কেউ কষ্ট দেয় না আপনাকে ?

—দিক গে কষ্ট, আমি তো কষ্ট বলে মনে করি না ভাই। এ-জন্মে যে কষ্ট দেবে
পরের জন্মে সে-ই ভুগবে। আমিও হয়ত আগের জন্মে পরকে কষ্ট দিয়েছিলুম···
কিন্তু ভগবান তো সব দেখছেন মাথার ওপর থেকে, বলুন, দেখছেন না ঠাকুরপো—?

সেদিন ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে হয়ত তর্ক করতে পারতাম। কিন্তু নিরু
বৌদির সামনে বসে আমার সমস্ত বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সন্দেহ, দ্বিধা কোথায় যেন
অন্তর্ধান করে গেল এক নিমেষে। সেই মধ্যরাত্রির অন্ধকার পরিবেশে চারদিকের
বাঁশঝাড় আর বাদুড়ের পীঠস্থানে এক স্বল্প-আলোকিত চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরে বসে নিরু
বৌদির সঙ্গে তর্ক করবার দুষ্প্রবৃত্তি আমার হল না কেন—তার কারণ হয়ত ভূ-ভারতে
কেবল আমিই জানি।

হঠাৎ নিরু বৌদি বললে, যাক, কাজের কথাটা বলি ভাই এবার—

বলেই সেমিজের ভিতর থেকে একটা তিন পয়সা দামের জোড়া পোস্টকার্ড বার
করলে নিরু বৌদি। বললে, রাধুর মাকে দিয়ে এই পোস্টকার্ডখানা কিনে
এনেছিলুম, কিন্তু লেখার অভাবে এতদিন পড়ে আছে শুধু, এতে একটা চিঠি লিখে
দেবেন ভাই ?

পোস্টকার্ডখানার চেহারা দেখে আরো অবাক হয়ে গেলাম। বহুদিন অব্যবহৃত
থাকায় ধুলো ময়লা পড়ে কালো হয়ে গেছে। এখন লিখতে গেলে কালি চুপসে
যাবে !

বললাম, কবেকার কেনা এটা? ক'বছর আগে?

নিরু বৌদি বললে, ক' বছর তা কি মনে আছে! আমি যদি লেখাপড়াই জানব তো তাহলে আমার ভাবনা!

পোস্টকার্ডখানাকে টিপে টেনে সোজা করে নিয়ে বললাম, কাকে লিখতে হবে?

—আমার মাকে!

—ঠিকানা কী?

—লিখুন আমার ভাইয়ের নাম, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভটচায্যি—আর ওপরে লিখুন মায়ের নাম—

—কোন্ পোস্টাপিস?

—বড়মাতলা, নেবুতলা বাড়ি পৌঁছে, ওই লিখলেই চিঠি যাবে। আমার নিজের হাতে পোঁতা নেবুগাছ কিনা, এই এত বড় বড় নেবু হয়, দেখুন—এই এত বড় বড় জানেন ঠাকুরপো, পান্তাভাত দিয়ে কচলে খেলে কী স্বতার হয় কী বলব ভাই মাখন বলত, ওটা ওর নেবুগাছ, আমি বলতুম আমার। তাই নিয়ে ঝগড়া বেধে যেত শেষকালে—

তারপর একটু থেমে নিরু বৌদি বললে, আচ্ছা আপনিই বলুন তো ঠাকুরপো হারানী ওদের বাগান থেকে নেবুগাছের চারাটা দিলে আমাকে, আমি আমাদের বাগানে পুঁতলুম আর উনি কেবল বাগানে জল দিয়েছেন, তাতেই গাছটা ও'র হয়ে গেল, বলুন তো? আপনিই বিচার করুন তো ঠাকুরপো—

বললাম—চারা যখন আপনি পুঁতেছেন, তখন গাছও আপনার বৈকি—

নিরু বৌদি বললে, তা মাখন কি সেকথা শুনবে? ওর গায়ে জোর বেশী, আমাকে টিপ টিপ করে কিল মারত কেবল। তাই না দেখে মা'র কাছে আমিই বকুনি খেতাম মা আমাকে বলত, তোরই তো দোষ রাক্ষুসী, তোর দুদিন বাদে বিয়ে হবে, শ্বশুর ঘর করবি, সোয়ামী হবে, ছেলেপুলে হবে, কোন লজ্জায় বেটাছেলের সঙ্গে ঝগড়া করিস শুনলেন মার কথা, বিচারটা একেবার দেখলেন তো ঠাকুরপো?

বললাম, তা তো বটেই—

নিরু বৌদি বললে, তারপর আমার বিয়ের দিন! আমার তো সবে তখন দশ বছর বয়েস,—বাইরে বর এসেছে, হারানীরা এসেছে বর দেখতে, আমি চুপি চুপি হারানীকে জিজ্ঞেস করলুম, আমার বরকে কী রকম দেখতে রে? খুব ছোট তো তখন, কাকে বলে বর, কাকে বলে বউ, কিছুই জানিনা। মার কানে গেছে কথাটা

সে কী বকুনি ঠাকুরপো, বললে, মুখপুড়ীর লজ্জা শরম নেই, এখন থেকেই বর-বর শিখেছে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে খাবেন লাথি ঝাঁটা, শাশুড়ী যখন চুলের মুঠি ধরে মারবে, যখন কেঁদে কুল পাবেন না, তখন আমার কথা মিষ্টি লাগবে—ও মেয়ে আমাকে না মেরে ছাড়বে না।···এই সব—

তারপর একটু থেমে বললে, আপনিই বলুন তো ঠাকুরপো, দশ বছর বয়েসে অত বুদ্ধি হয় কারো, বলুন। এখন না হয় বুঝেছি মা আমার ভালর জন্যেই বলত সব, আমাকে যাতে শ্বশুরবাড়িতে সবাই ভালবাসে তাই এত শেখাত। তখন কি অত সব বুঝতুম! এখন বুদ্ধি হয়েছে, এখন সব শিখেছি, তাই তো মার জন্যে কেবল মন কেমন করে। মা বলে কথা, মার তুল্য আছে নাকি কেউ সংসারে, বলুন ঠাকুরপো—

বললাম, তা তো বটেই—

নিরু বৌদি হঠাৎ আবার সচকিত হয়ে উঠল যেন।

বললে, যাক গে, সে-সব বাজে কথা, আপনি লিখতে আরম্ভ করুন।

বললাম, কী লিখব ?

—লিখুন, তোমার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে, আমি তোমার কথা কেবল ভাবি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে কেবল, এই সব লিখুন—

লিখলাম। বললাম, তারপর ?

নিরু বৌদি বললে, কি লিখলেন পড়ুন তো একবার—

পড়লাম।

নিরু বৌদি বললে, ঠিক হয়েছে, এইবার লিখুন হারানীর কথা। হারানী কোথায়, শ্বশুরবাড়িতে না বাপের বাড়িতে, বাপের বাড়িতে আসে কিনা—হারানীর ছেলেপুলে কটা। আর লিখুন, মাখনকে পাঠিয়ে আমাকে একবার নিয়ে যাও, আমার বাপের বাড়ি যেতে বড় ইচ্ছে করে, খরচপত্তরের জন্যে ভাবনা নেই, আমার হাতের রুলিটা বাঁধা রেখে আমি গাড়ি-ভাড়া জোগাড় করব, মার জন্যে এক জোড়া থান কিনে রেখেছি, আর মাখনের বউয়ের জন্যে বেগুনফুলি শাড়ি একখানা। এখান থেকে যাবার সময় মাখনের ছেলেমেয়েদের জন্যে বোয়ালমুড়ির চিনির পাকের মুড়কি-বাতাসা দু হাঁড়ি নিয়ে যাব, আর বেশীদিন তো এই সংসারে থাকতেও পারবো না।

তারপর একটু থেমে ঝুঁকে বললে, কি লিখলেন পড়ুন তো ঠাকুরপো—

ক্রমে অনেক রাত হয়ে এল। আর একবার শেয়ালের দল বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে চিৎকার করে আর এক প্রহর রাত ঘোষণা করতে লাগল। বললাম, আর কী লিখব বলুন—

নিরু বৌদি বললে, আর লিখুন···

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল নিরু বৌদি। কী যেন কান পেতে শুনছে।

বললে, এখুনি আসছি ঠাকুরপো, খুকু উঠেছে, যাই আবার, নইলে বিছান ভাসিয়ে দেবে—

বলেই হুড়মুড় করে উঠে পালিয়ে গেল।

বোয়ালমুড়ি গ্রামে প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, তখন তার বাইরে থেকে কেবল ডোবা, মশা, বাত, সান্নিপাতিক, লাঠি, কাশি, বাঁশঝাড় আর বাদুড়ই দেখেছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই মধ্যরাত্রের অন্ধকারে রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসে মনে হল, বোয়ালমুড়ি গ্রাম যেন বড় সুন্দর, বড় মধুর। একটিমাত্র মানুষের জন্যে বোয়ালমুড়ি গ্রামের সব কিছু যেন আজ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। আমি শহরের মানুষ, সিনেমা-রেডিও ট্রাম-বাস অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসী, কিন্তু তবু সেই মুহূর্তের জন্যে কলকাতা শহরকেও যেন বোয়ালমুড়ির চেয়ে ছোট মনে হল, সঙ্কীর্ণ মনে হল, অপরিসর, অনুদার মনে হল।

হঠাৎ বৌদি আবার ঘরে ঢুকেছে।

বললে, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ঠাকুরপো?

বললাম, যদি আপনার কষ্ট হয় তো থাক না বৌদি, আমি তো আরো দুদিন আছি, আপনার এ-চিঠি আমি শেষ করে তবে যাব।

—না ভাই, চিঠি আজকে অনেক দিন পরে লিখছি। অনেক দিন মার কোনও খবর পাইনি কি না, বড্ড মনটা কেমন করছে। তা মাখনও তো একটা চিঠি দিতে পারে। বলুন, তুই তিনটে পয়সা খরচ করে দু ছত্তোর লিখতে পারিস না? মেয়ে মানুষ তো নয়, বুঝবে কি? আর বুঝলুম না হয় যে, তোর অবস্থা ভাল নয়, আমাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবার পয়সা তোর নেই, ধারধোর করে যজমানদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে অতগুলো ছেলেপুলের সংসার চালাতে হয়, কিন্তু তিনটে পয়সার তো মামলা, আর সে-তিনটে পয়সা না হয় আমিই দিয়ে দিতুম—

বলতে বলতে নিরু বৌদি থেমে গেল খানিকক্ষণ।

তারপর খুব খানিকটা হেসে নিলে। বললে, আসলে তা নয়, আসলে কী জানেন ঠাকুরপো?

বললাম, আসলে কী?

—আসলে অভিমান হয়েছে আমার ওপর।

—আপনার ওপর অভিমান?

—হ্যাঁ, আসলে অভিমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল, ভাসুর জমিদারী সেরেস্তাতে কাজ করেন, আমার হাতে সংসার-খরচের টাকা, জানে তো সব তারা, আমি কেন পাঠাই না কিছু তাদের সংসারে, এই হয়েছে আসল ব্যাপার, জানেন। তা আপনি তো দেখছেন ঠাকুরপো রায়বাড়ির অবস্থা। যখন বোল-বোলা অবস্থা ছিল, তখনকার কথাই ছিল আলাদা কিন্তু এখন তো দেখছেন—কী দিয়ে আপনাকে ভাত দিই তার ভাবনাতেই অস্থির আমি। গুড় মুড়ি দিয়ে ছেলেমেয়েদের না হয় ভোলালুম কিন্তু ওই বুড়োমানুষ শাশুড়ী, ওঁকে কি করে বোঝাই বলুন তো? উনি তো কিছু বুঝবেন না—আর আমার নিজের সংসার বলতে তো কিছু নেই—বলুন, আছে?

বললাম, কেন, নেই কেন বলছেন বৌদি, আপনার ভাসুরের ছেলে-মেয়েরাই তো আপনার নিজের ছেলেমেয়ের মতন, তারা তো আপনাকেই মা বলে ডাকে।

—তা হোক, হাজার হলেও পেটের ছেলে আর পরের ছেলে সে তো আর এক জিনিষ নয়। আমার জা যখন ছিল, বলত, তুই বেশ আছিস ঝাড়া-ঝাপটা, কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু সেই জা-ই বা এখন কোথায় গেল, আর আমিই বা কোথায়? ওদের নিয়েই তো আমার সংসার এখন। আমার ভাসুর তো শুধু এসে দেখে যান মাসে মাসে আর টাকা পাঠিয়ে দেন কিন্তু ঝামেলা তো আমাকেই পোয়াতে হয় সব। তা সে জায়ের ছেলেই হোক আর নিজের ছেলেই হোক—

বললাম, কিন্তু মার কাছে যে যাবেন বলছেন, এদেরও কি নিয়ে যাবেন সঙ্গে? না হলে ওদের দেখবে কে?

নিরু বৌদি কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে এল। বললে, তাও ভাবি এক-একবার ঠাকুরপো, বলি তো যাব বাপের বাড়ি কিন্তু আমি গেলে ওদের দেখবে কে? আমি যদি এমনিতেই একটু সামনে না থাকি তো অস্থির, কে ওদের জামা পরিয়ে দেবে, কে খাইয়ে দেবে, কে নাইয়ে দেবে—

তারপর একটু থেমে নিরু বৌদি বললে, বয়ে গেল আমার, কে ওদের কথা ভাবে। দেখছেন তো ঠাকুরপো এই সংসারের অবস্থা, যার-যার তার-তার, ওরা যখন বড় হবে তখন তো বুঝবে আমি ওদের কে, কেউ-ই নই বলতে গেলে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে বৌদি বললে, খুকু কাঁদছে না?

আমিও কান পাতলাম। বললাম, কই? কেউ তো কাঁদছে না?

—ওই দেখুন, ওই রকম কেবল হয় আমার। মনে হয় ঘুমোতে ঘুমোতে যদি খুকু খাট থেকে পড়ে যায়। রাত্তিরে ঘুম নেই, দিনে শান্তি নেই, আমার জা মরে গিয়ে

আমায় একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে দিয়ে গেছে ভাই। আমি এ-সংসার থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যাই। মনে হয় যেখানে দু-চোখ যায়—যাই পালিয়ে। কিন্তু ওই ছেলেরা, ওই অন্ধ মানুষ বুড়ি শাশুড়ী—সামনে তো দেখছেন আমাকে কত বকুনি, একটু চোখের আড়াল হলেই ডাকবেন বউমা বউমা, অ বউমা, অ···। ওঁর মুখে বুড়ো বয়েসে একটা ভগবানের নাম পর্যন্ত নেই, রাধা-কেষ্টর নাম নেই, কেবল হা বৌমা আর যো বৌমা····· বৌমা যেন হয়েছে ওঁর জপতপ—

হঠাৎ নিরু বৌদি বললে, যাক গে বাজে কথা, দুদিনের জন্যে আপনি এসেছেন আর আপনাকে নিজের কথা শুনিয়ে যত কষ্ট দেওয়া, ছি ছি, আপনারও ঘুম হল না—

বললাম, আমার আর কী এমন কষ্ট—আপনাকে তো সেই ভোর রাত্তিরে উঠতে হবে আবার—

নিরু বৌদি তেমনি হাসতে হাসতে বললে, আমার কথা ছেড়ে দিন ভাই ঠাকুরপো, আমি তো পুকুরঘাট, গোবর নিকোন আর রান্নাঘর এইসব নিয়েই ভূতের বেগার খেটে মরব সারা জীবন। অথচ কার যে সংসার আর কে যে খেটে মরে তারই কোন হিসেব নিকেশ হল না আজ পর্যন্ত। তা যাক,' চিঠিখানা একবার সমস্তটা পড়ুন তো —কী লিখলেন শুনি—

সমস্তটাই পড়লাম।

নিরু বৌদি ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে সমস্তটা শুনলে। তারপর চিঠিখানা নিয়ে উঠল। উঠে ঘোমটাটা ভাল করে টেনে দিলে মাথায়। বললে, অনেক রাত করে দিলুম আপনার, মনে মনে গালাগালি দিচ্ছেন তো খুব—

—ছি ছি, আপনার মত একজন বৌদি পেলাম, লাভ তো আমারই—

—লাভ যা বুঝতে পারছি, একদিন মনের মত করে ঠাকুরপোকে খাওয়াব সেই ক্ষমতাই ভগবান দিলেন না। কী আর বলব। ক'টা বাজল দেখুন তো আপনার ঘড়িতে?

ঘড়ি দেখে বললাম, দুটো বাজতে···

—উঃ কত অপরাধই যে করছি—আমার পাপের আর শেষ নেই সত্যি।···আচ্ছা আসি ভাই—

বলে নিরু বৌদি ঘরের বাইরেই চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, মণি বলছিল আপনি নাকি আসছে মঙ্গলবার চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আর কতদিন আপনাকে কষ্ট দেব?

—ইস্, ভারী কষ্ট দিচ্ছেন, এমনি কষ্ট মাঝে মাঝে দিলে তবু তো বাঁচি। তারপর যখন বিয়ে-থা করবেন তখন তো বোয়ালমুড়ির কথা একেবারে ভুলেই যাবেন—

কী জানি কী হল আমার। বললাম, না বৌদি কত দেশেই তো ঘুরি। হরিদ্বার মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া। কিন্তু বোয়ালমুড়িতে এসে যা লাভ হল তা কোথাও হয়নি বৌদি—

নিরু বৌদি বোধ হয় হাসতেই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো একটা কথা বলি। আপনি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, না ভাই—অনেক তীর্থস্থান ?

বললাম, হ্যাঁ পিসিমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় তো ঘুরতে হয়েছে—

নিরু বৌদি বললে, মথুরা গেছেন ? কাশী ? বৃন্দাবন ? জগন্নাথক্ষেত্তর ?

বললাম, হ্যাঁ—

—ওখানে অনেক সাধু-সন্নিসী আছেন, না ?

—তা আছে হয়ত। কেন বলুন তো ?

নিরু বৌদি যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বললে, না, এমনি বলছিলুম—তীর্থক্ষেত্রেই তো সাধু-সন্নিসীদের ভীড় হয়···

হঠাৎ নিরু বৌদির চোখের দিকে চেয়ে যেন কেমন অবাক হয়ে গেলাম। মুখের সেই হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। নিরু বৌদির এ-চেহারা যেন আমার অচেনা। নিরু বৌদি যেন এখন আর মেয়ে নয়, মা নয়, গৃহিণী নয়, এমন কি বৌদি'ও নয়। হঠাৎ যেন নিরু বৌদিই এক নিমেষে এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর শুধু নারীও নয় যেন—বধু। বউ। কোন এক বিবাগীর বউ! এতদিনের মধ্যে এমন রূপ যেন আজ প্রথম দেখলাম।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। কখন নিরু বৌদি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল দেখতে পাইনি। দেখতে পেলাম যখন একটু পরেই আবার ফিরল।

হাসতে হাসতে বললে, এই দেখুন ভাই ঠাকুরপো, আমার মাথার ঠিক নেই—আমি আর এ-চিঠি কাকে দিয়ে ডাকে ফেলব, বরং এটা আপনার কাছেই থাক, আপনি যখন সকালবেলা পোস্টাপিসের দিকে যাবেন, এ-চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দেবেন। চললুম ভাই, ঘরে আবার শাশুড়ীর গলা পাচ্ছি—

বলতে গেলে জীবনে সেই আমার নিরু বৌদির সঙ্গে প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। আজ নিরু বৌদি বেঁচে আছেন কিনা তা-ও বলতে পারব না। ফটিকদা, ফটিকদার অন্ধ মা—নিরু বৌদির সেই দজ্জাল শাশুড়ী—তিনিও বেঁচে আছেন কিনা তা-ও বলতে

পারব না। কারণ বোয়ালমুড়ির সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে পিসিমা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নিরু বৌদির সঙ্গে তার মায়ের যে আর দেখা হয়নি তা আমি আজো সঠিকভাবেই বলে দিতে পারি। আসলে সেদিনকার সেই অত রাত জেগে লেখা চিঠিটা আমি শেষ পর্যন্ত ডাকবাক্সেই ফেলিনি! কারণ ফেলতে আমার মানা ছিল। ফটিকদাই মানা করেছিল আমাকে।

আজ সেই ঘটনাটি বলি।

পরদিন ভোরবেলা, তখনও ভাল করে জাগিনি। একটা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। দরজা খুলে দেখি ফটিকদা। জমিদারী সেরেস্তার কাজ সেরে প্রচুর মালপত্র নিয়ে রাত থাকতেই এসে পড়েছে। জামাটা গায়ে দিয়ে সকাল-সকাল চিঠিটা ডাকে দেব বলে বেরিয়েই পড়ছিলাম।

ফটিকদা বললে—ভায়া যে—

বললাম, এখন এলেন?

গুড়ের নাগড়ি, কুলো-ডালা, মানকচু, নারকেল-কাঁদি, নানা রকমের জিনিস বোঝাই। তারই তদারক করতে ব্যস্ত ফটিকদা। তবু বললে, কেমন আদায়পত্তর হচ্ছে ভায়া?

তারপর একটু থেমে বললে, প্রাতঃভ্রমণ করতে চললে বুঝি?

বললাম, না, নিরু বৌদির একটা চিঠি ছিল, ডাকবাক্সে ফেলতে যাচ্ছি, খুব জরুরী—

—চিঠি! কার বললে? ছোট বৌমার?

ফটিকদার মুখের ভাব হঠাৎ যেন আমূল বদলে গেল একেবারে।

বললে, বড়মাতলায় মা'কে লেখা?

বললাম, হ্যাঁ—কিন্তু···

বললে, দেখি—

চিঠিটা দিলাম হাতে। দু এক লাইন পড়েই কী হল ফটিকদার, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে দুই হাতে। বললে, এ-চিঠি পাঠিয়ে কোনও কাজ হবে না ভাই, কিছু মনে করো না—

তবু অবাক হওয়া আমার আরো বেড়ে গেল।

ফটিকদা বললে, ছোট বৌমারই কপালের ভোগ। নইলে কোলে একটা ছেলেপুলেও নেই, আর স্বামীও গেল বিবাগী হয়ে—তার ওপর নিজের মা, তা-সে গরীবই হোক আর যা-ই হোক, মা তো, তা সেই মা-ও···

কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল ফটিকদা।

তারপর বললে, তা সেই মা-ও আর বেঁচে নেই। ছোট বৌমাকে খবরটা শোনাব কেমন করে তাই মনে মনে ভাবছিলাম—বড়মাতলায় গিয়েছিলাম প্রজাবিলির কাজে, সেখানেই শুনলাম খবরটা। এমন পাষণ্ড ভাই, একবার আমাদের জানায়ওনি। একেই নানা অশান্তি ছোটবৌমার মনে, এর ওপর যদি আবার মায়ের মৃত্যুর খবরটা দিই তো···

জানি না পরে কোনও দিন নিরু বৌদিকে খবরটা শেষ পর্যন্ত জানান হয়েছে কি না। জানার পর মুখের সেই হাসিও বন্ধ হয়ে গেছে কি না চিরকালের মত। কিছুই জানি না।

বোয়ালমুড়ি থেকে চলে আসবার দিন ইচ্ছে হয়েছিল নিরু বৌদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসব। অনেকবার সুযোগও খুঁজেছিলাম। কিন্তু ভাসুর বাড়িতে থাকায় সে-সুযোগ আর হয়নি। শুধু কানে এসেছিল শাশুড়ীর সেই গলা, অ বৌমা, বলি শুনতে পাচ্ছ, অ বৌমা, বৌমা, অ···

শুধু বেরোবার সময় ফটিকদা বলেছিল, তোমাকে তো পিসিমাকে নিয়ে অনেক তীর্থস্থানে ঘুরতে হয় ভায়া—একটা কাজ করবে ?

বললাম, বলুন ?

ফটিকদা বললে, আমার তো সময়ও হয় না, আর সামর্থ্যও নেই আগেকার মত, তবে আমাদের বাবুরা গিয়েছিল এবার কামিখ্যেয়, জানো, বলছিল নাকি আমার ভাইয়ের মত এক সাধুকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে ওখানে। কে জানে—

তারপর একটু থেমে আবার বললে, শুধু ওঁরাই নয়, বারুইপুরের কৈলাস আচার্যিও গেল বছর শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, বলছিলেন, অবিকল তোমার ভাইয়ের মত চেহারা ফটিক, দাড়ি গোঁফ ঢাকা, ধরতে পারলুম না, ফসকে গেল—

—তা তুমি যদি এদিক-ওদিক যাও তো খুঁজে দেখো না ভায়া—আমার জন্যে নয়, ওই ছোটবৌমার কথা ভেবেই কষ্ট হয়। হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো···

তারপর মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, কামাখ্যা, হরিদ্বার, প্রয়াগ, পুষ্কর আবার গিয়েছি। একবার নয়, অনেকবার। পিসিমা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তাঁকে নিয়ে তো গিয়েছিই, এখন একলাই যাই। ও মন্দির, ঠাকুর, পুজো-পার্বণ ও-সব দেখি আর না দেখি, সাধু-সন্নিসী দেখা বাদ দিই না! সাধু দেখলেই পরিচয় করি। হাত

দেখাবার নাম করে, কোষ্ঠী গণনার ছুতোয়, কখনও বা ভোজন করিয়ে আলাপ করবার চেষ্টা করি। ভাব জমাই। কোনও সূত্রে যদি কোথাও বোয়ালমুড়ি গ্রামের ফটিকচন্দ্র রায়ের ভাই নিরু বৌদির স্বামীর সন্ধান পেয়ে যাই।

আজ আবু পাহাড়ে এসেও অনেক সাধু দেখলাম। গুহায় ভর্তি পাহাড়। পদে পদে গুহা। সাধুর শেষ নেই। তিনশো বছরের উলঙ্গ সাধু, কেউ আবার তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদ গেয়ে চলেছেন আপন মনে, শিষ্য পাশে বসে পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। আর কোথাও বা গুহার ভেতর ইলেকট্রিক আলো, রেফ্রিজারেটর। দশ আঙুলে দশটা আঙটি-পরা ডবল এম-এ পাশ সিল্কের গেরুয়া-পরা এক সাধু প্লেটে করে আঙুর খাচ্ছেন, আর পাশে বসে সিন্ধী শিষ্যা পাখার বাতাস করে চলেছে পরম ভক্তিভরে।

এত বিচিত্র পৃথিবী, এত বিচিত্র এর মানুষ আর মানুষের মিছিল, এর মধ্যেও বোয়ালমুড়ি গ্রামের সেই পাড়াগেঁয়ে বউটির কথা কিছুতেই আর মন থেকে তাড়াতে পারি না।

গল্প লেখকের গল্প

আমি সম্প্রতি বাড়ি বদলেছি। এতে আমার নিজের সুবিধে বা অসুবিধে যা-ই হোক, অসুবিধে সব চেয়ে বেশি হয়েছে মনোহরের।

কদিন থেকে মনোহরের অভাব বড় তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম! চাষের পক্ষে যেমন লাঙল, বাগানের পক্ষে যেমন মালী, পানের পক্ষে যেমন চুন, আমার মতন গল্প-লেখকের পক্ষেও তেমনি মনোহরের প্রয়োজন অপরিহার্য।

শ্যামবাজারের রাস্তায় হঠাৎ একদিন মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বললে—আপনি বাড়ি বদলেছেন স্যার, আমায় তো বলেন নি?

বললাম—আমিও তোমায় খুঁজছি কদিন থেকে, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার—

মনোহর এসব ক্ষেত্রে বুঝতে পারে। বললে—গল্প চাই বুঝি?

বললাম—গল্প তো চাই—কিন্তু খুব ছোট গল্প—এই ধরো দশ মিনিটের মতন।

মনোহর বুঝতে পারলে। পাকা লোক। অনেকদিন এ-লাইনে আছে। ছোট

গল্পের কারবারে নিজে না থাকলেও যারা গল্প লেখে তাদের কাছে যাতায়াত আছে। হঠাৎ গল্পের ফরমায়েস হলে চট করে প্লট্ দেওয়ার কাজ করে আসছে আজ বহুদিন। কত মাপের গল্প ফেনিয়ে কত বড় করলে ক' ফর্মা কাগজ লাগে তারও হিসেব মনোহরের মুখস্থ। দুনিয়ার খবর, দুনিয়ার চরিত্র নিয়ে হামেশা ঘাঁটাঘাঁটি করছে, তেমন লাগসই কিছু গল্প পেলে দৌড়ে এসে হাজির হয় আমার কাছে। গল্প পিছু পাঁচ টাকা রেট করে দিয়েছি আমি। বড় গল্প হলে কখনও কখনও পনেরো-কুড়ি টাকার কমে ছাড়ে না। আর ছোট ফর্মা আটেক-এর উপন্যাসের মাল-মশলা হলে তিরিশ-চল্লিশ টাকাও সময়ে সময়ে দিয়ে থাকি। এ-খবর শুধু মনোহর জানে আর আমি জানি। খবরের কাগজে অফিসের চাকরি। প্রতি রবিবারে স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে একটা করে গল্প লিখতে হয়। মনোহর না থাকলে চাকরি থাকাই দায় হয়ে উঠতো। তা ছাড়া রেডিও আছে, সিনেমা আছে, সাপ্তাহিক, মাসিক, নানা রকমের আবদার উৎপাত আছে। সুতরাং মনোহর ছাড়া আমার গতিই নেই বলতে গেলে।

আবার বললাম—খুব ছোট্ট গল্প, বেশি বড় যেন না হয়—

মনোহর জিজ্ঞেস করলে—খবরের কাগজের ক' কলম চাই বলুন না—?

বললাম—এবার কলমের হিসেব নয়, দশ মিনিট সময়, তার মধ্যে শেষ করতেই হবে।

মনোহর বললে—বুঝেছি, রেডিও—

বললাম—রেডিও-ই হোক আর যা-ই হোক, তোমার অত ভাববার দরকার নেই—তুমি মিনিট পাঁচেকের মত মশলা দাও, আমি তাকে ফেনিয়ে দশ মিনিট করে নেব—

মনোহর হেসে বললে—তা কত দেবে ওরা ?

বললাম—তোমার ওই বড় দোষ, তোমার পাঁচটা টাকা পেলেই তো হলো, ছোট গল্প বলে তো তোমাকে আর কম দিচ্ছি না, তোমাকে যা বরাবর দিই তাই-ই দেব—তা কবে আসছো বলো ?

মনোহর বললে—তা হলে কালই যাবো, সকালের দিকে—

বললাম—ঠিক যেও কিন্তু—

মনোহর বললে—আগে বেশ কাছাকাছি ছিলেন—হুট করে চলে যেতাম—এখন কোথায় শ্যামবাজার আর কোথায় চেতলা—তা এদিকে আর বাড়ি পেলেন না ?

মনোহরের ওই বড় দোষ ! বড় বাজে কথা বলে। কথার ভিড় সরিয়ে আসল

গল্পটি আমাকে বার করে নিতে হয়। টাকার যখন দরকার থাকে, তখন ঘন-ঘন হাজরে দেয়। হঠাৎ হয়ত একদিন সন্ধ্যেবেলাই এসে হাজির। দৌড়তে দৌড়তে এসে হয়ত হাঁফাচ্ছে তখন।

বলি—কী ব্যাপার! এমন অসময়ে যে?

মনোহর বলে—একটা ভালো জুৎসই গল্প পেয়ে গেলাম স্যার—

বললাম—শরীরটা খারাপ, এখন গল্প দরকার নেই—

মনোহর বলে—খুব ভালো গল্প ছিল স্যার, একেবারে টাটকা চোখে দেখা, খুব নাম হয়ে যেত আপনার—

বললাম—না, থাক, এখন দরকার নেই—

মনোহর তবু পীড়াপীড়ি করে—এখন দরকার না থাক, নোটবুকে লিখে রাখতেন—তবে খুব জুৎসই গল্প বলেই আপনার কাছে আসা, আপনার হাতে খুলতো ভালো! একটু ফেনিয়ে লিখতে পারলে বারো কিস্তির একটা ছোট উপন্যাস হয়ে যেত আপনার। তা আপনি যখন চাইছেন না বলছেন, তখন থাক, অন্য লোক দেখি গে—

মনোহর এইরকম। এমন ঘটনা ঘটলে বুঝতে হবে মনোহরের টাকার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে দরকার না থাকলেও টাকাটা-সিকেটা দিয়ে হাতে রাখতে হয় মনোহরকে।

মনোহর বলে—লেখাপড়াটা হলো না তাই, নইলে আপনাদের খোসামোদ করি? তা হলে দেখতেন আমি নিজেই লিখতাম। ও রবিঠাকুর, শরৎ চাটুজ্যের লেখাও পড়ে দেখেছি, এমন কিছু আহা-মরি নয়—! ছোটবেলায় বাবা পই-পই করে বানান মুখস্থ করতে বলতেন, তাঁর কথা শুনলে আজ আমার এই দশা হয়!

দশা যে মনোহরের খারাপ, সে সম্বন্ধে কারো কোনো সংশয় নেই। নইলে মনোহরদের অবস্থা এককালে আমিই দেখেছি। বিরাট ভুমহলা বাড়ি। দাদা মস্ত বড় ডাক্তার। পাড়ায় দত্তদের নাম-ডাক ছিল প্রচুর। বাবা মারা গেল মা মারা গেল। শেষে দাদাও মারা গেল। পৈত্রিক বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। লেখাপড়া শেখেনি মনোহর। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে পাড়াতেই একটা এককুঠুরি ঘর ভাড়া করলে। তারপর রোয়াকে বসে আড্ডা দিতে লাগলো।

পাড়ায় সরস্বতী পুজো দুর্গা পুজোর সময় প্রধান কর্মী মনোহর। সকাল থেকে উদয়-অস্ত খাটছে। পুজো-প্যাণ্ডেলে সবাই যখন রাত্তিরবেলা ঘুমোচ্ছে, মনোহর একা-একা জেগে ঠাকুর সাজাচ্ছে। বলে—ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে কি পুজো হয়?

বহুদিন পরে হয়ত হঠাৎ রাস্তায় দেখা।

বললাম—কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন, দেখিনি যে ?

মনোহর বললে—আর আমাকে দেখতে পাবেন না দাদা, আমি কাজে নেমে পড়ছি—

বললাম—কী কাজ ?

মনোহর বললে—এই টাকা উপায়ের কাজ, একটা শুভদিন দেখে আরম্ভ করে দেব, সাগরে গিয়েছিলাম, সব ব্যবস্থা করে এসেছি। হাজার দুয়েক টাকা জোগাড় করতে পারলে আর কথা নেই—

কিছুদিন পরে আবার দেখা।

বললাম—তোমার কাজ কেমন চলছে মনোহর ?

মনোহর পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে বললে—এই দেখুন, সব তৈরি—এবার কয়লা ধরবো ঠিক করেছি, টেন-পার্সেণ্ট লাভ আমার কেউ আটকাতে পারবে না—তখন আপনারাই বলবেন—হ্যাঁ, মনোহর কাজের ছেলে বটে—

শুধু কয়লা নয়। যখনি দেখা হয়েছে তখনি হয় কয়লা নয় বিড়িপাতা, নয়তো দুধ, নয়তো দালালী—একটা কিছু টাকা উপায়ের ফিরিস্তি দেখিয়েছে। টাকাই যে সব, টাকা না হলে যে দুনিয়ায় কিছুই নয়—এই তত্বটি সার বুঝেছিল মনোহর !

বলতো—আপনি ফেলুন না স্যার টাকা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মাসে হাজার টাকা উপায় করা কাকে বলে—

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনোহরের গলা শুনতে পেয়েছি কতদিন ! পাড়ার রোয়াকে বসে আসর গুলজার করে পাড়া কাঁপিয়ে চীৎকার করছে। হাজার টাকা, লাখ টাকা ওড়াচ্ছে !

বলছে—দে না তুই আমাকে লাখ খানেক টাকা, আমি দেখিয়ে দিই কাকে বলে ব্যবসা করা, তখন এই একা মনোহর দত্ত সব ব্যাটাকে মাথায় চাঁটি মেরে উড়িয়ে দেবে !

আবার একদিন হয়ত বিচিত্র পোশাকে দেখা যায় মনোহর দত্তকে। গায়ে লম্বা ঝুল পাঞ্জাবী, বাহারে তেড়ি, আঙুলে আঙটি, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, আর হাতে কুকুর মুখো ছড়ি—কুকুরের কানে আতর মাখানো তুলো গোঁজা।

বলতাম—এ কি ব্যাপার, মনোহর ?

মনোহর বলে—সে কি, আপনি জানেন না ?

বললাম—কী জানবো ?

মনোহর বললে—আমি তো রকবাজি ছেড়ে দিয়েছি স্যার ! রোয়াকে বসে বখাটেদের মতন খালি আড্ডা, আমাদের বংশে ওটা মানায় না. কী বলুন—ভেবে দেখলাম, তাতে যে সময়টা নষ্ট হয় তাতে কাজ করলে বরং কিছু টাকা আসে—

বললাম—তা এতো ভালো কথা—

মনোহর বললে—না স্যার, ভেবে দেখলাম টাকা যখন উপায় করতে জানি, তখন চুপচাপ আড্ডা মারা কোনও কাজের কথা নয়,—ওতে শুধু কাজের ক্ষতি হয়—তাই এখন কাজ নিয়ে আছি, এতে বেশি ক্ষিদে হচ্ছে, দু'সের ওজন বেড়ে গেছে—

বললাম—খুব ভালো কথা, খুব সুখের কথা মনোহর—তোমার যে কাজে মন লেগেছে এতেই খুশী হয়েছি।

মনোহর বললে—এই দেখুন না, এবার থেকে ফরসা জামা-কাপড় পরবো ঠিক করেছি, কাজের লোকের সঙ্গে মিশতে গেলে এ-সব দরকারী—কি বলেন ! এতে খরচ অবশ্য বাড়ে। তা বাড়ুক—টাকা যদি আসে তো খরচ বাড়লে ক্ষতি কী !

বললাম—কিন্তু কাজটা কী ?

মনোহর বললে—এখন আমার কাছে স্যার বিজ্‌নেস্ ইজ্‌ বিজ্‌নেস্—ফেল কড়ি মাখো তেল—এই পলিসি ধরেছি, আর মুফতের কারবার নয়—এখন আমারও ছেলে-পুলের সংসার, মাস গেলে গয়লা, মুদি সবই তো আছে—না কি বলুন—?

তবু বুঝতে পারলাম না—কীসের কারবার মনোহরের।

জিজ্ঞেস করলাম—দালালী করছো বুঝি ?

মনোহর বললে—না স্যার, দালালী বড় খোসামুদে কাজ, ওতে প্রেস্টিজ্‌ থাকে না—দশজনের বাড়িতে গিয়ে কেবল খোসামোদ করো, পায়ে তেল দাও—

বললাম—চালানি কারবার ?

মনোহর বললে—না স্যার, ও-ও আমি করে দেখেছি, ওতে নানান ল্যাঠা, বড় হিসেবের ঝঞ্ঝাট, অফিসের বড়বাবুদের ঘুঁষ দাও, বড়সাহেবদের ঘুঁষ দাও, চাপরাশিদের ঘুঁষ দাও—ও ঘুঁষের কারবারে আমি আর নেই— !

বললাম—তবে কীসের কারবার তোমার ?

মনোহর বললে—আমি স্যার তবলা বাজাই। বাড়িতে এসে খোসামোদ করে নিয়ে যায়—মাইফেল হয়, চা-পান-সিগ্রেট লুচি মাংস খাওয়া হয়—পকেটে আসেও দু'পয়সা।

কিন্তু তবলাই যদি বেশিদিন চালাতে পারবে, তবে মনোহর দত্ত মনোহর হয়েছে কেন!

হঠাৎ একদিন শুনি মনোহরকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

তা এই মনোহরকে আমি বহুদিন ধরেই দেখে আসছি। আমি যেমন মনোহরের কাছে পুরোন, মনোহরও তেমনি আমার কাছে পুরোন হয়ে গিয়েছিল। সব পাড়াতেই এ-রকম দু'চারজন থাকে, যারা পাড়ার গৌরবও বটে, অগৌরবও বটে। তাদের না হলে বারোয়ারী পূজো যেমন চলে না, আবার তেমনি গুণ্ডা বদমায়েসরাও তাদের হাতে সায়েস্তা থাকে। ঘরে থেকেও তারা বাইরের জীব, আবার বাইরে থেকেও তারা গৃহী।

সুতরাং আমি তেমন আমল দিই নি মনোহরকে। এসেছে, গেছে, কখনও তার জীবিকা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বরং একটা বনেদী বংশের নষ্ট সন্তান বলেই গণ্য করে এসেছি মনোহরকে বরাবর। এমন অনেক আছে। যে বংশের কোনও মানুষ কোনওদিন রাস্তায় পায়ে হেঁটে বেড়ায়নি, তাদের বংশের কুলতিলককে রাস্তায় আড্ডা দিয়ে বেড়াতে দেখেছি। মনোহর তাদেরই মত একজন। হঠাৎ হয়ত একদিন এক ঠোঙা খাবার নিয়ে এসে পায়ের কাছে রেখে দিয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করেছি—এ-সব আবার কী মনোহর?

মনোহর বলেছে—আজ্ঞে পেসাদ—

—কীসের প্রসাদ?

মনোহর বললে—এবার কারবারে কিছু লাভ হলো, তাই···

—কীসের কারবার?

মনোহর বললে—এই মাইফেলে গিয়ে কিছু উটকো টাকা পেয়ে গেলাম, প্রায় পঞ্চাশ টাকার মতন, তাই ইয়ার-বন্ধুরা ধরলে খাওয়াবার জন্যে—বাড়িতে মাংস পোলাও করে খাইয়ে দিলাম, তা আপনাকে তো আর খেতে বলতে পারি না তাদের সঙ্গে। তাই কিছু মিষ্টি দিয়ে গেলাম—

মনে পড়ে গেল। বললাম—শুনলাম জেলে গিয়েছিলে তুমি?

মনোহর বললে—সে আর বলবেন না দাদা, ওঃ, জায়গা বটে, দেশ স্বাধীন হলো না ছাই হলো, জেলখানা সেই একই রকম আছে দাদা—কোন পরিবর্তন হয়নি—! আপনারা লেখক মানুষ, লিখতে পারেন না ঠেসে?

তারপর লম্বা ফিরিস্তি দিলে মনোহর। জেলখানায় যা-যা ভুগতে হয়েছে তারই ফিরিস্তি। সেখানে না আছে একটা ব্যবস্থা, না আছে বন্দোবস্ত। কেউ কাজ করে

না। ফাঁকিবাজ সব। সব বসে বসে মাইনে গুনছে। কয়েদীদের পাওনা-গণ্ডা দেখে না কেউ। ডিউটি দিতে ভুল করে! আমি একদিন ধরিয়ে দিলুম। বললুম—খবরের কাগজে এ-সম্বন্ধে লিখতে হবে দাদাকে বলে! আপনি খবরের কাগজে আছেন—এই নিয়ে লিখুন না একটা, ভদ্রলোকের ছেলে আমরা, না হয় জেলেই গেছি, কিন্তু তা বলে ফাঁকি দেবে সবাই!

তা সেই হলো সূত্রপাত! কোন্ বাগানবাড়িতে কোথায় মাইফেল করতে গিয়ে খুন-জখমের মামলায় জড়িয়ে পড়ে মনোহর। তারই ফলে ছ' মাসের কয়েদ। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। বহুদিন জেলখানার কয়েদী নিয়ে গল্প লেখবার ইচ্ছে ছিল—যা জানতাম না, জেনে নিলাম মনোহরের কাছে। গল্প লেখার পর পাঁচটি টাকা মনোহরকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—এই নাও মনোহর—পাঁচটি টাকা তুমি নাও—

মনোহর অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। বলেছিল—কিসের টাকা দাদা?

বললাম—সেই যে তুমি আমাকে জেলখানার গল্প বলেছিলে—তার দক্ষিণে—

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে মনোহর বললে—তা স্যার, আপনাকে আমি আরো গল্প দিতে পারি—

—তা দিও, গল্প পিছু পাঁচ টাকা করে তুমি পাবে!

তারপর থেকে সময়ে-অসময়ে বহু গল্প আমাকে জুগিয়েছে মনোহর। তার কতক ব্যবহার করেছি, কতক করিনি। অনেক গল্প গল্পই নয়। বাড়িয়ে, বদলে, কমিয়ে কিছুতেই কিছু হয় না তার। সে-গল্প বিক্রী করে আমি হাজার-হাজার টাকা উপায় করেছি। লোকে আমায় বাহবা দিয়েছে! আমার সুনাম হয়েছে দেশে। সভাপতিত্ব করে এসেছি আমি নানা দেশের নানা সভায়। আমার গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে সবাই অভিভূত হয়েছে, আমার লোক-চরিত্র-জ্ঞানে সবাই মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু আসলে আমার কিছু নয়—সব কৃতিত্ব মনোহরের। মনোহর আমায় মাল-মশলা জুগিয়েছে, তাই আমি লেখক হতে পেরেছি। তাই তো বলছিলাম,—চাষের পক্ষে যেমন লাঙল, বাগানের পক্ষে যেমন মালী, পানের পক্ষে যেমন চুণ—আমার মতন গল্প-লেখকের পক্ষেও মনোহর তেমনি অপরিহার্য!

তা সেই মনোহর কাছে না থাকাতে ক'দিন যেন অসহায় বোধ করছিলাম।

নতুন বাড়িতে এসে পর্যন্ত মনোহরকে খবর দেওয়া হয়নি। এতদিন পরে দেখা হওয়াতে যেন নিশ্চিন্ত হলাম।

বললাম—ঠিক যেও কিন্তু—

মনোহর জিজ্ঞাসা করলে—আপনার ঠিকানাটা ?

বললাম—উনত্রিশের একের এক, চেতলা সেন্ট্রাল রোড—

মনোহরের মুখের দিকে চেয়ে দেখি কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব।

বললাম—উনত্রিশের একের এক, মনে থাকবে তো ?

মনোহর তবু যেন কী ভাবছিল।

বললে—উনত্রিশের একের এক ! আচ্ছা দাঁড়ান—

হঠাৎ যেন কী হলো মনোহরের। সামান্য ঠিকানা, সামান্য একটা বাড়ির নম্বর নিয়ে এত মাথা ঘামাবার যে কী আছে বুঝতে পারলাম না। সারা কলকাতা যে ঘুরে বেড়ায়, সারা কলকাতার রাস্তা যার মুখস্থ, সেই মনোহর কিনা আমার বাড়ির নতুন ঠিকানা শুনে অবাক হয়ে গেছে !

খানিক পরে মনোহর বললে—মাফ করবেন দাদা, আপনার বাড়িতে আমি যেতে পারবো না—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কেন ?

কেন-র জবাব মনোহর চট করে দিতে পারলে না। কী যেন ভাবতে লাগলো আপন মনে। আমিও কিছু ঠিক করতে পারলাম না। টাকার লোভ মনোহর ত্যাগ করতে পারবে এমন তো নয়। রাতারাতি কি মনোহর এমন অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে যে, আমার সাহায্যের প্রত্যাশীই সে নয় !

বললাম—টাকার বুঝি আর তোমার দরকার নেই মনোহর ?

মনোহর সঙ্কুচিত হয়ে বললে—টাকার দরকার নেই আমার ! কী বলেন আপনি ! টাকা আমায় দিন না যত দেবেন ! আমার অভাবের শেষ নেই স্যার ! অভাব কি একটা ! বাড়িতে তিনটে ছেলের একসঙ্গে টাইফয়েড, তা জানেন !

বললাম—তা হলে বাস ভাড়ার জন্যে ভাবছ তো ? সে যাতায়াতের ভাড়া তোমার আমি দেব মনোহর, তুমি চিন্তা কোর না—

তবু যেন মনোহর কেমন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রইল।

খানিক পরে বললে—আচ্ছা, আটাশ নম্বরের বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের চেনেন ?

আটাশ নম্বর ! আমার পাশের বাড়ি আটাশ নম্বর। আটাশ নম্বরে থাকেন এক উকিল ভদ্রলোক। বেশ বনেদী বংশ। বহু কালের বাস। তিন পুরুষ ধরে এই বাড়িতেই বংশের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। ছেলেরা লেখা-পড়া শিখেছে, ডিগ্রী নিয়েছে। কেউ কেউ বিদেশ

গিয়েছে। মেয়েরা লেখা-পড়া শিখে বিয়ের পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কে জব্বলপুরে, কেউ বোম্বাইতে, কেউ দিল্লী, কেউ বা হায়দরাবাদে। এক ডাকে সারা ভারতবর্ষের নাড়িতে টান পড়ে।

বললাম—তোমার কেউ হয় নাকি ওরা ?

মনোহর কেমন যেন লজ্জায় করুণ হয়ে উঠলো।

বললে—হবে আবার কে ? কেউ-ই হয় না—

—তবে ?

মনোহর আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

বললে—সে আপনার শুনে কাজ নেই, মানে, সে অনেকদিন আগের ঘটনা কি না, প্রায় একত্রিশ বছর আগের—

একত্রিশ বছর আগের কী এমন ঘটনা যার জন্যে মনোহর সে-পাড়াতেই যায় না! কি এমন অপরাধ! কি এমন অন্যায়!

বললাম—তুমি বুঝি ওদের চিনতে ?

মনোহর তবু যেন দ্বিধা করতে লাগলো। বললে—সে-সব এখন না তোলাই ভালো স্যার, সে কি আজকের কথা, তখন আমার বয়েস প্রায় ন' বছর। আর তা ছাড়া আমাদের অবস্থাও তখন ভালো ছিল—বাবা বেঁচে, মাও বেঁচে আর তখন আমাদের বংশেরও নামডাক ছিল। এখন আর কী আছে বলুন—এখন নাম বললে হয়ত চিনতেই পারবে না তারা—

বললাম—তোমাদের কি চেনাশোনা ছিল খুব ওদের সঙ্গে ?

মনোহর যেন কেমন মুস্কিলে পড়লো। তারপর কী যেন ভেবে একটু হাসলো আপন মনে। বললে—সে যে কী চেনা ছিল আপনি ভাবতেও পারবেন না স্যার। বাইরের লোকের সঙ্গে অত চেনাশোনাও হয় না কারো। একেবারে গলায়-গলায় ভাব ছিল কিনা পুতুলের সঙ্গে আমার—

বললাম—পুতুল ? পুতুল কে ?

মনোহর বললে—পুতুল হচ্ছে গিয়ে আপনার পদ্ম-মাসীমার মেজ মেয়ে—

পদ্ম-মাসীমাই বা কে আর পুতুলই বা কে—আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কেমন যেন সমস্ত জিনিসটা একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছিল। মনোহরের মত লোকের পেছনে যে এত রহস্য থাকতে পারে, একথা ভেবে কেমন যেন কৌতুক বোধ করছিলাম। কিন্তু অবাক হতে তখনও আমার অনেক বাকী।

মনোহর বললে—সে আপনি সব বুঝবেন না স্যার—ও আপনার শুনে কাজ নেই—

বলে চলে যাবারই উদ্যোগ করছিল মনোহর!

বললাম—বলো তো তোমার ঐ গল্পটাই লিখে দিই মনোহর—

মনোহর হঠাৎ ভূত-দেখার মত চম্‌কে উঠলো। বললে—না স্যার, আপনার পায়ে পড়ি, এ আপনি লিখতে পারবেন না—ওরা জানতে পারলে কী ভাববে বলুন তো! ছি ছি—তার চেয়ে আপনাকে আমি আর একটা ভালো গল্প দেব—

বললাম—তা হলে তুমি আমার বাড়ি আসছো তো?

মনোহর বললে—মাপ করবেন স্যার, আমি আপনার বাড়ি যেতে পারবো না, আমার ভারি লজ্জা করবে! একদিন দুদিন তো নয়—একত্রিশ বছর পরে হঠাৎ যদি ওরা দেখে ফেলে, কি ভাববে বলুন তো—

বুঝতে পারলাম না। বললাম—কে দেখে ফেলবে?

মনোহর বললে—পদ্ম-মাসীমা দেখে ফেলতে পারে, পুতুলও দেখে ফেলতে পারে, ও ছাড়া সবাই-ই আমাকে চিনতো কি না! আর শুধু কি চেনা! দিনরাত তো ওদের বাড়িতেই আমার কাটতো, একদিন না গেলে মাসীমা ডেকে পাঠাতো, বলতো—হ্যাঁরে আজকে আসিসনি কেনরে মনোহর?

এক মুহূর্তে মনোহর দত্ত যেন আমার চোখের সামনে আবার মনোহর হয়ে উঠলো।

আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। একেবারে চোখের সামনে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। কোন বাধা, কোনও অন্তরাল নেই আর।

মনোহর বলেছিল—আমরা তখন পুজোর ছুটিতে দু'ভাই বাবামা'র সঙ্গে মধুপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ওরাও গিয়েছিল,—

আমি দেখতে পেলাম—পাশাপাশি বাড়ি। একটাতে থাকে মনোহররা আর একটাতে পদ্ম-মাসীমা আর তার ছেলেমেয়েরা। ছোট্ট ন' বছরের একটি ছেলে। ফরসা ফুটফুটে। বাড়ির লাগোয়া বাগান পেরিয়ে এক-একদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ-বাড়ির বল খেলা করতে-করতে ও-বাড়িতে গিয়ে পড়ে।

পুতুল বলে—আমাদের বাড়ি ঢুকেছে—ও আমাদের বল—আমি দেব না মা—

পদ্ম-মাসীমা বলে—ছি, ওদের বল দিয়ে দাও, না বলে পরের জিনিস নিলে চুরি করা হয়, জানো না?

যাবার সময় পদ্ম-মাসীমা জিজ্ঞেস করে—তোমার নাম কি খোকন?

তারপর বলে—তুমি রোজ আসবে মনোহর, জানো, লজ্জা কোরো না—পুতুলের সঙ্গে আমাদের বাগানে বল খেলবে।

দুপুরবেলা—টা টা করছে রোদ। সবাই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করছে! ব বলটা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে মনোহর। কেউ যেন না টের পায়। কে যেন না পায়ের শব্দ পায়। কুয়োর পাড়ে বাগানের মালী বসে বসে সাবান কাচছে দূরে জবা-গাছটা ছেয়ে রাঙা-জবা ফুটেছে। একটা চড়াই-পাখি বাতাবী নেবু গাছে পাতার আড়ালে কিচ্-কিচ্ শব্দ করে। আর বাগানের কালো-হাঁড়ি মাথায় দেও কাকতাড়ুয়াটা কুমড়ো ক্ষেতের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বাতাস লেগে একটু দুলে ওঠে একটা টিকটিকিরও পায়ের শব্দ কান পাতলে শোনা যায়। সেই সময়গুলোতে কিছুতে ঘরে মন বসতো না মনোহরের। আস্তে আস্তে পদ্ম মাসীমাদের বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়তো। চুপি চুপি পুতুলের শোবার ঘরে গিয়ে ডাকতো—পুতুল, এই পুতুল—খেলবি?

পদ্মমাসীমা বলতো—দিদি, তোমার মনোহরের সঙ্গে আমার পুতুলের কী ভাব, কী বলবো—দুটির বিয়ে হলে বেশ হয়!

মা বলতো—ওর দুষ্টুমি তো দেখোনি ভাই—দু' চোখ যদি একটু এক করেছি তো ওমনি বাড়ির বাইরে চলে যাবে। ওকে জামাই করে দেখ না, ও বউকে জ্বালাবে, শাশুড়ীকেও জ্বালিয়ে খাবে।

সকাল বেলা দশটার সময় লোক পাঠিয়েছে পদ্মমাসীমা।

চাকর এসে খবর দিত—মাঈজী ডাকছে খোকাবাবুকে।

মা বলতো—কেন রে?

পদ্মমাসীমা বলতো—কী জানি দিদি। মনোহর সকালবেলা না এলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে—সকালবেলা সবাই জল-খাবার খাচ্ছে, মনে হলো—মনোহরকে বোধ হয় তার মা আসতে দেয়নি আজ—

মা বলতো—তুমিই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে দিচ্ছ ভাই।

পুতুল বলতো—নেব না আমি তোমার বল। না-বলে পরের জিনিষ নিলে তো চুরি করা হয়—মা বলেছে যে!

মনোহর বলতো—আহা, আমি বুঝি পর?

পুতুল বলতো—পর না তো কী,—পর বলেই তো তুমি আলাদা বাড়িতে থাকো! আমার মা কি তোমার মা? তবে যে বলছো?

মনোহর বলতো—আমার বলটা নিয়ে তুই খেল—তাহলে তোকে একটা পয়সা দেব।

পুতুল বলতো—মা যদি বকে?

মনোহর বলতো—মাসীমা বকলে বলবি আমি তোকে দিয়েছি। আমার একটা

কাঠের ঘোড়া সেটাও দেব, আমার একটা বন্দুক আছে, তা-ও তোকে দেব।

সব দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে যেতে ইচ্ছা করতো মনোহরের। ছোট্ট মেয়ে পুতুল। কত আর বয়েস। ছয় কি সাত। আর মনোহরের তখন ন' বছর।

তারপর একদিন পূজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। বাঁধা-ছাঁদা আরম্ভ হলো ও-বাড়িতে। পদ্মমাসীমা বাক্স বিছানা বাসন-কোসন গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিলে। ছেলেমেয়েরাও তৈরি হয়ে নিলে। প্যাণ্ট সার্ট ফ্রক রিবন পরে তৈরি।

মনোহর দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। প্যাণ্ট সার্ট জুতো মোজা পরে ফেলেছে।

বললে—আমিও তোদের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে যাব রে!

মা বলেছিল—তোমরা তো যাচ্ছ ভাই, আমার দুই ছেলেও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, একটু দেখো—এক কামরায় উঠবে তারপর হাওড়ায় নেমে ওরা শ্যামবাজারে চলে যাবে।

ট্রেনে উঠে পুতুল বলেছিল—এই নাও, তোমার বল নাও, কাঠের ঘোড়া নাও—বন্দুক নাও—তোমার জিনিস তোমায় দিয়ে দিলাম।

মনোহর বলেছিল—ওগুলো তো আমি তোকে দিয়ে দিয়েছি।

পুতুল বললে—ও আমি আর নেব না ভাই! পরের জিনিস নিলে মা বকবে—তুমি তো পর—

মনোহর বললে—বা রে, পর হতে যাবো কেন, মাসিমা বলেছে তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

হাওড়া স্টেশনে এসে পদ্মমাসীমা বলেছিল—এবেলা তাহলে তোমরা আমাদের বাড়িতেই চলো, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে বিকেল বেলা তোমাদের বাড়ি চলে যেও।

দাদা বলেছিল—কিন্তু পিসেমশায়কে যে বাড়িতে চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে—না গেলে সবাই যে ভাববে!

একমাস পূজোর ছুটি, তারপর একসঙ্গে ট্রেনে চড়ে সমস্ত রাত এক কামরায় কাটানো। কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল মনোহরের।

দাদা বললে—তার চেয়ে বরং সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে আপনাদের বাড়ি যাবো।

পদ্মমাসীমা বলেছিল—ঠিক যেও কিন্তু বাবা, তোমরা ওখানে গিয়ে রাত্তিরে খাবে, কেমন!

মনোহরের সেদিন যেন কেমন সমস্ত ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল —একটা ঘণ্টাও যেন পুতুলদের ছেড়ে থাকা যাবে না। তা হোক! হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছুল সকাল আটটার সময়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনটের সময় বেরোলেই চলবে।

পদ্মমাসীমা বলেছিল—আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানো তো, আটাশ নম্বর, সেণ্ট্রাল রোড, বাস থেকে নেমে পূব মুখো গিয়ে বাঁদিকে লাল রং-এর বাড়িখানা, মনে থাকবে তো?

মনোহর থামলো।

বললাম—তারপর? তারপর বিকালবেলা গেলে তো দেখা করতে?

মনোহর বললে—বিকেলবেলা যাবো কী করে স্যার! আর যাবো বললেই কি যাওয়া হয়। আমরা তো যাবার জন্যে ছটফট করছি। কিন্তু দুপুর দুটোর সময় এমন বিষ্টি এল বেরোয় কার সাধ্যি! সেই বিষ্টি যখন থামলো, তখন রাত নটা!

বললাম—তারপর?

মনোহর বললে—তারপর দাদা বললে—পরদিন সকালবেলা যাওয়া যাবে। তা রাত্তির বেলা তো ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হতে-না-হতে উঠতে হবে। কোথায় শ্যামবাজার আর কোথায় চেতলা। রাত আর কাটতে চায় না! সকালবেলা যাবার তোড়জোড় করছি—এমন সময় বোম্বাই থেকে ছোট জামাইবাবু এসে হাজির!

বললাম—তারপর? যাওয়া হলো না?

—কী করে আর হয় বলুন—কত দিন পরে ছোট জামাইবাবু এল বাড়িতে আর আমরা কিনা বেড়াতে যাবো। দাদা বললে—সন্ধ্যে বেলা যাবো তোকে নিয়ে। কিন্তু সন্ধ্যে বেলাও যাওয়া হলো না। ছোট জামাইবাবু একেবারে সকলের থিয়েটারের টিকিট কিনে এনে হাজির—স্টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন পালা হবে তারই টিকিট—

বললাম—তারপর?

মনোহর বললে—তারপর দিন যাওয়ার সব ঠিকঠাক, বিকেল বেলা হঠাৎ কেমন গা-গরম গরম মনে হলো—আর তারপর একেবারে পাঁচ ডিগ্রী উঠলো সেই জ্বর, সাত দিন সাত রাত্তির একেবারে বেহুঁশ অচৈতন্য—কোনও দিকে জ্ঞান নেই।

বললাম—কিন্তু যখন জ্বর ছাড়লো?

—যখন জ্বর ছাড়লো, তখন খুব দুর্বল শরীর। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই।

আর যখন গায়ে জোর পেলাম, তখন তো দেরি হয়ে গিয়েছে। ইস্কুলও খুলে গিয়েছে। ভাবলাম এত দেরি করে গেলে কী ভাববে ওরা! তা ভাবলাম বড়দিনের ছুটিতে যাবোখন। কিন্তু বড়দিনের ছুটিতে সবাই গেলাম মামার বাড়ি। শেষকালে অনেক দেরি হয়ে গেল। ওদিকে যাবার জন্যে কতবার ট্রামে উঠে বসেছি কিন্তু ধর্মতলা পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারিনি। বাড়ি ফিরে এসেছি লজ্জায়। সত্যিই তো এত দেরি করে কি যাওয়া যায়! গেলে কী বলবে!

বললাম—তা বলে আর দেখাই করলে না কখনও?

মনোহর বললে—দেখা করলাম না বলি কী করে, দেখা হয়ে উঠলো কই! আমি তো দেখা করতেই চেয়েছিলাম স্যার, কপালে না থাকলে আর কী হবে! আর তারপর আমার বাবা মারা গেল হঠাৎ, মা-ও মারা গেল, কাকা জ্যাঠারা সব আলাদা হয়ে গেল, আর ভরসা ছিল এক দাদা। দাদার নাম বললে সারা কলকাতার লোক তবু চিনতে পারতো, অত বড় ডাক্তার! সে-ও হঠাৎ মারা গেল একদিন। পৈত্রিক বাড়িটাও বিক্রী হয়ে গেল—যদি যাই-ই কোনদিন দেখা করতে তো কি পরিচয় দেব! কা'র পরিচয় দেব! পরিচয় দেবার মত কী-বা আছে বলুন স্যার আমার!

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—তাতে কী হয়েছে মনোহর! পৃথিবীতে সবাই কি সব হয়! গেলে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—চোখের দেখা তো মাত্র!

মনোহর বললে—না স্যার, গিয়ে কাজ নেই, হয়ত চিনতেই পারবে না, হয়ত পুতুলের বিয়েই হয়ে গেছে! হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। হয়ত ভালো ঘরে ভালো বরেই হয়েছে, আমার মত বকবাজ নয় জামাই—পদ্মমাসীমাও হয়ত আর তেমন করে কথা বলবে না আগেকার মত!—কি হবে গিয়ে, দরকার নেই—

বললাম—তোমার আবার এত লজ্জা হলো কবে থেকে মনোহর? গেলে দোষ কি! যাবে আর একটু কথা বলে চলে আসবে—

মনোহর তবু দ্বিধা করতে লাগলো—

বললে—না স্যার, আমায় আপনি যেতে বলবেন না—

বললাম—গেলে কি হয়েছে শুনি?

মনোহর বললে—আর তা ছাড়া, সে-চেহারাই নেই স্যার আমার, তখনকার চেহারা আর এখনকার চেহারা একেবারে আকাশ-পাতাল ফারাক—

নিজের চেহারার দৈন্যে মনোহর নিজেই হেসে উঠলো হা হা করে।

বললাম—তা হোক মনোহর, তুমি যাবে। কাল সকাল বেলা আমি তোমার

জন্যে বসে থাকবো—আর আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবো ও-বাড়িতে, ওদের সঙ্গে তুমি দেখা-শোনা করে আসবে—

মনোহর কি যেন ভাবলে। একবার যেন একটু লোভও হলো বললে—যাবো?

বললাম—নিশ্চয়ই যাবে, আমি বলছি. কিছু মনে করবে না তারা!

মনোহর বললে—আপনি তা হলে যেতে বলছেন?

বললাম—হ্যাঁ, আমি নিজে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো—আর একটা কথা, গল্প পিছু তোমায় পাঁচ টাকা তো দিতাম বরাবর, এবার দশ টাকা করেই পাবে—

মনোহর বললে—আচ্ছা ঠিক যাবো—

পরদিন আমি যথারীতি সকালে বাড়িতে ছিলাম। মনোহর এল না। ভেবেছিলাম তার পরদিন বুঝি আসবে, কিন্তু সেদিনও আসেনি। তার পরদিনও আসেনি। তার পরদিনও না। আমি বুঝলাম মনোহর আর আসবে না। দশ টাকা কেন, দু'শো টাকা দিলেও মনোহর এ-পাড়ায় আর আসবে না। এতদিনের জমানো সম্পদ, একত্রিশ বছর ধরে যখের মতন যা আগলে বসে আছে, তার সম্বন্ধে কি এই ঝুঁকি নেওয়া চলে! যদি খোয়া যায়! যদি ভেঙে যায়! যদি হারিয়ে যায়!

ভেবেছিলাম মনোহর বুঝি শুধু অর্থেরই কাঙাল। কিন্তু সে যে পরমার্থেরও কাঙাল তা এতদিনে বুঝলাম।

পুরুষ মানুষ

নিত্যানন্দ বললে, তোমার গল্প পড়েছি ভাই, কিন্তু সবারই ওই এক কথা। এবার পুরুষ মানুষ নিয়ে লেখ না-কেন, পুরুষ মানুষের মধ্যে কি রস নেই, পুরুষ মানুষের কি সৌন্দর্য্য নেই! আর আমাদের সৃষ্টিকর্তার কথা ভাব না, তিনিও তো পুরুষ হে—

খানিক থেমে নিত্যানন্দ বললে, লেখ না আমাদের সত্যসুন্দর চক্রবর্তীকে নিয়ে, না হয় আমাদের বাড়ির চাকর গোবিন্দকে নিয়ে, কিংবা, ভাল কথা, ওঁকে নিয়ে লেখ না, ওই যে—ওই যে বসে আছেন—

নিত্যানন্দ জানলার ফাঁক দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখালে।

রাস্তার এপার-ওপার। বাদামতলা এখান থেকেই শুরু। বাদামতলায় ঢুকতে গেলে, বাদামতলার ভদ্রপাড়ায় যেতে গেলে এই কাঠের গোলা, এই বস্তির চালাঘরের এলাকা পেরোতে হবে। কালীঘাটের জেলখানা আর গঙ্গার পুল পেরিয়ে প্রথমে আসতে হবে এই পাড়ায়। সার সার পানের দোকান, চাল-ছোলা ভাজা আর দু-পাশে যতদূর চাও কেবল কাঠের গোলা। টিনের চালার তলায় ছোট গদিবাড়ি। সব গোলাতেই ছোট মাপের একটু কুঠুরি। তাতে নিচু একটি তক্তপোশ। দু-চারটে তাকিয়া। ফরসা চাদর পাতা। কোথাও কোথাও মাদুর। আর সামনে কাঠের পাহাড়। গাছের গুঁড়ি কেটে চিরে ফালি ফালি করা। কড়ি-বরগার কাঠ চাই, তাও আছে। জানলা-দরজার কাঠ চাই, তাও আছে। নৌকো বানাবে, তার কাঠও আছে।

নিত্যানন্দ বলে, ওঁকে নিয়ে লেখ না, ওই আমাদের হরসুন্দরবাবুকে নিয়ে-- ?

দেখলাম, রাস্তার ওপারে নিত্যানন্দের কাঠের গোলার মতই আর একটা গোলা। ছোট একটু গদিবাড়ি। সামনে মাদুরপাতা তক্তপোশের ওপর একটা কাঠের ক্যাশবাক্স নিয়ে কাজ করে চলেছেন হরসুন্দরবাবু। গলায় কণ্ঠি, কপালে বুকে চন্দনের ফোঁটা। খালি গা। বাবু হয়ে বসে একমনে কাঠের ফর্দের হিসেব করছেন হয়তো। গোলার সামনে বড় সাইনবোর্ড। তাতে দোকানের নাম লেখা। নীচে লেখা রয়েছে—মালিক শ্রীহরসুন্দর ভট্টাচার্য।

নিত্যানন্দ বললে, ডাকব ওঁকে? দেখবে?

তা পুরুষ মানুষের মত চেহারাই বটে। যাকে বলে পুরুষ মানুষ। ফরসা শরীর। বুকে অল্প অল্প লোম। মাথার চুল কদম-ছাঁট। অল্প অল্প পেকেছে।

নিত্যানন্দের কারবার আর কতদিনেরই বা! কিন্তু যখন এই বাদামতলার

ইলেকট্রিক আলো আর কলের জলও আসে নি তখন এ বাদামতলা এমন ছিল না। কালীঘাটের মন্দির দেখেছেন—যাত্রীরা আসত ওপারে পুজো দিতে। ওপারে জ্বলত ইলেকট্রিক আলো। সানাই-ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মাড়োয়ারীদের বউ-ঝিরা আসত ঠাকুর দর্শন করতে, ওপার জম-জমাট। আর এপারে টিম্ টিম্ করে জ্বলত তেলের বাতি। এপারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে কেবল খড়ের চালা। খড়ের চালার পাশ দিয়ে গঙ্গাস্নানের রাস্তা। ভোরবেলা স্নান করা অভ্যেস হরসুন্দরবাবুর। ওখানটা দিয়ে যাবার সময় চোখ বুঁজে যেতে হত। ওই অত ভোরেও আবাগীদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে ঘেন্না করত। মনে হত যেন মদের গন্ধ আসছে। রাত্তির বেলার যা উৎপাত তা তো আছেই, ওই পশ্চিমের গঙ্গার পাড় ধরে বরাবর কালীঘাটের পুল পর্যন্ত আর এদিকে বাদামতলা রোড বরাবর আবাগীদের আড্ডা। এ ওদের কতকালের ব্যবসা তার ঠিক নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের বইতেও লেখা আছে এ-সব ইতিহাস। তা কারবার করতে হলে তো আর বাছ-বিচার করলে চলবে না। কাঠের খদ্দের ঘুরে ফিরে এখানেই আসবে। কাঠ কিনে ডোঙা বোঝাই করে চলে যাবে কত দূর দূর দেশে। উত্তরে নিমতলা আর দক্ষিণে এই বাদামতলা। তখন ওই বালিগঞ্জ হয় নি, গড়িয়াহাট হয় নি। ভবানীপুরের পর গঞ্জ বল, শহর বল, সবই এই বাদামতলা। বাদামতলার তখন রবরবা কত! আলিপুরের দেওয়ানী আর ফৌজদারী আদালতে মুহুরী উকিলের ভিড়, দক্ষিণের ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, সুন্দরবনের জমিজমা খুনখারাপী মামলার তদারক তদ্বির শুনানী সব এই এখানেই, এই বাদামতলার কাছারিতে। আর কাছারি-আদালতের ব্যাপার, এক ঘণ্টার ব্যাপার নয়। এক-একটা মামলা-মকদ্দমা চলছে তো চলছেই। একেবারে জেরবার করে ছাড়ে সকলকে। উকিল মুহুরীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে থাকতে হয় বাদামতলার হাটে। সেই সূত্রেই কারবার জমে ওঠে আবাগীদের। মরতে আর জায়গা পায় না, এসেছে গঙ্গার ধারে। একেবারে তীর্থস্থানের ধারে। ছোট ছোট খড়ের চালা বানিয়ে দিয়েছে এ-দিগর থেকে ও-দিগর পর্যন্ত জমিদার কুণ্ডুবাবুরা। খাজনা-করা জমি। মালিকানা স্বত্ব আবাগীদের নয়। এক-একজন বুড়ী গোছের মানুষ। হরিনামের কণ্ঠি, তেলক কাটে এখন, গঙ্গার ঘাটে বসে জপ-আহ্নিক করে। তেলক কেটে পাপ-ক্ষয় করে। আর পুজো দিয়ে আসে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে পালা-পার্বণের দিনে।

হরসুন্দরবাবু চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নেন। বলেন, দূর, দূর, দূর হ—সকালবেলাই অযাত্রা—

অথচ পাশাপাশি বাস না করেও উপায় নেই।

সকালবেলা নিত্যানন্দ এসে বসে ছিল। হরসুন্দরবাবু হন হন করে একেবারে ঢুকে পড়েছেন।

বললেন, এর একটা বিহিত করুন নেত্যবাবু, আজই এর বিহিত করতে হবে আপনাকে—

নিত্যানন্দ বলে, কিসের বিহিত?

হরসুন্দরবাবু বলেন, এত বড় যুদ্ধ গেল মশাই, কী বালিগঞ্জ ছিল আর কী হয়ে গেল, তামাম কলকাতা শহরের ভোল পালটে গেল, আর আমাদের বাদামতলা—

নিত্যানন্দ বলে, কী হল হরসুন্দরবাবু? হলটা কী?

—হল আবার কী বলছেন! আজ চল্লিশ বছর ধরেই হচ্ছে, আপনার আর কী। আমার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে হয়, ভাইপো ভাইঝিরা রয়েছে, তাদেরও তো এখন বয়েস হচ্ছে, আবাগীদের জ্বালায় তো দেখছি আর ব্যবসা করা চলবে না এখানে। হয় ওরা উঠে যাক, নয় তো আমরাই উঠি—নইলে এর একটা বিহিত করুন আজই—

নিত্যানন্দ বলে, তা এ তো চিরকালের সমস্যা হরসুন্দরবাবু, এ আর নতুন কথা কী?

হরসুন্দরবাবু বললেন, কিন্তু এদানি যেন বেড়েছে মশাই, কাল কতকগুলো মাতাল একেবারে আমারই দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে—

নিত্যানন্দ বলে, তা ওরা কী করে বুঝবে বলুন, বরং দরজার পাল্লায় আলকাতরা দিয়ে লিখে দিন—ইহা ভদ্রলোকের বাড়ি। ঢুকে যাবে ল্যাঠা।

—আপনি রসিকতা করছেন, আর আমার যে এদিকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে মশাই। ভাবছেন, তা আমি লিখি নি?

হরসুন্দরবাবু বলেন, এ জ্বালা কি আজ ভুগছি মশাই, চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমার এই পাড়ায়, ব্যবসা কি আমার আজকের?

হরসুন্দরবাবুর ব্যবসা যে আজকের নয় তা বাদামতলা কেন, নিমতলার কারবারীরাও জানে। ধার্মিক লোক বলে সমাজে খাতিরও আছে হরসুন্দরবাবুর। শুধু ধার্মিক নয়, সৎ সত্যবাদী নিষ্ঠাবান বলেও সুনাম আছে। এক পয়সা এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই ওঁর কাছে। মিস্ত্রিরা বলে, পাঁচ শো টাকার কাঠ কিনলাম, আমাদের পাওনা-থোওনা কিছু নেই?

হরসুন্দরবাবু ক্ষেপে ওঠেন: তবে তোমাকে বলেই রাখি মিস্ত্রি, ওসব উঞ্ছ

কারবার আমরা করি নে, ওসব দালালি পেতে হলে ওই গুজরাটীদের কাছে যাও, আমার এখানে হবে না। পাঁচ শো কেন, হাজার টাকার কাঠ কিনলেও হবে না—

কুণ্ডুবাবুদের ছোট শরিক কার্তিক কুণ্ডু এসে আসর জঁাকিয়ে বসেন।

হরসুন্দরবাবু বলেন, এই নিন, পান খান।

শুধু পান নয়, সঙ্গে সিগারেটও আসে।

বলেন, চা খাবেন নাকি ?

কুণ্ডুবাবু বলেন, চা ? তা আপনি খেলে খেতে পারি।

—আমি ?—হরসুন্দরবাবু হাসেন।

বলেন, যখন ছেড়ে দিয়েছি ওটা তখন ওটা আর ধরব না আজ্ঞে। আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে বেশ আছি, প্রার্থনা করুন যেন নেশা-ভাঙ না করতে হয় জীবনে—

কুণ্ডুবাবু হেসে বলেন, তা চা কি একটা নেশার সামিল ?

—তা নেশা নয় ? নেশা নয় তো কী বলেন। ও চা, পান, সিগারেট, বিড়ি তামুক সবই নেশা। শুধু মদ আর গাঁজাই কি নেশা ! নেশা আপনাদের পোষায় ছোটবাবু, আমরা কাঠের ব্যবসায়ী—

নিত্যানন্দের দোকানে এসে বসেন মাঝে মাঝে হরসুন্দরবাবু। বলেন, এমন করে কি আর ব্যবসা চলে নেত্যবাবু, ওই ফরসা আদ্দির পাঞ্জাবি আপনাকে ছাড়তে হবে মশাই, আর ওই ফিনফিনে ধুতি, ওই ফুটফুটে গেঞ্জিও আপনার চলবে না। খালি গায়ে না থাকতে পারেন, ফতুয়া পরুন বাবু. আমার মত এই মোটা খেটে ধুতি পরুন আর পায়ে চটি দিন—

নিত্যানন্দ বলত, ব্যবসার সঙ্গে পোশাকের কী সম্পর্ক ?

--সম্পর্ক নেই ? বলেন কী ? ব্যবসা হল গিয়ে মালক্ষ্মী। লক্ষ্মীপুজো কী আপনার যা-তা কাপড়ে, যেমন-তেমন করে করলেই হয় ! শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার নেই ! বাসী কাপড়ে পুজো হয় ? তা ব্যবসাও তাই। ভারি পবিত্র হয়ে ভক্তি ভরে না করলেই ওই ঈশ্বরদাস গুলজারিপ্রসাদের মত গনেশ ওল্‌টাতে হবে—

নিত্যানন্দ বললে, এই দেখ না, আমার দোকান তো সাত বছর হল হয়েছে, আমি তো কতদিন কামাই করেছি, খদ্দের এসে ফিরে গেছে কতদিন। আর হরসুন্দরবাবু ! একটা দিন কামাই নেই, একটা নেশা করা নেই। সকালবেলা গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে বুকে গলায় তিলক কেটে সেই যে বসেন আর ওঠেন সেই বিকেল চারটে পাঁচটা নাগাদ। তখন ছাতাটা নিয়ে গায়ে ফতুয়া পরে বেরুবেন !

বললাম, কোথায় ?

নিত্যানন্দ বললে, কে জানে !

বললাম, কোনও ইয়ে-টিয়ে আছে নাকি ?

নিত্যানন্দ বললে, তা তো ভাই বিশ্বাস হয় না। মেয়েমানুষের মুখদর্শন করতে যিনি ভয় পান, নেশা ভাঙ কিছু যিনি করেন নি, ফরসা কাপড় পরতে যাঁর আপত্তি, তাঁর যে অমন মতিভ্রম হবে, তা তো বিশ্বাস হয় না। ভারি কড়া মানুষ ও-সব বিষয়ে। আমাকেই এসে উপদেশ দিয়ে দিয়ে মাথা খারাপ করে দেন।

চটিটা পায়ে দিয়ে এক-একদিন রাস্তা পেরিয়ে এসে পড়েন।

বলেন, কী নেত্যবাবু, কখন এলেন ?

নিত্যানন্দ বলে, এই তো, এখুনি।

হরসুন্দরবাবু বলেন, এই নটার সময় কারবার শুরু করলেন! কাল সারাদিন আসেন নি, আপনার সব বাঁধা খদ্দেররা এসে ফিরে গেল। জিজ্ঞেস করছিল—নেত্যবাবু কোথায় ? আমি বললাম, কী জানি বাপু, অসুখ-টসুখ করল বোধ হয়। আপনার দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, সে-ও জানে না। বড় ভাবনা হয়েছিল মশাই আপনার জন্যে। তা কোথায় গিয়েছিলেন শুনি ?

নিত্যানন্দ বললে, কাল সকাল থেকে তাসের আড্ডায় জমে গিয়েছিলুম, আর উঠতে পারি নি।

কথাটা শুনে হরসুন্দরবাবু এমন চমকে উঠলেন যেন সামনে কেউটে সাপ দেখেছেন। খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুল না তাঁর।

আবার বলেন, সত্যি বলছেন তাস ?

নিত্যানন্দ বললে, হ্যাঁ, তাস।

হরসুন্দরবাবু যেন আকাশ থেকে পড়েন। বলেন, তাস খেলতে খেলতে দোকান খুলতেই ভুলে গেলেন ?

নিত্যানন্দ বলে, তাস খেলতে গিয়ে কিছু কি আর খেয়াল থাকে ?

হরসুন্দরবাবু বলেন, আমি আপনার ভালর জন্যেই বলি নেত্যবাবু। ব্যবসা আমিও করি, ব্যবসা আমারও লক্ষ্মী, কার জন্যে আর করি বলুন, আমার কে আছে ? ছেলেও নেই, বউও নেই, ভাইপো-ভাইঝিরাই সব পাবে। কিন্তু ব্যবসার জন্যে আমি, না, আমার জন্যে ব্যবসা, বলুন তো ?

নিত্যানন্দ বললে, আপনার জন্যেই তো আপনার ব্যবসা।

হরসুন্দরবাবু বললেন, ভুল কথা নেত্যবাবু, ভুল কথা। ব্যবসার জন্যেই আমি,

আর শুধু আমি কেন, আমার ব্যবসার জন্যেই আমার ভাইপো, ভাইঝি, আমার বিধবা ভাই-বউ, সব।

এই এমনি করেই একদিন সামান্য ভাবে একলা কাঠের পটিতে দোকান আরম্ভ করেছিলেন হরসুন্দরবাবু। সে অনেক দিন আগে। তখন এই এমন ইলেকট্রিক আলো ছিল না, রাস্তায় গ্যাসের বাতি ছিল না। কালীমন্দিরে তখন এমন যাত্রীর ভিড়ও ছিল না। সাত-তিন কাঠের ফুট ছিল তিন পয়সা। পাঁচ-আড়াই কাঠের দাম ছিল দেড় পয়সা। সস্তাগণ্ডার বাজার। তবু হলে কি হবে? অল্প বয়েস। উদয়াস্ত খাটতে হয়েছে হরসুন্দরবাবুকে। ওই বিরাট অশ্বত্থ-গাছটার তলায়, এখন যেখানে ভুলুবাবুর ভাতের পাইস-হোটেল হয়েছে, ওইখানে তিনখানা গদিবাড়ির জায়গা নিয়ে ছিল সাহাবাবুদের গোলা। তখন লোহা আর কেরাসিন কাঠের ব্যবসা নয়। শুধু শাল আর সেগুন। সাত-তিনের দর তিন পয়সা আর পাঁচ-আড়াইয়ের দর দেড় পয়সা। সাহাবাবুর পৈতৃক দোকান। তেমন মায়া-দয়া ছিল না কারবারে। দিনের শেষে শুধু ক্যাশবাক্সের পয়সা হাতিয়ে চলে যেতেন। গদিবাবু ছিল তারক সরকার। ক্যাশবাক্সে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে সকাল-সকাল গদিতে এসে বসত। বেচা-কেনা, ক্যাশ সামলানো, মাল কেনা, মাল ছাড়ানো, রেলের বাবুদের কাছে গিয়ে তদ্বির-তদারক, সব নিজে। লোকে বলত, গদিবাবু। গদির মালিকের দেখা-সাক্ষাৎ তো কালেভদ্রে। খদ্দেররা চিনত গদিবাবুকে। গদিবাবুই মালিক আবার গদিবাবুই কর্মচারী। একাধারে সব। দরোয়ান, মুটে, ঠেলাগাড়িওয়ালা সবাই গদিবাবুকেই এসে সেলাম করত।

সাহাবাবু বেলায় এসে একবার গদিতে বসতেন। বলতেন, বিক্রী-পাটা কেমন তারক?

গদিবাবু বলত, আজ্ঞে, বাজার বড় বেঁকা—

সাহাবাবু সিগারেট টানতে টানতে বলতেন, সোজা করে দাও তারক, সোজা না করলে আর চলা শক্ত! বড় টানাটানি পড়েছে—

গদিবাবু সবিনয়ে বলত, আজ্ঞে, মালিক হলেন আপনি, সোজা করলে আপনিই সোজা করতে পারেন—

সাহাবাবু বলতেন, কী করলে সোজা হয় বল তুমি?

গদিবাবু বলত, আজ্ঞে, টেনে টেনে—

সাহাবাবু বলতেন, এ কি রবার যে টেনে টেনে সোজা করব?

—আজ্ঞে, সে টান নয়, রাশ-টান—

সাহাবাবু তবু বুঝতে পারতেন না। বলতেন, কিসের রাশ?

গদিবাবু ঘুঘু লোক। সোজা কথা বলতে জানে না। বলত, টালিগঞ্জে মোড়লদের বাড়ি রাস দেখেছেন?

রাসলীলা কে না দেখেছে! বিশেষ করে সাহাবাবু তো দেখেছেনই। রাসের কদিন সাহাবাবু গদিতেই আসতেন না। বাঁধা আড্ডা ছিল সাহাবাবুর সেখানে। সেই রাসের সময়েই এক কাণ্ড ঘটে। হরসুন্দরবাবু তখন ছোট। পাঁচ টাকা মাইনের ছোকরা। গদিবাবুর সঙ্গে গজ-ফিতে নিয়ে ঘোরে। লোহাকাঠ মাপে, আর কাঠের আঁশ চেনে। সুতো ধরে খড়ির দাগ দেয়। খদ্দের এলে বসিয়ে রাখে। আর দরকার হলে পানটা সিগারেটটাও কিনে আনে। তখন সবে দেশ থেকে এসেছেন। তখন তাঁর কাছে কলকাতাও যা বাদামতলাও তাই। ওই আবাগীদের তখনও আড্ডা ছিল ওখানে। শুধু ওখানে কেন, সব জায়গাতেই। কালীঘাটের পুল থেকে তীর্থযাত্রী কি কাছারির মক্কেলদের সন্ধেবেলা হেঁটে আসবার উপায় ছিল না। ওই পানের দোকানটা যেখানে, ওইখানে এলেই ছেঁকে ধরত সব আবাগীরা। এ বলে—আমার ঘরে এস, ও বলে—আমার ঘরে এস। ভদ্রলোকদের বিপদের একশেষ। শেষে টাকা-কড়ি খুইয়ে শুধুহাতে দেশে হণ্টন। এখন তো দেখছেন পুলিস-পেয়াদার যা-হোক কিছু চোখ-রাঙানি আছে। তখন তাও ছিল না। বাদামতলার এই দিকটা দিয়ে হাঁটে কার সাধ্যি! কিন্তু কাঠের গোলার কারবারীদের ও-রাস্তা ছাড়া গতি নেই। তাগাদা সেরে টাকা-কড়ি নিয়ে যেদিন ফিরতে সন্ধ্যে হয়েছে সেদিন কী ভয়!

অথচ রাত্রে হাঁটা আমার তখন অভ্যেস আছে। আমাদের গাঁয়ে কতদিন আড্ডা দিয়ে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু সে আলাদা। সে তো আর বাদামতলার রাত্তিরের মত নয়। এখানে তো জানেন মাঝ-রাত্তিরেই এক-একদিন হৈ-হল্লা বেধে যায়। যত মাতাল আর যত আবাগীদের মরণ এই বাদামতলায় মশাই। অমন গঙ্গার ধার, বেশ খোলা হাওয়া, বসে বসে দেখুন না সিনারি! বড় বড় গাছ, সেই গাছের তলায় দুপুরবেলাও যেন স্বর্গ মশাই। গরমের দিনে যখন সারা দুনিয়া পুড়ে ছারখার তখন বাদামতলার ওই গঙ্গার ধারটিতে বসলে মনে হবে যেন কাশ্মীরে বসে আছি—এমনি আরাম! তা আরাম কি করতে দেবে আবাগীরা! তখন হয়তো ওখানেই চুল খুলে রোদ পোয়াচ্ছে, বিকেলবেলা তো কথাই নেই। ওদিকে মাড়ায় কার সাধ্যি! দেখছেন তো টিনের ঘর, ওই ঘরের মধ্যে মানুষের চামড়া যেন সেদ্ধ হয়ে আসে। আপনার কি মশাই, আপনার তো ফ্যামিলি বাইরে,

আমরা যে ছাড়তে পারি নে। আর আমার আরামের জন্যে তো ব্যবসা নয় ব্যবসার আরামের জন্যেই তো আমরা।

তা ব্যবসা বলে কি নিজের আরাম বলতে কিছু নেই?

হরসুন্দরবাবু বলতেন, না মশাই, ব্যবসার কাছে আরাম-টারাম সব হারাম হায়! আপনি আরাম খুঁজলে ব্যবসাও আরাম খুঁজবে। তারপর গদিবাবুর মত একটা ম্যানেজার রাখুন না, আরও আরাম। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে রাসলীলা দেখুন, কে বারণ করছে! আমার মত ছোকরা পেয়েছিল বলে তবু সাহা-কোম্পানি কিছুদিন চলেছিল। এই হাতে হাজার হাজার টাকা এনেছি এই বাদামতলার রাস্তা পেরিয়ে, কখনও একটা আধলা খোয়া যায় নি তবু।

গদিবাবুকে যদি বলতুম, গদিবাবু, আর এক টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিন না।

গদিবাবু বলত, আমি কি মালিক, মালিক এলে বলিস।

তা মালিকেরই তখন যা টাকার খ্যাচ, আমি আর চাইব কী! চোখের সামনে সব দেখেছি তো! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চোখ মেলে থাকলেই দেখবে রাস্তার ওপর রাসলীলা। হাতাহাতি টানাটানি চলেছে। বাদামতলার কাণ্ড, আপনিও তো আছেন এখানে সাত বছর, সবই দেখছেন। এ আর কী! তখন ছিল নরক। ওদিকে ভবানীপুর, এদিকে কালীঘাট, দক্ষিণে টালিগঞ্জ। মাঝখানে এই বাদামতলা। দিনরাত নরক একেবারে গুলজার হয়ে থাকত। শুনেছি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বইতে সে-সব লেখা আছে। ছেলেবেলায় নিজের দেশ দেখেছি আর কলকাতায় এসে দেখলাম বাদামতলা। আর মাঝে মাঝে শুধু যেতে হত নিমতলায় কাঠের পটিতে। দেশে ছিল অন্য রকম। সেখানে ছিল ভারি বদ নেশা আমার। সঙ্গদোষে যা হয় আর কি!

লজ্জায় হরসুন্দরবাবুর কান দুটো যেন লাল হয়ে আসে।

বললাম, কিসের নেশা!

সে আর বলবেন না নেত্যবাবু। ভাবতেও আমার লজ্জা হয়। ভগবানের আশীর্বাদ মশাই যে সে-নেশা কাটাতে পেরেছি, কোনও মানুষের যেন অমন সর্বনাশা নেশা না হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, কিসের নেশা, মদের?

হরসুন্দরবাবু বললেন, না না, সে হলে তো কথা ছিল মশাই, তার চেয়েও খারাপ, সে আর আপনার শুনে দরকার নেই।

—গাঁজার?

হরসুন্দরবাবু আরও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন, না তাও নয়, তার চেয়েও খারাপ—

বললাম, কিসের বলুন না ?

হরসুন্দরবাবু গলাটা আরও নিচু করে আনলেন। বললেন, আজ্ঞে, কাউকে যেন বলবেন না, পাশাখেলার নেশা—

কথাটা বলে যেন মহা অপরাধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এমনি ভাবের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। অনুশোচনার আত্মপীড়নে খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলেন না।

তার পর বললেন, সেই আমার এক চরম পরীক্ষার দিন গেছে মশাই, নাকে কানে খত দিয়েছি আর ও-কর্ম করব না—তাস-পাশা-দাবার মধ্যে আর নেই, জীবন নষ্ট, ব্যবসা নষ্ট, চরিত্র নষ্ট, সব নষ্ট—

বললাম, এই যে এত লোক তাস-পাশা খেলছে, সকলের চরিত্রই কি নষ্ট হয়েছে বলতে চান ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, যারা খেলে তারা খেলুক মশাই, বাপের টাকা, শ্বশুরের টাকা থাকে ওড়াক না যত খুশী। তাদের কথা আলাদা—যেমন সাহা-কোম্পানির ছোট-সাহা মশাই। আমরা হলাম গরিব লোক, আমাদের অল্প পুঁজি নিয়ে দোকান করতে হবে, দশজনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে—

বললাম, রাসলীলার দিন কী হয়েছিল বলছিলেন হরসুন্দরবাবু ?

হরসুন্দরবাবু বলেন, চরিত্র জিনিসটা কি সোজা নেত্যবাবু ! আপনারা বুঝবেন না তিলে তিলে বড় হওয়া কাকে বলে। এ যুদ্ধের হিড়িকে বড় হওয়া নয়। টাকার জোয়ার আসা যাকে বলে, তাও নয়। এক পার্সেণ্ট, দেড় পার্সেণ্ট লাভে মাল বেচেছি, বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় করে প্রতিষ্ঠা করা· যে কি কষ্ট তা আপনি বুঝবেন না নেত্যবাবু।

হরসুন্দরবাবু বলতেন, চোখের সামনে চুরির পয়সা লোপাট হতে দেখেছি, আবার অগাধ পয়সা এক ফুঁয়ে তুলোবাজির মত উড়তে দেখেছি। কিন্তু ওই যে বাবা একদিন কান মলে দিয়ে আমায় শিক্ষা দিয়ে দিলেন তা আর ভুলি নি মশাই—

তার পর আকাশের উদ্দেশে হাত জোড় করে বলতেন, বাবা এখন গত, তিনি ছিলেন দেবতা, তেমন মনের বলও নেই আমাদের, তেমন শিক্ষাদীক্ষাও নেই, তবু এ-জীবনে যা কিছু করেছি, জানবেন সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদের জোরেই—

বলতে বলতে হরসুন্দরবাবুর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। ঘড়ির দিকে চাইতেই চমকে ওঠেন: পাঁচটা বাজে! বলেন কী! আপনার ঘড়িটা ঠিক আছে তো নেত্যবাবু?

বলে তর তর করে বেরিয়ে যান। পাঁচটার পর আর তাঁকে আটকানো যায় না।

খদ্দের এলে বলেন, আজ নয়, কাল আসবেন। কাল কাঠের চালান আসছে আরও দু গাড়ি, সাত-তিন, পাঁচ-দেড়, ছয়-চার, যা চাইবেন, সব পাবেন—

নিত্যানন্দ গল্প বলছিল। শেষে বললে, আমি তো আজ সাত বছর দোকান করেছি এখানে, এই এক ভাব দেখে আসছি হরসুন্দরবাবুর, কোনও দিন কোনও ব্যতিক্রম নেই। অথচ ব্যবসাদার হিসেবেও ভারি খাঁটি, ওঁর দোকানে এক দর, খদ্দেররা সে কথা জানে। কবে একদিন বাপ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পাশাখেলার অপরাধে, তার পর থেকে একেবারে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ চরিত্রটি রেখেছেন—একেবারে নিদাগ যাকে বলে।

এতক্ষণ গল্প শুনে বললাম, না ভাই, ওঁকে নিয়ে গল্প হয় না।

নিত্যানন্দ হাসল। বললে, আমিও তাই ভাবতুম। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যিই গল্প হয়ে গেল কিন্তু।

বললাম, কী রকম?

নিত্যানন্দ বললে, হ্যাঁ ভাই। হঠাৎ। আর আমি তার জন্যে ঠিক তৈরী ছিলাম না. যে-লোককে নিরস কাঠের ব্যবসায়ী বলে জানতাম, হিসেব আর গজ-ফিতে আর টাকা উপার্জন নিয়েই ব্যস্ত বলে জানতাম, হঠাৎ আমার চোখে একদিন সেই মানুষই এক মহাকাব্য হয়ে উঠল ভাই।

তবু বুঝতে পারলাম না, বললাম কী রকম? লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খান বুঝি?

নিত্যানন্দ হাসল। বললে, দূর, তা হলে তো চরিত্রটা মাটি হয়ে যেত!

তা হলে?

নিত্যানন্দও হাসতে লাগল। বললে, সে কল্পনাও করতে পারি নি ভাই আমি—

বললাম, তবে কি মেয়েমানুষ—?

নিত্যানন্দ বললে, তোমরা গল্প লেখ, তবু এমন ঘটনা তুমিও কল্পনা করতে পারবে না।

বললাম, তবে কি গান-বাজনা?

না, তাও না।

নিত্যানন্দ বলতে লাগল, প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগত ভাই লোকটাকে। ভাবতাম, খালি এসে উপদেশ দেয়। বুঝি পয়সাটাই সার চিনেছে জীবনে। বিয়ে-থা করে নি, কেবল চোখ কান নাক বুজে ব্যবসাই করছে। ব্যবসা ভাল জিনিস, কিন্তু জীবনে কাঠই সত্যি আর সব মিথ্যে, এমন কথা হাজার চেষ্টা করেও ভাবতে পারলুম না জীবনে, তাতে ব্যবসা হোক আর না হোক। ওদিকে হরসুন্দরবাবুর ঘরে গিয়ে দেখেছি সামনা-সামনি দুটো ছবি। এ পাশে ঠিক গণেশের মূর্তির ওপরই একটা লক্ষ্মীর পট আর সামনের দেওয়ালে ওঁর বাবার একটা ফোটো।

প্রত্যেকদিন গঙ্গাস্নান করে এসে ওই গণেশ আর লক্ষ্মীকে প্রণাম সেরেই বাবার ফোটোর তলায় অনেকক্ষণ ধরে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে একমনে প্রণাম করেন।

বলেন, পিতাই তো সর্বস্ব মশাই, তিনি তো ওপর থেকে সবই দেখছেন, যখনই ঠেকায় পড়ি, বাবার ছবির সামনে গিয়ে উপদেশ চাই, বলি, তোমার কথা আমি অমান্য করি নি বাবা, আমাকে আশীর্বাদ কর, যেন সমস্ত বিপদ কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি।

হরসুন্দরবাবু বলেন, আর আশ্চর্য দেখেছি মশাই, বাবাকে স্মরণ করলেই কোথা থেকে সব বিঘ্ন কেটে যায়, সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়।

অদ্ভুত পিতৃভক্তি! এত যে যুদ্ধ গেল, এত বাজার খারাপ গেল, হরসুন্দরবাবু বিপদে-আপদে কেবল বাবাকে ডেকে এসেছেন।

খদ্দেরদের বলেন, দেখুন, আমি কে? আমি তো নিমিত্ত, ওই দেখুন বাবার ফোটো। বাবাকে স্মরণ করে আমি কারবার করি, ওপর থেকে উনিই দেখছেন। আপনাদের যে ঠকাব তারও উপায় নেই।

বলেন, বাবা ছিলেন আমার দেবতা। যা কিছু শিক্ষা দেখছেন—এই ত্যাগ, এই সংযম, এই পরিশ্রম দেখছেন, সব আমার বাবার কাছে শিক্ষা।

ছেলেরা দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজোর চাঁদা চাইতে এলে বলেন, এই চার আনা দিলাম ভাই, নিতে হয় নাও না-নাও নিও না—এর বেশী দেবার সামর্থ্য আমার নেই ভাই।

ছেলেরা বলে, ওঁরা সবাই দু টাকা করে দিলেন, আর আপনি মোটে চার আনা?

হরসুন্দরবাবু বলেন, ওই তো বললুম, ওঁদের বড় বড় ব্যবসা, ওঁরা দিতে পারেন। দু টাকা তো সামান্য ভাই, আমি যখন তোমাদের বয়েসে সাহা-কোম্পানিতে পাঁচ টাকা মাইনের কাজ করতুম, তখন দেখেছি সাহাবাবুর হাত দিয়ে দশ টাকার কমে

গলত না—পাঁচ হাতে হীরের আংটি, দান-ছত্তোর দোল-দুর্গোৎসব, এলাহি কাণ্ড। টালিগঞ্জের মোড়লদের রাসের মেলায় বাঈজী-খেমটাওয়ালীর ভিড় লেগে যেত, তা সেই সাহা-কোম্পানি কি রইল? বল না তোমরা? তোমরা তো আজকালকার ছেলে হে, সেই সাহা-কোম্পানির নাম শুনেছ?

ছেলেরা বলে, না।

শোন নি? তবে শোন আমার কাছে, শুনে নাও।

বলে লম্বা ফিরিস্তি দেন সাহা-কোম্পানির কারবারের। কেমন করে সাহা-কোম্পানি আস্তে আস্তে পড়ল। কেন পড়ল। যাতে না পড়ে তার জন্যে কী কী করা উচিত তার জন্যে উপদেশ। ছেলেরা অত শুনবে কেন? তাদের দশ জায়গায় কাজ আছে। আরও পঞ্চাশ জনের দরজায় যেতে হবে। বলে, পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল।

কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর কেউ কাছা-গলায় দিয়ে সাহায্য চাইতে আসুক!

হরসুন্দরবাবু মুক্তহস্ত। বলেন, ওই দেখ আমার বাবার ছবি, এই যা কিছু দেখছ, সবই ওই ওঁর কল্যাণে। বাবার একটা ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখবে ভাই. রাত্রে শুতে যাবার আগে আর ঘুম থেকে উঠে প্রণাম করবে। দেখবে সব বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে।

বলেন, বাপ কি সামান্য জিনিস ভাই, সেই বাপের কথাই ছোট বয়েসে শুনি নি, ছেলেবেলায় সঙ্গদোষে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে বাপকে কেয়ারই করি নি, নেশা করে সর্বনাশ করেছি নিজের।

নেশা?

হ্যাঁ ভাই, নেশা করে একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিলাম।

কিসের নেশা?

না ভাই, মদ-ভাঙ নয়, মেয়েমানুষও নয়, তার চেয়েও খারাপ নেশা। কিন্তু বাবা ছিলেন দেবতা, জানতে পেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই দেখ না চেলা কাঠের দাগ এখনও পিঠের ওপর দেখতে পাবে!

বলে পিঠটা দেখান পাশ ফিরে।

বলেন, সেই যে শিক্ষা পেলাম, সে আর জীবনে ভুলি নি,—নাক-কান মলা খেয়ে সেই যে ও-পথ ছেড়েছি, আর নয়।

বলে আকাশের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করেন।

নিত্যানন্দ বললে, তা এই চরিত্র দেখে দেখে আমিও ভাই ভাবতুম, তুমি ে

জীবন নিয়েই মেয়েদের নিয়ে গল্প লিখছ, ঠিকই করছ। মেয়েদের জীবনেই বুঝি যত রস, মেয়েদেরই জীবনে যত নাটক। পুরুষ মানুষকে খাটতে হয়, অফিসে উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর আর কিছু থাকে না তার শরীরে কি মনে, কিংবা ব্যবসাপত্তোর করে সারাদিন বিলের তাগাদা আর গজ-ফিতের হিসেবের তাপ লেগে রস-কশ সব বুঝি শুকিয়ে যায়। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছি হরসুন্দরবাবুকে। ওঁর জীবনের সব খুঁটিনাটি! ছোট বয়েসের ঘটনা, তারপর যখন বড় হয়েছেন। প্রাণখোলা মানুষ। সব বলেছেন আমাকে। ভাবলাম সাহা-কোম্পানির সাহাবাবুর কাছে তো বার বার যেতে হয়েছে। রাসবাড়িতে নাচওয়ালী-খেমটাওয়ালীদের বাহার দেখেছেন, কখনও কি আর কিছু ঘটে নি! সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো চেপে যাচ্ছেন। হয়তো বয়েসে আমি কম বলে কিছু ঢাকছেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারি নি।

হরসুন্দরবাবু বলতেন, চরিত্রটা ঠিক না রাখলে কি আর আজকে এই দাঁড়াতে পারতাম ভাই, বড় ভাইপোকে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছি, মেজ ভাইপোটা এম. এ. পাস করে প্রফেসারি করছে, ছোটটাও ইস্কুলে ফার্স্ট হয়, এবার ভাইঝির একটা বিয়ে দিতে পারলেই—

বলতাম, কিন্তু আপনারও তো একদিন কম-বয়েস ছিল, সাহাবাবুর গদিবাড়িতে যখন চাকরি করেছেন, কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে—তখনও কিছু হয় নি?

হরসুন্দরবাবু বলতেন, ওই যে তোমাকে বললুম ভাই, বাবার ফোটোটা কাছে রেখে দিতাম আর বিপদে পড়লেই বাবাকে স্মরণ করতাম, সঙ্গে সঙ্গে সব বিপদ কেটে যেত।

কিন্তু সাহাবাবুর সঙ্গে তাঁর মেয়েমানুষের বাড়িতেও তো যেতে হয়েছে?

তা যেতে হয়েছে বইকি। হামেসাই যেতে হয়েছে। শুধু যেতে হয়েছে? গদিবাবু ছিল তারক সরকার। সে কি কম চেষ্টা করেছে আমাকে বখাবার। সময় নেই, অবসর নেই, গিয়েছি তার হুকুমে। গিয়ে সে যা বেলেল্লাগিরি দেখেছি আবাগীদের! দেখে গায়ের রক্ত জল হয়ে এসেছে। কিন্তু তখুনি বাবার মুখখানা স্মরণ করলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে সব বিপদ উদ্ধার হয়ে গেল।

আর রাসবাড়িতে?

হরসুন্দরবাবু বলতেন, সেখানকার কথা আর বলবেন না নেত্যবাবু, সেখানেও বাবুরা রাসলীলা করত কিনা। টাকার শ্রাদ্ধ হত সে-কদিন। মদ—মদের ফোয়ারা চলত মশাই সেখানে। একদিন কি হল জানেন? সকালবেলা গিয়েছি সাহাবাবুর

সঙ্গে দেখা করব বলে। তা বাবুর কি আর হুঁশ আছে তখন! রাত্তিরে মদ খেয়ে আছেন, সে ঘোর তখনও কাটে নি। যতবারই দেখা করতে যাই, শুনি— দেখা হবে না, বাবু ওঠে নি। দুপুর হয়ে গেল, বসেই আছি—না-খাওয়া না-দাওয়া, ওকেই বলে চাকরি, বসে থাকতেই হবে, উঠে আসতে পারি নে, সাত টাকার চাকরিটা চলে যাবে—গদিবাবু তারক সরকার আর তা হলে আস্ত রাখবে না, শেষকালে বেলা আড়াইটে···

হরসুন্দরবাবু একটু দম নিয়ে আবার বললেন, আড়াইটে নাগাদ একটু ঢুলুনি এসেছিল আমার, হঠাৎ দেখি এক আবাগী আমাকে এসে ঠেলছে। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারি নি, ভাবলাম কে-না-কে! তক্তপোশটার ওপর উঠে বসলাম, ভাল করে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখি, কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারদিকে একটু ঝাপসা-ঝাপসা ভাব।

আবাগী বললে, উঠুন, উঠুন—উঠুন।

ভারি রাগ হয়ে গেল আমার, জানেন! সাহাবাবুর গদিতে চাকরি করি বলে কি সাহাবাবুর আবাগীদেরও চাকর নাকি মশাই! বললাম, কোথায় উঠব?

আবাগী বললে, নিমতলায়।

নিমতলায় কথাটা শুনেই কেমন যেন ঘুমের ঘোরটা ভাল করে ভেঙে গেল মশাই। নিমতলায় কাঠ কিনতে গদিবাবুর সঙ্গে কতবার গিয়েছি। নিমতলা আমার চেনা জায়গা।

বললাম, নিমতলায় কেন যাবে?

সে বললে, নিমতলায় আমার বাড়ি।

বললাম, তা বাড়ি যেতে হয় যাও না, আমার সঙ্গে কী! মালিকের অনুমতি নিয়েছ? সাহাবাবু চলে যেতে বলেছে?

আবাগী বললে, সাহাবাবুকে বলবেন না, বললে আমায় ছাড়বেন না।

আমার যেন কেমন ভয় হতে লাগল মশাই। এই সব আবাগীদের নিয়ে কত সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয় শুনেছি। চোখের সামনেও তো দেখেছি বাদামতলায়। দিন-রাতই তো পুলিসের হুজ্জুত লেগেই আছে। মারপিট আর খুন-জখম তো এ-পাড়ার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে।

বললাম, সাহাবাবুর সঙ্গে কি তবে তোমার ঝগড়া হয়েছে?

আবাগী বললে, আমাকে কুড়ি টাকা দেবে বলে ভুলিয়ে এনেছিল, চার দিন হয়ে গেল এখনও একটা পয়সাও দেয় নি।

তা বাবুকে বল না কেন। সাহাবাবুর তো টাকার অভাব নেই।

আবাগী বললে, সাহাবাবু তো দিয়ে দিয়েছে, নলিনবাবু সব নিজে খেয়েছে—শুধু আমি নয়, কারোর টাকাই দেয় নি।

তারা কোথায় সব?

তারা সব ঘুমোচ্ছে, আমি এই সুযোগে পালিয়ে এসেছি।

বললাম, কেন? থাক না, পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে একেবারে যেও।

আবাগী কেঁদে ফেললে। বললে, আমার মেয়ের বড় অসুখ, বাড়িতে কেউ নেই, আমি আর থাকতে পারছি নে।

বলে সত্যি সত্যি মশাই মেয়েটা সেইখানে সেই তক্তপোশে বসে কাঁদতে লাগল আঁচলে চোখ ঢেকে। দেখুন তো মুশকিল! আমি গেছি বাবুর কাছে কাগজ-পত্তর নিয়ে দেখাতে। সাহাবাবু সই-সাবুদ করবে তবে ছাড়ান পাব গদিবাবুর হাত থেকে, এ কী বিপদ বলুন তো! অন্ধকার ঘর। দোতলায় সব বাবু, বাবুর মোসাহেবরা রয়েছে। আমাকে যদি দেখে ফেলে! গদিবাড়িতে চাকরি করতে এসে এ কী ঝঞ্ঝাট বলুন তো! পরের চাকরি তো একেই বলে। তাই তো একদিন চাকরির মাথায় তুত্তোর বলে লাথি মেরে নিজেই কাঠের ব্যবসায় নেমে পড়লাম। বললাম, আর পরের চাকরি না মশাই।

বললাম, তা সে মেয়েটার বয়েস কত?

হরসুন্দরবাবু বললেন, আপনিও যেমন নেত্যবাবু, আবাগীদের আবার বয়েস, ও আবাগীদের ঝাড়-বংশ বদমাইশ, ওদের কথা আমি বিশ্বাস করি ভেবেছেন?

বললাম, তারপর কী করলেন আপনি?

হরসুন্দরবাবু বললেন, আবাগী আমাকে গায়ের গয়না খুলে দিয়ে বলে কিনা—এগুলো আপনি নিন, আমায় দয়া করে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।

তা আমি বললাম, তুমি একলাই যাও না, আমাকে কেন?

আবাগী বললে, আমি কলকাতার রাস্তা চিনি না, নতুন এসেছি এখানে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোত্থেকে এসেছ?

আবাগী বললে, ফরিদপুর, পূবের পাড়া। ওই নলিনবাবুই আমাকে নিয়ে এসেছিল।

তা আমার তখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল মশাই, আমার বলে চাকরির ঠেলা, আমার নিজের ঠেলাই কে সামলায় তার ঠিক নেই। সাহাবাবু যদি জানতে পারেন তো আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি—

তা আপনি কি করলেন?

হরসুন্দরবাবু বললেন আমি আর কি করব, আমি তখন বাবার মুখখানা স্মরণ করলাম। যখনই বিপদ এসেছে বাবার মুখখানা স্মরণ করতেই সব মুশকিলের আসান হয়ে গেছে বরাবর। মনে মনে বললুম—বাবা, আমার মনে বল দাও, শক্তি দাও, ভরসা দাও—

তার পরে শেষ পর্যন্ত কি হল?

কি আর হবে! শেষকালে যা হবার তাই হল। দেখছেন তো এখন ভুলুবাবুর পাইস হোটেল হয়েছে ওখানে। অত বড় গোলা, দিনরাত কাজকর্ম লেগে থাকত সেখানে, সেই গোলা, সেই পাঁচ পুরুষের ফলাও কারবার উঠে গেল। কোথায় গেল সাহাবাবু, কোথায় গেল তার সব মোসাহেবের দল! আর গদিবাবু? সেই তারক সরকার? সেও কি ভোগ করতে পেলে ভেবেছেন! ভেবেছিল দেশে গিয়ে গঞ্জে কাঠের গোলা খুলবে। কিন্তু কার ধন কে খায়! মশাই, রাত পোয়াতে তর সইল না, সাপের কামড়ে প্রাণ হারাতে হল। আর আমি···

কিন্তু সেই মেয়েটা?

হরসুন্দরবাবু বললেন, আপনি ভাবছেন আমি তার খোঁজ নিয়েছি! রাম বল! বাবার কাছে আমার শিক্ষা মশাই, ভোরবেলা রোজ বাবাকে প্রণাম করে কারবার শুরু করি, আমি যাব সেই আবাগীর খোঁজ নিতে! ওই আবাগীদের মুখ দেখতে হবে বলে থিয়েটার-বায়োস্কোপে পর্যন্ত যাই না মশাই, তা হলে আর বাবাকে মুখ দেখাতে পারব ভেবেছেন? বাবা যে ওপর থেকে সব দেখছেন—

বললাম, তার পর?

তারপর সাহা কোম্পানি যখন উঠে গেল, সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা, প্রথম একদিন পাঁচ দশ টাকার বাঁশ নিয়ে বাবার নাম স্মরণ করে কারবার আরম্ভ করে দিলুম, তারপর থেকে তো দেখছেন এই কারবার, বড় ভাইপোকে বিলেত পাঠিয়েছি ডাক্তারি পড়তে, মেজ ভাইপোটিকে এম. এ. পাস করিয়ে প্রফেসারিতে দিয়েছি, ছোটটি পড়ছে, ভাবছি ভাইঝিটিকে পাত্রস্থ করে ওদের জন্যে একটা গেরস্থ-পোষা বাড়ি করে দেব, আর তারপর বাবা যদি মুখ রাখেন, মায়ের মন্দিরের পাশে কেওড়াতলার শ্মশানে এই গঙ্গার তীরেই যেন যেতে পারি মশাই ভালয় ভালয়।

বলেই উঠলেন হরসুন্দরবাবু। বললেন, যাই, দেরি হয়ে গেল আবার।

তারপর যেতে যেতে ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, ওঃ পাঁচটা বাজে! আপনার ঘড়ি ঠিক চলছে তো?

তারপর ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে চটি পরে হাতে ছাতা নিয়ে সোজা দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নিত্যানন্দ গল্প শেষ করে বললে, এই হল মোটামুটি হরসুন্দরবাবুর জীবনী।

বললাম, তবু ভাই, এ নিয়ে গল্প হয় না।

নিত্যানন্দ বললে, কিন্তু এর পরেই গল্প হল যে—শুধু গল্প নয়, মহাকাব্য হল একেবারে!

বললাম, কি রকম?

নিত্যানন্দ বললে, তবে শোন, একদিন কি মনে হল। ভাবলাম, দেখি না কোথায় যায় লোকটা! দোকান আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছি কিনা, ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছাতা নিয়ে ফতুয়া পরে বেরিয়ে যান। মনে মনে অনেক কৌতূহল হয়েছে। কোথায় যান? বিলের তাগাদায়? কিন্তু সে জন্যে তো আলাদা সরকার আছে; আর যদি বেড়াতে যান তো তার জন্যে আবার ঘড়ি দেখার কী দরকার! এ যেন এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালোট হয়ে যাবে! যেন তার জন্যে কেউ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে! যেন তিনি না গেলে সব আয়োজন শুধু পণ্ড নয়, লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিসের এত কাজ যার জন্যে খদ্দের এলে ফিরিয়ে দেন!

খদ্দেরদের বলেন, কাল আসবেন দাদা, কাল আরও দু ওয়াগন মাল আসছে, সাত-তিন, ছয়-চার, পাঁচ-দেড়—সব পাবেন। আজকে একটু বেরোচ্ছি আমি—

যে-লোক বার বার আমাকে উপদেশ দেন, আমার তাসখেলার খবর শুনে ভয়ে আঁতকে ওঠেন, তিনি হেন লোক কী করে ব্যবসাকে এতখানি অবহেলা করেন। তিনি হেন লোক কী করে বিকেলবেলা দোকান ছেড়ে যান! কিসের টানে! কিসের নেশায়! কিসের আকর্ষণে!

অনেক দিন ভেবেছি। দোকানে যখন বিকেলবেলা কোনও কারণে জানলার বাইরে নজর পড়েছে, ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি হরসুন্দরবাবু দোকান থেকে বেরুলেন। আকাশের দিকে চেয়ে বোধ হয় বাবাকে স্মরণ করে ছাতাশুদ্ধ হাত দুটো জোড় করেই কাকে যেন প্রণাম করলেন। যেন মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করলেন। অর্থাৎ অফিস যাবার সময় সেকালের বাবুরা যেমন ইষ্টনাম স্মরণ করে অফিসে যাত্রা করেন এও যেন তেমনি। নিজের মেয়ের পাত্র দেখতে যাবার সময়ও কেউ এত ভক্তিভরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে না ভাই এমনি ভক্তি, এমনি নিষ্ঠা! আর এ কি একদিন, না, দুদিন! হামেসা। হামেসাই দেখি। আশেপাশের

গোলদার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে বলে, পাঁচটা বেজেছে এখন আর হরসুন্দরবাবুকে পাওয়া যাবে না।

আর আমিও যে জিজ্ঞেস না করেছি তা নয়।

জিজ্ঞেস করতাম, কোথায় চলেছেন হরসুন্দরবাবু?

হরসুন্দরবাবুর তখন দাঁড়াবার সময় নেই, চলতে চলতে বলতেন, কাজ আছে ভাই, চলি।

এমনি যে কতবার জিজ্ঞেস করেছি তার ঠিক নেই। প্রত্যেকবারই ওই একই উত্তর—কাজ আছে ভাই, চলি।

যখন সকালবেলা, কাজকর্ম কম, তখনও জিজ্ঞেস করেছি, রোজ পাঁচটার সময় কোথায় যান বলুন তো হরসুন্দরবাবু? রোজ আপনার কিসের কাজ?

হরসুন্দরবাবু প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতেই চেষ্টা করতেন, নেহাত পিড়াপিড়ি করলে বলতেন—ভাই, কাজ কি আর একটা নেত্যবাবু, তিন ভাইপোকে তো একরকম যা-হোক করে মানুষ করে দিয়েছি, এখন ভাইঝিটার বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। যাব আর কোথায় ভাই, এই একটু ধান্ধায় ঘুরি আর কি!

প্রথম প্রথম আমিও ভাবতাম, হয়তো তাই। ভাইঝির বয়েস হয়েছে, বি. এ. পাস করেছে। ভারি নম্র স্বভাব মেয়েটির। গড়ন-পেটন ভাল। বাদামতলার এই আবহাওয়ার মধ্যে টিনের গোলার ভেতর মানুষ বটে কিন্তু চাল-চলন ভারি চমৎকার। এখান দিয়ে হেঁটে কলেজ যেত, কোনদিকে চোখ তুলে চাওয়া নয়, কি কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসি-গল্প করা নয়। কাকাবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা পুরোপুরি পেয়েছে। হরসুন্দরবাবু নিজের হাতে মানুষ করেছেন বলতে গেলে। ভাইঝিটির বিয়ের জন্যে হরসুন্দরবাবুর একটা ভাবনা ছিল জানতাম। ভাবতাম, সেই ধান্ধাতেই হয়তো ঘোরেন।

কিন্তু ভাইঝিরও বিয়ে হয়ে গেল একদিন।

ওরই মধ্যে হরসুন্দরবাবু খরচ-পত্তোর করে লোক-জন নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। দেখতে দেখতে দু-এক দিনের মধ্যে অতিথি-অভ্যাগতের ভিড়ও কমে গেল। কিন্তু অত যে কাজকর্ম তার ফাঁকেও দেখেছি, হরসুন্দরবাবু কেমন যেন পাচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করছেন।

আমার ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই বললেন, উঃ পাঁচটা বাজে, আপনার ঘড়িটা ঠিক চলছে তো?

বললাম, কোথাও যাবেন নাকি?

নাঃ, কাজ তো ছিল, কিন্তু বাড়িতে লোকজন আসবে, যাই কী করে ?

বললাম, এ কটা দিন না হয় একটু কাজ কামাই-ই করলেন—ভাইঝির বিয়েটা হয়ে গেল। এবার তো আর আপনার কারও দায় নেই—

তা দায় না থাকলে কী হবে! বাড়ি একটু ফাঁকা হতেই দেখি, আবার সেই পাচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে, সাবান-কাচা ফতুয়াটা পরে, ছাতা নিয়ে হন হন করে চলেছেন। যেন তাঁর অভাবে কোথাও রাজকার্য আটকে যাচ্ছে। যেন তিনি না গেলে সব আয়োজন পণ্ড, সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে। যেন তাঁর যেতে দেরি হলে কোথাও কোনও অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে পারবে না। যেন কেউ তাঁর জন্যে উদ্গ্রীব আগ্রহে প্রতিক্ষা করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় চলেছেন হরসুন্দরবাবু ?

হরসুন্দরবাবুর তখন দাঁড়াবার সময় নেই। চলতে চলতেই বললেন, কাজ আছে ভাই, চলি।

বুঝলাম কোথাও একটা রহস্য আছে। যা কেউ জানে না, যা কাউকে তিনি জানাতেও চান না—অতি গোপনীয়, গূঢ় তত্ত্ব. যা সকলের কাছ থেকে তিনি গোপন করতেই চান।

পাশের গদির দয়াল পোদ্দারকে জিজ্ঞেস করলাম একদিন। দয়াল পোদ্দার এ-পাড়ায় ষোল বছর কাঠের কারবার করছেন। বললেন, আমিও রোজ দেখি যেতে বটে, ঠিক পাঁচটার সময়। আজ ক্রমাগত ষোল বছর ধরেই দেখে আসছি, কিন্তু—

মোড়ের মাথার শশী দাস মশাইকেও জিজ্ঞেস করলাম। দাস মশাই আজ তিরিশ বছর বাদামতলায় কাঠের কারবার করছেন। বললেন, আমিও আজ তিরিশ বছর অমনি দেখে আসছি বটে—পাঁচটা বাজতে না বাজতে কোথায় যান বুঝতে পারি না।

শেষকালে একদিন ঠিক করলাম. দেখতে হবে কোথায় যান হরসুন্দরবাবু।

সেদিনও ফতুয়া গায়ে ছাতা নিয়ে দু হাত জোড় করে ইষ্টনাম স্মরণ করে, বোধ হয় বাবার নামই স্মরণ করে হন হন করে চলতে লাগলেন।

আমিও তৈরী ছিলাম। পেছু নিলাম।

আগে আগে চলতে লাগলেন হরসুন্দরবাবু। এই ধর পঞ্চাশ গজ দূর দূর। আর পেছনে তাঁকে লক্ষ্য করে আমিও চলেছি। কিন্তু তখনও কি জানি আমি, কী অমূল্য রত্ন পাব! তখনও কি জানি হরসুন্দরবাবু শুধু কবিতা নয়, ছোটগল্পও নয়, একেবারে সাত সর্গে পূর্ণাঙ্গ একটি মহাকাব্য! আমি তাই পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দেখেছি,

পুরীর সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখেছি, আবু পাহাড়ের সান্-সেট্-পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেছি, দার্জিলিং থেকে ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি, মহাবলীপুরমের হর-পার্বতী মূর্তি দেখেছি, সাঁচীর বুদ্ধস্তূপ দেখেছি, বৃন্দাবনে সোনার তালগাছ দেখেছি, কাশ্মীরের নিশাদ্‌বাগ দেখেছি, যোধপুরের থর মরুভূমি দেখেছি—জান তো ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কতবার কত জায়গায় কত জিনিস দেখতে গিয়েছি; কিন্তু এ এক অবাক কাণ্ড! এমন আমার জীবনে দেখি নি। এ তুমি কল্পনাও করতে পারবে না—

বললাম, কী রকম?

নিত্যানন্দ বললে, আমি তো পেছনে পেছনে চলেছি, তখন নভেম্বরের মাঝামাঝি, পাঁচটার পরই সন্ধ্যে হয়ে যায়, চারদিকে বেশ অন্ধকার ভাব, কাঠের পটি পেরিয়ে, বেঙ্গল গভর্মেণ্ট প্রেস পার হয়ে সেণ্ট্রাল জেল বাঁয়ে রেখে কালীঘাটের গঙ্গার উঁচু পুল। দু পাশে মানুষজন যাবার রেলিঙ-ঘেরা সরু রাস্তা। হরসুন্দরবাবু সেই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন। আশেপাশে কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। শুধু ছাতাটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে নীচু দিকে চেয়ে হন হন করে চলেছেন। তখনও ভাবছি, কোথায় চলেছেন!

তার পর পুল পার হয়ে শনিঠাকুরের মন্দির ডান দিকে রেখে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরলেন। বাঁ দিকে মেথরদের বস্তি পেরিয়ে একেবারে হরিশ চ্যাটার্জির স্ট্রীট। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে তখন দোকান-পাট আলোয়-আলো। রাস্তাতেও সে-আলো এসে পড়েছে। বাঁ দিক ঘেঁষে চুন-বালি আর সুরকির গোলা, ইঁটের আর টালির কারবার। পুরনো জানলা দরজার দোকানও আছে। আর কিছু স্যাকরাদের সোনা-রূপোর দোকান। ঠুক-ঠাক হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। রাস্তার পাশে টিউব-ওয়েলের ধারে কিছু মেয়ে পুরুষের ভিড়। তখনও হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে আর ঝগড়া চলেছে জল নিয়ে। গরুর গাড়িগুলো খোলা পড়ে আছে। মোষ গরু রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে। তারই মধ্যে একটা মোটর কি ট্যাক্সি এলে পাড়া কাঁপিয়ে হর্ন বাজিয়ে ভিড় সরাতে হয়। আর ঠিক দু পাশের গলির মুখগুলোতে ও-পাড়ার মেয়েমানুষরা সেজেগুজে পাউডার মেখে মাটির ওপরেই উবু হয়ে বসে গেছে। কেউ কেউ ইঁট পেতে বসেছে, কেউ হেলান দিয়েছে ইঁটের দেয়ালে। রঙ্গ-রসিকতা করছে। কেউ কেউ আবার পানের দোকানের সামনে পান বিড়ি কেনবার ছুতো করে কড়া পাওয়ারের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে নিজেদের রূপ দেখাচ্ছে। কিন্তু হরসুন্দরবাবুর সে দিকে বিশেষ নজর নেই। তিনি আপন মনেই ছাতা ঠুক ঠুক করতে করতে চলেছেন নেই নোংরা খোয়ার রাস্তা দিয়ে।

ভাবলাম, হরসুন্দরবাবু এত রাস্তা থাকতে ওই রাস্তা দিয়েই বা চলেছেন কেন! পাশেই তো পোটোপাড়ার গলি ছিল কিংবা তারও ওপাশে হরিশ মুখুজ্জে রোড ছিল। কোথায় যান! কোথায় যান রোজ! শুধু আজ নয়, গতকাল নয়—চিরকাল ধরে। অন্ততঃ দয়াল পোদ্দার ষোল বছর ধরে বাদামতলায় কারবার করছেন। তিনি ষোল বছর ধরে এমনি দেখে আসছেন। শশী দাস তিরিশ বছর ধরে কারবার করছেন বাদামতলায়। তিনিও তিরিশ বছর ধরেই দেখে আসছেন। অথচ কেউ জানে না—কোথায় যান, কী করতে যান, কেন যান! কিসের এত আকর্ষণ! নিজের ছেলে-মেয়ে-বউ কেউ নেই, শুধু ভাইপো, ভাইঝি ভাই-বউ নিয়েই সংসার তাঁর। অর্থাৎ ভূতের সংসার। নিজের ছাড়া আর সবাই তো আছে। নিজের আপন-জনকেই কেউ দেখে না, নিজের বউকেই কত লোক খেতে পরতে দেয় না, ছেলেগুলোকে গোমুখ্যু করে রাখে। নিজের জামা-কাপড়-জুতো, নিজের চুল টেরি তেল সাবান গামছা নিয়েই কত লোক ব্যস্ত! নিজের জন্যে রোজ আধপোয়াটাক মাংস বরাদ্দ, বাড়ির বউ ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীর জন্যে মাছ এল কি এল না দেখে না—এমন লোকও কত দেখেছি। তা এ তা-ও নয়। নিজেরই কেউ নয়, বিধবা ভাই-বউ। মরে গেল কি বেঁচে রইল দেখবার দরকার কী! বিধবা মানুষ! আবার ঝাড়া হাত-পাও নয়। চার চারটে অপোগণ্ড। তিনটি ছেলে একটি মেয়ে নিয়ে ভাইয়ের সংসারে উঠেছে। লাথি-ঝাঁটা খেলেও কারও কিছু বলবার থাকত না। উদয়াস্ত খাটিয়ে নিয়ে একপেটা খেতে দিলেও কেউ নিন্দে করত না। কিন্তু সেই ভাই-বউকে সংসারের গিন্নী করে, তিনটি ভাইপোকে মানুষের মত মানুষ করে, ভাইঝিটিকে সৎপাত্রস্থ করে, এই যে ব্যবসা করে যাচ্ছেন—এটাই কি কম প্রশংসার কথা এই যুগে! একে নিয়েও যদি তোমরা গল্প না লিখতে পার তো কাকে নিয়ে লিখবে? কেন, নষ্টচরিত্র না হলে কি তাকে নিয়ে গল্প লেখা যায় না? গল্পের যোগ্য হতে গেলে কি চরিত্রের স্খলন দেখাতেই হবে? নেগেটিভ চরিত্র নিয়েই তোমাদের কারবার, কিন্তু পজিটিভ চরিত্র নিয়েই বা গল্প হবে না কেন? তা হলে রামকে নিয়ে রামায়ণ লেখা হল কী করে? যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে মহাভারতই বা লিখলেন কী করে ব্যাসদেব? কেবল ছিদ্র দেখাবার জন্যেই কি গল্প লেখা! একই চরিত্রের মধ্যে দুটো বিরোধী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখানোই কি তোমাদের চরম লক্ষ্য? কিন্তু আমি বলি, তা কেন হবে! অত সঙ্কীর্ণ কেন হবে গল্প-লেখকদের দৃষ্টি! সমস্ত মানুষ, এই গোটা মানুষটাকে নিয়েই বা গল্প লেখা হবে না কেন! যদি পবিত্র চরিত্রই কল্পনা কর তো এমন পবিত্রতার কথা চিন্তা কর না, যা শুধু

বৈরাগ্যে বা ত্যাগেই মহান নয়, যা ভোগ থেকে বিমুখ হয়ে নয়, ভোগের মধ্যে থেকেই এই আমার 'আমি'কে দূর করতে পেরেছে, ভোগের মধ্যে থেকেই যে ভোগাতীত হতে পেরেছে, সংসারের মধ্যে থেকেই যে সংসারের উর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করেছে—

তা থাক্ গে এ-সব কথা! আমি ভাই পেছনে পেছনে যাচ্ছি আর এই সব কথা ভাবছি। শেষে কি এমন একটা চরিত্রের অধঃপতনই দেখব! হরসুন্দরবাবুর চরিত্রের সব মাধুর্যটুকু কি একটা ছোট ছিদ্র দিয়েই নিঃশেষ হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত!

হরসুন্দরবাবু আগে আগে চলেছেন। সেই ছাতাটি ঠুক ঠুক করতে করতে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সেই যেমন চালে প্রথম থেকে হাঁটতে শুরু করেছেন, সেই এক চাল। হঠাৎ পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকলেন।

আমি দেখে যেন বিশ্বাস করতে ভয় পেলাম।

গলির মোড়ে তখন ওপাড়ার বস্তিবাসিনীরা গুলজার করে দাঁড়িয়ে। কারও মুখে বিড়ি, কারও হাতে পান, কেউ পিঁড়িতে বসে, কেউবা উঠে দাঁড়িয়ে। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকতেও কেউ চঞ্চল হল না, কেউ সচেতন হল না। তাদের সভা যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগল। আর হরসুন্দরবাবুও যেমন যাচ্ছিলেন তেমনিই চলতে লাগলেন। যেন ওদের পরিচিত মানুষ! যেন ওঁকে ওরা চেনে। এমনি ভাব। যেন বহুদিনের বহু-পরিচিত অভ্যস্ত পথ দিয়েই চলেছেন। কোনও দ্বিধা নেই, কোনও সংকোচও নেই। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না তা পেছন ফিরে চেয়ে দেখাও নেই! আশ্চর্য!

আমিও পেছনে পেছনে চলেছি। রূপসীদের ভিড় পেরিয়ে গলিতে ঢুকে দেখি হরসুন্দরবাবুও তেমনি চলেছেন। তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। তেমনি সুবিন্যস্ত গতি।

দু পাশে টিনের চালা। মাঝে মাঝে গ্যাসের আলো দেওয়ালের মাথায়। চালা-ঘরের সদর-দরজার সামনে ছোট ছোট দরজার পৈঠেতে রূপসীদের ভিড়। এত সরু গলি, তবু লোক-চলাচলের বিরাম নেই। হরসুন্দরবাবু এঁকে-বেঁকে চলেছেন, আর অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখে আমিও সাবধানে তাঁর অনুসরণ করে চলেছি। একবার মনে সন্দেহ হল পাশের একটা বাড়িতেই তিনি ঢুকে পড়েন বুঝি বা, চির-অভ্যস্ত চির-পরিচিত একটি ঘরের চারটে দেয়াল আর একটি মেয়ের আশ্রয়নীড়ে বুঝিবা সারা জীবনের সমস্ত সাধু সঙ্কল্পের সুখ-সমাধি রচনা করেন। আর তা

যদি করেনই, তাতে দোষই বা কী দেওয়া যাবে! অপরাধই বা তাতে কোথায়! তাতে শুধু এইটুকু হবে যে, যে-হরসুন্দরবাবুকে নিয়ে গল্প লিখতে বলছি, তিনি অতি সাধারণ চরিত্র হয়ে যাবেন। সে-চরিত্রের আর কোনও বৈশিষ্ট্যই থাকবে না। যেমন আর পাঁচজন তেমনই। সমাজের সচরাচর আরও শতকরা নিরানব্বইটি ব্যাচিলর মানুষের মতই একজন। তাতে কোনও বৈচিত্র্যই নেই। আর তা হলে হরসুন্দরবাবুকে নিয়ে তোমাকে গল্প লিখতেও বলতাম না।

তা এমনি করেই আমি চলেছি আর ভাবছি মনে মনে।

এবার আর একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন হরসুন্দরবাবু। এ গলিটা আরও সরু। এ যেন গলির মধ্যে গলি। ঢুকেছিলেন যদুনন্দন লেন দিয়ে, এবারে ঢুকলেন যদুনন্দন বাই-লেনে। ইট-বাঁধানো গলি। একটা বাড়ির ইট-বার-করা দেয়ালের গায়ে গ্যাস-বাতিটা কোণাকুণি আঁটা। তাও আধখানা কাঁচ ভেঙে গেছে। গলিটা উত্তরমুখো সোজা চলে গেছে বলরাম বোস ঘাট রোডের দিকে। হরসুন্দরবাবু সেই দিকেই চলেছেন। মনে হল হরসুন্দরবাবুর গন্তব্যস্থল যেন আরও অনেক দূরে। আশে-পাশের কোনও দিকে নজর নেই। হন হন করে চলেছেন। তারপর যদুনন্দন বাই-লেন যেখানে শেষ হল সেখানে সেই মোড়ের ওপরই একটু খোলা জায়গা মতন। কিছু দোকান গজিয়েছে। অগোছালো, অবিন্যস্ত আবহাওয়া। কিছু নীচুতলার লোকের ভিড়।

একটা দিশী মদের দোকান সেখানে।

হরসুন্দরবাবু সেখানে একটু দাঁড়ালেন।

আমার বুকটা যেন ছাঁৎ করে উঠল। শেষে কি এই পরিণতি দেখব! আমার এমন সাধের মানুষটি কি এমনি করেই আমাকে এই দেখাতে এতদূর টেনে এনেছেন! এমন জানলে কে আসত এতদূর! এমন জানলে কি তোমাকে গল্প লিখতেই বলতাম ওকে নিয়ে!

কিন্তু তোমাকে তো বলেইছি, সেদিন যা দেখলাম সে ছোট গল্প নয়, বড় গল্পও নয়, মহাকাব্য। সাত সর্গে পূর্ণাঙ্গ এক মহাকাব্য একেবারে।

তা যাক গে, যা দেখলাম বলি।

হরসুন্দরবাবু সেই মদের দোকানের সামনেই দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। বোধ হয় কোঁচার খুঁট দিয়ে একটু কপালের মুখের ঘাম মুছে নিলেন। তারপর ডান হাতে ছাতিটা নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। এবার ঢুকে পড়লেন পাশের আর একটা আরও সরু গলিতে। এবার যেন আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই কোথায় চলেছেন হরসুন্দরবাবু! কত দূর!

কিন্তু এবার আর বেশী দেরি হল না। সরু গলিটা এবার যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেটা বেশ নিরিবিলি জায়গা। ঠিক দুটো রাস্তার কোণাকুণি একটা বাড়ি। বাড়ির ছাদটা গাড়ি-বারান্দার মত ফুট-পাতের ওপর বার করা। একটা গ্যাসপোস্ট ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গ্যাসের বাতিটাও অন্যগুলোর চেয়ে যেন একটু বেশী জোরালো। আর তার নীচেই ফুটপাতের পাথরের ওপর ছেঁড়া মাদুর পেতে চারজন লোক কী যেন এক মনে করছে। নীচু দিকে চোখ, মুখে অনর্গল কথা। কিন্তু ভীষণ মনোযোগ। আর অল্প দু-চারজন লোক আশেপাশে বসে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে তাই দেখছে।

হরসুন্দরবাবুও সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। কোঁচা দিয়ে মুখের আর কপালের ঘাম মুছলেন একবার। তারপর পাশের নীচু রোয়াকে বসে ছাতটার ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সেইদিকে একমনে চেয়ে দেখতে লাগলেন। দেখা আর শেষ হয় না। রাস্তা দিয়ে কত লোক নিঃশব্দে নিজের নিজের কাজে চলে যাচ্ছে, কারোরই সেদিকে দৃষ্টি নেই। শুধু ওই কজন লোক একদৃষ্টে নীচু হয়ে কী যেন দেখছে। কারোর মুখেই কথা নেই। যেন বড় নিবিষ্ট ভাব। নীচের চারজন খুব ঘেঁষাঘেঁষি মুখোমুখি বসে আছে। বসে হাত দিয়ে কি করছে। আর আশেপাশের লোকগুলো যেন আরও নিবিষ্ট মনে তাই দেখছে কেবল। তাদের মুখেও কথা নেই। আর সব চেয়ে নিবিষ্টচিত্ত যেন হরসুন্দরবাবু। মনে হল যেন হরসুন্দরবাবুর চোখের পলকও পড়ছে না। তার চোখে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সব মুছে গেছে। বাইরের যে-চলন্ত পৃথিবীতে এত কোলাহল, এত গুঞ্জন, এত শব্দতরঙ্গ, তার বিন্দুমাত্রও তাঁর কানে পৌঁছচ্ছে না। তিনি যেন তলিয়ে গেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের বাণী এমন নিবিষ্টচিত্তে বুঝি শোনেন নি। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনেও যেন অর্জুন এমন মন্ত্রমুগ্ধ হন নি। আর দ্বাপরে কৃষ্ণের বাঁশী শুনে শ্রীরাধিকাও এত বিহ্বল হন নি বুঝি।

তারপর আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না ভাই, আমি টিপি টিপি পায়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হরসুন্দরবাবু যে রোয়াকে বসে ঝুঁকে দেখছিলেন, সেই রোয়াকে উঠে তাঁর পেছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালাম। হরসুন্দরবাবু আমাকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু সামনে নীচের ফুটপাতের দিকে চেয়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। দেখি আশপাশের লোকজন একদৃষ্টে চেয়ে আছে আর তাদের দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসে চারজন লোক শুধু খেলছে আপন মনে।

বললাম, কী খেলছে?

নিত্যানন্দ বললে, পাশা।

বললাম, পাশা ?

নিত্যানন্দ আবার বললে, হ্যাঁ ভাই, পাশা। কিন্তু আমি সেই পাশাখেলা দেখলাম না, দেখতে লাগলাম, হরসুন্দরবাবুকে। হরসুন্দরবাবুকে সেই মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকতে দেখে মনে হল, এঁকে যেন আমি চিনি না। এ যেন অন্য মানুষ। মনে হল শ্রীরাধিকাও কি কৃষ্ণের বাঁশী-শুনে এতখানি তন্ময় হয়ে যেতেন, এমন করে ঘর-সংসার ভুলতে পারতেন! আমার সন্দেহ হল। মনে হল, চোখের সামনে যেন শ্রীরাধিকাকেই দেখছি, যেন অর্জুনকেই দেখছি ; মনে হল, যেন হরসুন্দরবাবু আজ সত্যিই হরসুন্দর হয়ে উঠেছেন। বাবার নাম দেওয়াও যেন সার্থক হয়েছে আজ। হরসুন্দরবাবুকে আমার যেন প্রণাম করতে ইচ্ছে হল।

বললাম, তারপর ?

নিত্যানন্দ বললে, তারপর আর কি ! রাত সাড়ে নটার সময় যখন খেলা ভাঙল তখন আবার সেই একই রাস্তা দিয়ে বাড়ী চলে এলেন। এমনি একদিন নয়, দুদিন নয়, তিরিশ বছরেরও ওপর এতখানি নিষ্ঠা কী যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্যদেবেরই ছিল ? আমার কিন্তু সন্দেহ হয়।

তাজমহল

মিস্টার রামলিঙ্গম আমার বললেন, আমি জানি—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, আপনি জানেন ?

আড্ডা প্রায় শেষ হবার মুখে হঠাৎ যেন আবার নতুন করে জমে উঠল। সপ্তাহে একটা দিন সকলে এসে পরস্পরের একটু দেখাশোনা করেন, এই ডাক্তারখানায় বসেন। ডাক্তার রামপাল সিংয়ের ডাক্তারখানায় সন্ধ্যেবেলা খদ্দের কেউ বড একটা আসে না। আজমীরের গোল মার্কেটে ভিড় যা কিছু সব শেষ হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আজমীর-শরিফের মেলার ভিড়ও নেই। এতদিন দোকানপাট অনেক রাত্তির পর্যন্ত খোলা থাকত। কারবার যা কিছু সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কিছুদিন বিশ্রাম করবার সময়।

কথাটা উঠেছিল এক বাঙালীকে নিয়ে। বাঙালী মেয়ে একটা। ধর্মশালায় এসে উঠেছিল। সঙ্গে একটা ছেলেও ছিল। তারপর হঠাৎ কি সন্দেহ হওয়াতে

পুলিস তাদের ধরে নিয়ে হাজতে রাখে। তারপর খবর পেয়ে বাংলা দেশ থেকে মেয়ের বাপ এসে মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।

ডাক্তার রামপাল সিং বলেছিলেন, আমি মশাই তিরিশ বছর প্র্যাক্টিস করছি এখানে, এ-রকম কেস্ যে কত দেখলুম, সব কটা বাঙালী মেয়ে।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, বাঙালীরা বড় রোমান্টিক, বড় এমোশন্যাল।

রামপাল সিং বললেন, তা বললে শুনব কেন মিস্টার ত্রিপাঠি, আমার কাছে মেডিক্যাল ক্যানভাসার মিস্টার দাস আসেন, দেখেছি ভারি হিসেবী, টি-এ বিল নিয়ে বেশ দর কষাকষি হয়, মিথ্যে টি-এ বিল করতে ওস্তাদ।

মিস্টার চৌহান এক মনে সিগারেট খাচ্ছিলেন। বললেন, তা হলেও বাঙালীদের মাথাটা খুব পরিষ্কার, অমন তলিয়ে বুঝতে ইণ্ডিয়ার কোনও জাত পারবে না।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, কিন্তু বড় আল্‌সে জাত, কিছুতে খেটে খাবে না। পরিশ্রমের নাম শুনলে পালাবে সেখান থেকে।

তারপর আরম্ভ হলো বাঙালী-নিন্দা। ইণ্ডিয়ার সব জাতের মধ্যে অমন অস্থির জাত আর দুটো নেই। কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না ওদের। অর্ডার মানতে চায় না। আর্মিতে মিলিটারি অফিসাররা কেউ বাঙালী আরদালী রাখতে চায় না। কথায় কথায় আর্মি-কোড দেখাবে। বেশী বুদ্ধির গলায় দড়ি! দেখছেন না কেবল ধর্মঘট লেগেই আছে কলকাতায়! বেঙ্গল নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টেরও মাথা-ব্যথা কম ছিল না, এখনও দিল্লীর মাথা ব্যথার শেষ নেই! দেখছেন না রাজাগোপালাচারী…

আলোচনা এতক্ষণ একতরফা চলছিল। হঠাৎ মিস্টার রামলিঙ্গম আয়ার বললেন, কিন্তু একটা গুণ আছে বাঙালীদের।

সবাই ফিরে চাইলেন মিস্টার আয়ারের দিকে। মিস্টার রামলিঙ্গম আয়ার এতদিন জয়পুর স্টেটের চীফ অ্যাকাউণ্টেণ্ট ছিলেন। রিটায়ার করে এখন এখানেই বাস করছেন। সত্যবাদী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলে সমাজে বেশ সুনাম আছে তাঁর। সবাই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কি গুণ?

মিস্টার আয়ার গম্ভীরভাবে বললেন, ওরাই হচ্ছে আসল প্রেমিক জাত।

কথাটা কারও যেন বিশ্বাস হলো না। বাঙালীরা প্রেমিকজাত কি না সে নিয়ে বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো মিস্টার আয়ারের কথা নিয়ে। মিস্টার রামলিঙ্গম আয়ারকে যাঁরা এতদিন দেখে আসছেন, তাঁরা তাকে জটিল অঙ্কবিদ বলেই জানেন। সকালবেলা কপালে তিলক কেটে সেই যে দরবারে গিয়ে নিজের দপ্তরের কাজ নিয়ে মেতে থাকতেন, বেরুতেন সেই সন্ধ্যের পর। যতদিন চাকরি করতেন কেউ বাইরের

সমাজে মিশতে দেখে নি তাঁকে! বড় কড়া লোক ছিলেন। হাসতেন কম, বকতেন বেশী। এখনও জরুরী দরকার পড়লে মহারাজা বিশেষ পরামর্শের জন্য মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান। আজকাল আজমীর শহর থেকে দূরে পাহাড়ের কোলে বাড়ি করেছেন। সপ্তাহে শুধু একবার করে সন্ধ্যাবেলা এসে বসেন ডাক্তার রামপাল সিংয়ের ডাক্তারখানায়। মিস্টার ত্রিপাঠি আসেন, মিস্টার চৌহান আসেন, মিস্টার জয়সূরিয়া আসেন। সবাই জয়পুর স্টেটের রিটায়ার্ড কর্মচারী। নানারকম আলাপ-আলোচনার পর আবার যে-যার বাড়িতে চলে যান। সপ্তাহে এই একটি দিন।

আজকেও আড্ডা যথারীতি শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সকলের ওঠবার পালা যখন, তখন হঠাৎ উঠল ধর্মশালার পালিয়ে-আসা বাঙালী মেয়েটার কথা। তাদের পুলিসে ধরার কাহিনী। তার বাপ-মায়ের ছুটে এসে মেয়েকে উদ্ধারের সংবাদ। সমস্ত।

মিস্টার চৌহান উঠতে যাচ্ছিলেন। মিস্টার আয়ারের কথা শুনে আবার বসে পড়লেন। বললেন, প্রেমিকের জাত কি আমরা নই? আমাদের জাতের বউরা যে মোগল আমলে জহর-ব্রত করেছে, তা কি প্রেম নয়?

মিস্টার আয়ার বললেন, তা করুক, কিন্তু তবু আপনারাও প্রেমিকের জাত নন। আমরাও নই মিস্টার চৌহান।

কেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, আমাদের দেশে শঙ্করাচার্য জন্মাতে পারেন, আপনাদের দেশে রাণা প্রতাপ সিংহ জন্মাতে পারেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

কিন্তু চৈতন্যদেব জন্মান শুধু বাংলা দেশেই। আর চণ্ডীদাসের মত পোয়েট শুধু বাংলা দেশের মতন মাটিতেই জন্মানো সম্ভব।

মিস্টার চৌহান বললেন, কিন্তু আমাদের দেশেও ভাট ছিলেন, তাঁরাও মস্ত কবি সব।

মিস্টার আয়ার বললেন, কোকোনাট তো সব দেশেই জন্মায়, কিন্তু আমাদের দেশের কোকোনাটেরই বা অত নাম কেন?

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তা বাংলা দেশের লোকরাই কি প্রেমিক বেশী?

মিস্টার আয়ার বললেন, হ্যাঁ, অন্ততঃ আমার তাই মত।

আপনি কি বই পড়ে বলছেন, না নিজে জানেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, বইও পড়েছি আর আমি নিজেও দেখেছি, আমি জানি।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, কি করে জানলেন? আপনি দেখেছেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

এবার সবাই অবাক হয়ে গেলেন। আগেও অনেক দিন অনেক রকম আলোচনা হয়েছে। এমন কোনও বিষয় নেই যা আলোচনা হয় না এ আড্ডায়। কিন্তু তার বেশীর ভাগই গম্ভীর আলোচনা। রাজনীতি, সমাজনীতি, অ্যাটমিক এনার্জি, হিস্ট্রি, মেটাফিজিক্স—এই সমস্ত বৈশেষিক দর্শন থেকে শুরু করে তত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত বিভাগ নিয়ে আলোচনা চলে। আর আছে ধর্ম উপনিষদ্ বেদ গীতা—সমস্ত।

কিন্তু আজ একেবারে অভাবনীয়ভাবে এক নতুন প্রসঙ্গ উঠে পড়েছে। একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রসঙ্গ।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, বলুন মিস্টার আয়ার, আপনার দেখা ঘটনা বলুন।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, হ্যাঁ, বলুন মিস্টার আয়ার, এখন তো বেশী রাত হয় নি।

সবাই ঘড়ির দিকে চাইলেন। রাত অনেক হয় নি বটে। দিল্লীর লাস্ট ট্রেনটা এখনই ছেড়ে গেল। গোল বাজারের অন্য দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আর সকলের বাড়ি অবশ্য কাছে। কিন্তু মিস্টার আয়ারকে অনেক দূর যেতে হবে। তার গাড়ির ড্রাইভারের কদিন অসুখ হয়েছে। তিনি আজ নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। তবু কি যে হলো! এই কজন বৃদ্ধের মনে হঠাৎ বুঝি বহুদিনের ফেলে-আসা যৌবনের গল্প শুনতে ইচ্ছে হলো। সবাই যেন আবার পুরনো দিনে ফিরে গেলেন।

মিস্টার আয়ার বললেন, আমি তখন আগ্রায়, নতুন এক চাকরিতে ঢুকেছি, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, তখন আমার বয়েস বোধ হয় কুড়ি কি বাইশ। চাকরি করি মেরিনা হোটেলে—মেরিনা হোটেল এখন আর নেই, সে হোটেল করে উঠে গেছে। কিন্তু তখনকার দিনে ওই হোটেলটাই ছিল সবচেয়ে কস্ট্‌লি। শুধু ইয়োরোপীয়ান টুরিস্টরাই ওখানেই এসে উঠত। আমি ছিলাম ম্যানেজার।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, ওই অত কম বয়সেই ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছিলেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, তারও একটা ইতিহাস আছে। হোটেলের মালিক ছিল রবিনসন্ সাহেব, আমার সঙ্গে আলাপ হয় ত্রিবেন্দ্রামে। আমার অঙ্ক কষা দেখে আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন। বছর দুয়েক চাকরি করেছিলাম অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে, তারপর ম্যানেজার যখন চাকরি থেকে রিটায়ার করলে তখন রবিনসন্ সাহেব আমাকে বসিয়ে দিলেন সেই চাকরিতে।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, একেবারে ম্যানেজার?

মিস্টার আয়ার বললেন, হাঁ, একেবারে ম্যানেজার, আর ওই কম বয়সে। আমি সাউথ ইণ্ডিয়ার লোক, আমরা তামিলিয়ান, ছেলেবেলা থেকে যেখানে মানুষ সে এক আজ পাড়াগাঁ, একেবারে অ্যারেবিয়ান সি-কোস্টের ধারে, কেবল কাজুবাদাম শুঁটকিমাছ আর নারিকেলের দেশ, সেখানে থেকে যে কেমন ভাবে ডাঙার দেশ আগ্রায় মেরিনা হোটেলের ম্যানেজার হয়ে গেলাম তা ভেবে আমার নিজেরও অবাক লাগল। মনে করুন সেই যুগে আমার মাইনে হলো দু শো টাকা!

ডাক্তার রামপাল সিং অবাক হয়ে গেলেন—দু শো টাকা! মানে আজকের দিনে হাজার টাকার সমান!

মিস্টার আয়ার বললেন, কিন্তু তা হলে কি হবে, আমার স্বপ্ন তখন দু হাজার টাকার।

মিস্টার চৌহান বললেন, আপনি বুঝি ছেলেবেলা থেকেই আত্মবিশ্বাস?

মিস্টার আয়ার বললেন, শুধু আমি নয়, আমাদের দেশের প্রত্যেকটি লোক আত্মবিশ্বাস্। আমরা প্লেন-লিভিং-এর ভক্ত বটে কিন্তু হাই থিঙ্কিং আমাদের জাতের মজ্জাগত। শঙ্করাচার্যদেব জন্মেছেন আমাদের দেশে, তাঁর নামই শুধু আপনারা জানেন, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই শঙ্করাচার্যের এক-একটা ছোট সংস্করণ। কিন্তু বাংলা দেশ থেকে চৈতন্যদেব এসে যেমন শঙ্করাচার্যের সব মত একদিন রসাতলে তলিয়ে দিলেন, তেমনি আমারও সব ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়ে গেলো একজোড়া বাঙালী। একজন ছেলে আর একটি মেয়ে—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তাতে আপনার ক্ষতি হলো বলতে চান?

মিস্টার আয়ার বললেন, ক্ষতি?

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ক্ষতি কে কার করতে পারে বলুন মিস্টার ত্রিপাঠি, শঙ্করাচার্যের-ই কি কিছু ক্ষতি করতে পেরেছেন চৈতন্যদেব? আমি ম্যাথামেটিশিয়ান, আমি ফরমুলায় বিশ্বাসী—ফরমুলার বাঁধন থেকে যে মুক্তি পেলাম সেদিন, সেইজন্যে সেই ছেলেটা আর মেয়েটাই বলতে গেলে দায়ী।

তার মানে?

মিস্টার আয়ার বললেন, সেইটেই হলো আমার গল্প—গল্পটা বললেই মানে বুঝতে পারবেন আপনারা।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তারা ম্যারেড, না আনম্যারেড?

মিস্টার আয়ার বললেন, সে কথাটা বলবার আগে, আমার নিজের কথাও কিছু বলতে হবে। কারণ এটা বাঙালী ছেলেমেয়ের গল্প হলেও আসলে আমারই গল্প।

তারা কেবল উপলক্ষ্য, লক্ষ্য আমিই। তারা থিওরি, আমি একজাম্পল্। তারা রুল আর আমি রুল-অব-থাম্ব—

তারপর একটু থেমে বললেন, সুতরাং আমার কথাই আগে বলতে হবে।

বলে খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন মিস্টার আয়ার। আজমীরের গোলবাজারের সব দোকান তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আজমীর-শরিফের দিকের চওড়া কংক্রীটের রাস্তায় আর ফেরিওয়ালার ভিড় নেই। মেলা উপলক্ষে যেসব বাঈজী এসে দোতলার ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছিল তারাও বেশীর ভাগ আবার যে-যার দেশে চলে গেছে। সুতরাং এ-পাড়া এখন নিস্তব্ধ। মিস্টার আয়ার এতদিন এ-দেশে আছেন তবু এমন ধরনের গল্প কোনও দিন বলেন নি। এমন আলোচনাও ওঠে নি আগে। মিস্টার ত্রিপাঠি সকাল-সকালই রোজ উঠে পড়েন। মিস্টার চৌহানকেও সকালবেলা মর্নিং ওয়াক্ করতে হয় রোজ। তাই, বেশী রাত করায় তিনিও পক্ষপাতী নন। মিস্টার রামলিঙ্গম আয়ারও বরাবর সব কাজে নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে চলেন। আর সকলেরই বয়েস হয়েছে। সুতরাং দেরি করে আড্ডা দেবার কারোর-ই মেজাজ নয়। কিন্তু আজ সবাই নিয়ম-নিষ্ঠার কথা ভুলে গেলেন। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে মিস্টার আয়ারের গল্প শুনতে লাগলেন।

মিস্টার আয়ার বললেন, আপনারা সবাই জানেন আমি কি রকম স্ট্রিক্ট প্রিন্সি-পলের লোক! এ শুধু আজ নয়, প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ছেলেবেলা থেকেই ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস আমার, উঠে পুজো করি, বাড়ির সামনে নিজের হাতে আলপনা আঁকি, স্নান করি, কপালে তিলক কাটি, বরাবর নিরামিষ আহার করি—এমনি বরাবর। হোটেলে চাকরি করেও এর ব্যতিক্রম হয় নি কোনও দিন। ইউরোপিয়ান হোটেল, আর আমি তার ম্যানেজার—খাওয়া-দাওয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থাও সেখানে। মদ আছে সব রকম, সব রকমের মাছ মাংস—সুতরাং যদি আমার ইচ্ছে হতো সব রকম বিলাসিতারই প্রশ্রয় দিতে পারতাম আমি। কিন্তু কোনও দিন তা করি নি। আজীবন নিরামিষ খেয়ে এসেছি, আজীবন পুজো-জপ-তপ করে এসেছি, মনপ্রাণ দিয়ে চাকরি করে এসেছি, আর ফরমূলা দিয়েই জীবন-জীবিকা সমস্ত কিছুর বিচার করে এসেছি।

তারপর একটু থেমে নিয়ে বললেন, কিন্তু একদিন তার ব্যতিক্রম হলো, এই সত্তর বছরের জীবনে মাত্র একদিন বে-হিসেব করে ফেললাম, একদিনের জন্যে কেবল আমার পদস্খলন হলো—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, আপনারও পদস্খলন হলো?

মিস্টার চৌহানেরও যেন বিশ্বাস হলো না। বললেন, বলেন কি, আপনার ?

হ্যাঁ, পদস্খলন হলো আমার।

বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর নিজেই বললেন, হ্যাঁ, আমার পদস্খলনই হলো। কিন্তু হলো ওই একটা বাঙালী ছেলে আর একটি বাঙালী মেয়ের জন্যে—আর কারো জন্যে নয়। তারা এসে উঠেছিল মেরিনা হোটেলের সতেরো নম্বর ঘরে—

এবার কেউ-ই কোনও রকম প্রশ্ন করলেন না। প্রশ্ন করে গল্পের গতিকে আঘাত করতে আর ইচ্ছে হলো না কারও।

মিস্টার আয়ার বলতে লাগলেন, তার জন্যে অবশ্য আমি অনুতাপ করি সারা জীবন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুতাপ করব। কিন্তু ওই একটি মাত্র দিন, ওই মাত্র একটি বার, আর কখনও নয়—

মিস্টার আয়ার আবার বলতে শুরু করলেন, আমার তখন প্রায় তিন বছর চাকরি হয়ে গেছে। তেইশ বছর বয়েস। ম্যানেজার হিসেবে আমার খুব নামও হয়েছে। রবিন্‌সন্‌ সাহেবের লোক আমি, আর আমার কাজকর্মও খুব ভাল, সুতরাং বলতে গেলে হোটেল আমিই চালাই—আমিই সব কণ্ট্রোল করি, আমার কথাতেই ওঠে বসে সব স্টাফ। আগ্রায় তখন ওইটেই বেস্ট হোটেল, সবচেয়ে কস্ট্‌লি হোটেল। যত রকমের আরাম চান ওখানে পাবেন। শীতকালে গরম জল পাবেন, গ্রীষ্মকালে বরফ পাবেন, আট কোর্সের ডিনার লাঞ্চ পাবেন, নানা রকমের নানা দেশের ড্রিঙ্ক্‌স্‌ পাবেন, টাকা ফেললে কিছু পেতে আর বাকি থাকবে না আপনার। একাত্তরটা রুম নিয়ে হোটেলের কারবার, সবসময়েই ভর্তি থাকে। নানান দেশের লোকজন আসে। পৃথিবীর সব দেশের টুরিস্ট। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ। তারা বিশেষ করে তাজমহল দেখতেই আসে, তারপর আশেপাশের অন্য টুম্ব্‌সও দেখে, আবার একদিন হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে যায়। ফরেনার ছাড়া অন্য জাতের লোকও আসে—মাদ্রাজী, ভাটিয়া, গুজরাটী, পাঞ্জাবী। তারাও তাজমহল দেখে। পূর্ণিমার রাতেই ভিজিটার্স বেশী হয়। এসে হোটেলে ওঠে, টাঙ্গা-ভাড়া করে, ট্যাক্সি ভাড়া করে, সমস্ত দিন তারা দেখে বেড়ায়, ফতেপুর-সিক্রি যায়, তারপর একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার যে-যার দেশে চলে যায়। আমার তখন সমস্ত দেখা হয়ে গেছে। যা-যা দেখতে লোক আগ্রায় আসে তা সব দেখা হয়ে গেছে। ফতেপুরসিক্রি দেখেছি। বাদশা আকবরের রাজধানী দেখে মনে কী হয়েছে তা আপনাদের না বললেও চলবে। অন্য লোকেরা

হয়তো বাদশার ঐশ্বর্যের বহর দেখে তারিফ করেছে, আমি পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স আর টাকা-আনা-পাই দিয়ে সব বিচার করেছি। ভেবেছি এত টাকা খরচ করে এত বড় বিলাসিতা করবার কি দরকার ছিল! তাজমহল দেখে যখন সবাই সাজাহানের এস্থেটিক সেন্সের প্রশংসা করেছে, আমি আমার ফরমুলা দিয়ে তা পয়সা-নষ্টের স্বাক্ষর ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারি নি। আমি ভেবেছি একটু রঙ-চঙ কম হলে কি এমন ক্ষতি হতো! একটু গ্রান্‌জার কম হলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। তাজমহল আমার কাছে একটা শ্বেত-পাথরের কবরখানা ছাড়া আর কিছুই বলে মনে হতো না। মোগল-সম্রাটের বিলাসিতার বহর দেখে বরং ঘৃণাই হয়েছে বরাবর। আমি বরাবর টাকাকে টাকা বলে ভেবেছি আর টাকার মূল্যে কেনা বিলাসিতাকে টাকা অপচয়ের নামান্তর বলেই ভেবে এসেছি। অন্ততঃ আমার দেশে আমি যেমন ভাবে মানুষ হয়েছি, সেই ভাবেই আমার ভাবনার ডেভলপমেণ্ট হয়েছে, সেই ভাবেই আমি জীবন কাটিয়েছি, এবং এখনও পর্যন্ত আমি সেই ধারণা নিয়েই চলেছি এবং সেই ধারণা ঠিক বলে এখনও বিশ্বাস করি। আমার কাছে বিয়ে করাটা একটা প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক ফার্দিংও নয়। টাকার মত জীবনে বিয়ে করাটাও প্রয়োজন, এ-ই আমি বিশ্বাস করি। আর এও সত্যি যে বিয়ে না করলেও চলে, কিন্তু টাকা না হলে চলেই না। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে নিশ্চয় আপনারা একমত! শুধু আপনারা কেন, ভারতবর্ষের যত জাত আছে সবাই তাই বিশ্বাস করে। গুজরাটী, পাঞ্জাবী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী—সবাই। এক বোধ হয় বাঙালীরাই এ বিষয়ে আলাদা। তাই বাঙালীরাই দেখতাম তাজমহল নিয়ে বেশী হা হুতাশ করত। তাজমহলের পেছনে প্রেমের যে করুণ ইতিহাস আছে তা বাঙালীদের যেমন অভিভূত করত, আর কোনও জাতকে তা করতে দেখি নি। পোয়েট টেগোর শুনেছি নাকি তাজমহল নিয়ে বিরাট একটা পদ্যই ফেঁদেছেন। কি জানি, পোয়েট্রি আমি বিশেষ পড়ি না, পোয়েট্রি পড়ে আমি তেমন রস কখনও পাই নি। আমি তার চেয়ে বেশী রস পেয়েছি ক্যালকুলাস কষে, বেশী আনন্দ পেয়েছি ফরমূলা বার করে। কিন্তু একদিন—শুধু এক রাতের জন্য আমার এ মত বদলে গিয়েছিল। একদিনের জন্য আমি মতিভ্রষ্ট হয়েছিলাম, একদিনের জন্যে আমার পদস্খলন হয়েছিল। আর তার জন্যে দায়ী ওই একটি বাঙালী ছেলে আর একটি বাঙালী মেয়ে। তারা আগ্রায় এসেছিল তাজমহল দেখতে, আর মেরিনা হোটেলের সতেরো নম্বর ঘরেই তারা উঠেছিল—

মিস্টার আয়ার আবার চ লাগলেন, এ যেন অনেকটা সেই মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ লেখার মতন। আমি সেদিন যথানিয়মে সকালবেলাই অফিসে গিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছি। তুফান মেল আগ্রা সিটি স্টেশনে বেলা এগারোটার সময় পৌঁছয়। কলকাতা থেকে বহু টুরিস্ট ওই ট্রেনেই আসে। আমাদের হোটেলের লোক স্টেশনে গিয়ে প্যাসেঞ্জার ধরতে যায়। কার্ড নিয়ে মতিলাল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একপাল টুরিস্ট এনে ছেড়ে দেয় আমার হেপাজতে। আমি তাদের ঘরে ঘরে স্থিতি করে দিই, সুখ-সুবিধে দেখি। কার কটা লাঞ্চ, কটা ব্রেকফাস্ট, কটা ডিনার—কে কত টব গরম জল ব্যবহার করলে, কে কটা আফটারনুন টী খেলে, সব আমার অফিসের খাতায় লেখা হয়ে যায়। তারপর যাবার সময় হিসেব মিলিয়ে দিই, টাকার পাওনা বুঝে নিই। তখন তারা আবার টাঙ্গায় উঠে চলে যায়। কেউ যায় দিল্লী, কেউ মথুরা, কেউ কলকাতা, কেউ জয়পুর, রাজস্থান, মাউণ্ট্ আবু। বয়েস তখন আমার কম হলে কী হবে, সবগুলো গাইড-বুক তখন পড়ে মুখস্থ করে নিয়েছি। টপ করে কোনও টুরিস্ট যদি জিজ্ঞেস করে, আগ্রায় দেখবার কী কী আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমায় সব জবাব দিতে হয়। বলি—তাজমহল। কাউকে কাউকে গল্পটাও বলি। একদিন বাদশা আর বেগম শতরঞ্চ খেলছিলেন। হঠাৎ মমতাজমহল জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা সম্রাট, আমি যদি আগে মরি তুমি আমার জন্যে কী করবে? সম্রাট সাজাহান বলেছিলেন—যদি তেমন দুর্ঘটনাই ঘটে তো তোমার স্মৃতিরক্ষার জন্যে এমন কিছু করব, যা পৃথিবী অবাক-বিস্ময়ে চিরকাল দেখবে। আরও বলি সিকান্দ্রার কথা। ছ মাইল দূরে লাহোর আর দিল্লীর রাস্তার ওপর বাদশা আকবরের সমাধি। আকবর নিজেই আরম্ভ করেন এটা, কিন্তু শেষ করেন জাহাঙ্গীর। ভেতরে আকবরের সমাধি ছাড়াও আছে আকবরের মেয়ে আরামবাণুর কবর আর আছে জাহাঙ্গীরের ছয় মাসের এক মেয়ের কবর। আরও আছে ইৎমদ্-উ-দ্দৌলা, নুরজাহানের বাবার কবর। আরও আছে আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুরসিক্রি। ফতেপুরসিক্রির লম্বা লিস্ট্ আমার মুখস্থ ছিল। বুলান্দ দরোয়াজা, হামাম, আকবরের তুর্কী বেগমের কামরা, দেওয়ান-ই-আম, মেয়েদের নিয়ে দশ-পঁচিশ খেলার যায়গা, হিরণ-মিনার, তেরো মুহুরী, যোধাবাঈয়ের গুরুর মন্দির, মরিয়ম বেগমের ঘর, সেলিম চিস্তির কবর—গড় গড় করে মুখস্থ বলে যেতাম সব। বেশ রঙ চড়িয়ে সব বর্ণনা দিতাম, যাতে আরও টুরিস্ট্ আসে, হোটেলের আরও আয় হয়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তুফান-মেলে অন্য যাত্রীর সঙ্গে এসে হাজির হল একটি ছেলে

আর একটি মেয়ে। ছেলেটি সাড়ে পাচ ফুট লম্বা আর মেয়েটিও বেশ সুন্দরী। আমাদের হোটেলের এজেন্ট মতিলাল আমার অফিসে এনে হাজির করল তাদের।

মতিলাল বললে, এঁরা তিন দিন থাকবেন, তিন দিন তাজমহল দেখে চলে যাবেন।

বললাম, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

ছেলেটি বললে, কলকাতা।

বুঝলাম বাঙালী। মেয়েটিও বাঙালী। ভারি স্মার্ট দুজনে। সঙ্গে শুধু একটা সুটকেস। আর কিছু নেই। এমন যাত্রী আগেও এসেছে, এতে তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। আসে, তিন-চার দিন থাকে, তারপর চলে যায়। আগ্রাতে তিন-চার দিনের বেশী দেখবার মত কিছু নেই। ছেলেটির গায়ে দামী সুট। মুখে সিগরেট। চোখে যেন বিদ্যুৎ জ্বলছে। আমার অফিসে দুজনেই দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল। সীট্ রেণ্ট নিয়ে কথা হল। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কথা হল।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তিন দিন থাকবেন, না, আরও বেশিদিন থাকবেন?

মেয়েটি এবার কথা বললে—যেমন চেহারা তেমনি সুন্দর গলার স্বর। মাথার খোঁপায় একটা গোলাপ ফুল। বললে, তিন দিনের বেশী থাকবার মত জিনিস আছে নাকি আগ্রায়?

বললাম, আছে বইকি! ফতেপুরসিক্রি দেখতেই তো একটা দিন লাগে, ভাল করে দেখতে হলে। আর তা ছাড়া ইৎমদ্-উ-দ্দৌলা আছে, সিকান্দ্রা আছে, আগ্রা ফোর্ট আছে আর তাজমহল তো আছেই, আর তাজমহল রোজ দেখেও তো ফুরোয় না।—বলে আমার লম্বা মুখস্থ ফর্দ বলে গেলাম। কোথাকার কী ইতিহাস, কোথাকার কী রোম্যান্স, কোথায় কী কী ঘটনা ঘটেছে। ইতিহাস আর গাইড-বুকের মুখস্থ-করা বুলি সব।

বললাম, বসুন না।

সামনের চেয়ারে দুজনেই বসল। কাল রাত্রে কলকাতা থেকে ট্রেনে উঠেছে আর এখন বেলা বারোটা। সারা রাত ট্রেনে কাটিয়েও যেন শরীরে তাদের কোনও গ্লানি নেই। বেশ তাজা ভাব। বোধ হয় ট্রেনেই স্নান, খাওয়া, টয়লেট সবই সেরে নিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে নেমেছে একেবারে।

আবার বললাম, আজ পূর্ণিমা তো, আজ রাত্রে তাজমহলটা দেখে আসুন।

মেয়েটি যেন কী ভাবল। একটু দ্বিধা করতে লাগল বুঝি। বললে, আজ পূর্ণিমা?

বললাম, হ্যাঁ, আজই তো পূর্ণিমা, সেই জন্যেই তো হোটেলে এত ভিজিটার্সের ভিড়—

মেয়েটি যেন ভয় পেলে। বললে, খুব ভিড় আপনাদের হোটেলে ?

বললাম ভিড় একটু আছে, তা আমাদের হোটেলটাই তো এখানকার মধ্যে বেস্ট কিনা, তাই যাঁরা একটু কমফর্ট চান তাঁরা আমাদের এখানেই ওঠেন, আমাদের খাওয়া একদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন—

ছেলেটি হঠাৎ বললে, আমরা তো খেতে আসি নি এখানে।

মেয়েটিও বললে, হ্যাঁ, খাবার জন্যে আমরা গাড়ি ভাড়া খরচ করে কলকাতা থেকে এতদূরে আসি নি।

ছেলেটি বললে, আসলে আমরা এসেছি তাজমহল দেখতে।

মেয়েটি এবার বললে, তাজমহলের জন্যেই আপনাদের হোটেলে ওঠা, হয়তো দিনের বেলা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেব। যেখানে হয়। আমার খাওয়ার সম্বন্ধে অত বাছ-বিচার নেই।

ছেলেটি বললে, আমারও নেই, শুধু শেষরাত্রে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্যেই হোটেলে আশ্রয় নেওয়া আর কি।

মেয়েটি বললে, নিশ্চয়, খাওয়া-থাকার জন্যে তো কলকাতাতে বাড়ি-ঘর রয়েছেই। তার জন্যে এতদূর কষ্ট করে আসব কেন ?

ছেলেটি বললে, দেখুন মিস্টার ম্যানেজার, আমাদের খাওয়ার জন্যে ভাববেন না, আমরা এখনও ইয়াং, সে সব ভাববেন বুড়োদের জন্যে, আপনি আমাদের একটা উপকার করে দেবেন ?

উদ্‌গ্রীব হয়ে বললাম, কী ?

মেয়েটি হঠাৎ বললে, আমাদের ঘরে কিন্তু অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম থাকা চাই।

বললাম, মেরিনা হোটেলে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না—আপনাদের যা-কিছু দরকার সব আমাকে জানাবেন, ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন।

মেয়েটি বললে, একটু নিরিবিলি হবে তো ?

বললাম, আপনাদের জন্যে আমি সতেরো নম্বর রুম ঠিক করেছি, কোনও অসুবিধে হবে না সেখানে, দেখবেন—

তারপর বললাম, বেশী দিন থাকলে আপনাদের কিছু কনশেসন্‌ করা যেত—

ছেলেটি বললে, বেশী দিন থাকবার উপায় নেই—মাত্র পাঁচ দিনের ছুটি।

মেয়েটি বললে, আমারও কলেজ খুলবে তেরো তারিখে।

বললাম, তা হলে ফতেপুরসিক্রি দেখবেন না ?

মেয়েটি বললে, না।

ছেলেটিও বললে, না। আমরা তাজমহল দেখতেই এসেছি, তাজমহল দেখবার আমাদের দুজনের বহু দিনের সাধ, কিন্তু কিছুতেই আর সুযোগ হচ্ছিল না।

মেয়েটিও বললে, আমরা ঘুরে ফিরে কেবল তাজমহলই দেখব, সেই রকম ঠিক করেই এসেছি, ভোরবেলা দেখব, সকালবেলা দেখব, সন্ধ্যাবেলা দেখব, রাত্রিতে দেখব, অন্ধকারেও দেখব, চাঁদের আলোতেও দেখব, এ আমাদের দুজনের বহু দিনের সাধ।

বললাম, সিকিন্দ্রা ? বাদশা আকবরের সমাধি ?

মেয়েটি বললে, না।

বললাম, ইৎমদ্-উ-দ্দৌলা ?

মেয়েটি বললে, না মশাই, না। তাজমহল দেখলেই আমাদের সব দেখা হয়ে যাবে।

মিস্টার আয়ার বললেন, ভাবুন বাঙালীদের কী অদ্ভুত ধারণা ! ওরা প্রেম ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আরও অনেক বাঙালী বোর্ডার রয়েছে তো, প্রায় সকলেই ওই এক রকম। তাজমহল বলতে অজ্ঞান। কতবার দেখেছি, বাঙালীরা এসেছে হোটেলে, ঘুরে ফিরে কেবল তাজমহলই দেখেছে। ক্লান্তি নেই, তৃপ্তিও নেই। এক অদ্ভুত জাত। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইংলিশ, মারোয়াড়ী, গুজরাটি, ভাটিয়া সবাই এসেছে। তারা দেখতে হয় দেখেছে, আর্কিটেক্‌চার বিচার করেছে, কত খরচ হয়েছে তৈরি করতে তার হিসেব করেছে—কিন্তু এত বাড়াবাড়ি কেউ করে নি।

তা সেই রকম ব্যবস্থাই হল !

ছেলেটি বললে, একটা বিশ্বাসী টাঙ্গাওয়ালা যোগাড় করে দিন, আমরা তিন দিন থাকব, তিন দিনই সে আমাদের ঘোরাবে, নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে—

বললাম, একটা টাঙ্গাতেই চড়বেন ?

ছেলেটি বললে হ্যাঁ, কত নেবে ?

মেয়েটি বললে, আজ এই এখন খেয়ে-দেয়ে বেরোব, ধরুন রাত আটটার সময় ফিরব, তারপর খেয়ে-দেয়ে আবার বেরোব, তারপর পূর্ণিমায় তাজ দেখে ফিরে আসব রাত বারোটার সময়, তারপর কাল ভোর পাঁচটায় আবার বেরোব, এমনি করে পরশু দিন সন্ধ্যের গাড়িতে আমরা চলে যাব।

একটা টাঙ্গাওয়ালা ডেকে সব বন্দোবস্ত করে দিলাম। পনের টাকা করে রোজ

নেবে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। তিন দিনে পঁয়তাল্লিশ টাকা। ছেলেটি পনের টাকা অ্যাডভান্সও দিয়ে দিলে তাকে। বললে, ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন, আমরা খেয়ে-দেয়ে এখুনি বেরোব।

মিস্টার আয়ার বললেন, তখনকার মত এই তো হলো—তারপর সতেরো নম্বর ঘরে ওদের রাখিয়ে দিয়ে আমি নিজের কাজ করতে লাগলাম—

মিস্টার চৌহান বললেন, তারপর?

মিস্টার আয়ার বললেন, রাত বোধ হয় অনেক হলো।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তা হোক, গল্প শেষ না করে আজকে আপনাকে ছাড়ছি না।

মিস্টার আয়ার বললেন, আপনাদের তো গোড়াতেই বলেছি, এ আমার পদস্খলনের কাহিনী আমার অধঃপতনের কাহিনী, এক মুহূর্তের জন্যে হলেও বটে, এক রাত্রের জন্য হলেও বটে। আর সারা জীবন তার জন্যে আমি অনুতাপ করি। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি বাঙালীদের কখনও কোনও চাকরি দিই নি কেন? আমি কখনও উত্তর দিই নি বটে, কিন্তু মেরিনা হোটেলের সেই ঘটনাটাই তার একমাত্র কারণ। জয়পুর স্টেটে যখন ছিলাম তখন বহু জাতের লোককে চাকরি করে দিয়েছি আমার অফিসে কিন্তু বাঙালীকে কখনও চাকরি করে দিই নি। আমার মনে সেই দিনের সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনাটার জন্যে কেমন একটা পাপ-বোধ পোষণ করছি আজও—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তারপর?

মিস্টার আয়ার বললেন, তারপর আর কি! তারপর আমি ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম কাজের চাপে। সন্ধ্যেবেলা টাঙ্গাওয়ালাকে দেখে ওদের দু'জনের কথা মনে পড়ল। হোটেলের সামনে তখনও সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে টাঙ্গা নিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, সাহেবকে তাজমহল দেখিয়েছ?

টাঙ্গাওয়ালা বললে, না হুজুর, সাহেব তো এখনও ঘর থেকে বেরোয় নি।

সে কি! তখুনি তো তাজমহল দেখতে যাবার কথা ছিল। আর এখন তো সন্ধ্যে হয়ে এল!

বললাম, দাঁড়াও একটু, সাহেব সারারাত ট্রেনে এসে বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা নিয়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

নিজের ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন বারান্দা দিয়ে বাইরে চাইলাম, দেখি টাঙ্গাওয়ালা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

বেয়ারাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা বললে, সতেরো নম্বর রুমে বিকেলের চা টোস্ট পাঠানো হয়েছিল, রাত্রের ডিনারও পাঠানো হয়েছে এখন।

বললাম, জিজ্ঞেস কর, টাঙ্গা কি দাঁড়িয়ে থাকবে?

বেয়ারা জিজ্ঞেস করে এসে বললে, সাহেব বলেছে—টাঙ্গা এখন ফিরে যাক, কাল ভোর পাঁচটার সময় এসে যেন তৈরি থাকে, তখন সাহেব তাজমহল দেখতে যাবে।

টাঙ্গাওয়ালাকে সেই কথা বলে দিলাম। ভোর পাঁচটার সময় সে যেন টাঙ্গা নিয়ে হাজির থাকে, একটুও যেন দেরি না হয়।

টাঙ্গাওয়ালা চলে গেল। আমিও শুতে গেলাম আমার ঘরে।

তার পরদিন যথানিয়মে ভোরবেলা চারটের সময় উঠেছি। পুজো করেছি, কপালে তিলক কেটেছি। তারপর অফিসে এসে বসেছি খাওয়া-দাওয়া করে। হঠাৎ দেখি টাঙ্গাওয়ালা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, সাহেবকে তাজমহল দেখালে?

টাঙ্গাওয়ালা বললে, সাহেব তো যায়নি হুজুর, আমি ভোর পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

এবার আমিও অবাক হয়ে গেলাম। তবে কি ঘুমিয়ে পড়েছে দুজনে? ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙেনি? কিন্তু ভোরবেলা ডেকে দেবার ব্যবস্থাও তো ঠিক ছিল। বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম। বেয়ারা বললে, চা ব্রেকফাস্ট ঘরেই দিয়ে এসেছে সকালবেলা—

বেয়ারা বললে, সাহেব বলেছে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে, টাঙ্গাওয়ালা যেন দাঁড়িয়ে থাকে।

টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম, আর একটু দাঁড়াও, সাহেব খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা যাবে।

কিন্তু দুপুরবেলাও বেরোল না তারা। আমি খেয়ে নিলাম। টাঙ্গাওয়ালাও খেয়ে এল বাড়ি থেকে। অন্য সব বোর্ডার যারা বহু দূর দূর থেকে এসেছিল, তারা এক দিনে সব দেখা শেষ করে ফেললে। তাদের কেউ কেউ আগ্রা দেখা সেরে হোটেলের বিল চুকিয়ে চলেও গেল। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যেও হল। তবুও না। একবার সেই ফাঁকে—চায়ের ফরমাশ হল সতেরো নম্বরের ভেতর থেকে। চা গেল ভেতরে। দু দিন থেকে চা, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবই ভেতরে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা আর বাইরে আসে না। ভেতরেই কাটল ওদের দিন-রাত। বাইরে থেকে জানলা দরজা বন্ধ। শুধু খাবার দেবার সময় ওরা দরজা খুলে

দেয়, তারপরেই আবার বন্ধ। ক্রমে রাত হল। রাত্রে হয়তো তাজমহলে যেতে পারে, এই ভেবে তখনও গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল টাঙ্গাওয়ালা। রাত বারোটার সময় আস্তে আস্তে টাঙ্গাওয়ালা নিজের আস্তানায় চলে গেল। আমিও সারা দিনের কাজের পর বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুম এল না। মনে মনে যতবার অন্য চিন্তা করি ততবার ঘুরে ফিরে কেবল ওদের কথা মনে আসে। কে ওরা? ঘরে দরজা বন্ধ করে কী ওরা করছে? কেন এমন করে পয়সা নষ্ট করছে টাঙ্গা বসিয়ে রেখে? বলে দিলেই হয়, চায় না টাঙ্গা, টাঙ্গা তাদের দরকার নেই। তিরিশটা টাকা নষ্ট! ষোল আনায় যদি এক টাকা হয়, তা হলে তিনিশ টাকায় কত আনা! অঙ্ক দিয়ে বারবার জীবন মাপতে শিখেছি, ফরমুলা দিয়ে জীবন বিচার করতে শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। এমন বেহিসেব দেখে আমার যেন কেমন অবাক লাগল। এমন অপব্যয়! ঘণ্টা-মিনিটের সঙ্গে মিলিয়ে টাকা-আনা-পাইয়ের তারতম্য করতে শিখেছি আমি। তাই এমন বেচাল আমার ভাল লাগল না। নিজের অতীত, নিজের বর্তমান, নিজের ভবিষ্যৎ সমস্ত-কিছু সেই রাত্রে পরিক্রমা করেও এমন খেয়ালের কোনও তাৎপর্য বার করতে পারলাম না। এ কেমন করে হয়, এ কেমন করে সম্ভব! এমন তো কখনও দেখিনি, এমন তো কখনও কল্পনা করি নি! এ কোন্ জীবন! এ কোন্ দেশের মানুষ!

সমস্ত রাত আমার ঘুম এল না। সমস্ত রাত আমি বিছানায় এপাশ-পাশ করেছি। ভোর-রাত্রে টাঙ্গার শব্দে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, টাঙ্গা এসে দাঁড়িয়েছে। আজ পুরোদিন কাজ করলে পুরো পঁয়তাল্লিশ টাকাই ও পাবে বিনা পরিশ্রমে। বসে বসে।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম। তারপর আস্তে আস্তে চলতে চলতে কখন যে সতেরো নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি নিজেরই খেয়াল নেই। মনে হলো যেন ভেতরে জেগে আছে ওরা। মৃদু কথা শোনা যাচ্ছে ওদের। মৃদু নড়াচড়া। বোঝা যায় ভেতরে যারা আছে, তারা ঘুমিয়ে নয়—জেগে আছে।

আবার দিন এল। আবার দিনের কাজ আরম্ভ হলো হোটেলের। আবার নতুন বোর্ডার, নতুন মুখ। আবার টী ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনারের হিসেব। আবার সেই ফরমুলা। কিন্তু সেদিন যেন আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। রোজকার মত লেজার বই চেক্ করতে করতে যেন কিছুতেই আর হিসেব মেলে না। কিছুতেই ফরমুলা আর খাটে না। বার বার ভুল হতে লাগল। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে

পড়লাম। ছেলেবেলা থেকে হিসেব করে করে এত সুনাম আমার, রবিনসন্ সাহেবের এত করুণা, এই হোটেলের চাকরি, আর সামনে আরও প্রমোশন, সমস্ত যেন সেদিন মিথ্যে হয়ে গেল। মনে হলো, আমি কোন দূর এক দেশের ছেলে, কতদূর থেকে টাকার নেশায় এসেছি! সব মিথ্যে। মনে হল টাকাই সব নয়। ফরমুলাই সত্যি নয় শুধু। আরও কিছু আছে সংসারে, আরও কিছু সত্য। আরও কিছু মহত্ব।

সেদিন দুপুরবেলা ভেতর থেকে আবার লাঞ্চের অর্ডার এল। আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবার বিকেলবেলা টী, আটটার সময় ডিনার। ডিনারের পর বেরোল ওরা। একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হলো।

আমি ওদের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কোনও কথা বেরোল না। যেন ওদের দিকে ভাল করে চাইতে আমারই লজ্জা হলো।

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে, কি হলো মিস্টার ম্যানেজার, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

মেয়েটিও বললে, আপনাকে তো আর চেনা যাচ্ছে না একেবারে, কি হলো আপনার?

আমি কি বলব! আমার সমস্ত শরীর থর থর করে তখনও কাঁপছে। আমি যেন অচেতন হয়ে গেছি। আমার হৃৎস্পন্দন নেই, আমি মৃত, স্থির, নিশ্চল একেবারে।

মিস্টার চৌহান বললেন, তারপর?

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তারপর কি হলো বলুন মিস্টার আয়ার। তাজমহল দেখতে গেল তারা?

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তা একটা অ্যাস্পিরিন খেয়ে নিলেন না কেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, না ডাক্তার, অ্যাস্পিরিনে আমার কিছু হতো না তখন।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, নিশ্চয় হতো—অ্যাস্পিরিনে সব ঠিক হয়ে যেত।

মিস্টার চৌহান বললেন, অ্যাস্পিরিনের কথা থাক্। তারা কি করল তাই বলুন, তাজমহল দেখতে গেল?

মিস্টার আয়ার বললেন, আপনারা কল্পনা করুন তো কি করল তারা?

মিস্টার চৌহান বললেন, আর একদিন রইল হোটেলে?

মিস্টার আয়ার বললেন, না।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তবে কি তখুনি তাজমহল দেখতে গেল?

মিস্টার আয়ার বললেন, না, তাও না।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, আপনি যদি সেই তখন দুটো অ্যাস্পিরিনের পিল খেয়ে নিতেন, দেখতেন সব সেরে যেত—সারা রাত ঘুম হয় নি কিনা।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, ও-কথা থাক, তাদের তাজমহল দেখা হলো কিনা তাই বলুন, মিস্টার আয়ার।

মিস্টার আয়ার বললেন, তারা সেই টাঙ্গাতে চড়েই রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল। কিন্তু তারা তাজমহল দেখলে না কেন তা নিয়ে তখন আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই। কিংবা তিন দিন ধরে দরজা-বন্ধ ঘরের ভেতর আর এক নতুন তাজমহল তৈরি করেছিল কি না তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাই নি। তারা চলে যাবার পরই যেন আরও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, সারারাত ঘুম না হলে ও-রকম তো হবেই।

মিস্টার আয়ার বললেন, না, সে জন্যে নয়। আমার মনে হলো আমি যেন জীবনে কিছুই পাই নি। হোটেলের দু হাজার টাকা মাইনে, বিলিতী হোটেলের ম্যানেজারের পোস্ট, আজীবন অঙ্ক নিয়ে এত পরিশ্রম, সব আমার মিথ্যে। আমি প্রচণ্ড এক আঘাত পেলাম। আর সেই রাত্রেই আমার পদস্খলন হলো। জীবনে যা কখনও করি নি, তাই করলাম সেদিন—সেই রাত্রে।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, কি করলেন?

আজমীরের সদর-রাস্তায় সমস্ত নিস্তব্ধ। কয়েকটা কুকুর শুধু ময়লা নর্দমার ধারে ধারে ঘুরে চিৎকার করছে। শেষ ট্রেনে যাত্রীদের পৌঁছে দিয়ে টাঙ্গাগুলো এখন যে-যার আস্তানায় ফিরে গেছে। এত রাত পর্যন্ত কখনও ডাক্তার রামপাল সিংয়ের ডাক্তারখানা খোলা থাকে না।

মিস্টার আয়ার বললেন, মহাকবি বাল্মীকি কবে কোন্ যুগে একদিন এক ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ব্যথায় নাকি রামায়ণখানা লিখে ফেলেছিলেন শুনেছি। জানি না তিনি কোন দেশের মানুষ—তিনি বাঙালী ছিলেন কি না তাও জানি না। কিন্তু আমি আর এক কাণ্ড করলাম।

কী?

মিস্টার আয়ার বলতে লাগলেন, আমি চুপি চুপি সেই সতেরো নম্বর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তখন সামনের বারান্দা অন্ধকার, সকলের আড়ালে সেই ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখলাম। বিছানা বালিশ সমস্ত অগোছালো। শুধু একটা গোলাপফুল বিছানার ওপর পড়ে আছে। ফুলটা মেয়েটির খোঁপায় লাগানো ছিল

দেখেছি। সেদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ সেটা বড় সুন্দর মনে হলো। মনে হলো, লক্ষ লক্ষ টাকার চেয়েও যেন ফুলটা বেশী দামী, বেশী লোভনীয়।

তা সেদিন আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল নিশ্চয়ই। নইলে আমার অমন হবে কেন? আমি সেই শুকনো ফুলটা নিয়ে ঘরে এলুম। ঘরে এসে অন্যদিন নিজের জপ-তপ করি। সেদিন তাও করা হলো না। সেই ফুলটা একটা কাচের গ্লাসে রেখে সামনের চেয়ারে আমি বসলাম। তারপর হোটেলের লাইব্রেরি থেকে ফিট্‌জারেল্ডের 'ওমর খৈয়াম' বইখানা আনিয়ে নিলাম। তারপর চলল পড়া। জীবনে যা কখনও করি নি, তাই করলাম! সামনে সেই ফুল আর হাতে কাব্যগ্রন্থ। সমস্ত বইখানা শেষ করে ফেললাম সারা রাত্তির ধরে পড়ে। পড়তে পড়তে মনে হল, যেন সাজাহান আর মমতাজমহল আবার তিন শো বছর পরে নতুন করে জন্ম নিয়েছে এই পৃথিবীতে। এই হোটেলের সতেরো নম্বর ঘরে বুঝি আবার এক নতুন তাজমহল রচনা করে রেখে গেছে!...

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তারপর?

মিস্টার চৌহান বললেন, তারপর আপনার পদস্খলন হলো কী করে, বললেন না?

মিস্টার আয়ার বললেন, সে-কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারে নি। শুধু পরদিন হোটেলের খাতায় একটা ব্র্যাণ্ডির বোতলের হিসেব আর কিছুতেই মিলল না।

সুশ্রী সেন

লেখক জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, তাকে সারা জীবন ধরে লিখতে হবে এবং আজীবন ভালো লেখাই লিখতে হবে। একখানা ভালো বই লিখে থেমে গেলে চলবে না। একখানা ভালো বই লিখেছে বলে, পরের বইটা খারাপ লিখলেও কেউ তাকে ক্ষমা করবে না। শুধু ভালো লিখতে হবে তাই-ই নয়। আরো ভালো। আরো, আরো ভালো। উত্তরোত্তর ভালো।

এ-সব কথা আমার নয়। এত কথা আমি বুঝতাম না। এ-সব কথা আমাকে যে শিখিয়েছিল, তাকে আমার গল্পের মধ্যে কখনও টেনে আনিনি। আমার জীবনের শেষ গল্প আমি লিখবো হয়ত তাকে নিয়েই। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

কিন্তু কাকে নিয়ে 'কন্যাপক্ষ' সুরু করি!

অলকা পাল, সুধা সেন, মিষ্টিদিদি, মিছরি-বৌদি, আমার মাসিমা, কালোজামদিদি, মিলি মল্লিক—কার কথা ভালো করে জানি! কাকে ভালো করে চিনেছি! আমার জীবনের সঙ্গে কে জড়িয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে বেশি করে! ছোটবেলা থেকে কত জায়গায় তো ঘুরেছি! কত কিছু দেখেছি! সকলকে কি মনে রাখা সহজ! জব্বল পুরের সেই নেপিয়ার টাউন, বিলাসপুরের শনিচরী বাজার, কলকাতার সেই হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে মিষ্টিদিদির বাড়ি, পলাশপুরের মিলি মল্লিক—কত জায়গায় কত লোককে দেখলাম, আমার নোট-বইতে সকলের সব গল্প লিখে রাখিনি। শুধু দু'একটা টুকরো-টাকরা টুকি-টাকি স্কেচ্ সব, তাই নিয়েই এই 'কন্যাপক্ষ'।

সোনাদি বলতো, 'যা-কিছু দেখছিস টুকে রাখ্। আর্টিস্টরা যেমন স্কেচ্ করে খাতায়, তেমনি করে, তারপর যখন উপন্যাস লিখবি তখন কাজে লাগবে তোর।'

উপন্যাসের কাজে কোনদিন লাগবে কিনা জানি না, তবু অনেকদিন ধরে যেখানে যা-কিছু দেখেছি, তার কিছু কিছু লিখে রেখেছি। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর যেন এক-একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠেছি। এক-একজন মানুষ যেন এক-একটা তাজমহল। তেমনি সুন্দর, তেমনি বিস্ময়-মুখর, তেমনি অশ্রু-করুণ!

ইচ্ছে ছিল, একদিন একখানা উপন্যাস লিখবো। এমন উপন্যাস যে, পৃথিবীর সব মানুষ তাদের নিজের ছায়া দেখতে পাবে তাতে। অসংখ্য চরিত্রের শোভাযাত্রা। হাজার হাজার মানুষের মর্মকথা মুখর হয়ে উঠবে সে-উপন্যাসে। সে হবে দ্বিতীয় মহাভারত। সে আশা আমার সার্থক হয়নি জানি। হবেও না। তবু সোনাদি আশা দিতো, কেন পারবি না তুই, নিশ্চয় পারবি—নগদ পাওনার লোভ যদি ত্যাগ করতে পারিস, পুরুত হয়ে পুজোর নৈবিদ্যি যদি চুরি না করিস তো, একদিন দেবতার প্রসাদ পাবি তুই নিশ্চয়ই।'

মনে আছে, ছোটবেলায় একমাত্র সোনাদির কাছেই যা-কিছু উৎসাহ পেয়েছি। যখন লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে খাতার পাতা ভরিয়ে ফেলেছি, বাবা দেখতে পেয়ে রাগ করেছেন, বন্ধু-বান্ধবরাও ঠাট্টা করেছে—তখনও কিন্তু সোনাদি হাসেনি!

সোনাদি বলতো, 'মেয়েদের নিয়ে লেখাই শক্ত, মেয়েদেরই ভালো করে লক্ষ্য করবি। মেয়েরা যেন ঠিক মঙ্গলগ্রহের মতো, এত দূরে থাকে তবু তার সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কৌতূহলের আর শেষ নেই। মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুবার জন্যে কি মানুষের কম চেষ্টা, কম অধ্যবসায়! কিন্তু যদি কখনও পৌঁছুতে পারে সেখানে—'

জিগ্যেস করতাম, 'পৌছুলে কী দেখবে, সোনাদি ?'

'তা কি বলতে পারি। কেউ হয়তো ঠকবে, কেউ জিতবে। হারজিত নিয়েই তো জগৎ। কিন্তু যে-মানুষের দূরত্ব নেই, তার সম্বন্ধে কোনো মানুষের কোনো কৌতূহলও আর নেই। মেয়েদের রহস্যময়ী করে সৃষ্টি করার কারণই তো তাই—'

কিন্তু সুধা সেনকে যখন প্রথম দেখি তখন সত্যিই কোনো কৌতূহল, কোনো রহস্য আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই পরে যখন একদিন সুধা সেনের চিঠি পেলাম, সেদিন সত্যিই চমকে উঠেছিলাম।

মনে আছে সুধা সেনকে নিয়ে যেদিন প্রথম রাস্তায় বেরিয়েছিলাম নিজেরই কেমন লজ্জা হয়েছিল যেন। সুধা সেন এমন মেয়ে নয় যাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনো চলে।

ট্রাম-রাস্তার মোড়ে কারো সঙ্গে দেখা হয়, এটা ইচ্ছে ছিল না আমার সেদিন। সুধা সেন তেমন মেয়ে নয়, যাকে সঙ্গে করে বেড়ালে লোকের ঈর্ষার উদ্রেক করা যায়। বরং উল্‌টো। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন রোগা স্বাস্থ্যহীন কেমন করে হল ? কাঁধ-ঢাকা ব্লাউজের বাইরে হাত দুটোর যে অংশ নজরে পড়ে, সেখানে সৌন্দর্যের আভা কি যৌবনের মাধুর্য এতটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না! গলার দু'পাশে কণ্ঠার হাড় দুটো স্পষ্ট-উচ্চারিত উদ্ধত ভঙ্গিতে আত্মঘোষণা করে। চোখের যে-দৃষ্টি থাকলে অন্তত যুবতী বলে মনের নিভৃতেও একটু চাঞ্চল্য জাগে, তাও নেই তার।

সে-দৃশ্যটা আজো আমার মনে আছে। সুধা সেন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েই দাঁড়িয়েছে আমার বাঁ-পাশে। হাতে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগও আছে, পায়ে মাঝারি দামের স্যাণ্ডেলও আছে, হাতে চুড়িও আছে দু'গাছা করে। সিঁদুরের একটা টিপও দিয়েছে সুধা সেন দুটো ভুরুর মধ্যে। একটা জমকালো রঙিন শাড়িও পড়েছে। অর্থাৎ সাজবার দুর্দম স্পৃহা না থাক্, তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুধা সেন সেজেছে।

সুতরাং এমন একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে চলতে সেদিন লজ্জাই হচ্ছিল মনে আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থাতেই কি মোহিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হয়!

এড়ানো সম্ভব হলে হয়ত এড়িয়েই যেতাম। কিন্তু মোহিতই আমায় দেখে ফেলেছে। এগিয়ে এসে বললে, 'কী রে, কোথায় ?'

বললাম, 'একটা উপকার করতে পারো হে ?'

তারপর সুধা সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার বৌদির বিশেষ জানাশোনা, বড় মুশকিলে পড়েছেন। থাকবার একটা ঘরের বিশেষ দরকার।

মেয়েদের বোর্ডিং, না হয় মেস, যেখানে হোক। একেবারে যাকে বলে নিরাশ্রয়। একটা বাসার খবর দিতে পারো?'

মোহিত নানা কাজের মানুষ। নানা দরকারে নানা জায়গায় যেতে হয় তাকে। বার দুই সিগারেটে টান দিলে। কপাল কুঁচকে একবার ভাবলেও যেন। তারপর বললে, 'আপাতত তো কিছু মনে পড়ছে না ভাই, তবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ একবার চেষ্টা করে ছাখো না—'

চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি নেই। মোট কথা আজকের মধ্যে যেখানে হোক একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করতেই হবে। সুধা সেনকে আমারই হাতে ছেড়ে দিয়েছে বৌদি। সুধা সেনের একটা থাকবার ব্যবস্থা আজ না করলেই নয়। এই বিরাট কলকাতা শহরে সুধা সেন নাকি একেবারে সহায়হীনা। আজ রাতটুকুর জন্যেও মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই তার কোথাও।

সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলাম। ভারি অসহায় মনে হল তাকে! কে জানে এতদিন এই স্বাস্থ্য নিয়ে বি. এ. পাস করেছে কেমন করে, কেমন করে সাপ্লাই অফিসের অ্যাকাউন্টস্ সেক্সনে আশি টাকা মাইনের চাকরি করছে। পাড়াগাঁয়ে নাকি ছোটবেলায় মানুষ। ছোটবেলায় মানে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে দেশেই। বৌদি বলে, 'ভীষণ কিপ্‌টে মেয়েটা, কিছুতেই পয়সা খরচ করবে না, দিন ভোর শুধু সাত-আট বার চা খেয়েই কাটায়।'

ট্রাম এসে গিয়েছিল।

মোহিত বললে, 'হ্যাঁ, আর একটা জায়গা মনে পড়েছে, গোয়াবাগানে মেয়েদের একটা বোর্ডিং আছে, সেখানে একবার চেষ্টা করতে পারো, বোধ হয় জায়গা পেতেও পারো—'

ট্রামে উঠে পকেট থেকে নোট-বইটা বার করে ঠিকানাটা লিখে রাখলাম। কোথায় বালিগঞ্জ, কোথায় গোয়াবাগান, কোথায় হ্যারিসন রোড। শেষে যদি কোথাও জায়গা না মেলে তখন আমার কী কর্তব্য ভেবে পেলাম না। কিন্তু সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলে সত্যিই মায়া হয়।

বৌদি বলে, 'অফিসে একদিনও কিছু খাবে না, নেহাত যখন খুব খিদে পাবে তখন খালি এককাপ চা—তাই তো ওইরকম স্বাস্থ্য।'

একটা বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। জানলার দিক ঘেঁষে সুধা সেন বসেছিল।

বললাম, 'বৌদি বলছিল, আপনার এক ভাই থাকে কলকাতায়—'

সুধা সেন বললে, 'এক ভাই নয়, দু'ভাই—দু'জনে দু'বাসায় থাকে।'

'আপনার আপন ভাই? তা সেখানে তাদের কাছে কোনরকমে—'

সুধা সেন বাইরের দিকে চোখ রেখেই বললে, 'আমার টিউশানিটা যাবার পর থেকে তো ভায়েদের কাছেই আছি।'

'আপনি টিউশানি করতেন নাকি?'

সুধা সেন বললে, 'সেইখানেই তো এ ক'বছর কাটিয়েছি, আমার স্যুটকেসটা এখনও সেখানে সেই বাসাতেই পড়ে আছে। একটা ছোট ছেলেকে পড়াতে হত। তাঁরা নোটিস দিলেন। ছেলে বড় হয়েছে, এবার পুরুষ টিচারের কাছে পড়বে। লোক তাঁরা খুব ভালো। আমাকে এক মাসের নোটিস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,— এক মাসের মধ্যে কোথাও একটা বাসা-টাসা খুঁজে নিতে!'

'তারপর?'

'একটা মাস তো দেখতে দেখতে কেটে গেল। একখানা ঘর পাওয়া গেল না যে, তা নয়। কিন্তু মেয়েদের থাকার মতো সে-ঘর নয়। আর, এক-একজন যা ভাড়া চেয়ে বসলো! আমি তো আশি টাকা মাইনে পাই, তা থেকে দেশে মাকেই বা কী পাঠাই, আর নিজের খরচই বা কিসে চালাই!'

কল্পনা করলুম, সুধা সেন সারাদিন অফিসের চাকরি করে সকালে-সন্ধ্যেয় ছাত্র পড়িয়ে বাসা খুঁজতে বেরিয়েছে। শ্যামবাজার, বউবাজার, টালা আর টালিগঞ্জ। যেখানে এতটুকু পরিচয়ের সূত্র আছে সেখানেই সন্ধান নেওয়া। তারপর ট্রামের ভিড়। সে-ভিড়ে পুরুষ মানুষেরাই উঠতে পারে না তো সুধা সেন তো চেপ্‌টে যাবে! একটা আচমকা ধাক্কা খেয়েই তো উল্‌টে পড়বে রাস্তায়। হয়তো ধাক্কাও খেয়েছে অনেকদিন। সৌন্দর্যের আভিজাত্য থাকলে লোকে তবু একটু সম্ভ্রম সমীহ করে। খাতির করে। সুধা সেনের সে সুবিধেও নেই। এই তো সেদিন দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে যাবার সময় একজনের চোখের সান-গ্লাসটা ছিট্‌কে রাস্তায় চুরমার হয়ে গেল। কতবার রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে যে-সব অত্যাচার অপমান সইতে হয়েছে, সে-সব কি আর সুধা সেন মুখ ফুটে বলবে?

বললাম, 'ধরুন, আজ যদি কোনো ব্যবস্থা না হয়, তাহলে কী উপায়?

'তা হলে?—' বলে ভাবতে লাগলো সুধা সেন।

'আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন আমার। আপনি নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, আপনার বৌদির কাছে শুনেছি আপনার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে।'—সুধা সেন আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে।

লেডিস্ সীটে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মহিলা ওঠায় জায়গা ছেড়ে দাঁড়াতে হল। আমি যেন বাঁচলাম।

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছট্‌ফটে মেয়েটা। কেবল এ-অফিস থেকে সে অফিস করবে। কেবল কিসে উন্নতি করবে, বেশি টাকা জমাবে সেই ইচ্ছে—মোটে খাবে না কিছু, পয়সা যেন ওর গায়ের রক্ত।'

সুধা সেনের পাশে যে মেয়েটি এসে বসলো সে পাঞ্জাবী। সুধা সেন তার পাশে যেন এতটুকু বিন্দুবৎ হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি সুধা সেনকে দেখে মায়া হয় না, দুঃখ হয় না। হাসি পায়। সাপ্লাই অফিসের অন্য মেয়েদেরও তো দেখেছি। অনেক বিবাহিতা মহিলা, পাঁচ-ছ' ছেলের মা, অনেকেই তো চাকরি করে। আবার কারোর চাকরি করবার প্রয়োজন নেই, শুধু শখ, তাও দেখেছি। সাজগোজ পোশাক-পরিচ্ছদ, সেই পয়সায় সিনেমা থিয়েটার রেস্টুরেণ্ট সবই চলে। ধর্মতলার খাবারের দোকানটাতে দুপুরবেলা মেয়েদের ভিড়ে ঢোকাই যায় না। কিন্তু সুধা সেনের মতো মেয়ে সত্যিই দেখা যায়নি এর আগে। এত রোগা মেয়ে আগে নজরেও পড়েনি আমার। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন স্বাস্থ্যহীন কেমন করে হল। সুধা সেন যখন হাঁটে, তখন মনে হয় সে যেন তার কানের পাতলা দুটো দুলের মত টিকটিক করে দুলছে। হাঁটছে তাকে বলা চলে না ঠিক।

দু'জনের দুটো টিকিট আমিই কিনেছিলাম। কিন্তু সুধা সেনের সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। টিকিট কেনা হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন তার মনে উঠতে পারে না।

ধর্মতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নামতে হল। আর একটা ট্রামে উঠতে হবে এখানে।

শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে বললাম, 'কোথায় আগে যাবেন? গোয়াবাগানে, না পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ?'

সুধা সেন বললে, 'চলুন আগে শেয়ালদ'য়। আমার ছোড়দা ওখানে থাকে শুনেছি।'

বললাম, 'আর আপনার বড়দা? তিনি কোথায় থাকেন?

সুধা সেন বললে, 'সেই বড়দার বাড়িতেই তো রাত্রে শুই, কিন্তু সেখানেও রাত বারটার আগে ঢোকবার হুকুম নেই, তারপর ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে-থাকতে সকলের ঘুম থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে চলে আসতে হয়।'

'কেন?' সুধা সেনের কথা শুনে অবাক্ হবারই কথা।

সুধা সেন যা বললে, তা শুনে আরো অবাক্ হয়ে গেলাম। সুধার বড়দা ফড়েপুকুরে বিয়ে করে বউ নিয়ে সংসার পেতেছে। সেখানে থাকবার জায়গাও আছে বেশ। একখানা ঘর খালি পড়েই থাকে। ভারি ভালমানুষ কিন্তু বড়দা। কারো মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। কতদিন বড়দা সুধা সেনের অফিসে এসে আগে আগে খবর নিয়ে যেত। টাকার সাহায্য অবশ্য সুধা সেনের প্রয়োজন হয় না। তবু বৌদি কিছুতেই সুধা সেনকে সেখানে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু বড়দা খুব ভালোবাসে ছোট বোনকে। যখন বৌদি ঘুমিয়ে পড়ে, রাত বারটার পর বড়দা চুপি চুপি দরজা খুলে দিয়ে যায়। নিঃশব্দে, আলো না জেলে সুধা সেন তার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আবার সকালবেলাই সকলের আগে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে হয় রাস্তায়।

বললাম, 'তারপর স্নান খাওয়া, এসব ?'

সুধা সেন বললে, 'স্নানটা এতদিন ছোড়দার ওখানেই করতুম। বউবাজারে একটা মেস করে আছে ছোড়দারা কয়েকজন বন্ধু মিলে···ওরা এতদিন আপত্তি করে আসছিল। সকালবেলা সবাই অফিস যাবে, আর আমি তখন কলঘর জোড়া করে থাকি—সকলের বড় অসুবিধে হয়।'

বললাম, 'শোয়া, স্নান করা তো হল—এরপর খাওয়া ?'

'খাওয়ার আর ভাবনা কি ? না খেলেই হয় !' সুধা সেন হাসলে।

বৌদি ঠিকই বলেছে,—মেয়েটা ভারি কিপ্‌টে। কিছু খাবে না, খাবে কেবল চা। কাপের পর কাপ চা। নইলে খুব খিদে আছে। যদি খায় তো বড় জোর সিঙ্গাড়া, কচুরি নয় তো বেগুনি, ফুলুরি তেলেভাজা। এই তেলেভাজা খেয়েই এক-একদিন কাটিয়ে দেয় সুধা সেন। এক-একদিন স্রেফ কিছুই খায় না। প্রথম প্রথম নাকি কষ্ট হত সুধা সেনের, কিন্তু আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। বড়দার বাড়িতে রাত বারটার আগে ঢোকবার হুকুম নেই, অথচ অফিস ছুটি পাঁচটায়। এই সাত ঘণ্টা কাটাতেই বড় কষ্ট হয়। কার্জন পার্কের জনবহুল অংশটায় কাটানোই সবচেয়ে নিরাপদ। কিংবা ট্রামে চড়ে একবার ডালহৌসি আর একবার বালিগঞ্জ স্টেশনও করা যায়, কিন্তু অকারণে অনেকগুলো পয়সা খরচ। কার্জনপার্কের খোলা হাওয়ায় ঘাসের ওপর বসে দু'পয়সার চিনেবাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে পেটটাও ভরে, খোলা হাওয়া খাওয়াও হয়, আবার সময়টাও বিনা খরচে কাটানো যায়।

সুধা সেন বললে, 'বড়দা ছোড়দা কেউ মাকে টাকা পাঠায় না। সেখানে আমার একটা ছোট ভাই আছে, আমাকেই তার খরচ দিতে হয়।'

বড়দা নাকি বিয়ের আগে টাকা পাঠাতো। কিন্তু ইদানীং বৌদি বারণ করে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ির কোন লোককে দেখতে পারে না বৌদি। ছোড়দা তো দাদার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছে—সুধা সেন বাধ্য হয়েই রাত্রে যায় শুতে, নইলে বৌদি দেখতে পেলে বড়দাকে তো আর আস্ত রাখবে না।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়দার মেসটা ছিল এতদিন, তবু সকালবেলা কাপড়-কাচা, স্নান করাটা হচ্ছিল। কিন্তু দু'দিন থেকে তাও হয়নি—আজ দু'দিন স্নান করাও হয়নি আমার।'

'কেন ?'

'ছোড়দা ও-মেস ছেড়ে দিয়ে শেয়ালদা'য় একটা বড হোটেলে উঠেছে। সেই জন্যেই বলছিলুম, আগে শেয়ালদ'য় গিয়ে ছোড়দার খোঁজটা করি—'

শেষ পর্যন্ত শেয়ালদ'র মোড়েই ট্রাম থেকে নামলাম। সুধা সেনকে নিয়ে এখানে ঢুকতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হল।

ম্যানেজার কিন্তু চিনতে পারলেন না। বললেন, 'অমলেন্দু সেন ? না মশাই, এখানে ও-নামে কেউ থাকে না।'

সুধা সেন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। অথচ সে ছোড়দার মেসে গিয়ে শুনেছে, এখানেই উঠেছে ছোড়দা।

আমি বললাম, 'এখানে কোনো ঘর পাওয়া যাবে, মানে আলাদা ঘর একটা, ইনি থাকবেন।'

ম্যানেজার সুধা সেনের দিকে চাইলেন। কেমন যেন বক্র-দৃষ্টি। অন্তত সুধা সেনকে কেউ বক্র-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে, এ-ধারণা আমার ছিল না। দু'একজন ওয়েটার, চাপরাসী ক্যাশিয়ার তারাও এসে দাঁড়িয়েছে চারপাশে। সুধা সেন আর আমাকে জড়িয়ে সবাই মিলে যেন একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে। জিনিসটা আমার ভালো লাগলো না।

ক্যাশিয়ার বললে, 'কী বললেন স্যার, অমলেন্দু সেন ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিলেন এখানে তিনি, কিন্তু তিনি তো···আচ্ছা, ওইখানে দেখুন তো, পাশেই যে গলিটা, ওর শেষে: একেবারে লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় বোধ হয় তিনি আছেন—ওই হোটেলে একবার চেষ্টা করে দেখুন তো—'

সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি পার হয়ে সুধা সেনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে যেন বাঁচলাম। আমার সম্বন্ধে কী ভাবলে ওরা কে জানে ! ব্যাপারটা সুধা সেন বুঝতে পেরেছে নাকি ? কিন্তু ওর মুখ দেখে তা বুঝবার উপায় নেই।

তেমনি ভাষাহীন বিবর্ণ মুখ ওর। হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটি নিয়ে বেশ চঞ্চল পায়ে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলো সুধা সেন।

লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় ঢোকা গেল।

একটু নির্জন মনে হল বাড়িটা। ঘরগুলো তালাচাবি দেওয়া। ছুটির দিন। সবাই বোধ হয় যে-যার দেশে চলে গেছে। রান্নাঘরের কোণে ঠাকুর থালায় ভাত বেড়ে খাবার আয়োজন করছে।

বললে, 'অমলেন্দুবাবু? ওই সাত নম্বর ঘরে দেখুন।'

সাত নম্বর ঘর খুঁজতে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ঠিকানা বদলালো, অথচ বোনকে একটা খবর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেনি—এ যেন কেমন। সুধা সেন কি এখানে থাকতে পারবে? এ যেন কেমন। হেটো মেস বলে মনে হল।

এক ভদ্রলোক ভিজে গামছা পরে এক বালতি জল বয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকেন, কিন্তু এখন তো তিনি নেই। সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন, আসবেন সেই রাত্রে, আবার না-ও আসতে পারেন। বলে গেছেন, ওবেলা খাবেন না।'

সুধা সেনের দিকে তাকালাম। সুধা সেনও আমার দিকে তাকালে। বুঝলাম —ছোড়দাকে পাবার আশা যেন সে করেনি। শুধু ছোড়দার আস্তানাটা চিনে রাখতেই এসেছিল। সুধা সেন নির্বিকারভাবে বেরিয়ে এল বাইরে। আমিও এলাম পেছনে পেছনে।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়াদার দেখা পাওয়া যাবে না জানতাম—ও ছোটবেলা থেকেই ওমনি! দশ বছর বয়েসে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, মাকে একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় না।'

শুনে আমি চুপ করে রইলাম।

সুধা সেন আবার বলতে লাগলো, 'বড়দার ওপরেই মার বেশি ভরসা ছিল। জমি-জায়গা বেচে বড়দাকে বাবা পড়িয়েছিলেন। আর বলতেন—'কমলটাই মানুষ হবে।'

বললাম, 'মানুষ তো যা হয়েছে, বুঝতে পারছি।'

সুধা সেন বললে, 'বড়দাই তো আমার পড়ার খরচ সব দিত, মাকেও টাকা পাঠাতো, কিন্তু বৌদি আসার পর থেকেই সব বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকেও বৌদি মোটে দেখতে পারে না। বড়দা এই ব্যাগটা আমায় কিনে দিয়েছিল আমার জন্মদিনে।'

বললাম, 'এবার তাহলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিংটা দেখা যাক—'

সুধা সেনকে নিয়েই আজ সমস্ত দিন কাটবে মনে হল। অথচ রাস্তার মধ্যে ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। কোথাও একরাত্রির জন্যেও যদি থাকবার একটা বন্দোবস্ত করা যেত আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অফিসে যে-সব মেয়েরা সুধা সেনের সঙ্গে কাজ করে তারাও কী আশ্রয় দেন না একে! কে জানে সুধা সেনের কোথায় গোলযোগ। নিশ্চয় একটা খুঁত আছে কোথাও সুধা সেনের চরিত্রে, যা তাকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম। বৌদি বলেছিল, 'বড় কিপ্‌টে মেয়েটা, না-খেয়ে ওর মতো থাকতে আর কাউকে দেখিনি।'

কিন্তু কৃপণতা কি এতবড় একটা অপরাধ নাকি যে কারো সহানুভূতি ভালোবাসা বন্ধুত্ব পাবে না? যে কৃপণতা করে সে তো নিজেকেই কষ্ট দেয়, নিজেরই স্বাস্থ্য নষ্ট করে। তাতে আর কার কী এসে গেল! নাকি একসঙ্গে এক ঘরে বাস করতে গেলে কুড়িয়ে ছড়িয়ে না থাকলে কারোর সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায় না। কমলেন্দুকে মানুষ করতে সুধা সেনের মা যে-পরিমাণ অর্থ আর সম্পত্তি ব্যয় করেছেন, সেটা থাকলে আজ বোধ হয় সুধা সেন অন্যরকম হত। বোধ হয় সুধা সেন পেট ভরে খেত। বোধ হয় তার স্বাস্থ্য এমন নির্জীব হত না। হয়ত সুধা সেনকে বি. এ. পাস করতেও হত না, চাকরি করতেও হত না। বিয়ে করে দেশের আর পাঁচজন মেয়ের মতো সংসার পাততে পারতো।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ বড্ড কড়াকড়ি।

দোতলায় ভিজিটার্স রুমে অনেক টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি। সেখানেই বসলাম দু'জনে। ঘরে আরো অনেক ছেলেমেয়ে গল্প করছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর নাকি অসুখ, তিনি নিচে নামবেন না। আমি বসে রইলাম, সুধা সেনই ওপরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সুধা সেন খানিক পরে আবার সেই নির্বিকার মুখ নিয়েই ফিরে এল।

বললে, 'হল না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম আবার।

তারপর? তারপর কী? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম। কাঁটা ঘুরে একেবারে তিনটের ঘরে চলে এসেছে। এখনও কিন্তু সুধা সেনের খিদে পাবে না। অন্তত খাবার কথার উল্লেখ না করলে আর খাবার কথা বলবে না সুধা সেন। ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়েছি। আমার যেন আর নড়তে ইচ্ছে করছে না। সুধা সেন কিন্তু

অক্লান্ত। মনে হল এখনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমনি অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরি চালিয়ে যেতে পারবে। সুধা সেনের দিকে চাইলাম। বললাম, 'তারপর ?'

সুধা সেনও আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তারপর কী বলুন ?'

তারপর যেন আর সত্যিই কিছু করবার নেই। যেন এখানেই এসে পূর্ণচ্ছেদে পরিসমাপ্তি। আর চলবে না চাকা। এখানেই নামতে হবে শেষবারের মতো। এরপর শুধু ধূসর হতাশা।

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছটফটে মেয়ে, আর বড্ড একগুঁয়ে, যা নিয়ে লাগবে তা শেষ পর্যন্ত করে ছাড়বে, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, অদ্ভুত গোঁ ওর !'

শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আসুন, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

আপত্তি করলে না সুধা সেন। বললে, 'চলুন।'

একটা ভালো রেস্তোরাঁ দেখে ঢোকা হল। ঘরময় লোক। সুধা সেনকে নিয়ে ঢুকতেই চারিদিক থেকে দৃষ্টি পড়লো আমাদের ওপর। কোনও পরিচিত লোকের দৃষ্টিকেই ভয় ছিল, নইলে আর অসুবিধে কিসের। সুধা সেনকে নিয়ে যে কোনো লোকের বিব্রত হবারই কথা। সুধা সেনের চেহারাই এমন, তার ওপর নজর না পড়ে উপায় নেই।

কোন রকমে সুধা সেনকে নিয়ে একটা কেবিনের মধ্যে ঢুকেছি। পর্দাটা অর্ধেক টেনে দিলাম !

কোনো মেয়ে যে একজন পুরুষের সামনে অমন গোগ্রাসে খেতে পারে, সুধা সেনকে সেদিন কেবিনের মধ্যে খেতে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না সত্যি। নাকি সকালে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত কিছুই খায়নি ! হয়তো হাতে পয়সা নেই। সেই কোন্ সকালে বড়দার বাড়ি থেকে বৌদি জাগবার আগেই বেরিয়ে এসেছে, তারপর দোকান থেকে কি আর এক কাপ চা-ও খায়নি ! আমাদের বাড়িতে যখন সুধা সেন এল তখন সাড়ে দশটা সকাল। তারপর এখন তিনটে বিকেল। সত্যি সুধা সেনের ক্ষমতা আছে। সুধা সেন নিজের মনেই খাচ্ছে, আর আমি অপাঙ্গে তাই দেখছি। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত মুমূর্ষু ভিখিরির আহার দেখেছি, সে এক রকম। কিন্তু এই সুধা সেনের খাওয়া ! বি. এ পাশ, প্রাইভেটে এম. এ. দেবে, শিক্ষিতা মেয়ের এই আহার যেমন কদর্য তেমনি কুৎসিত। সমস্ত মন আমার বিষাক্ত হয়ে উঠলো। তিন টাকা বিলের দাম চুকিয়ে দিলাম নিঃশব্দে।

বললাম, 'উঠুন।'

আরো বোধ হয় খেতে পারতো সুধা সেন। সুধা সেন যেন আজ সাত দিনের

খাওয়া একদিনে খাবে বলে মনস্থ করেছে। রাস্তায় বেরিয়েই কিন্তু করুণা হল। পরিমাণে যে খুব বেশি খেয়েছে সুধা সেন, তা নয়, কিন্তু তার খাওয়ার ভঙ্গিটাই যেন বড় বিশ্রী লেগেছিল সেদিন।

যেন খানিকটা শক্তি পেয়েছে সুধা সেন। বললে, 'চলুন, একবার গোয়াবাগানে শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

মোহিতের দেওয়া ঠিকানার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নোট-বুকে লেখা ছিল। এবার শেষ চেষ্টা। হাতে আর আশ্রয়ের সন্ধান নেই। এবারে যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে নিরুপায়। সুধা সেনকে বললাম 'ট্রামে উঠুন তাহলে—'

কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে গোয়াবাগান দশ মিনিটের রাস্তা। ট্রামে খুব ভিড়। কিন্তু কেন জানি না লোকজন সুধা সেনকে দেখেই রাস্তা করে দিলে। লেডীজ্ সীট ভর্তি ছিল। একজন পুরুষ যাত্রী সুধা সেনের জন্যে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুধা সেনের কৃশ শরীর দেখে দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হল, ভিড়ের মধ্যে সুধা সেনকে ছেড়ে দিয়ে যাব নাকি পালিয়ে। না হয় খুঁজে মরুক নিজের আশ্রয়। গোটাকতক পয়সা খরচ হোক না সুধা সেনের। তারপর লেখাপড়া জানা মেয়ে—রাস্তায় আর রাত কাটাতে হবে না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কোন রকমে রাস্তায় কাটিয়ে তারপর আশ্রয় নিক গিয়ে বড়দার বাড়িতে নিত্যকার মতো। সুধা সেনের বড়দা লোক ভালো, তিনি ঠিক রাত বারোটার সময় স্ত্রীর অজ্ঞাতে দরজার খিল খুলে দেবেন। আমার কিসের মাথাব্যথা! আমার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে আমি কেন মিছিমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি সুধা সেনের পেছনে পেছনে। আমার কিসের দায়! সুধা সেন আমার কে! অমন কত অসংখ্য মেয়ে কলকাতার রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। আর অভাব? অভাব কার নেই। বি. এ. পাশ করেছে, প্রাইভেটে এম. এ দেবে, তারপর হয়তো একদিন টি-বি হবে—হয়তো তখন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে কেউ দয়া করে। একটা ফ্রি-বেড যোগাড় হলেও হতে পারে। তারপর কে মনে রাখবে সুধা সেনের কথা। দেশে মা হয়তো মনিঅর্ডারের আশায় মাসের পর মাস বসে থাকবে—ভাই-এর স্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে টাকার অভাবে। বড়দাকে মাঝরাতে উঠে আর দরজা খুলে দিতে হবে না। ছোড়দাকে বিরক্ত করতে আসবে না কেউ।—

সুধা সেন নিজেই উঠে এসেছে।

'নেমে পড়ুন, গোয়াবাগানে এসে পড়েছি যে—'

গলির ভেতর বাড়িটা খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হল। তা হোক, পাওয়া গেল

তা-ই ভালো একটা আধপুরোনো বাড়ির অর্ধাংশ সেই অর্ধাংশ নিয়েই মেয়েদের বোর্ডিং।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটার প্রবেশপথের একটা নিশানা খুঁজছিলাম।

'সুধাদি!'

পেছন ফিরে দেখি একটা ছোট ছেলে সুধা সেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিরে বিলু, তুই! এখানে কোথায়?'

ছোট হাফ্প্যাণ্ট-পরা ছেলেটা চেনে সুধা সেনকে। আমার কাছে যেন হঠাৎ সুধা সেনের মর্যাদা বেড়ে গেল। সুধা সেনকে কেউ চিনবে, কেউ তাকে চিনে নাম ধরে ডাকবে, তা সে হোক না ছোট ছেলে—এটা যেন আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। তাহলে নিতান্ত অসহায় নয় সুধা সেন। তারও এই কলকাতা শহরে পরিচয়ের স্বর্ণসূত্র আছে। সেই সূত্র ধরে সে আশ্রয়ের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছতেও পারে!

'তোরা কবে এলি রে কলকাতায়?'

'এই তো সাতদিন এসেছি মামার বাড়িতে। আমি কিন্তু তোমায় দেখেই চিনতে পেরেছি সুধাদি'—বিলু বললে।

'মা কেমন আছে রে?'

তারপর আবশ্যক-অনাবশ্যক অনেক কথা। সুধা সেন যেন হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠলো। সুধা সেনের দেশের ছেলে। অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেছে। আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। এখন কোনো রকমে সুধা সেনকে ছেলেটির হাতে গছিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি। সুধা সেনের সঙ্গে পরিচয় থাকার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারি।

সুধা সেন বললে, 'তুই দাঁড়া বিলু, এখানে যদি ঘর না পাই, তাহলে তোর মামার বাড়িতেই উঠবো একটা রাত্তিরের জন্যে।'

যাক, এতক্ষণে যেন আশার একটা ক্ষীণতম সূত্র পাওয়া গেল। তারপর সুধা সেনকে নিয়ে বোর্ডিং-এর গলির ভেতর ঢুকলাম। গলির পেছন দিকে ছোট দরজা। সুধা সেনই সামনে এগিয়ে গেল।

'আপনাদের বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'তিনি তো এখন নেই। কি বলবেন আমাকে বলুন।'

বেশ বর্ষীয়সী মহিলা একজন। বিধবার বেশ। সরু চুলপাড় ধুতি পরনে। মাথায় একটু ঘোমটা। আমি এগিয়ে গেলাম। বুঝিয়ে বললাম সব। বললাম সুধা সেনের সত্যিকারের সবিস্তার দুর্দশার কাহিনী। আশ্রয় এখানে না পেলে

আজ রাত্রে কোথায় কাটাতে হবে, তার কোনো ঠিকই নেই। সুধা সেনের কৃশ চেহারা দেখে মহিলাটির যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও যেন দূর হয়ে গেল। সুধা যেন বিধবা নয়—কুমারী, তবু মহিলাটির বোধ হয় মনে হল—বিধবার চেয়েও সহায়হীন সে। যে সুধা সেনের কৃশ, রুগ্ন চেহারা আমার মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করেছে, তাই-ই মহিলাটির মনে সহানুভূতির সৃষ্টি করতে পেরেছে যেন।

মহিলাটি বললেন, 'এখন তো আমাদের কোনো সীট খালি নেই, তবে কয়েকদিন পরেই খালি হবে···'

তারপর খানিক থেমে আবার বললেন, 'তবে নেহাত যদি কোথাও থাকবার জায়গা না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে দিতে পারি কয়েকদিনের জন্য।'

একটা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। মনে হল ঘাড় থেকে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। সুধা সেনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। বিছানা সঙ্গে আনেনি সুধা সেন। তা সে কাল সকালে আনলেই চলবে। সুটকেসটা ছাত্রের বাড়িতে পড়ে আছে, সেটাও কাল সকালে আনলেই চলবে। ইতিমধ্যে একটা মাদুর বা ছেঁড়া শতরঞ্জি কি আজকের রাতটার জন্যে কারোর কাছে ধার পাওয়া যাবে না? বালিশ সুধা সেনের দরকার হয় না। মাথার ওপর একটা ছাদ, চারদিকে চারটে দেওয়াল, আর ছেঁড়া একটা মাদুর—এর বেশি কোনো দিন কিছু চায়নি সুধা সেন। সুধা সেনকে সেইখানে রেখে আমি আর সুধা সেনদের দেশের সেই ছেলেটি চলে এলাম। গলির বাইরে এসে একটা মুক্তির নিশ্বাস পড়লো। সারা দিনটার এমন অপব্যয় আর কখনও করিনি এর আগে। সুধা সেন আমার কাঁধ থেকে নামলো শেষ পর্যন্ত সেই-ই আমার সৌভাগ্য!

শুধু এইটুকু ঘটনা হলে এ গল্প লেখবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে যে বিপরীত চরিত্রের আর একটি মেয়েকে আর একদিন অন্য পটভূমিকায় দেখতে পাব, সে কথা কি আমিই জানতুম!

সুবোধ এসেছিল কলকাতায়। নতুন-দিল্লীতে বড় কনট্রাকটার সুবোধ রায় আবার বহুদিন পরে কলকাতায় এল।

সুধা সেনকে ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে রাখবার মতো মেয়ে তো সুধা সেন নয়। বহুদিন পরে বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'তোমাদের সুধা সেনের খবর কি বৌদি?'

বৌদি বলেছিল, 'তোমায় তো বলেছি, সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ধানবাদে চলে গেছে, সেখানে পাঁচ টাকা মাইনে বেশি পাবে নাকি। আমরা অফিসের সব মেয়েরা অনেক করে বললাম, কিছুতেই থাকলো না। বললে,—এ মাইনেতে আর কুলোতে পারছি নে।'

সুধা সেনকে অনেক কষ্টে বাসা যোগাড় করে দিয়েছিলাম, ওইটুকুই শুধু মনে ছিল। কিন্তু পাঁচ টাকা বেশি মাইনের লোভে কলকাতার বাসা সে ত্যাগ করবে, তা আগে জানলে সেদিন অত কষ্ট স্বীকার করতাম কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমার বন্ধু সুবোধ রায়ের ও-সব সমস্যা নেই। বছরের মধ্যে বার দুই-তিন কলকাতায় আসতে হয় সুবোধ রায়কে এবং বরাবর কলকাতার নাম-করা হোটেলেই এসে ওঠে। সেখানে রুমের যত অভাবই হোক, সুবোধ রায়ের জন্যে সবচেয়ে ভালো ঘরটাই ব্যবস্থা করা হয়—তেতলার সবচেয়ে দামী দক্ষিণমুখো একটা ঘর। আলো হাওয়া প্রচুর। ঘরের দক্ষিণমুখো ব্যাল্‌কনি থেকে সামনের পার্কটা দেখা যায়; হু হু করে হাওয়া আসে দিন-রাত। দুটো ফ্যান। বাথরুম পাশেই। বাথরুমে গরম কলের জলের ব্যবস্থা। শাওয়ার বাথ্। মোজেয়িক করা মেঝে। দুটো চাকর অনবরত অ্যাটেণ্ড করে। হোটেলের সর্বোত্তম সুখসুবিধে ওই ঘরটাতেই আছে। তার জন্যে চার্জ যা করা হয়, কনট্রাক্‌টার সুবোধ রায়ের পক্ষে তা কিছুই না। ও-ঘরটার বিশেষ দরের জন্যে ও-টা এমনিতে সাধারণতঃ খালি পড়েই থাকে।

নিয়মমতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে তেতলায় চলে গেছি। ছুটির দিন দেখেই গেছি। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে হঠাৎ বাধা পেতে হল।

'কাকে চাই, সাব্?'—একটা চাপরাসী উঠে দাঁড়াল।

'সুবোধ রায়। দিল্লী থেকে এসেছেন।'

'তিনি দোতলার কামরায় আছেন, ওখেনে খোঁজ করুন।' চাপরাসীটা বললে।

'এখানে তবে কে আছেন?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'মেম সাহেব।'

মেম সাহেব! যেন বিতাড়িত, অপমানিত বোধ করলাম। মনে হল—সুবোধ রায়কে তার চির-অধিকৃত ঘর থেকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে।

নিচে গিয়েই দেখা হল। বললাম, 'একি? কী হল? এ ঘরে?'

সুবোধ রায়ের মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম সে-ও কম বিরক্ত হয়নি।

সুবোধ বললে, 'কে একটা খুব বড়লোকে মেয়ে এসেছে—ওই ঘরেই আছে।'

'বাঙালী নাকি?' জিগ্যেস করলাম।

'হ্যা, বাঙালীই তো শুনেছি। দু'হাতে পয়সা খরচ করছে। চাকর-বাকর, চাপরাসী, আয়া বকশিশ দিয়ে এরই হাত ফেলেছে ভালো ভালো ডিশ্‌ যা-কিছু সব অর্ডার দিচ্ছে। সকালে ব্রেকফাস্টে ডিম একদিন বাসী ছিল বলে কমপ্লেন করেছে। শুধু তাই নয়, ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার কোন কিছুতে একটুকু ত্রুটি ঘটলে নাকি অনর্থ ঘটাবে মেয়েটি। দু'চারজনের ইতিমধ্যে ফাইনও হয়ে গেছে। ম্যানেজার থেকে শুরু করে জমাদার পর্যন্ত সবাই সন্ত্রস্ত। এতটুকু ত্রুটি যাতে না ঘটে সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য। গেটে দারোয়ান একদিন সেলাম করতে ভুলে গিয়েছিল বলে শাস্তিও নাকি হয়েছে তার। এখন হোটেলের মালিকের কানে যাতে না যায় সেই চেষ্টাই করছে ম্যানেজার। নইলে যে-সব ত্রুটি এ-পর্যন্ত ঘটে গেছে তা তার কানে গেলে ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত হাত পারে।

আবার কেউ কেউ বলছে, 'কোনো এক নেটিভ স্টেটের ছোটরানী লুকিয়ে এসে এখানে রয়েছে।'

সুবোধ বললে, 'মেয়েটাকে দেখিনি কখনও ভাই। বিয়ে হয়েছে কি হয়নি জানিনে—তবে খায় খুব—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাই সিঁড়ি দিয়ে ওয়েটাররা ডিশের পর ডিশ্‌ নিয়ে যাচ্ছে। ডিনারেও তিনটে কোর্সে কুলোয় না।'

অনেকদিন আগেকার সুধা সেনকে মনে পড়লো। সুধা সেন খেত না। খাবার জায়গাও ছিল না বটে, তা ছাড়া পয়সাও ছিল না সুধা সেনের। তারপর সেই রেস্তোরাঁর কেবিনে ঢুকে গোগ্রাসে খাওয়া! সেদিন সুধা সেনের খাওয়া বড় বিশ্রী লেগেছিল মনে আছে।

দেখলাম হোটেলের চাকর-বাকররা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেশি গোলমাল না হয় কোথাও। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সিঁড়ি ধোয়ামোছা—পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। কয়েকটা পাম, অর্কিড আর ফুলগাছের টব দিয়ে সাজিয়েছে সারা বাড়িটা। কে এসেছে যে তার জন্যে এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন!

সুবোধ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে দু'চারদিন গিয়েছি, কিন্তু সেইদিনই প্রথম দেখা হয়ে গেল। দেখে অবাক্ হলাম। দারার কাটা মুণ্ড দেখে সাজাহানও এত বিস্মিত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ!

সুধা সেন!

পেছনে পেছনে দুটো ওয়েটার চলেছে সুধা সেনের। সিঁড়ির আশেপাশে যারা ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে ব্যস্ত!

এক নিমেষে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছি। বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না

আমার। সেই সুধা সেন! সেই কৃশ মেয়ে! উপোস করে না-খেয়ে-খেয়ে পয়সা বাঁচায়! সারা শহর খুঁজে বেড়ায় একটু আশ্রয়ের জন্যে। বড়দার বাড়িতে রাত বারোটার পর গিয়ে লুকিয়ে শুয়ে পড়ে, আর স্নান করতে যায় ছোড়দার মেসবাড়িতে। একবার মনে হল ভুল দেখছি না তো! সমস্ত যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গোলমাল হয়ে গেল।

পরদিনই বৌদির বাড়িতে গেলাম।

এ-কথা সে-কথার পর বললাম, 'তোমার সেই সুধা সেনের খবর কি বৌদি?'

বৌদি বললে, 'হঠাৎ সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করছো যে?'

বললাম, 'না, এমনি আজ ট্রামে সুধা সেনের মতো একটা মেয়েকে দেখলাম কিনা, সেবার বলেছিলে তো যে ধানবাদে গেছে সুধা সেন। পশ্চিমে গিয়ে মোটা-সোটা হল? খবর পেয়েছ কিছু?'

বৌদি খবর দিতে পারলে না। বুঝলাম সুধা সেন কাউকেই খবর দেয়নি কিছু।

দিন সাত-আট পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই হোটেলে ঢুকছি এমন সময়ে সামনেই দেখি সুধা সেন। কিন্তু আমি এড়িয়ে যাবার আগেই সুধা সেন আমায় দেখে ফেলেছে।

আমাকে দেখে সুধা সেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। চারদিকে চাকর-বাকর চাপরাসীর ভিড়। সবাই বকশিশ পাবার জন্যে ব্যস্ত। সুধা সেনকে দেখে মনে হল যেন সে হোটেল ছেড়ে আজ চলে যাচ্ছে। স্যুটকেস বিছানা বাক্স সব সামনে নামিয়েছে। ট্যাক্সি হাজির।

সুধা সেন সকলকে বকশিশ দিয়ে একপাশে সরে এসে চুপি চুপি বললে, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালোই হল। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা দরকার আছে।'

তারপর সুধা সেন মালপত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললে, 'আসুন।'

সুধা সেন গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো। আমিও পেছন পেছন গিয়ে উঠলাম। কে জানে কোথায় আবার যাবে সুধা সেন! বৌদির কথাটা মনে পড়লো। সুধা সেন সত্যিই কি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছে, না, যুদ্ধের কল্যাণে কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক টাকা তার হাতে এসে পড়েছে, কে বলতে পারে!

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই সুধা সেন আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমাকে আপনি বাঁচান!'

আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না কী সে চাইছে।

সুধা সেন আবার বললে, 'একটা রাতের জন্যে আমার একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দিন, আমি একেবারে নিরাশ্রয়।'

তবুও যেন কিছু বুঝতে পারছিলাম না! তবে এই ঐশ্বর্য, এই বকশিশ দেওয়ার বহর, এই হোটেলের সবচেয়ে সেরা ঘর নিয়ে থাকা, এই ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার...

সুধা সেন বললে, 'আপনাকে আমি সব খুলেই বলছি, আমায় বিশ্বাস করুন। আমার কাছে আর একটা টাকাও নাই। এতদিন না-খেয়ে-খেয়ে যা কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আবার আজ নিরাশ্রয়। এই ট্যাক্সি ভাড়া করেছি বটে, কিন্তু কোথায় যাব কিছুরই ঠিক নেই!'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। আমি প্রাণশূন্য দৃষ্টি দিয়ে সুধা সেনের দিকে চেয়ে রয়েছি। আমি কি আবার সুধা সেনের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে চলেছি! আবার সেই হোস্টেল, মেস আর বোর্ডিং-এর দরজায় দরজায় বে-হিসেবী সুধা সেনের জন্যে ধর্না দিতে চলেছি! তারপর এই ট্যাক্সি-ভাড়া, তা-ও কি আবার আমাকেই দিতে হবে!

সুধা সেন তার কাঠির মত আঙুল দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলে 'আপনাকে একটা জায়গা খুঁজে দিতেই হবে আমার জন্যে! আপনি যে সেই বলেছিলেন আপনার কোন্ এক বন্ধু আছে—চলুন না এখন তার ওখানে—যদি থাকতে দেয়।'

সেদিন বলেছিলাম বটে। কিন্তু সুখেন্দুর বাড়ি তো এখানে নয়। বেলগাছিয়ার একেবারে শেষপ্রান্তে সে-বাড়ি। তা ছাড়া তার এক দিদির একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আসবার কথা ছিল। যদি তারা এসে থাকে. তাহলে কি আর জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে! রাগে দুঃখে ধিক্কারে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো।

সুধা সেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা চলুন, দেখি—'

ট্যাক্সি চললো। হাওয়ার মতো উড়িয়ে চললো। সুধা সেনের চুলগুলো উড়ে পড়ছে তার কালো মুখের ওপর। কে জানে কোথায় এ-যাত্রার শেষ! শেষ পর্যন্ত আশ্রয় আজ মিলবে কিনা ঠিক কী! কলেজ স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট পেরিয়ে ডান দিকে চলল ট্যাক্সি। বেলগাছিয়ার পুল পেরিয়ে আরো ভেতরে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল গলির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'আপনি বসুন, আমি দেখে আসছি।'

অন্ধকার গলি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা। রাত তখন বেশি হয়নি। নির্দিষ্ট

বাড়িটার সামনে আসতেই বাড়ির ভেতর থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের কলরোল কানে এলো। এ বাড়িতে তো ছোট ছেলেমেয়েদের বালাই ছিল না। তবে কি সুখেন্দুর দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে নাকি! ডাকবো কিনা ভাবছি। যদি সুধা সেনের উপকার হয়। কিন্তু মনটা আমার বিষিয়ে উঠলো। বে-হিসেবী সুধা সেনের পরিচয় তো আমি ভালো করেই পেয়েছি। বন্ধুকে আর ডাকলাম না। গলির এ প্রান্তে ট্যাক্সির কাছে আর ফিরেও এলাম না। এ প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়লাম আর একটা সমান্তরাল বড় রাস্তায়। তারপর কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে উঠে পড়লাম ধর্মতলার ট্রামে। তারপর চলন্ত ট্রামের জনবহুল একটি কোণে নিজেকে আড়ালে রেখে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। থাক্ সুধা সেন ট্যাক্সিতে বসে। ট্যাক্সির ভাড়া যদি না দিতে পারে তাতে আমার কি আসে যায়! সুধা সেন প্রতীক্ষমাণ ট্যাক্সিতে বসে মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে থাক্, আমি ততক্ষণ বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিবিড় ঘুমের মধ্যে গা গড়িয়ে দেব। আমার এত কিসের ভাবনা সুধা সেনের জন্যে!

কয়েক দিন পরে বৌদিকে সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করতেই বৌদি বললে,—একদিন নাকি হঠাৎ রাত বারোটার সময় সুধা সেন ট্যাক্সি করে বৌদির বাড়িতে এসে হাজির। সে রাতটা বৌদির বাড়ির সিঁড়ির ঘরের ভেতর কাটিয়ে সকালবেলাই চলে গেছে আবার—কোথায় চলে গেছে বলে যায়নি। সুধা সেনের চাকরিও চলে গেছে অফিস থেকে।

সুধা সেন! ভাবলেই সুধা সেনের চেহারাটার কথা মনে পড়ে। সেই কৃশ স্বাস্থ্যহীন চেহারা, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, হয়তো কলকাতা শহরের জনতার ভিড়ে মিশে গেছে আবার। নয়তো ফিরে চলে গেছে দেশে—মা'র নিশ্চিন্ত নির্ভর আশ্রয়ের নীড়ে। শহরের অশান্ত প্রতিযোগিতার ক্লান্তি থেকে অনেক দূরে—যেখানে অবারিত মাঠ, দিগন্ত-বিসারী আকাশ, আর স্নেহকোমল ছায়া-নিবিড় নীড়। চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের আবরণে সেখানে শরীর কৃশ আর আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসে না। সুধা সেন সত্যি সত্যি আবার সেইখানেই ফিরে গেছে কিনা কে বলতে পারে!

মিষ্টিদিদি

মিষ্টিদিদি আমার আপন দিদিও নয়, দূরসম্পর্কের দিদিও নয়।

তবু মিষ্টিদিদি ছিল বুঝি আমার আপন দিদির চেয়েও বড়। বলতো, 'যে-কটা দিন বেঁচে আছি, তুই আমার কাছে থাক্, জানিস।'

মিষ্টিদিদি সময় পেলেই চুপচাপ শুয়ে থাকতো। পাতলা পলকা শরীর, ধবধবে রং। ফিনফিনে শিল্কের শাড়ি গায়ের ওপর থেকে খসে খসে পড়তো। ইজি-চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুতো একবার, তারপর হয়ত তখনি আবার উঠে গিয়ে বসতো বাগানের দোলনায়। তারপরেই হয়ত খেয়াল হল—আর তখুনি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গঙ্গার ধারে।

জামাইবাবু আমাকে দেখিয়ে বলতো, 'ওকে সঙ্গে নিয়ো মিষ্টি—কোথাও যদি হঠাৎ টলে পড়ে যাও, তখন—'

মিষ্টিদিদিও মাঝে মাঝে বলতো, 'তোদের সবাইকে খুব কষ্ট দিচ্ছি রে আমি—'

আমি বলতাম, 'বাঃ, কষ্ট কিসের!'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোর জামাইবাবুর দেখ্ তো, কখনও কোন অসুখ হতে দেখিনি। আমার জন্যেই তো কোথাও যেতে পারে না, আমার জন্যেই তো এত চাকর-বাকর রাখা। শঙ্করকেও দূরে পাঠাতে হল তো শুধু আমার শরীরের জন্যেই।'

মিষ্টিদিদির ঝি অবশ্য থাকতো সঙ্গে। মিষ্টিদিদির সঙ্গে দিনরাত পালা করে একটা-না-একটা ঝি থাকেই। রাত্রে যদি মিষ্টিদিদির ঘুম না আসে, ওই একজন ঝি পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুম পাড়াবে। শাড়ি যদি কাঁধ থেকে হঠাৎ খসে যায় মিষ্টিদিদির, তো একজন ঝি কাপড়টা তুলে দেবে যথাস্থানে। খেয়ালের তো অন্ত নেই মিষ্টিদিদির। কখন কী খেয়াল হবে মিষ্টিদিদি তা নিজেও বলতে পারে না আগে থেকে। হয়ত রাত্তির দশটার সময়েই মিষ্টিদিদির তপ্‌সে মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে হতে পারে। আশ্বিন মাসের দুপুরবেলাতেই ল্যাংড়া আম খেতে ইচ্ছে হতে পারে। জামাইবাবু হয়ত তখন অফিসে যাচ্ছে, মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার বুকটা কেমন করছে, তুমি আজ কোথাও যেয়ো না গো!'

জামাইবাবু তখন কোটপ্যাণ্ট পরে তৈরি। নিচে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। বললে, 'আমার যে আজ একটা জরুরী কাজ ছিল।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'তা বলে কাজটাই তোমার বড় হল?'

জামাইবাবু কেমন যেন অপ্রস্তুত ব্যস্ততায় বলতো, 'আমি বরং গিয়ে ডাক্তার সান্যালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মিষ্টিদিদির পাতলা শরীর যেন কান্নার ফুলে ফুলে উঠতো। বলতো, 'আমি আর ক'দিন! আমি মরে গেলে তুমি যত খুশি কাজে বেরিয়ো না, কাজ তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না।'

সত্যিই তো তখন আমাদেরও মনে হত মিষ্টিদিদি আর ক'দিনই বা বাঁচবে। কলকাতার হার্ট-স্পেশালিস্টরা কেউ রোগ ধরতে পারতো না মিষ্টিদিদির। কতবার কলকাতার বাইরে থেকে ডাক্তার এসেছে। ভিয়েনা থেকে এসেছে। আমেরিকা থেকে এসেছে। জামাইবাবু মোটা মোটা টাকা দিয়ে সব রকম চিকিৎসা করিয়েছে। কেউ রোগ ধরতে পারেনি। কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একমত হয়ে বলে গেছে, রোগীর মনে কোনো রকম উত্তেজনা হতে দেওয়া উচিত নয়। একটু উত্তেজনা হলেই আর বাঁচানো যাবে না রোগীকে।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আমি মরে গেলে তুমি যেমন খুশি যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়িয়ো, আমি দেখতেও আসবো না। কিন্তু যে দু'টো দিন বেঁচে আছি, আমাকে দয়া করে শান্তিতে বাঁচতে দাও।'

তা মিষ্টিদিদিকে শান্তিতে বাঁচতে দেবার জন্যে জামাইবাবুও কি কসুর করতো কিছু!

দু'টো দিন—

অথচ 'দুটো দিন' 'দুটো দিন' করে কতদিন যে বেঁচে থাকবে মিষ্টিদিদি, আমি কেবল তাই ভাবতাম। তবে অপূর্ব স্বাস্থ্য বটে জামাইবাবুর। একটা দিনের জন্যে অসুখ করেনি, একদিন সর্দি হল না। চল্লিশ বছরের জামাইবাবুকে যেন পঁচিশ বছরের ছোকরা মনে হত দেখে। ভোরবেলা উঠতো। উঠে সামনের সমস্ত বাগানটা জোরে জোরে হেঁটে নিত দশ-পঁচিশ বার। একদিনও শুনিনি যে জামাইবাবুর মাথা ধরেছে। কখনও ডাক্তারের কাছে সঁপে দিতে হয়নি নিজেকে। কবে যে ওষুধ খেয়েছে তা মনেই পড়ে না জামাইবাবুর। এমনি অটুট স্বাস্থ্য। এমনি আঁট শরীর।

কিন্তু তবু জামাইবাবুকে গঞ্জনা শুনতে হত মিষ্টিদিদির কাছে।

রবিবার। খাবার টেবিলে হয়ত সবাই খেতে বসেছি। জামাইবাবুও খাচ্ছে একমনে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'ওমা, ওই অতগুলো মাংস তুমি সত্যি সত্যি খাবে নাকি?'

কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল জামাইবাবু। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। তারপর মাংসের প্লেটটা পাশে ঠেলে দিয়ে বললে, 'তাইতো, আমাকে বড্ড বেশি মাংস দিয়েছে দেখছি ঠাকুর।'

মিষ্টিদিদিকে আমি লক্ষ্য করেছি তখন। ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি একরাশ নিয়েছে পাতে। বার বার চেয়ে-চেয়ে ভাতও নিয়েছে এক হাঁড়ি। পোনা মাছের কালিয়ার সবটাও শেষ করে ফেলেছে! কাঁটাগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলেছে মিষ্টিদিদি। তারপর নিঃশব্দে কখন মাংসের প্লেটটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আরো মাংস দিয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। আমাদের দু'জনের ডবল খেয়ে কখন শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে বসে ডাঁটা চিবোচ্ছে মিষ্টিদিদি। জামাইবাবু লক্ষ্য না করুক, আমি তা করেছি।

তবু মিষ্টিদিদি ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বললে, 'বেশি খেয়ো না বলে দিলাম, ওতে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।'

জামাইবাবু বললে, 'কই, আমি তো বেশি খাইনি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'এক একজনের ধারণা, একগাদা খেলেই বুঝি শরীর ভালো থাকে। ওটা ভুল।'

জামাইবাবু বললে, 'নিশ্চয়।'

এমন সময় ঠাকুর বললে, 'মা, আমড়ার চাটনি করেছিলুম, দিতে ভুলে গেছি।'

মিষ্টিদিদি বললে 'ভুলে গেছ ভালোই হয়েছে—ওঁকে আর দিয়ো না। আমার এই প্লেটে বরং একটুখানি দাও, কেমন রেঁধেছ চেখে দেখি।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তুই নিবি নাকি একটু?'

বললাম, 'তা দিক একটুখানি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, থাক্ তোকে আর নিতে হবে না। এই বয়েস থেকে বেশি খাওয়া অভ্যেস করিস নে তোর জামাইবাবুর মতো। পেট ভরে খাবি না কখনও, এই বলে রাখলুম। একটু খালি রেখে খেতে হয়।'

তা ঠাকুর শুধু আমড়ার অম্বলই দিলে না। পুরনো ঠাকুর জানে সব! শুধু অম্বল মিষ্টিদিদি খেতে পারে না। সঙ্গে দুটি ভাত চাই। ঠাকুর ভাতও এনে দিলে মিষ্টিদিদিকে।

ঠাকুর বললে, 'আর দু'টো ভাত দেবো, মা?'

তখন সব ভাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, পাগল হয়েছ

ঠাকুর। একে দেখছ আমার শরীর খারাপ—আমাকে কি তুমি খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

কী জানি আমার কেমন জামাইবাবুকে দেখে মনে হত তার যেন পেট ভরেনি। এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে উঠে পড়তো জামাইবাবু।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'খেয়ে উঠে যেন এখনি আবার শুয়ো না গিয়ে ঘরে।'

'না না, শোব কেন, এখন আমার কত কাজ।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, খেয়ে উঠে শুলেই যত অম্বল আর চোঁয়া ঢেকুরের উৎপাত।'

জামাইবাবু তারপর নিজের ঘরে চলে যেত। আর মিষ্টিদিদির তখন নিজের স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে থাকবার পালা। বলতো, 'আমার যে কী কপাল! ইচ্ছে না হলেও মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে বিছানায়।'

সেবার জামাইবাবুর একটা মস্ত প্রমোশন হল আপিসে। শুধু প্রমোশন নয়। সমাজে, পাড়ায়, অফিসে সর্বত্র সেটা হিংসে উদ্রেক করার মতো প্রমোশন। অর্থবান মানুষ জামাইবাবু। একসঙ্গে দু'তিনখানা গাড়ি রাখবার মতন অবস্থা। ব্যাঙ্কের আর্থিক স্ফীতিটাও উল্লেখযোগ্য। অথচ সমস্ত নিজের চেষ্টায়। অল্প অবস্থা থেকে শুধু কর্তব্যনিষ্ঠা আর পুরুষকারের জোরে বাড়ি গাড়ি আর মিষ্টিদিদির মালিক হতে পেরেছে।

বিয়ের আগে মিষ্টিদিদিকে চিনতাম না। তবে শুনেছি মিষ্টিদিদির কথা।

মা বলতো, 'সে রীতিমত লড়াই বেধে গিয়েছিল মিষ্টির বিয়ের সময়ে। পটল বলে, আমি বিয়ে করবো, চাইবাসার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ বললে, আমি বিয়ে করবো—দিনরাত মনোহরদার বাড়ি দশ-বিশটা ছেলের ভিড়—টেনিস খেলা চলে ওদের, আর মিষ্টি বাগানে একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে খেলা দেখতো।'

আমি জিগ্যেস করতাম, 'মিষ্টিদিদি খেলতো না, মা?'

'হ্যা, ও আবার খেলবে কী! ও তো কেবল ওর শরীর নিয়েই ব্যস্ত। ওর জন্যে মনোহরদা পর্যন্ত ফতুর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, কেবল ডাক্তার আর ওষুধ—কী যে রোগ কেউ বলতে পারে না, বিশ্রাম নিতে হবে। ওই মেয়েকে নিয়ে মনোহরদাকে কি কম ভুগতে হয়েছে! শেষে মনোহরদা সকলকে ডেকে বললে—আমার মেয়েকে যে বিয়ে করবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মেয়েকে কখনও খাটাবে না, কখনও কাজ করাতে পারবে না। ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে যেমন

আমি করছি। শুনে সবাই রাজী, বড় বড় লোকের ছেলে সব—বড় বড় চাকরি করে, হাজার দেড় দুই টাকা করে সব মাইনে পায়। শুনে আমরা তো চাইবাসার মেয়েরা সব হেসে বাঁচি নে। ওই তো পাতলা হাড়-জিরজিরে চেহারা, কদিন আর বাঁচবে, একটা ছেলে হলেই হাড্ডিসার হয়ে যাবে—তা কী যে সব আজকালকার ছেলেদের পছন্দ জানিনে মা, সবাই বলে রাজী।'

বাবা বলতেন, 'তা রোগা হওয়াই তো ভালো, খাবে কম!'

মা বলতো, 'হ্যাঁ, খাবে নাকি কম, কথা শোনো, দিনরাতই যে খাচ্ছে কেবল, কী করে হজম করে মা, কে জানে! মনোহরদা তো ওই মেয়ের জন্যেই দেউলে হয়ে গেল শেষকালে, কাঠের ব্যবসা ছিল মনোহরদার। তা মেয়ের খাওয়ার জালায় দেনা হল চারিদিকে। সকাল থেকে উঠেই মেয়ের খাওয়া। মুখে একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। চকোলেট, বিস্কুট, লজেঞ্জ, মাংস, মাছ, শাক, খাদ্য-অখাদ্য কিছু তো আর বাদ নেই!

বাবা বলতেন, 'তা যদি হজম করতে পারে, ক্ষতি কী?'

মা বলতো, 'তুমি আর ঠেস্ দিয়ে কথা বোলো না বাপু, এই তো এতদিন এসেছি তোমার সংসারে, কেউ বলুক দিকিনি আমার জন্যে ক'টা পয়সা তোমার খরচ হয়েছে ডাক্তারের পেছনে?'

বাবা হেসে উঠতেন হো হো করে। আর মা থেমে যেতো গম্ভীর হয়ে।

আমি বাধা দিয়ে বলতাম, 'মা, তারপর কী হল?'

মা বললে তা, 'তারপরই গোল বাধলো। সবাই যখন রাজী তখন মনোহরদা উপায় না দেখে বললে,—মিষ্টি যাকে বেছে নেবে তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব। তা ওদের মধ্যে পটলই ছিল সবচেয়ে মজবুত, দৌড়তে পারতো, কম বয়েস, নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছে, কুস্তিকরা চেহারা। মিষ্টির বরাবর রাগ ছিল পটলের ওপরে—'

জিগ্যেস করলাম, 'রাগ ছিল কেন, মা?'

'তা, রাগ থাকবে না? মিষ্টি নিজে হাওয়ায় উড়ে যায়, একটু কাজ করলে মাথা ঘোরে, ঘুম না পাড়ালে ঘুম আসে না, তার চোখের সামনে অত মজবুত চেহারার মানুষকে ভালো লাগবে কেন? তা মিষ্টি শেষ পর্যন্ত পটলকেই বিয়ে করতে রাজী হল।'

এসব ছোটবেলায় মা'র কাছে গল্প শুনেছিলাম। তারপর যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়বার কথা হল, তখন পটল-জামাইবাবুই লিখলে, 'ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে ও, কোন অসুবিধে হবে না।'

আসবার সময় মা বলে দিয়েছিল, 'বাড়িতে যেন বেশি গোলমাল কোরো না বাবা—একটি মাত্র ছেলে শঙ্কর, তাকে পর্যন্ত কাছে রাখেনি পটল, পাছে মিষ্টির শরীর খারাপ হয়—'

আমি যখন মিষ্টিদিদির বাড়িতে প্রথম এলাম, তখন শঙ্কর থাকতো দেরাদুনে। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে বাড়ি করার পেছনেও ওই সেই একই কারণ। এ পাড়ার অধিকাংশ অধিবাসী সাহেব-সুবো। বিরাট দশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। ঘন গাছপালা। বাড়ি থেকে রাস্তা বা পাশের বাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। কোনো রকম শব্দ আসে না এখানে। নিঝুম নির্জন আবহাওয়া। শুধু এক-একবার এক-একটা পাখির ডাক দুপুরবেলার শান্তি ভঙ্গ করে। শঙ্কর যখন জন্মাল, সেই প্রথম দিনটি থেকে তার ভার নিয়েছিল নার্স। দিনের মধ্যে এক-একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে মিষ্টি-দিদির কোলে রাখা হত। কিন্তু জামাইবাবুর হুকুম ছিল—শঙ্কর কাঁদলেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একেবারে মিষ্টিদিদির কানের এলাকার বাইরে! ভয় ছিল, ছেলের কান্না শুনলেই মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল হতে পারে। মিষ্টিদিদি যদি থাকতো দক্ষিণের ঘরে, শঙ্করকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে একেবারে সুদূর উত্তরে। হয়ত একেবারে বাগান পেরিয়ে ওদিকের মালীদের ঘরে। যেখানে ছেলে ককিয়ে কাঁদলেও মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই। সেই ছেলে ক্রমে এক বছর বয়েসের হল। দু'বছরের হল। বড় জ্বালাতন করতে লাগলো তখন। হুড়মুড় করে দৌড়ে বেড়ায়, কান ঝালাপালা হয়ে যেত। সেই গোলমালে একদিন মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করে আর কি! ভীষণ অবস্থা। ডাক্তার এল। নার্স এল। অক্সিজেন গ্যাস এল। জামাইবাবু দু'রাত ঘুমোলো না।

অনেক কষ্টে, অনেক অর্থব্যয়ে, ডাক্তার সান্যালের অনেক চেষ্টায় সে-যাত্রা টিকে গেল মিষ্টিদিদি! কিন্তু জামাইবাবু আর দায়িত্ব নিলে না। শেষকালে কী হতে কী সর্বনাশ হয়ে যাবে!

মিষ্টিদিদি সেরে ওঠার পর জামাইবাবু বললে, 'শঙ্করকে আমি দেরাদুনে পাঠিয়ে দিই, কী বলো? ওখানে ওরা ট্রেনিংটা ভালো দেয়। আর ওরা যত্নও করে খুব ছোট ছোট ছেলেপিলেদের।'

মিষ্টিদিদি ছলছল চোখে বললে, 'কী কপাল দেখো আমার, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত কাছে রাখতে পারবো না, আদর করতে পারবো না!'

'তাতে কী হয়েছে, তুমি সেরে উঠলেই—'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর সেরেছি, বেশি দিন আর নেই আমার বুঝতে পারছি,

বড জোর দিন পনরো—তারপর আমি মরে গেলে···, ওকে কিন্তু তুমি বাড়িতে নিয়ে এসে তোমার কাছে কাছেই রেখো গো।'

তারপর কত পনরো দিন কেটে গেছে, পনেরো বছর কাটতে চললো, কিন্তু কিছুই হয়নি মিষ্টিদিদির। প্লেট-প্লেট মাংস খেয়েছে, বাটি-বাটি আমড়ার অম্বল খেয়েছে, ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়েছে, পোনা মাছের কালিয়া খেয়েছে। দামী দামী বিস্কুট কেক্ লজেঞ্চ খেয়েছে, দামী দামী গাড়ি চড়েছে! মিষ্টিদিদির শোবার ঘর এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্ করা হয়েছে। ওষুধ, বিশ্রাম, আরাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব যুগিয়েছে জামাইবাবু। তবু অসুখ সারেনি মিষ্টিদিদির।

অথচ কত সাবধানতা, কত সতর্কতা মিষ্টিদিদির জীবনের জন্যে। পাশের গাছের ডালে একটা কাক পর্যন্ত ডাকলে বুক ধড়ফড় করতো মিষ্টিদিদির! হাঁ-হাঁ করে তাড়িয়ে দিতে হত। ঝড়বৃষ্টির দিনে যদি জোরে মেঘ ডেকে উঠতো তো আপিস থেকে টেলিফোনে খবর নিতো জামাইবাবু—মিষ্টি কেমন আছে। খবরের কাগজটা আগে নিজে পড়ে তবে জামাইবাবু পড়তে দিতো মিষ্টিদিদিকে। অনেক খুন-জখমের খবর থাকে ওতে। সে-সব পড়ে যে-কোন মুহূর্তে হার্ট-ফেল হতে পারে। কতবার কত প্রমোশনের সুযোগ এল জামাইবাবুর। এমন সচরাচর আসে না কারোর। উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জে গেলে মাইনে হত পাঁচ হাজার টাকা। ওখানকার মাটির তলায় খনির সম্বন্ধে গবেষণা করতে জামাইবাবুকেই পাঠানো ঠিক করলো ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট। মাইনে ছাড়া টি-এ আছে অনেক।

কিন্তু প্রত্যেকবার মিষ্টিদিদি বলেছে, 'আর দু'টো দিন আমার জন্যে সবুর করো, আর বেশিদিন কষ্ট দেব না তোমাদের।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেছে জামাইবাবু।

'আর দু'টো দিন, শুধু দুদিন, তার পরে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে যাব—তখন তুমি যেখানে খুশি যেয়ো।'

এ-সব আজ থেকে প্রায় পনরো বিশ বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু সেই অল্প বয়েসেও আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়েছে, এ ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। বড় স্বার্থপর মনে হয়েছে মিষ্টিদিদিকে। এই আরাম, এই বিশ্রাম, এই অর্থ-অপচয়, বিলাসিতা থেকে পাছে বঞ্চিত হয়, পাছে পরিশ্রম করতে হয় মিষ্টিদিদিকে—তাই যেন এই ছলনা।

শঙ্কর যখন পুজোর আর গরমের ছুটিতে আসতো বাড়িতে, জামাইবাবু যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। বলতো, 'ওদিকে যেয়ো না শঙ্কর, তোমার মার শরীর খারাপ, জানো তো—'

শঙ্করও যেন কেমন বিব্রত হত। ও-বয়সের ছেলেদের স্বাভাবিক ধর্ম হৈ-চৈ করা, খেলা, চিৎকার করা। কিন্তু পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল শেষকালে। যেন কলকাতায় আসতে ভাল লাগত না তার। আবার স্কুলে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো। কেবল বলতো, 'কবে যে ছুটি ফুরোবে!'

মনে আছে একবার বলেছিল, 'এখানে আমার বড় মন-মরা লাগে, ভালো লাগে না মোটে।'

'কেন!'

শঙ্কর বলেছিল, 'কী জানি।'

আপন যারা, তারা এত কম বয়সে পর হয়ে যায় কেমন করে তা ভেবে আমারও অবাক্ লাগতো। আমারও মা ছিল। যখন ছুটিতে বাড়ি গেছি, সে অন্যরকম। আমাকে আদর করবার জন্যে কতরকম আয়োজন—কত রান্না, কত কী উৎসব আনন্দ হত। আর এ-ও তো মিষ্টিদিদির ছেলে। বড়লোকের ছেলে! আরো আনন্দ হওয়া উচিত বৈকি।

কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও ভুলে হো হো করে হেসে উঠতো, কোথা থেকে ঝি এসে বলতো, 'চুপ করো খোকাবাবু, মার বুক কেমন করছে।'

মায়ের ঘরের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে যদি শঙ্কর কোনদিন ঢুকে পড়তো, অম্নি দশজন ঝি-চাকর হাঁ হাঁ করে উঠতো, 'এদিকে না—এদিকে না—'

বাড়িটা যেন হাসপাতাল। অথচ যে রোগী সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় খায়-দায়, সাজ-পোশাক করে। মিষ্টিদিদি বিকেলবেলা স্নান করে। স্নানের শেষে এসে বসে আয়নার সামনে। দু'জন ঝি আসে এগিয়ে। তখন বেরোয় রুজ, লিপষ্টিক, তেল, সেণ্ট, পাউডার—আরো কত কি! ভালো ভালো পোশাকী শাড়ি বেরোয়। ব্লাউজ বেরোয়। আলতা বেরোয়। একঘণ্টা ধরে সাজিয়ে-গুজিয়ে ফিটফাট করে দেয়। তারপর ইজি-চেয়ারটা বারান্দার সামনে রেলিং-এর গা ঘেঁষে রাখা হয়। সেই সাজ, সেই পোশাক পরে মিষ্টিদিদি তখন আস্তে আস্তে ইজি-চেয়ারে গিয়ে বসে। কোনো কথা নেই, কোনো কাজ নেই—শুধু বসে থাকা, আলস্যের ঢেউ-এ গা এলিয়ে দেওয়া। এত আলস্য যে কী করে সহ্য করে মিষ্টিদিদি, কে জানে। কিন্তু সবাই ভাবতুম—আর তো মাত্র দু'টো দিন, হয়ত আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা,—তারপরেই তো শেষ!

ছুটির সময় দেশে গেলে মা সব শুনে বলতো, 'ও মেয়ে মনোহরদাকেও অম্নি করে জালিয়েছে, ও পটলকেও জালিয়ে ছাড়বে, দেখিস।'

কিন্তু জামাইবাবুর অদ্ভুত ধৈর্য। স্ত্রীর জন্যে হাসিমুখে এমন আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ক্ষতি স্বীকার করতে আর কাউকে দেখিনি আমি। অথচ স্ত্রৈণ বলবো কেমন করে! কোথায় যেন মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কিংবা চেহারায় একটা যাদু ছিল।

রোজই সকালবেলা জামাইবাবু একবার করে মিষ্টিদিদিকে জিগ্যেস করতো 'আজ কী খাবে তুমি? কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

মিষ্টিদিদি কোনদিন বলতো, 'আজকে ফাউল আনতে বলে দাও ঠাকুরকে—'

কোনোদিন বলতো, 'আজ মাটন্—'

আবার কোনোদিন বলতো, 'আজ টোস্ট আর ফাউল কাট্‌লেট করতে বলো ঠাকুরকে।'

কোনো-কোনো দিন আবার বলতো, 'চলো আজ হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি, বাড়ির রান্না আর ভালো লাগছে না।'

এমন কোনোদিন হল না যেদিন মিষ্টিদিদি বলেছে,—'আজ শরীরটা খারাপ, কিছু খাবো না।'

জামাইবাবু যদি কোনদিন বলতো, 'এত শীতে আর না-ই বা বেরোলে, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর তো মাত্র ক'টা দিন—যে ক'দিন বাঁচি করে নিই।'

তা এসব হলো পনেরো বিশ বছর আগের ঘটনা।

মিষ্টিদিদির বাড়িতে থেকে আই. এ. পাস করেছি, বি. এ. পাস করেছি– এম. এ. পাস করেছি। করে চাকরি-সূত্রে তখন বিলাসপুরে আছি। খবর পেয়েছিলাম, মিষ্টিদিদি তখনও বেঁচে আছে। একদিনের জন্যেও কখনও জ্বর হতে শুনিনি, একদিনও উপোস করতে শুনিনি। আর শুনেছি মিষ্টিদিদির জন্যে জামাইবাবু নিজের প্রমোশন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত ত্যাগ করে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতেই আছে।

কিন্তু হঠাৎ মা'র চিঠিতে সেবার জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে চমকে উঠেছিলাম।

জামাইবাবুর তো কখনও অসুখ হতে দেখিনি। সে-মানুষ এমন হঠাৎ মারা গেল! জ্বর নয়, রোগশয্যায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা নয়, হঠাৎ নাকি হার্ট-ফেল করেছে।

কিন্তু ভয় হয়েছিল মিষ্টিদিদির জন্যে।

মিষ্টিদিদি এ-শোক কেমন করে সহ্য করবে কে জানে! জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই তো মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল করার কথা!

সমবেদনা জানিয়ে মিষ্টিদিদিকে একখানা চিঠিও দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু সে-চিঠির কোনো উত্তর পাইনি বহুদিন।

সেবার যখন কলকাতায় এলাম, দেখা করলাম গিয়ে।

ঠিক সেইরকম ইজি-চেয়ারে মিষ্টিদিদি বসে। রুজ, পাউডার, লিপস্টিক, সিল্ক, সেণ্ট, সাবান, ওষুধ—কোনো কিছুরই ব্যতিক্রম নেই। পাশেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ডাক্তার সান্যাল বসে ছিলেন।

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'অনেক কষ্টে তোমার মিষ্টিদিদিকে বাঁচিয়ে রেখেছি। খুব শক্ পেয়েছিলেন, তিন দিন সেন্স ছিল না একেবারে।'

বললাম, 'শঙ্কর কোথায়? শুনলাম সে নাকি কলকাতায় ফিরে এসেছে?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'এই তো বেরোল যেন কোথায়, তাকেও বারণ করেছি বেশি কাছে আসতে—এত উইক হার্ট, কোনো এক্সাইট্‌মেণ্টই সহ্য হবে না—কনস্টাণ্ট কেয়ার নিতে হচ্ছে।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'চলো একটু গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে আসি। গাড়িটা বার করতে বলো।'

ডাক্তার সান্যাল আপত্তি করলেন, 'এ অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয় আপনার—উইক হার্ট নিয়ে—'

মিষ্টিদিদি উঠলো। বললে, 'আর তো দু'টো দিন—দু'টো দিন হয়ত মোটে বাঁচবো—সারা জীবনই তো ভুগছি, এখন আর ভালো লাগে না—যা হয় হবে—'

মনে আছে, যে দু'দিন ছিলাম হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে, ডাক্তার সান্যাল দিনরাত মিষ্টিদিদির পাশে পাশে থাকতেন! কিন্তু আমার যেন কেমন ভাল লাগত না। মিষ্টিদিদির পোশাক পরিচ্ছদেও তখন কোনো পরিবর্তন দেখিনি। শাড়ি, গয়না, সিল্ক, সেণ্ট—তা-ও পুরোমাত্রায় রয়েছে। একবার মনে হল, হয়ত স্বাস্থ্যের জন্যেই ও-সব পরেছে। হঠাৎ বৈধব্যের সাজ পরলে হয়ত জামাইবাবুর কথা বেশি করে মনে পড়ে যাবে! সঙ্গে সঙ্গে শক্ লাগবে হার্টে। হয়ত সেইজন্যেই। হয়ত সেইজন্যেই জামাইবাবুর মস্ত অয়েল পেণ্টিংখানাও হল্ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সে রাত্রে মিষ্টিদিদির বাড়িতেই ছিলাম। শঙ্কর এল সন্ধ্যের পর।

আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে, 'ছোট-মামা, তুমি—'

বললাম, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?'

'কোথাও না—'

'সেই ছুপুরবেলা বেরিয়েছিলি, আর এলি এখন—এতক্ষণ কী করছিলি ?'

শঙ্কর যেন আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে দেখেছিলাম। বলেছিল, 'কিছু ভালো লাগছিল না, চৌরঙ্গীর ধারে মাঠে গিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে ছিলাম একলা-একলা।'

এ বয়েসের ছেলের পক্ষে এমন করে সময় কাটানো কেমন যেন অস্বাভাবিক।

বললাম, 'আজকাল খেলাধুলো করিস তুই ? সেই টেনিস খেলা কেমন চলছে তোর ?'

'এখানে এসে পর্যন্ত ও-সব ছুঁইনি, ছোট-মামা।'

সেদিন খাবার টেবিলে ডাক্তার সান্যালও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন মনে আছে। মিষ্টিদিদির পাশেই তাঁর চেয়ার। ডাক্তার পাশে বসা দরকার। কখন মিষ্টিদিদির কি বিপদ হয়!

শঙ্কর চুপচাপ বসে খাচ্ছিল।

মিষ্টিদিদি এবার বললে, 'ঠাকুর, তোমার বুদ্ধি তো বেশ, খোকাকে অত গুচ্ছের মাংস দিয়েছ কেন শুনি ?'

শঙ্কর অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'আমাকে বলছ, মা ?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো বলছি। অত খাচ্ছ কেন, খাওয়াটা হবে লাইট্, পেটে চাপ যেন না পড়ে—ঠাকুর না হয় ইডিয়ট্, কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ—তোমাদের স্কুলে এতসব শেখায়, হাইজিন শেখায় না ?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আপনি অত উত্তেজিত হবেন না, মিসেস সেন।'

মাছের একটা মুড়ো চুষতে চুষতে মিষ্টিদিদি বললে, 'আমি আর ক'দিন ডাক্তার সান্যাল। কিন্তু ছোট ছেলেরা যদি এই বয়েসেই স্বাস্থ্যের গোড়ার কথাগুলো না শেখে তো কবে শিখবে ?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আমি আপনাকে বার বার তো বলেছি মিসেস সেন, এই সব সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মোটে ভাববেন না, ওতে আপনার হার্ট আরও উইক হয়ে যাবে।'

মিষ্টিদিদি ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললে, 'ঠাকুর, আজকে চচ্চড়িতে ঝাল দিতে ভুলে গেছ তুমি ?'

ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। বললে, 'কই, ঝাল তো দিয়েছি, মা।'

'ছাই ঝাল দিয়েছ। ডাঁটা-চচ্চড়ি ঝাল না হলে খাওয়া যায় ?'

তারপর আমাকে সাক্ষী মেনে মিষ্টিদিদি বললে, 'হ্যাঁ রে, তুই-ই বল তো,—ঝাল হয়েছে চচ্চড়িতে ?'

বললাম, 'আমি তো চচ্চড়ি খাইনি।'

'কেন ? তুই চচ্চড়ি খাস না ?'

ঠাকুর বললে, 'ওটা শুধু আপনার জন্যেই করেছিলাম, মা।'

মিষ্টিদিদির গলা একটু চড়ে উঠলো, 'কেন ? শুধু আমার জন্যে কেন ? তুমি বুঝি আমাকে খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও ? আমি মরে গেলেই তোমরা বুঝি সবাই বাঁচো, না ?'

ঠাকুর রীতিমতো অপ্রস্তুত। শঙ্করও দেখলাম খাওয়া বন্ধ করে মুখ নিচু করে আছে। আমিও কম অপ্রস্তুত হলাম না। আমাকে চচ্চড়ি না দেওয়াতেই এই কাণ্ড।

মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার যেমন কপাল—যার হার্ট দুর্বল তার যে কেন বেঁচে থাকা।'

তারপর মাংসের বাটিটা শেষ করে বললে, 'অথচ যাঁর থাকবার কথা তিনি কেমন টপ্ করে চলে গেলেন, আর আমিই কেবল মরতে পড়ে রইলুম।'

ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আঃ, আমি বারবার আপনাকে বলছি না মিসেস সেন, ও সব কথা মোটেই মনে আনবেন না, ওতে মিছিমিছি দুর্বল হার্টটাকে আরো দুর্বল করা—'

তারপর ঠাকুরকে বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও তো ঠাকুর, আর আমাদের কিছু দরকার নেই। তোমরা সবাই মিলে দেখছি ওঁর রোগটাকে বাড়িয়ে দেবে কেবল।'

খানিক পরে আমার কানে কানে বললেন, 'শঙ্করকে নিয়ে তুমি চুপি চুপি টেবিল থেকে উঠে যাও তো, দেখছো তোমার মিষ্টিদিদি এক্সাইটেড হতে শুরু করেছে—যাও শিগগির—'

তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আমার। শঙ্করেরও খাওয়া শেষ হয়নি। কিন্তু মিষ্টিদিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তার পাতলা শরীরে যেন আগুন জ্বলছে, কান দুটো ঠিক যেন কয়লার মত লাল হয়ে উঠেছে। সত্যিই বোধহয় হার্টের প্যালপিটেশন হলে ওই রকম হয়।

সেদিন নিঃশব্দে শঙ্করকে নিয়ে উঠে এসেছিলাম খাবার টেবিল থেকে, মনে আছে।

মনে আছে, পরে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'মিস্টার সেন-এর শোকটা উনি এখনও ভুলতে পারছেন না কিনা—ওইটেই দিনরাত ভোলাবার চেষ্টা করছি—দেখছ না, মিস্টার সেন-এর অয়েল পেন্টিংখানা পর্যন্ত তাই সরিয়ে ফেলেছি ঘর থেকে।'

আর একদিন বলেছিলেন, 'ওঁরা তো ছিলেন আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড-ওয়াইফ্, তাই শোকটা অত লেগেছে মিসেস সেন-এর। উনি তো মাছ-মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি দেখলুম এই স্বাস্থ্যের ওপর যদি আবার খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার চলে তাহলে তো আর বাঁচাতে পারবো না আমি। শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে—'

যে-কদিন হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে ছিলাম, সে ক'দিন কেবল মনে পড়তো জামাইবাবুর কথা! সত্যিই তো, তাঁর তো যাবার কথা নয় এত শিগ্‌গির। কিন্তু এক-একবার মনে হত জামাইবাবু মরে গিয়ে বোধহয় বেঁচেছেন।

শঙ্কর আর আমি এক ঘরে, এক বিছানায় শুতাম। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হত যেন পাশে উসখুস করছে শঙ্কর!

ডাকতাম, 'শঙ্কর!'

'উঁ!'

'ঘুমোসনি এখনও?'

'ঘুম আসছে না যে, ছোট-মামা।'

'কেন ঘুম আসছে না রে, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলি বুঝি?'

'না, কোনও দিন রাত্তিরে ঘুম আসে না আমার।'

'কেন?'

'কী জানি।'

বারো বছরের শঙ্কর সেদিন তার ঘুম না-আসার কোনো কারণ বলতে পারেনি। আমিও যেন কারণটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি সেদিন।

একবার ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন মনে আছে।

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আমার আবার জন্মদিন কেন? আর ক'দিনই বা বাঁচবো!'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'আপনার জন্মদিনটা তো একটা উপলক্ষ্য, মিসেস সেন। লক্ষ্য, আপনাকে একটু আশা দেওয়া, আপনার জীবনটা যে মূল্যবান এইটে মনে করিয়ে দেওয়া। আপনি যেন এতে আপত্তি করবেন না, মিসেস সেন।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'কিন্তু আমি কি অত হৈ-চৈ গোলমাল উত্তেজনা সহ্য করতে পারবো? আমার হার্টের যা—'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'আমি তো আছি, মিসেস সেন, ভয় কি ? আপনার দীর্ঘ-জীবনের কামনা নিয়েই তো এই উৎসব। সংসারের খুঁটিনাটি থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখা—এতে হার্ট বরং ভালোই হবে, আমি বলছি। আপনি কোনো 'কিন্তু' করবেন না, আপনি যেমন রোজ ইজি-চেয়ারটায় বসে থাকেন তেমনি বসে থাকবেন শুধু, আমরা পাঁচজনে আপনার দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করবো।'

তা হলও তাই। ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল মিষ্টিদিদির ঘর। বিছানা, ফার্নিচার, ড্রেসিং টেবিল— যেদিকে মিষ্টিদিদির চোখ পড়তে পারে সবদিকে শুধু ফুল আর ফুল। শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়েছিল মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মোৎসব। মিষ্টিদিদি যেমন করে সেজেগুজে বসে থাকতো সেদিনও তেমনি করেই বসে ছিল। সন্ধ্যেবেলা শুধু আমরা তিনজন—আমি, শঙ্কর আর ডাক্তার সান্যাল আমাদের উপহারগুলো সামনের তেপায়া টেবিলের ওপর গিয়ে রেখেছিলাম। ডাক্তার সান্যাল দিয়েছিলেন দামী হীরে সেট্-করা একটা ব্রোচ্। এখন মনে হয়, সে জিনিসের দাম তখন ছিল খুব কম করেও আট ন'শো টাকা!

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'এত দামী জিনিস কেন দিলেন আমাকে—আমি আর ক'দিন বা পরতে পারবো এ-সব!'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'ওইসব কথা দয়া করে আজকের দিনে আর মুখে আনবেন না, মিসেস সেন!'

আমি আর শঙ্কর দিয়েছিলাম নিউমার্কেট থেকে কেনা রজনীগন্ধার দু'টো ঝাড়।

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'ফুলই আমার পক্ষে ভালো রে—ফুলের মতোই দু'দিন শুধু আমার পরমায়ু।'

বলতে বলতে কেমন করুণ হয়ে উঠেছিল মিষ্টিদিদির চোখ। পাতলা শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল একটু। কিন্তু ডাক্তার সান্যাল ছিলেন, তাই খুব সামলে নিয়েছিলেন সেদিন।

তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্ট-এর শিশিটা মিষ্টিদিদির নাকের কাছে দিয়ে আমাদের বলেছিলেন, 'যাও শঙ্কর—তোমরা এখান থেকে শিগগির চলে যাও! মিসেস সেনের অবস্থা যা দেখছি—'

মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা সেদিন সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রতি বছর যেখানেই থাকি, মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কখনও চিঠি, কখনও টেলিগ্রাম গেছে আমার কাছে। আর প্রত্যেকবারই আমি এসেছি। কিন্তু ভুলেও কখনো ফুল উপহার দিইনি। ফুল মিষ্টিদিদির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতো

না। ফুল দেখলেই নাকি তার মনে পড়তো, ফুলের মতোই তার ক্ষণস্থায়ী জীবন—ফুলের মতোই তার পরমায়ু ক্ষণিক। ও কথাটা মনে পড়া হার্ট-ডিজিজের 'রোগীদের পক্ষে তো মারাত্মক।

মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব প্রত্যেক বছরেই হত। শুধু মাঝখানে বছর দুই বন্ধ ছিল। সে-সময় ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নিয়ে ভিয়েনা গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে।

মিষ্টিদিদি নাকি প্রথমে রাজী হয় নি। বলেছিল, 'আর তো ক'টা দিন—তার জন্যে কেন মিছিমিছি কষ্ট করা।'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো আমি।'

আমি তখন স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি হয়ে চলেছি! কোনো খবর রাখতে পারিনি মিষ্টিদিদির! বিলাসপুর থেকে যাচ্ছি জব্বলপুরে। জব্বলপুর থেকে নাইনিতে। নাইনি থেকে এলাহাবাদে। শুনেছিলাম হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে শঙ্কর থাকতো একলা। কেমন যেন মায়া হত ওর কথা ভেবে। জন্মের পর থেকে বাপমায়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ ভোগ করবার অবকাশ হয়নি জীবনে। নিঃসঙ্গ নির্ভরহীন শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে তখন সবে পা দিয়েছে শঙ্কর। মনে হত, এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিলে ভালো হয়! কিন্তু কে দেবে?

সেবারে কথাটা পেড়েছিলাম মিষ্টিদিদির কাছে।

বলেছিলাম, 'এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিয়ে দাও, মিষ্টিদিদি।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আর ক'টা দিন, তারপরেই তো আমার ইহলীলা শেষ। তখন সবাইকে ছুটি দিয়ে যাবো আমি, শঙ্করও বিয়ে থা করে সুখে থাকতে পারবে। আর দু'টো দিন আমার জন্যে ও সবুর করতে পারবে না?'

ভিয়েনা থেকে ফিরে আসার পর যেবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে আবার নিমন্ত্রণ হল, সেবার ভেবেছিলাম স্বাস্থ্য বোধ হয় ফিরেছে মিষ্টিদিদির। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, সেই একই অবস্থা। তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে আগেকার মতো।

আমার আনা উপহারটা সামনের টেবিলে রেখে জিগ্যেস করেছিলাম, 'কেমন আছ, মিষ্টিদিদি?'

মিষ্টিদিদি তেমনি সিল্ক, সার্টিন, জর্জেট, স্নো, পাউডারে মুড়ে বসে ছিল।

বললে, 'আমার আর থাকা—আর বোধ হয় বেশিদিন নয়—!'

বললাম, 'বাইরে গিয়েও সারলো না শরীর?'

মিষ্টিদিদি বললে, 'এ মরবার আগে আর সারছে না রে!'

বলে চকোলেট চুষতে লাগলো।

কিন্তু শরীর সারাবার জন্যে মিষ্টিদিদির চেষ্টারও তা বলে অন্ত ছিল না। ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে আনতেন। কখনও পুরী, কখনও চিল্কা, কখনও অন্য কোথাও। ডাক্তার সান্যাল কবে একদিন চিকিৎসা করতে এসেছিলেন মিষ্টিদিদিকে। সে কোন্ যুগে। জামাইবাবু তখন বেঁচে। তারপর কতদিন কেটে গেল। রোগও সারলো না মিষ্টিদিদির, আর ডাক্তার সান্যালও গুরু দায়িত্ব থেকে বুঝি মুক্তি পেলেন না।

হঠাৎ সেবার শঙ্করের আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে দৌড়ে এসেছিলাম কলকাতায়।

এমন আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটলো, যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে।

ভয় হয়েছিল এবার আর মিষ্টিদিদিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। শঙ্করের এমন শোকে নিশ্চয়ই মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করবে। সেবার জামাইবাবুর শোক মিষ্টিদিদি যদিও বা ভুলতে পেরেছে ডাক্তার সান্যালের চেষ্টায়, শঙ্করের অপমৃত্যুর আঘাত নিশ্চয়ই অসহ্য হয়ে উঠবে। হয়ত গিয়ে দেখবো শঙ্কর তো নেই-ই, মিষ্টিদিদিও বেঁচে নেই আর।

অত্যন্ত ভয়ে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌছলাম। শঙ্করের এমন পরিণতি হবে ভাবতেই পারিনি। একবার ভেবেছিলাম শঙ্কর হয়ত মিষ্টিদিদিকে আঘাত দেবার জন্যেই এই পথ বেছে নিয়েছে। হয়ত শঙ্কর ভেবেছিল, এই ভাবেই একমাত্র মিষ্টিদিদির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

কিন্তু শঙ্কর তো জানতো না মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট।

ভেতরে ঢোকবার রাস্তাতেই বাইরের ঘরে ডাক্তার সান্যাল বসেছিলেন।

বললেন, 'এসেছ তুমি—শুনেছ বোধ হয় খবরটা—?'

বললাম, 'শঙ্কর কেন এমন করলো? কী হয়েছিল?'

ডাক্তার সান্যাল সে-বৃত্তান্ত বললেন। বরাবর নির্বাক নির্বিরোধ শঙ্কর, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি! মনে আছে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'যদি সুইসাইড না করতো শঙ্কর তো নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত শেষকালে—দেখতে—'

বললাম, 'মাথা-খারাপই বা হল কেন?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'ডাক্তারী শাস্ত্রে একে বলে 'মেনিয়া'। বেশি ব্রুডিং নেচারের লোক হলে এ-রকম হয়। হয় সুইসাইড করে, নয়তো পাগল হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।'

তারপর বললেন, 'তোমার মিষ্টিদিদিকে যেন এ খবরটা বোলো না আবার। ওঁকে জানানো হয়নি এখনও।'

'মিষ্টিদিদি জানে না?'

'না, জানানো হয়নি, জানালে এ-যাত্রা আর বাঁচাতে পারতুম না। মিস্টার সেন-এর বেলায় জানি কিনা—হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো, ছেলের মৃত্যু কোনো মা-ই সহ্য করতে পারে না, তার ওপর মিসেস সেন-এর হার্ট-এর অবস্থা এখনও খারাপ, যে-কোনো দিন যে-কোনো বিপদ ঘটতে পারে।'

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে মিষ্টিদিদির ঘরে ওঠবার সময় মনে আছে আমার যেন খুন চেপে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল শঙ্করের অপমৃত্যুর খবরটা আমিই শোনাবো মিষ্টিদিদিকে। দেখি পরখ করে মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল হয় কিনা! যদি হয়, তাতেও আমার দুঃখ নেই। মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদির নাম কে রেখেছিল জানি না, কিন্তু মিষ্টিদিদির কোনখানটাই যেন আর মিষ্টি নয়।

কিন্তু সমস্ত সঙ্কল্প আমার মিষ্টিদিদির সামনে গিয়ে ভেসে গেল।

সেই সিল্ক, সেন্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডার! সেই ইজি-চেয়ার, সেই শরীর-খারাপের অভিযোগ। সেই চকোলেট চোষা। সেই ঝিকে দিয়ে মিষ্টিদিদির পায়ে হাত বুলিয়ে নেওয়া।

সত্যিই, কিছু বলতে পারলাম না সামনে গিয়ে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'আর ক'টা দিন, তারপর তোদের সবাইকে মুক্তি দেব।' বলে চকোলেট চুষতে লাগলো মিষ্টিদিদি।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট থেকে তার পরদিন দেশে গিয়েছিলাম। মা বললে, 'শঙ্কর আমাদের সোনার টুকরো ছেলে তাই অপঘাতী হল, নইলে অন্য ছেলে হলে মাকেই খুন করতো। মনোহরদা বেঁচে থাকলে ও-মেয়েকে গুলি করে মারতো, দেখতিস।'

বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কেন?'

'তা না তো কি, কোথায় ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবে, তা নয়, বিধবা মাগী বিয়ে করে বসলো। শঙ্কর কি সাধ করে অপঘাতী হয়েছে ভাবিস!

বললাম, 'কে বিয়ে করেছে?'

'ওই মিষ্টি, ডাক্তারকে কিনা বিয়ে করে বসলো অত বড় ছেলে থাকতে!

তা এসব ঘটনাও প্রায় পনরো বিশ পঁচিশ বছর আগেকার! তারপর প্রতি

বছরেই মিষ্টিদিদির জন্মদিনটিতে কলকাতায় গেছি। উপহার দিয়ে এসেছি যথারীতি। ডাক্তার সান্যাল প্রতিবারের মতো মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যের জন্যে সতর্কতা নিয়েছেন— কোনো উত্তেজনা না হয় কোনো অশান্তি না হয় মনে! তাহলেই মিষ্টিদিদিকে আর বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার সান্যাল বার বার বলেছেন, মিষ্টিদিদির হার্টের যা অবস্থা তাতে যে-কোন দিন যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! কিন্তু গত পনরো বিশ পঁচিশ বছর কত কোটি মুহূর্ত নিঃশব্দে মহাকালে গিয়ে লয় হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তারপর যেবার ডাক্তার সান্যালেরও মৃত্যু-সংবাদ পেলাম সেবারও ভালো করে জানতাম কিছুই ঘটবে না মিষ্টিদিদির। বেশ জানতাম, মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট! ভালো করে জানতাম, মিষ্টিদিদি আর যা-ই হোক—মিষ্টি নয় মোটেই। তবু গেছি মিষ্টিদিদির বাড়িতে। মিষ্টিদিদির জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আমি এড়াতে পারিনি কখনও।

এই গত বছরেও আবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কলকাতায় এসেছিলাম।

ভালো করেই জানতাম—মিষ্টিদিদি তেমনি ইজি-চয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। পায়ে সুড়সুড়ি দেবে ঝি। সিল্ক, 'সেণ্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডারে মুড়ে সেজেগুজে চুপ করে থাকবে। তেমনি প্রতিবারের মতোই উপহার দেব গিয়ে। উপহারটা রাখবো গিয়ে তেপায়া টেবিলের উপর। বলবো, 'কেমন আছো মিষ্টিদিদি?'

মিষ্টিদিদি তেমনি করেই বলবে, 'আমার আর থাকা, আর তো দুটো দিন! দু'টো দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো রে!'

বলে মিষ্টিদিদি তেমনি করেই ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে চকোলেট চুষবে আর আরামে গা এলিয়ে দেবে প্রতিবারের মতো। সত্যি, সৃষ্টিকর্তা যেন মিষ্টিদিদিকে অক্ষয় পরমায়ু দিয়ে পাঠিয়েছিল এ সংসারে!

কিন্তু গতবারের জন্মদিনে মিষ্টিদিদি সত্যি সত্যিই আমাক অবাক্ করে দিয়েছিল। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েও প্রথমে টের পাইনি।

তেমনি চাকর-বাকর-ঝি-মালী সবই ছিল। কিন্তু সেই পরিচিত ইজি-চেয়ারটা খালি।

একজন ঝিকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'মিষ্টিদিদি কোথায়?'

ঝি বললে, 'ঘরে শুয়ে আছেন—অসুখ করেছে।'

জিগ্যেস করলাম, 'অসুখ কবে হল?'

ঝি বললে, 'কাল থেকে। হঠাৎ পড়ে গেছেন কাল।'

তা সত্যি অসুখ হয়েছিল মিষ্টিদিদির! ঘরে গিয়ে দেখি চিত হয়ে শুয়ে আছে

খাটের ওপর। সমস্ত দেহটা অসাড়। অনড়। ধরে পাশ ফেরাতে হয়। মুখ তুলে খাইয়ে দিতে হয়। সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। প্যারালিসিসে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে মিষ্টিদিদিকে। তবু তারই মধ্যে কেউ বুঝি পাউডার, স্নো, রুজ, লিপষ্টিক মাখিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছে। পায়ে কোনো সাড় নেই। তবু একজন ঝি পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে নিচেয় বসে বসে।

বরাবরের অভ্যেস মতো বলেছিলাম, 'কেমন আছ মিষ্টিদিদি ?'

মিষ্টিদিদি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল, কিছু কথা বলতে পারেনি ! শুধু ঠোঁট দুটো যেন ঈষৎ নড়তে লাগলো। মনে হল যেন বলতে চাইছে,—'আমার আর থাকা থাকি···আর ক'টা দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো···এবার সত্যি আর বেশিদিন নয় রে···

মিষ্টিদিদির চোখ দিয়ে জল পড়ে পাউডার-স্নো ধুয়ে গেল ! মিষ্টিদিদির চোখে সেই প্রথম জল দেখলাম জীবনে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদি যেন এখনও মিথ্যে কথা বলছে, ধাপ্পা দিচ্ছে আমাদের—এ-ও যেন ভান, এ-ও যেন মিষ্টিদিদির নতুন একরকমের ছল। একেবারে না মরলে আর মিষ্টিদিদিকে যেন বিশ্বাস নেই।

আমার মাসিমা

মাসিমা আর মেসোমশাই-এর সম্পর্কটা আমার কাছে বড় বিচিত্র লাগতো বরাবর।

মা বলতো, 'আহা ! কী কপাল করেই যে এসেছিল রাঙাদি—'

সত্যিই হিংসে করবার মতো কপালই বটে রাঙা মাসিমার। খুব ছোটবেলায়, মনে পড়ে, রাঙা মাসিমার বাড়ি গেছি। তখন ভাড়াটে বাড়ি ছিল। রাঙা মাসিমা নিজের হাতে রান্না করা, ময়লা কাপড় সেদ্ধ করা, যাবতীয় কাজ করেছে। মেসোমশই পর্যন্ত কখনও মুড়ি ছাড়া আর কিছু জলখাবার পায়নি।

আমাকে দেখিয়ে মেসোমশাই বলেছে, 'ওকে দুটি মুড়ি দাও না।'

মাসিমা বলেছে, 'ওরা আর মুড়ি খায় না আমাদের মতন।'

তারপর হাতের কাজ করতে করতে বলেছে, 'ওর বাবা তোমার মতো আর অকম্মা লোক নয়—ওদের তিনজনের সংসার, তবু চার সের দুধ নেয় ওর মা, তা জানো?'

মেসোমশাই বলেছে, 'তা মুড়ি কি খারাপ জিনিস, গা! বর্ষাবাদলের দিনে তেলনুন মেখে মুড়ি খেতে তো বেশ লাগে আমার।'

রাঙা মাসিমা রেগে গিয়ে বলেছে, 'তোমার মতো লোকের হাতে পড়ে মুড়ি ছাড়া যে আর কিছুই জুটবে না তা আমি জানি। যেমন ফুটো কপাল আমার!'

তখনও মেসোমশাই জজ্ হয়নি। সামান্য উকিল মাত্র! বউবাজারের একটা গলিতে সে যে কী বাড়িতে থাকত! একখানা মাত্র শোবার ঘর। তারি মধ্যে ঢালোয়া বিছানা। তিন-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই একটা ঘরের মধ্যে থাকা। আর রান্নাঘরটায় গোলপাতার ছাউনি। সেই এক চিল্‌তে রান্নাঘরের মধ্যে দিনরাত কাটতো মাসিমার! কিন্তু তবু কত যে পরিপাটি কাজ! রান্না সারা হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে, মেসোমশাই কোর্টে—তখন যত রাজ্যের কাজ মাসিমার। বড়ি শুকোতে দিয়েছে রোদ্দুরে, ক্ষার কাচতে বসেছে, কিংবা চাল বাছতে শুরু করেছে কুলো নিয়ে। অথচ একটা ঝি নেই, চাকর নেই!

মেসোমশাই কতবার বলেছে, 'একটা বিধবা মেয়েমানুষ আছে, ওরা বলছিল—মাইনে নেবে না, শুধু খাবে—রাখলেও তো পারো।'

রাঙা মাসিমা ঝাঁজিয়ে উঠত, 'থামো তুমি, তোমার মতো অকম্মা লোকের হাতে যখন পড়েছি, তখন জানি আমার কপালে কষ্ট আছে—জিজ্ঞেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু ওর মাকে কখনো নিজে রাঁধতে হয়নি।'

মেসোমাশাই বলত, 'তা বলে তোমার একটা অসুখ-বিসুখ করলে তখন?'

মাসিমা বলতো, 'অসুখ-বিসুখ হলে তো বেঁচে যাই, আমাকে আর ভূতের বেগার খাটতে হয় না তোমার সংসারে।'

মেসোমশাইকে দেখেছি ভোর বেলা উঠে নিজের হাতে নিজের জামাকাপড় কেচে ঘর পরিষ্কার করে বাইরের ঘরে কাজ নিয়ে বসে গেছে। তারপর চট করে এক ফাঁকে মক্কেলকে বসিয়ে রেখে বাজারও করে এনেছে।

মাসিমা দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠেছে।

'ওকি, মাছের থলি আর আনাজের থলি একাকার করে ফেললে যে, ছিষ্টি আঁশ করে ফেললে যে তুমি, অমন বাজার করবার মুখে আগুন—নাও, হাত ধোও।'

নিজেই জলের ঘটি নিতে যাচ্ছিল মেসোমশাই।

আবার হৈ হে করে উঠেছে মাসিমা।

'এই দেখো, আমার হেঁশেল শুদ্ধ আঁশ করে দেবে নাকি! কী অকম্মা লোকের হাতেই পড়েছি মা! বলি আঁশ হাতে যে হেঁশলের ঘটি ছুঁচ্ছিলে তুমি!'

মেসোমশাই হয়ত তখন সত্যিই বড় ব্যস্ত। বাইরের ঘরে মক্কেল বসিয়ে রেখে এসেছে! একটু যেন গলা চড়িয়েই বললে, 'তা আমার হাতে একটু হাত ধোবার জল দাও, মক্কেলরা বসে আছে যে সব—'

মাসিমা রান্নাঘর থেকে বলে, 'তা তোমার মক্কেলরাই বড় হল গা তোমার কাছে! ওলো, কর্তার কথা শোন্ তোরা, শুনেছিস অনাছিষ্টির কথা—' বলে সাক্ষী মানতো ছেলেমেয়েদের।

আমায় লক্ষ্য করে মেসোমশাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাসিমা কতদিন বলতো, 'এই আমা-হেন গিন্নী পেয়েছিলে বলেই এ-যাত্রা টি'কে গেলে তুমি—যা বলব—'

তারপর একটু থেমে বলতো, 'একবার ইচ্ছে হয় দেখতে আমি দু'দণ্ড চোখ বুঁজলে তুমি কেমন করে চালাও সব।'

আমরা তখন অতি ছোট। সব জিনিস বোঝবার বয়েস হয়নি। দেখতাম, মাসিমার কথা শুনে মেসোমশাই কেমন নিরুত্তর হয়ে থাকতো। অত যে অভিযোগ অনুযোগ, সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মেসোমশাই নির্বিকার চিত্তে আদালতের নথিপত্র পড়ছে। নিজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে টাকা এনে সংসারে তুলে দিচ্ছে মাসিমার হাতে। মাসিমা আবার সে টাকা আঁচলে গেরো বেঁধে রাখছে কিন্তু একটা কোনো খরচের জন্যে টাকা চাইলেই মাসিমা আগুন। বলতো, 'কোত্থেকে টাকা পাবো সে হিসেব রাখো—টাকা কোথায় পাবো—টাকা আমার হাতে নেই।'

মেসোমশাই বলতো, 'তা ছেলেটার জ্বর, ওষুধ তো আনতে হবে—'

মাসিমা তখন সে-দৃশ্য থেকে দূরে সরে গেছে।

মেসোমশাই রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বললে, 'ওষুধটা তাহলে এনে দিয়ে যাই—'

'তা যাও না, কে বলছে যে ওষুধ এনো না?'

'টাকা দাও দুটো।'

মাসিমা বললে, 'টাকার কি গাছ আছে আমার, না আমি পুরুষ মানুষ, চাকরি করে টাকা আনব। তা আমি যদি পুরুষ মানুষ হতুম, তো সংসারের এমন দশা হত

না! জিগ্যেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু ক'টা ঝি আর ক'টা চাকর রেখেছে ওর বাবা।'

ঝি-চাকর আসে। মেসোমশাই বলে-কয়ে দশজনকে খোশামোদ করে বাড়িতে আনে। চাকরকে লুকিয়ে লুকিয়ে বলে যায়, 'একটু যদি বকুনি-টকুনি দেয় তোর মা, তো কিছু মনে করিসনি বাবা, তোকে আমি আলাদা বকশিশ দেব। যদি ভাত খেয়ে পেট না ভরে তো আমাকে বলিস—আমি তোকে পয়সা দোব, দোকান থেকে কিনে খেয়ে নিস্।'

কিন্তু অশান্তি আরো বেড়ে যেতো তাতে।

মক্কেলদের সঙ্গে কাজের কথা বলতে বলতে এক-একবার কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা হয়। চাকরের সঙ্গে মাসিমার বচসার আর অন্ত থাকে না।

মাসিমা বলে, 'ডাক্ তো তোর বাবাকে। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো—বেশ ছিলাম সুখে, চাকর-বাকর বাড়িতে ঢুকিয়ে এ এক 'কাল' হল। দুটো মানুষের ভাত খাবে অথচ কাজের বেলায় এত ফাঁকি। এ তো চাকর আনা নয়, আমাকে জ্বালানো —যেমন হয়েছে কর্তা, তেমন হয়েছে কর্তার চাকর!'

তারপর যথারীতি একদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসে দেখে সব নিস্তব্ধ।

মেসোমশাই জিগ্যেস করে, 'হরি কোথায় গেল?'

মাসিমা বোধ হয় এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল। বললে, 'যেমন তুমি অকম্মা বাবু, তেমনি তোমার অকম্মা চাকর। ও কাউকেই আমার দরকার নেই। আমার যেমন কপাল, তোমার মতন লোকের হাতে যখন পড়েছি, তখনই জানি অদেষ্টে আমার অনেক কষ্ট। জিজ্ঞেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু—'

এ-সব কথা যখনকার তখন আমরা খুব ছোট। তারপর বউবাজারের বাড়ি ছেড়ে মেসোমশাই কলেজ স্ট্রীটের ওপর সদর রাস্তায় বাসা নিয়েছে। আয় বেড়েছে। ছেলে-মেয়েদের বয়েস হয়েছে। খুকুর বিয়ে হয়ে গেছে এক বড় ঘরে। খুকুর বিয়েতে মেসোমশাই জাঁকজমক করেছিল খুব। সে-বিয়েও মেসোমশাইয়ের এক মক্কেলের কল্যাণেই। একটা পয়সা নেয়নি পাত্রপক্ষ। মক্কেলরা গাদা-গাদা জিনিস-পত্তোর দিয়ে গেছে বাড়িতে বয়ে। ধন্য ধন্য করেছে সব আত্মীয়-স্বজন নতুন কুটুম দেখে। বরকর্তা বলেছে, জিতেনবাবু এমন সজ্জন লোক, তাঁর মেয়ের বিয়েতে আমরা টাকা নেব না।' কেবলমাত্র মেসোমশাইকে দেখেই পাত্রী পছন্দ করেছে তারা। এমন সাধু লোকের মেয়ে ঘরে আনতে পারাও যেন বহু পুণ্যের ফল।

মাসিমা কিন্তু তখনও সেই ভিড়ের মধ্যে বলেছে, 'ওঁর সাধ্যি কি ওই মেয়ে পার

করেন, যা দেখছো মা, সব এই আমি হেন মেয়ে ছিলাম বলে—কোনো যুগ্যিতা নেই তো ওঁর।'

গায়ে-হলুদ দেখে সব লোক অবাক্। মেয়েকে দিতে আর কিছু বাকি রাখেনি।

মাসিমাও গরদের জোড় পরে বললে, 'দেখছ তো মা তোমরা ওই অকম্মা মানুষটিকে, সেই মেয়ে-দেখার সময় থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু সব আমাকে করতে হচ্ছে, একটা কাজ তো ওঁকে দিয়ে হবার উপায় নেই।'

মেসোমশাই সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মাসিমা বললে, 'হাসছ কি, এই তো সবাই সাক্ষী আছে, বলুক দিকি কেউ তুমি কোন্ কাজটা করেছ, যে-কাজটা আমি দেখবো না সব তো পণ্ড করবে, এমন কপাল আমার মা, যে একা হাতে সব কাজ করতে হবে!'

সত্যি মাসিমাও মেসোমশাইকে দেখে এক-একবার অবাক্ হয়ে যেত। বলত, 'আমার একবার কাছারিতে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে, তুমি কেমন করে কাজ চালাও সেখানে।'

উকিল থেকে আস্তে আস্তে মেসোমশাই জজ্ হল। গোলদীঘির পেছনে মস্ত বাড়ি কিনলে। মণ্টু তখন ডাক্তারি পাশ করে রেলে চাকরি নিয়েছে। মেজ ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে কাশী থেকে। জম-জমাট সংসার। তিনটে চাকর, দু'টো ঝি। আত্মীয়-স্বজন, নাতি-নাতনি, বিধবা-সধবা গলগ্রহের কল-কোলাহলে বাড়ি পূর্ণ। তার মধ্যে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মাসিমার কেবল ওই এক কথা!

'হলে কি হবে মা, আমি যেদিকে দেখব না, সেইদিকেই তো চিত্তির! যেমন হয়েছে বাড়ির অকম্মা কর্তা, তেমনি সবাই, একটা মানুষ যদি কাজের··· সবাই এ বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে!'

গৃহ-প্রবেশের দিনে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে।

গিয়েই মাসিমার গলা শুনতে পেলাম। বলছে, 'আচ্ছা, তুমি একটা অকম্মা মানুষ, তুমি আবার কাজের ভিড়ের মধ্যে কেন শুনি—'

মেসোমশাই বুঝি নিজের গামছার খোঁজে এসেছিল অন্দরমহলের ভেতর। মাসিমার মন্তব্য শুনে আবার যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। কোন বিরক্তি নেই, বিরাগ নেই—সদাশিব ধীর স্থির শান্ত মানুষটি বরাবর। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের ধৈর্য, সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা দিয়ে অক্লান্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বিত্তশালী হয়েছে, কিন্তু কোনো হিংসা, ক্ষোভ, দুর্ব্যবহার নেই কারো ওপর।

মাসিমা বলে, 'এও বলে রাখছি বাপু তোমাদের (তোমরা এখন বড় হয়েছ,

সব বুঝতে পারো), এই আমার মতো গিন্নী পেয়েছিল বলেই তোমার মেসোমশাই এই বাড়ি-ঘর-দোর করতে পারলে কলকাতায়।'

পুত্রবধূদের ডেকে বলে, 'এই শোন বৌমারা, এই আজ আমাকে দেখছ তোমরা এমনি, এই আমিই একদিন ছেলে মানুষ করা থেকে এই কলকাতায় বাড়ি করা পর্যন্ত সব একা করেছি। আমি না থাকলে ওই ছেলেরাও মানুষ হত না, মেয়েদেরও বিয়ে হত না। ওই অকম্মা মানুষ শুধু মাসে মাসে ক'টা টাকাই এনে তুলে দিয়েছে আমার হাতে, আর তো কোন যুগ্যিতা ছিল না ও-মানুষের!'

যে-মানুষের কোন যোগ্যতা ছিল না, সে-মানুষ সামান্য অবস্থা থেকে এত বড় কেমন করে হল এ-প্রশ্ন কেউ কোনোদিন করেনি মাসিমাকে। দিনে দিনে বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে; পুত্র, পৌত্র, ধন জন কিছুরই অভাব থাকেনি মাসিমার। সে মুড়ি খাওয়া এখন উঠে গেছে। এখন সংসারে দৈনিক পাঁচ সাত সের দুধ খরচ হয়। নাতনিদের এক খেপে গাড়ি করে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর কর্তাকে কোর্টে পৌঁছে দেয়। মেসোমশাই গরমের ছুটিতে মাসিমাকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। সংসার জ্বল্‌জ্বল্ করছে। চারিদিকে সাফল্য, চারিদিকে সাচ্ছল্য! পাড়ার পাঁচ-দশজন লোক রোজ এসে কুশল প্রশ্ন করে যায়। দেশের দশ-বিশটা ব্যাপারে মেসোমশাইএর ডাক পড়ে। কত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে দাতব্য করতে হয়। সময় পায় না মেসোমশাই সব জায়গায় যেতে।

তবু ক'জন আমায় পীড়াপীড়ি করছিল ক'দিন ধরে, মেসোমশাইকে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে বলবার জন্যে। আমিও মাসিমাকে দিয়ে বলাবো ভাবছিলাম।

মাসিমা শুনে বললে, 'ও-মানুষকে তো চিরটা কাল দেখে আসছি, বিয়ে হওয়া এস্তোক আমাকে জ্বালিয়েছে। ওঁকে দিয়ে তোদের কাজের কী সুসার হবে বলতো?'

মাসিমা সত্যিই হেসে বাঁচে না।

বলে, 'ওঁকে সভাপতি করবে, তবেই হয়েছে—তোরা আর লোক পেলি নে রে—'

কথায় কথায় মাসিমা খোঁটা দেয়, 'ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, জিগ্যেস করো না ওকে, ওদের তো তিনজনের সংসার, এখন না-হয় ওর বউ ছেলেমেয়ে হয়েছে, কিন্তু ওর মা কোন্ দিন সংসারের কোন্ কুটোটা নেড়েছে—বলুক ও।'

কখনও কখনও রেগে বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলে, 'পারব না আমি এত দেখতে, তোমার সংসার তুমি দেখ, আমি পারব না। বিয়ে হয়ে এ-বাড়িতে ঢোকা ওব্দি এক দণ্ডও ফুরসুৎ পেলাম না মা—। কেন, কী আমার দায় পড়েছে।

হোক্‌গে সব লণ্ড-ভণ্ড, তুমি নিজে দেখতে পারো ভালো, নইলে রইলো সব পড়ে—সব অপচো-নষ্ট হোক্‌, আমি ফিরেও দেখবো না আর।'

বলে মাসিমা নিজের শোবার ঘরে বিছানায় উঠে গিয়ে বসে।

বড় বউমা লোক ভালো। মন-রাখা কথা বলতে জানে।

বলে, 'মা, আপনি এখানে বসে থাকলে কেমন করে কী করবো, আমরা ছেলেমানুষ, কী বুঝি—আপনি সামনে বসে দেখিয়ে দিন, আমরা শিখে নি।'

মাসিমা বলে, 'কেন, উনি কোথায়, তোমার শ্বশুর—'

'তিনি তো বাইরের ঘরে।'

'ডাক তাঁকে, ডেকে আনো, দেখুন না এসে সংসারে হুজ্জুতটা কত!'

'তা কি আর কেউ জানে না মা, সবাই জানে, আপনি তবু একবার চলুন নিচেয়।'

'না, তুমি যাও বউমা, আমি যাবো না, একদিন ও-মানুষ দেখুক কাজটা কী হয় সংসারে, বাইরে বাইরে শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান তো নয়, তোমার শ্বশুরের কথা বলছি, সারা জীবনটা আমার এমনি করে হাড়ে হাড়ে জালিয়েছে বউমা, একটা দিনের তরে শান্তি পাইনি আমি, এমন অকম্মা লোকের হাতে পড়েছিলুম মা!'

বলতে বলতে মাসিমার চোখ সত্যিই ছলছল করে ওঠে।

সাধারণতঃ মাসিমা কাক-কোকিল ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে ওঠে। সেই সুরু হয় চরকির মতো পাক খাওয়া। কে কী খাবে, কোথায় অপচয় হচ্ছে, কার কী প্রয়োজন, সমস্ত জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। যেখানকার যে-জিনিস সেখানে না থাকলেই অনর্থ। রান্নাঘরের পাশে উঠোনের ঝাঁটাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মাসিমা সৌরভীকে ডেকে দু'কথা শুনিয়ে দেবে, 'হ্যাঁ গা মেয়ে, উঠোনের ঝাঁটাটা যে বড় কাত হয়ে পড়ে আছে, এ কেমন ধারা অনাছিষ্টি কাজ গা—সবাই কি বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে!'

এদানি মাসিমা পূজোর সময় প্রতি বছরেই একটা-না-একটা গয়না গড়াত। বউদের যা হবার তা তো হয়ই। সেবার কাজের ভিড়ে স্যাকরাও সময়মত জিনিসটা গড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। বার বার লোক দিয়ে তাগাদা দিয়েও মহালয়া পেরিয়ে গেল।

মাসিমা সেদিন একেবারে মেসোমশাই-এর সদরে গিয়ে হাজির! মেসোমশাই কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মাসিমাকে দেখে অবাক্‌। মেসোমশাই মুখ তুলে চাইতেই মাসিমা বললে, 'বলি, তোমাকে তো বলা বৃথা,—তুমিতোমার রাজকাজ্য নিয়েই ব্যস্ত!'

'কি, হল কী ?'

'বলি, সংসারের তো তুমিও একজন, না তুমি সংসার ছাড়া ? সংসারে থাকতে গেলেই দু'চার কথা বলতে হয় তাই বলি, নইলে আমার আর কী ? যেদিন মরে যাবো, দু'চক্ষু বুঁজবো, সেদিন তোমাকে বলতে আসবো না—তুমিও নিশ্চিন্তে রাজকাজ্য করবে। তা ভেবো না, তোমাকে আমি দুষছি, দোষ তোমারও নয়, দোষ আমারই পোড়া কপালের। তা নইলে এত লোক থাকতে তোমার মত অকম্মা লোকের হাতেই কিনা আমায় পড়তে হয়—'

মেসোমশাই কিছু বুঝতে না পেরে বললে, 'কী, হল কী, বুঝতে পারছিনে তো।'

মাসিমা বললে, 'হ্যাঁ গা, আমার কপালেই কি যত অকম্মা জুটতে হয়! চাকর, ঝি, বউদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তারা না হয় কেউ আপনার জন নয়, কিন্তু গয়লা, স্যাকরা এদেরও কী বেছে বেছে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে জ্বালিয়ে খাবার জন্যে ?'

সেদিন গয়লা এলে তাকে সোজা শুনিয়ে দিলে মাসিমা, 'তোকে আর দুধ দিতে হবে না বাছা, কত্তার রক্ত-জল-করা পয়সা, আর তুই এমনি করে ঠকাবি ; কত্তা না হয় মানুষ নয়, তা আমরাও কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি ?'

কতদিন ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি আমাদের সকলের সামনে মাসিমা দুঃখ করে মেসোমশাইকে বলেছে, 'তোমার হাত থেকে যে কবে নিষ্কৃতি পাবো কে জানে, আর জন্মে কত পাপই করেছি !'

মাসিমা বলত. 'সেই এগারো বছর বয়েসে বউ হয়ে ঢুকেছি এ-বাড়িতে আর এখন বুড়ী হয়ে গেলুম, সুখ যে কী দ্রব্য তা জানলুম না এ-জীবনে।'

মা বাবাকে বলত, 'পড়তে তুমি দিদির হাতে তো বুঝতে ঠেলা, অমন দেবতার মতো স্বামী, তা-ও উঠতে-বসতে গঞ্জনা !'

বাবা বলত, 'তোমার দিদি বুঝবে মজা একদিন—কর্তা মারা যাওয়ার পর ছেলেরা কী করে দেখো।'

আমাদের জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে আসছি মাসিমাকে ওই একই রকম! আগে যখন মেসোমশাই-এর অবস্থা খারাপ ছিল তখনও অভিযোগের অন্ত ছিল না। তারপর সংসারী মানুষের যা কিছু কাম্য, কিছু আর পেতে বাকি ছিল না মাসিমার। ঐশ্বর্য, সম্পদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য. সচ্ছলতা, পরিজন. দাসদাসী। তারপর ভবানীপুরের প্রাসাদতুল্য বাড়ি। মেসোমশাই-এর বাড়ি নয় তো—রাজপ্রাসাদ! সমস্তই মেসোমশাই-এর নিজের চেষ্টায়, নিজের সৎ উপার্জনে! জীবনে কারো ক্ষতি করেননি

কারো ওপর হিংসা নয়। দূরের কাছের যে-কেউ আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে এসেছে, আদর এবং অভ্যর্থনা পেয়েছে, বাড়ির একজনের মতো থেকেছে। দিনে দিনে পরিজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-সমস্তর মূলে একজনের অক্লান্ত অধ্যবসায় পরিশ্রম আর মানুষের সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করার ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সমাজে মেসোমশাই-এর প্রতিষ্ঠা বেড়েছে দিন দিন, কোর্টে পসার বৃদ্ধি পেয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে। সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে একদিন। কিন্তু যখন দিন গেলে পাঁচ টাকা এনে মাসিমার হাতে তুলে দিয়েছে তখনও যা, যেদিন পাঁচ হাজার এনে তুলে দিয়েছে সেদিনও তাই। সে-টাকায় সংসারেরই শুধু সমৃদ্ধি হয়েছে, ছেলে-মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার বেড়েছে কিন্তু মেসোমশাই-এর পরিশ্রমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি। মাসিমার কাছে কোনোদিন কোনো মর্যাদারও তারতম্য হয়নি। মাসিমা ছেলেমেয়েদেয় খাওয়ার তদারক যতখানি করেছে ততখানি করেনি মেসোমশাই-এর!

মাসিমা সন্ধ্যে হতেই হুকুম দিয়েছে 'খোকাবাবু আজ লুচি খাবে, মনে থাকে যেন ঠাকুর, আর মণ্টুর মাছের তরকারিতে যেন ঝাল দিয়ে বোসো না।'

ঠাকুর হয়ত বলেছে, 'বাবুর খাবারটা আগে দিয়ে দেব, মা?'

মাসিমা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছে, 'বাবুর খাবার পরে হবে, খোকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লে আর খেতে চায় না, জানো না?'

বড়ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত বহু লোকজন এসে খেয়ে দেয়ে গেল। হাজার লোকের খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। রাত তখন বারটা। সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে যাবার আয়োজন করছে। হঠাৎ কে যেন বললে, 'বড় বাবু তো কই খাননি।'

খবর পেয়ে সবাই লজ্জিত সঙ্কুচিত।

মাসিমা খাবার ঘরের সামনে এসে অত লোকের সামনে চেচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ গা, তোমায় অকম্মা বলি কি সাধে, খেতে ভুলে গেলে কী বলে তুমি? এইটুকু উপকার তোমায় দিয়ে হয় না, আমার কি একটা কাজ, আমি একলা মানুষ কত দিকে নজর দেব?'

কত জায়গায় একে একে বদলি হল মেসোমশাই। মেসোমশাই-এর কোর্টে যাবার কথা কিন্তু কারো মনে থাকে না সচরাচর। ঠিক সময়ে খাবার দেওয়ার কথাও কেউ ভাবে না। ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে এসে মেসোমশাই দেখে খাবারের কোনো আয়োজনই হয়নি।

মাসিমা এসে হাজির হয়। বলে, 'যখন একলা এই শরীরে সংসার ঠেলেছি, তখন তো কই ভাত দিতে কখনও দেরি হয়নি, এখন কেন হয়?'

মেসোমশাই বলে, 'কেন হয় তা তুমিই জানো।'

মাসিমা বলে, 'আমার জানতে বয়ে গেছে, তুমিই দেখ, গাদা গাদা লোক রেখেছ, বোঝ এখন যে আমার মত গিন্নী পেয়েছিলে বলেই তুমি এ যাত্রা টিঁকে গেলে। তুমি কি ভেবেছ চিরটা কাল তোমার সংসারে বাঁদিগিরি করবো বলেই জন্মেছি, আমার আর নিজের সুখ-আহ্লাদ বলে কিছু নেই? পারবো না আমি দেখতে তোমার ভূতের সংসার, তুমি থাকো তোমার সংসার নিয়ে, আমি পারব না! যতদিন গতর ছিল দেখেছিলাম, আর নয়, ঢের হয়েছে, সংসার করার সাধ আমার খুব মিটে গেছে—।'

সংসারে শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাসিমারও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে দেখতাম। মাসিমাকে দেখলেও আর চিনতে না পারার কথা। নাতি-নাতনী, পুত্র-পৌত্র পুত্রবধূদের ঘিরে বিকেলবেলা মাসিমা যখন বারান্দায় বসে, তখন সে এক দৃশ্য। এক বউমা মাসিমার চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর একজন সামনে বসে তরকারি কুটছে শাশুড়ীকে জিগ্যেস করে করে।

'মণ্টুর কপির তরকারিতে গরমমসলা দিতে বারণ করো, ছোট বউমা।'

'খুকুর বাটিতে আজ যেন দুধ রেখো না, ক'দিন থেকে পেটের অসুখ করেছে, তোমরা তো কেউ দেখবে না—'

'ভোলা আজ লুচি খাবে না বলেছে, ওর জন্যে তিজেল হাঁড়িতে এক মুঠো ভাত করে দিয়ো।'

'পল্টুর দুধটা একটু ঘন করবে ঠাকুর, পাতলা দুধ খেতে পারে না ও, জানো তো।'

এমনি তদারক চলে মাসিমার সারাদিন ধরে।

হঠাৎ হয়ত কেউ বললে, 'মা, কর্তাবাবু কোর্টে চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।'

মাসিমা বলে, 'জানিনে বাপু, সারাদিন কোন্ রাজকাজ্য করেন ভগবান জানে। আমার শতেক কাজ, এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কর্তার চাবির কথা সে-ও আমাকেই ভাবতে হবে, পারব না আমি অত। সংসারের একটা কুটো নেড়ে তো ও-মানুষের উপ্‌গার নেই, বাইরে বাইরে কেবল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন! পারব না আমি, যার যা খুশি করুক, খবরদার, আমাকে কেউ কিছু বলতে আসিসনি, ভালো হবে না।'

তা এমনি করে মাসিমার দাম্পত্য-জীবন কত বছর চলতো কে জানে। সংসার তখন জম-জমাট। মেসোমশাই প্রতিষ্ঠার সুউচ্চ শিখরে উঠেছে। মাসিমারও চুল পেকে গেছে। সম্পদ আর ঐশ্বর্যের সীমা নেই! এমন সময় মেসোমশাই হঠাৎ

রোগে পড়ল। ভীষণ রোগ। সকালবেলা কলঘরে গিয়ে কী যে হল আর বেরোয় না। শেষে জানা গেল কপালের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন যে-যেখানে আছে সবাই ছুটে গেল।

মাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও ছুটে গেলাম খবর পেয়ে।

সমস্ত বাড়িতেই একটা থমথমে ভাব। ঝি-চাকর, নাতি-নাতনী সবাই সন্ত্রস্ত। শুনলাম মাসিমা সেই যে মেসোমশাই-এর পাশে গিয়ে বসেছে আজ দু'দিন আর ওঠেনি। নাওয়া খাওয়া নেই! কারো কথা শুনবে না। সবাই বলে বলে হার মেনেছে।

মাকে দেখে মাসিমা উঠে এল! চোখে জল নেই। শুকনো খট্‌খটে। রাগে যেন চোখ দু'টো শুধু লাল জবাফুল হয়ে আছে। বললে, 'এসেছিস তুই, দেখে যা ও-মানুষের কাণ্ড, সংসারের একটা উপ্‌গার করা দূরে থাক, এই অসুখে পড়ে আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে খাচ্ছেন! ও-মানুষ কি সোজা মানুষ ভেবেছিস, আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে এখন পালাবার মতলব ওঁর।'

মা বললে, 'রাঙাদি, তুমি নিজের শরীরটার দিকে একবার চেয়ে দেখ।'

মাসিমা বললে, 'আমার নিজের শরীরের কথা যদি ভাবব, তাহলে যে আমার সুখ হবে রে—। আমার সুখ দেখলে ও-মানুষের বরাবর পিত্তি জ্বলে যায়, আমার হবে সুখ, বিয়ে হওয়া এস্তোক চিরটা কাল আমায় জ্বালিয়েছে ও-মানুষ। সুখ বলে কী দ্রব্য জীবনে জানতে পারিনি—সুখের আমার হয়েছে কী বোন, সারাটা জীবন আমায় জ্বালিয়েছেন, এখন মরে গিয়ে পর্যন্ত আমায় জ্বালাবার মতলব ওঁর—উনি কি সোজা মানুষ ভেবেছিস?'

মাসিমার শেষ জীবনটাও আমরা দেখেছি। মেসোমশাই মারা যাবার আগে তার যাবতীয় সম্পত্তি মাসিমার নামে লিখে দিয়েছিল। ভবানীপুরের বিরাট বাড়ি। নগদে আর স্থাবর অস্থাবরে মিলিয়ে প্রায় সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি! ছেলেদের আগেই মানুষ করে গিয়েছিল মেসোমশাই। সব মেয়েদের বিয়েও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

মাসিমা বলত, 'মরণ আমার, সারাজীবন এক দণ্ড সুখ দেয়নি সে-মানুষ, ওঁর সম্পত্তি নিয়ে আমি রাজা হব, দেখিস, আমি ওঁর সম্পত্তির একটা পয়সা ছুঁচ্ছিনে হাত দিয়ে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাকুক, ছেলেরা থাকতে কর্তার পয়সায় আমার দরকার নেই মা, আমি কর্তার পয়সার কখনও পিত্যেশ্‌ করিনি, আর করবও না।'

তা সত্যিই, মাসিমা মেসোমশাই-এর পয়সার প্রত্যাশা করেনি।

আমাদের দেশে যখন যাই, বড় হাসপাতালটার দিকে চেয়ে আমার সব কথা মনে পড়ে যায়, মেসোমশাই-এর নামেই হাসপাতাল। মেসোমশাই-এর সেই প্রাসাদতুল্য বাড়িটা মায় সমস্ত সাত লাখ টাকার সম্পত্তি, সব মাসিমা দান করে গিয়েছিল। শেষ জীবনটা ছেলেদের ছোট বাড়িতে কেটেছে তার। অতবড় বাড়িতে ওই ঐশ্বর্যের মধ্যে এতদিন কাটিয়েও এখানে কোনও অসুবিধে হত না।

মেসোমশাই-এর নামে হাসপাতাল যেদিন প্রতিষ্ঠা হল সেদিনও মাসিমা একবার দেখতে গেল না। যাঁর টাকা তাঁরই নামে হাসপাতাল। প্রকাণ্ড মিটিং হল। মেসোমশাই-এর গুণকীর্তন করে কত লোক কত কী বক্তৃতা দিলে। সামান্য অবস্থা থেকে কেমন করে ধনী হয়েছিলেন সেই ইতিহাস। এতটুকু অহঙ্কার ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না। অনলস কর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। কর্মই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান নিদিধ্যাসন। জীবনে এক মুহূর্তের জন্যে তিনি অলস হননি। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কর্ম-সাধনায় কেটেছে। তিনি কর্মপ্রাণ, কর্মপ্রতীক, কর্মবীর মানুষ। শেষে তাঁর বিধবা স্ত্রীর দানশীলতা ও অচলা পতিভক্তির জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েও একটা প্রস্তাব পাঠ করা হল সভায়। আদর্শ হিন্দু রমণী হিসেবে মাসিমার নামও লেখা রইল হাসপাতালের খাতায়।

তবু হাসপাতালটার দিকে চাইলেই আমার কেবল মনে পড়ত মাসিমার কথাগুলো, 'সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে রে সে-মানুষ, আর তাঁর টাকা ছোঁবো আমি, ওই অকম্মা লোকের হাতে পড়ে আমার সারাজীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাক, তাদের খুদকুঁড়ো যা জোটে তা-ই খাবো, তবু সে-মানুষের টাকা আমি ছুঁচ্ছিনে, দেখে নিস তুই—'

চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবন আর একুশ বছরের বিধবাজীবন—এই এতদিনের একনিষ্ঠ পতিনিন্দার পরে যথারীতি একদিন সকালে মাসিমার মৃত্যুর খবর শুনে চমকেও উঠেছিলাম মনে আছে।

যে গল্প লেখা হয়নি

মাত্র দু'রতি ওজনের এক টুকরো হীরে। তাই নিয়েই একটা গল্প মাথায় এসেছিল। গল্পটা লেখবার আগে উষাপতিকে একটা চিঠি লিখেছিলাম তার অনুমতি চেয়ে।

উষাপতি উত্তরে লিখেছিল, 'সতীকে নিয়ে গল্প তুই লিখতে পারিস, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দেখিস ভাই, যাতে সতীর কোনো দুর্নাম হয় বা বদনাম হয় আমাদের, এমন কিছু লিখিস নে। জানিস তো, মেয়েমানুষের মন, চট করে এমন কাণ্ড করে বসবে—'

আরো অনেক কথা লিখেছিল। উষাপতি তখন ছিল পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টার। এখন বদলি হয়েছে রায়গড়ে। মাইনেও অনেক বেড়েছে। দু'পয়সা এদিক-ওদিক থেকেও আসে। নিজেও বিশেষ খরচে-স্বভাবের লোক নয়। কিন্তু চিঠির শেষে লিখেছে, তোদের ওখানে যদি ভালো কোনো ডাক্তার থাকে, একটু খবর দিয়ে জানাস, সতীকে চিকিৎসা করাতে চাই। অনেক ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, সাধুকে দেখালাম—খরচও হচ্ছে প্রচুর—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—'

উষাপতির অনুমতি নিয়ে গল্পটা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম বটে। কিন্তু লিখতে গিয়ে হঠাৎ কেমন হাসি এল। সতীকে নিয়েই গল্পটা বটে! উষাপতিকে অবশ্য জানাইনি দু'রতি ওজনের হীরের কথা। জানিয়েছিলাম সতীই আমার গল্পের নায়িকা। কিন্তু আসলে তো জানি যে, সতী আমার গল্পের উপনায়িকা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। শকুন্তলার যেমন প্রিয়ংবদা! কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে আমার ঘরে কে এসেছিল? এ-গল্পের নায়িকা না উপনায়িকা?

সত্যি সেই রাতটার মধ্যেও যেন কিছু মোহ ছিল। সেটা বুঝি ফাল্গুনী-পূর্ণিমার রাত। জীবনে কতদিন জীবিকার জন্যে রাতের পর রাত কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। অফিসের চারটে দেওয়ালের মধ্যে কাজ করতে করতে অনেকবার বাইরে চেয়ে দেখেছি! কেমন করে রাতের গাঢ় অন্ধকার পাতলা হয়ে নীল হয়, সেই নীল কেমন করে সাদা হয় তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবু মনে হয়েছে রোজই যেন নতুন দৃশ্য দেখছি। দশ বছর আগের সেই রাতটা যেন আজো আমার জীবনে অনন্য আর একক হয়ে রয়েছে। পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টারের বাঙলোর সেই সঙ্গীহীন ঘরে সারারাত তো আমার অনিদ্রাতেই কেটেছিল। তবু সকালবেলা জলখাবার খেতে বসে উষাপতি অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার চেহারা দেখে।

বলেছিল, 'রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি ?'

বলেছিলাম, 'না।'

উষাপতি বলেছিল, 'আমারও হয়নি।'

কী জানি কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। বলেছিলাম, 'কেন, তোর হয়নি কেন ?'

উষাপতি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল…

কিন্তু যা বলেছিল, তা বলবার আগে গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটাই বলা দরকার।

উষাপতি তখন সবে বদলি হয়েছে পলাশপুরে। নতুন বিয়ে করে সংসার পেতেছিল ওখানে। ওর অনেকদিনের সাধ ছিল আমাকে ওর বউ দেখায়। চিঠিতে লিখেছিল কতবার। নাকি বেশ নিরিবিলি জায়গা। অন্তত কলকাতার চেয়ে নিশ্চয়ই নিরিবিলি। চার-পাঁচটা কোলিয়ারীর সাইডিং শুধু বেরিয়ে গেছে স্টেশন থেকে। কোলিয়ারী ছাড়া স্টেশনের আর কোন উপযোগিতাও ছিল না। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো আমাকে, 'এবার শীতকালে নিশ্চয়ই আসিস। তোর জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

কিন্তু যাওয়া আমার হয়ে ওঠেনি। উষাপতি যখনই ছুটিতে এসেছে, দেখা করেছে আমার সঙ্গে। বলেছে, 'আমার ওখানে গেলি না তো একবার !'

বিশেষ করে, স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে অতিথি হওয়ার একটা লোভও ছিল বরাবর। মুরগি, মাছ, ডিম, ঘি—সবই স্টেশন মাস্টারের প্রায় বিনা পয়সায় প্রাপ্য। আকারে-প্রকারে উষাপতি আমাকে জানিয়েও দিয়েছে সে-কথা। কিন্তু নিজের কোঠর ছেড়ে নড়া-চড়া করার সুবিধে কখনও হয়ে ওঠেনি বলে যাওয়াও হয়নি ওর কাছে।

কিন্তু সেবার বম্বে যাবার পথে কেমন করে যে কাটনী স্টেশনে হঠাৎ নেমে পড়লাম, তা নিজেই জানি না। কাটনী থেকে কয়েকটা স্টেশন গেলেই পলাশপুর ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন। একটা রাত থাকবো ওখানে, তারপর পরদিন আবার ফিরবো। এই-ই মতলব।

যখন গিয়ে পলাশপুরে পৌছলাম তখন বিকেল।

স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল উষাপতি। সাদা গলাবন্ধ কোট পরলেও চিনতে কষ্ট হল না। আমাকে দেখেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে।

বললাম, 'কিন্তু কালকেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই, ভীষণ কাজ—'

'সে হবে না' বলে কাকে যেন হুকুম দিলে আমার মালপত্তোর বাড়িতে নিয়ে যেতে।

তা পলাশপুর বেশ বড় স্টেশন। সব গাড়ি জল নেয় এখানে। বাইরে বিরাট একটা খেলার মাঠ। জাফরি-দেওয়া বড় বড় বাঙলো। রাস্তায় ফিরিঙ্গী সাহেব-মেমদের ভিড়। সাইকেল-রিক্শা'র চল্ আছে বেশ এদিকে। বিকেলবেলার গাড়ি দেখতে প্ল্যাটফরমে টাউনের লোক এসে জুটেছে। গাড়ি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব চলে গেল প্ল্যাটফরম থেকে। ফাঁকা স্টেশন।

উষাপতির হাজার কাজ। দশজনকে হুকুম দিতে হয়। দশজনকে শাসন করতে হয়।

কাজের ফাঁকে একবার বললে, 'আর একটু বোস, একসঙ্গে যাবো বাড়িতে—আর এই কাজটা সেরে নি।'

শেষ পর্যন্ত একসময় কাজ সেরে উঠলো উষাপতি। বললে, 'আর পারিনে কাজের ঠেলায়! এই দেখ না, তুই এলি, তোর সঙ্গে একটু ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না—যা হোক, তারপর কাল কিন্তু তোর যাওয়া হবে না বলে রাখছি—ওসব ওজর আপত্তি শুনছিনে।'

বললাম, 'তা হয় না রে। ওদিকে একদিন দেরি হলে ভারি অসুবিধে হবে আবার—'

'সে কৈফিয়ত দিস তুই মিলির কাছে, তার হাতে তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি খালাস, ভাই—বাড়ির ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ কি আমার এলাকার বাইরে চলে গেলে—সেখানে মিলির কথাই ফাইন্যাল।'

বললাম, 'পুরোপুরি ডিভিসান-অব-লেবার দেখছি।'

উষাপতি সিগ্রেটে টান দিতে দিতে বললে, 'না করে উপায় ছিল না, ভাই। আমার অফিসের এত কাজ যে, এর পরে আর বাড়ির কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার ফুরসুত পাই না, ওটা মিলি নিজেই ঘাড়ে নিয়েছে, বলেছে,—বাড়ির ব্যাপারে আমায় সম্পূর্ণ স্বরাজ দিতে হবে। তা এমন কি, ওর চিঠি পর্যন্ত আমি খুলে পড়তে পারবো না, ও-ও আমার চিঠিপত্র খুলবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'এই যে তুই এলি, কী খাবি না-খাবি,—সমস্ত ভাবনা তার। কোথায় শুবি, কী করবি—ও নিয়ে আমায় আর মাথা ঘামাতে দেবে না।'

বললাম, 'এরকম স্ত্রী পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা রে।'

উষাপতি হাসলো। বেশ যেন পরিতৃপ্তির হাসি। বললে, 'তা জানিনে। তবে যারা এসেছে বাড়িতে, দেখেছে মিলিকে, তারা বলে,—আমার নাকি স্ত্রীভাগ্য ভালো। তবে বিয়ে তো একটাই করেছি, তুলনামূলক বিচার করতে পারবো না ভাই।'

উষাপতি আবার বলতে লাগলো, 'আমি অবশ্য তোদের অনেক পরে বিয়ে করেছি, বলতে পারিস একটু বুড়ো বয়সেই। মনে একটা ভয় ছিল বরাবর, এ বয়েসে বিয়ে করে হয়ত আর-একজনকে কষ্ট দেব—কিন্তু'···

'কিন্তু' বলে কথাটা আর শেষ করলো না উষাপতি। আত্মতৃপ্তির এক বাষ্পয় হাসিতে আবার ভরে উঠলো উষাপতির মুখ। সে-হাসি গোপন করতে চেষ্টা করলো না উষাপতি।

বললাম, 'তাহলে বিয়ে করে খুব সুখী হয়েছিস বল্—বিয়ে করবো না বলে যে রকম পণ করেছিলি তুই—'

উষাপতি আবার হাসলো। বললে, 'সুখী ?·· তবে আমি মিলিকে বলেছিলাম বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে, কারণ বরাবর ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে এসেছে—শেষকালে আমাকে না দোষ দেয় যে, তোমার জন্যে আমার ডিগ্রীটা পাওয়া হল না! তা কী বলে জানিস—?'

বললাম, 'কী বলেন ?'

'মিলি বলে···'

কিন্তু মিলি কী যে বলে তা আর বলা হল না। হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একটা বিলিতী টেরিয়ার কুকুর এসে আপ্যায়ন জানাতে লাগলো উষাপতিকে। উষাপতি বললে, 'আরে, তুই ঠিক টের পেয়েছিস দেখছি!'

বললাম, 'তুই আবার কুকুর পুষেছিস নাকি ?'

'আরে আমি পুষতে যাবো কেন ? মিলির। মিলির ছোটবেলাকার কুকুর, বিয়ের পর এ ও এসেছে সঙ্গে···যাক্‌গে যে-কথা বলেছিলাম—' বলে উষাপতি আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল।

গলা নিচু করে হাসতে হাসতে বললে, 'কালকে আমাদের বিয়ের বার্ষিকী গেছে কিনা—খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, কুকুরটা খুব খুশী আছে তাই, তা সেই উপলক্ষে হীরে-বসানো নেকলেস একটা দিয়েছি ভাই মিলিকে—আনিয়েছি কলকাতা থেকে! তুই একবার দেখিস তো—বেটারা ঠকালো, না ঠিক দাম নিয়েছে।'

বললাম, 'কত দাম নিলে ?'

'চোদ্দ শো টাকা নিয়েছে অবশ্য, তা নিক্‌গে, সে জন্যে কিছু নয়। উপ্‌রি পয়সা ওয়াগন পিছু কিছু-কিছু পাওয়া যায়, কোলিয়ারী যদ্দিন আছে ভাই, টাকার অভাবটা নেই তদ্দিন। তারপরে যদি বদলি করে কখনও কোনো খারাপ স্টেশনে তখন দেখা যাবে—'

কথা বলতে বলতে উষাপতির বাঙলোর সামনে এসে গিয়েছিলাম। উষাপতির আভাস পেয়ে বুঝি তার স্ত্রীও এসে দাঁড়ালো সামনে। আমাকে অবশ্য আশাই করছিল। কারণ আমার স্যুটকেস, বিছানা আগেই পৌঁছে গেছে এখানে।

কিন্তু উষাপতির স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন থমকে গেলাম। আমাকে দেখে যেন কালো হয়ে এল তাঁর মুখখানা।

তবে এক মুহূর্তের জন্যে! এমন কিছু নজরে পড়বার মতো নয়।

উষাপতি এগিয়ে গিয়ে বললে, এই দেখো, কাকে এনেছি। আমাদের দলের হীরো এ—আর ইনি—'

আলাপ হল। এবার হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন মিলি দেবী। টেবিলে গিয়ে বসলাম। চায়ের সরঞ্জাম তৈরি ছিল।

চা তুলে নিয়ে উষাপতি বললে, 'কিন্তু ও কী বলছে জানো, ও নাকি কালই চলে যাবে।'

মিলি দেবী হঠাৎ অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইলেন, 'সে কী? তা বললে শুনছি না, কাল আপনার যাওয়া চলবে না।'

উষাপতি বললে, 'এখন তোমার হাতে ভার দিয়ে দিলাম—আমার আর কিছু করবার নেই। যা ভালো বোঝ করো।'

মিলি দেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই নাকি?'

বললাম, 'ক্ষমা করবেন এবার। পরের বার বরং থাকবে৷ যতদিন বলেন, এবারে বিশেষ জরুরী কাজে—'

মিলি দেবী বললেন, 'বাড়িতে যখন আমার এলাকার মধ্যে এসেছেন, তখন আপনাকে দু'দিন থেকে যেতেই হবে···আমরা বিদেশে পড়ে থাকি, একটু বুঝি দয়া-মায়া নেই আপনাদের!'

উষাপতি হাসতে লাগলো।

হাসতে লাগলাম আমিও।

মিলি দেবীও হাসতে লাগলেন।

কথা বলতে বলতে উষাপতি হঠাৎ বললে, 'তোমার নেকলেসটা দাও তো একবার, দেখাই।'

বললাম, 'আমি তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি বেশ—ওঁর গলাতেই তো মানাচ্ছে ভালো। কেন আর—'

উষাপতি বললে, 'না না, তা কি হয়। হারটা খুলে দাও—বেটারা ঠকালো

কিনা জেনে নেওয়া ভালো। এ আমাদের ভালো সমঝদার একজন, ওদের ফ্যামিলিতে এ-সব জিনিস আছে অনেক।

মিলি দেবী নেকলেসটা খুললেন। বেশ চমৎকার জিনিসটা মনে হল। দেখে মনে হল, ন্যায্য দামই নিয়েছে। নতুন ডিজাইনের জড়োয়ার কাজ করা হার। ঠিক লকেটের ওপর একটা দু'রতির হীরে জ্বলজ্বল করছে।

হারটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, বড় সুন্দর জিনিস—আপনার পছন্দ আছে বৌদি।'

মিলি দেবী খানিক পরে চলে যাবার পর উষাপতি বললে, 'বেশি বয়েসে বিয়ে করলে এই সব গুনোগার দিতে হয় ভাই।'

বললাম, 'কেন? এ কথা বলছিস কেন?'

উষাপতি সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কী একটা কাজে পাশের ঘরে চলে গেল। আমিও এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বড়লোক হয়েছে উষাপতি এখন। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে। শুধু সুন্দরী স্ত্রী নয়, সুশিক্ষিতা বিদূষী বলা চলে। হয়ত উষাপতি নিজের ঐশ্বর্য দেখাতেই আমাকে এতবার আসতে নিমন্ত্রণ করেছিল। তবু খুশি হলাম দেখে যে, তার জীবন সার্থক হয়েছে। বিয়ে করে সুখী হয়েছে সে। বাপ-মা-মরা উষাপতি। বড় গরীব ছিল আমাদের দলের মধ্যে। বরাবর ওর উচ্চাশা, একদিন আমাদের সমান পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এতদিন পরে তা সফল হয়েছে। দেখে আনন্দই হল।

অনেকদিন আগেকার কথা। ভালো করে সব মনে নেই। শুধু মনে আছে বেশ আনন্দে, হাসিতে, গল্পে কেটে গেল সে-সন্ধ্যেটা। আরো মনে আছে বার বার মিলি দেবী কেবল বলেছেন, 'কাল আপনার যাওয়া হবে না তা বলে, আর একটা দিন থাকতেই হবে।'

সেই রাত্রেই ঘটনাটা ঘটলো।

ঠিক কত রাত্রে বলতে পারবো না। নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না। মনে হল ভেজানো দরজাটা খুলে কে যেন ঘরে ঢুকলো। নিস্তব্ধ রাত। শুধু মাঝে মাঝে রেলের ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি আর আক্রোশের গর্জন কানে আসে।

বললাম, 'কে?'

ছায়ামূর্তি বললে, 'আমি—'

বিছানার ওপর সটান উঠে বসেছি। অস্পষ্ট হলেও অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না।

বললাম, 'আপনি! হঠাৎ?'

মিলি দেবী বলে উঠলেন, 'আপনি এখানে আসতে পারেন হঠাৎ, আর আমি আসতে পারি না? এ আমার বাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমি এখানে খুব সুখে ছিলাম—কেন তুমি এলে? বলো, সত্যি কথা বলো—কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

হতচকিত নির্বাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

বললাম, 'কী বলছেন আপনি!'

'চীৎকার করো না, পাশের ঘরে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তুমি ললিতকে বোলো, মিলি তাকে ভুলে গেছে। কাঁসারিপাড়া লেন-এর সে-বাড়িটা সে-ঘরটা আমার আর মনে নেই, আমি এখন মিলি মল্লিক—আমি এখন পরস্ত্রী…'

আবার বললাম, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা বলো না, আমি তোমাদের সবাইকে চিনি। ললিত তোমার ভাগ্নে নয়? বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিক্ করতে আমাদের সঙ্গে যাওনি তুমি? ইণ্টারমিডিয়েট টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ট্যাক্সি করে কারা ঘুরিয়েছিল আমাকে! আমরা গরীব ছিলুম, তাই তোমাদের সাহায্য আমরা তখন নিয়েছি। কিন্তু এখন তো আমি বড়লোকের স্ত্রী! এখন তোমাদের প্রয়োজন আমার মিটে গেছে! এখন শাড়ি দিতে এলেও নেব না, গয়না দিতে এলেও নেব না আমি, সিনেমা দেখাতে এলেও যাবো না তোমাদের সঙ্গে—কেন এসেছ তুমি? একজনকে পাগল করে দিয়েছ বলে ভেবেছ আমাকেও করবে? সত্যি বলো তো, কিছু মনে পড়ছে না?'

ললিত নামে কোনো ভাগ্নে দূরে থাব, ও-নামের কোনো বন্ধুও আমার কোনও কালে ছিল না। কী জানি কী খেয়াল হল, বললাম, 'পড়েছে।'

'ললিত তোমায় পাঠিয়েছে? সত্যি কি না বলো?'

এবারও বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি তোমাদের সকলকে চিনি, জানতাম না আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে—কিন্তু তোমাদের পায়ে পড়ি, আর কখনও এসো না এখানে, যাও, কাল সকালেই চলে যেয়ো এখান থেকে—বুঝলে?'

বললাম, 'যাবো।'

'হ্যাঁ, তাই যেয়ো।'

শরীরটাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মিলি দেবী যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

তারপর সমস্ত রাত আমার আর ঘুম এল না। মনে হল—কার ভুল? আমার,

না, মিলি দেবীর? আর কখনো কোথাও ওকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কে ললিত! কার ভাগ্নে! কবে কার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরেছেন! কবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্যাক্সিতে! আমার চেহারার সঙ্গে কি অন্য কারো চেহারার বা নামের মিল আছে? নিজের স্মৃতির অলি-গলি-ঘুঁজি সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো কিনারা করতে পারিনি।

ভোরবেলাই বিছানা ছেড়ে উঠেছি।

উষাপতি তারও আগে উঠেছে। চায়ের টেবিলে পোশাক পরে তৈরি সে। এখনি বোধ হয় ডিউটিতে যাবে। পাশে কালকের মতো মিলি দেবীও বসে। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই যেন।

উষাপতি আমাকে দেখেই বললে, 'কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি? এরকম চেহারা কেন রে?'

বললাম, 'না, নতুন জায়গা বলে হয়ত।'

উষাপতি বললে, 'আমারও হয়নি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

উষাপতি বললো, 'সতী কাল রাত্রে বড় বিরক্ত করেছে।'

'সতী! সতী কে?' জিগ্যেস করলাম।

মিলি দেবী চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'আমার দিদি।'

উষাপতি বললে, 'হ্যাঁ, মিলির দিদি। মাথাটা সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, পাগলের মতো লক্ষণ, আমার এখানেই রয়েছে এখন।'

হঠাৎ যেন কেমন সন্দেহ হল। মিলি দেবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। শান্ত, পরিতৃপ্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কাল রাত্রে তবে কি ভুল দেখেছি! পাগলের প্রলাপ শুনেছি কেবল?

উষাপতি আবার বললে, 'মাঝে মাঝে বেশ থাকে, কাল রাত থেকে আবার হঠাৎ কিরকম মাথাটা বিগড়ে গেছে—সারা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, চীৎকার করেছে, বকেছে—কেঁদেছে—'

উষাপতি আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালে। একটা ঘরের ভেতরে বন্ধ। অবিকল মিলি দেবীর মতো দেখতে। বয়সে দু' এক বছরের ছোট-বড় হয়ত। ঘরের মধ্যে আপন মনেই বিড়বিড় করে বকছে।

উষাপতি বললে, 'এখন ওইরকম কিছুদিন থাকবে, তারপর আবার কিছুদিন ভালো হয়ে যাবে—স্বামী নেয় না, তারপর থেকেই···কিন্তু তুই আজকে থাকছিস তো?'

বললাম, 'না ভাই, আজ পারবো না থাকতে।'

উষাপতি মিলির দিকে চেয়ে বললে, 'ও কী বলছে শোনো—থাকবে না নাকি আজ।'

মিলি দেবী তেমনি স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তা হবে না, থাকতেই হবে কিন্তু—'

চা খেতে খেতে হঠাৎ উষাপতি একবার স্ত্রীর দিকে কৌতূহলী হয়ে যেন কী দেখতে লাগলো। কাছে গিয়ে গলার নেকলেসটা দেখে বললে, 'একি? তোমার লকেটের হীরে কোথায় গেল?'

'কই দেখি? কী সর্বনাশ!'

আমিও দেখলাম।

মিলি দেবীও নেকলেসটা খুলে দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন। তাই তো! কাল সন্ধ্যেবেলাও তো ছিল সেটা! কোথায় গেল একরাত্রের মধ্যে। খোঁজো তো বিছানাটা। বিছানাটা খোঁজা হল। খোঁজা হল ঘর-দোর। এখানে-ওখানে। ব্যস্ত হয়ে পড়লো উষাপতি। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিলি দেবী। কোথাও তো যাওনি? দেখো তো বাথরুমটা! যাবে কোথায়? হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না। শোবার ঘর, হল ঘর, আর নয়তো বাথরুম!

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! সেদিন কোথাও সেই দু'রতি ওজনের হীরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উষাপতি আর মিলি দেবীর কাছে আজ পর্যন্ত সেটা নিরুদ্দেশ হয়েই আছে হয়ত!

মনে আছে সেদিন কারো অনুরোধ উপরোধ না-শুনেই চলে এসেছিলাম পলাশপুর থেকে!

ফিরে এসে গল্পটা সমস্ত লিখে পাঠিয়েছিলাম উষাপতির কাছে। আপত্তির কিছু আছে কি না জানতে। উত্তরে উষাপতি লিখেছিল, 'মিলিও তোর গল্পটা মন দিয়ে পড়েছে। বলেছে,—গল্পটা ভালো হয়েছে, কিন্তু যেন অসম্পূর্ণ মনে হল লেখাটা। দু'রতি হীরের কথাটা গল্পের পক্ষে নাকি অবান্তর হয়ে গেছে। গল্পের সঙ্গে ওর যোগাযোগ কী বোঝা গেল না, আমি অবশ্য সাহিত্যের কী-ই বা বুঝি—যা হোক সেই হীরেটা এখনও পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না বোধহয়।'

আজ এক-একবার ভাবি, মিলি দেবীকে চিঠি একটা লিখবো নাকি! লিখবো নাকি হীরেটা আমার কাছেই আছে। জানিয়ে দেব নাকি যে সেদিন ভোরবেলা নিজের হাতে বিছানাটা বাঁধবার সময় আমার শোবার ঘরেই সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম

আমি! সেই দু'রতি ওজনের হীরেটা। কিন্তু আবার ভাবি, থাক্ না। উষাপতি স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে। ওদের সংসারে আগুন জেলে লাভ কি! আমার এ গল্প যদি অসম্পূর্ণ থাকে ত থাক—আমি জীবনে আরো অনেক সম্পূর্ণ গল্প লিখতে পারবো, কিন্তু ওরা সুখে থাকুক। আমার একটা সামান্য গল্পের চেয়ে ওদের জীবন যে অনেক দামী।

সরবতী বাঈ

সুচেতা চট্টোপাধ্যায় সুচরিতাসু—

তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে নিয়ে গল্প লিখতে বলে আমাকে ভারি বিপদে ফেলেছ আমি ফরমায়েসি গল্প কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু এতো জুতো নয় যে যতবার ফরমায়েস করবে ততবারই বানিয়ে দেব। আর তোমার ঠিকানাও দাওনি চিঠিতে খামের ওপর। পোস্ট অফিসের ছাপ খুঁজে ঠিকানা বার করতে গিয়ে দেখলাম, লেখা রয়েছে—শিবপুর।

শিবপুর! শিবপুর কি এখানে! তবু ঠিকানা মিলিয়ে তোমার সন্ধান করতে বেরোব তা মনে করো না যেন। যে-টুকু তুমি লিখেছ তাতেই আমি বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি নিতান্ত অসহায় হয়েই আমায় চিঠি লিখেছ। যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি। আমার দ্বারা তোমার কতটুকু সাহায্য হবে জানি না।

কিন্তু তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার একটা লাভ হয়ে গেল। বহুদিন আগের আর একজনের কাহিনী মনে পড়লো। সে সরবতী বাঈ নয়, বনলতা। বনলতার কাহিনী।

বনলতা আমার নিজের কেউ নয়। তোমার মতই একদিন তার ছাব্বিশ বছর বয়সে এক ভীষণ সমস্যার উদয় হয়েছিল। সত্যিই ছাব্বিশ বছর বয়েসের সমস্যার বুঝি তুলনা নেই। তুমি লিখেছ যে-ছেলেটি তোমাকে ভালবাসে তার বয়েস তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অর্থাৎ তেইশ। ছাব্বিশ বছরের জ্বালা তেইশ কী করে বুঝবে বলো!

ছাব্বিশ বছরের বনলতা একদিন বলেছিল—আপনার তো আস্পর্দ্ধা কম নয়!

তেইশ বছরের সুধাময় বলেছিল—পেথম দেখে আমরা মনুর চিনতে পারি কিনা—

বনলতা বলেছিল—তাহলে এবার আরো ভালো করে চিনুন—

বলে কথা নেই বার্তা নেই পায়ের চটিটা খুলে সুধাময়ের গালে সপাং সপাং করে কসিয়ে দিয়েছে। বনলতার জুতোর শুকতলাটা সুধাময়ের গালে গিয়ে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

ততক্ষণে মেডিকেল কলেজের নার্স ডাক্তার ছাত্র ছাত্রী সবাই দৌড়ে এসেছে। ভিড় জমে গেছে কলেজের অপারেশন থিয়েটারের সামনে। মেথর, জমাদার, হাউস সার্জেন, কেউই বাদ নেই। কী হলো! কেন মারলে? কেন জুতো মারতে গেল হাউস ফিজিশিয়ানকে! সামান্য একজন নার্সের এই কাণ্ড! কী হয়েছে মেট্রন! হৈ, চৈ—তুমুলকাণ্ড একেবারে।

বনলতা তখন রাগে ফুলছে। পারলে যেন আরো দুঘা মেরে দিত হাউস-ফিজিসিয়ানের গালে। এক ঘায়ে যেন ঠিক সায়েস্তা হলো না!

মেট্রন জিজ্ঞেস করলে—কী হলো মিস রায়?

বনলতা বললে—

কিন্তু সে কথা এখন থাক! ছাব্বিশ বছরের সে জ্বালা আর কেউ না বুঝুক তুমি হয়ত বুঝবে। তুমিই বুঝবে বনলতা রায়ের সেই অপমান। তেইশ বছরের ছেলে সুধাময় সেদিন অন্যায় করেছিল কি অন্যায় করেনি, তা-ও তুমি বুঝতে পারবে! কিন্তু সে-কথা পরে বলবো।

তুমি লিখেছ—তেইশ বছরের একটি ছেলে তোমাকে নিয়ে ঘর-বাঁধতে চায়। তা হলোই বা তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট! ঘর-বাঁধতে কি বয়েস লাগে! ঘর তো যে-কোনও বয়সেই বাঁধা চলে। বিশেষ করে তেইশ বছরে ভালো করেই চলে। তেইশ বছর ক্লান্তি জানে না। তেইশ বছর ঘুম জানে না। তেইশ বছরের যে অক্লান্ত ক্ষমতা! তেইশ বছর কি সামান্য জিনিস!

তবে গোড়া থেকে বলি শোন। অনেক দিন আগে একবার ওখাপোর্টে গিয়েছিলাম। রাজপুতানা পেরিয়ে ভারতবর্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে। মেহ্‌শানা, আমেদাবাদ, জাম নগর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দর অতিক্রম করে একেবারে ভারত মহা-সমুদ্রের ধারে। যেখানে দাঁড়ালে ভারত সমুদ্রের ওপারে আফ্রিকার চালানী নৌকোগুলোকে দেখা যায়। দেখা যায় পালতোলা নৌকোর সার। যেখান থেকে বাণিজ্য করতে যায় এপারের মাঝি মল্লারা। আর ওপারে সওদা বেচে অন্ত

কোনও সওদা কিনে নিয়ে আসে এখানে বেচতে। এই তাদের ব্যবসা। সমুদ্রের ধারে ধারে জেলে মালোদের বাস। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে।

পাণ্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছিল—তীর্থস্থান বলেই বাবু-মহাজনেরা এখানে আসে হুজুর—নইলে সবই তো ওই মাঝি-মাল্লা কেবল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমাদের এখানে বাঙ্গালী কেউ নেই?

বাঙ্গালী! ঈশ্বরীপ্রসাদ মনে করতে চেষ্টা করলে। বললে—একজন বাঙ্গালী এখানে ছিল হুজুর, এখানকার বাতি-ঘরে কাজ করতো, তিনি বদলি হয়ে গেছেন তিন বছর আগে—আর একজন—

বলতে গিয়েই যেন মনে পড়ে গেল। বললে—আর একজন এখনও আছে হুজুর—

বললাম—কে?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তা সেও এখান থেকে তেত্রিশ মাইল দূরে—এক ডাক্তার—

বাঙ্গালী ডাক্তার ডাক্তারী করতে এসেছে হাজার-হাজার মাইল দূরে এই অজ গ্রামের মধ্যে! মাঝি-মাল্লারা পয়সা দিতে পারে!

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি সেখানে, মস্ত হাসপাতাল করে দিয়েছে ডাক্তার-মা—একটা পয়সা নেয় না হুজুর—

জিজ্ঞেস করলাম—নাম কী?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—বনলতা মিত্র। লোকে ডাক্তার-মা বলে ডাকে—

বনলতা মিত্র! বহু দিন বহু বছর অতিক্রম করে মেডিকেল কলেজের একটা ঘটনার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। তার নামও বনলতা রায়। এমন নাম সচরাচর সব মেয়ের থাকে না।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম দেখতে বলো তো?

আমি যে-বনলতাকে দেখেছিলাম তার তখন তোমার মতই ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। সে-ও কি আজকের কথা! তখন আমার কত আর বয়েস। মেডিকেল কলেজে প্রত্যেক দিন যেতাম সন্ধ্যেবেলা। টুকু মাসিমা গলস্টোন অপারেশন করতে হাসপাতালে শুয়ে থাকতো। আমি বাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে খাবার দিয়ে আসতাম। সেখানেই প্রথম বনলতা দেবীকে দেখি। নার্সের পোষাক পরা হাতে থারমোমিটার নিয়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী নিরীহ চেহারা! ছাব্বিশ বছর বয়েস হলে কী হবে, মাসিমা বলতো—ভারি যত্ন করে রোগীদের জানিস্—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলতে লাগলো—ওখানকার মাঝি-মাল্লাদের বড় পারা-রোগ আছে কিনা—সেই পারা-রোগের হাসপাতাল করে দিয়েছে ডাক্তার-মা। এক পয়সা খরচ-পত্তোর লাগে না—সেবা-যত্ন হয় ভালো—ডাক্তার-মা ভারি যত্ন করে রোগীদের—

মনে আছে যখন সব দেখা হয়ে গেল, রুক্মিণীর মন্দির, দ্বারকার মন্দির, ওখা-বন্দর, আর কিছু দেখতে বাকি নেই, তখন গরুর গাড়ি ভাড়া করে একদিন গিয়েছিলাম ডাক্তার-মার হাসপাতাল দেখতে। ওখা-বন্দর থেকে স্থলপথে তেত্রিশ মাইল ভেতরে। রাস্তা খারাপ! মটর যেতে পারে না। গরুর-গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া—আমি আর পাণ্ডা ঈশ্বরী-প্রসাদ। ঈশ্বরীপ্রসাদ সারা রাস্তা গল্প করতে করতে চলেছে।

বনলতা দেবীকে নিয়ে গল্প অবশ্য হয় না। বনলতা দেবীর জীবনে আরম্ভও যা শেষও তাই। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বনলতা দেবীর জীবনের প্রশ্নের মত তার উত্তরও বড় সরল। সোজা সমতল ভূমির মত সরল। চড়াই যদিই বা থাকে, সেটা শুধু শুরুতে, শেষে আর কিছু নেই। প্রশ্ন যেমনই হোক উত্তর যার কঠিন নয় তাকে নিয়ে গল্প লেখা তো বিড়ম্বনা!

সেদিনও যথারীতি কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজতে হাসপাতালে গেছি। সেই চারপাশের সার-সার রোগীদের বিছানা, কাতর চাউনি।

হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই টুকু মাসিমা বললে—আজকে এখানে এক কাণ্ড হয়ে গেছে জানিস?

জীবনের তিনটি বৃহৎ ঘটনার মধ্যে অন্তত দুটি নিত্যনৈমিত্ত হাসপাতালে ঘটে থাকে। জন্ম আর মৃত্যু এখানে চিরাচরিত। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাকে কাণ্ড বলেই কেউ ভাবে না।

বললাম—কী কাণ্ড!

টুকু মাসীমা বললে—আমাদের এখানকার নার্স এক ডাক্তারকে জুতো মেরেছে!

—কোন নার্সটা?

—ওই যে! ওই......

বনলতা দেবীকে সেদিন দেখেছিলাম। মাথায় স্কার্ফ আঁটা। হাতে একটা জ্বরের চার্ট। অমন মেয়ে যে একজন পুরুষকে জুতো মারতে পারে, দেখে তা মনে হলো না। সবাই তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে বলে যেন মনে হলো।

—আর সেই ডাক্তার ?

ডাক্তার সুধাময়কে আমি দেখিনি। কিন্তু হাসপাতালের এ-কোণে ও-কোণে সব জায়গায় কেবল ওই একই আলোচনা। গুজুর-গুজুর ফুস-ফাস সব কথা। যেন আলোচনার একটা বিষয় পাওয়া গেছে।

টুকু মাসিমা আরো প্রায় এক মাস ও-হাসপাতালে ছিল। পরে সব শুনেছি। জানতে আর কারো বাকি ছিল না। ডাক্তার, হাউস-সার্জেন, মেট্রন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সব্বাই।

সুধাময় সেদিন সেই কথাই বলেছিল বনলতা দেবীকে।

বলেছিল—আমার আর কারো কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই—আপনি আমার খুব ক্ষতি করলেন।

বনলতা বলেছিল—আর আমারই কি মুখ দেখাবার উপায় আছে ভেবেছেন !

সুধাময় বলেছিল—আপনি মেয়েমানুষ, আপনার ঘর থেকে না বেরুলেও চলে। কিন্তু আমার ?

ছকু খানশামা লেন-এর একটা পাঁচ-ঘর-ওয়ালা বাড়ির একখানা ঘর নিয়ে থাকতো তখন বনলতা। সেইখানেই রান্না খাওয়া সেরে দরজায় চাবি দিয়ে ডিউটিতে যেতো। আবার ফিরতো ছোট এটাচি কেসটা নিয়ে। হাসপাতালের কারো জানা ছিল না এ ঠিকানা। কোনওদিন গল্প করতেও বনলতা কাউকে নিয়ে আসেনি এবাড়িতে। কিন্তু এ-বাড়ির ঠিকানা সুধাময় কেমন করে যে জোগাড় করলো কে জানে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিতেই সুধাময়কে দেখে বনলতা কেমন অবাক হয়ে গেলো। খানিকক্ষণ যেন মুখ দিয়ে কথাও বেরোল না তার।

সকাল বেলা যাদের ঝড়গা হয়ে গেছে, দুদিন পরে তারাই কী করে যে এত ঘনিষ্ট হয়ে কথা বলতে পারে, তা লোক চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলে কেউ আর অবাক হবে না।

পরস্পরের ক্ষমা চাওয়ার পালা শেষ হলো, তখন সুধাময়ই প্রথমে কথা বললে। বললে—আমি তাহলে উঠি এখন—

বলে উঠতেই যাচ্ছিল। বনলতা বললে—একটা কাজ করতে পারবেন আমার ?

সুধাময় ঘুরে দাঁড়াল। যেন অবাক হলো। বললে—কাজ ! কী কাজ বলুন ?

বনলতা বললে—আমার এ-মাসের কুড়ি দিনের মাইনে পাওনা আছে—ওটা এনে দিতে পারবেন ?

—কেন, আপনি নিজেও তো আনতে পারেন !

বনলতা বললে—আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি !

তারপর একটু থেমে বললে—যে ঘটনা ঘটলো তাতে আর ওখানে আমার চাকরি করা চলে না।

সুধাময়ের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে বললে—কিন্তু আমিও যে ছেড়ে দিয়েছি ! আর তো যাই না কলেজে—

এবার বিস্ময়ের পালা বনলতার, কিন্তু একটু পরেই বললে—আপনার ভাবনা কি. আপনি ডাক্তারি পাশ করে গেছেন, অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যেতে পারবেন—

সুধাময় বললে—সেই জন্যেই তো ক্ষমা চাইতে এসেছি—

বনলতা বলেছিল—না, ক্ষমা আপনার চাইবার দরকার ছিল না, অপরাধ তো আমারও কম ছিল না—সকাল থেকে মেজাজটা আমার ভালো ছিল না। তারপর মাস বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়ে গেছে…আপনি ঠিক আমাদের অবস্থা বুঝতে পারবেন না—

সুধাময় আবার একটু বসলো। বললে—আপনিও ঠিক আমার অবস্থা বুঝবেন না—সেই ঘটনার পর থেকে আর বাড়ি ফিরিনি, জানেন—

বনলতা বললে—তাহলে দু'দিন কোথায় ছিলেন ?

সুধাময় বললে—এই রাস্তার পার্কে…খবরের কাগজে খবরটা বেরোবার পর কোনও বন্ধুর বাড়ীতে যেতেও লজ্জা করছে…

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা উঠি এখন—

বনলতা বললে—কোথায় যাবেন ?

সুধাময় বললে—জানি না. বাড়িতে তো যেতে পারবো না, হোস্টেলেও না,—

—তাহলে ?

সুধাময় বললে—ডাক্তারি পাশ করেছি, একেবারে উপোষ করবো না জানি, কিন্তু টাকাও আমার হাতে নেই যে ট্রেণে উঠে চড়ে বসি বা কোথাও চলে যাই—টাকা থাকলে কোথাও চলে যেতুম আজই—

সুধাময় এবার উঠে সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছিল। বনলতা চুপ করে চেয়ে দেখল তার দিকে। তারপর যখন সুধাময় সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নেমে গেছে নিচে, তখন ডাকলে—সুধাময়বাবু শুনুন—

সুধাময় ওপর দিকে চাইলে। বললে—আমাকে ডাকছেন ?

বলতে বলতে ওপরে এসে দাঁড়াল আবার। বনলতা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বললে—একটা কথা রাখবেন আমার—

তাড়াতাড়ি হাতের একগাছি চুড়ি খুলে নিয়ে বনলতা সুধাময়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—এটা গিলটী নয়, খাঁটি সোনার, আপনার বোধহয় উপকার হতে পারে—

সুধাময় সত্যিই অবাক হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না তার।

বনলতা বললে—আপনার বয়েস কম,—নিতে আপত্তি করবেন না—

সুধাময় বললে—এর চেয়ে আর একবার জুতো মারুন না—এখানে তো কেউ নেই, আমি তা-ও সহ্য করবো—

বনলতা এবার চোখ নামালো। বললে—আমারও যে খুব ভালো অবস্থা নয়, কিন্তু···

সুধাময় বললে—তা হলে খেসারত্ দিচ্ছেন বুঝি?

বনলতা বললে—ধরুন না কেন তাই। আমি হয়ত খুঁজে পেতে অন্য কোথাও একটা চাকরি জোগাড় করে নেব—কিন্তু আপনার এই বয়েস, এখনও যে অনেক বাকি—

সুধাময় বললে—তা হোক, তবুও আপনি ফিরিয়ে নিন্—

বলে চুড়ি-গাছা বনলতার হাতের মুঠোয় গছিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু বনলতা খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলেছে। বললে—আপনার দুটি হাত ধরে বলছি, নিন্—

সুধাময় অবাক হয়ে বনলতার মুখের দিকে স্পষ্ট করে চাইলে। মুখখানা এতবার দেখেছে, কিন্তু মেয়েটির মুখে যেন অন্য ভাষা অন্য অর্থ দেখতে পেলে আজ প্রথম। সুধাময় আর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না। বললে—আপনি নিতে বলছেন?

বনলতা বললে—আমি আপনার চেয়ে বয়েসে বড়—আমার কথা শুনতে হয়—

সুধাময় বললে—কিন্তু আপনারও তো দুমাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি?

বনলতা বললে—আমি মেয়েমানুষ, আমরা পুরুষের চেয়ে বেশি সহ্য করতে পারি—

বলে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

তুমি মেয়েমানুষ। তুমি হয়ত বনলতার এই আচরণ বুঝতে পারবে। তারপর ঘরে ঢুকে বনলতা বিছানায় মুখ গুঁজে কেঁদেছিল কিনা তা কেউ জানে না।

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তা নাহারগড়ে এক বাঙ্গালী ডাক্তার যখন এল—তার আগে অসুখ হলে লোকে জলপড়া খেত, মানত্ করতো ঠাকুর দেবতাকে—আর যাদের পয়সা ছিল, তারা দেখাতো বৈদ্যকে—রাজার বৈদ্য, তার নজরই লাগতো বারো টাকা, দাওয়াইএর দাম আলাদা—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলতে লাগলো—নাহারগড় ছোট সহর হলে কী হবে, নাহারগড়ের রাজা খানদানী রাজা। রাজার তিন রাণী। ফি রাণীর তেরটা ঝি। ছত্রিশটা কায়েত, আর লোক-লস্কর, খোজা, রাজকুমার, লালজী-সাহেব সব আছে।

আজমীর ষ্টেশনে একদিন ভোরবেলা এক ছোকরা ডাক্তার এসে ট্রেণ থেকে নামলো। সঙ্গে না আছে সুটকেশ, না আছে বিছানা। দেখে মনে হয় তেইশ চব্বিশ বছর বয়েস।

যখন আজমীরে ছিলাম, তখন খানিকটা কাহিনী সদানন্দবাবুর কাছেও শুনেছিলাম।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—মশাই, এই যে রাজপুতানা দেখছেন, যার কোথাও জায়গা নেই এইখানে তার ঠিক জায়গা মিলবে!

বাঙ্গালী-মিষ্টির দোকান করেছেন সদানন্দবাবু। বাঙ্গালী কেউ আজমীরে এলে ওখানে আসতেই হবে। বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়ে এত দূরে ছানার খাবার, দুটো বাঙ্গলা কথা, মাছের ঝোল-ভাত ওইখানেই পাবেন। বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, চিতোর চারধারে। মাঝখানে এই আজমীর।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—নাহারগড়ের রাজবাড়িতে বিয়ে—সন্দেশ রসগোল্লার অডার হয়েছে আমার ওপর—আরও হুকুম হয়েছে মেজরাণীকে রসগোল্লা তৈরি শিখিয়ে দিতে হবে—গিয়ে দেখি রাজবদ্যি ওখানকার বাঙ্গালী। ছোকরা বয়েস—দেখেই চিনতে পারলুম—বললাম—আপনি এখানে?

অনেকদিন আগের কথা। এক ছোকরা মানুষ ষ্টেশনে নেমে সোজা আমার কাছে এসে হাজির। আমি তখন ভিয়েন করতে যাচ্ছি। আমাকে জিজ্ঞেস করলে এখানে ধর্মশালা আছে কোথাও স্যার?

জিজ্ঞেস করলাম—কোত্থেকে আসছেন!

বললে—কলকাতা থেকে—

—সঙ্গে আর কে কে আছে?

বুঝলাম একলা যখন এসেছে তখন তীর্থযাত্রী-টাত্রী কেউ নয়।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কী করেন—

বললে—আমি ডাক্তার।

ডাক্তার শুনেই যেন অবাক হয়ে গেলাম। ডাক্তারি করতে বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে এখানে কেন? নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল আছে! জিজ্ঞেস করলাম—সঙ্গে টাকা-কড়ি কিছু আছে?

বললে—আছে।

বুঝলাম মিথ্যে কথা। কাছে টাকা থাকলে মুখের অন্যরকম চেহারা হতো। বাড়ির কারো গয়না চুরি করে এনেছে হয়ত। এ রকম কত ছেলেই তো এসেছে। আমিও একদিন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এই মরুভূমির দেশে পালিয়ে এসেছিলাম। আমারই মতন কেউ হবে বোধহয়। হাতে তখন ছানার বারকোষটা, সেটা পাশের ঘরে গিয়ে রেখে আসতে হবে। বললাম—তুমি একটু বোস, আমি আসছি—

বলে খানিক পরেই ফিরে এসেছি দোকানে। কতই বা দেরি হয়েছে! এই দু'মিনিট কি তিন-মিনিট! এসে দেখি ভোঁ-ভাঁ! কেউ কোথাও নেই। বোধহয় আমার জিজ্ঞেস করবার ধরন দেখে সন্দেহ হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। ওই যেখানে এখন সিন্ধিদের দোকানগুলো হয়েছে, ওখানে তখন ফাঁকা ছিল সব। সামনে রেলের লাইনগুলো দেখা যেত। সেদিকে একবার পালিয়ে গেলে আর পাত্তা পাওয়া মুস্কিল। শেষে আর তার পাত্তা পাইনি।

তা নাহারগড়ে গিয়ে আবার সেই ছোকরার সাক্ষাৎ পেলাম মশাই। রাজা দলজিৎ সিং-এর খাস রাজবদ্যি! উঠতে বসতে ডাক পড়ে রাজবদ্যির!

বললাম—চিনতে পারেন?

কিন্তু তাকেই মশাই আর চেনবার উপায় নেই তখন। নাহারগড় ষ্টেট আপনার কেউ-কেটা নয়। শহর ছোট হলে কী হবে, নাহারগড়ের রাজা খানদানী রাজা। রাজার তিন রাণী। তিন রাণীর তেরটা করে ঝি, ছত্রিশটা পর্দায়েত, আর লোক লস্কর, খোজা, রাজকুমার, লালজীসাহেব, লালজী-বাঈ—সব আছে। সেই রাজার নেক-নজরে পড়া সোজা কথা নাকি।

চোখে-মুখে কথা সদানন্দবাবুর। বলেন—লোকে বলে বাঙ্গালীর ছেলে ঘর কুনো—তা দেখে আসুন রাজপুতানা ঘুরে, যত ষ্টেটের দেওয়ান, নায়েব, ল-য়্যাডভাইসার সব তো বাঙ্গালী! আর নাহারগড়ে আগে রাজবদ্যি ছিল এ

বেহারী, কারো অসুখ হলে দিত হরতুকির বড়ি, ডাক্তার মিত্তির যাবার পর থেকে আর বত্থির বড়ি কেউ খেতে চায় না—

জিজ্ঞেস করলাম—তা রাজাকে পটালে কী করে ডাক্তার ?

ডাক্তার বললে—মেজরাণী যশোদা-বাঈএর অসুখ হয়েছে, রাজবদ্যি দেখেছে, মোটে সারে না—মরো-মরো অবস্থা, আর আমি তখন আজমীর থেকে টো-টো করে ঘুরতে বেরিয়েছি, বেরিয়ে নাহারগড়ে আছি। রাজবাড়ির পাইক-বরকন্দাজ দোকানে আসে, সিনেমায় ছায়াবাজি দেখে, পথে ঘাটে দেখি। তাদের কাছে কথাটা শুনে বললাম—আমি সারিয়ে দিতে পারি যশোদা-বাঈকে !

কিন্তু দেখবো কী করে। রাজার অন্দরমহলে ঢুকি কী করে। রাজার পাঞ্জা চাই। অন্ততঃ দিলখুশা সিংএর পাঞ্জা চাই। দিলখুশা সিং হলো অন্দরমহলের খোজা! সারা অন্দর মহলের একমাত্র প্রহরী। সর্বত্র তার গতিবিধি। রাণী-সাহেবা থেকে সুরু করে বড়রাণী লালজীবাঈ, বাঁদী, নোকরাণী পর্যন্ত কারোর অন্দর-মহলের বাইরে আসতে গেলে দিলখুশা সিং-এর পাঞ্জা চাই !

বললাম—তা হলে কী হবে ?

তারা বললেন—আপনি রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন—

রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে বিরাট লেক্-এর পাড়ে রেসিডেণ্ট সাহেবের বাঙলা। একদিন ভোর বেলা তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। দেখা কি হয়! দেখা কি করতে চায় ? বেঙ্গল থেকে আসছে শুনেই তখনকার সাহেবরা ভাবতো টেররিস্ট। রেসিডেণ্ট অসবর্ণ সাহেব বার কয়েক দেখলে আমার দিকে। মেডিকেল ডিগ্রীটা হাতে নিয়ে পড়লে কতবার। তাতেও কি সন্দেহ যায়! জিজ্ঞেস করলে—এখানে তুমি কী করতে এসেছ বাবু ?

বললাম—মেজরাণী যশোদা-বাঈএর অসুখের খবর শুনে এসেছি—যদি সারাতে পারি, যদি রাজার নেক-নজরে পড়ে ভাগ্য ফেরাতে পারি, তাই—

তা রেসিডেণ্ট সাহেব লিখে দিলে একটা চিঠি রাজার নামে !

রাজা-সাহেবের সঙ্গেও দেখা হওয়া সোজা ব্যাপার নয়। রাজা তো রাজা! রাজা দলজিৎ সিং বাহাদুর। পারিষদ আমলা কর্মচারীরা বলে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী তাঁর রাজ্য। মোগল সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সম্রাট আকবরের কাছে বীরত্বের জন্যে বাহবা পেয়েছিলেন নাহারগড়ের পূর্বপুরুষ রাজা হিকমৎ সিং বাহাদুর। পুরুষানুক্রমে এখন সে-বীরত্বের খেতাব পেয়েছেন রাজা দলজিৎ সিং। কিন্তু আর কিছু বীরত্ব দেখাবার এখন আর দরকার হয় না। দরকার হলে শুধু রেসিডেণ্ট

সাহেবকে নিয়ে কিম্বা বড়লাট বাহাদুরকে নিয়ে শিকার করতে যান। আমলা-কর্মচারীরা ঢাক পিটিয়ে বিট্ দিয়ে বাঘ-ভাল্লুক তাড়িয়ে নিয়ে আসে রাইফেল-এর আওতার ভেতরে আর তিনি হাতীর পিঠের হাওদায় চড়ে ফায়ার করেন। তা মেজরাণীর অসুখে তিনিও মনমরা হয়েছিলেন। তারপর রেসিডেন্ট অসবর্ণ সাহেবের চিঠি পেয়ে আর দ্বিধা করলেন না। পাঞ্জা পাশ করে দিয়ে আমলাদের হুকুমনামা দিয়ে দিলেন। রোগী দেখে ডাক্তার বেরিয়ে আসবে তারপর সে-পাঞ্জা কেড়ে নেওয়া হবে। যতদিন না রোগ সারে ততদিন!

যথারীতি পাঞ্জা দেখাতে হলো অন্দরমহলের গেটে! খোজা দিলখুশা সিং পাঞ্জা পরীক্ষা করে নিয়ে গেল মেজরাণীর মহলে। মহলের পর মহল অতিক্রম করে, কত সুড়ঙ্গ, কত গলি, কত বিচিত্র ঘাগরা ওড়না সুরমা-আঁকা চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টি পেরিয়ে তবে আসতে হয়। ঝালর ঘেরা মশারির ভেতর মেজরাণী যশোদা-বাঈএর ঘর। মশারীর আড়ালে যশোদাবাঈ শুয়ে ছিলেন। দিলখুশা সিং-এর কথায় ওপাশ থেকে বাঁদী মশারীর বাইরে মেজরাণীর হাতটা বাড়িয়ে দিলে। পরীক্ষা হলো অসুখ। জিজ্ঞাসাবাদ হলো। কী খাচ্ছেন না-খাচ্ছেন সব প্রশ্নের উত্তর হলো ওপার থেকে বাঁদী মারফৎ।

এই রকম তিনদিন। তিনবার যাওয়া-আসা করতে হলো ডাক্তারকে। ওষুধও চলছে। আজমীর থেকে ওষুধ আনিয়ে খেতে দিল। দিলখুশা সিংকে ভালো করে বুঝিয়ে বললে। তারপর রাজার পাঞ্জা দেখিয়ে রাজকোষ থেকে টাকা নিতে হলো।

কিন্তু এতেও তখন অত তাজ্জব কিছু হয়নি।

হলো হঠাৎ। রাজার কাছে খবর গেল নতুন বাঙ্গালী ডাক্তার সাহেব মেজরাণীকে ভাল করে দিয়েছে। এবার তলব হলো রাজার আম দরবারে।

সদানন্দবাবু বললেন—একেই বলে ভাগ্য মশাই—হয়ত মায়ের একগাছা সোনার চুড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছিল—শেষে হয়ে গেল রাজবদ্যি! পুরোন রাজবদ্যির খেলাত গেল। শুধু জায়গীরটা রইল। কার ভাগ্যে তিন হাজারী জায়গীর পেলে, রাজা রাজড়ার ব্যাপার, কখন কার ভাগ্যে ফুলের মালা আর কার ভাগ্যে জুতোর মালা জোটে—কে বলতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম—তা ডাক্তারি পাশ করেছেন আপনি, আপনার চাকরির ভাবনা কী? বাঙ্গলা দেশে একটা জোটাতে পারেন নি এতদিন?

ডাক্তার বললে—বাঙ্গলা দেশে মুখ দেখাবার অবস্থা ছিল না আর, তা নইলে এখানে আসি—

জিজ্ঞেস করলাম—কেন, কী হয়েছিল ?

ডাক্তার চুপ করে গেল। রাজাসাহেব বিরাট প্রাসাদ করে দিয়েছে ডাক্তারের জন্যে। সামনে বাগান। আর শুধু তো রাজত্বই নয়, রাজ-কন্যাও—

—কী রকম ?

সদানন্দবাবু বললেন—তবে শুনুন—

সে-এক ইতিহাস বটে ! আমাদের চোখে তো বটেই। নাহারগড়ের ইতিহাসেও। নাহারগড়ের রাজা ভারি বিলাসী মানুষ। কাজ-কম্ম তো নেই মশাই, কেবল বিলাস। নইলে রসগোল্লা তৈরি করতে গিয়ে আমি মাঝখান থেকে পাঁচটা হীরের আংটি, একটা গরদের জোড় আর সাতশো টাকা ইনাম নিয়ে এলাম ! রাজবাড়ির আম্‌লা-মহকুমা-দরবারের লোক খেয়ে একেবারে বাহোবা-বাহোবা করতে লাগলো ! এমন মেঠাই খায়নি কখনও—বড়রাণী নিজে তাঁর হাতের পান্নার আংটি দিয়ে তারিফ পাঠালেন। অথচ রসগোল্লা তৈরি করতে ছাই শিখেছে ! রসগোল্লা তৈরি কি অত সহজ মশাই, তাহলে তো সবাই পারতো তা শেষে রাজাসাহেবের পেয়ারের লোক হয়ে উঠলো ডাক্তার। রোগ কারো হোক আর না হোক, ডাকো ডাক্তার সাহেবকে ! দুপুরবেলা গরমে ঘুম আসছে না, ডাকো ডাক্তার সাহেবকে ! অন্দরে ভালো সরবৎ বানিয়েছে, ডাকো ডাক্তার সাহেবকে ! এমনি যখন-তখন ডাক ! আর ডাক্তারেরই বা কী কাজ ! রাজ-বৈদ্য হয়েছে, তিন হাজারী জায়গীর পেয়েছে, রাজার হুকুমে হুজুরে হাজির হওয়াই তো রাজ-বদ্যির আসল কাজ !

তবু যখন সময় থাকে হাতে, যখন একলা ঘরে মরুভূমির গরমের ডাক্তার রাত্রে শুয়ে থাকে আর ঘুম আসে না তখন মনে পড়ে আর একজনের কথা। আসবার দিন জোর করে হাতে গুঁজে দিয়েছিল একগাছা সোনার চুড়ি।

সুধাময় বলেছিল—ঋণশোধ করে দেব একদিন, সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া আর আমার কিছু বলবার মুখ নেই—জানো—

বনলতা বলেছিল—একে ঋণ না-ই বা বললে—ধরো না কেন, তোমাকে দিলাম আমি ওটা—

সুধাময় খুব হেসেছিল সেদিন কথাটা শুনে।

বনলতা বলেছিল—অত হাসছো যে ?

সুধাময় বলেছিল—আমাকে জুতো মারার ব্যাপারটা তুমি এখনও ভুলতে পারোনি দেখছি—আমি কিন্তু ভুলেই গেছি—

বনলতা কিন্তু হাসেনি বলেছিল—যারা এত সহজে সব ভুলে যায় তাদের নিয়ে কিন্তু ভয়ের কথা!

সুধাময় তখন বনলতার হাতটা ধরেছিল নিজের হাত দিয়ে। বললে—আমাকে নিয়ে কিন্তু তোমার অত ভয় করবার দরকার নেই—অপমানটাই সহজে ভুলি, তাবলে ভালবাসাও ভুলবো এমন পাষণ্ড নই আমি—

বনলতা বলেছিল—চিঠি দেবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে কি?

পাশের বাড়ির মেয়েরা বলতো—আজ তোমার ডিউটি নেই বনলতাদি?

একটি দিনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে যেন পৃথিবীতে। একদিন আগেও যে-ছিল নেহাৎই পর, হাওড়া ষ্টেশনে সেই সুধাময়ের গাড়িটা দেখার পর কেমন যেন ফাঁকা লাগলো সমস্ত কিছু। অথচ সুধাময় তার কে-না-কে? একই হাসপাতালের একজন ছাব্বিশ বছর বয়েসের নার্স আর একজন সদ্য পাশ করা ডাক্তার। চেহারাতেও কত ছোট দেখায়!

বনলতা শুধু বলেছিল—আমার জন্যেই তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে যেতে হলো—

সুধাময় বললে—আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে আমার লাভ হলো কি লোকসান হলো তা এখনো বলার সময় আসেনি—

বনলতা বলেছিল—সে-সময় আর কি আসবে?

সুধাময় বলেছিল—না এলে তোমার জুতো মারাও যেমন মিথ্যে হবে, তেমনি তোমার চুড়ি দেওয়াও মিথ্যে হবে, আমার লাভ-লোকসান সবই মিথ্যে হয়ে যাবে—

গিয়ে অবশ্য সুধাময় একটা চিঠি দিয়েছিল। লিখেছিল—রাজপুতানার মরুভূমির দেশে এসে এখনও ওয়েসিসের সন্ধান পাইনি। রাস্তায়-রাস্তায় চানা-ভাজা খাই আর কুয়োর জল ভরসা। তোমার চুড়ি-গাছা আজো খরচ করতে ভয় হয়, ওটা কাছে রেখে দিই সব সময়, তুমি যে আছো তার উপলব্ধিতে সান্ত্বনা পাই—

চিঠিটার কোথাও বনলতাকে যেতে বলার অনুরোধ নেই। বার-বার চিঠিটা পড়লে বনলতা। তারপর চিঠিটা আঁচলে বেঁধে রেখেই উনুনে ভাত চড়িয়ে দিলে। ছাব্বিশ বছর বয়েস তো, সত্যি কথাটা লিখতে আত্ম-অহমিকায় বাধলো। চাকরি জোটেনি তবু লিখলে—নতুন একটা হাসপাতালে চাকরি নিয়েছি, কলকাতা থেকে দূরে, সময়মত উত্তর না-পেলে কিছু মনে কোর না—

দুপুরবেলা ভাত খেয়ে উঠে মেঝেতেই গড়িয়ে পড়লো বনলতা। সুধাময় তো দেখতে আসছে না।

কিন্তু রাজপুতানা কলকাতা নয়। নাহারগড়ও কলকাতা নয়।

আর ডাক্তার সুধাময়ের বয়েসও তেইশ। সে কী করে বুঝবে ছাব্বিশের ব্যথা। সকাল থেকে উঠে প্রথম কাজ সাজ-গোজ করা। দরবারে গিয়ে রাজা দলজিৎ সিং বাহাদুরকে কুর্নিশ করে বসে থাকতে হয়। তারপর দরবার শেষ হতেই বাড়ি এসে খেয়ে নিয়ে দৌড়তে হয় রাজপ্রাসাদের তয়খানাতে। দিবানিদ্রার পর রাজা-সাহেব তখন দাবা খেলতে বসেন। আগে অন্য সঙ্গী ছিল, এখন ডাক্তার। এককালে রাজমন্ত্রীজী, দেওয়ানজী, রাণীজী, পর্দায়েৎজী, পাশোয়ানজী সবাইকে সঙ্গে নিয়েছে দাবা খেলায়। এখন হয়েছে ডাক্তার।

রাজা-সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—দাবা খেলা আসে ডাক্তার?

মহারাজার সামনে না বলতে নেই। বললে—জানি হুজুর—

এককালে দাবা খেলেছে সুধাময়। তখন ছিল আড্ডার নেশা। এখন চাকরি বাঁচাতে দাবা খেলতে হয়। এই দাবা খেলতে খেলতেই একদিন সুধাময়ের জীবনে চরম আত্মোপলব্ধি এল। আবার আত্মবিভ্রমও এল বলা চলে। এই দাবা খেলতে না বসলে বনলতার জীবনেও এই দুর্দৈব আসতো না। আর গল্প-লেখক হিসেবে আমিও সরবতি বাঈ-এর কাহিনী জানতে পারতুম না।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—আমি গিয়েছিলাম রসগোল্লা বানাতে আর শুনে এলুম সরবতি বাঈ-এর গল্প—

রাজ-অন্দরমহলের ব্যাপার। কখনও তো দেখিনি। না-দেখলে তা বোঝবার সাধ্য নেই কারো। গোলাপী ওড়না আর অসূর্যম্পশ্যাদের চকিত চাউনির ভিড়। এখানে সুড়ঙ্গ, ওখানে কটাক্ষ। নানা তোষামোদ আর হাহাকারের ভিড়, ঘাগরা আর সুরমা কাজলের রহস্য। বাইরের জগতের বিশ্ব-পৃথিবীর খবর এখানে পৌঁছোয় না। এখানেই জন্ম আর এখানেই মৃত্যু হয়েছে এমন নারীর ইতিহাসই এখানে বেশি। শেঠ আর বেনেদের ঠাকুরাণীরা আসে উৎসব-পার্বণে, দোল-যাত্রায়। কেউ ফিরে যায়, কেউ রাজা-সাহেবের নজরে পড়ে গিয়ে আর ফিরতে পারে না। কারো কারো উচ্চাকাঙ্খা তালকটোরার বন্দীশালায় ধূলিসাৎ হয়। রাজার নজরে একবার পড়ে গেলে জীবনের কোনও সাধ আর অপূর্ণ থাকবার নয়। তার জন্যে, কত সাধ্য-সাধনা। খোসামোদ করতে হয় মহারাণীকে, মাজী-সাহেবাকে, পর্দায়েৎ, পাশোয়ানজীকে আর সকলের চেয়ে বেশি খোসামোদ করতে হয় একমাত্র প্রহরী খোজা দিলখুশা সিং-কে। কিন্তু সরবতি বাঈ তাঁদের মধ্যে একজন হলেও—ঠিক তাদের মত নয়।

খেলায় রাজা-সাহেবই বেশিবার হারেন। হারলেই তো খেলে আনন্দ। ভারি উৎসাহ রাজা-সাহেবের।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—সেকালের রাজা-মহারাজাদের কাজ-কর্ম ছিল, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল, এখনকার রাজাদের আছে কী মশাই! শুধু কোথায় সুন্দরী মেয়ে আছে নিয়ে এস, কার সুন্দরী বউ আছে ধরে আনো। এমনি করে অসংখ্য মেয়ে-মানুষে ভরে গেছে অন্দর-মহল। সেখানে একমাত্র পুরুষ হলো রাজা-সাহেব। তা সব সময়েই কি আর সে-সব ভালো লাগে! মাঝে মাঝে তাই শিকার-টিকার করেন, দাবা টাবা খেলেন। তা নাহারগড়ের রাজার আবার বয়েসটাও কম। তিন রাণী, সেই রাণীর বয়েসও আবার রাজার বয়েসের চেয়ে বেশি! মহারাজার বয়েস যখন বারো, বড় রাণীর বয়েস তখন কুড়ি, মেজ রাণীর বয়েস তখন ষোলো, ছোট রাণী তখনও আসেই নি। আবার প্রত্যেক রাণীর সঙ্গে বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক-পাওয়া তেরটা-চোদ্দটা করে ঝি, তাদেরও এইরকম জোয়ান বয়েস। তা ছাড়া আছে রাণীদের সখীরা, আছে বাইরের উপহার পাওয়া মেয়ে, কেউ এসেছে ইচ্ছে করে, কাউকে আনা হয়েছে ভুলিয়ে ভালিয়ে। রাত্রে গান-বাজনার উৎসবে তাদের কাউকে চোখে লেগে গেল তো তার বরাত খুললো। কাউকে আবার ষড়যন্ত্র করে গুম্ করে ফেলা হলো তালকটোরার ঘরে। সারা-জীবন আর রাজা-সাহেবের নজরে না পড়তে পারে। তা সুন্দরী মেয়েদের ভাগ্যে বিড়ম্বনাই বেশী কি না। আমি যে অন্দর-মহলে ঢুকলাম, মেজরাণীকে রসগোল্লা তৈরি করতে শেখালুম, কাউকে এক-পলকের জন্যে দেখতেও পাইনি, খোজা-সাহেবের আইন এমনি কড়া!

কিন্তু ডাক্তারের ব্যাপার আলাদা! রাজ-বদ্যি, তায় রাজা-সাহেবের পেয়ারের লোক!

ডাক্তার বলে—হুজুর, গজ বন্দী হলো আপনার!

রাজা-সাহেব বলেন—তোমার মন্ত্রীর কী দশা করি দেখ ডাক্তার—

প্রাসাদের তয়খানা একেবারে মাটির নিচেয় তৈরি। গরমের দিনে ভারি আরাম সেখানে। ভেতরের অন্দর-মহল থেকে সুড়ঙ্গ পথে আসা-যাওয়ার রাস্তা আছে। দরকার হলে রাজা-সাহেব হাততালি দেন আর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হয়। ঘাগরাপরা দাসী বাঁদী আসে। জল দরকার হলে জল, সরবৎ দরকার হলে সরবৎ, যা চাই সব।

রাজা-সাহেব আমলাদের বলেন—ডাক্তারের মাথা খুব সাফ—

শুধু মাথা নয়, ডাক্তারের সবই ভালো। ডাক্তার কাছে এলেই হাসি বেরোয়

মুখে। যে-কাজ কেউ আদায় করতে পারছে না, ডাক্তারকে বললেই তামিল হয়ে যাবে। ডাক্তারের কথায় 'না'-বলবার সাধ্য মহারাজার নেই। সম্মানে উঁচু-নিচু হলেও বয়েসটা দু'জনেরই এক। তা সাধে কি বলে বাঙ্গালীর বুদ্ধি! বুঝুন, সেই কোন দূর বাঙ্গলা দেশ থেকে খালি হাতে এসে একেবারে সর্বস্ব দখল করে নিলে। সাধে কি আর মশাই সবাই চটে গেছে আমাদের ওপর?

বললাম—তারপর কী হলো বলুন?

সদানন্দবাবু বললেন—তারপরেই তো সরবতিবাঈ এল। দুপুর থেকে খেলা চলেছে। পর-পর দুবার হার হয়েছে রাজা-সাহেবের, এবারও হারবার মত অবস্থা। কিস্তী মাৎ হবো-হবো! ডাক্তারের কাছে পারবার উপায় নেই। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো!

ভীষণ গরমের দিন। হলেই বা তয়খানা। পাকা চোত্ মাস। বাইরে তো লূ চলে। আকাশের তলায় আই-ঢাই করে প্রাণ। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে চিঁ চিঁ করে। ডাক্তারের জল তেষ্টা পেয়ে গেল!

ডাক্তারের ও-সব আরক-মোদক কিছুই চলে না। বললে—এক গ্লাস জল চাই—

রাজা-সাহেব হাততালি দিলেন। সে-হাততালির মানে যারা বোঝে তারা বোঝে! হাত-তালির ইঙ্গিত পেতেই পেছনের সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে বেরিয়ে এল সরবতি বাঈ!

খেলা ফেলে ডাক্তার চেয়ে রইল সেই দিকে। গোলাপী বুটিদার ঘাগরা, বুকে সোনালী এক-চিল্‌তে কাঁচুলি আর পাতলা ফিনফিনে জাফরাণী জরিদার ওড়না। গায়ে আর কোথাও কিছু নেই। মাথায় সোনার ঘড়া। দুহাতে ঘড়াটা আলতো করে ধরে ঘরে এসে দাঁড়ালো। হেঁটে এল না সরবতি-বাঈ, যেন ভেসে এল। ডাক্তার জল খেয়ে আবার দাবার চাল দিলে। কিন্তু আর যেন জমলো না।

রাজা-সাহেবও অবাক হয়ে গেছেন। সেই প্রথম হার হলো ডাক্তারের।

ওঠবার সময় রাজা-সাহেব মাথায় পাগড়ি পরে বললেন—তোমায় আমি একটা উপহার দেব ডাক্তার!

—উপহার?

রাজা-সাহেব বললেন—তুমি তো বিয়ে করোনি?

ডাক্তার বললে—না—

—তবে এবার তুমি বিয়ে করো!

ডাক্তার অবাক হয়ে গেছে। বললে—কাকে?

—সরবতিকে তোমার হাতে দেব—

ভাবুন একবার! ইতিহাসে এমন ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি, দেখেনি। মোগল-সরকারের আমলে অবশ্য বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সে তো রাজনীতি। লালজীসাহেব, বাঈলালজীদের কারো কারো এমন দুর্দৈব ঘটেছে। কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের বে-ওয়ারিশ কোনও মেয়ের ভাগ্যে এমন ঘটনার কথা ইতিহাসে নেই। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কোন বাঈলালজীর বিয়েতেও এত ঘটা হয় না। বায়না চলে গেল এখানে-সেখানে। জুতোওয়ালা জুতো তৈরি করতে বসলো। মেঠাইওয়ালা মেঠাই বানাতে লাগলো। এখান-ওখান থেকে কুটুম্বরা আসবে। এলাহি কাণ্ড। রসগোল্লা বানাবার ফরমাস হলো আমার ওপর! কিন্তু যাদের নিয়ে কাণ্ড, যাদের বিয়ে তাদের বুক দুর-দুর করে কাঁপছে।

দিলখুশা সিং পিঠ চাপড়ে দিলে সরবতি বাঈ-এর। যা, বেঁচে গেলি বেটি! তোর দেমাগ্ খুশ্ হবে এবার!

আর ডাক্তার! ডাক্তার সুধাময়। কলকাতার মেডিকেল কলেজের এম-বি ডাক্তার তারও আবার ভয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না ডাক্তারের চোখে। অনেক মাইল দূরে একটি মেয়ে এই রাত্রে হাসপাতালে ডিউটি করতে করতে হয়ত একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই তার—কোথাও নেই আশ্রয়। একগাছি সোনার চুড়ি দিয়ে একজন নিরুদ্দেশ যাত্রীকে একদিন সাহায্য করেছিল। তারপর হয়ত আবার অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে মেতে আছে।

চিঠি লেখে বনলতা। লেখে—চাকরিতে মোটে সময় পাই না। সময়মত চিঠি না দিতে পারলে ভেবো না, নতুন দেশ, দুধ খাবে আর ও-দেশে তো খাঁটি ঘি পাওয়া যায়—তার ব্যবস্থা কোর, এখানে ইলিশমাছ উঠেছে, তোমার জন্যে মন কেমন করে—

ছাব্বিশ বছর বয়েসের দৌর্বল্য থাকে বনলতার চিঠিতেও। যেন উপদেশ দেয়, যেন উঁচুতে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চাওয়া। ঠিক সমানে-সমানে নয়।

সুধাময়ের চিঠিও আসে। লেখে—তোমার সোনার চুড়িটা আর বেচবার দরকার হবে না, তবু কাছে রাখি, মনে হয় তুমি কাছাকাছি আছো, একেবারে হৃদয়ের কাছাকাছি—

বার-বার চিঠিগুলো পড়ে বনলতা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। রান্না করবার

ফাঁকে ফাঁকে পড়ে। কই, কোথাও তো যেতে লেখেনি তাকে। হয়ত এখনও ভালো করে গুছিয়ে বসেনি সুধাময়। ভালো করে ঘর সাজাতে হবে, ভালো করে ব্যবস্থা করতে হবে। বনলতাকে তো যেমন-তেমন করে রাখা যায় না। যেখানে-সেখানে! নিজে মুখ ফুটে কি বলা যায়—আমি যাচ্ছি! যেতে তো কই লেখে না! তেমন করে কই লেখে—তুমি চলে এসো বনলতা, আমি তোমার জন্যে ঘর সাজিয়ে বসে আছি। ছাড়ো তোমার চাকরি, আমি তো আছি, চাকরি তোমায় আমি আর করতে দেব না—

এ-হাসপাতাল থেকে ও-হাসপাতাল। কোথাও গিয়ে বনে না বনলতার।

একটু অসুবিধে হলেই বলে—দেখুন, আপনাদের মতো নয় আমার, আমার চাকরি না করলেও চলে—

সরলাদি বলে—হ্যাঁ বনলতাদি, তুমি নাকি এক ডাক্তারকে জুতো মেরেছিলে?

চম্‌কে ওঠে বনলতা। কে বললে?

এখানে হাওড়াতেও তাহলে কথাটা প্রচার হয়ে গেছে। বলে—তোমার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে বোলে দিও, দরকার হলে তাঁকেও জুতো মারতে বাধবে না। আমার—

সরলাদি বলে—কাজ কি ভাই ও-সব ভেবে, চাকরি করতে যখন এসেছি, চাকরি না করে কি চলবে আমাদের? এই তো আমাদের কপাল—

বনলতা বলে—তোমাকে তাহলে সত্যি কথাই বলি সরলাদি—চাকরি আমি করবো না বেশি দিন।

সরলাদি যেন অবাক হয়। বিশ্বাস করে না।—বলে—চাকরি না করে কী করে চালাবে বনলতাদি?

বনলতা বলে—কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো!

—কোথায়!

বনলতা বলে—যেখানে হোক—আমরা কাজ জানি, কাজ জানলে খাবার জায়গার অভাব—

সরলাদি বলে—আমাকেও সঙ্গে নিও বনলতাদি, আমারও আর ভাল লাগে না, খবর-কাগজ খুলে তাই কেবল চাকরি-খালির বিজ্ঞাপনগুলো দেখি—

বনলতা বলে—যাবে আমার সঙ্গে—সে কিন্তু অনেক দূর—

—অনেক দূর! কোথায় শুনি?

—নাহারগড়।

সরলাদি বলে—নাহারগড় আবার কোথায় ভাই, নাম শুনিনি তো! সে-কোথায়?

—রাজপুতানায়!

সরবতী বাঈ বলেছিল—বাঙ্গলা দেশ, সে কোথায়?

সুধাময় বলেছিল—সে অনেক দূর।

অনেক দূরত্বটা আন্দাজ করতে গিয়ে সরবতী বাঈ-এর চোখ দুটোও বড় হয়ে আসে। অনেক দূরের মানুষকে যেন ভয় হয়। সরবতীবাঈএর চোখে যেন কেবল ভয়ের ছায়া। রাজাসাহেব কোনও ত্রুটি রাখেননি। আজমীর, বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর থেকে আত্মীয় কুটুম্বরা এসেছে! অন্দর মহলে এসে ঢুকেছে। রাজপুরোহিত এসে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে। ও বিয়ে যখন, তখন বাঙালী-মতই হোক আর রাজপুত-মতেই হোক—হলেই হলো!

বিয়ে ফুলশয্যা বৌভাত সবই রাজোচিত।

রাজা-সাহেব জিজ্ঞেসা করেছিলেন একবার—তোমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে নেমন্তন্ন করতে হবে না?

কিন্তু আছে কে যে নেমন্তন্ন করবে। বিয়ে যারা দেবার লোক তারা সবাই আছে সুধাময়ের কিন্তু সম্পর্ক যখন রাখেনি কেউ তখন আর দরকার কী। আর রাজা-সাহেব একাই তো একশো। একা রাজা-সাহেব থাকলে আর কারো সাহায্য চায় কে!

সরবতি বাঈ ফুলশয্যার রাত্রেই বলেছিল—আমাকে ছুঁয়ো না—

হয়ত প্রথম লজ্জার ভান! কিন্তু রাজ-অন্দর মহলে মানুষ, যৌবন নিয়ে যত রকম বেসাতি আছে সব তো তার নখ-দর্পণে থাকা উচিত। চোখের সামনেই তো দেখেছে যৌবন কী করে বিশ্বজয় করে। সামান্য চাষার গরীব মেয়ে কী করে একদিন মহারাণীর চেয়েও উঁচু পদ পেয়ে যায়।

ছোট বেলায় বাবা একদিন বলেছিলেন—এবার চাকরিতে ঢুকে পড়ো আর আমি তোমায় পড়াতে পারবো না—

সুধাময় তখন সবে আই-এস-সি পাশ করেছে। বললে—কেরাণীগিরি আমি করবো না—

রেগে গিয়েছিলেন বাবা। বলেছিলেন—তা হ'লে তোমার যা ইচ্ছে করো—আমার আর পড়াবার ক্ষমতা নেই—

কাকাদের কাছে গিয়েও দরবার করতে হয়েছিল—। তাঁরা বলেছিলেন—

ডাক্তারি পড়া তো চারটিখানি কথা নয়—শুধু টাকা হলেই তো চলবে না, মাথাও চাই—

বাবা অবশ্য তার ডাক্তারি পাশ করা দেখতে পাননি। মা-ও না। দেখেছিলেন কাকাবাবু। কিন্তু তারপরেই তো লজ্জায় কলঙ্কে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। বাঙলা দেশের সঙ্গে তার আর সম্পর্কই রইল না। ক্ষীণ একটু সম্পর্ক রইল যার সঙ্গে, সে বনলতা। কিন্তু বনলতাকে এ-খবরটাই বা জানানো যায় কেমন করে। রবিবার দিন সকালবেলাই একটা চিঠি এসেছিল বনলতার। লিখেছে—চাকরিতে বড় ব্যস্ত থাকতে হয়—মোটে সময় পাই না—ভাবছি অন্য হাসপাতালে চাকরি নেব, এখানে মেট্রন সুবিধের লোক নয়—

থাক। বনলতা তার চাকরি নিয়েই ব্যস্ত থাক।

আর সুধাময় এখানেই থাকুক। সরবতী বাঈ আছে, রাজা-সাহেব আছেন, ভয় কী তার!

সুধাময় জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কী ভয় করছে?

কোনও উত্তর দেয়নি সরবতীবাঈ! গোলাপী বুটিদার ঘাগরা, এক চিলতে কাচুলী আর জাফরাণী রঙের পাতলা ওড়নার আড়ালে নিজেকে যেন সুন্দর করে রেখেছিল সে। যেন স্পর্শ করলে জাত যাবে তার।

কিন্তু সত্যিই শেষ পর্যন্ত জাত যায়নি সরবতী বাঈ-এর।

বলেছিল—তুমি আমাকে সাদী করলে কেন বাবুজী?

সুধাময় জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, তুমি কি সুখী হওনি?

তখন রাজা-সাহেব মারা গেছেন। তিন রাণী বিধবা হয়েছে। ভোল বদলে গেছে রাজ্যের। ডাক্তারের আগেকার প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেছে। শুধু আছে জায়গীরী। তিন হাজারী থেকে পঞ্চাশ হাজারী করে গিয়েছিলেন রাজা-সাহেব, তাই আছে। সরবতিয়ার তখন শোচনীয় অবস্থা। তাকে আর স্পর্শ করা যায় না। ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দেয় সুধাময়। রাতদিন তার ঘুম নেই। বড় বড় বই আনায় সুধাময়। ডাক্তারী শাস্ত্রে এত ওষুধ আছে, এ-রোগের চিকিৎসা হবে না, এ-রোগ আরোগ্য হবে না, তা কি হতে পারে! আস্তে আস্তে ঘায়ের ওপর মলম লাগিয়ে দেয় সুধাময়। সরবতি বাঈ-এর সেই রূপ, সে কোথায় গেল। এখন চোখ মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে হয়। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে সরবতি বাঈ!

সরবতি বাঈ কাতর চোখে জিজ্ঞেস করে,—আমাকে তুমি কেন সাদী করেছিলে বাবুজী?

কিন্তু তখন আর কার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে সুধাময়! যার কাছে চাইবার তিনি আর তখন নেই। রাজা-সাহেব তখন লালজী-সাহেবদের ষড়যন্ত্রে খুন হয়ে গেছেন। তাঁর প্রেতাত্মা তখন অন্তঃপুরের মহলে-মহলে, তালকটোরার কুঠরীতে-টুঠরীতে সুড়ঙ্গের অলিতে-গলিতে, অলিন্দে-অলিন্দে আর মাজী সাহেব, মহারাণী পর্দায়েৎ পাশোয়ানজীদের কক্ষে কক্ষে নিঃশব্দে হাহাকার করে বেড়ায়।

ফুলশয্যার রাত্রে নির্জন ঘরে সরবতি বাঈ-এর সেই উন্মত্ত রূপ আবার ঝড় ওঠালো। সুধাময় আবার সেই দিকে চেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সেই দাবা খেলার সময় যেমনভাবে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। বাইরে মরুভূমির রাত্রি যেন যাদুমন্ত্রে মদির হয়ে উঠেছে। রাজার আদেশে এ ঘরে আজ সমারোহের সীমা নেই। আতর গোলাপজল, ফুল, পানীয়—কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি। অন্তঃপুরের মহিলারা উৎসবের শেষ সমবেত গানটি গেয়ে বিদায় নিয়েছে। বাইরে উৎসবের বাকি অংশ এখনও চলছে, কানে ভেসে আসছে সে-সুর।

সরবতি বাঈ চীৎকার করে উঠলো—পায়ে পড়ি বাবুজী, আমাকে ছুঁয়ো না—

—কেন?

বিয়ের ইতিহাসে নববধূর এ-আচরণ কখনও শোনা যায়নি। অন্ততঃ সুধাময় কখনও শোনেনি। তবু সে রাত্রি তেমনি করেই কেটে গেল। দুজনেই জেগে। একজন পালঙ্কের ওপর, আর একজন পালঙ্কের নীচে। রাত্রের ফুল সকাল হলেই শুকিয়ে এলো। আতর গোলাপজলের তীব্র সুগন্ধও কখন মরুভূমির শুখনো হাওয়ায় মিলিয়ে এল। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সরবতি বাঈ সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল আর বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুধাময়।

আজ থেকে কত বছর আগেকার এ-সব ঘটনা, এ-সব শোনা কাহিনী মনে পড়তো না, যদি না তোমার চিঠি পেতাম। এ সেই বনলতারই। সরবতি বাঈ এ-কাহিনীর কিছু না। তবু বনলতার কাহিনী বলতে গেলে সরবতি বাঈ-এর কাহিনী না বললে চলবে না।

বনলতা তোমারই মত একদিন ছিল ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। তোমারই মত চাকরি করতো সে। আর তোমারই মত মুখ ফুটে মনের কথাটা বলতে লজ্জা পেত। তোমারই মত সুধাময়ের সব আবদারে সন্দেহ করে দূরে সরে থাকতে চাইত। বয়েসে

়ু হওয়ার জ্বালা তো আছেই। তাই তো বলি সেই জ্বালা ঢাকবার জন্যে লজ্জা ারো খারাপ।

সরলাদি বলতো—কা'র সোয়েটার বুনছো বনলতাদি ?

সুধাময়ের নামটা করতে যেন লজ্জা করতো বনলতার। বলতো—কেউ না কেউ আসবেই, তখন তাকেই দেব—

সরলাদি বলতো—কেউ এলে এখনই আসতো—আমাদের বয়েস তো হু হু করে ড়ে চলেছে ভাই—

এক-একদিন সরলাদি বলতো—রাজপুতানায় যাবে বলেছিলে, যাবে না ?

বনলতা বলে—দূর, ও তোমাকে এমনি বলেছিলাম—

তবু তন্ন তন্ন করে সুধাময়ের চিঠিগুলো পড়েও কোথাও তাকে আহ্বানের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। চিঠির কোথাও এতটুকু হা-হুতাশ নেই। একলা থাকবার -হুতাশ! কোথাও কোনও ইঙ্গিতও নেই তার। লেখে—চাকরি করতে গেলে -সব একটু সহ্য করতেই হয়, সহ্য করবে মুখ বুজে। তোমার সেই সোনার চুড়িটা এখনও কাছে রেখে দিয়েছি। ওটা তোমায় ফেরৎ পাঠাবো না—। ওটা কাছে রেখে দিয়ে শান্তি পাই—মনে হয় তুমি আমার কাছাকাছি আছো—

তারপর ?

তারপরেও পড়ে দেখে বনতলা। কোথাও তো এ-কথা লেখা নেই—'তুমি করি ছেড়ে দিয়ে চলে এসো, চাকরি করবার দরকার নেই তোমার—'। এ-কথা স্পষ্ট করে কেন লেখে না সুধাময়।

রাত্রের নির্জনে আবার দেখা হয় সরবতি বাঈ-এর সঙ্গে। একদিনেই যেন চেহারা করুণ হয়ে উঠেছে। রাজার প্রাসাদের অন্তঃপুর ছেড়ে সুধাময়ের বাড়িতে এসে উঠেছে সরবতি বাঈ। রাজা-সাহেব দু'জনের একটা বিরাট অয়েল পেন্টিং করে দিয়েছেন। সেটা দেয়ালে টাঙ্গানো হয়েছে। চমৎকার মানিয়েছে সরবতি বাঈকে। বু সুধাময়ের মনে হলো সরবতি বাঈ যেন ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে থাকে ইচ্ছে রে।

হাত ধরতেই সরবতি বাঈ সরে গেল। বললে—আমাকে ছুঁয়ো না তুমি বাবুজী! নিজের স্ত্রীকে ছুঁতে পারবে না সুধাময়, এ-কেমন অনুরোধ!

সরবতি বাঈ বললে—না, আমার অসুখ আছে।

অসুখ! সত্যিই এক-পা পেছিয়ে এল সুধাময়! অসুখ যদি সরবতি-বাঈ-এর তো সেও তো ডাক্তার। কী অসুখ! কেমন অসুখ! সব অসুখের ওষুধ আছে।

অসুখ সারিয়ে দেবে সুধাময়। অসুখের জন্যে ভয় কী! কিন্তু ডাক্তার রোগীকে ছোঁবে না, এ-কেমন কথা।

সরবতি বাঈ বললে—আমাকে ছুঁলে তোমারও অসুখ হবে বাবুজী!

সুধাময় এবার সোজা হয়ে প্রশ্ন করলে—কী অসুখ?

সরবতি বাঈ বললে—ওরা সবাই তোমাকে জব্দ করবার জন্যে তোমাদের দাবা খেলার আসরে আমাকে পাঠিয়েছিল—তোমার ওপর ওদের খুব রাগ—

সুধাময় জিজ্ঞেস করলে—রাগ কেন?

সরবতি বাঈ বললে—রাজা-সাহেব যে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল বাবুজী!

—তা আমাকে জব্দ করবে কী করে শুনি?

সরবতি বাঈ বললে—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে—তোমার জীবন বরবাদ করে দিয়ে?

সুধাময় বললে—তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমার জীবন বরবাদ্ হবে কেন?

সরবতি বাঈ বললে—হ্যাঁ, বাবুজী, আমার জীবনও বরবাদ্ হয়ে গিয়েছে—

সব শুনে অবাক হয়ে গেল সুধাময়। সরবতি বাঈ বললে—আমার মত আরো অনেক মেয়ে আছে বাবুজী, কাউকে জব্দ করতে গেলে তাদের দিয়ে মন ভুলিয়ে জওয়ানী বরবাদ্ করে দেওয়া যায়,—

—আর তারা?

সরবতি বাঈ বললে—তারা ওখানেই একদিন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে কুষ্ঠ হয়ে মারা যায়—

সুধাময় বললে—রাজা-সাহেব জানেন এ-সব কথা?

সরবতি বাঈ বললে—হুজুর সব ব্যাপার জানেন, শুধু আমার ব্যাপারটা জানেন না। এ খোজা দিলখুশা সিং-এর মতলব, লালজী সাহেবের চক্রান্ত আর বড় রাণী চন্দ্রাবতীর পরামর্শ—

এ-সব অনেকদিন পরের কথা। পরদিন সকালেই সুধাময় দরবারে গিয়ে রাজা-সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাইলে। আমলারা বললে—রাজা-সাহেব তো আজ দরবার করবেন না হুজুর—

—কেন?

—সে তাঁর খুশী!

কিন্তু পরদিনও রাজা-সাহেব এলেন না। কিন্তু খবরটা তার পরদিন বেরুল রেসিডেন্ট্ সাহেব এলেন, তদারকি চললো কিছুদিন। অনেক জল গড়িয়ে গেল

আরাবল্লীর গিরি-খাত দিয়ে, অনেক মোহর, অনেক টাকা, অনেক ইনাম সুড়ঙ্গের অন্ধকার গলিতে গিয়ে আত্মগোপন করলো। সারা-রাজ্যময় তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল সেদিন। কত গুজবের সৃষ্টি হলো, কত কাহিনী। কেউ বলে—এ লালজী সাহেবের কাজ।

কেউ বলে—রাণী চন্দ্রাবতজীর পরামর্শ—

কেউ বলে—দিলখুশা সিং-এর হাত আছে এতে—

রেসিডেন্টের রিপোর্ট গেল দিল্লীতে—নাহারগড়ের রুলিং প্রিন্স হার্ট ফেল করে মারা গেছেন—

সরবতি বাঈ বললে—আমার জন্যে কেন তক্‌লীফ করছেন বাবুজী,—

বেশি কথা বলে না সরবতি বাঈ। শুধু বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটো শুধু এক-একবারে কাঁপে। বলে—ও-সাদী আমাদের সাদী নয় বাবুজী! আমাকে ভুলে যান আপনি—

সুধাময় বই খুলে তখন পড়ছে। দিনরাত বই পড়ে আর জিজ্ঞেস করে। বলে —তোমার ভুখ আছে?

আবার কখনও পড়তে পড়তে কী একটা সন্দেহ হয়। বলে—আমার কাছে লজ্জা কোর না, আমি ডাক্তার, যা যা জিজ্ঞেস করি বলো তো…

অদ্ভুত জীবন। এত অদ্ভুত জীবনের পরিচয় সুধাময় তার ডাক্তারী বইতেও কখনও পড়েনি। কোথাকার সব বাছাই করা মেয়ে। কাউকে কিনে আনা, কাউকে চুরি করে আনা। গ্রামের সব মেয়ে। হয়ত জল তুলতে এসেছিল কুয়োর ধারে তারপর আর কেউ তার সন্ধান পায়নি। একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে অকারণে। তারপর এসে তাদের তুলে দিয়েছে দিলখুশা সিং-এর হাতে। তারপর যারা বেশি সুন্দরী, তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে রোগের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে শরীরে। যখন কাউকে জব্দ করতে হবে, কারুর জীবন বরবাদ করে দিতে হবে, তাকে উপহার দেওয়া হয় এক-রাত্রির জন্যে। তারপর রোগের বীজাণু শরীরের কোষে কোষে রক্তকনিকায় মিশে গিয়ে বিষাক্ত করে দেয় সমস্ত। তারপর যন্ত্রণা। কঠোর যন্ত্রণায় জীবনের অবসান হয় এক-রাত্রির বিভ্রমে।

সরবতী বাঈ বলে—আমাকে তুমি কেন সাদী করলে বাবুজী?

অনেক দিন আগের কথা!

একদিন রাত্রে হঠাৎ অন্দর-মহলের দরজা খুলে গেল। খবর গেল দিলখুশা সিং-এর কাছে। একদিন মোগল আমলে এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনে সশস্ত্র

পাহারা বসেছে। মহারাজা যুদ্ধে গেছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। খবর এসেছে পরাজয়ের। মোগল-সৈন্য দলে দলে ছুটে আসছে নাহারগড় লক্ষ্য করে। সড়কী, ঢাল, তলোয়ার, ঘোড়া, উট নিয়ে তৈরি হয়ে আছে এখানকার প্রহরীরা। ভেতরে অন্তঃপুরে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। খোজা-প্রহরীরা কান পেতে আছে। মোগল সৈন্য অন্তঃপুরে ঢোকবার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। আগুনের কুণ্ড তৈরি হয়ে একে-একে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে মাজী-সাহেব, বড়রাণী, মেজরাণী, ছোটরাণী, সখী পর্দায়েৎ, পাশোয়ানজী, দাসী, বাঁদী, কেউ আর বাকি নেই। এক-এক করে আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। মোগল-সৈন্য যেন দেহ স্পর্শ না-করতে পারে। সবাই জহর-ব্রত করবে! কিন্তু সেদিন আর এখন নেই!

তবু আজো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। দিলখুশা সিং নিজেই এসেছে মশাল নিয়ে।

বললে—মুখটা দেখি—?

মুখটা দেখে খোজা দিলখুশা সিংও অবাক হয়ে গেল। এত কম বয়েসের মেয়ে আর এত রূপ!

দিলখুশা সিং-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে লোক দুটো আবার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ইস্পাতের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে। তারপর মহলের পর মহল পেরিয়ে চললো দিলখুশা সিং আর ছোট একটি মেয়ে। শেষে এসে পৌঁছুল একটা ঘরে। দিলখুশা সিং-এর ঘর। ঘরের কোণ থেকে বেরোল একটা লাল কাপড়ে বাঁধা খাতা। খাতার পাতাগুলো খুলতে খুলতে বললে—নাম কি তোমার ছোক্‌রি?

ছোক্‌রি বললে—মোহর বাঈ—

নামটা লিখে নিলে দিলখুশা সিং। তার পর নিয়ে গেল বড়রাণীর কাছে। ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়ে বড়রাণী তখন আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। আফিং এর নেশাও করা ছিল। পাশে কয়েকজন সখী বাঁদী সেবা করছে। সামনে পানের বাটা।

দিলখুশা সিং-এর অবাধ গতি। ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে—চন্দ্রাবত্‌জী—

চন্দ্রাবত্‌জী চন্দ্রাবৎ বংশের মেয়ে। বললেন—কে?

দিলখুশা সিং সামনে গিয়ে মোহরকে এগিয়ে দিলে। বললে—সেলাম কর—

—কে এ?

—নতুন এসেছে আজ। নাম—মোহর বাঈ—

বড়রাণী ভালো করে চোখ তুলে চাইলেন। সখীরাও দেখলে, বাঁদীরাও দেখলে ভালো করে। দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো তারা। বললে—ওমা, একেবারে ঠাণ্ডি সরবতের মত চেহারা যে—

সব দেখে শুনে মোহর বাঈ আরো তাজ্জব হয়ে গেছে। এ-কোথায় এল সে। রাজার বাড়ি দেখাবে বলে তারা বাপকে একশো এক টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এল। বললে—মেয়ে তোমার সুখে থাকবে শেঠজী—খেয়ে পরে বাঁচবে, তারপর রাজা-সাহেবের নজরে যদি একবার পড়ে যায় তখন আর পায় কে! তারপর গরুর গাড়ি চড়ে এখানে এনে কোথায় পৌছিয়ে দিয়ে গেল তারা। এ যেন পরীদের দেশে এসে পড়েছে সে।

হঠাৎ বড়রাণীর গলার শব্দে তার যেন জ্ঞান ফিরে এল।

বড়রাণী বললেন—ঠাণ্ডি সরবতের মতন চেহারা—ওর নাম থাক সরবতি বাঈ—

সরবতি বাঈ অন্তঃপুরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এ-মহল থেকে সে-মহল। দোলের দিনে ফাগ মাখে, বিয়ে-সাদীতে মেঠাই খায়। দেওয়ালীতে নতুন জামা পরে। যাত্রা-ছায়াবাজী এলে দেখে। গান শোনে। অভিনয় দেখে। পূজো-পার্বণে যোগ দেয়। আর সবাইকার মতই একজন।

তারপর একদিন বয়েস হলো। দিলখুশা সিং বলে—সরবতিয়াজী, অত দুষ্টুমি করে না, এখন তোমার বয়েস হয়েছে—

বয়েস সত্যিই হলো একদিন। সেই বয়েস হওয়াই কাল হলো তার। পায়ে জরির জুতো উঠলো। বুকে কাঁচুলি উঠলো, মাথায় ওড়না উড়লো। চুলের বেণী ঝুললো, পায়ে মল, কানে ঝুমকো, গলায় হার—সব। এ-সব রাজবাড়ির নিয়ম। এ-নিয়ম চলে আসছে অনাদি কাল থেকে। এখন যারা পর্দায়েৎ হয়েছে—তারাও এককালে এমনি করে এসেছে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে এসেছে। তাদের কাছে পুরুষ একমাত্র রাজা-সাহেব। আর কোনও পুরুষ নেই। এ-জগতে একজন পুরুষ আর সব নারী। ওই পুরুষটির মনোরঞ্জনের জন্যেই এই অসংখ্য নারীর জীবন-যৌবন-মান-সম্ভ্রম সমস্ত কিছু।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্দৈব ঘটলো সরবতি বাঈ-এর জীবনে।

হোলির উৎসব হচ্ছে। চারিদিকে ঝাড়-লণ্ঠন, ফুল, পাতা, লাড্ডু, মেঠাই-এর ছড়াছড়ি। নতুন কাপড়, জামা, জুতো, ওড়না, ঘাগরার আমদানী হয়েছে। সবাই আসতে শুরু করেছে। দূরে দূরে খানদানী ঘরে নেমন্তন্ন গেছে। তাদের ঝি-ঝিউড়ি, বউ, বহিন সব এসেছে। কিন্তু সবাই সরবতি বাঈ-এর দিকে চেয়েই চমকে যায়—!

এত রূপ! এত রূপও হয়। যেন সকলকে হারিয়ে দেবে আজ। রাজা-সাহেবের সামনে আজ সবাইকে হার মানতে হবে। সকলের পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়না, সাজ-গোজা সব ব্যর্থ। এক সরবতি বাঈ আজ সকলকে কাণা করে দেবে।

সবাই বলে—ও কে বহিন?

—ও সরবতি বাঈ—

সর্বনাশ! রাজা-সাহেবের চোখে পড়তে দেওয়া উচিত হবে না এমন রূপকে। এমন রূপসীকে আড়ালে না সরালে আজ সকলকে কানা করে দেবে! দিলখুশা সিংকে চুপি চুপি ডেকে পাঠালেন বড়রাণী চন্দ্রাবতজী! তারপর কি কথা হলো কেউ জানে না। কেউ শোনেনি সে-কথা। শুধু যখন উৎসব হলো তখন সরবতি বাঈকে কেউ আর দেখতে পেলে না সেদিন। সরবতি বাঈ তখন তালকাটোরার বন্দীশালার অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। উৎসবে সরবতি বাঈ-এর অধিকার নেই বটে। কিন্তু অধিকার আছে অন্য কাজে। আরো গুরুতর কাজ! রাজ্যের ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কাজে তাকে ব্যবহার করা হবে। এমন রাখতে হয়। যখন রাজার শত্রুতা করছে কেউ, ষড়যন্ত্র করছে রাজ্যের বিরুদ্ধে, তাকে খাতির আপ্যায়ন করে এনে বসিয়ে আরক খাইয়ে অসাড় করে ওই সব রূপসী নারীদের এগিয়ে দেওয়া হয়। এই-ই তাদের কাজ। জীবন বরবাদ করে দেওয়া হয় শত্রুদের। তাদের ধ্বংস করা হয় এইভাবেই।

শুধু কি সরবতি বাঈ! ও-মহলে ওই কাজের জন্যে আছে মতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈ। বেশিদিন বাঁচে না তারা। তবু জীইয়ে রাখতে হয়। খেতে পরতে দিতে হয়। ভালো-ভালো সাজ-পোশাক দিতে হয়। তারপর অনেক রাত্রে একদিন দিলখুশা সিং মশাল নিয়ে এসে দরজার চাবি খোলে আর আধা-অন্ধকার ঘরে টুপ করে ঢুকে পড়ে একটা বিকলাঙ্গ মূর্তি! এসে জড়িয়ে ধরে সাপের মত। তারপর রাত্রির রোমাঞ্চ কাটতে পাঁচ কি সাত দণ্ড লাগে মাত্র। দিলখুশা সিং আবার তাকে বার করে নিয়ে যায়। তারপর আবার। তারপর দিনও আবার। ভালো করে রক্তের অণু-পরামাণুতে মিশে যাক বীজাণু। ভালো করে অস্থি-মাংস-মজ্জায় শেকড় গাড়ুক। কোথাও কোনও ফাঁক না থাকে!

মতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈ সকলেরই জীবনে এমনি ঘটেছে। সরবতি বাঈ-এর জীবনেও ঘটলো।

বড়গাজীর শেঠ খানদানা লোক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অনেক মতলব।

রতনগড়ের নবাবের কাছে গিয়ে নাহারগড়ের রাজা-সাহেবের কুৎসা করে। জমিদারীর প্রজাদের ওপর হামলা করে। গরু-ঘোড়া-উটের পাল চুরি করে নিয়ে যায়। এর মূলে ছিল বড়গাজীর শেঠ। তাকেই জব্দ করতে হবে। রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করে আপীল-আদালত যা-কিছু সে তো হবেই, কিন্তু শেঠজীকে জব্দ করা দরকার। একদিন ডেকে আনা হলো খাতির করে। খাওয়ানো হলো পেঠ ভরে। আরক এল। বাঈজী এল। আর রাত্রি গভীর হলে এল গোলাপী বাঈ। গোলাপী বাঈ-এর সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটালো শেঠজী! আর শেঠজীর অস্থি-মাংস-মজ্জায় গোলাপী বাঈ-এর সমস্ত কামনা প্রতিশোধ হয়ে প্রতিহিংসা হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। তারপর চার কি পাঁচ বছর! রাজা-সাহেবের সব শত্রু নিপাত হয়েছে এমনি করে।

সরবতি বাঈ শুধু কাতর চোখে চায় আর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—আমাকে তুমি সাদী করলে কেন বাবুজী, আমরা সাদীর জন্যে নয় যে—

এবার কিন্তু অন্য ঘটনা। রাজা-সাহেবও জানে না। এ দিলখুশা সিং বড়রাণী আর লালজী সাহেবের কাণ্ড! তিন হাজারী থেকে পঞ্চাশ হাজারী জায়গীর পেয়ে গেল বাঙ্গালী ডাক্তার চালাকী করে। রাজা-সাহেব ডাক্তার-সাহেবের কথায় ওঠেন। তাকে জব্দ করতে হবে। রোজ দাবা খেলতে বসে তয়খানায়। যখন জলের জন্যে রাজা-সাহেব হাততালি দেবেন জল নিয়ে যাবে সরবতি বাঈ!

সকাল থেকে দিলখুশা সিং অনেক পোশাক-আশাক দিয়ে গেছে! কুম্‌কুম্‌, বাসতেল, ফুল, পৈছাঁ-কঙ্কন, কপালের টিপ। ভালো করে সাজো, ভালো করে ঘষে মেজে মোহিনী মূর্তি ধরো, খেলার মোহ ভাঙাও—। আপত্তি করলে চলবে না, রাজ্যের ভালো মন্দের জন্যে সব স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। কাঁদলে চলবে না!

তারপর মোহিনী মূর্তিতে সাজিয়ে তয়খানার পাশের ঘরে রেখে এল সরবতি বাঈকে।

দিলখুশা সিং বললে—রাজা-সাহেব তিনবার হাততালি দিলেই বুঝবি জল চাইছেন, দুবার হাততালি দিলে আরক, আর একবার দিলে বুঝবি তামাক—

রাজা-সাহেব হাততালি দিলেন তিনবার।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—পরে আর একবার গিয়েছিলাম মশাই নাহারগড়ে। সেবারও ওই রসগোল্লার বায়না, সরবতি বাঈ-এর বিয়ের সময় রসগোল্লা খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল, আবার তাই হুকুম হয়েছে। তা গেলাম! তখন দলজিৎ সিং মারা গেছে, খোজা দিলখুশা সিং আর বড়রাণী চন্দ্রাবতজীর রাজত্ব। বড় কুমার-

সাহেব গদীতে বসেছে। ডাক্তারের আর সে-খাতির নেই। ডাক্তার তখন এক কাণ্ড করে বসেছে।

সদানন্দবাবু বলেন—ভীষণ কাণ্ড। সারা-জীবনেও মশাই এমন কাণ্ড কেউ শোনেনি।

জিজ্ঞেস করলাম—আর বনলতা?

—কে বনলতা? সদানন্দবাবু চিনতে পারলেন না।

বললেন—দেখলাম বটে একজন মহিলাকে—

—কী রকম চেহারা?

চেহারা বনলতা রায়ের এমন কিছু ভালো নয়। পাচ-পাচি একরকম। লোকে বলতো—মুখের গড়নে কী যেন একটা আছে। ওই জন্যেই একদিন সুধাময় বোধ হয়, একটা রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারেনি। তার মূল্যও সেদিন দিয়েছে সে! সারা জীবন ধরে সে-মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। আর সে-মূল্য কি কম মর্মান্তিক।

সরবতী বাঈ যেদিন মারা গেল সেদিন সুধাময় নদীর ধার থেকে সোজা নিজের ঘরে এসে বসলো। সেই যে ঘরে ঢুকলো জীবনে সে-ঘর থেকে বেরোয়নি আর। কখন সকাল হয়েছে, কখন সন্ধ্যে হয়েছে, কখন রাত হয়েছে, কখন সারা নাহারগড় ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে খবর রাখতো না। কেউ কেউ দেখেছে। রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখা গেছে, ডাক্তার ঘরের ভেতর বসে-বসে কী সব লিখছে। পাতার পর পাতা। লোকের রোগ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে এসেছে রোগের ওষুধ নিতে।

জিজ্ঞেস করেছে—ডাগ্‌দার সাব্‌ হ্যায়?

চাকর এসে বলেছে—না, সাহেব ডাক্তারী করে না আর—

অনেক রাত্রে বই পড়তে পড়তে পাতার ওপর চোখ দুটোকে স্থির করে দেয়। যেন ধ্যানে বসেছে সুধাময়। সরবতী বাঈ মারা গেছে যন্ত্রণায়। ডাক্তারের ওষুধ তাকে বাঁচাতে পারেনি। ডাক্তারী বিদ্যে কোনও কাজে লাগেনি। পৃথিবীর কোনও ওষুধ তাকে সারাতে পারেনি। এক-একদিন সরবতী বাঈ-এর পাশে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শুধু দেখেছে তাকে। জিজ্ঞেস করেছে—আজ কেমন আছো?

সরবতী বাঈ শুধু চোখ দিয়ে কথা বলেছে। কথা বলবার শক্তি ছিল না শেষ পর্যন্ত। যেন বলতে চেয়েছে—আমাকে কেন সাদী করলে বাবুজী!

সুধাময় বললে—আর একটা ইনজেকশন্ দিচ্ছি—এটা নিয়ে কেমন থাক দেখি—

একটার পর একটা ওষুধ এনেছে কলকাতা থেকে, বোম্বাই থেকে আর খাইয়েছে সরবতী বাঈকে! বই-এর পর বই কিনেছে আর পড়েছে। এ-বুঝি মরুভূমির জগতে এক আজব রোগ। এ রোগের কথা কেউ লেখেনি আগে। সরবতি বাই-এর সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করলো। তারপর কথা বন্ধ হলো, তারপর চোখ অন্ধ হলো। সে-যন্ত্রণা আর চোখ দিয়ে দেখা যায় না। তবু সরবতী বাঈ-এর সারা দেহখানা নিজের দুহাতে তুলে ধরে তাকে ধুইয়ে দিতে হয়। সমস্ত গায়ে দুর্গন্ধ। এত যে সুন্দরী, এরই সৌন্দর্য দেখে একদিন সুধাময় অবাক হয়ে গিয়েছিল, এখন আর সে-কথা ভাবা যায় না। কয়েক মাস বেশ ভালো ছিল, আবার রোগ হলো, আবার ভালো হলো, তারপর আবার সেই।

সমস্ত বাড়িটা সেদিন যেন থম্ থম্ করছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। পশ্চিম দিকের খেজুর গাছের পাতায় শুধু শুকনো বাতাসের খস্ খস্ শব্দ আসছে একটু। একটা পাখি নিঃশব্দে উড়ে যেতে যেতে বুঝি হঠাৎ ডানা ঝাপটিয়ে দিক পরিবর্তন করলো। সরবতী বাঈ যে-ঘরটায় শুয়ে থাকতো সেটা আজ ফাঁকা। তবু সেইদিকে চেয়ে সুধাময়ের মনে হলো, কেউ যেন কাঁদছে। সরবতী বাঈ-এর কান্নার শব্দ। ঠিক সেই রকম গলা। বলছে কেন আমাকে সাদী করলে বাবুজী! অস্ফুট স্বর যেন আস্তে আস্তে আবার অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। সমস্ত নাহারগড় যেন স্থির হয়ে আছে। নতুন রেসিডেণ্ট্ এসেছে লেকের ধারে বাঙ্গলোতে। নতুন সাহেব। রাজপ্রাসাদ থেকে নতুন করে দামী ভেট্ গেছে সাহেবের কাছে। রাজা-সাহেবও নতুন, রেসিডেণ্টও নতুন। তবু বড়রাণী আছে, খোজা দিলখুশা সিং আছে। রাজ-প্রাসাদের সমস্ত চক্রান্ত সাহেবের চোখ থেকে আড়ালে রাখতে হবে। সরবতী বাঈ গেছে, মোতিয়া বাই, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈও হয়ত গেছে। তাদের জায়গায় আবার হয়ত এসেছে অন্য কোনও বাঈ। সরবতী বাঈ-এর ঘরে অন্য কোনও মেয়ে এসে আবার হয়ত বন্দী হয়েছে। আবার যদি রাজা-সাহেবকে কেউ হাত করে ফেলে আবার সরবতী বাঈ সেজে সোনার ঘড়ায় জল নিয়ে হাজির হবে তয়খানাতে! তা হলে মুক্তি কোথায়! সরবতি বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈদের মুক্তি কোথায়?

ডাক্তারি বই পড়তে পড়তে হঠাৎ সুধাময় উঠলো। ক'দিন ধরে দাড়ি কামানো হয়নি। টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে ঘরে, সমস্ত মুখটা বিভৎস হয়ে উঠলো আয়নার

ছবিতে। হঠাৎ যেন সরবতি বাঈ অলক্ষ্যে কথা বলে উঠলো—আমাকে তুমি কেন সাদী করলে বাবুজী ?

এই কেন'র উত্তর দেওয়া হলো না সুধাময়ের। সরবতি বাঈ-এর সমস্ত শরীর পঙ্গু হয়ে গেছে তখন। কথা বলতে পারে না। লোক চিনতে পারে না। চোখ মুখ নাক কান সব বিকল হয়ে গেছে। সেই রূপ কোথায় গেল ? কোথায় গেল সরবতি বাঈ! অন্ধকার রাতগুলোতে সরবতি বাঈ-এর বিকৃত রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুধু দেয়ালের অয়েল-পেন্টিংখানা নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে।

সেদিন সকাল বেলাই ডাক্তার মাধোলালকে ডেকেছে।

বললে—আজ থেকে যে আসবে, বলবি আমার সঙ্গে দেখা হবে না—

মাধোলাল বললে—যদি রাজা-সাহেব এত্তেলা দেয় ?

সুধাময় বললে—তবু না—

—যদি রাণীসাহেবা এত্তেলা পাঠায় ?

—তবু না—

—যদি…

কেউ না, কেউ নেই সুধাময়ের। সরবতি বাঈ ছাড়া ইহলোকে পরলোকে কেউ তার নেই।

তেত্রিশ মাইল রাস্তা গরুর গাড়ি ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলেছে। রাত থাকতে বেরিয়েছি। বাবলা কাঁটার ঝোপ-ঝাপ পেরিয়ে মেটে রাস্তা ধরে চলা। ছায়া-ছায়া দিন। ভারত মহাসাগরের ধারে ধারে নুনে জমাট বাঁধা খাল-বিল। রোদ লেগে চিক্ চিক্ করছে। পাণ্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ গল্প বলে চলেছে শুধু।

এ-ও আজ থেকে কতদিন আগের কথা। সব স্পষ্ট মনে নেই।

আজ তোমার চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে আবার সব মনে করবার চেষ্টা করছি সুচেতা। আজমীরের সদানন্দবাবুর কাছে সুধাময় ডাক্তারের সবটা শোনা হয়নি। সদানন্দবাবু সবটা জানতেনও না। রসগোল্লার বায়না পেয়ে নাহারগড়ে গিয়ে ডাক্তারকে যেমন-যেমন দেখেছিলেন তেমনি বলেছিলেন আমাকে। প্রথমটা শুনি টুকু মাসিমার কাছে কলকাতায়। তারপর আজমীরে। বার বার ভাগে ভাগে গল্প শুনে একটা আধা-সম্পূর্ণ কাহিনী পেয়েছিলাম। আর আজ শুনছি শেষটা। বনলতা রায় কেমন করে বনলতা মিত্র হলো, সেই গল্প।

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—পয়সা তো ডাক্তার-মা নেয় না—ডাক্তার-মা'র হাসপাতালে কারো পয়সা লাগে না—

অথচ পয়সার একদিন কী অভাবই ছিল বনলতার।

সরলাদি বলেছিল—সব কেনা-কাটা হলো বনলতাদি?

বনলতা বললে—আর পয়সা নেই ভাই—

সরলাদি বলেছিল—গিয়ে চিঠি দিও কিন্তু—

কিন্তু, সরলাদি চলে যেতেই মনে পড়ে গেল। সুধাময়ের জন্যে কাপড় কিনেছে। ভাইফোঁটার আগের দিন পৌঁছবে নাহারগড়ে। ট্রেনভাড়া বাদ দিয়ে হাতে আর কিছু নেই। হঠাৎ মনে পড়লো একটা কথা। আবার দোকানে যেতে হলো। বললে—সিঁদুর দিন তো এক প্যাকেট—ভালো সিঁদুর—

দোকানী একবার বনলতার সিঁথির দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর প্যাকেটটা দিয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। দাম নিতে গিয়ে বনলতার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখলে কিছুক্ষণ! বনলতা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে। তার মুখ চোখও কি সিঁদুরের মত লাল হয়ে গেছে! জানতে পেরেছে নাকি সবাই!

মুখের কথার প্রতীক্ষায় নির্ভর করে আর বনলতার দেরি করা চলে না তখন। তখন ছাব্বিশ ছত্রিশে গিয়ে পৌঁছেছে। রাত্রে ডিউটি করতে গিয়ে ঘুম এসে পড়ে। সারাদিন ঘুমে ঢোলে চোখ। আর শুধু কি চোখ! মনেও বুঝি ক্লান্তি নেমেছে। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সমস্ত দেহ। তবু কোথায় যেন বিরাট অসম্পূর্ণতা। নিঃসহায়, নিরবলম্ব অপার শূন্যতা। বনলতা ট্রেনে উঠে বার বার ভাবতে চেষ্টা করলে—কোনও অন্যায় সে করতে যাচ্ছে না। তার বয়েস ছত্রিশ আর সুধাময়ের তেত্রিশ। আজকের এই তেত্রিশ মাইল পথের মতই দীর্ঘ। ছায়া আছে কিন্তু প্রখর রোদের তেজে কি কখনও ছায়ার আশ্রয় খোঁজেনি সুধাময়! কখনও ছায়া নিবিড় আশ্রয়ের সন্ধানে আকুল হয়নি! তবে কেন সে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে। বনলতার একটা চিঠিরও জবাব সে দেয় না কেন?

মাধোলাল প্রথমে বাঙ্গালী মেয়ে দেখে আপত্তি করেছিল—। বলেছিল—দেখা হবে না—

বনলতা বলেছিল—দেখা হবে না কেন?

—ডাগদারবাবুর হুকুম—

বনলতা বলেছিল—তুমি বলো, আমি দেখা করবোই, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—কলকাতা থেকে—

মাধোলাল বলেছিল—ডাগদার সাহেব কারো সঙ্গে দেখা করেন না হুজুর,—শুধু ওষুধ খান—আর লেখেন—

—কী লেখেন ?

মাধোলাল বলেছিল—লিখে লিখে খাতা ভর্তি করেন, খাতায় বোঝাই হয়ে গেছে ঘর—

ঈশ্বরীপ্রসাদের সঙ্গে ডাক্তার-মা'র হাসপাতালে যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন বনলতা মিত্র আমাকে দেখিয়েছিলেন সে সব খাতা। বনলতা মিত্রকেও সেদিন বহু বছর পরে প্রথম দেখেছিলাম। সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। থান কাপড়, সাদা সেমিজ। হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের ওপর তাঁর নজর। রোগীরা সবাই বনলতাকে ডাক্তার-মা বলে ডাকে। দূরে সমুদ্রের জল চিক্ চিক্ করছে। বনলতার বসবার ঘর থেকে বাইরের সে-দৃশ্যটার সঙ্গে ডাক্তার-মা'র চেহারারও কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। যেন তেমনি বিরাট, তেমনি প্রশান্ত, তেমনি প্রশস্ত।

বনলতা দেবী বললেন—ডাক্তার মিত্র ওই সব খাতায় নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন প্রথম দিনটি থেকে, সমস্ত খুঁটি-নাটি, অনেক খাতা কপি করিয়ে পাঠিয়েছি জার্মানীতে, তা থেকে নতুন তথ্য আবিষ্কার হবে বলে তাঁরা চিঠি লিখেছেন—এই দেখুন সে-চিঠি—

আমাদের জলখাবার এল। দেখলাম, বনলতার জীবনে যেন এতদিনে স্থৈর্য এসেছে। যেন এতদিন এই সত্য-সাধনা, এই পরিপূর্ণতার দিকেই তিনি একাগ্রচিত্তে এক লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। প্রথম যৌবনের সেই প্রমত্ততার কোনও লক্ষণ আর নেই সেখানে। যেদিন প্রথম নাহারগড়ে এসেছিলেন সেদিনও চিত্ত তাঁর স্থির ছিল না।

সুধাময় বলেছিল—কেন তুমি এলে বনলতা ?

বনলতা বলেছিল—আমি যে বড় দেরি করে ফেলেছি—আর অপেক্ষা করতে পারছি না—কবে তুমি আমাকে আসতে বলবে তার প্রতীক্ষা যে আমার অসহ্য হয়ে উঠলো—

—কিন্তু আমি যে···

বনলতা বলেছিল—আমি তোমার কোনও কথা শুনবো না, আমি কলকাতা থেকে একেবারে সিঁদুর কিনে এনেছি—

বলে সুধাময় আপত্তি করবার আগেই তার হাতটা চেপে ধরলে বনলতা।

সুধাময় একবার বলতে গেল—আমাকে ছুঁয়োনা বনলতা—

কিন্তু তার আগেই বনলতা সুধাময়ের হাত দিয়ে তার নিজের সাদা সিঁথিতে

জোর করে সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর সুধাময়ের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে বলেছে—তোমাকে দিয়ে জোর করে নিজের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে নেওয়াতেও আর আমার লজ্জা নেই—লজ্জা করবার সময়ও নেই—

সুধাময়ের হাতের আঙুল তখন একটু একটু করে খসতে শুরু করেছে। সারা গায়ে ঘা বেরিয়ে পুঁজ বেরোচ্ছে। তখন চোখেও আর ভালো দেখতে পায় না। দুদিন বাদে হয়ত কানেও আর শুনতে পাবে না। তবু সুধাময়ের চোখের কোণে যেন একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। বললে—তুমি এত দেরি করে কেন এলে বনলতা ?

বনলতা সুধাময়ের হাত দুটো ধরে বললে—তা হোক, আরো দেরি করিনি—সেই আমার ভাগ্যি—

সুধাময় বললে—কিন্তু ওই তুচ্ছ সিঁদুরটুকু ছাড়া যে আর কোনও সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার থাকবে না—

—কে বললে থাকবে না ?

সুধাময় বললে—সত্যি'ই থাকবে না, থাকলে আমার সমস্ত তপস্যা মিথ্যে হয়ে যাবে যে—সরবতি বাঈ যেমন করে যত কষ্ট পেয়ে মরেছে, সেই সমস্ত কষ্টটুকু আমি নিজে পেয়ে মরতে চাই—আর আমার এই লেখাগুলো যদি পারো, বিলেতে কিম্বা জার্মানীতে কোথাও পাঠিয়ে দিও, তারা হয়ত সরবতি বাঈদের আবার বাঁচাতে পারবে—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তারপর সেই পঞ্চাশ হাজারী জায়গীর বেচে দিয়ে ডাক্তার-মা এইখানে এসে হাসপাতাল করলেন—যত পারা-রোগী আসে সবাইকে নিজে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করেছেন বিনা-খরচে। ডাক্তার আছে—নিজের তো ও বিদ্যে জানাই ছিল—যেমন করে ডাক্তার সুধাময়কে সেবা করেছেন তাঁর মরার শেষ দিনটি পর্যন্ত, তেমনি করেই এখানকার রোগীদের সেবা করেন, বাঙলা দেশের কথা ভুলেই গেছেন, এইটেই দেশ হয়ে গেছে এখন ডাক্তার-মার—

ঈশ্বরীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু সরবতি বাঈ-এর রোগ ডাক্তারের হলো কী করে ?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছিল—ডাক্তার যে ইচ্ছে করে ইনজেকশন নিয়েছিল নিজের শরীরে—

—কিসের ইনজেকশন ?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—ওই পারা-রোগের !

জানি না, তোমাকে আজ যে চিঠি লিখছি এতে তোমার জীবনের পরিণতির কিছু আভাষ পাবে কিনা। কিন্তু একটা কথা আমি নিজেই বুঝতে পারি না আজো। আজো এতদিন পরে মনে আছে সেদিনকার সেই ওথাপোর্ট থেকে বাবলাকাঁটার মেটে রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িতে চড়ে চলতে চলতে আর ঈশ্বরীপ্রসাদের গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনকেও আমি এই প্রশ্নই করেছিলাম।

সুধাময় কেন নিজের শরীরে সরবতি বাঈ-এর রোগের ইনজেকশন নিয়েছিল?

সে কি পৃথিবী থেকে সিফিলিস দূর করবার সাধনায়, না সরবতি বাঈ-এর সমস্ত যন্ত্রণা নিজের শরীরে তুলে নিয়ে সুস্থ সুন্দর সরবতি বাঈকেই পাবার জন্যে! যাকগে, আমার এ-গল্প যে কাকে নিয়ে তাও আমি ঠিক বলতে পারবো না আজ। কে এর নায়িকা? সরবতি বাঈ না বনলতা দেবী! সাধারণ পাঠক যা খুশী ভাবুক—তোমারও কি সে সম্বন্ধে কোনও সংশয় আছে?

এ-গল্প এখানে শেষ হয়ে গেলেই ভালো হোত হয়ত। কিন্তু সে-গল্প আমার-গল্প হতো না। তাই যখন চলে আসছি বনলতা দেবী বললেন—আর একটা জিনিস দেখাতে বাকি আছে আপনাদের—দেখবেন আসুন—

আমাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন বনলতা দেবী। ঈশ্বরীপ্রসাদ তখন সমুদ্রের ধারে হাত-মুখ ধুতে গেছে। এ-ঘরটা আরো প্রশস্ত। আরো সাজানো। নানা জিনিস সযত্নে সাজানো।

বনলতা দেবী বললেন—এই দেখুন, এখানে ডাক্তার মিত্রের সব জিনিষপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যে-জুতো ব্যবহার করতেন, যে-কাপড়, যে-জামা ব্যবহার করতেন—সমস্ত! তাঁর যাবতীয় জিনিস। তাঁর চিরুণী, তাঁর চশমা, তাঁর বাঁধানো দাঁতটি পর্যন্ত—

—আর ওই দেখুন—ডাক্তার মিত্রের ছবি!

চেয়ে দেখলাম দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা অয়েল পেন্টিং। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো। একপাশে ডাক্তার সুধাময়, মাথায় পাগড়ি পরা। বরের পোশাক। আর তার পাশেই সরবতি বাঈ-এর ছবি। জাফরানি ওড়না, গোলাপী ঘাগরা। রাজপুতদের বধূ বেশ। যে ছবিখানার কথা শুনেছি সদানন্দবাবুর কাছে। নাহারগড়ের রাজা-সাহেব যে-ছবি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের বিয়ের দিন।

আমি সেই দিকে চেয়ে দেখছিলাম এক মনে।

বনলতা দেবী বললেন—আমাকে চিনতে পারছেন?

কেমন অবাক হয়ে গেলাম।

বনলতা বললেন—ডাক্তার মিত্রের পাশে—ও তো আমিই—

বললাম—আপনাকে তো চেনা যায় না ?

বনলতা বললেন—তখন তো বয়েস কম ছিল, সে বয়েসে আমায় দেখতেও খুব ভালো ছিল, অনেক ফর্সা ছিলাম, রাজা-সাহেবের ভারি সখ আমি রাজপুত মেয়েদের পোষাক পরে ছবি তুলি, রাজা-সাহেবই দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন কি না—

একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করি—সরবতি বাঈকে আপনি চেনেন ?

কিন্তু আমার মুখ-চোখের ভাব দেখে বোধ হয় তাঁর সন্দেহ হলো। বললেন—আর তাছাড়া দু'জনেরই বয়েস তখন কম ছিল যে—

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলেন।

কিন্তু এক মুহূর্তেই নিজেকে আবার সামলে নিলেন।

বললাম—কত ?

বনলতা দেবী বললেন—ওঁর তখন সবে ছাব্বিশ আর আমার তেইশ—

মেনন সাহেব

মেনন সাহেবকে মনে পড়লে প্রথমেই মনে পড়ে যায় তাঁর হাসিটা। সদাহাস্য মুখ। যার দিকেই তিনি চান না কেন, মনে হবে তাকে হাসি দিয়েই অভ্যর্থনা করছেন যেন! সে হাসির মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা নেই। সে এক নির্বিচার নিরপেক্ষ হাসি। সে হাসি প্রসন্নতা সৃষ্টি করে, পরিতৃপ্তি দেয়, পরিশুদ্ধ করে।

কিন্তু সেই মেনন সাহেবকেই আবার একদিন কাঁদতে দেখলাম। একেবারে হাউ হাউ করে কান্না। সেই জামনগরের চীফ্ ইনজিনিয়র মেনন সাহেবকে কাঁদতে দেখে আমি সেদিন সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর তার পরদিনই জামনগর ছেড়ে চলে আসি। তারপর আর কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

প্রথম যেদিন আলাপ হলো, বললেন—আই হ্যাভ বীন টু ক্যালকাটা, আমি কলকাতায় গিয়েছি একবার—খুব বড় বড় হোটেল আছে—না ?

জামনগরে অফিসার্স ক্লাবে তাঁর আর আমার একই টেবিলে জায়গা হয়েছিল।

বললাম—এবার আর একবার চলুন, আপনাকে বড় বড় বস্তিও দেখিয়ে দেব—

হো হো করে হেসে উঠলেন মেনন সাহেব। হাসতে হাসতে একবার এর সঙ্গে গল্প করছেন, একবার ওর সঙ্গে। সকলেই তাঁর প্রিয়, তিনিও সকলের প্রিয়। পনের দিন মাত্র ছিলাম ওখানে। স্টেটের অতিথি আমি, গেস্ট হাউসের কায়দা-কানুন আদব-কায়দা সবই মেনে চলতে হতো! অনেক বড় বড় কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলাপ হলো। সকলের মুখেই ওই এক কথা—মেনন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার?

যাহোক, সেই মেনন সাহেবের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একদিন আলাপও হলো, বন্ধুত্বও হলো, ঘনিষ্ঠতাও হলো; কিন্তু ঠিক চলে আসবার আগের দিন মেনন সাহেবের এক অদ্ভুত পরিচয় পেয়ে গেলাম হঠাৎ। মেনন সাহেব আমার সামনে হাউ হাউ করে দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন।

সেই ঘটনাটি বলি।

জামনগরের দ্রষ্টব্য জিনিস যা কিছু সব তখন দেখা হয়ে গেছে। ছোট্ট শহর, বিকেল বেলা লেক-এর ধারে গিয়ে চক্কর দিয়ে আসি। তারপরেই শহরের রাস্তায় সুভাষ মার্কেটের দিকে টাঙ্গা, ট্যাক্সি, লাউডস্পীকার, আলো, লোকজন—সব মিলে সে এক হট্টগোলের ব্যাপার। তখন ক্লাবে গিয়ে বসি। চা, কিম্বা ঠাণ্ডা সরবৎ কিম্বা কফি চুমুক দিতে দিতে পরস্পরের সঙ্গে গল্প করা, কিম্বা টেনিস খেলা। এমনি করেই কেটেছে পনের দিন।

শেষের দিন ত্রিবেদীজী এসে বললেন—আপনাকে একটা উপকার করতে হবে আমার—

বললাম—কীসের উপকার?

ত্রিবেদীজীর সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। তাকে দেখিয়ে ত্রিবেদীজী বললেন—এই ছেলেটি মেনন সাহেবের অফিসে চাকরি করে, এর মায়ের ভারি অসুখ, টেলিগ্রাফ এসেছে—এ ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিল; কিন্তু মেনন সাহেব কিছুতেই রাজি নয় ছুটি দিতে—

বললাম—কেন?

ত্রিবেদীজী বললেন—মেনন সাহেব বলেছেন এখন বাজেট তৈরির সময়, এখন কেউ ছুটি পাবে না—

ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখলাম। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েস। ভারি ম্রিয়মান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ত্রিবেদীজী বললেন—আপনার সঙ্গে মেনন সাহেবের বন্ধুত্ব আছে, আপনি বললে আর না বলতে পারবেন না—

জানলাম ছেলেটি মেনন সাহেবের অফিসে ড্রাফ্ট্‌সম্যানের চাকরি করে। সামান্ত মাইনে পায়। মা দেশে থাকে। সেখানে তাদের জমি-জমা আছে সামান্য। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে মা ছেলের কাছে আসতে রাজি নয়। বয়েস হয়েছে মায়ের। তাঁকে দেখা শোনা করবার কেউ নেই। এ-সময়ে যদি মা'র কাছে না যেতে পারে তো আপশোষের সীমা থাকবে না তার।

ত্রিবেদীজী চলে গেলেন। বললাম—আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

জানতাম মেনন সাহেব নিয়ম করে ঠিক আটটার সময়ে ক্লাবে আসেন। আর কাঁটায় কাঁটায় রাত ন'টার সময় চলে যান। ক্লাবে এসেই হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা বলেন। এর সঙ্গে খানিকক্ষণ, ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ। জামনগর স্টেটের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। বয়েস হয়েছে, তবু ছাড়তে চায় না স্টেট। মেনন সাহেব একদিন নাকি খুব গরীব ছিলেন। নিজের উপার্জনে বুড়ো বাপ, তিন ভাই, তিন বোনের ভরণ পোষণ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েছিল। বোনদের বিয়ে দিয়েছেন, ভগ্নীপতিদের প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। ভাইদের সব বড় বড় চাকরি করে দিয়েছেন। বড় আমুদে লোক। শুধু আমুদে লোকই নয়, পরোপকারী লোকও বটে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন গরীব ছাত্র বাড়িতে থেকে লেখা-পড়া করে, তাদের ভবিষ্যতের ভার তিনি নিয়েছেন। দান ধ্যানও প্রচুর। জামনগরের সব লোক তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ত্রিবেদীজী বলেছিলেন—সেদিন দেখলাম আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করছেন—আপনার কথা এড়াতে পারবেন না মেনন সাহেব—

সত্যিই মেনন সাহেব আমার সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করতেন। যে ক-দিন দেখা হয়েছিল, সে কদিনই আমার সঙ্গে গল্প করে কাটাতেন। কফি আসতো দুজনের জন্যে, ক্লাবের বাগানের এক কোণে বসে তিনি নানা রকম গল্প করে যেতেন আর মাঝে মাঝে কফির কাপে চুমুক দিতেন আর চুরুট টানতেন।

ত্রিবেদীজী বলতেন—মেননজী কলকাতায় বম্বেতে বড় বড় চাকরি পেয়েছেন, কোথাও যাননি—এই জামনগরেই পড়ে আছেন—

বললাম—কেন?

ত্রিবেদীজী বললেন—এখন তো বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু যখন ওঁর বয়েস কম ছিল

তখনও কোথাও যাননি, এই জামনগরেই কনট্রাক্টরি কাজ নিয়েছেন, এখানেই ওঁর জীবন কাটিয়ে দিলেন, শেষে অনেক ধরাধরির পর এই চাকরি নিয়েছেন—

একদিন বলেছিলাম—মেননজী, আপনি কলকাতায় চলুন না আবার—

মেননজী যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললেন—না কলকাতায় আর যাবো না!

—কেন?

মেননজী বললেন—কলকাতায় যেতে ভালো লাগে না, কোথাও যেতেই আর ভালো লাগে না, নিজের দেশ ছেড়ে সেই যে এখানে এসেছি, এখানেই রয়ে গেছি—

জিজ্ঞেস করলাম—কখনও বাইরে যেতে ইচ্ছে করেনি?

বললেন—বাইরে?

—এই ধরুন বম্বে কি আহ্‌মেদাবাদ, কি দিল্লী, কিম্বা আপনার নিজের দেশ মাইসোর?

মেনন সাহেব বললেন—না—

বললাম—বিয়ে থা'ও করলেন না, সারাজীবন এত টাকা উপায় করলেন—কার জন্যে করলেন, কে এসব দেখবে; হয়ত আপনার হাতে গড়া সব জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে একদিন! অন্য লোকে কি এর মূল্য বুঝবে, এর মর্যাদা রাখবে তেমন করে?

মেনন সাহেব বল্‌তেন—কী জানি কেন বাড়ি করতে গেলাম, কেন এত সম্পত্তি, করতে গেলাম! সত্যিই সম্পত্তি করবো বলে করিনি, এত বড় বাড়ি করবার ইচ্ছেও ছিল না। কনট্রাক্টারি করতাম, একটার পর একটা কাজ আসতো আর নিতাম কাজ, কখন টাকার পাহাড় জমে গেছে ঠিক টের পাইনি। সত্যিই বিশ্বাস করুন, টাকা যখন উপায় করেছি হিসেব করিনি।—কত টাকা জমলো বা কত টাকা খরচ হলো একদিন পাশ বইটা খুলে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—এত টাকা, এত টাকা জমে গেছে! আমার বিশ্বাসই হলো না।

বললাম—কিন্তু বিয়ে করলেন না কী জন্যে?

মেনন সাহেব হেসে ফেললেন।—বিয়ে করার সময় পেলাম কই?

বললাম—বিয়ে করতে আবার সময় লাগে নাকি?

মেনন সাহেব হেসে বললেন—গল্প লিখবেন বুঝি আমাকে নিয়ে?

বললাম—লিখলে আপনার কি আপত্তি আছে?

মেনন সাহেব বললেন—আপত্তি নেই, তবে পুরো মানুষটাকে না জেনে লিখবেন কী করে? আমাকে কি পুরো জেনেছেন? আমাকে কি পুরোপুরি দেখেছেন?

বললাম—পুরোপুরি জানালেই জানতে পারি।

মেনন সাহেব বললেন—আমার অত্যন্ত সাধারণ জীবন, যেমন আর আর সকলের—এতে নতুনত্ব কিছু নেই, একদিন বুড়ো বাবা মারা গেল, আমি ভাইবোনদের নিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে পড়লাম এই জামনগরে—তারপরে ভাগ্যচক্রে পড়ে বড়লোক হয়ে গেলাম! এই পর্যন্ত!

—কিন্তু বিয়ে করলেন না কেন?

মেনন সাহেব বললেন—ওই যে বললাম, বিয়ে করবার সময় হয়নি—বিয়ে করতেও তো সময় লাগে, বিয়ে করতেও তো অবসর দরকার হয়!

—কিন্তু সেই সামান্য অবসরটুকুও পাননি আপনি বলতে চান?

মেনন সাহেব বললেন—না, সত্যিই পাইনি আমি, বিশ্বাস করুন এর মধ্যে আর রোম্যান্স খুঁজবেন না, এর মধ্যে আর গল্পের খোরাক খুঁজবেন না আপনি, ওদিক থেকে আমার জীবন একেবারে নীরস—একেবারে রসকষহীন—

মেনন সাহেবের জীবনের কিছু কিছু ত্রিবেদীজীর কাছে শুনেছিলাম।

ত্রিবেদীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা ত্রিবেদীজী, এত বড় কনট্রাকটার, উনি বিয়ে করেন নি কেন বলুন তো?

ত্রিবেদীজী বললেন—কী জানি, তা তো জানি না, শুনিনি তো কিছু—

—কোনও ব্যর্থ ভালবাসা কিম্বা প্রণয় কিছু ঘটেছিল কি ওঁর জীবনে?

ত্রিবেদীজী বললেন—কই, এত বছর আছি এখানে, শুনিনি তো তেমন কিছু—বিয়ে দিয়েছেন ভাইদের বোনদের, তাদের বিয়ের পর যে-যার কাছে চলে গেছে, উনি তো একলাই পড়ে আছেন এখানে—বাড়িতে তো একগাদা গলগ্রহ, চাকর-বাকর, দারোয়ান সরকার—তাদের হাতেই সংসার—

বললাম—মেনন সাহেবের ঘরে কখনও গেছেন? ওঁর বাড়িতে?

বাড়ি? তা বাড়িতেও গেছেন দু' একবার। বিরাট বাড়িটা। থাকতে মাত্র ওই একটি লোক। সেই যে সকাল বেলা খেয়ে দেয়ে অফিসে আসেন, আর যান সেই অফিস ছুটি হবার পর। তারপর ওই ক্লাব, আর ক্লাব থেকে বাড়ি! শুনেছি বাড়িতে চারতলায় একটা ঘরে নিজে থাকেন, সেখানে চাকর-বাকর কাউকে ঢুকতে দেন না। সে ঘরে কারো প্রবেশ নিষেধ। নিজে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন, আবার বেরিয়ে তালা বন্ধ করে দিয়ে অফিসে আসেন। চাকর-বাকর কাউকেই ঢুকতে দেন না সেখানে শুনেছি।

এসব জানা ছিল আমার। যে-কদিন ছিলাম জামনগরে মেনন সাহেবের সম্বন্ধে

জানবার চেষ্টা করেছি—তারপর একদিন চলে যাবার সময় এলো। আর কিছু জানা যায়নি। কিন্তু ঠিক যাবার আগের দিন সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

মেনন সাহেব সেদিন নিজের ঘরেই বসে ছিলেন। এক-একদিন যেমন হঠাৎ নীল আকাশে মেঘ করে আসে, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ পশ্চিম দিক কালো করে সারা পৃথিবীতে ঘনঘটা ছড়িয়ে পড়ে, সেদিনও বোধহয় তেমনি হয়েছিল। কেউ কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি। সমস্ত বাড়িতে আজ অন্য রকম চেহারা। মেনন সাহেব ক্লাবে চলে গেলেই সকলের একটু গড়িয়ে নেবার অবসর। অফিসে চলে যাবার পর তখন লোকজনের কথাবার্তার চীৎকারের আওয়াজ শোনা যাবে। তখন দারোয়ান রঘুবীরের সঙ্গে সরকার মুন্সীর বচসা বাধে। চাকর পুরণচাঁদের সঙ্গে ঝি যমুনার ঝগড়া হয়। কিন্তু সেদিন মেনন সাহেব অফিসে যাননি। সারা বাড়িতে থম্‌থমে ভাব। সাহেব যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া করেছেন। কিন্তু ড্রাইভার নারায়ণ সিং গাড়ি তৈরি করে হঠাৎ শুনলো—সাহেব বেরোবে না। নারায়ণ সিং আবার গাড়ি তুলে রেখেছে। রঘুবীর দারোয়ান গেটের সামনেই পাগড়ি পরে হাজির রইল। কখন সাহেবের কী হুকুম হবে বলা যায় না। পুরণচাঁদ সাহেবের কামরার আশে পাশে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। আজ আর তার ছুটি নেই। যমুনাবাঈ আজ নিজের মনের ঝাল নিজেই হজম করে নিয়ে সংসারের কাজে মেতে আছে। ওদিকটা বাবুলোকদের থাকবার জায়গা। রঘুবীর গিয়ে একবার শুনিয়ে দিয়ে এল—বাবুজী আজ গোলমাল মাত করিয়ে—সাহেব কোঠিতে মোতায়েন আছে—

হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করতেই পুরনচাঁদ সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেনন সাহেব বললেন—কুছ কহেগা?

পুরণচাঁদ বললে—হুজুর, এক আদমী আপনার সঙ্গে মোলাকত করতে চায়।

—বল্‌ এখন দেখা হবে না।

এ-রকম অনেক লোককে ফিরিয়ে দিয়েছেন সেদিন। মেনন সাহেব আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। পুরণচাঁদ অনেকক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে সে-ও টিপি টিপি পায় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেই দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে। দেখলে—ফাঁকা ছাদের উপর সাহেব একলা এদিক থেকে ওদিক দ্রুতপায়ে পায়চারি করছেন।

যারা নতুন তারা বুঝতে পারে না। সকলের সামনে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন—কেমন আছেন ভাইসাহেব?

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করেন—নারায়ণ সিং তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়? ছেলে কেমন আছে তোমার? লেড়কী কেমন আছে?

পুরণচাঁদকে দেখলেও বলেন—যাও বেটা, আবি শো যাও—

ভারি মোলায়েম ব্যবহার, ভারি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সকলের সঙ্গে। রঘুবীর সেলাম করবার আগেই নিজে থেকে সেলাম করে বসেন। বাড়িতে যে-সব ছাত্ররা পড়া-শোনা করে, তাদের মধ্যেও গিয়ে দাঁড়ান মাঝে মাঝে। ভাল মন্দের খবর নেন। কারো কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। কা'র বাড়ি থেকে চিঠি আসেনি, কা'র বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে, সকলের সঙ্গে কথা বলেন। যেন আপনার জন। কেউ পর নয় তাঁর। বাইরে যাবার পথে হঠাৎ ঢুকে পড়েন তাদের ঘরে। চৌকীতে বসেন তাদের সঙ্গে সমান স্তরে। সবাই এক—সব একাকার। কিন্তু সামনে থেকে চলে গেলেই সকলের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে ভয়ে বুক দুরদুর করে ওঠে সকলের।

আগ্রা থেকে ছোটভাই গনেশ চিঠি লেখে। নাগপুর থেকে মেজভাই বিশ্বনাথ্‌ন চিঠি লেখে। সব ভাই বোন মেনন সাহেবকে চিঠি লেখে। মেনন সাহেবের খবর নেয়। কেমন আছেন মেনন সাহেব জানতে চায়। মেনন সাহেব সবাইকে লেখেন তিনি ভালো আছেন। কোনও ভাবনা নেই তাঁর জন্যে। তোমরা সকলে ভালো থাকো, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক, তোমরা সকলে সুখী হও, তা হলেই আমার আনন্দ, তা হলেই আমার সুখ! আর কিছু চাই না।

এখন, এই পরিস্থিতি আমি কিছুই জানতাম না। ত্রিবেদীজী বলেছিলেন—আপনি বললেই ছেলেটির ছুটি হয়ে যায়।

আমি শুধু ছেলেটার উপকারের জন্যেই একটা দরখাস্ত নিয়ে সেদিন সোজা ক্লাবে গেলাম। একেবারে ক্লাবে গিয়ে তাঁকে দিয়ে ছুটিটা মঞ্জুর করে নিয়ে আসবো, এই ছিল মতলব। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে বসেও মেনন সাহেব এলেন না। অথচ পরের দিন সকালেই আমাকে জামনগর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শেষে ঠিক করলাম মেনন সাহেবের বাড়িতে যাবো।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে সুভাষ মার্কেটের সামনে দিয়ে ঘুরে পাশের রাস্তার ওপরেই তাঁর বাড়ি জানতাম। ঠিক চেনা ছিল না জায়গাটা। তবু চিনে চিনে গেলাম তাঁর বাড়িতে। বিরাট বাড়ি। সামনে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।

দরোয়ান চাকর কর্মচারী সবাই জড়ো হয়েছে, আর সকলের সামনে একটি মহিলা। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা বলেই মনে হলো। তিনি ভেতরে ঢুকতে চাইছেন।

দরোয়ান হাতে লাঠি নিয়ে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে—নেহি বাঈ, সাহেব মানা করে দিয়েছে—যানা মাত্—

এক কর্মচারী, সরকার বলে মনে হলো—বললে—এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—তিনি দেখা করবেন না আপনার সঙ্গে—

মহিলাটি বললেন—আমার বিশেষ দরকার, সাহেবকে বলো আমি বোম্বাই থেকে আসছি—না দেখা করলে আমার চলবে না—

মহিলাটির চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠলো যেন। চেয়ে দেখলাম—একটু বয়েস হয়েছে। কিন্তু চেহারায় জলুস আছে, ঘষা মাজা রূপ। পোষাক—পরিচ্ছদের বাহুল্য না থাকলেও মার্জিত রূপ।

হঠাৎ চেহারাটা দেখতে দেখতে মনে হলো এ-মুখ যেন কোথায় দেখেছি। ভারি চেনা-চেনা। অথচ ঠিক মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি। শুধু একবার নয়, অনেকবার দেখেছি, অনেকবার অনেক জায়গায়। অনেক রকম ভাবে।

মহিলাটি তখন রীতিমত কাঁদতে শুরু করেছেন।

বললেন—আমি অনেকদূর থেকে এসেছি, তোমরা একবার গিয়ে সাহেবকে বলো বাবা।

দরোয়ান না-ছোড়। বললে—নেই বাঈ, নেহি—যানা মাত্—

বলে মোটা লাঠিটা একবার জোরে ঠুকলে মাটিতে।

মহিলাটি সকলের মুখের দিকে অসহায়ের মত তাকাতে লাগলেন। কারোর মুখ থেকেই কোনও আশ্বাসের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। ভদ্রমহিলা যেন বেশ মুষড়ে পড়লেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে বোধহয় নিজের লজ্জা আর আপমান ঢাকতে চাইলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে গেলেন হঠাৎ। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল তাতেই গিয়ে উঠলেন। তারপর ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলে।

আমি এতক্ষণ বিমূঢ়ের মত এসব দেখছিলাম। কেমন যেন সঙ্কোচ হতে লাগলো। এমন অবস্থায়, কি দেখা করা উচিত হবে! কিন্তু দেখা না-করলেই নয়। পরের দিন সকালবেলাই আমার যাওয়া!

একজন কর্মচারীকে আমার উদ্দেশ্য বলতেই আমাকে পাশের একটা ঘরে বসিয়ে দিলে। তারপর খবর দিতে গেল সাহেবকে। আমার নাম জেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য, খবর দেবার একটু পরেই মেনন সাহেব নিজে এসে পড়লেন।

ড্রেসিং-গাউন পরা। হাসিমুখ। হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—কী খবর? আপনি?

বললাম—কাল সকালে চলে যাচ্ছি—

বললেন—জামনগর কেমন লাগলো বলুন?

বললাম—তার আগে একটা আর্জি আছে আপনার কাছে—

মেনন সাহেব বললেন—কী আর্জি.বলুন?

বললাম—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি এতক্ষণ ক্লাবে অপেক্ষা করছিলাম, আপনাকে দেখতে না পেয়ে সোজা আপনার বাড়ি চলে এলুম—

মেনন সাহেব—খুব ভালো করেছেন, খুব খুশী হলাম—বলুন আপনার কী আর্জি, বলুন আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?

পকেট থেকে দরখাস্তটা বার করে দিলাম সামনে। বললাম—আপনার অফিসের ড্রাফটসম্যান্ এই ছেলেটি, এর মার খুব অসুখ, মৃত্যুশয্যায়—একে আপনাকে ছুটি দিতে হবে—

দরখাস্তটা নিয়ে মেনন সাহেব হাসতে লাগলেন।

বললেন—আপনাকে ধরেছে বুঝি এরা?

বললাম—আপনার কাছে অনেক পীড়াপীড়ি করে যখন কোনও ফল হয়নি, তখন আমার কাছে এসেছে, আপনি না বলবেন না—

মেনন সাহেবের দিকে চেয়ে দেখলাম। তিনি যেন কী ভাবছেন।

—বললাম এর মা সত্যিই মৃত্যুশয্যায়, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ছেলেটিকে নিজে দেখেছি, সে-ছেলে কখনও মিথ্যে বলতে পারে না—

মেনন সাহেব তখনও দরখাস্ত হাতে নিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। মুখে কিন্তু তখনও সেই হাসিটি লেগে আছে, মৃদু মৃদু হাসছিলেন দরখাস্তটার দিকে চেয়ে।

সাহস পেয়ে বললাম—আর তা ছাড়া পৃথিবীতে মায়ের মত আর কী আছে বলুন! ছেলের কাছে মায়ের মত আপন আর কে হতে পারে!

মেনন সাহেব হঠাৎ মাথা তুলে চাইলেন আমার দিকে।

বললেন—কী বললেন?

বললাম—এ ছেলেটি যদি মায়ের শেষ সময়ে কাছে যেতে পারে, তবু একটু সান্ত্বনা পাবে মনে, মায়ের মৃত্যুশয্যায় বসেও একটু শান্তি পাবে—সত্যিই বলুন মায়ের ভালবাসার কি তুলনা আছে?

মেনন সাহেব মাথাটা নাড়া দিলেন। বললেন—মিথ্যে কথা!

কেমন যেন অবাক হলাম মেনন সাহেবের কথা শুনে। চাইলাম তাঁর দিকে। দেখি তখনও হাসি লেগে আছে সে-মুখে।

বললাম—মিথ্যে কথা? বলছেন কী? মায়ের ভালবাসার সঙ্গে তুলনা?

মেনন সাহেব বললেন—হ্যাঁ মিথ্যে কথা! ছুটি আমি দিয়ে দিচ্ছি ছেলেটিকে, বিশেষ করে যখন আপনি ধরেছেন—সে-কথা নয়—কিন্তু ওটা আপনি কী বললেন?

বললাম—কোন্ কথাটা?

মেনন সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন—মায়ের শত্রুতারও কি তুলনা আছে পৃথিবীতে?

মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম মেনন সাহেবের। কী বলছেন মেনন সাহেব!

মেনন সাহেব আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না?

আমার মুখে তখন আর কোনও কথা নেই। তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন—আমার সঙ্গে আসুন—

কী জানি হঠাৎ কী হলো। তখন রাত সাড়ে আটটাও বাজেনি। তিনি আমার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। আমলা, কর্মচারী, চাকর, দরোয়ান, সবাই সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকেই বাঁ দিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন মেনন সাহেব। পেছনে পেছনে আমিও চলতে লাগলাম। মেনন সাহেব পেছনে ফিরে বললেন—আসুন আমার সঙ্গে—

বললাম—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

মেনন সাহেব বললেন—আপনি না বললেন মায়ের ভালবাসার তুলনা নেই—তাই আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি—

বুঝতে পারলাম না কী দেখাবেন তিনি আমাকে।

চলতে চলতে মেনন সাহেব বললেন—কাউকেই আমি ওপরে নিয়ে আসি না, শুধু আপনাকেই নিয়ে যাচ্ছি, আপনি বিশ্বাস করেন মায়ের ভালবাসার তুলনা নেই?

এর উত্তরে কী বলবো বুঝতে পারলাম না। মেনন সাহেব কোথা দিয়ে ঢুকে কোথায় যাচ্ছেন, কোন্ তলায় দিয়ে কোন্ তলায়, তাও টের পাচ্ছি না। অনেক ঘুরে অনেক এঁকে বেঁকে এক জায়গায়, একটা ঘরের সামনে এসে থামলেন তিনি। একজন চাকর দৌড়ে আসছিল, তিনি হাত তুলে তাকে বারণ করলেন। চাকরটা থেমে গেল। তিনি চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলতে খুলতে বললেন—আপনি জানেন বোধহয় আমাদের ছোটবেলার অবস্থা খুব খারাপ ছিল—

বললাম—জানি—

মেনন সাহেব বললেন—জামনগরের লোকের মুখ থেকে কিছু কিছু শুনেছেন বোধহয়; কিন্তু কতটুকু আর জানে তারা, কতটুকু আর দেখেছে আমায়—আমি একলা বুড়ো বাবাকে সাহায্য করেছি, ছোটবেলা থেকে তিন ভাই তিন বোনের ভরণপোষণ করেছি, আমাদের চাকর রাখার ক্ষমতা ছিল না, আমি নিজের হাতে বাসন মেজেছি, রান্না করেছি, পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়েছি—তারপর সকলে ঘুমোলে নিজের লেখাপড়া করেছি—

ততক্ষণে দরজা খুলে গেছে।

বললাম—কিন্তু আপনার মা ছিল না?

মেনন সাহেব ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার ভালো করে বন্ধ করে দিলেন। বললেন—একটু আগে আপনি বলছিলেন না মা'র চেয়ে আপন কেউ নেই পৃথিবীতে? আপনি জেনে রাখুন—আমার জীবনে আমার মা'র চেয়ে বড় শত্রু আর কেউ নেই—আর অত কষ্টও আমাকে কেউ দেয়নি—

বললাম—মা ছিল?

মেনন সাহেব বললেন—ছিল, কিন্তু সে না-থাকারই মত। আমার মা ছিল ভয়ানক রাগী, আমার বাবার সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া লেগে থাকতো, একদিন সামান্য একটা দেশলাই নিয়ে এমন ঝগড়া বাধলো যে আমার মা রেগে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়—আর সেই যে গেল আর এল না—

বললাম—কোথায় গেলেন?

মেনন সাহেব বললেন—আমরা তখন খুব ছোট, তা আমরা জানতে পারিনি—

—কিন্তু পরে? পরে আর আসেন নি?

মেনন সাহেব একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

বললেন—আজ এসেছিল! আপনি দেখেন নি?

মনে পড়লো ঘটনাটা! অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তখনও অবাক হওয়া বুঝি আমার শেষ হয়নি!

মেনন সাহেব হাসতে লাগলেন। বললেন—আজ এতদিন পরে এসেছিল, আমি দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে অমন মায়ের মুখদর্শন করবো না—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—ওই দেখুন—চেয়ে দেখুন—ওইটে দেখাতেই আপনাকে এই ঘরে এনেছি, এ-ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দিই না, ওই দেখুন—

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। অবাক হয়ে দেখলাম—দেয়ালে একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো। ছ'সাতটি ছোট ছোট মেয়ে। মাঝখানে একজন বয়স্ক পুরুষ আর একটি মহিলা। সকলের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—মাথা থেকে পা পর্যন্ত। কিন্তু মহিলাটির মুখের ওপর কে যেন কাঁচি দিয়ে কাটা এক টুকরো গোল কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছে। সে-মুখ কোনও দিক থেকেই দেখবার উপায় নেই। সম্পূর্ণ ঢাকা।

বললাম—ইনি কে?

মেমন সাহেব তখন মৃদু মৃদু হাসছেন। বললেন—প্রতিজ্ঞা করেছি মা'র মুখদর্শন করবো না জীবনে—

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম ফোটোটার দিকে। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

মেনন সাহেব বলতে লাগলেন—অথচ দেখুন মুখদর্শন করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করলে কী হবে, দিনের পর দিন সব সময় মায়ের মুখ দেখতে হয়েছে আমাকে—খবরের কাগজে, রাস্তার দেয়ালে-দেয়ালে, পোস্টারে পোস্টারে মায়ের মুখ যে কতবার দেখেছি......

হঠাৎ মনে পড়লো আমার, কেন মহিলাটিকে অত চেনা-চেনা মনে হয়েছিল তখন। মনে পড়লো কেন মেনন সাহেব বোম্বাই যান না, কলকাতায় যান না। মনে পড়লো, এই কিছুদিন আগেও ছবিতে যেন দেখিছি মেনন সাহেবের মাকে!

কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি মেনন সাহেব, জামনগরের সেই চীফ ইঞ্জিনীয়র দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদছেন! সে-কান্না আর কিছুতেই থামে না।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেব কি, সে-দৃশ্য দেখে আমারই বাকরোধ হয়ে গেল।

মিসেস নন্দী

মিসেস সেন-এর কথা আমার সত্যিই মনে ছিল না। টেলিফোন ভুলে জিজ্ঞেস করলাম—কে ?

—চিনতে পারছেন না ? আমি মিসেস সেন—প্রভা—

সেই বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। টেলিফোনে যেন গলাটা আরো মিষ্টি শোনালো। টেলিফোনেও যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম মিসেস সেন-এর জর্জেট শাড়ি, তাঁর সিগ্রেট খাওয়া, তাঁর এলো খোঁপা আর সিঁদূরের টিপ। বললেন—আজকে আপনার সময় হবে একবার ? আপনাকে আমার বিশেষ দরকার ছিল—

বললাম—কখন ?

মিসেস সেন বোধহয় তখন সিগ্রেট টানছেন। একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—মিষ্টার সেন মারা গেছেন শুনেছেন বোধহয় ! বললাম—কখন ? শুনিনি তো !

সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। সুব্রত সেন মারা গেছে এ-খবর তো জানা ছিল না। তার যে অসুখ তা-ও শুনিনি। অবশ্য সুব্রত সেন-এর সঙ্গে আমার দেখা তেমন ঘন-ঘন হতো না। সে অন্য সমাজের লোক। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কিসের। রেসের খবরও আমি রাখি না। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের খবরও আমার রাখবার দরকার হয় না। সুব্রত সেন-এর সঙ্গেও বলতে গেলে আমার কোনও সম্বন্ধ রাখার প্রয়োজনই হয়নি। কলেজে একসঙ্গে কিছুদিন পড়েছিলাম, সেই পর্যন্ত !

মনে আছে একদিন এক ভদ্রলোক সকাল বেলা একটা চিঠি দিয়ে গেলেন।

বললাম—কার চিঠি ?

ভদ্রলোক বললেন—আমাদের সাহেব এই চিঠি পাঠিয়েছেন, আপনি তাঁর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছেন—তিনি একবার দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে—

তখনও জানিনা সাহেব কে ! মস্ত বড় কোন্ সরকারী অফিসের আরো বড় হোমরা-চোমরা সাহেবের নাম-ধাম-পরিচয় ছাপা লেখা প্যাডে একখানা চিঠি। লিখেছে সুব্রত সেন। কুড়ি বছর পরে আমার ঠিকানা খুঁজে বার করে অফিসের বাবুকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। কখন আমার অবসর, কখন বাড়িতে থাকি না-থাকি বা তার অফিসে গিয়ে দেখা করতে অসুবিধে হবে কিনা জানতে চেয়েছে। রীতিমত আপ্যায়ন করে ভদ্রলোককে বিদায় দিলাম। বললাম—তাঁর সাহেব সত্যিই আমার সহপাঠী এবং তাঁর সঙ্গে আমি সেই দিনই দেখা করবো !

কিন্তু তারপর যা সচরাচর হয় তাই হয়েছিল। দেখা করা তো হয়ই নি, এমন কি চিঠি দেওয়াও হয়নি। কেন যে হয়নি তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল না। দেখা হয়নি, হয়নি। আরো নানান্ জরুরী কাজ অবহেলা করার মত ও-কাজটাও অবহেলিত হয়ে হয়ে শেষে আর সমাধা হয়নি। শেষকালে এমন দেরী হয়ে গেল যে ও-প্রসঙ্গ আমি ভুলেই গেলাম।

শেষে এক সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মিসেস সেনের সঙ্গে।

সভা থেকে বেরোবার সময় দেখি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা। জর্জেট শাড়ি, এলো খোঁপা, সিঁদুরের টিপ! আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন। আমি কাছে যেতেই আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন—আমায় চিনতে পারেন ?

এক নিমেষে যেন আমার বারো বছর বয়েস কমে গেল।

বললাম—প্রভা না ?

প্রভা বললে—মিষ্টার সেনের চিঠি পাননি ?

—মিষ্টার সেন ?

প্রভা বললে—মিষ্টার সেনের অফিসের ক্লার্ক আপনাকে চিঠি দেয়নি ?

বললাম—সে তো সুব্রত, আমরা একসঙ্গে পড়েছি এক কলেজে—তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ?

প্রভা হেসে ফেললে। বললে—ভেবেছিলাম চম্‌কে দেব আপনাকে, তা আপনি এলেনই না সেদিন।

বললাম—এখানে কী করতে ?

প্রভা বললে—কাগজে খবর দেখে আপনার লেক্‌চার শুনতে এসেছি।

বললাম—মাসীমা কেমন আছেন ?

ভালো করে চেয়ে দেখলাম আর একবার। মনে আছে মাসীমার কথাগুলো। মাসীমা বলতো—ওসব পদ্য লেখা-টেখা ছাড়ো দিকিনি, গরীবের ছেলে, ও সব রোগ কেন—

মাসীমার ছোট ছেলে খোকাকে তখন পড়াতাম আমি। গরীবের ছেলেকে শুধু সাহায্য করার জন্যেই ছেলে পড়ানোর কাজটা দিয়েছিলেন। নিয়ম করে রোজ সকালে বিকালে খোকাকে পড়াতাম। কিন্তু মাসীমা সামনে বসে থাকতেন। এক-

একদিন পড়ার শেষে আড়ালে ডাকতেন। বলতেন—বাড়ী যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও—

তারপর যখন দেখা করতে যেতাম, বলতেন—বোস—

সোফাটায় বসিয়ে বলতেন—খোকার সামনে কথা বলে তোমাকে লজ্জা দিতে চাই না, তাই আড়ালে ডেকেছি—

বললাম—বলুন—

মাসীমা বললেন—আমি অনেকদিন থেকে দেখে আসছি, তুমি বড় খারাপ জামা-কাপড় পরে পড়াতে আসো,—সার্ট ট্রাউজার পরে আসতে পারো না—

আমতা আমতা করে বললাম—বরাবর ধুতি পরেই কাটিয়েছি, তাই,...আর তাহলে ট্রাউজার আমায় কিনতে হয়—

—হ্যাঁ কিনবে! ট্রাউজারে কত স্মার্ট দেখায় তা জানো! এ সার্টের কাপড়ের গজ কত করে?

বললাম—বারো আনা করে কিনেছিলাম তখন, এখন একটু দাম বেড়েছে. অনেক দিন হয়ে গেল—

—ছি, ছি—

মাসীমা যেন দর শুনে মর্মাহত হলেন। বললেন—খোকা কী ভাবে বল দিকিনি! আড়াইটাকা গজের চেয়ে কম দামী কাপড় ব্যবহার করতে লজ্জা হওয়া উচিত তোমার—! তুমি খোকার টিউটার, তোমার কাছে তো শুধু লেখাপড়াই শিখবে না, তোমার চালচলন, ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সবই ওর ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে—

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—এই দেখ না, আমি সিগারেট খাই, খাই কেন?

মাসীমার সিগারেট খাওয়ার কারণ আমি কী করে জানবো! সুতরাং আমি চুপ করে রইলাম।

মাসীমা নিজেই বললেন—আমি তো প্রথমে খেতাম না, খেলে কাশি আসতো—কিন্তু খোকা-খুকুর শিক্ষার কথা ভেবেই ধরলাম, ভাবলাম ওরা তো অন্ততঃ স্মার্টনেস্ শিখবে,—এতে খরচও একটু বাড়ে বটে, কিন্তু কত লাভ হয় জানো?

লাভটা কী হয় তা আমি সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু কথাটা বলবার পর থেকে বার বার লক্ষ্য করে দেখেছি—ওই ট্রাউজার সার্ট, এই সিগারেট, ওই চালচলনের একটা লাভ আছে। দেখতাম জামসেদপুরের যত বড় বড় লোক সবাই

আসতেন মাসীমার বাড়ী। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সি-রোডের বাঙ্গলো বাড়ীতে প্রত্যেক দিনই পার্টি বসতো। জেনারেল ম্যানেজার থেকে স্বরু করে, ওয়ার্কস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ফোরম্যান—জামসেদপুরের যত গণ্যমান্য অফিসার সব আসতেন। মাসীমার তখন কী উৎসাহ! মেসোমশাই তেমন স্মার্ট ছিলেন না। এককোণে বসে বসে চুরোট টানতেন। কিন্তু মাসীমা সর্বত্র। বলতেন—মিষ্টার ভাণ্ডারী, আপনাকে আজ ভারি ইয়াং দেখাচ্ছে—

মিষ্টার ভাণ্ডারী বলতেন—এ আপনার চোখের গুণে মিসেস নন্দী।

মাসীমা বলতেন—না না, নিশ্চয়ই সাদেক আলী আপনার স্যুট তৈরি করেছে—ভারি চমৎকার ফিট্ করেছে আপনাকে—

সাদেক আলী ব্রাদার্স ছিল জামসেদপুরের সব চেয়ে বড় টেলার্স্। জেনারেল ম্যানেজার স্যুট তৈরি করতেন সাদেক আলীর কাছ থেকে। আর সেই জন্যেই মিষ্টার নন্দীকেও সেখান থেকেই স্যুট করাতে হতো। মাসীমার বাড়ীর সকলের জামা-ব্লাউজ তৈরী হতো ওখান থেকেই। শুধু টেলার্স্ নয়, সব কিছু। সব কিছুই কিনতে হতো সব চেয়ে ফ্যাশনেবল্ দোকান থেকে, যেখান থেকে জামসেদপুরের বড় বড় অফিসাররা কেনেন। আর মাসীমা তাঁর বাড়ীর সান্ধ্য-পার্টির জন্যেই কি কম খরচ করতেন! মিষ্টার নন্দী একটু শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বেশি নড়া-চড়া, বেশি সাজ-গোজ পছন্দ করতেন না। তাঁকে দেখলেই মনে হতো যেন খালি গায়ে থাকলেই তিনি বেশি আরাম পান। পা ছড়িয়ে মাদুর বিছিয়ে শুয়েই যেন স্বস্তি পান বেশি।

আর তার ওপর ছিল মিষ্টার নন্দীর ভুলো মন।

সকাল বেলাই মিসেস নন্দী ধরেছেন ঠিক। বললেন—এ কি, চুরোট কই তোমার?

মিষ্টার নন্দী আম্তা আম্তা করে বললেন—চুরোট ফুরিয়ে গেছে বোধহয়—

—কেন? আগে থেকে বলোনি কেন! ষ্টোর থেকে নিয়ে আসতো! কী যে তোমার নেচার, তোমাকে বার বার বলেছি না, চুরোট মুখে না-দিয়ে থাকবে না, চুরোট ছাড়া তোমাকে ভালো দেখায় না, এখন যদি কেউ এসে পড়ে?

মিষ্টার নন্দীকে বলতে গেলে মাসীমাই মানুষ করেছেন। একটা আস্ত লেখা-পড়া জানা গাধা ছিলেন মিষ্টার নন্দী, যখন প্রথম তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়। মিসেস্ নন্দীই মিষ্টারকে ভাল স্যুট পরাতে শেখালেন। চুরোট ধরালেন, পার্টিতে ড্রিঙ্কস্ খেতে শেখালেন। তখন মিষ্টার নন্দী ছিলেন সামান্য এ্যাসিষ্টেণ্ট ফোরম্যান। কিন্তু মিসেস্

নন্দী তখন থেকেই স্মার্ট, সেই মিষ্টার নন্দীর অল্প মাইনে থেকেই টাকা বাঁচিয়ে, না খেয়ে, ভালো পোষাক পরিচ্ছদ পরতে লাগলেন, বাড়ীতে চায়ের পার্টি দিলেন, মিষ্টার নন্দীর বার্থ-ডে উৎসব করলেন, বড় বড় অফিসারদের তাঁর নিজের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাওয়াতে লাগলেন। কী সে কষ্টের জীবন ছিল মাসীমার তখন! বাড়ীতে বাসি রুটি পান্তভাত খেয়ে পার্টিতে সকলকে কেক্ ওমলেট কফি খাওয়াতে লাগলেন। আগে থাকতেন জামসেদপুরের এল্-রোডে, পরে উঠে এলেন সি-রোডে বেশী ভাড়ার কোয়ার্টারে। ক্রমে গণ্য-মান্য লোক আসতে লাগলো মিসেস্ নন্দীর পার্টিতে। মিসেস্ নন্দীর পার্টির সুনাম ছড়িয়ে পড়লো জামসেদপুরের হোমরা-চোমরাদের মহলে। মিষ্টার ভাণ্ডারী এলেন। মিসেস্ ভাণ্ডারী এলেন। মিষ্টার দেশমুখ এলেন, মিসেস্ দেশমুখ এলেন। মিষ্টার সুন্দরম্ আয়ার এলেন, মিসেস্ সুন্দরম্ আয়ার এলেন। শেষে সোসাইটিতে মিসেস্ নন্দীর পার্টি ক্রেজ হয়ে উঠলো।

মিসেস্ নন্দীর সে সব দিনের ইতিহাস বড় করুণ!

মিষ্টার নন্দী রাত্রে আণ্ডারওয়ার পরে শুতেন। মিসেস্ নন্দীও ছেঁড়া শাড়ি পরে শুতেন। বিছানার ফরসা চাদর তুলে ছেঁড়া চাদর বেরোত রাত্রে। শুধু র' চা খেয়ে ব্রেক ফাষ্ট করেছেন দু'জনে। মাছ মাংস খাবার টেবিল থেকে বাদ। সাবান দিয়ে কাপড় কেচেছেন নিজের হাতে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে। ঘরের মধ্যে শুধু সেমিজ পরে কাটিয়েছেন, ঘর ঝাঁট দিয়েছেন। ঘুঁটের ছাই দিয়ে বছরের পর বছর দাঁত মেজেছেন। কিন্তু কেউ এসে গেলেই জর্জেটটা জড়িয়ে নিতেন। খাবার সময় চারদিকের দরজা জানলা বন্ধ করে খেয়েছেন। নইলে কী দিয়ে তাঁরা খাচ্ছেন তারা দেখতে পাবে। বাড়ীতে একটা চাকর রেখেছেন, সে শুধু কাজ করে দিয়ে চলে যেত। খেত না। সেই চাকরই পাগড়ি পাজামা পরে একবার খানসামা, একবার বয়, একবার বাবুর্চি, একবার দারোয়ান সাজতো। বহুরূপী।

মিষ্টার নন্দী বলতেন—এ রকম কষ্ট করলে তোমারও শরীর খারাপ হয়ে যাবে শেষকালে—

মিসেস্ নন্দী বলতেন—তা হোক্, কিন্তু এ-রকম না করলে তোমার প্রমোশনটা যে হবে না—

মিষ্টার কাশ্যপ্ ছিলেন এস্ট্যাবলিশমেণ্ট অফিসার। তাঁর হাতেই সব! মিষ্টার নন্দী বলতেন—মিষ্টার কাশ্যপ্ যদি চান তো একদিনে ফোরম্যান হতে পারি—

তখন ফ্যাক্টরীতে আরো অনেক এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ফোরম্যান রয়েছে। মিষ্টার নন্দী

সকলের জুনিয়র। মাসীমা একদিন এক পার্টিতে গিয়ে মিসেস্ কাশ্যপের সঙ্গে ভাব জমালেন। তারপর নেমন্তন্ন করলেন নিজের বাড়িতে। এলেন মিষ্টার কাশ্যপ্‌ মিসেস্ কাশ্যপ্‌ দু'জনেই। সিফন্‌ সাড়ী পরে খুব তোয়াজ করলেন দু'জনকেই। দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে নানারকম খাবার আনালেন। চা, কফি, লেমনেড কোকো সব কিছুরই আয়োজন হয়েছিল। আর তার পরের মাসেই প্রমোশন হয়ে গেল মিষ্টার নন্দীর। তিনশো টাকা মাইনে বাড়লো।

কিন্তু শুধু ফোরম্যান্‌ করেই তৃপ্তি হলো না মাসীমার। সমাজে মিষ্টার নন্দীর প্রমোশনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদাও বাড়াতে হবে। ওয়ার্কস ম্যানেজারের গৃহিনীও হতে হবে একদিন। লক্ষ্যটা রইল সেইদিকেই!

তখন এলেন মিষ্টার আর মিসেস্ ভাণ্ডারী!

এমনি করে মিষ্টার নন্দী অল্প ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। কী করে বড় হতে হয় তার চাবিকাটির সন্ধান জানতেন মাসীমা। আমার ভালোর জন্যেই আমাকে সেই সব উপদেশ দিতেন।

তাই সেদিন যখন জামা-কাপড় নিয়ে অনুযোগ করলেন, উত্তরে আমি কিছুই বলিনি। চুপ করে ছিলাম।

মাসীমা বলেছিলেন—সাদেক্ আলীর দোকান থেকে স্যুট করিয়ে নাও—

বললাম—আমি অত টাকা কোথা থেকে পাবো বলুন—বাড়ীতে ভাইবোন আছে, বাবা মাকে টাকা পাঠাতে হয়—

মাসীমা বললেন—তোমার মেসোমশাইএর কী করে প্রমোশন করিয়েছি জানো? —ছিলেন তো ক্লার্ক—এখন তো সবাই দেখছো ওয়ার্কস্ ম্যানেজার, কিন্তু কী করে হলো, তা জানো?

বললাম—না—

মাসীমা বললেন—চুরুট খাইয়ে। প্রথমে কিছুতেই খেতে চাইবেন না, বিশ্রী গন্ধ লাগে! বললাম—গন্ধ লাগে লাগুক, অফিসারদের সঙ্গে মিশতে গেলে তারা যেমন ভাবে চলে তেমনি করে চলতে হবে, তারা যে দোকান থেকে জামা করায় সেই দোকান থেকে জামা করাতে হবে, যে ক্লাবে যায় সেই ক্লাবে যেতে হবে—

তারপর আবার একটু থেমে বললেন—নইলে মন দিয়ে শুধু ঘাড় গুঁজে অফিসের কাজ করে গেলে সেই ক্লার্কই থাকতে হতো বরাবর, এই প্রমোশনও হতো না, এই গাড়ী বাড়ী কিছুই হতো না—

বলতেন—তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, তোমাকেও ফ্যাক্টরীতে ভালো

চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারি ওঁকে বলে, কিন্তু আমি যেমনভাবে বলি তেমনিভাবে চলতে হবে, ও ধুতি-টুতি চলবে না—

মাসীমা তখন পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মোটাও হয়েছিলেন খুব। ফরসা বরাবরই ছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে মেদ্ বাড়লো। জর্জেটের জৌলুষ ভেদ করে মাসীমার মেদ ফেটে পড়তো। কিন্তু সেই মেদই ছিল মাসীমার গর্ব। নইলে অমন করে সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার মত করে কেন তা প্রকাশ আর প্রচার করতেন। সিল্কের শাড়ী সিল্কের ব্লাউজের ওপর এঁটে বসতো না, বার বার খসে পড়তে চাইতো। এক-একবার মনে হতো শাড়ীর আঁচলটা কাঁধ আর বুক আর পিঠ থেকে ইচ্ছে করে খসিয়ে দিয়েই বুঝি মাসীমা বেশী আনন্দ পেতেন! মিষ্টার কাশ্যপ, মিষ্টার ভাণ্ডারী, মিষ্টার দেশমুখদের বোধ হয় ওইভাবেই আকর্ষণ করতে চাইতেন। তাঁর সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়নি, মেসোমশাইএর পদোন্নতিই তার প্রমাণ।

অথচ মেসোমশাইকে দেখেছি অন্যরকম। নন্দী মাসীমার পীড়াপীড়িতেই গায়ে জামা দিতে হোত তাঁকে, মাসীমার কথাতেই চুরোট কামড়ে, ট্রাউজার পরে দলের মধ্যে বসে থাকতে হতো।

মাসীমা বললেন—কাল মিষ্টার ভাণ্ডারীদের পার্টি দিচ্ছি একটা, মনে আছে তো?

মেসোমশাই তখন ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে একটু গড়াচ্ছেন সবে। ভয়ে ভয়ে বললেন—আবার? এই যে সেদিন পার্টি হয়ে গেল!

মাসীমা বলতেন—তুমি আর বোক না, এখনও তোমার কন্‌ফার্মেশন্ হয়নি, জানো না?

মেসোমশাই বললেন—আর ভালো লাগে না, একদিন যে একটু নিরিবিলিতে বাড়ীতে থাকবো···

মাসীমা বললেন—একবার ওয়ার্কস্ ম্যানেজার হও, তখন যত ইচ্ছে নিরিবিলিতে থেকোনা—আমি বারণ করতে আসবো না—আমারই কি খুব সাধ? খরচও কি কম হয় ভেবেছো?

মেসোমশাই হতাশ হয়ে পড়তেন—আর নিরিবিলি হয়েছে, ওরা এলেই জোর করে হাসতে হয়, কথা বলতে হয়—অফিসেও সেই ওরা, বাড়ীতেও ওরা—সব সময়ে কি ভালো লাগে?

মাসীমা বলতেন—তা আমারই কি খুব ভালো লাগে মনে করেছো?

—তাহলে, কেন করো? আর প্রমোশনে কী দরকার? বেশ তো চলে যাচ্ছে!

মাসীমা বলতেন—তুমি তো বললে বেশ চলে যাচ্ছে! বেশটা চলে যাচ্ছে

কোথায় ? ওই পুরোন গাড়ীটায় চড়ে আর মান থাকে ? মিষ্টার ভাণ্ডারীর গাড়ীটা দেখেছো চোখ মেলে ?

তা মেসোমশাইও অস্বীকার করতেন না। আগে তো সেই হেঁটে হেঁটে ফ্যাক্টরীতে যেতে হয়েছে। ঘেমে নেয়ে উঠতেন তখন অফিস যাবার সময়। একটু দেরী হলে বকুনি খেতে হোত, ফাইন হতো। সেই অবস্থা থেকে তো আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছেন। এখন তবু দশজনে মানে, খাতির করে, সম্মান করে। রাস্তায় দেখা হলে ডেকে নমস্কার করে। জেনারেল ম্যানেজারের বাড়ীতে নেমন্তন্ন হয়। পোষাকে পরিচ্ছদেও যে কিছু হয়, তিনি নিজেই তো তার প্রমাণ! সেই মাসীমা যিনি একদিন ধোঁয়ায় বসে রান্না করতে গিয়ে চোখের জলে ভেসেছেন, নিজের হাতে শুধু রান্নাই নয়, বাসনও মেজেছেন, সেই মাসীমাই এখন এত চেষ্টার পর সমাজে জাতে উঠেছেন। মিসেস্ ভাণ্ডারীর সঙ্গে মিসেস্ নন্দীর নামও একসঙ্গে উচ্চারিত হয়—। জেনারেল ম্যানেজারের পাশের চেয়ারে বসতে পান, এটাই কি কম। সেই মাসীমাই এখন সি-রোডের বাড়ী ছেড়ে নিজের কেনা বাড়ীতে উঠেছেন, নিজের গ্যারাজে নিজের গাড়ী আছে তাঁর, রান্নাঘরে বাবুর্চি আছে, টেবিলে বয় আছে, বাগানে মালী আছে। এটাই কি কম কথা নাকি !, আর সংসারে থাকার মধ্যে তো একটি শুধু ছেলে আর একটি মেয়ে।

ঠিক এমনি অবস্থাতেই আমি এসে হাজির হয়েছিলাম খোকার প্রাইভেট টিউটর হয়ে।

তাও কি কম তদ্বিরের পর !

আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা বলেছিলেন—মিষ্টার নন্দীকে বললে তোমার চাকরি হবে না—যদি কোনও রকমে মিসেস্ নন্দীকে পাকড়াতে পারো তাহলে হতেও পারে—

আমার তখন ছেলে-পড়ানো প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কোনও রকম ভাবে আস্তে আস্তে ঘনিষ্টতা হলে ফ্যাক্টরীতে একটি চাকরি জোগাড় করা। মিষ্টার নন্দীর হাতেই সব। মিষ্টার নন্দীই একমাত্র বাঙ্গালীদের মধ্যে জামশেদপুরে বড় চাকরি করেন। ইচ্ছে হলে তিনিই চাকরি দিতে পারেন।

একদিন একলা পেয়ে মিষ্টার নন্দীকে বললাম আমার অভাবের কথা।

বললাম—আপনি যদি একটা চাকরি করে দেন ফ্যাক্টরীতে, বড় উপকার হয়—যে কোনও রকমের একটি চাকরি…

ফ্যাক্টরীতে মিষ্টার নন্দীর কাজের লোক হিসেবে নাম ছিল। যোগ্যতার সঙ্গে

মাসীমার তদ্বির মিলে ধাপে ধাপে তাঁর উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন বাঙ্গালী। ডিনার খেতেন, স্যুট পরতেন, চুরোট কামড়াতেন, সে কেবল স্ত্রীর অদম্য উচ্চাকাঙ্খার তাগিদে! নইলে সরষের তেল গায়ে মেখে চান করতেই পছন্দ করতেন, ডাল দিয়ে ভাত মেখে খেতেই ভালোবাসতেন, ধুতি পরেই আরাম পেতেন, তাই আমার কথায় একটু সহানুভূতি হলো যেন তাঁর।

বললেন—চাকরি করবে? ফ্যাক্টরীতে?

আবার বললাম—হ্যাঁ, যে কোনও চাকরি—

কী জানি কী রকম মেজাজ ছিল। বললেন—তুমি জানো না, জীবনে চাকরি কখনও করোনি, সবে আরম্ভ করছো জীবন, আমরা চাকরি করলাম এতদিন, মর্মে মর্মে বুঝলাম চাকরির জ্বালা—

বলে একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন—চাকরির অপমান, বড় মর্মান্তিক অপমান, জানো, যে চাকরি করেনি, সে বুঝবে না...তা তোমার চাকরি না করলেই কি চলে না?

সেদিন বুঝেছিলাম মেসোমশাইএর সে সব কথা ছলনা নয়। বাইরে থেকে সামাজিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাটাই আমরা দেখতাম, ভেতরের অন্তরঙ্গ মানুষটা যে অন্যরকম, সেদিন তারই পরিচয় পেলাম।

বললেন—এক এক সময় মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বনে চলে যাই—মনে হয় এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ভালো—

আমি আর কী বলবো! সেদিন তাঁর সামনে চুপ করেই বসে ছিলাম।

মেসোমশাই আবার বললেন—ভাবি আমার জীবনটা তো একরকম গেল, আমার ছেলেকে যেন এ দুর্ভোগ না ভুগতে হয়—যেমনই হোক একটা ছোট-খাটো দোকান করলেও এর চেয়ে ঢের সুখী হওয়া যায়—

সেদিন জামশেদপুর ফ্যাক্টরীর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার মিষ্টার নন্দীর মুখ থেকে অমন কথা শুনবো, সত্যিই আশা করিনি। বলতে গেলে ঠিক সেইদিন থেকেই জীবন সম্বন্ধে আমার এক নতুন দৃষ্টি খুলে গেল!

প্রভা তখন ছোট, খোকা আরো ছোট! আমি খোকাকে পড়াতে যেতাম সন্ধ্যেবেলা। যাবার আগে যথাসাধ্য ফিট-ফাট্ হয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। নিয়মিত চুল ছাঁটতাম, সাদেক আলীর দোকান থেকে স্যুট করিয়ে পারতাম, কিন্তু তবু মাসীমাকে খুশী করতে পারতাম না। মাসীমা আমার সব জিনিষেই খুঁত্ ধরতেন।

বলতেন—এ ট্রাউজার কি বদলাবে না তুমি? তোমাকে তো বলেছিলাম একটা

স্যুট দু'দিনের বেশী পরবে না—আর বাড়ীতে গিয়ে বিছানার তলায় ভাঁজ করে রাখবে—

কখনও বলতেন—সু পরতে পারো না? এখানে বড় বড় লোক আসে সব, যদি মিসেস্ ভাণ্ডারী কোনও দিন জিজ্ঞেস করেন—এ কে? তখন কী উত্তর দেব বলো তো?

হয়ত মাসীমা বাড়ির বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে আমার বেরোন পছন্দ করতেন না, তাই যেদিন পার্টি থাকতো সেদিন খোকাকে আমি সকালে পড়িয়ে আসতাম। তাতে মাসীমারও ইজ্জৎ থাকতো, আমারও দুর্ভোগ পোয়াতে হতো না।

কিন্তু সব চেয়ে বেশি রেগে গেলেন সেদিন, যেদিন জানতে পারলেন—আমি গল্প লিখি!

বললেন—ও-সব বদ্ নেশা হলো তোমার কোত্থেকে? তোমাকে তো ভালো ছেলে বলেই জানতাম—।

আমি আর কী বলবো, আমি সেদিন চুপ করেই ছিলাম।

বললেন—লেখা-পড়া জানা ছেলেরা ও-সব লিখতে যাবে কেন! তুমি না ফ্যাক্টরীতে চাকরির জন্যে মিষ্টার নন্দীকে বলেছিলে? যদি কেউ জানতে পারে তুমি ওই সব রাবিশ লেখো তা হলে কি তোমার চাকরি হবে কোনও দিন ভেবেছো? ছি—ছি—

বললেন—ভেবেছিলাম মিষ্টার নন্দীর মতন তোমাকেও জীবনে কেমন করে দাঁড়াতে হয় শেখাবো—

তারপর একটু ভেবে বললেন—কিন্তু সাবধান, খোকাকে যেন ও-সব পড়িও না, শিখিও না—

তা যা হোক, ওখানে আমার আর বেশিদিন চাকরি করা সম্ভব হয়নি। ফ্যাক্টরীতেও আমার চাকরি হয়নি শেষ পর্যন্ত। হয়নি বলে কোনও ক্ষতি হয়নি আজ বুঝেছি। কিন্তু এই প্রভা?

এই প্রভার জন্যে মাসীমার কি কম চিন্তাই ছিল! যখন মেসোমশাইকে প্রতিষ্ঠার উঁচু শিখরে উঠিয়ে দিয়েছেন, তখন প্রভার পালা। আই-সি-এস থেকে সুরু করে গেজেটেড অফিসার পর্যন্ত সমস্ত পাত্র যখন একে একে নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন একদিন···।

কিন্তু সে-সব আমি দেখিনি। আমি তখন কলকাতায়। কিছু কিছু কানে আসতো। শুনেছিলাম মেসোমশাই অনেক পাত্রের খবর এনেছিলেন। কিন্তু

মাসীমার সে-সব পছন্দ হয়নি। অনেক রকম 'বায়নাক্কা ছিল মাসীমার। বিলেত-ফেরৎ হওয়া চাই। স্যুটপরা চেহারা চাই। আই-সি-এস হওয়া চাই অন্ততঃ কিছু না হোক, গেজেটেড অফিসার।

শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল এক বিলেত-ফেরতের সঙ্গে। গেজেটেড অফিসারই বটে। এই বিয়েতেও মাসীমা মস্ত পার্টি দিয়েছিলেন। মিষ্টার মিসেসরা সবাই এসেছিলেন সে-পার্টিতে। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল পাত্র নাকি বড় বেশি মদ খায়, রেস খেলে, ষ্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলে। এ-সব খবর আমি কলকাতায় থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই পাত্র যে আমাদের সুব্রত তা-ও জানতাম না। এবং যখন সুব্রত তার অফিসের ক্লার্ককে দিয়ে আমায় চিঠি পাঠিয়েছিল তখনও জানিনা যে তারই সঙ্গে মিসেস নন্দীর মেয়ে প্রভার বিয়ে হয়েছে।

জানলাম পরে। অনেক পরে। যখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে। আমিও তখন অন্যভাবে অন্যজগতে ভীষণ ব্যস্ত অবস্থায় আছি। তখন আর মিষ্টার নন্দী, মিসেস নন্দী, জামসেদপুর, সেই সমাজ, কোনও কথাই মনে নেই। সেই সময়ে হঠাৎ একদিন মিসেস নন্দীর চিঠি পেলাম যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন! এ-ঘটনা যেমন বিস্ময়কর তেমনি কৌতুকপ্রদ। মনে আছে আমি সে-চিঠি পেয়ে সেদিন অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম।

মিসেস নন্দী যখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আমি তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ দেখেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। খদ্দরের শাড়ি পরেছেন, খদ্দরের ব্লাউজ।

বললেন—খুব খুশী হয়েছি তোমার সাকসেস্ দেখে—যেখানে যাই সেখানেই তোমার নাম শুনি, তবে তোমার বইটা এখনও পড়া হয়নি, তা এত লোকে যখন ভালো বলছে তখন নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে—শুনলাম নাকি সিনেমাতেও হচ্ছে তোমার বই?

আসল উদ্দেশ্যটা পরে বললেন।

বললেন—যে জন্যে তোমার কাছে এসেছি—বলি—

বলে একটু থামলেন। মিসেস নন্দী মনে হলো যেন আরো বুড়ো হয়েছেন এখন। মেদ যেন সব ঝরে গেছে। চুলেও পাক ধরেছে। একটু যেন হতাশ-হতাশ ভাব মুখে চোখে।

বললেন—দেখো কী রকম সব কিছু বদলে গেল! তোমার তো এখন বহু লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে, এখানকার মিনিষ্টার মহলের সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দিতে পারো?

বললাম—মিনিষ্টার মহলের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন কেন ?

বললেন—খোকাকে তো বিলেত পাঠিয়েছি, জানো বোধহয়—সেই তারই একটা চাকরির জন্যে—ওই ছেলেটার জন্যেই যা কিছু ভাবনা, খুকুর তো বিয়ে হয়েই গেছে !

সেদিন মাসীমাকে আমি সাহায্য করতে পারিনি বলে দুঃখ যে না-পেয়েছিলাম তা নয়, কারণ তিনি যে কেমন করে ভাবতে পেরেছিলেন গল্প-লেখক হলে মিনিষ্টার মহলের সঙ্গে আলাপ থাকা সম্ভব, তা আমি বলতে পারবো না। সেদিন ক্ষুন্ন মনেই মাসীমা বিদায় নিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ছেলের চাকরি শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কি না, তা-ও আর খবর রাখবার সময় পাইনি।

এর পরই এসেছিল সুব্রত সেনের চিঠি।

এবং তার পরেই সেই মিটিং-এ প্রভার সঙ্গে দেখা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—মাসীমা কেমন আসেন প্রভা ?

প্রভা বলেছিল—মা তো মারা গেছেন, আপনি জানেন না ?

—আর মেসোমশাই ?

প্রভা বলেছিল—বাবার বড় অসুখ, সেবা করবার তো কেউ নেই—বড় কষ্ট হয়েছে তাঁর—

—কেন, খোকা কোথায় ? বিলেত থেকে ফেরেনি ?

প্রভা বললে,—না, খোকা নাকি সেখানেই এক মেম বিয়ে করেছে, চিঠি-পত্র দেয় না, খোকার জন্যেই ভেবে ভেবে মা অত তাড়াতাড়ি মারা গেলেন।

সুব্রতর কথা আর জিজ্ঞেস করলাম না। কারণ সুব্রতকে আমি ভালো করেই জানতাম কলেজে। বড়লোকের ছেলে। দেখতেও সুন্দর। কিন্তু সেই বয়েস থেকেই অবাঞ্ছিত দলের সঙ্গে মিশে গোল্লায় গিয়েছিল। শেষে রেস-এ যেত, আরো কোথায় কোথায় যেত তার উল্লেখ না-করাই ভালো।

একটু থেমে প্রভা বললে—আর কী বই লিখছেন ?

বললাম—লিখতে আর পারছি কই—লেখা আর আসছেই না !

প্রভা হাসলো। বললে—এবার আমাদের নিয়ে একটা বই লিখুন না—

আমিও হাসলাম। বললাম—তোমার কাকে নিয়ে ?

—এই আমার মা'কে নিয়ে !

কথাটা বলে প্রভা হাসতে চেষ্টা করলে। কিন্তু আমার মনে হলো প্রভার হাসিটা যেন কান্নার মত দেখালো। আমিও হাসতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন প্রভাদের বাড়িতে একদিন যাবো বলে চলে এসেছিসাম। কিন্তু যথারীতি সে-কথাও রাখতে পারিনি।

তারপর আজ এতদিন পরে হঠাৎ টেলিফোনে সুব্রত সেনের মৃত্যুর খবরটা শুনে সত্যিই ভারি দুঃখ হলো। দুঃখ হলো সকলের জন্যে। দুঃখ হলো সুব্রতর স্ত্রী মিসেস সেন-এর জন্যেও।

মিসেস সেন তখনও টেলিফোন ধরে আছেন। আবার বললেন—আজকে আপনার সময় হবে একবার? আপনাকে আমার বিশেষ দরকার ছিল—

মনে পড়লো প্রভার সেদিনের কথাটা। প্রভা বলেছিল—এবার আমাদের নিয়ে বই লিখুন না—

হয়ত আমার সঙ্গে এই কথাই বলবে প্রভা! হয়ত বলবে মাসীমার কথা, মেসোমশাই-এর কথা, খোকার কথা আর তার নিজের আর সুব্রতর কথা। সুব্রতর মদ খাওয়ার কথা, সুব্রতর অসংযমের কথা, সুব্রতর রেস্ খেলার কথা। সব কথাই হয়ত অকপটে বলে যাবে। আর হয়ত ওদের ওই সংসারের কথা নিয়ে বই লিখতে পীড়াপীড়িও করবে।

কিন্তু মাসীমাকে আমি কেমন করে আমার গল্পের বিষয়-বস্তু করবো! মাসীমা যে সেদিন আমায় স্যুট পরতে বলেছিলেন, আমায় সাহিত্য-রচনা করতে বারণ করেছিলেন, সে তো আমার ভালোর জন্যেই! আমার ভালোর জন্যেই তো সেদিন তিনি আমাকে ইংরিজি শিখতে বলতেন, সাদেক্ আলির স্যুট পরতে বলতেন! আমার ভালোর জন্যেই তো! আমি তাঁর কথামত চললে আমাকে তিনি একটা চাকরি সেদিন করেই দিতেন। এতদিন সে চাকরিতে থাকলে হয়ত মেসোমশাই-এর মত ফোরম্যানও হয়ে যেতাম। চিরজীবনের জন্যে নিশ্চিন্তও হতে পারতাম। পেন্‌সন্ প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ড্—সবই পাকা হয়ে থাকতো। তা হলে আর এই পাঠকদের কৃপাকণার জন্যে লোলুপ হয়ে থাকতে হতোনা। রাত জেগে লিখে লিখে শরীর খারাপও করতে হতো না। এত ঈর্ষা, এত শত্রুতা, এত দলাদলির গ্লানি থেকে মুক্তি পেতাম। সাহিত্য করে আমার কী-ই বা হয়েছে! সেই চাকরিই তো আমার পক্ষে ভালো ছিল।

মিসেস সেন আবার বললেন—আজ সময় হবে আপনার?

বললাম—না।

এবং না বলেই টেলিফোনটা ছেড়ে দিলাম।

হয়ত প্রভা খুব আঘাত পেলো। কিন্তু তা হোক, নন্দী মাসীমাকে নিয়ে গল্প লিখলে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

বাদশাহী

গড়জয়পুরের বর্তমানও নেই ভবিষ্যৎও নেই। বলতে গেলে গড়জয়পুর বলে কোনও জায়গাই নেই আর। কিন্তু তার অতীত আছে। আর সেই অতীতের একটা কাহিনীও আছে। কিন্তু সে কাহিনী বলবার আগে আজকের দিনের একটা কাহিনী বলি।

একটা জরুরী কাজে এক সরকারী অফিসে গিয়েছিলাম। একমাস ধরেই যাচ্ছি। সেদিনও যথানিয়মে সকাল থেকেই দাঁড়িয়ে আছি।

ডেস্‌প্যাচ্ সেকশনের বড়বাবু তখন সবে এসেছেন। এসে তোয়ালে পাট করে কপালের ঘাম মুছছিলেন।

বললেন—শুনেছ কালীপদ, এদিকে কী কাণ্ড?

কালীপদ খবরের কাগজ বিছিয়ে সবে পড়া শুরু করেছিল। বড়বাবুর গলা পেয়ে কাছে এল। বললে—কী কাণ্ড স্যার?

বড়বাবু বললেন—তোমরা তো সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করলে না, তোমরা ভাবলে আমি বুঝি বাজে কথা বলছি—

ব'লে তোয়ালেটা পাট করে ড্রয়ারের মধ্যে রাখলেন। গ্লাসভর্তি জলটা চুমুক দিয়ে সবটা খেয়ে নিলেন। তারপর পকেট থেকে ডিবে বার করে একটা পানও মুখে পুরলেন। তারপর ডাকলেন—ও প্রভাস—প্রভাস শোন এদিকে—

প্রভাসও এল। বললে—আমাকে ডাকছিলেন স্যার—?

বড়বাবু তখনও পান চিবোচ্ছেন। বললেন—নিশিকান্তকে ডাকো তো, নিশিকান্তও শুনে যাক্—

নিশিকান্তও এসে দাঁড়াল। বড়বাবুর তিনজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্। কালীপদ, প্রভাস, নিশিকান্ত—তিনজনই এসে দাঁড়িয়ে রইল।

বড়বাবু বললেন—তোমরা তো সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করলে না, তোমরা ভাবলে আমি বুঝি বাজে কথা বলছি—

কালীপদ বললে—কোন্ কথাটা স্যার ?

প্রভাস বললে—কোন্ কথাটা বলছেন বলুন তো স্যার ? ল্যাংড়া আমের কথাটা তো ? আমার শ্বশুরের বাগানে এগারোটা ল্যাংড়া আমের গাছ, আমি ল্যাংড়া আমের······

বড়বাবু বললেন—দূর, ল্যাংড়া আমের কথা বলবো কেন—

নিশিকান্ত বললে—সেই আপনার চিনে-বাড়ির জুতো কেনার কথা বলছেন তো ?

বড়বাবু জানালায় গলা বাড়িয়ে পানের পিক্ ফেলে বললেন—আরে না ; এ একটা নতুন কাণ্ড, আজকে নিজের স্বচক্ষে দেখা—! আজকে বাজারে গিয়েছিলাম —জানো !

ব'লে চাপরাশিকে ডাকলেন। বললেন—দ্বিজপদ, চা নিয়ে এস—

তারপর আর একবার ভালো করে মুখ মুছে নিয়ে বললেন—বাজারে তো গেছি, গিয়ে দেখি এই এত বড়-বড় ইলিশ মাছ ! বেশ টাটকা। মনে হলো গঙ্গা থেকে টাটকা ধরা ! জিজ্ঞেস করলাম—কত করে দাম গো ? মেছুনি কী বললে জানো ?

কালীপদ বললে—গঙ্গার ইলিশের তো তিনটাকা করে দর এখন—

প্রভাস বললে—কী যে বলো ! তিন টাকায় দেবে গঙ্গার ইলিশ,—! মাথা খারাপ !

নিশিকান্ত বললে—আমাদের খিদিরপুরের বাজারে কিন্তু কালকে আড়াই টাকা দর গেছে জানেন !

কালীপদ বললে—তোমাদের খিদিরপুরের কথা ছেড়ে দাও—ওটা হলো পাইকিরী বাজার। বাজার হলো আমাদের বৈঠকখানায়, গেরস্থ-পোষা ! যার যেমন অবস্থা তেমনি জিনিস—

প্রভাস বললে—তবে আর যা-ই বলুন, দর একটু বেশি নেয় বটে, বাজার হিসাবে আমাদের লেক-মার্কেটই বেস্ট্—

বড়বাবু বললেন—ওটি বলতে পারবে না প্রভাস, তা যদি বলো তো সে নিউ-মার্কেট, একেবারে বাছাই জিনিস—

প্রভাস বললে—নিউ-মার্কেটের কথা ছেড়ে দিন স্যার, ও আমাদের জন্যে নয়,—

বড়বাবু বললেন—ও কথা বললে শুনবো কেন প্রভাস, আমি নিজে কতবার মাংস কিনেছি নিউ-মার্কেটে গিয়ে—তুমি বললেই তো আর শুনবো না!

তারপর শুরু হলো তর্ক। কোন্ বাজার ভালো। নিউ-মার্কেট না খিদিরপুর, না লেক-মার্কেট, না বৈঠকখানা। সে-তর্কের আর শেষ নেই। সেই বাজার-প্রসঙ্গ থেকে নানা প্রসঙ্গ উঠলো একে একে। তার মধ্যে অনেকবার জল এল, চা এল, পান এল।

সকাল থেকে আমি বসে ছিলাম। এবার সবিনয়ে বললাম—এবার আমার সেই বিল্‌টা একটু দেখবেন—?

এতক্ষণে বড়বাবু আমার দিকে চাইলেন। বললেন—আপনার একলার কাজ করলে তো চলবে না মশাই আমার, সকাল থেকে একটু ফুরসুত পেয়েছি, বলুন? আর একটু বসুন।

ব'লে আবার গল্প করতে লাগলেন। বললেন—তারপরে কী কাণ্ড হলো শোন—

বসেই ছিলাম আমি। হঠাৎ গড়জয়পুরের কাহিনীটা মনে পড়লো। সেও এমনি এক সকাল। সেদিনও এমনি এক আসর বসেছে।

কর্তা বললেন—তবে শোন—

ব'লে গড়গড়ার নলে টান দিয়ে একবার ধোঁয়া ছাড়লেন। সকলের দিকে একবার চোখও বুলিয়ে নিলেন। এইবার আর একটা গল্প বলবেন কর্তা।

তালুকদার মশাই উঠে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে ঢুলুনি আসছিল তাঁর। সকাল বেলাই এসে বসেছেন আসরে। তিনি একলা নন। ভুধর চাটুজ্জেও এসেছেন। কর্তার দয়ায় তাঁকেও আর যজমানি করে খেতে হয় না। তাঁকেও হাজ্‌রে দিতে হয় রোজ আসরে। এসেছেন তান্ত্রিক কালীনাথ। অর্থাৎ গ্রামের গণ্যমান্য তিনজন লোকই হাজির। তামাক দেওয়া হয়েছে। পান-জর্দা দেওয়া হয়েছে। তাকিয়াও আছে ফরাসের ওপর। ঢালোয়া ফরাস। ভোর বেলা নফর দাস সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে গেছে আসর। কর্তাও এসে পড়েছেন। একেবারে কাবা-জোব্বা প'রে হাজির। সকাল বেলাই পরামানিক এসে খেউরি করে দিয়ে গেছে। সকাল থেকে

ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। খেউরি হতে হতেই কর্তা খবর নিয়েছেন—হ্যাঁরে মুকুন্দ, তালুকদার এসেছে ?

মুকুন্দ কর্তার হুঁকো-বরদার। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, শশধর বলছিল, এসেছেন—

কর্তা খেউরি হতে হতে রেগে উঠলেন।

—শশধর বলছিল! তুই নিজে দেখতে পারিস না! কেবল ফাঁকি, কাজের বেলায় কেবল অষ্টরম্ভা সব—

তারপর চান করতে করতে মনে হলো সত্যিই ভূধর চাটুজ্জে এসেছে তো! শশী তেল ডলছিল গায়ে। জলচৌকির ওপর বসে একঘণ্টা ধরে রোজ তেলমাখা তাঁর অভ্যেস। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। তেল মেখে হাতীর পিঠে উঠে নদীর ঘাটে নামবেন। শেখানো হাতী। শুঁড় দিয়ে জল নিয়ে কর্তার মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দেবে। তিনি মসলিনের গামছা দিয়ে গা ডলে ডলে গায়ের ময়লা পরিষ্কার করবেন। তখন ঘাটের ত্রিসীমানায় কারও যাওয়া নিষেধ। ঘাটে যদি কেউ থাকে তো সরে চোখের আড়ালে যেতে হবে। যতক্ষণ ঘাটে থাকবেন, কেউ নদীতে নামতে পারবে না।

বসির এক ক্রোশ দূর থেকে চীৎকার করবে—ঘাট থেকে সরে যাও গো, কর্তা আসছেন—

শুধু ঘাট নয়। ইছামতীর একূল-ওকূল চারিদিক থেকে সব লোক উঠে পালাবে! এঁটো জলে চান করতে নেই। তারপর ঘাট থেকে উঠে গা মুছিয়ে দেবে শশী। তারপরে আসবেন বাড়ির দিকে। পথে আসতে আসতে হাতী এর গাছের লাউ, ওর গাছের কুমড়ো, তার বাগানের শশা যা পাবে শুঁড় দিয়ে টেনে নিয়ে খাবে। তারপর বাজারের মধ্যে দিয়ে আসবেন। বাজারের তরি-তরকারি কলা-মুলো যদি ইচ্ছে হয় খেয়ে নেবে সে। কেউ মারতে পারবে না, খেদাতেও পারবে না। এ নিয়ম।

পরের দিন যার যা লোকসান হিসেব দিলে খাজাঞ্চী মশাই সকলের গুনোগার দিয়ে দেবেন। কারোর তিন টাকা, কারও তিনগণ্ডা কড়ি। যেমন-যেমন লোকসান, তেমন তেমন ক্ষতিপূরণ। কত্তামশাই-এর বড় আদরের হাতী। ওকে কেউ কিছু বলতে পাবে না!

শশীকে বলবেন—যা, ভূধর চাটুজ্জে মশাই এসেছে কিনা—দেখে আয় তো—

যেদিন দেরি হয় সেদিন বড় ভাবনা হয় চাটুজ্জের। বলেন—ও মুকুন্দ, মুকুন্দ—কর্তাকে যেন বলে দিস্ নে—আমার একটু দেরি হয়ে গেল আসতে, বাবা—

তারপর আদর করে মুকুন্দের চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খান।

বলেন—লক্ষ্মী বাবা আমার, দেখিস্, কত্তা যেন আবার টের না পায় রে—

তান্ত্রিক কালীনাথ এককালে তন্ত্রসাধনা করতেন। পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল ইছামতীর ধারে শ্মশানঘাটের কাছে। এখন বিয়ে-থা করেছেন। ছেলে-মেয়ে হয়েছে। কর্তার দৌলতে তিনিও ও-সব ছেড়ে দিয়ে আসরে এসে হাজ্‌রে দিচ্ছেন। পান খান, জর্দা দিয়ে পান মুখে পুরে দিয়ে আর সকলের সঙ্গে কর্তার গল্প শোনেন।

তালুকদার বলেন—কালকে কর্তা আপনার গল্পটা শুনে পর্যন্ত হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে যাই আর কী! বাড়িতে গিয়ে যত ক্ষিদে পাচ্ছে, তত ব্যথা বাড়ছে—শেষে খেতে বসেই হাসি, আমার বউ বলছিল—এত হাসছো কেন গো,—আমি বললাম, কর্তার কথা শুনে—

ভুধর চাটুজ্জে বললেন—আর আমার? আমার সারারাত ঘুম হয়না রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে—যেই ঘুম আসে আর হাসির চোটে ঘুম ভেঙ্গে যায়—শেষে হাসতে হাসতে···আপনি এত হাসাতেও পারেন কর্তা,—

তান্ত্রিক কালীনাথ বলেন—আমি বাড়ি গিয়ে কী করলুম জানেন কর্তা—পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়ে বসলাম—হাসি চাপতে গিয়ে মায়ের খর্পরধারিণী মূর্তি ধ্যান করে তবে সামলাই, নইলে কি থামে হাসি—

কর্তার মনে ছিল না। বললেন—কালকে কী গল্প বলেছিলুম?

তালুকদার মনে করতে পারলেন না। বললেন—সেই যে, সেই···

ভূধর চাটুজ্জের মনে ছিল। বললেন—আপনার সেই মুসুরডাল খাওয়ার গল্পটা, কর্তা······

—ও, মনে পড়েছে, ও-গল্প কি আর একটা মনে করো? অমন হাজার হাজার গল্প আমার আছে, নিয়ম করে ঠিক এলে তোমাদের শুনিয়ে দেব—মুসুরডাল খাওয়ার গল্প আছে, মাম্‌দো ভূতের গল্প আছে, সাধুর গল্প আছে, বেলের গল্প আছে, ওস্তাদের গল্প আছে, আমের গল্প আছে,—

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—আমের গল্পটাই আজ বলুন কর্তা—

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—বেলের গল্পটাই বলুন তার চেয়ে—

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—না কর্তা, আমের গল্পটাই বলুন—

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—না কর্তা, বেলের গল্পটাই ভালো—

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—কেন, আমের গল্পটা খারাপ কিসে?

—কেন, বেলের গল্পই বা কিসে খারাপ হলো শুনি?

ঝগড়া বেধে গেল দুজনে। বেল বড়ো না আম বড়ো—এই নিয়ে ঝগড়া! ঝগড়ার গোলমালে নায়েব-কাছারির আমলা-আমিনরা পর্যন্ত হিসেবে ভুল করে ফেললে। অন্দরমহলের বউ-ঝি-ঝিউড়িরা কান খাড়া করে উঠলো। বুঝতে পারলে, রোজকার মতো কর্তার আসরে গোলমাল বেধেছে। এমন একদিন নয় দু'দিন নয়। এ গা-সওয়া হয়ে গেছে! হৈ-চৈ চলে বিকেল পর্যন্ত। তখন ভেতর থেকে বেলের পানা আসে। আমের সরবত, ক্ষীরের নাড়ু আসে, সরের বরফি আসে, মুগ ভিজে, মাখন মিছরি, ফল আসে। তখন শান্ত হয়। সাব্যস্ত হয় না কিছু। আম বড় না বেল বড়, তাল বড় না তিল বড়, এর মীমাংসা হয় না। কিন্তু সময় কাটে চমৎকার।

মুকুন্দ সারাদিন একতলার তোষাখানায় কলকের পর কলকে ধরিয়ে যায়। গড়গড়া থাকে একতলার ঘরে। সেইখানেই গড়গড়ার ওপর কেবল তামাক-সাজা আর কলকে-বদলানো কাজ মুকুন্দর। সেই গড়-গড়া থেকে ওপরে দোতলায় নল গিয়ে কর্তার হাতে ধরা থাকে। গড়গড়ার শব্দ সহ্য হয় না, তাই এই ব্যবস্থা।

একদিন কলকে বদলাতে ভুল হয়ে গিয়েছিল মুকুন্দর। মুকুন্দ বুঝি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। গড়গড়ায় টান দিয়ে ধোঁয়া পেলেন না কর্তা। সর্বনাশ! মুকুন্দকে ডাকলেন। বললেন—আজ থেকে তোকে আর তামাক সাজতে হবে না—

পরদিন থেকে বসন্ত বহাল হলো সেই কাজে।

মুকুন্দ কান্নাকাটি করতে লাগলো। বলে—আমি কী খাবো, হুঁজুর—আমার জমিজমা কেড়ে নিলে আমি খাবো কী? মরে যাব যে—তা মুকুন্দর কথা তখন কে আর শোনে। কর্তা বললেন—যা, তুই সামনে থেকে, কাজের সময় বিরক্ত করিস্ নে—

বলে আরম্ভ করলেন—তবে শোন—

ভোরবেলা উঠেই কিন্তু মনে পড়লো কর্তার। কাল তো তর্কতে হেরেই গেল ভূধর চাটুজ্জে, কিন্তু আমের চেয়ে বেলই বা ছোট কিসে? অবশ্য আমই খেতে ভালো। তেমন আম হলে কথা নেই। একটা টিপ্ চাল্‌তে আম ওজনে একসের তিনপোয়া পর্যন্ত হয়েছে তাঁর বাগানে।

খেউরি করছিল দিগম্বর পরামানিক। বললে—এবার ক্ষেত-খামারের অবস্থা বড় সুবিধের নয়, কর্তা—

কর্তা রেগে গেলেন। বললেন—এখন বিরক্ত কোরো না, দিগম্বর—সকালবেলাই তোমার নালিশ—

—আজ্ঞে, চৌপর দিন আপনার সঙ্গে তো দেখা হবে না—

—তুমি থামো দিগম্বর, দেখছো একটা কাজের কথা ভাবছি—

মুকুন্দকে বললেন—যা তো মুকুন্দ, একবার চাটুজ্জেকে ডেকে নিয়ে আয় তো—আর কালীনাথ আর তালুকদারকেও ডেকে আনবি ওই সঙ্গে, বলবি কর্তা ডাকছেন—

আম অবশ্য খেতে ভালো, দিতে-থুতে ভালো। এমন-এমন আম আছে যার একটুকু আঁশ নেই। দুধে ফেলে দিলে সে একেবারে অমৃত হয়ে ওঠে। তা অবিশ্যি মিথ্যে নয়। এমন আম আছে যা একটি খেলেই পেট ভরে যাবে। আঁশ বল, কি টক রস বল, কিছুই নেই। কিন্তু বেলই বা কম কিসে? বেলেরই কি কম গুণ? আর ওজন। এক-একটা বেল দু'সের তিনসের পর্যন্ত তো হয়।

খাজাঞ্চী মশাই খাতা নিয়ে এসেছিলেন ভোরবেলা।

বললেন—বাগ্দী প্রজারা এবার সব ভিটে ছেড়ে চলে গেল হুজুর, খাজনা-পত্তোর কেউ দেয়নি—হাল খাজনার আব্ওয়াব দিতে দেরি হবে নবাব-সরকারে—

কর্তা বললেন—এখন ওসব কথা থাক্—

খাজাঞ্চী মশাই মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—থাক্-থাক্ বলে অনেকদিন হয়ে গেল, আর—

কর্তা চটে উঠলেন। বললেন—তোমাদের সকালবেলাই যত নালিশ—দেখছো একটা কাজের কথা ভাবছি—

খাজাঞ্চী মশাই মুখ নিচু করে চলে গেলেন।

কর্তামশাই আবার ভাবতে লাগলেন। কালীনাথ বড় জিতে গেল কাল। আম ওমনি বললেই হলো? ভূধর চাটুজ্জে ঠিকই বলেছে। বেলও কম নাকি! আসুক সবাই। বাগান থেকে বেল একটা আনালেই হবে। দরকার হলে ওজন করেই দেখা যাবে। আর রঙ? লাল-টুকটুকে বেলও আছে। ঠিক আমের মত লাল টুকটুকে বেল। পেকে-পেকে পড়ে থাকে মাটিতে। বেল কোষ্ঠ পরিষ্কার করে—আমও করে। কিন্তু বেলের মত কী আছে? বেল হলো শ্রীফল! সামান্য ফল হলে কি আর বেলকে শাস্ত্রে শ্রীফল বলতো! আজ আসুখ কালীনাথ।

আসরে গিয়ে দেখলেন—সবাই এসে গেছে।

গড়গড়ার নল ফরাসের ওপর তৈরি রয়েছে। তালুকদারও এসে গেছে। ভূধর চাটুজ্জেও এসে গেছে। তান্ত্রিক কালীনাথও রয়েছে।

তালুকদার বললেন—আজ সকাল বেলাই ডেকে পাঠালেন কেন কর্তা ?

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—আপনার ডাক শুনে বড় ভয় হলো কর্তা, তাই আসবার সময় মঙ্গলচণ্ডীতলায় পূজো দিয়ে এলাম একেবারে—

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—কিছু বুঝি কাজ ছিল কর্তামশাই ?

তিনজনই সমাজের মাথা। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর সর্বসাধারণের মাতব্বর গোছের লোক থেকেই তিনজন বরাবর কর্তার আসরে হাজির হবার অধিকার পেয়েছেন। বছরের পর বছর এসে হাজ্‌রে দেন কর্তার আসরে। নফর দাস আসর সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে যায়। পান আসে, জর্দা আসে। এখানে বিরক্ত করতেও কেউ আসে না। একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে সারাদিনের মতন কাজ। কর্তা তিনজনকেই জমি দিয়েছেন—নিষ্কর ধান-জমি, বাস্তভিটে। ভূধর চাটুজ্জে, তালুকদার, তান্ত্রিক কালীনাথ—তিন জনকেই ভরণপোষণের ভাবনা যাতে না ভাবতে হয়, তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কর্তা।

একদিন কর্তা হয়ত বলেন—চাটুজ্জে, কাল কী স্বপ্ন দেখেছি জানো ?

ভূধর চাটুজ্জে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বললেন—আজ্ঞে, খুবই সুখের স্বপ্ন নিশ্চয়ই !

কর্তা গড়াগড়া টানতে টানতে বললেন—উঁহু, হলো না—

তারপর তালুকদারের দিকে চেয়ে বললেন—তালুকদার তুমি বলতে পারো ?

তালুকদার বিপদে-পড়লেন। বললেন—খুব দুঃখের স্বপ্ন বুঝি ?

কর্তা গড়গড়া টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—দূর, তোমার কিছু বুদ্ধি নেই তালুকদার, দুঃখের স্বপ্ন দেখবো কেন ?

কর্তা বললেন—আমি সুখের স্বপ্নও দেখিনি, দুঃখের স্বপ্নও দেখিনি, আমি বেগুনের স্বপ্ন দেখেছি—

সবাই অবাক্ হয়ে গেলেন।

—বেগুনের ?

—হ্যাঁ, বেগুনের।

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—বেস্পতিবারে বেগুনের স্বপ্ন দেখলেন ?

কর্তা বললেন—কেন ? বেস্পতিবারে বেগুনের স্বপ্ন দেখলে কী হয় ?

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—শাস্ত্রে আছে বেস্পতিবারে বেগুনের স্বপ্ন দেখা খারাপ—অমঙ্গল হয়—

কর্তা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—অমঙ্গল হয় ?

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—কিছছু অমঙ্গল হয় না, কর্তা—আমি বলছি কিছছু অমঙ্গল হয় না—

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—হয়, আলবত হয়—

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—কিছুতেই অমঙ্গল হতে পারে না……তা আপনি কী রকম বেগুনের স্বপ্ন দেখেছিলেন কর্তা ?

কর্তা বললেন—সাদা রঙের বেগুন।

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—তবে আপনার কোনও ভাবনা নেই কর্তা, আপনি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন—

তালুকদার এতক্ষণ কথা বলেন নি। বললেন—একেবারে ভাবনা নেই তা বলবো না, একটুখানি ভাবনা আছে—

কর্তা বললেন—কী রকম ?

তালুকদার বললেন—স্বপ্নটা মাঝরাত্তিরে দেখেছেন, না শেষ রাত্তিরে দেখেছেন ?

কর্তা বললেন—শেষ রাত্তিরে।

তালুকদার বললেন—তা হলে বড় ভাবনার কথা কর্তামশাই !

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—কিছছু ভাবনার কথা নয়—

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—তার চেয়ে এক কাজ করুন—

—কী ?

কালীনাথ বললেন—নবদ্বীপের তারাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশকে ডেকে পাঠান, তিনি যা বিচার করে মীমাংসা করেন—তাই হবে।

সেবার নবদ্বীপে গিয়ে নায়েব-মশাই তারাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশকে ডেকে আনলেন। চারদিন ধরে এই ব্যাপারে পূজো হোম যজ্ঞ চললো। অমঙ্গল যা একটু ছিল তার জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়নও করতে হলো। কর্তামশাই ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন সে-ক'দিন।

এ-রকম একবার নয়। কখনও কখনও শনিবার সন্ধ্যেবেলা হাঁচি পড়ে কর্তার। শনিবার সন্ধ্যেবেলা হাঁচি-পড়া মঙ্গল কি অমঙ্গল—এ নিয়ে তর্ক বাধে। সে-তর্কের গণ্ডগোল সাতদিন আটদিন ধরে চলে। সে গণ্ডগোলের পর আর-এক তর্ক ওঠে। কর্তার ভাত খাবার সময় সামনে দিয়ে চলে যায় একটা টিকটিকি। যায় পূব দিক থেকে উত্তর দিকে। এ নিয়েও তর্ক বাধে। পূব দিক থেকে উত্তর দিকে যাওয়া মঙ্গল কি অমঙ্গল তার মীমাংসা অত সহজ নয়। সুতরাং তর্কও হয়—দিনও কাটে। ব্যস্ততাও বাড়ে।

তা এবার কিন্তু অত সহজে মীমাংসা হবে না। এবার সমস্যা আরো গভীর। নবদ্বীপের পণ্ডিত দিয়ে আর চলবে না।

তান্ত্রিক কালীনাথ, তালুকদার, ভূধর চাটুজ্জে সবাই উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন। কী জন্যে কর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন কিছুই জানা যাচ্ছে না। টিকটিকি, না হাঁচি না স্বপ্ন, না অন্য কিছু!

কর্তামশাই এসেই বললেন—কালীনাথ, তুমি যে কাল বড় জিতে গেলে, তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে কেন আম বড় ?

কালীনাথ বললেন—আজ্ঞে, কাল তো আপনিই বললেন আম বড়—?

চাটুজ্জে বললেন—আজ্ঞে মীমাংসাটা ঠিক ভালোমতো হয়নি কাল—

তালুকদার কাল কোনো পক্ষেই ছিলেন না।

কর্তা বললেন—তালুকদার, তোমার কী মত শুনি ?

তালুকদার মহা মুশকিলে পড়লেন। বললেন—আয়ুর্বেদ-মতে বেলই তো শ্রেষ্ঠ ফল—

কর্তা বললেন—কাল আমি বলেছিলাম বটে, কিন্তু ভেবে দেখলাম—বেলই বড়—বেলের অশেষ গুণ।

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—বেলের যদি একশো গুণ হয় তো, আমের হাজার গুণ, আম হলো ফলের রাজা।

তালুকদার বললেন—আর বেল যে হলো ফলের বাদ্‌শা—

একপক্ষে তিনজন, আর একপক্ষে একজন। কিছুতেই হারতে চান না কালীনাথ। বললেন—আম হলো আম্র, মানে যার নাম অমৃত। অমৃতের কি তুলনা আছে ?

কর্তা বললেন—বেলেরও তুলনা নেই। বিল্বপত্র পূজোয় লাগে—

কালীনাথ বললেন—আম্রপত্রও পুজোয় লাগে—

তালুকদার বললেন—বেলগাছ মহাদেবের বাহন—

কালীনাথ চুপ করে গেলেন—

কর্তা বললেন—দাও কালীনাথ, এর উত্তর দাও, চুপ করে থাকলে চলবে না—

কালীনাথ বললেন—মহাদেব নয় আজ্ঞে, বেলগাছ হলো ব্রহ্মদৈত্যের বাহন—

ভূধর চাটুজ্জেও রেগে গেছেন। বললেন—আমগাছও তাহলে পেত্নীর বাহন—

কর্তা বুঝি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়লো।

খাজাঞ্চী মশাই উঁকি মারছিলেন দরজা দিয়ে।

কর্তা বললেন—আবার তোমার কী চাই ?

খাজাঞ্চী মশাই কানে কলম দিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—হাল-সনের খাজনাটা আজকে পাঠাবার শেষ দিন—একটা সই দিতেন যদি—

কর্তা গড়গড়ার নল রেখে তেড়ে উঠলেন। বললেন—এই সময়ে কি তোমার যত বাজে কথা, দেখছো একটা কাজ করছি—তোমরা সবাই মিলে কাজের সময় বিরক্ত করো কেবল !

খাজাঞ্চী মশাই তাড়া খেয়ে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্তা ডাকলেন—শোন—

খাজাঞ্চী মশাই ফিরলেন।

কর্তা বললেন—তোমাকে একবার কাশী যেতে হবে—এখনি—

—আমাকে ?

কর্তা বললেন—হ্যাঁ তোমাকে, কাশীতে গিয়ে বসন্ত ন্যায়রত্ন মশাইকে একবার ডেকে নিয়ে সঙ্গে করে আসবে। বলবে ভীষণ জরুরী দরকার আমার—তিনি নিজেই মীমাংসা করে দিয়ে যান বেল বড় না আম বড়—

সকাল বেলাই এসে হাজির হন ভূধর চাটুজ্জে। আসেন তান্ত্রিক কালীনাথ। আসেন তালুকদার।

কর্তা বলেন—এবার আমরাই জিতবো, কালীনাথ।

কালীনাথ বলেন—না কর্তা, আমি হারবো না, দেখে নেবেন ! বেল হলো পথ্য, আর আম হলো খাদ্য—খাদ্যের কাছে কি পথ্য ?

কর্তারও শান্তি নেই মনে। তাড়াহুড়ো করে খাজাঞ্চী মশাইকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাশী কি এখানে ? যেতে তিন মাস, আসতে তিন মাস। পুরো ছ'মাসের রাস্তা। অনেক টাকা নিয়ে গেছেন। বসন্ত ন্যায়রত্নই এখন কাশীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ন্যায়ের বিচারে তাঁর জুড়ি নেই।

খেউরি করতে করতে দিগম্বর পরামানিক বলে—এবার ক্ষেত-খামারের অবস্থা বড় সুবিধের নয়, কর্তা—

কর্তা রেগে যান। বলেন—থামো তুমি, তোমার সকালবেলাই নালিশ, দেখছো একটা কাজের কথা ভাবছি—

তালুকদারেরও শান্তি নেই মনে। খাওয়া-দাওয়া সেরেই চলে আসেন কর্তার আসরে। সোজা এসে আসরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবেন। শেষ পর্যন্ত যদি তান্ত্রিক কালীনাথই জিতে যান তো মহা লজ্জার কথা। ভূধর চাটুজ্জেও ভারি চিন্তিত

আজকাল। খেতে বসেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তান্ত্রিক কালীনাথটা অনেক জানে শোনে। তার কাছে কি খাটো হয়ে যাবেন নাকি শেষকালে!

কর্তা হাতীর পিঠে চড়ে চান করতে যান নদীতে। রাস্তায় গাছের দিক্ চেয়ে দেখেন। আমগাছও চোখে পড়ে, বেলগাছও চোখে পড়ে। আমগাছে কেমন ছায়া-ছায়া ভাব আর বেলগাছে কেবল যেন কাঁটা। মনে হয় ভুল করলেন নাকি। তান্ত্রিক কালীনাথই কি শেষে জিতে যাবে নাকি!

কালীনাথকে বললেন—এখনও বলো কালীনাথ, বেলই বড়ো—

ভূধর চাটুজ্জেও কালীনাথকে ডেকে বললেন—বেল বড়ো বলতে তোমার কী দোষ শুনি! ব'লে দাওনা বেলই বড়ো, চুকে যাক্ ল্যাঠা।

কালীনাথ বলেন—তা তোমরাই না-হয় বলো-না যে আমই বড়ো, আম বড়ো বলতে দোষ কী?

কয়েকদিন কোনও পক্ষেরই ঘুম নেই। সকালবেলা কর্তা আসরে এসে বসেন। হাতে গড়গড়ার নল নিয়ে টানেন খানিকক্ষণ। গল্ গল্ করে ধোঁওয়া বেরোয়। আসরে তান্ত্রিক কালীনাথ বসে থাকেন। তালুকদার বসে থাকেন। ভূধর চাটুজ্জে বসে থাকেন। অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ার পর কর্তা বলেন—একটা মতলব মাথায় এসেছো—জানো—

ভূধর চাটুজ্জে বলেন—কী মতলব, কর্তা?

কর্তা বললেন—তবে শোন—

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

কর্তা বললেন—কালকে কাশী থেকে হঠাৎ একটা চিঠি এসে হাজির হয়েছে খাজাঞ্চী মশাই এর—লিখেছে, আজ সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে পৌঁছোচ্ছেন ন্যায়রত্নমশাই—

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—ভালোই হলো তাহলে।

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—এ তো সুখবর কর্তা, আজকেই একটা সুরাহা হয়ে যাবে তাহলে—

কর্তা গড়গড়ায় একটা টান দিলেন। বললেন—না সুরাহা হবে না—

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—কেন সুরাহা হবে না কেন কর্তা?

তালুকদার বললেন—নিশ্চয়ই সুরাহা হবে কর্তামশাই—নিশ্চয় হবে—

ভূধর চাটুজ্জেও সায় দিলেন। বললেন—আমরাই জিতবো কর্তা, দেখে নেবেন—

কর্তা তবু বললেন—না।

উত্তর শুনে সবাই যেন থম্‌কে গেলেন। কর্তার মুখের দিকে সবাই চেয়ে রইলেন উন্মুখ হয়ে। কেন যে সুরাহা হবেনা বুঝতে পারলেন না।

কর্তামশাই বললেন—আমি নদীর ঘাটে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, ন্যায়-রত্নমশাই এলেই যেন সোজা আসরে ধরে নিয়ে আসে।

অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই কারও মুখে।

কর্তা গড়গড়ার নলটা রেখে আবার বললেন—তাই সকালবেলাই আমার মাথায় একটা মতলব এল—জানো—ভাবলাম সিঁড়ি দিয়ে রোজই তো দোতলায় উঠি, কথনো তো গুনে দেখিনি কতগুলো ধাপ এ-সিঁড়ির—ভাবলাম আজ গুনবো—

ভূধর চাটুজ্জে বললেন—তারপর? গুনলেন?

তান্ত্রিক কালীনাথ বললেন—কতগুলো ধাপ গুন্‌তিতে দাঁড়ালো?

কর্তা আবার নল রেখে দিয়ে বললেন—ভাবলাম যদি গুন্‌তিতে সিঁড়ির ধাপগুলো বিজোড় সংখ্যা হয় তো জিত কালীনাথের, আর যদি জোড় হয়, তো···

—তারপর কর্তা, তার পর?

সবাই এবার আরো এগিয়ে এলেন। বললেন—তারপর, কী দাঁড়ালো কর্তা? জোড়, না বিজোড়?

কর্তা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন···

হঠাৎ নটবর ঘরে এসে হাজির হলো।

কর্তা রেগে গেলেন। বললেন—আবার এসেছিস্? বলেছি না কাজের সময় বিরক্ত করবি নে আমাকে?

নটবর বললে—কর্তা, বড় গণ্ডগোল বেধে গেছে—

কর্তা বুঝতে পারলেন না। বললেন—কী? ন্যায়রত্ন আসেন নি?

নটবর উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই বাইরে মহা হট্টগোল উঠেছে চারিদিকে। হৈ-চৈ হল্লা। সঙ্গে সঙ্গে নায়েব-মশাই এসে হাজির। বললেন—কর্তা, প্রজারা বাইরে বড় হট্টগোল বাধিয়েছে—দেখা করতে চায় আপনার সঙ্গে—

কর্তা রেগে উঠলেন। বললেন—বলে দাও, এখন বড্ড কাজে ব্যস্ত, কাজের সময় বিরক্ত করতে বারণ করে দাও—দেখছো ন্যায়রত্নমশাই আসবেন,—সেই ভাবনায় অস্থির সব—

নায়েব-মশাই বললেন—তাই বলেছিলাম, কিন্তু শুনছে না, ফিরিঙ্গীরা এসে লুঠতরাজ করছে জমিদারিতে—

কর্তা বললেন—তা তোমরা রয়েছ কী করতে?

কর্তা রেগে গেলেন। বললেন—তুমি যাও তো এখন নায়েব-মশাই, বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই—দেখছো কাজে ব্যস্ত আছি এখন। চাটুজ্জে, দরজায় খিল দিয়ে দাও তো—সকাল বেলাই যত নালিশ—

ভূধর চাটুজ্জে উঠে নায়েব-মশাইকে বাইরে বার করে দিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন।

দরজায় খিল তো লাগানো হয়ে গেল।

কর্তা আবার নল তুলে নিলেন।

তালুকদার বললেন—বলুন এবার আপনার গল্প, কর্তা, গুন্‌তিতে কী দাঁড়ালো? জোড়, না বিজোড়?

কর্তা মুখ দিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—তবে শোন…

কিন্তু ছ'মাস নয়। কাশীধাম থেকে যখন পণ্ডিত এলেন তখন প্রায় একবছর হয়ে গেছে। ঘাটে এসে নেমে খাজাঞ্চী মশাই যেন হক্‌চকিয়ে গেলেন। ঘাটে কর্তার কোনো লোক নেই। পাইক বরকন্দাজ থাকবার কথা ছিল। বসন্ত ন্যায়রত্নমশাইকে ঘাট থেকেই অভ্যর্থনা করে একেবারে সোজা কর্তার আসরে নিয়ে তোলবার কথা ছিল। তা কিছু নেই। সব অচেনা লোক। সব অচেনা মুখ। কাউকেই চিনতে পারলেন না খাজাঞ্চী মশাই। ঘাটের চেহারাও অন্যরকম হয়ে গেছে। বুড়োশিবের মন্দির ভেঙে পড়ে আছে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেও কোন চেনা মুখও নজরে পড়লো না।

একজন লোককে ডাকলেন। বললেন—ওহে শোন—

লোকটি কাছে এল।

খাজাঞ্চী মশাই বললেন—কর্তার লোকজন কাউকে দেখেছ এদিকে?

—কোন্ কর্তা?

—গড়জয়পুরের কর্তা।

লোকটি খানিক খাজাঞ্চী মশাইএর মুখের দিকে চাইলে। বললে—গড়জয়পুর! এ তো জালালাবাদ। সুলতান জালালুদ্দিন শা'র জায়গীর জালালাবাদ। এখানে তো কর্তা কেউ নেই! সুবাদার ইসলাম খাঁ'র দপ্তরে গিয়ে খবর নিন্ সাহেব, আমি জানি না—

খাজাঞ্চী মশাই অবাক হয়ে গেলেন শুনে। ন্যায়রত্নমশাইও অবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু কর্তামশাই, তালুকদার, কালীনাথ, ভূধর চাটুজ্জে তাঁরা কেউ অবাক হয়েছিলেন কিনা, সে কথা ইতিহাসে আর লেখা নেই।

হঠাৎ বড়বাবু বললেন—দেখি আপনার রসিদটা—

বিকেল তখন সাড়ে চারটে। বাড়ি যাবার সময়। রসিদটা দিলাম।

বললেন—আরে, এ যে মশাই অন্য ডিপার্টমেণ্ট, আপনি ডেসপ্যাচ্ সেকশানে এসেছেন কেন? রেট্স-অফিসে যান—সেই চারতলায়—

চারতলায়! আজ এক মাস ধরে ধর্না দেওয়ার পর এই উত্তর! বড়বাবু আমার ওপর বিরক্ত হয়ে মুখ বেঁকালেন। তারপর কালীপদর মুখের দিকে চেয়ে আবার শুরু করলেন—তার পরে কী কাণ্ড হলো শোন…

এক রাজার ছয় রাণী

ভেবেছিলাম গল্পের নাম দেব 'এক দেহের ছয় রিপু', কিন্তু ভেবে দেখলাম রিপু আর রাণী, ও একই জিনিস, একই তাদের আকর্ষণ। বিশেষ করে রায়গড়ের ঠাকুর সাহেবের ছোটরাণীর আকর্ষণ! ছোটরাণীর চিঠি কি কম আকর্ষণ করেছিল দামোদর পাঁড়েকে? নইলে ছোটরাণীর আকর্ষণে…

কিন্তু গল্পটা আগে থেকেই বা বলি কেন?

আনন্দী বাঈ-এর গল্পটা তো আগেই বলেছি। সেটা আমেদাবাদের পথে মিস্টার রামানুজম্-এর কাছে শুনেছিলাম। এটা শুনলাম, আজমীরের বাঙ্গালী ধর্মশালার ম্যানেজার অনন্তরাম উপাধ্যায়ের কাছে। আজমীর থেকে আর দুদিন আগে ফিরলেই দামোদর পাঁড়েকে দেখা বাদ পড়ে যেত আমার।

যাত্রার আগে আমার এক জ্যোতিষী বন্ধু বলেছিল 'মঙ্গল এখন মকরে, আপনার জীবনে সংঘাত আর সম্পদ দুই-ই অনিবার্য, একটু সাবধানে যাবেন।'

সংঘাতের ব্যাপারটা ঠিক জানি না। সংঘাত এড়াতে পারবো, এমন দুরাশাও আমার নেই। কতবার সংঘাতের পর সংঘাত এসেছে জীবনে। সে-সংঘাত কখনও

কখনও ভূমিসাৎও করে দিয়েছে আমাকে। তারপর আবার উঠেও দাঁড়িয়েছি এক সময়ে। আর সম্পদ! সম্পদ আমি সহজেই পাই। সহজে আনন্দ পেতে জানি বলেই তো প্রতি মুমূর্তে আমি বিত্তবান। অতি দুঃখের মধ্যেও আমি যে সম্পদের স্পর্শ পেয়েছি। ক্ষতির ক্ষয়ের মধ্যেও আমি যে আশ্বাসের শক্তি আহরণ করি, সেই-ই তো আমার পরম সম্পদ। জীবনে তার বেশি আর কী সম্পদ চাই!

পুষ্করের দামোদর পাণ্ডে বলেছিল—ভোজনের মধ্যে দিয়েই আমি পরমেশ্বরকে পূজন করি বাবুসাহেব—আপনারা তীর্থ করেন, কত রুপেয়া খরচ করে দেশভ্রমণ করেন, পুণ্য হয় আপনাদের, আমি ভোজন করেই পুণ্য করি, আমি ভোজন করি সেই পরমেশ্বরেরই নামে,—পরমাত্‌মা তুষ্ট হলেই যে পরমেশ্বর তুষ্ট হয়—

আজমীর, দ্বারকা, পুষ্কর, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন গিয়ে কী পুণ্য সঞ্চয় করেছি তার হিসেব বোধহয় পরমেশ্বরের জাবদা-খাতায় লেখা আছে। সে-আমার আখেরের হিসেব। পেলেও পাবো, না-পেলেও অভিযোগ নেই। কিন্তু তীর্থযাত্রার পথে, ঘাটে, ট্রেনে, টাঙ্গায়, ওয়েটিংরুমের কথা অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত সেই মানুষগুলো! তাদের দর্শনে যে পুণ্য আছে তা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি আজ। তাদের নিয়েই আমার শিল্পকর্ম, আমার সৃষ্টির পুঁজি যে তারাই।

তখন দরগাহ্‌ শরীফ দেখেছি, পৃথ্বিরাজের আড়াই দিনের ঝোপড়া দেখেছি, তারাগড় দেখেছি, মিউজিয়ম, দৌলতবাগ, আন্নাসাগর কিছু দেখার আর তখন বাকি নেই। ভেবেছি বুঝি সব দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু বেরোবার দিনই বাধা পড়লো।

পাণ্ডা মহারাজ ডি এন কালে মশাই বললে—তীর্থস্থানে এসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করালেন না বাবুজী—

কথাটা ভাববার মত। অনুষ্ঠানের তো কিছুই ত্রুটি রাখিনি। পুষ্করে গিয়ে পূজো দিয়েছি, সাবিত্রী পাহাড়ে উঠে দেবী-দর্শনও করেছি, কচ্ছপকে ছোলাভাজা খাইয়েছি, অনেক বেলা পর্যন্ত উপোস করে দান ধ্যান, পুজো, গো-দান, ভুজ্যি উৎসর্গ যা কিছু করণীয় অনুষ্ঠান সবই করেছি। শুধু বেলা হয়ে যাচ্ছিল বলে ব্রাহ্মণ-ভোজনটা আর করানো হয়নি। ভেবেছিলাম পরে টাকা ধরে দিলেই চলবে। কিম্বা আজমীরে ফিরে গিয়েই একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সেখানেও তো ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি সেটা।

পাণ্ডা মহারাজের কথায় চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কত খরচ পড়বে?

ডি এন কালে বললে—পাঁচটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে আপনার……

উপাধ্যায় এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের কথাবার্তা। বললেন—পাঁচটা কেন, একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই যথেষ্ট—

পাণ্ডা মহারাজ চলে যাবার পর উপাধ্যায় বললেন—ওসব পাণ্ডাদের কথা শুনবেন না আপনি, কোথা থেকে সব বাজে বামুন হাজির করবে আর মাঝখান থেকে শুধু মোটা কমিশন মারবে—মাথা-পিছু যা দক্ষিণে দেবেন তারও অর্ধেক নেবে ও—তার চেয়ে বরং আমি দামোদর পাঁড়েকে ডেকে দেব, খাঁটি ভোজপুরী ব্রাহ্মণ, সৎ লোক, পাঁচজনের খাওয়া একলাই খেতে পারবে সে, একজনকে খাইয়ে পাঁচজন বামুন খাওয়ানোর কাজ বিলকুল হয়ে যাবে আপনার—

বললাম—সেই ব্যবস্থাই করুন তা হলে—

সামান্য একজন ব্রাহ্মণ খাবে। তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই। পুরী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগধাম সব জায়গাতেই সে-ব্যাপার করা গেছে। পাণ্ডারাই সে দায়িত্ব নিয়েছে। আমি শুধু টাকা দিয়েই বরাবর খালাস। কিন্তু আজমীরে এসে এই প্রথম এ-ব্যাপারে গল্প পেয়ে গেলাম। কোনওদিন খাইয়ে-বামুনদের জীবন-চরিতের দিকটা ভাবিনি আমি। আজমীরে গিয়েও ভাবতাম না। কারণ উপাধ্যায়ই সমস্ত ভার নেবে সেইরকম ঠিক ছিল।

পরদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতেই দেখি ফুলহাতা বেনিয়ান পরে সিং-দরজার পাশের বাঁধানো বেঞ্চিতে কে যেন বসে আছে—

আমাকে দেখেই লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি ভোজন করা লিয়ে ব্রাহ্মণের কথা বলেছিলেন বাবুজী, আমার নাম দামোদর পাণ্ডে—আমি ভোজন করি—

ঠিক এ-অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি।

কিন্তু পাঁড়েজী নিজেই আরম্ভ করলে—এই পৈতে দেখুন বাবুজী আমার, আমি কনৌজের ব্রাহ্মণ, এখানকার পাণ্ডাজীদের কমিশন দিই না বলে আমাকে বরবাদ করে দিয়েছে, কিন্তু বাঙ্গালী বাবুরা যারা আসেন এখানে, সব আমাকেই ভোজন করান—উপাধ্যায়জীর সব মালুম আছে—

বললাম—আপনি করেন কী এখানে?

পাঁড়েজী কথাটা যেন বুঝতে পারলে না। আমার দিকে বিমূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বুঝিয়ে বললাম—আপনি এখানে চাকরি-বাকরি করেন, না আর কিছু করেন—আপনার পেশা কি?

পাঁড়েজী বললে—না বাবুজী, আমি স্রেফ ভোজন করি—পুষ্করজীর কিরূপায় ভোজনই আমার পেশা—

কথাটা বলে পেশা-কৌলীন্যের গর্বে নিজেই যেন গর্বিত হয়ে উঠলো দামোদর পাণ্ডে।

তারপর বললে—নন্দ্‌কিশোরবাবুকে চেনেন? কলকাতার নন্দ্‌কিশোরবাবু?

চিনতে পারলাম না।

পাঁড়েজী বললে—সেকি বাবুজী, কলকাতার অত বড় শেঠ, চেনেন না? বড়বাজারে গদী আছে—এখানে এসে ভোজন করিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণের ওপর ভারি ভক্তি ওঁর আওরাতের, পাঁচ সের দহি, আধ মণ আটার পুরি, লাড্ড্‌, দহিবড়া, ভোজন দেখে তারিফ করলেন খুব, শেষে দশ টাকা ভোজন দক্ষিণা···

লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছিল হয়ত পাঁড়েজী। বাধা দিয়ে বললাম—আচ্ছা উপাধ্যায় মশাই আসুক, তাকে সব ব্যবস্থা করতে বলেছি।—

রাত্তির বেলা উপাধ্যায় বললেন—পাঁড়ে এসেছিল নাকি সকালে?

ধর্মশালার ম্যানেজার উপাধ্যায় তখন খাটিয়ায় শোবার উদ্যোগ করছিলেন। বললেন—তাহলে কালই ব্যবস্থা করে দেব সব—কি বলেন?

বললাম—কাল সন্ধ্যেবেলা যে চিতোর যাচ্ছি—

উপাধ্যায় বললেন—গাড়ি তো রাত্তিরে, সকালেই ভোজন হয়ে যাবে, বেলা বারোটার সময় যদি করেন তো আড়াইটার মধ্যে পাতা চেটে পুটে সাফ করে দেবে দেখবেন—আজ বলে রেখেছি যেন সমস্ত দিনটা উপোস দেয়—

অবাক হয়ে গেলাম। উপোস? কাল খাবে, তার জন্যে আজ থেকে উপোস?

—আজ্ঞে উপোস না দিলে কাল পাঁচ জনের খাওয়া খাবে কি করে? মানুষের পেট তো বটে, সব দিন কি সমান ক্ষিদে থাকে? আর আজকাল তো সব ভেজালের খাবার, এই আজমীরেই আমরা সেকালে চার আনা সের খাঁটি ভয়সা ঘি কিনেছি। বড় বড় বোম্বাই আঁবের মত লাড্ড্‌ এক পয়সায় এক গণ্ডা, কত খাবেন খান, এখন দহিবড়াতে পর্যন্ত ভেজাল শুরু হয়েছে। অসুবিধে হয়েছে পাঁড়ের মত লোকদেরই, তেমন ভোজনের ভেল্কিবাজী দেখাতে পারে না, খেয়ে উঠে এখন ছোট্ট্‌লাল্পের হজমী বড়ি খেতে হয়। বড় বিপদে পড়েছে হুঁজুর ওরা।

বললাম—তা এত পেশা থাকতে খাওয়ার পেশাই বা ধরলে কেন পাঁড়েজী?

বাঙ্গালী ধর্মশালার অন্য সব ঘর খালি পড়েই ছিল। অল্পস্বল্প শীত পড়েছে। সন্ধ্যে থেকেই চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে যায়। উপাধ্যায়েরও বিশেষ কোনও

কাজ থাকে না। ক'দিন ধরে অনেক গল্প হয়েছে উপাধ্যায়ের সঙ্গে। উপাধ্যায় বললেন—আপনি খাটিয়াটায় বসুন বাবুসাহেব, আপনাকে বলি—

আজো মনে আছে সেই সুদূর রাজপুতানার একটি ধর্মশালার সেই রাতটার কথা। গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। দূরে যোধপুরের পাহাড়ের সীমারেখাটা পশ্চিম দিকের আকাশটা আড়াল করে আছে। আর দক্ষিণ দিকের তারাগড়ের উঁচু বসতির মাথায় একটা একটা করে সব আলো নিভে গিয়েছে। আজমীর জংশনে শেষ রাত্রের কয়েকটা ট্রেন রাত্রির স্তব্ধতা চিরে খান খান করে দেয়। কিন্তু আমি তখন সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। ভোজপুর কোথায়, কোথায় কনৌজ কিছুই আমার ঠিক নেই। পশ্চিম জনপদের কোন্ গ্রামে বুঝি রায়গড়ের রাজা ঠাকুর সাহেব এসেছে। শিকারে ঠাকুর সাহেবের ভারি শখ। ছাউনি পড়েছে নর্মদা নদীর তীরে। সেই ছাউনি থেকে বন্ধু-বান্ধব ইয়ারবক্সী নিয়ে দুটো বাঘ মেরে নিয়ে এসেছেন কাছারি বাড়িতে। উৎসব চলছে তারই। যারা ঢাক-ঢোল ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘকে ঘিরে বন্দুকের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিল তাদেরই খাওয়ানো হচ্ছিল। তা প্রায় শ' দুই তিন লোক হবে। পোলাও, লাড্ডু, ভাজি, দহি, গুলাবজামুন কিছু আর বাকি নেই। সব লোক উপোসী ছারপোকার মত চেটে-পুটে খাচ্ছে। নর্মদাপ্রসাদ হুকুম দিয়েছেন—যার যত খুশী পেট ভরে খাও—যে যত চাইবে তাকে তত দাও—

সবাই খাচ্ছে। কোনও দিকে চেয়ে দেখবার ফুরসৎ নেই কারো। শেষকালে পেট ভরে এল। ভাঁড়ার খালি হয়ে এল। উদ্গার তুলতে তুলতে সবাই সেলাম করে গেল ঠাকুর সাহেবকে।

কিন্তু একজন তখনও ওঠেনি। আরও দাও কিছু। লাড্ডু কি গুলাবজামুন, কি পেঁড়া, কি দহি।

আর তো কিছু নেই। কোথায় পাবো আর। সব তো নিঃশেষ হয়ে গেছে।

খবর গেল ঠাকুর সাহেবের কাছে। একজন এখনও অতৃপ্ত রয়েছে।

—কে সে?

—হুঁজুর, বিটের লোক, এই মহল্লাতেই বাড়ি, হুঁজুরের প্রজা!

দেখতে হচ্ছে কেমন প্রজা, কেমন তাজ্জব খাইয়ে। সব খেয়ে উজাড় করে দেয়!

সামনে এসে হাণ্টার ঘোরাতে ঘোরাতে নর্মদাপ্রসাদ বললেন—কৌন্ হায় তুম? তুমি কে? নাম কি তোমার?

হুঁজুরের প্রজাটি তখন শূন্য পাতা সামনে রেখে চুপ করে বসে ছিল।

বললে—হুঁজুর, আমি দামোদর পাণ্ডে, ব্রাহ্মণ।

হুঁ। নর্মদাপ্রসাদ ভাবলেন খানিকক্ষণ। বললেন—পেট ভরেনি তোমার?

—হুঁজুর, না।

—আরো খেতে পারো?

—জি, হাঁ।

—আর কত খেতে পারো?

—হুঁজুর যত দেবেন!

হুঁজুর আবার ভাবলেন। অজ পল্লীগ্রামের ভেতর কাছারিবাড়ি। হালুয়াই-এর দোকান কাছাকাছি কোথাও নেই। শহর তিরিশ ক্রোশ দূরে। মোসাহেব বন্ধু ইয়ারবক্সী—সবাই পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তারাও সব শুনছিল।

হুঁজুর বললেন—আমার সঙ্গে রাজবাড়িতে যাবে? চাকরি করবে?

দামোদর পাণ্ডে তখন বেকার। শুধু নিজের পেটের ভাবনাতেই অস্থির। দু'বেলা খেতে পায় না। কিন্তু বিশ্বগ্রাসী ক্ষিধে। এমন লোককে চাকরির লোভ দেখানো। এ যেন সেই 'ভুলো খাবি, না আঁচাবো কোথা'—সেই অবস্থা।

একবার শুধু দামোদর বললে—কী কাজ করতে হবে হুঁজুর? আমি তো লেখা-পড়া জানি না—নাম সই করতেও পারি না—

ঠাকুর সাহেব বললেন,—লেখা-পড়া নয়, শুধু ভোজন করতে হবে—

ভোজন! সেটা আবার একটা কাজ!

দামোদর দল-বলের সঙ্গেই রওনা দিলে। তিরিশ ক্রোশ দূরে রায়গড়ে ঠাকুর সাহেবের রাজবাড়ি। রাজবাড়ি তো রাজবাড়িই। এলাহি কাণ্ড। ঠাকুর সাহেব কাঁচা বয়েসের লোক। দেদার পয়সা, দেদার প্রতিপত্তি। মোসায়েব, ইয়ারবক্সীর দল বসে বসে খায়। আর ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়। তাই-ই তাদের কাজ। গান গাইবার, বাজনা বাজাবার লোক আছে। দরকার হলে মুজ্‌রো দিয়ে বাঈজী আনানো হয়। নাচ হয়। গান হয়। আর মাঝে মাঝে শিকার। ঠাকুর সাহেবের হাতি আছে, কুকুরের দল আছে, হরিণ আছে, বাঘ, সিংহ, পাখী আছে। বন্দুক, রাইফেল, মটরগাড়ি, পাল্কী, সাইকেল সব আছে। সবই ছিল, সবই আছে। ছিল না শুধু একটি জিনিস। একটি জিনিসেরই শুধু অভাব ছিল। তা-ও এল। এল দামোদর পাণ্ডে। করে কী? না ভোজন করে।

সকালবেলা ঘুম থেকে দেরি করে ওঠেন ঠাকুর সাহেব। দেওয়ানজীই সব কাজ

করেন। বাকি দু' একটা কাজ-কারবার যা-কিছু করবার তা ঠিক যোগাড়-যন্ত্র করে দিতে হবে ঠাকুর সাহেবের মুখের কাছে। কোথায় সই করতে হবে তা-ও আঙুল বসিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। কাজে দেরি হলে আড্ডার মেজাজই নষ্ট হয়ে যাবে তাঁর। ফুর্তি আর জমবে না। তারপর এসে বসবেন আড্ডা-ঘরে। এটা রাজবাড়ি থেকে আলাদা। অনেকগুলো ঘর ওপরে-নিচেয়। সাহেব-ঠিকেদার অনেক টাকা নিয়ে বানিয়ে দিয়েছে এ-বাড়ি।

প্রথম দিনই পরথ হয়ে গেল। মনে পড়লো দামোদর পাণ্ডের কথা। ডাক পড়লো তার। আজব লোক এসেছে রাজবাড়িতে। অকর্মা লোকের ভীড়ে ভরে গেল ঘর-বাড়ি। পেকাটি চেহারার মানুষটা এমন কী খেতে পারবে!

ঠাকুর সাহেব নর্মদাপ্রসাদ তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন। পান-কিমামের হরির লুট চলছে।

দামোদর পাণ্ডে গিয়ে হাজির হলো। যথারীতি সেলাম করে দাঁড়ালো।

নর্মদাপ্রসাদ বললেন—বিশ সের জিলেবী খেতে পারবে পাঁড়ে?

—জী হাঁ—

করজোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দামোদর। অনেক দিন জিলেবি খাওয়া হয়নি। লোভও হলো।

সবার চোখ কপালে উঠলো। আধ মণ জিলেবি খাবে!

তবে বলে এসো হালুয়াইকে। পাকি বিশ সের জিলেবি। রস বাদ দিয়ে। ঠাকুর সাহেবের লোকের সামনে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে মাপ হবে মশলা। হিসেবে কোথাও গোলমাল না থাকে। বিকেলবেলা আসর বসবে রাজবাড়িতে। সেখানেই দামোদর খেলা দেখাবে!

বিকেলবেলা উঠোনে চাঁদোয়া পড়লো। কৃষাণ, মজুর, চাকর, বাবু, মোসায়েব সকলে এসে ভীড় করেছে। লোকের ভীড়। বাবু নর্মদাপ্রসাদ পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন। পান-কিমাম চলছে হরদম। দামোদর পাণ্ডে এসে বসলো মধ্যেখানে। তারপর জিলেবির হাঁড়া এসে বসলো। দামোদর সকলের দিকে একবার চেয়ে নিলে। ঠাকুর সাহেবকে সেলাম করলে। অসংখ্য চোখ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তারপর শুরু হলো খেলা।

এক-একটা জিলেবি মুখে পোরে দামোদর আর মুখের মধ্যে মিলিয়ে যায় নিঃশব্দে। নরম সোনালী রংয়ের জিলেবি। আধ-গরম। চিবোতেও হয় না, কামড়াতেও হয় না। শুধু খেয়ে যাও।

খাওয়া চলতে লাগলো নিঃশব্দে। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছে। হাতে তুলে জিলেবি মুখে পোরে দামোদর আর সকলের চোখও তালে তালে ওঠে আর নামে। বিশ সের জিলেবি। মোটা মোটা সাইজ। গড়ে সের-এ তিরিশখানা। সবশুদ্ধ ছশো জিলেবি। বিকেল তিনটের সময় শুরু হয়েছে আর শেষ হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। শেষ জিলেবিটা মুখে পুরতেই ঠাকুর সাহেব বললেন—সাবাস ওস্তাদ সাবাস—জীতা রহো—

মাথা নিচু করে আর একবার সেলাম করলে দামোদর।

ঠাকুর সাহেব হুকুম দিলেন ইনাম পাবে দামোদর। সিল্কের দামী পাগড়ি পরিয়ে দিলেন ঠাকুর সাহেব। আর শহর থেকে আসবে বাদামী রং-এর নাগরা জুতো।

সভার সমস্ত লোক তাজ্জব হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা ঠাকুর সাহেব একবার ডেকে পাঠালেন। বললেন—কিছু হজমী গুলীটুলি খাবে নাকি পাঁড়ে—আছে আমার কাছে—

দামোদর বললে—দরকার হবে না হুঁজুর—

অনেক রাত্রে রসুইখানা থেকে লোক এল। বললে—আজ খানা খাবে নাকি পাঁড়েজী?

দামোদর বললে—খানা খাবো না তো কি উপোস করবো?

এর পর দামোদরের নাম রটে গেল চারদিকে। নর্মদাপ্রসাদেরও নাম হলো। সবাই বলে—বাবু বটে বাবু নর্মদাপ্রসাদ। সবাই দেখতে চায় দামোদরকে। জেলার হাকিম সাহেব মাঝে মাঝে আসতেন এখানে। সরেজমিনে তদন্ত করবার দরকার, হয় তাঁর।

শুনে বলেন—ভারি তাজ্জব তো! আধ মণ জিলেবি? দেখাতে পারেন?

বাবু নর্মদাপ্রসাদ বলেন—যে দিন স্যারের খুশী দেখাবো—

ডাক পড়লো দামোদরের। বোলাও পাঁড়েজীকো। দামোদর এসে সেলাম করলো দু'জনকেই। পেঁকাটির মত চেহারা। সাহেব আপাদমস্তক দেখলো। বললে—লুকস্ লাইক এ পিগ্‌মি—

ইংরেজি বুঝলো না দামোদর।

বাবু নর্মদাপ্রসাদ বললেন—খাবে কিন্তু রাক্ষসের মত স্যার—

রাক্ষস! নর্মদাপ্রসাদ ঐশ্বর্যগর্বে হাসতে লাগলেন।

সাহেব বললে—ভাত-ডাল খায়?

—আজ্ঞে স্যার ভাত-ডালই তো খায়, কিন্তু দরকার হলে পেটটাকে একেবারে

জালা বানিয়ে নিতে পারে! কোত্থেকে যে এত খেতে পারে, সব গব্ গব্ করে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে উধাও—

—কোত্থেকে পেলে একে বাবু?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দেখতে চাইলেন। এবার জিলেবি নয় লাড্ডু, লাড্ডু খেতে হবে আধ মণ। খেতে পারলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বখ্‌শিস দেবেন পাঁচ টাকা।

তা আয়োজন হলো আবার। হালুয়াই ডেকে ফরমাইজ হলো। বিকেল বেলাই বানিয়ে দিতে হবে। সামনে ওজন করে নেওয়া হলো মাল। আবার লোকের ভিড় জমে গেল চারদিকে। মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেতে হলো এবার! বেশ শক্ত ব্যাপার। তা দামোদর পাণ্ডে পেছ-পা নয়, পারলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইনাম দিলে পাঁচ টাকা। ধন্য ধন্য পড়ে গেল রাজ্যময়।

এমনি কি একবার? আজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, কাল ঠাকুরসাহেবের ভাতিজা, পরশু পাশের গাঁয়ের জমীদার। যে শোনে সেই একবার দেখতে চায়। তাকেই খেলা দেখাতে হয়। ইনাম আসে। খাতির বাড়ে।

একদিন এ-বাড়িতে যখন প্রথম মটর গাড়ি এসেছিল, সেদিনও এমনি তারিফ হয়েছিল। মটর গাড়ি দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। ভোঁ শব্দ শুনলেই ছেলে মেয়ে বুড়ো মদ্দ দাঁড়াতো এসে রাস্তায়। বাঘ মেরে আনলেও এমনি ভীড় হয়। এমনি তারিফ হয়। ঠাকুর সাহেবের চিড়িয়াখানায় যখন প্রথম সিংহ এল জুনাগড়ের জঙ্গল থেকে সেদিনও ভীড় ঠেলে রাখতে হয়েছিল। দামোদর পাণ্ডেও তাদের মতন একজন। ঠাকুর সাহেবের দুদিনের খেয়াল, প্রথম প্রথম খুব খাতির খুব তারিফ। দামোদরকে নিয়ে মাথায় তুলে রাখলেন নর্মদাপ্রসাদ। দামোদরের খাওয়া-থাকার যেন ত্রুটি না হয়। তদ্বির-তরিবতের কোনও ফাঁক না থাকে।......

এমনি সময় এক কাণ্ড ঘটলো। লালাবাবুর জীবনে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। যারা পরে মহাপুরুষ হবে বাবুজী, তাদের সকলের জীবনে এমন ঘটনাই ঘটে থাকে। ও তুলসীদাসই বলুন আর সুরদাসই বলুন আর ভক্ত কবীর কি রামদাসই বলুন, ভগবান যে কখন কোন্ ভক্তকে কিরূপ কিরূপা করেন কে বলতে পারে। ভগবানের আর এক নাম জনার্দন! তাই তো শাস্ত্রে লিখেছে—ভোজনে চ জনার্দন :—

উপাধ্যায় থামলেন। বললেন—রাত কত হলো?

মনে আছে আজমীর জংশনের শেষ ট্রেনটা তখন হুস্ হুস্ করতে করতে চলে গেল। সদর রাস্তায় সিন্ধিদের পাঁউরুটির দোকানে তখন ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল শেষবারের মত।

উপাধ্যায় বললেন—আপনি পাঁড়েকে দেখলেন তো আজ সকালে। ওকে দেখলে মনে হবে সাধারণ পেটুক বামুন একটা, খাওয়ার জন্তে খুব নোলা, কিন্তু······

উপাধ্যায় আবার বললেন—পাঁড়ের কাছ থেকেই এ-সব শোনা, তখনো তো ওর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি আমার। যখন আলাপ হলো, তখন দামোদরের বয়েস হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে একটু একটু, আবুপাহাড়ে অচ্ছলগড়ের ওপর স্বামী তুরীয়ানন্দর আখড়া, দেখি সেইখানে গাঁজা খাচ্ছে, শংখিয়া খাচ্ছে আর ছাইভস্ম মেখে ধুনির সামনে পড়ে আছে ওই পাঁড়ে—

বললাম—শংখিয়া কী ?

উপাধ্যায় বললেন—একরকম শাঁখ আর কি, পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই খায় সাধুরা, সে খেলে মাঘ মাসের শীতে পুষ্করতীর্থে স্নান করলেও ঘাম মরবে না গায়ের এমনি গরম তার—তা ধরুন তখন ক্ষিধে কমাবার তপস্যা করছে দামোদর—

বললাম—কেন ?

উপাধ্যায় বললেন—তা হলে আপনাকে গোড়া থেকেই বলি বাবুজি—আমিও তো তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম কিনা, আখড়ায় যারা আসে তারা ভগবান পেতেই আসে, মুক্তি পেতেই আসে, ভজন পূজন করতে আসে, ভবসংসারকে ত্যাগ করে বিশ্বসংসারকে পেতে চায়, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম হুজুর, এ আর কিছু চায় না, শুধু ভুখ ভুলতে চায়, আগুনের মত ভুখ্, তার বিশ্বগ্রাসী ভুখার নেশায় তার অশান্তির যেন একশেষ।

আমিও তো সাধু হবো বলেই আখড়ায় গিয়েছিলাম। গিয়ে পাঁড়েকে দেখে তো অবাক ! এমন সমস্যাও আছে দুনিয়ায় ! ভাবলাম দিন দুনিয়ার মালিকের এ কী খেলা ! একদিন জিজ্ঞেস করলাম—পাঁড়েকে তিন ছিলুম গাঁজা আর শংখিয়া খাইয়ে সেদিন চেপে ধরলাম—ব্যাপারটা বলতেই হবে পাঁড়েজি !

সেইদিনই পাঁড়ের গল্পটা শুনলাম হুঁজুর।

তাই তো বলছিলাম, পুষ্করজী কোন্ ভক্তকে কী কিরূপা করেন তার মহিমা কে বুঝতে পারে বাবুজী ! সেই সময়ে ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে তো আছে পাঁড়ে। খেয়ে খেয়ে মহা ফুর্তিতে আছে তখন। আজ জিলেবি, কাল লাড্ডু, পরশু পেঁড়া, তার পরদিন গুলাবজামুন, কালাকান্দ্—এমনি রোজ হররবখ্ত। কেবল খাও। খেয়ে হজম্ করতে পারলেই চাকরি রইল।

গাঁজায় দম্ দিয়ে পাঁড়ে বললে—কিন্তু একদিন এক কাণ্ড বাধলো। একেবারে খাস রাণীমহল থেকে ডাক এল। রাণী নিজের মহলে বসে খাওয়াবে। সামনে বসে খেলা দেখাতে হবে। রাণীর শখ !

ঠাকুর সাহেব তো হুকুম দিলেন। কিন্তু বিপদ হলো আমার। বিকেল তখন তিনটে। ঠাকুর সাহেবের লোক এল ডাকতে। এসে পুরু দু'পাট কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। অন্দরমহলের গোড়ার এসে বারমহলের লোক বাঁদীর হাতে আমাকে জিম্মা করে দিলে। তারপর সেই বাঁদীর হাত ধরে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে যাওয়া কোনও দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শব্দ কানে শুনতে পাই। তা-ও আমি কাছে যেতেই সব চুপ। তারপর এক জায়গায় এসে মনে হলো এতক্ষণে যেন রাণীমহলে এসে পড়েছি। কী গলার শব্দ! যেন বাঁশি বাজছে। গলার শব্দ শুনে বয়েস ঠাহর করে নিতে হয়। নর্মদাপ্রসাদ শৌখিন লোক। শখের তাঁর শেষ নেই। হাজারো-শখ। বাঘের শখ, সিংহের শখ, শিকারের শখ, টাকা, নওকর, দৌলত শুধু নয়, আওরাতেরও শখ। শখের ঝোঁকে অনেক সাদী করেছেন। সুন্দরী সুন্দরী আওরাত। কেউ তাদের কখনও দেখেনি। দেখা তাদের যায় না। তাদের দেখতে নেই। দেখলে ইজ্জত চলে যায়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, কেউ দেখবে না। পুরুষ মানুষের দেখা পাপ! দেখবে শুধু একজন পুরুষ! সে তাদের মালিক। মালিক ঠাকুর সাহেব নর্মদাপ্রসাদ। রাত দশটার পর একমাত্র নর্মদাপ্রসাদই রাণীমহলে ঢুকবেন। ছয় রাণী নিয়ে তাঁর রাণীমহল!

শুনেছিলাম ছয় রাণীর ছটা মহল নাকি আলাদা আলাদা। এক-এক রাণীর দু'টো করে বাঁদী আর একটা করে নোক্‌রাণী।

নর্মদাপ্রসাদের শোবার ঘর ছিল আলাদা মহলে। সেখানে সব ব্যবস্থা আলাদা। এক এক রাণী পালা করে দু'মাস তার সঙ্গে কাটাবে। দু' মাস ফুরিয়ে গেলে আর এক রাণী গিয়ে উঠবে ঠাকুর সাহেবের মহলে। এমনি করে বছর কাটবে। কিন্তু সেই দু' মাস আরামের একেবারে অফুরন্ত বন্দোবস্ত। গোলাপ জলে স্নান করে রাজার সঙ্গে বিহার করবে। পানের সঙ্গে কস্তুরী, রূপোর থালায় ভাত, হাতীর দাঁতের পালঙ্কে শয়ন। ছ'টা বাঁদী, চারটে নোক্‌রানী,—কত আর বলবো, সব কি দেখেছি! শোনা কথা হুঁজুর—শোনা কথা সব। তারপর দু' মাস এমনি কাটবার পর আবার নামতে হবে নিজের মহলে। তখন অন্য রাণীর পালা। তখন আবার কুয়োর জলে স্নান, কাঁসার থালায় ভাত খাওয়া, পানের সঙ্গে কিমাম্—যে-কে-সেই!

তা আমার ডাক যে কোন্ রাণীর কাছে পড়েছে কে জানে!

যাচ্ছি তো বাঁদীর সঙ্গে। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। কোন্ সিঁড়ি পেরিয়ে কোন্ সিঁড়িতে উঠছি কিছুই টের পাচ্ছি না। চোখ তো আমার দু'পাট কাপড় দিয়ে

বাঁধা। শেষে একটা মহলে এসে আমায় থামতে হলো! সেখানে গোলাপ-গন্ধ বাতাসে। রেডিও বাজছিল ঘরে। সিল্কের শাড়ির খস্ খস্ শব্দ হলো। চুড়ি, বাজু, তাগার ঝম্ ঝম্ শব্দ। কে যেন নড়ছে। মনে হলো রাণীসাহেবা যেন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে। রাণীর খাস বাঁদী আমাকে বললে—খা লেও—গুলাবজামুন খা লেও—আঁধা মণ গুলাবজামুনকা খেল্ দেখাও—

আমি সামনে হাতড়ে দেখলাম গামলায় ভর্তি গুলাবজামুন। একটা-একটা করে খেতে লাগলুম। খেতে আর কী কষ্ট। আর খাওয়াই তো চাকরি আমার। খেতেই হবে। না খেতে পারলে ঠাকুর সাহেবের অপমান। জান্ দিয়েও খেতে হবে আমাকে! না খেলে ছাড়ছে কে! তা খেলুম আধ মণ গুলাবজামুন।

হাত ধোবার জল এল। তারিফ করবার লোক কেবল একজন। তারপর এক সময়ে আমি খাওয়া শেষ করে আবার ফিরে এলুম। বাঁদী আমার হাত ধরে আবার পৌঁছে দিয়ে গেল বারমহলে। সেখানে বারমহলের চাকর এসে বাইরে এনে চোখের কাপড় খুলে দিলে। কোথা দিয়ে গেলুম, কোথা দিয়ে এলুম, কাকে খেলা দেখালুম কী রকম দেখতে তাকে কিছুই মালুম হলো না।

ঠাকুর সাহেব আবার একদিন বললেন—পাঁড়ে, মেজরাণী ধরেছেন, আবার একদিন খাওয়া দেখবে, গুলাবজামুন তিনিও খাওয়াবেন তোমাকে, তবে বিশ সের নয়, একুশ সের, এবার এক সের বেশি—পারবে তো পাঁড়ে?

রাজি হতে হলো। রাজি না হলে উপায়ও নেই।

তা সেদিনও তেমনি। তেমনি করে ভু'পাট করে কাপড় চোখে বেঁধে গেলুম বাঁদীর হাত ধরে রাণীমহলে। এবার আর ঠাকুর সাহেবের মহল নয়। এবার তেমন সুগন্ধ নেই বাতাসে। তেমন নিঃশব্দ আবহাওয়া নয়। এবারও কোন কথা নেই, কোনও উচ্চবাচ্য নেই। একুশ সের গুলাবজামুন খেয়ে নিঃশব্দে চলে এলুম। চাকরি বজায় রইল।

এমনি করে আবার একবার ডাক পড়লো রাণীমহলে। এবার সেজরাণীর ডাক। সেবার বাইশ সের গুলাবজামুন। আরো এক সের বেশি। কেউ কারো কাছে হারবে না। না-হারুক, আমিও খেয়ে এলুম নিঃশব্দে। আমার কাছে আধ মণও যা, বাইশ সেরও তাই।

এমনি করে পাঁচ জন রাণীর কাছে খাওয়ার পর ছোটরাণীর পালা।

পাঁড়ে বললে—এই ছোটরাণীর বেলাতেই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। ছোটরাণী

খাওয়ালেন পঁচিশ সের গুলাবজামুন। খেয়ে দেয়ে হাত ধুয়ে যখন উঠছি হঠাৎ মনে হলো—ছোটরাণী কথা বললেন—

—পান লিজিয়ে বাবু—

আহা, কান যেন জুড়িয়ে গেল। ভারি মিষ্টি গলা। কোনও রাণীর গলাই শুনিনি। কিন্তু তবু যেন মনে হলো—ছোটরাণীকেই দেখতে বুঝি সবচেয়ে সুন্দরী। শব্দের মধ্যে দিয়ে যেন দেখতে পেলাম তাকে।

পানের খিলিটা হাতে নিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু ছোটরাণী বললেন—বাঁহার যা কর্ খুল কর্ দেখিয়ে গা বাবুজী—

বলেই তিনি চলে গেলেন। তারপর বাঁদীকে ডেকে আমায় বাইরে নিয়ে যেতে বললেন।

বাইরে চোখের কাপড় খুলে নিজের ঘরে এসে পানের খিলিটা খুললাম। খিলির ভেতর একটা কাগজ। আমি তো অবাক। ভাঁজে ভাঁজে কাগজটা ভেতরে পোরা ছিল। ভাঁজ খুলে দেখলাম—কি যেন তাতে লেখা রয়েছে। কিছুই বুঝতে পারলাম না হুজুর। নিজের নামটা সই করতে পারি না, লেখা-পড়া তো দূরের কথা। কাকে দিয়ে পড়িয়ে নেব! কি এতে লেখা আছে! যদি কোনও গোপন কথা হয়! কাগজটা ভাঁজ করে ফতুয়ার পকেটে রেখে দিলাম হুঁজুর। কি জানি যদি কেউ দেখে ফেলে।

ঠাকুর সাহেব সেদিনও জিজ্ঞেস করলো—খেতে পেরেছ পাঁড়ে? বললাম—জী হ্যাঁ।

ঠাকুর সাহেব খুশী হলেন। বললেন—সাবাস ওস্তাদ, জীতা রহো—

কিন্তু রাত্রে ঘরে এসে আবার সেই চিঠিটা খুললাম! কালিতে লেখা কয়েকটা অক্ষর। আমার কাছে তার কোনও অর্থই নেই। আমি হুঁজুর, সেই-ই প্রথম কাঁদলুম এই ভেবে যে, কেন আমি লেখা-পড়া শিখিনি! আমি এ-চিঠির কী উত্তর দেব! উত্তর যদি দিতেই হয় তো লিখবো কী করে! চিঠিটা পকেটে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর দিনও সমস্ত দিন ভাবতে লাগলাম। সমস্ত দিনটাই ভেবে কেটে গেল। ভেবে কিছু কূলকিনারা করতে পারলাম না। শুধু ভাবি! একবার মনে হয়, কিসের চিঠি হতে পারে! ব্যাপার যে গোপনীয় তা বুঝতে পেরেছিলাম। রাজবাড়ির রাণী পানের মধ্যে পুরে চিঠি দিয়েছে—এ সামান্য ব্যাপার হতে পারে না। কিন্তু কে জানিয়ে দেবে, কি লেখা আছে এতে! আকাশ-পাতাল ভাবনা। ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে এল আমার। দিন যায় আর ভাবনা বাড়ে। মনে হয় যদি আবার কখনও চিঠি আসে আর একটা! কি বল্‌বো! কাকে জানাই। আমার তো ভেবে ভেবে খাওয়া কমে

এল হুঁজুর। তেমন পেট চন্ চন্-করা ক্ষিদে আর লাগে না। মেজাজ, তবিয়ৎ, শির সব খারাপ হয়ে গেল।

ঠাকুর সাহেব চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তবিয়ৎ ঠিক আছে তো পাঁড়ে?

ঠাকুর সাহেবের মুন্সীর কাছে গিয়ে একদিন বললাম—আমাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে দেবে মুন্সীজী?

মুন্সীজী হাসলেন। বললে—লেখা-পড়া শিখে কি করবে পাঁড়েজী, তোমার যা বিদ্যে তাই আমাকে শিখিয়ে দিতে পারতে যদি!

কী করি। নিজেই একদিন হিন্দীর পহেলী-কেতাব কিনে আনলাম। অনেক করে শেখবার চেষ্টা করলাম হুঁজুর। বড় শক্ত কাম। দেখলাম ও নিজে নিজে শেখবার কাম নয়। তবু চিঠির অক্ষরের সঙ্গে পহেলী কেতাবের অক্ষরগুলো মিলিয়ে দেখি যদি বুঝতে পারি। কিন্তু কিছু ফায়দা হলো না। দিনরাত সেই চিঠিটা বুকে করে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। ভগবানের নাম কখনও আগে মুখে আনিনি। ঈশ্বরের নাম সেই প্রথম করলাম জীবনে হুজুর। ভগবান কি সোজা মানুষ। বাঁকা পথে আসেন যে। সোজা পথে এলে যে তাঁকে সহজে পাওয়া হয়। যা সহজে পাই তা যে শিগগির হারাই। রাতের বেলা শহরের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সব শব্দ যখন থেমে গেছে, তখন শুধু আমি জেগে থাকি। আমার ঘরের ছোট জানালাটা খুলে আকাশটার দিকে চেয়ে দেখি ভগবানকে দেখা যায় কি না। ভগবান অত সহজে যদি দেখা দিত, তবে আর ভাবনা ছিল না। আর এত লোক থাকতে আমাকে দেখা দেবেন তাই-ই বা কেমন করে হয়। আমার আর কী পুণ্য আছে। জানি আমি কী! কোনও গুণই তো নেই আমার! টাকা-কড়ি নেই, রূপ-যৌবন নেই, বাড়ি-গাড়ি কিছুই নেই। লেখা-পড়াটাও জানি না। 'ক' বলতে জিব বেরিয়ে আসে। ঠিক পেল্লাদের উল্টো! পেল্লাদকে চেনেন তো! হিরণ্যকশিপুর ছেলে। সে 'ক' বলতে কেষ্ট বলতো। আর আমার 'ক' বলতে মাথায় বাজ পড়ে!

যাক, সেই রাত্তিরে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নজরে পড়লো ঠাকুর সাহেবের মহলটা। আকাশের গায়ে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা চেহারা। ঠাকুর সাহেবের খাসমহলে আলো নিভতো একটু বেশি রাত্তিরে। খাসরাণী তখন যে ছিল তারই সৌভাগ্য। সেই বরাদ্দ দু'টি মাসের জন্যে। আর-আর রাণীদের মহল তখন অন্ধকার। আমি দূর থেকে চেয়ে দেখতাম—অত বড় রাজপ্রাসাদের কোন্ ঘরের, কোন্ প্রাণীটি চিঠির উত্তরের প্রত্যাশা করছে। মনে হতো যদি আকাশের তারায় তারায় সে-চিঠির অক্ষরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতো। মানে বোঝা

যেতো চিঠির। কিন্তু মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে আসতো। নর্মদাপ্রসাদ যেতেন শিকারে, যেতেন বন-ভোজনে। আমরা সবাই যেতাম সঙ্গে। আমরা ইয়ারবক্সীর দল মহারাজের অবসরটুকু ভরিয়ে দিতাম বৈচিত্র্য দিয়ে। জীবন একঘেয়ে লাগলেই আমরা আছি। বাঘ, সিংহ, হরিণ, বন্ধু, মোসায়েব, ইয়ার-বক্সী, ছয় রাণী আর আমি।

সেবার কুম্ভমেলা হবে হরিদ্বারে। সবাই গেলাম। নর্মদাপ্রসাদের তাঁবু পড়লো। দলের সঙ্গে আমিও। লোক-লস্কর চাকর, নোওকর, খানা-পিনা, খানসামা, বাবুর্চি। বাবুরা ঠাকুর সাহেবকে ঘিরে গান-বাজনা নিয়ে ব্যস্ত। হারমোনিয়ম, রেডিও, বাঁয়া-তবলা, সেতার, সারেঙ্গি আরো কত কি! আমিও আছি সঙ্গে। সব কাজের মধ্যেই থাকি, কিন্তু সেই চিঠিটার কথা ভুলতে পারিনি। ফতুয়ার পকেটে চিঠিটা আছে সঙ্গে। সেটা হাত দিয়ে মাঝে মাঝে দেখি। লোক খুঁজে বেড়াই—কাকে পড়াবো, কাকে গোপন কথা বলা যাবে! কে তেমন বিশ্বাসী লোক। কাকে মনের সব কথা বলা যায়।

চারদিকে সাধুর আড্ডা। সারা দেশ থেকে সাধুরা এসেছে। নাগা সাধু, মেয়ে নাগা, মৌনী বাবা, পুরী, বন্, ভারতী কত সম্প্রদায়। ধুনী জ্বালে, লেট্টি বানায় একধারে বড় বড় রেডিওতে গীতা পাঠ হয়, গ্রামোফোনে ভজন হয়—

"ভজ হে মন হরে নাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম"

ফেরিওয়ালা গরম গরম জিলেবি ভাজছে, ঘিয়ে ভাজা পুরি গোছাগোছা উড়ছে জিলেবিওয়ালা বলছে—

জিলেবি কা বাবা জেলেবা
সের ভর্ খরিদ কর্ লে বাবা

এদিকে আমের পাহাড় নিয়ে বসে আমওয়ালা চিৎকার করছে—

আমে আম ভাই আমে আম
রামে রাম ভাই রামে রাম—

সব ছড়া। ছড়া দিয়ে গান দিয়ে সুর দিয়ে সবাই ভোলাতে চাইছে। একটা সাধুকে কয়েকজন চেলা ঘিরে বসে গাঁজা খাচ্ছে। ছাই মেখে বসে আছে সাধু। দেখে বড় ভক্তি হলো হুজুর। মনে হলো এমনি যদি সাধু হতে পারতাম এদের মতন। সব ত্যাগ করতে পারতাম। মিছি মিছি পেটের জন্যে ঠাকুর সাহেবের দাসত্ব করছি। জিলেবি খাওয়াবে ঠাকুরসাহেব, লাড্ডু খাওয়াবে তাই জন্যেই পড়ে

আছি চাকরের মত। সামান্য পোকা-পতঙ্গ তারাও স্বাধীন। কারো তাঁবে থাকে না তারা। নিজের ওপর ঘেন্না হতে লাগলো সব দেখে। অথচ এরা কারোর তোয়াক্কা করে না। এদের জামা-কাপড় লাগে না, তেল মাখবার দরকার হয় না, কারো মুখ চেয়ে এরা চলে না। খেতে পেলে খায়, নয় তো খেলেই না। আর আমি খাবার জন্যে হাঁ করে থাকি। পেট আমার সহজে ভরে না।

সাধুর দলে গিয়ে বসতেই সবাই হাঁ হাঁ করে চিম্‌টে নিয়ে তেড়ে এল। বলে—ভাগ্‌ বেটা—ভাগ্‌—ভাগ্‌ যা—

সরে এলাম কিন্তু দমে গেলাম না।

রোজই যেতে লাগলাম সাধুর কাছে। সকালে সন্ধ্যায় বিকেলে রাত্তিরে। হাতে কিছু না কিছু খাবার নিয়ে যাই। মালাই কি দহি কি আটা যা হোক কিছু একটা। ভোগ দিয়ে আসি কিন্তু আমলই দেয় না কেউ। ভজন গায় যখন, আমি হাত তালি দিই। তালে তালে মাথা নাড়াই। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাই—

"কাহে উমতলা হে তৈলক নাথ
নিত উগারিঅ নিত ভশম সাথ।"

হে ত্রৈলোক্য নাথ, তুমি কেন উন্মত্তভাবে সর্বদা ভস্ম মেখে উলঙ্গ হয়ে থাকো? কেন থাকো, কে বলে দেবে! তোমার কোনও আকর্ষণ নেই। তোমার রাগ নেই বিরাগ নেই। তোমার আকর্ষণ নেই বিকর্ষণ নেই। তুমি ভোলানাথ। ওই সাধুজীও তোমার মত সব মায়া ভুলতে পেরেছে! আমি গান গাইতে গাইতে মেতে উঠি। কেউ আর আমায় লক্ষ্য করে না। তারপর একসময়ে চুপি চুপি ফিরে এসে ঠাকুরসাহেবের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকে পড়ি। তাঁবুতে তখন ঠাকুর সাহেব ইয়ার-বন্ধু নিয়ে গান-বাজনা খানা-পিনায় ব্যস্ত। সবার চোখ লাল হয়ে আছে। কেউ আমায় দেখতে পেলে না।

সেদিন সকলের আড়ালে রাত্তির বেলা তাঁবু থেকে বেরুলাম। রাত তখন অনেক। বোধহয় দ্বিতীয় প্রহর। একা একা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে সাধুর আড্ডায় হাজির। সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একা সাধুজী তখন আগুনের সামনে বসে বসে ভাগবত গীতা পাঠ করছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"

তারপর আমাকে দেখেই সাধু বললে—কৌন্ হো তুম?

বললাম—আমি দামোদর পাণ্ডে বাবা,—ব্রাহ্মণ—

সাধুবাবা ধুনি থেকে একচিমটি ছাই নিয়ে হাতে দিয়ে বললে—লে, ভাগ্—

তবু বসে আছি দেখে সাধুবাবা আবার জিজ্ঞেস করলে—কুছ মাঙ্তে হো তুম্?

বললাম—একটু কিরূপা চাই বাবা—

সাধুবাবার দয়া হলো যেন। বললে—বোল্ জলদি বোল—

তখন বললাম—একটা খত্ পড়ে দিতে হবে বাবা, আমি লেখা-পড়ি জানিনা, নিরক্ষর মানুষ—

সাধুবাবা বললে—কেয়া খত্, কিস্‌কা খত্? লে আ—

পকেট থেকে চিঠিটা বার করতে গেলাম। কিন্তু খুঁজে পেলাম না। বুক পকেট, পাশের পকেট কোথাও নেই। আঁতি পাঁতি করে খুঁজতে লাগলাম। উল্টে-পাল্টে দেখলাম। মিথ্যে চেষ্টা। গেল কোথায়। মাথা গরম হয়ে গেল। অমন অমূল্য সম্পদ, দিন রাত কাছে নিয়ে, বুকে নিয়ে থেকেছি, এখন দরকারের সময়ে পাওয়া গেল না! আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। জামা যখন সাবান দিয়ে পরিষ্কার করেছি, তখন চিঠিটা রেখেছি ট্যাঁকে। আবার যখন জামা পরেছি তখন পকেটে তুলে রেখে দিয়েছি। তবে গেল কোথায়! এখন করি কী! তাঁবুতে কি ফেলে এলাম। রাত্রে তাঁবুতে ফিরে এসে সব জায়গা খুঁজলাম। অন্ধকারে কেউ না জেগে ওঠে। কেউ কি চুরি করলে। তবে কি কেউ পড়ে ফেলেছে! কী লেখা ছিল জেনে ফেলেছে! কোথায় গেল! সারা রাত চিঠির ভাবনায় আমার ঘুম এল না হুজুর। আমি কাঁদতে লাগলাম। নিজে পড়তে জানলে আর এমন হতো না। কান্নায় আমার বুক ফেটে জেরবার হয়ে গেল!

উপাধ্যায় থেমে বললেন—এমনি করে তো পাঁড়ে সে-চিঠি হারিয়েই ফেললে মশাই। তারপর কী তার মনে হলো কে জানে, যখন সাধুরা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে পাঁড়েও কাউকে না বলে কয়ে সাধুদের পেছু নিলে। রাজবাড়িতে ফিরে গিয়ে আর কী হবে! নিজের জীবনের ওপরেই তার অশ্রদ্ধা এসে গেল। মনে মনে ঠিক করলে ঠাকুরসাহেবের তাঁবুতে আর ফিরে যাবে না সে। সেখানে গিয়ে তো সেই কেবল তোষামুদি আর মোসায়েবি করা! তার চেয়ে কিছুর জন্যে তোষামুদি যদি করতেই হয় তো ভগবানের তোষামুদি করাই ভালো। যাতে লেখা-পড়া, জ্ঞান-ধর্ম হয়। দেখুন বাবুজি, এমনি করেই মহাপুরুষদের জীবনে পরিবর্তন আসে। তুলসীদাসেরও একদিন এমনি হয়েছিল। তা সাধুর দলের

সঙ্গে ভিড়ে তো পড়লো পাঁড়ে। কিন্তু চেলারা ওকে দলে নেবে কেন? চিম্‌টে দিয়ে তাড়া করতে আসে। তবু পেছু ছাড়ে না ও। তারা ট্রেনে উঠলো, দামোদরও ট্রেনে উঠলো। ট্রেনের এক কোণে বসে রইল। কেউ নজর করেনি। দামোদর কেবল ভাবছে সাধুর দলের সঙ্গে গিয়ে সাধুদের আখড়ায় গিয়ে শেষ জীবনটা ধর্ম-চর্চায় কাটিয়ে দেবে! এমনি করেই চলছে। কত ষ্টেশনের পর কত ষ্টেশন চলে গেল। সাধুরা গাঁজা খাচ্ছে। নানা লোক নানা-রকম খাবার দিয়ে যাচ্ছে, সব খাচ্ছে তারা। দামোদরের খুব ক্ষিদে পেল বাবুজি। দামোদরের ক্ষিদে আর তো যে-সে ক্ষিদে নয়। একেবারে হুতাশনের ক্ষিদে। চোখের সামনে দিয়ে ফেরিওয়ালার খঞ্চি চলে যায়, চোখ দুটো যেন দাউ দাউ করে ওঠে। জিবটা লক্ লক্ করে ফণা বিস্তার করতে চায়। কিন্তু কোমরের কাপড়টা দিয়ে কষে পেটটাকে বেঁধে ক্ষিদে চাপতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ভোলা কি যায়? ওর নাম যে দামোদর হুজুর, উদরের কথা কি ভুলতে পারে ও? প্রহ্লাদ কি হরির নাম ভুলতে পেরেছিল? তার বাপ তো কত চেষ্টা করলে—বলুন।

তা এমনি করেই সাধুর দলের সঙ্গে হয়ত দামোদর কেদার বদরী কি নেপাল তিব্বতে কোথাও চলে যেত কিন্তু আজমীর ষ্টেশনে এসেই ধরা পড়ে গেল। চেলাদের নজরে পড়লো বাজে লোক তাদের সঙ্গে চলেছে। সবাই মিলে জোর করে দিলে নামিয়ে এই আজমীর জংশনে। ভগবানের মহিমা বোঝে দিন-দুনিয়ায় কার এমন সাধ্য আছে বাবুজি!

অচেনা-অজানা জায়গা। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একদিন পুষ্করজীর পায়ের তলায় গিয়ে হাজির। আবার যে-কে সেই। সেই পেটের ভাবনা। পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। পুষ্করজীর গো-ঘাটে গিয়ে আঁজলা-আঁজলা জল খেলে। তারপর ঘুমোবার চেষ্টা করলে। ঘাটের ধারেই শুয়ে ছিল। কে যেন কাছে এসে বললে—এখানে শুয়ে আছো কেন, কচ্ছপে কামড়াবে, কুমীরে খাবে। তখন উঠে রাস্তায় এল।

কিন্তু পুষ্করতীর্থ আপনার পৃথিবীর মধ্যে তো শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আপনি লেখা-পড়া জানা লোক, সমস্তই জানেন। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটি, মারহাটি, বাঙ্গালী সব জাতের লোক ওখানে আসে রোজ। এসে পুজো দেয়, পিণ্ড দেয়, ভুজ্যি উৎসর্গ করে, ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দেয়, খাবার দেয়, গোদান করে। তীর্থযাত্রীর অভাব হয় না পুষ্করজীর। হাজার হাজার লোক মাসে মাসে 'জয় পুষ্করজী কী জয়' বলে আসে স্নান করতে, ব্রহ্মার মন্দির দেখতে, সাবিত্রী পাহাড়ে দেবীজীকে দর্শন করতে। দামোদর পাঁড়ে সেই

তীর্থযাত্রীদের পেছনেই লেগে রইল। ভোর হলেই বাসের আর টাঙ্গার আড্ডায় গিয়ে হাজ্‌রে দেয়। পাণ্ডাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে। দক্ষিণা যা পাবে টাকা পিছু আট আনা তাদের। আধাআধি বখ্‌রা।

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় আর সকলের মত সুর করে বলে— বেরাহ্মণ ছে হুঁজুর, বেরাহ্মণ কো কুছ ভোজন কো ওয়াস্তে দিজিয়ে হুজুর—

দেখুন ভগবানের কী লীলা। ভক্তকে নিয়ে যুগে যুগে ভগবান কত পরীক্ষাই না করেন। তারপর এমনি করে কত মাস কাটলো, কত বছর কাটলো। হিসেব তার রাখেনি দামোদর। কোনও জমিদার হয়ত এসেছে তীর্থ করতে ওমনি পাণ্ডা মহারাজ খবর পাঠিয়েছে—কাল ধর্মশালায় হাজির হবি পাঁড়ে, ব্রাহ্মণ ভোজন হবে—

যথাসময়ে দামোদর পাঁড়ে সেই ঠাকুরসাহেবের দেওয়া নাগরা জুতো আর সিল্কের পাগড়ি পরে গিয়ে হাজির হয়েছে ধর্মশালায়। পুরী খেয়েছে, লাড্ডু খেয়েছে, মালাই খেয়েছে, ভাজি খেয়েছে—আবার তারপর ভোজন-দক্ষিণা নিয়ে পাণ্ডাকে আধা বখ্‌রা দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। এমনি করেই কাটছিল। এমন সময় আবার একটা কাণ্ড ঘটলো। তা না হলে আর ভগবানের লীলা কেন বলছি বাবুজি!

বলে উপাধ্যায় থামলেন!

উপাধ্যায় বললেন—রাত ক'টা হলো! আপনার ঘুমোতে দেরি হলো বাবুজি—

বললাম—না বলুন আপনি—

উপাধ্যায় তো জানেন না তীর্থ করতে আমি আসিনি এতদূরে, এসেছি আসলে গল্প শুনে পুণ্যসঞ্চয় করতে। রাজপুতানার অলিতে গলিতে নতুন চরিত্র দেখতে পাবো বলেই তো এত কষ্ট করা। আমার জ্যোতিষী বন্ধুর কথা তাচ্ছিল্য করে সংঘাতের আশঙ্কা আছে জেনেও সম্পদের লোভ ত্যাগ করতে পারিনি।

উপাধ্যায় বললেন—তবে শুনুন—পাঁড়ের মুখ থেকে যেমন শুনেছি আমি তেমনি বলি।

গাঁজায় আর এক দম দিয়ে পাঁড়ে তারপর আরম্ভ করলে।

পাঁড়ে বললে—সেদিন পাণ্ডা মহারাজ এসে খবর দিয়ে গেল রায়গড়ের ঠাকুরসাহেব এসেছে ধর্মশালায়, ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে—যেয়ো ঠিক—

মনটা চন্ চন্ করে উঠলো। সেই রায়গড়ের ঠাকুরসাহেব নর্মদাপ্রসাদ। তিনি এসেছেন পুষ্করতীর্থে! ঠাকুর সাহেবের দেওয়া সেই নাগরাজুতো, সিল্কের পাগড়ি পরে গিয়ে হাজির হলাম। পুষ্করতীর্থের কোনও ব্রাহ্মণ আর বাকি নেই। সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। মহা সোরগোল পড়ে গিয়েছে ধর্মশালায়। পাঁচশো ব্রাহ্মণ

জড় হয়েছে। মহাভোজের আয়োজন। যে-যত পারবে খাবে। সমস্ত ধর্মশালাটা ঠাকুর-সাহেবের লোকে ভর্তি। বাইরের কেউ নেই। একপাশে গিয়ে তো বসলাম আমি। খাবার ডাক পড়লো। কেবল ভয় হচ্ছিল ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে দেখা হলে কী বলবো।

খেতে বসলাম। সেই মালাই, পেঁড়া, গুলাবজামুন, মালপো, ভাজি, পুরি। একেবারে এলাহি কাণ্ড। সবাই পেট পুরে খাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরসাহেব নর্মদাপ্রসাদের দেখা নেই। কেবল মনে হচ্ছিল সঙ্গে কি রাণীসাহেবারা এসেছে! সেই ছোট রাণীসাহেবা!

সবাই খেয়ে উঠে গেল। আমি তখনও খাচ্ছি। আমার আর পেটই ভরে না। অনেকদিন পরে এমন খাওয়া খাচ্ছি!

মনে হচ্ছিল এখনি হয়ত নর্মদাপ্রসাদ বেরিয়ে আসবেন। বলবেন—এ কি, পাঁড়েজি না? দামোদর পাণ্ডে! কিন্তু কিছুই হলো না। খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে পাণ্ডামহারাজই। ঠাকুরসাহেব এলেন না। একসময়ে খাওয়া সেরে উঠলুম। তবু কিন্তু তখনি বাড়ি গেলাম না।

দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখা মুন্সিজীর সঙ্গে—আরে পাঁড়েজি!

বললাম—মুন্সিজী, ঠাকুরসাহেব আসেননি?

মুন্সিজী বললে—না তিনি তো মারা গেছেন, তাঁর ছেলেরা এসেছে—আর বিধবা রাণীজীরা এসেছেন।

তবু যেন তৃপ্তি হলো না। আরো যেন কিছু শুনতে চাই।

বললাম—সব রাণীজী এসেছেন?

মুন্সিজী বললে—মহারাণীজী এসেছেন আর পাঁচ রাণীজীও এসেছেন—

—পাঁচ কেন? রাণী তো ছ'জন?

—আজ্ঞে, এক রাণী তো মারা গেছেন, ছোট রাণী! জানো না?

—কোন্ রাণী?

—ছোট রাণী আত্মহত্যা করে মারা গেছেন—সে তো অনেকদিন হলো, আজ সাত বরিষ হয়ে গেল। সে কি আজকের কথা। আর গেল বরিষে ঠাকুরসাহেব মারা গেলেন শীকার করতে গিয়ে জঙ্গলে—

সাত বছর। হিসেব করে দেখলাম প্রায় সাত বছরই হলো পুষ্করে এসেছি।

তখনই চলে এলাম হুজুর। আবার নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। সেদিন আর বাড়ি ফিরিনি আজ্ঞে। পুষ্কর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আজমীর চলে এলাম। তারপর

সারারাত ষ্টেশনে মুশাফিরখানায় থেকে ট্রেনে উঠে বসলাম। তারপর এলাম এই আবুপাহাড়ে। শুনেছিলাম এখানে অচ্ছলগড়ে অনেক সাধুর আড্ডা। ভাবলাম জীবনে কিছুই কিছু নয়। সব মায়া, সব মিথ্যে! সব ত্যাগ করতে হবে। ক্ষিধে, তেষ্টা, লোভ সব—সব। সমস্ত অনর্থের মূল।

বললাম—তারপর ?

উপাধ্যায় বললেন—তারপর তুরীয়ানন্দজীর আখড়ায় দেখি ওই দামোদর পাঁড়ে কেবল গাঁজা খাচ্ছে আর শংখিয়া খাচ্ছে—ক্ষিদে ভুলবে ও। পেটের ক্ষিদে ভুলে এমন জিনিস পেতে চায় যা পেলে আর কোনও ক্ষিদে থাকে না। আপনাদের বাঙলাদেশের লাটু মহারাজের নাম শোনেন নি ? স্বয়ং জগন্নাথ মহাপ্রভু তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। লাটু মহারাজেরও বড্ড ক্ষিধে ছিল। মহাপ্রভু বর দিয়েছিলেন—তুই যা পাবি তা-ই খাবি, সব হজম হয়ে যাবে তোর—। আমাদের ধর্মশালায় একজন সাধু এসেছিল একবার, সিদ্ধপুরুষ। বলতো—

"মেরা নাম হ্যায় গোবিন্দ্
ভোজনমে মিলে আনন্দ্"

তুরীয়ানন্দজী সব দেখে একদিন ডাকলেন দামোদরকে। বললেন—কী চাস তুই বেটা—

পাঁড়ে বললে—প্রভু, ক্ষিদের জ্বালায় বড় জ্বলে মরি, আমায় ক্ষিদে ভুলিয়ে দিন—

তুরীয়ানন্দ বললেন—যা বেটা, তুই খেয়ে বেড়াগে যা, লোকে পুজো করে, উপাসনা করে, তোর খেলেই পুজো করা হবে, ভোজনই তোর ভজন—যা বেটা যা—তুই পেয়ে গেছিস্—

পাঁড়ে কী বুঝলো কে জানে। আমি যখন এই ধর্মশালায় ম্যানেজারের চাকরি নিলাম, ওকে নিয়ে চলে এলাম হুজুর এখানে। এখন কিছুই করে না ও। শুধু ভোজন করে। ওর ভজন-পূজন ওইতেই হয়। ছ'টা রাণীর মোহ কি কম মোহ মশাই, ছ'টা রিপুকে যে বধ করতে পেরেছে তার তো সব মিলে গেছে! তাই তো আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, ভোজনে চ জনার্দন—যান, এবার শুতে যান, অনেক রাত হলো, ক'টা বেজেছে কে জানে!

বললাম—আর সেই চিঠিটা ? ছোটরাণীর চিঠি······

উপাধ্যায় বললেন—সে চিঠি তো উপলক্ষ্য বাবুজী, যে ভগবান পেয়ে গেল, তার কাছে ও চিঠি তো তুচ্ছ, লালাবাবু যেদিন গোবিন্দজীকে পেলেন, সেদিন তো তার রাজ্য, আওরাত্, লেড়কা সব বিলকুল ঝুট হয়ে গেল, লাটুমহারাজ যেদিন···

পরদিন সকালে যথারীতি দামোদর পাঁড়ে খেতে এল। ভালো করে লক্ষ্য করলাম চেহারাটা যেন যৌবনে এককালে সুন্দরই ছিল। ছ'ফুট লম্বা, ফরসা রং, সুন্দর গড়ন। দামোদর পাঁড়েকে যেন নতুন চোখ দিয়ে আবার দেখলাম। বেশ পরিপাটি করে খেল সব। যেন খাওয়ায় তার শুচিভ্রষ্ট নিষ্ঠা। পূজারি যেমন করে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করে, সে-ও যেন তেমনি। তেমনি অবিচল ভক্তি, তেমনি পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

যাবার সময় দামোদর পাঁড়ে বললে—পরমেশ্বর বড় তুষ্ট হলেন বাবুজী, আপনার কল্যাণ হবে—

কিন্তু আমার জ্যোতিষী বন্ধুর কথা আমি ভুলিনি। মঙ্গল তখন মকরে জেনেও যাত্রা করেছি। কী সম্পদ যে পেলাম আমি, তা উপাধ্যায়ও জানলেন না, দামোদর পাঁড়েও জানলে না। আর সংঘাত? সংঘাতের গল্প পরের বারে বলবো!

গার্ড ডিসুজা

বন্ধুর প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন। যেমন হয় আর কি! লোকজন প্রচুর। উদ্যোগ আয়োজনেরও শেষ নেই। একদল খেয়ে দেয়ে চলে যাচ্ছে—আর একদল ঢুকছে।

খাওয়া দাওয়ার শেষে বাড়ির ভেতরে যেতে হলো। বিরাট বাড়ি। সদর মাড়িয়ে অন্দরে ঢুকে অনেক বারান্দা অনেক ঘর পেরিয়ে শেষে একেবারে শেষ ঘরটায় পৌঁছুলাম।

বন্ধুর স্ত্রী পর্দানশীন। একটা গরদের শাড়ি পরে ছেলে কোলে বসে ছিলেন।

বললাম—বাঃ বেশ ছেলে হয়েছে তোর—

বন্ধুর মুখটা এক নিমিষেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অনেকদিন পরে ছেলে হয়েছে! অনেক সাধ্য-সাধনার পর। মাদুলী তাগা ওষুধ-বিষুধের অন্ত ছিল না। অনেক দিন ধরে অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কোনও ফল হয়নি। কিন্তু যখন সব আশা প্রায় চলে গেছে এমন সময়…

ছেলেটির হাতের মুঠোর মধ্যে একটা গিনি দিতেই ছেলেটি মুঠো বন্ধ করে সেটা মুখে পুরে দিতে গেল। বন্ধুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি হাতটা ধরে ফেললে।

চলেই আসছিলাম—

হঠাৎ বন্ধু জিজ্ঞেস করলে—কা'র মতন হয়েছে রে? বউ-এর মতন না আমার মতন?

কথাটার কী উত্তর দেব ভাবতে গিয়ে ছেলের মুখের দিকে আবার ভালো করে দেখতে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো বন্ধুর স্ত্রীর মুখের দিকে। ঘোমটার আড়ালে মায়ের মুখের সেই আশ্চর্য রূপ দেখে চমকে উঠলাম। আমার আর উত্তর দেওয়া হলো না। প্রথম ছেলে হওয়া মায়ের মুখ এমনই সুন্দর হয় বটে! এ-ছবি তো আমি আগে দেখেছি।

তাড়াতাড়ি চলে এলাম। কিন্তু দৃশ্যটা ভুলতে পারলাম না। এ-মুখ তো আমার দেখা। এ মুখতো ভোলা যায় না। মিসেস ডি'সুজার মুখ তো সেদিন এমনি করেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। সেদিনও তো আমি এমনি করেই অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিলাম মিসেস ডি'সুজার মুখের দিকে! সে গল্পটা বলি।

তখন আমি চাকরি করছি।

চক্রধরপুরে একটা দু'কামরা ঘরে থাকি। একটা বাড়ির এদিকের দু'খানা ঘরে আমি আর ওদিকের দু'খানা ঘরে ডি'সুজা সাহেব। মাঝখানে একটা ছোট পাঁচিল। রাঁচি রোডের ওপর ছোট বাড়িটা। সামনে একটু ঘেরা বাগানও আছে। সে বাগানে মাঝে মাঝে একটা চেয়ার নিয়ে বসি সন্ধ্যেবেলা। সামনে পিচঢালা রাস্তাটা টাটানগর চাইবাসা হয়ে কোথায় গড়াতে গড়াতে রাঁচির দিকে চলে গেছে। এক একটা দামী মটর সোঁ সোঁ করে সামনের রাস্তা দিয়ে হাওয়ার বেগে উড়ে চলে যায়। খানিকটা ধুলো ওড়ে। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ। এমনি করে যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে বসি ভেতরে। তখন বাতি জ্বেলে পড়তে বসি। পড়তে পড়তে কখন রাত গভীর হয়—এক সময়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার উঠি সকালে।

—গুড্ মর্নিং আংকেল!

ডি'সুজা সাহেবের ভাই আমাকে আংকেল বলে ডাকতো।

বললাম—তোমার ব্রাদার কোথায় জনি?

ডি'সুজা সাহেব দেখা হলে—গুড মর্নিং অথর!

আর ডি'সুজা সাহেবের বৌও লোক ভালো। রঙ-বাহার গাউন পরে বাগানে বেড়ায়। রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে যায়। তারপর বাড়িতে এসে গান গায় বিচিত্র সুরে। পাশাপাশি ঘর। ও ঘর থেকে কথা বললে এ-ঘরে সব শুনতে পাই! একটাই ছাদ—মাঝখানে শুধু একটা দেয়ালের পার্টিশন।

ডি'সুজা সাহেব রেলের গার্ড। এক-একদিন কতদূর চলে যায়। আড়াই দিন তিন দিন পরে আবার ফিরে আসে। হঠাৎ হয়ত রাত দুটোর সময় এসে ডাকে—মিলি মিলি—

তা মিলি মেমসাহেবও বেশ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে। লজ্জা শরমের তেমন বালাই নেই। ডি'সুজা সাহেব কাজে যাবার সময় মেমসাহেব একেবারে বাগান পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে। তারপর আমিই থাকি আর রাস্তায় কেউ লোকজনই থাকুক, সে কী দু'জনের চুমু খাওয়া। মেমসাহেব ডি'সুজা সাহেবের গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এমন শব্দ করে চুমু খাবে যে আমিও লজ্জায় পড়ি। বারান্দা থেকে ভেতরে সরে যাই।

এমনি একদিন নয়, রোজ প্রত্যহ।

প্রত্যহ মেমসাহেব হাঁ করে বসে থাকে সাহেবের জন্যে। আমার পাশের বারান্দাতেই আর একটা চেয়ার নিয়ে বসে বসে সোয়েটার না কী যেন একটা বোনে আর মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে চায়। এইবার থার্টিন ডাউন চলে গেল, এবার গুডস ট্রেন আসবে। ডি'সুজা সাহেব আসবে। বাগানে টেবিল চেয়ার পড়বে, চা খাবে তিনজনে। ডি'সুজা সাহেব, মেমসাহেব আর জনি।

এক-একদিন আমারও ডাক পড়ে।

—এসো এসো অথর, কাম্ হিয়ার বয়, হ্যাভ টি প্লিজ—

প্রথম দিনের আলাপেই বোধহয় বলেছিলাম আমার লেখার বাতিক আছে। চাকরি করি আর মাঝে মাঝে বইও লিখি।

—ও লাভলি, আই হ্যাভ নেভার সীন্ এ্যান্ অথর!

মেমসাহেব আমার দিকে অবাক-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বেশ লাল আপেলের মত গাল দুটোতে স্পষ্ট টোল পড়লো। ডি'সুজা সাহেব কালো ভূত হলে কি হবে, মেমসাহেব বেশ ধবধবে ফরসা। নিটোল নিভাঁজ দেহ, নিপাট টুসটুসে লাবণ্য। কী যেন একটা উগ্র সেণ্ট মেখেছে। আমার নাকে মুখে চোখে সে-গন্ধ আছড়ে পড়ছে।

ডি'সুজা সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলে—এই আমার ব্রাদার, জন ডি'সুজা, জনি বলে ডাকি!

জনি বলেছিল—আমি তোমাকে আংকেল বলে ডাকবো!

ডি'সুজা সাহেব বললে—এখানে বেকার বসে রয়েছে, ডি টি এস বলেছে ভেকেন্সি হলেই একটা চাকরি করে দেবে—

এই প্রথম আলাপ। আর ঠিক এর তিন দিন পরেই ঘটনাটা ঘটল।

রাত তখন একটা কি দুটো। আমি ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ মনে হলো বাইরের দরজাটা কে যেন ঠেলছে। আর প্রাণপণে চীৎকার করছে—আংকেল, আংকেল……

ঘুমের ঘোরে প্রথমটা ভালো বুঝতে পারিনি। ভালো করে তন্দ্রাটা ভাঙতেই দরজা খুলে চেয়ে দেখি জনি! ডোরা কাটা স্লিপিং গাউন পরে জনি দাঁড়িয়ে আছে। উস্কো-খুস্কো চুল। খুব যেন ভয় পেয়ে গেছে। আমি দরজা খুলতেই আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে। বললে—আংকেল, তোমার বাড়িতে আমি শোব, আমাকে তোমার বাড়িতে শুতে দাও—প্লিজ—

—কী হয়েছে?

আমি যেন হতবাক হয়ে গেলাম।

থর থর করে কাঁপছে জনি। বছর আঠার বয়েস। বেশ জোয়ান চেহারা। হারিকেনের আলোতে মনে হলো মুখখানা যেন তার আরো কালো—কুচকুচে কালো হয়ে উঠেছে। আমার দিকে চেয়ে হাঁফাচ্ছে।

বললাম—কেন, তোমাদের বাড়িতে কী হলো?

জনি কিছু উত্তর দিলে না। ঘরের ভেতর আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তখনও যেন কেমন আড়ষ্ট ভাব।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের বাড়িতে কেউ নেই?

এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না জনি।

জিজ্ঞেস করলাম—ব্রাদার কোথায়?

জনি বললে—দাদা নেই, লাইনে গেছে—আমি……

কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর আমিও আর সেদিন বিরক্ত করিনি জনিকে।

এমনিতে চক্রধরপুর খুব খারাপ জায়গা নয়।

ডি'সুজা সাহেব বলতো—জানো অথর, বেষ্ট প্লেস আমাদের চক্রধরপুর—আমি বিলাসপুর ছিলাম, ভোজুডিতে ছিলাম, আদ্রায় ছিলাম—

আদ্রায় ডি'সুজা সাহেব তখন ফায়ারম্যানের চাকরি করে। আদ্রা থেকে বেরিয়ে খড়্গপুরে গাড়ি নিয়ে যায়, আসে একদিন দেড়দিন পরে। একদিন রানিংরুমে বেহুশ হয়ে পড়ে ছিল। ফায়ারম্যানের অভাবে গাড়ি ক্যানসেল হয়ে গেল। রিপোর্ট হয়ে গেল ডি টি এস-এর কাছে। চাকরি যায় যায় অবস্থা।

তখন এই মিলিই বাঁচিয়ে দিলে। মিলি মেমসাহেব। মিলি তখন বেশ নামজাদা হয়ে উঠেছে কলোনীতে, ক্লাবে, ইনষ্টিটিউটে। নাচে, গায়, বিলিয়ার্ড খেলে, সাইকেল চালায়। গার্ড আর ফায়ারম্যান মহলে তার অনেক ভক্ত। অদ্ভুত জন্ম-বৃত্তান্ত তার। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের ফাদার কোহান তাকে কুড়িয়ে এনেছিল রানিং রুমের কামরা থেকে। সকালবেলা ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে যোশেফ মেথর দেখেছিল বাথরুমের কোমডের পাশে পড়ে আছে ফুটফুটে একটা ছোট্ট একদিনের মেয়ে। আর তারপর······

এ-সব খবর আমার জানা ছিল না। চক্রধরপুরের অফিসের হেড ক্লার্ক নীলকণ্ঠম বাবুর কাছে শোনা। বুড়ো মানুষ। পুরোনো কথার জাহাজ। কোন্ সাহেবের কী নেশা, কার কেমন মেজাজ, সমস্ত সাহেব জাতের হাঁড়ির খবর নীলকণ্ঠমবাবুর মুখস্থ।

প্রথম দিনই নীলকণ্ঠমবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—বাড়ি পেয়েছেন?

বলেছিলাম—হাঁ, ডি'সুজা সাহেবের বাড়ির পাশে—

—বেশ বেশ, ভালো, ডি'সুজা সাহেব একটু মদ টানে বটে, কিন্তু লোকটা ভালো।

একটু থেমে বলেছিলেন—ডি'সুজা সাহেবের মেমকে দেখেছেন?

বললাম—হাঁ, দেখেছি, আলাপ হয়েছে, একদিন চা খেতেও নেমন্তন্ন করেছিল—

—মেমসাহেবটাও খুব ভালো। ও-বেটি ওদের জাতের একটা রত্ন মশাই, ওই মাতালটাকে কী ভালোই না বাসে, সাহেবটাকে ডিউটিতে যাবার সময় চুমু না খেয়ে ছাড়বে না—অথচ······

—অথচ, কী?

নীলকণ্ঠমবাবু বললেন—অথচ জন্মেছে তো রানিংরুমে!

—রানিংরুমে জন্মেছে কেন?

নীলকণ্ঠমবাবু বললেন—কেউ জন্মের পর ওখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল আর কি! বুঝতেই তো পারছেন ও-বেটাদের কাণ্ড—

তা সেই মিলি শেষকালে ফাদার কোহানকে ধরে ডি. এল. এস সাহেবকে গিয়ে ধরলে। ডি. এল. এস ছিল তখন ফার্নাণ্ডিজ সাহেব। ফাদার কোহানের কথায় চাকরিটা রয়ে গেল ডি'সুজার। মিলি মেমসাহেবকে বিয়েও করতে হলো! শেষকালে বদলি হয়ে এল গার্ড হয়ে এই চক্রধরপুরে।

মিলি মেমসাহেব একটা বেতের চেয়ারে বসে একলা-একলা সেলাই করছিল।

বললাম—গুড আফটারনুন মিসেস ডি'সুজা !

—গুড আফটারনুন অথর।

বললাম—মিষ্টার ডি'সুজা কোথায় ?

মেমসাহেব বললে—ক'দিন হোল ব্যালাস্ট ট্রেনের ডিউটি করছে। বাড়ি আসতে পারছে না—

হাসতে হাসতে বললাম—খুব একলা-একলা ঠেকছে বুঝি ?

মেমসাহেব বললে—কী আর করবো বলো অথর, রেলের গার্ডের বউ-এর লাইফ এমনি বরাবর লোন্‌লি ! এখন অভ্যেস হয়ে গেছে ! প্রথম প্রথম খুব ভয় করতো !

—ভয় ? কীসের ভয় ?

মেমসাহেব বললে—ভয় করবে না ?

বলে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসতে লাগলো। চোখে মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল !

তবু বুঝতে পারলাম না আমি। বললাম—রেল কলোনীর মধ্যে ভয় কীসের ? এত পুলিস পাহারা......

মেমসাহেব বললে—পুলিস পাহারা আর কী করবে বলো অথর। আমার মতন সুন্দরী মেয়ে ক'টা আছে এখানে বলো তো ?

বলে নিজের গালে দুটোতে স্পষ্ট টোল খাইয়ে দিলে।

আমি উত্তরটা শুনে একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু কথাটা মিথ্যে বলেনি মিলি মেমসাহেব। রবিবার সকালে যেদিন ডি'সুজা সাহেবের ছুটি থাকতো, দেখতাম নতুন সাজ-পোশাক পরে দু'জনে চলেছে রাঁচি রোড ধরে গীর্জার দিকে। ডি'সুজা সাহেবের বাঁ হাতটা ধরে মিসেস ডি'সুজা গল্প করতে করতে চলেছে। তারপর কয়েক ঘণ্টা পরে আবার দেখতাম দু'জনে তেমনি হাত ধরাধরি করে বাড়ির দিকে আসছে। বড় পবিত্র বড় পরিশুদ্ধ সে দৃশ্য !

চক্রধরপুরে অত ঝামেলা ছিল না। রেল কলোনীর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরারা তেমন বকাটে নয় আদ্রার মত ! আদ্রার রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ কোনও জন্ ডিক কি হ্যারি পাশ থেকে শিষ দিতে দিতে এসে একেবারে গা ঘেষে সাইকেল চালিয়ে চলে যেত। ইনষ্টিটিউটে নাচতে গেলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত তাকে নিয়ে।

নীলকণ্ঠবাবু বলেছিলেন—তাই তো ফাদার কোহান অনেক বলে কয়ে এখানে ট্রান্সফার করে দিয়েছে, তাই তো এখানে ওরা রেলের কোয়ার্টারে থাকে না—

কথাটা কিছু অবিশ্বাস্য নয়। সুন্দরী স্ত্রী থাকা যে বিপদ তা ডি'সুজা সাহেবকে দেখে বোঝা যেত।

চা খেতে বসে বলতাম—তাহলে মিস্টার ডি'সুজার তো খুব বিপদ?

মেমসাহেব খিল খিল করে হাসতো। বলতো—আমাদের সোসাইটিতে খুবই বিপদ অথর, তোমাদের হিন্দু মেয়েদের বেশ! ঘোমটা দিয়ে হারেমের মধ্যে রেখে দিলে, কারো দেখতে পাবার সুযোগ নেই—তোমরাও বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—

বললাম—তা হলে তো বাইরে গিয়ে ডি'সুজা সাহেবের মনে সুখ নেই—

মেমসাহেব হাসতে হাসতে বললে—একেবারেই সুখ নেই, বাড়িতে সুন্দরী বউ একলা ফেলে রেখে কেউ সুখে থাকতে পারে অথর?

তা এমনি সময় জনি এল চক্রধরপুরে।

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। ডি'সুজা সাহেব বললে—এই আমার ব্রাদার জনি—

জনি ড্রিঙ্ক করে না, সিগারেট খায় না। এ এক দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলা যায়। এখনও সংসারের কোনও আঁচ যেন লাগেনি। পুণায় এক কনভেণ্টে ছিল। এখন চাকরি করা দরকার, তাই দাদা ডাকিয়ে এনেছে এখানে। ডি টি এস কিম্বা ডি এল এস কাউকে বলে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে।

মেমসাহেবকে একদিন বললাম—এ তো এক অবাক দেওর তোমার মেমসাহেব, এ যে দেখছি একবারে ব্রহ্মচারী!

—ব্রহ্মচারী? তার মানে?

জনি বলতো—ড্রিঙ্কিং ইজ এ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট আংকেল—ড্রিঙ্ক করলে মানুষের মনুষ্যত্ব, হিউম্যানিটি চলে যায়, স্মোকিংও খুব খারাপ—

মেমসাহেব বলতো—দেখছো অথর, হাও নাইস্ হি ইজ্—হীরের টুকরো ছেলে জনি আমাদের—

জনি বলেছিল—যারা মদ খায় তাদের আমি হেট্ করি আংকেল—

—যারা স্মোক করে?

—তাদেরও—

—কিন্তু তোমার ব্রাদার?

দুদিন মিশেই কেমন অবাক হয়ে গেলাম। এমন ছেলে তো এদের সমাজে দেখিনি! রোজ চার্চে যাবে, ঘুম থেকে উঠেই দেখেছি রাঁচি রোড ধরে একেবারে

পাহাড়ের দিকে বেড়িয়ে আসে। তারপর বাগানে গিয়ে মাটি কুপোতে বসে। তারপর স্নান সেরে এসে খবরের কাগজ পড়ে!

মেমসাহেব বলে—হি ইজ এ্যান্ অ্যাঞ্জেল অথর,—ও মানুষ নয়—

আমি দেখেছি মিসেস ডি'সুজা বসে বসে জনির জন্যে চা তৈরি করে দিয়ে কাপটা এগিয়ে দিচ্ছে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে বসিয়ে মায়ের আদরে বলছে—এটা খাও—ওটা খাও—ইত্যাদি—

জনি যা-যা খেতে ভালোবাসে সেই সব জিনিসই বাজার থেকে আনায় মিসেস ডি'সুজা।

জনি আমার ঘরে এসে বলে—বড্ড আদর দিচ্ছে আমাকে আমার সিস্টার-ইন্-ল। দেখো না এই ক'দিনে কী মোটা হয়ে গেছি, সি ইজ টু গুড এ লেডি—

তারপর বললে—কিন্তু আমার বড় লজ্জা করে আংকেল—

—কেন, লজ্জা কীসের? তোমার তো মা নেই, মা পেয়েছ!

—তা হোক, কিন্তু ব্রাদারের ঘাড়ে বসে বসে খাওয়া, আমারও কোনও চাকরি-বাকরি হচ্ছে না—

বললাম—হবে নিশ্চয়ই, তোমরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তোমাদের চাকরির জন্যে আবার ভাবনা—! দেখ না তোমার চাকরি হলেই মাইনে হবে খুব কম করে পঞ্চাশ টাকা, আর আমাদের একটা চাপরাশির মাইনে সাত টাকায় আরম্ভ—

একটু থেমে জনি বলে—আচ্ছা আংকেল, এ কেমন করে হয়, তোমরাও মানুষ আমরাও মানুষ, অথচ এত তফাৎ কেন হয়?

বললাম—তোমরা রাজার জাত বলে।

—কিন্তু তা যদি হয় তো আমাদের সঙ্গে ওরা তো এক সঙ্গে খায় না, এক সঙ্গে বসে না, ওদের মেয়েদের সঙ্গে তো আমাদের ছেলেদের বিয়ে হয় না।

সে-সব দিনের কথা! সেই ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস। আমরাও ওদের পর করে দিতাম, সাহেবরাও ওদের পর মনে করতো! কিন্তু বাচ্চা ছেলে জনির মুখে সে কথা শুনে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। অন্তত একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও তো এ-কথা ভেবেছে! কোথায় পুণার কোন্ কনভেণ্টে কোন্ পাদরি সাহেব তাকে এ শিক্ষা দিয়েছিল, এ-কথা ভাবতে শিখিয়েছিলেন, তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু জনির কথা শুনে তাঁকে সেদিন মনে মনে নমস্কার করেছিলাম মনে আছে।

মিস্টার ডি'সুজা একদিন হুড়মুড় করে এসে পড়তো আবার। ব্যালাস্ট ট্রেন নিয়ে

কোথায় ক'দিন আটকে ছিল, এবার এসেছে অনেক মালপত্র নিয়ে। কোত্থেকে সস্তায় ডিম এনেছে, মুরগী এনেছে, ফ্রুটস্ এনেছে। আমার কাছেও কিছু পাঠিয়ে দিলে। আসতেই দরজার কাছ থেকে মেমসাহেব ডি'সুজা সাহেবকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে চুমু খেলে।

বললে—তোমার কোনও কষ্ট হয়নি ডিয়ার?

আমি বিজাতীয় হয়ে এদের জীবন-যাত্রা দেখতাম আর মনে হতো—থাক্ ওরা মদ, মিসেস ডি'সুজা থাক্ সিগারেট, তাতে কী হয়েছে। আমাদের চোখ দিয়ে বিচার করলেই তো খারাপ। নইলে কোনও দোষ তো নেই। একজন মানুষ একটা কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে বিয়ে করেছে, সংসার করছে, ভাইকে এনেছে চাকরি করে দেবার জন্যে—একটা মানুষ যতটা সাধ্য সমস্তই করছে, এর পর যদি ডি'সুজা সাহেব একটু নেশাই করে তো তাতে কী এমন অপরাধ হয়। মিসেস ডি'সুজা স্বামীর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকে বাগানে। নিজের একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যে যদি সিগারেটই খায় তো তাতেই-বা দোষটা কী! আর বৈচিত্র্য হিসেবেও কলকাতা থেকে চক্রধরপুরে গিয়ে এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারটির সংস্রবে এসে বেশ ভালো লেগেছিল। কিন্তু তখন কি জানতাম এ বৈচিত্র্য আমার মনে এমন দীর্ঘস্থায়ী ছাপ এঁকে দেবে যে কোনওদিন ভোলা যাবে না!

দু'দিন পরে ঠিক মাঝ রাত্রে আবার সেই ঘটনা!

বাইরে দুম্ দুম্ করে দরজায় ধাক্কা পড়ছে আর ডাকছে—আংকেল—আংকেল—

খিল খুলেই দেখি—জনি!

অবাক হয়ে বললাম—কী হলো?

—আমি আর ওখানে শুতে পারবো না, তোমার বাড়ীতে আমায় শেল্টার দাও আংকেল, প্লিজ, একটা রাতের জন্যে, কাল সকালেই আমি চলে যাবো—

যেন সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না।

সকালবেলা যখন ডি'সুজা সাহেব এসে ডাকলে—মিল্লি, মিল্লি—

দেখলাম মিসেস ডি'সুজা এসে সাহেবকে দু'হাতে জড়িয়ে খুব জোরে চুমু খেলে।

জনি তখনও আমার বিছানায় ঘুমোচ্ছিল। রাত্রে জেগেছিল বলে সকালে ঘুম ভাঙেনি। গায়ে হাত দিয়ে ডেকে দিলাম। বললাম—ওঠো, ওঠো, জনি—তোমার ব্রাদার এসেছে—

ব্রাদার আসবার খবর শুনে যেন নিশ্চিন্ত হলো জনি।

বললে—আংকেল—

বললাম—কী ?

জনি বললে—তুমি ব্রাদারকে কিছু বলো না আংকেল—প্লিজ—

ডি'সুজা সাহেবকে আমি অবশ্য কিছু বলিনি। কিন্তু আমার কেমন সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো। অন্তত যখন মিসেস ডি'সুজাকে দেখতাম। সেই স্বামীকে ধরে চুমু খাওয়া, সেই কাপে চা ঢেলে দেওয়া, সেই রবিবার হাত ধরাধরি করে চার্চে যাওয়া। সেই মায়ের আদরে জনিকে খেতে দেওয়া—এটা খাও, ওটা খাও বলা···

ভেবেছিলাম হয়ত দু'একদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দিনের বেলা বেশ সুস্থ সরল পরিবেশ। বেয়ারা বাগানে টেবিল পাতে, ট্রে ভর্তি কাপ ডিশ আসে, টি-পট আসে। মিসেস ডি'সুজা কাপে কাপে চা ঢেলে দেয়, ডিশে ডিশে কেক কেটে দেয়, স্যাণ্ডুইচ দেয়। তারপর স্বামীকে বলে—তোমাকে আর চা দেব ডিয়ার ?

জনিকে বলে—তুমি যে কিছু খাচ্ছো না জনি ?

জনি চোখ তুলে চাইতে পারে না মিসেস ডি'সুজার দিকে।

মিসেস ডিসুজা আবার বলে—কী হলো তোমার ?

জনি বলে—আমার ক্ষিদে পাচ্ছে না—

ডি'সুজা সাহেব বলে—এরকম 'রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন জনি ? রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি বুঝি ?

মিসেস ডি'সুজা সঙ্গে সঙ্গে বলে—না ডিয়ার, রাত্রে তো খুব ঘুমিয়েছে। আমি রাত্রে একবার উঠেছিলাম, দেখলাম জনি খুব সাউণ্ড ঘুম দিচ্ছে—ও একবার ঘুমোলে আর ওর সাড়া পাওয়া যায় না···তোমায় আর একটা স্যাণ্ডুইচ দিই ডিয়ার—

হঠাৎ জনি বলে উঠলো—রাত্রে আমার ঘুম আসে না—

—কেন ?

দুজনেই হঠাৎ এক সঙ্গে বলে উঠলো—কেন ?

মিসেস ডি'সুজা বললে—তোমার ঘুম আসে না তো আমাকে বলো না কেন ? একটু ও'ডিকলোন মাথায় ঘষে দিতাম—

ডি'সুজা সাহেব বললে—তুমি ওকে একটু দেখো ডিয়ার, মাদারলেস্ চাইল্ড,—

মিসেস ডি'সুজা নিজেই হঠাৎ উঠলো। উঠে গিয়ে ও'ডিকলোনের শিশিটা নিয়ে এসে পাশে বসে জনির মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে বললে—নড়ো না—চুপ করে শুয়ে থাকো—

ঠিক যেমন করে মার কোলে ছেলে মাথা রাখে তেমনি করে জনি মাথা রাখলে

মিসেস ডি'সুজার বুকের ওপর। আর মিসেস ডি'সুজা জনির কপালে ও'ডি কলোন ঘষে দিতে লাগলো। বললে—চুপ করে থাকো, এখনি মাথা ধরা ছেড়ে যাবে—

আমার এক-একবার মনে হতো, হয়ত জনি যা বলে সব সত্যি নয়।

কিন্তু রাত্রে—প্রায়ই মাঝরাত্রের দিকে ও-পাশ থেকে ওদের গলা শুনতে পাই। ডি'সুজা সাহেব বাড়িতে না-থাকলেই বেশি শুনতে পাই যেন।

জনি চীৎকার করে ওঠে—নো—নো—

খানিকটা চুপচাপ। মিসেস ডি'সুজার চাপা গলা কানে আসে—ইউ মাস্ট্—ইউ মাস্ট্—

—নো—নো—

তারপর জনি আরো চীৎকার করে ওঠে—আই মাস্ট টেল মাই ব্রাদার—আমি ব্রাদারকে বলে দেব—

মিসেস্ ডিসুজার গলা—নো, ইউ মাস্ট্ নট্—নেভার—কখনও বলতে পারবে না—কখনও না—

তারপর বিচিত্র শব্দ শুরু হতো। দেয়ালের ওপারে যেন কেউ ধাক্কা মারে। কেউ যেন কারো মুখে হাত চাপা দেয়। গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায় একটা। কান্না, ধস্তাধস্তি, কথা কাটাকাটি—এ-পাশ থেকে কিছু বুঝতে পারি না—।

আর খানিক পরেই সব চুপ, সমস্ত নিস্তব্ধ। চক্রধরপুরের স্টেশন থেকে একটা ইঞ্জিন বিকট হুইশ্ল দিয়ে সে-নিস্তব্ধতা খানিকক্ষণের জন্যে টুকরো টুকরো করে দেয়। আর তারপর শ্যান্টিংএর শব্দও যখন থেমে যায়, মাঝরাত্রির একটা বাদুড় পাহাড়ের দিক থেকে শহরের মাথায় এসে পাশের বাগানের লিচু গাছের ওপর নামে। তখন আমার ঘরের দরজায় এসে কে যেন হঠাৎ ধাক্কা দেয়—আর ডাকে—আংকেল—

দরজা খুলে দিতেই জনি হাউ হাউ করে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। বলে—আমাকে ছুঁয়ো না আংকেল, ডোণ্ট টাচ্ মি, আমি অপবিত্র, আই অ্যাম ইমপিওর—লর্ড জিসাস্ সেভ্ মাই সোল্—

কথা বলতে বলতে আমার বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে জনি কেবল কাঁদতে থাকে!

কিন্তু তার পর দিন যখন আবার দেখি ডি'সুজা সাহেব ডিউটিতে যাচ্ছে—বাগানের বাইরে এসে দাঁড়াতেই একবার পেছন ফিরলো, আর সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ডি'সুজা কাঁধটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে লম্বা করে চুমু খেতে লাগলো—তখন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। জনির সব কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

জনিকে বলেছিলাম আমি—তুমি ব্রাদারকে সব কথা বলে দাও না কেন?

জনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—তাহলে যে ব্রাদারের লাইফ্ নষ্ট হবে যাবে আংকেল, ব্রাদার হয়তো সুইসাইড্ করবে—আত্মহত্যা করবে—

যত রাত হতো ততই ভয় হতো জনির। জনি বলতো—রাত্রে ব্রাদারের ডিউটি পড়লেই আমার ভয়ে বুক কাঁপে—

যাবার আগে ডি'সুজা সাহেব বলতো—যাও, আমি চললাম—ন'টা বাজে, ঘুমিয়ে পড়ো গে যাও—

মিসেস ডি'সুজাও বলতো—হ্যাঁ, বেশি রাত করে কী হবে, তোমার বিছানা তো তৈরি, ঘুমোও গে যাও—

ব্রাদার চলে যেত—আর বুকটা কেঁপে উঠতো জনির। হয়ত চক্রধরপুর স্টেশনে ট্রেনটা তখনও ছাড়েনি, ডি'সুজা সাহেব কালো বাক্সটা খুলে মালগাড়ির ব্রেকভ্যানের ভেতর হ্যারিকেনটা জ্বালছে, তারপর সেই দেশলাই কাটিটা দিয়ে সাইড ল্যাম্প দু'টোও জ্বালবে, পেছনে ঝুলিয়ে দেবে লাল আলোর ডেন্জার সিগন্যালটা—হঠাৎ—

—জনি, মাই জনি!

জনি প্রথমটা চুপ করে থাকে। ঘুমোবার ভান করে। দরজাটায় ভালো করে খিল এঁটে দিয়েছে। তবু বাইরে থেকে, বার বার দরজা ঠেলে মিসেস ডি'সুজা!

—জনি, মাই জনি—দরজা খোল!

জনি তবু চুপ করে থাকে। মুখটা বালিশের ওপর গুঁজে পড়ে থাকে পাথরের মত!

—খোল, খোল, ওপেন দি ডোর জনি,—

দরজাটার খিলটার কী কৌশল কে জানে। পুরোন দরজা—হঠাৎ যেন আপনি আপনিই খিলটা খট্ করে খুলে যায়। অদ্ভুত কৌশল জানে মিসেস্ ডি'সুজা। দরজার ফাঁক দিয়ে হয়ত কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে খিল্ খুলে ফেলেছে।

তারপর মিসেস ডি'সুজা নিজেই আস্তে আস্তে খিলটা তুলে দিয়েছে আবার। তারপর জনির খালি গায়ের ওপর একটা আল্তো স্পর্শ এসে লাগতেই জনি লাফিয়ে উঠেছে। যেন অতর্কিতে সাপে ছোবল্ দিয়েছে তার শরীরে।

কিন্তু সামনে যা দেখলো তাতে জনির সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল।

বললাম—কী দেখলে জনি?

—আমি তোমাকে তা বলতে পারবো না আংকেল!

মানুষের সংসারে এমন ঘটনা হয়ত নতুন নয়। সেই গুহার যুগ থেকে শুরু করে

এই পঞ্চশীলের যুগ পর্যন্ত অন্ধকারের আড়ালের এমন অনেক কাহিনী বার বার ইতিহাসের পাথর-ফলকে লেখা হয়েছে আর বার বার মুছে গেছে। সৌরাষ্ট্র মালব আর মগধ পেরিয়ে জাতি, ধর্ম আর বংশগৌরবের গণ্ডী অতিক্রম করে এই একই মানুষ একই ভাবে পাহাড়ের গুহায় আর মন্দিরের দেয়ালে আর প্রাসাদের অলিন্দে বিচিত্র ভূষায় বিচিত্র ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। চক্রধরপুরের মিসেস ডি'সুজা তো তাহাদের একজন—সেই রহস্যময় মানুষদের।

আজও মনে আছে সেই সেদিন ভোরবেলাকার কথা।

ভোর কেন, রাত বলা যায়। শেষ রাত। চক্রধরপুরের সেই আউটার-সিগন্যালের ধার থেকে একেবারে স্টেশনের ক্রস্-ওভার পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন সে-দৃশ্য দেখবার জন্যে। থার্টিন ডাউন নাগপুর প্যাসেঞ্জারটার সমস্ত যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

—কে?

—কী হলো মশাই?

অ্যাসিস্টেণ্ট্ স্টেশন মাস্টার বোসবাবু তখন নাইট-ডিউটির পর বুঝি একটু ঝিমোচ্ছিলেন। তন্দ্রার ঘোরটা একটু কাটলেই মুখে-চোখে জল দিয়ে আসবেন ভাবছিলেন! থার্টিন ডাউনের লাইন ক্লিয়ারও দেওয়া ছিল। বিল্লা নিয়ে বৈজু কেবিনে গিয়েছিল। ইয়ার্ড মাস্টার থার্টিন ডাউনের জন্যেই শুধু অপেক্ষা করছিল। ট্রেন এলেই আজকের মত ডিউটি খতম!

হঠাৎ থার্টিন ডাউনের ড্রাইভার ব্রেক কষতে কষতে একেবারে ক্রস-ওভার পেরিয়ে হিন্দু রিফ্রেস্‌মেণ্ট্ রুমের সামনে এসে থামলো। ড্রাইভার ইঞ্জিন থেকে নেমে আসবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। দু'টো চাকা একেবারে সোজা শরীরটার ওপর দিয়ে চলে গেছে। আর রক্তে লাল হয়ে গেছে জায়গাটা!

অ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশনমাস্টার বোসবাবু কণ্ট্রোলকে ফোন করেই দৌড়ে এলেন। ইয়ার্ড মাস্টার ইয়ার্ড-ফোরম্যান, বৈজু—কেউ আর বাদ নেই। লোকে লোকারণ্য। চক্রধরপুর কলোনীর ছেলে-মেয়েরাও দৌড়ে এসেছিল।

আমি খবর পেয়েছিলাম একটু দেরিতে। খবর পেয়ে আমিও দৌড়ে গেলাম স্টেশনের দিকে।

কিন্তু কে জানতো এমন হবে!

নীলকণ্ঠবাবুর চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত জনির চাকরির ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল একটা। চিঠি যেদিন বেরোল, সেদিন ডি'সুজা সাহেব আমাকেই প্রথম

জানিয়েছিল। বললে—অথর, একটা সুখবর দিতে এলাম—চাকরি হয়ে গেল জনির—

বললাম—তা হলে উৎসবের আয়োজন করতে হয়—

কিন্তু তখনও কি জানি সুখবর শুধু একটাই নয়, ক'দিন পরে এমনি করে আর একটা সুখবরও শুনতে হবে ডি'সুজা সাহেবের মুখ থেকে। আর সেই সুখবর শুনে মিসেস ডি'সুজার দুটো গাল কাটারক্তের আভায় একেবারে লাল হয়ে উঠবে আমার সামনে······

কিন্তু সেকথা এখন থাক!

চাকরির চিঠি যেদিন বেরোলো অফিস থেকে সেদিনও কিছু আভাস পাইনি আমি। ডি'সুজা সাহেব নিজেও কোনও আভাস পায়নি। আমার কাছে চিঠিটা নিয়ে খুলে দেখালে ডি'সুজা সাহেব। বললে—এই দেখ অথর, জনির চাকরি হয়ে গেল আজ—

তখনও ভোর হয়নি ভাল করে! বাড়ির সামনে ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পাশের বাড়িতে তখনও কেউ ওঠেনি। সেই সকালেই ডিউটি করে বাড়িতে আসছে সাহেব। তখনও মাথায় টুপি, গায়ে গার্ডের পোষাক।

সাহেব বললে—কাল রাত্রেই পেয়েছি চিঠিটা, নীলকণ্ঠবাবু দিলে, তখন আমি ডিউটিতে যাচ্ছি—

বাড়ির সামনে দরজায় ঘা দিতে দিতে ডাকলে—মিল্লি, মিল্লি—

ঠিক আগের দিন রাত্রেও জনিকে দেখেছি। জনির গলা শুনেছি। ঠিক তেমনি রোজকার মত মিসেস ডি'সুজা ডেকেছে—জনি, মাই ডিয়ার জনি, দরজা খোল—

তবু জনি সাড়া দেয়নি।

অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনের কথা কাটাকাটিও কানে এসেছে। একজন দোর খুলবে না আর একজনের দোর খোলবার জন্যে পীড়াপীড়ি। তারপরে এক অদ্ভুত কৌশলে দরজাও খুলে গিয়েছিল—আর তারপরে চীৎকার, অনুনয়, বিনয়, সাধাসাধি—

ভেবেছিলাম, প্রতি রাত্রের মত সেদিনও আমার দরজায় এসে ধাক্কা দেবে জনি ডাকবে—আংকেল, আংকেল—

তারপর দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদবে হাউ হাউ করে। যেমন প্রায়ই হয়।

কিন্তু সেদিন কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দিলে না। আস্তে আস্তে কখন সব

নিস্তব্ধ হয়ে এল। আর কখন বুঝি আমিও শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ভোরবেলা ডি'সুজা সাহেবের সঙ্গে দেখা হতেই তার আগের রাত্রের সব কথা মনে পড়লো।

ডি'সুজা সাহেব ডাকলে—মিল্লি, মিল্লি—

ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেমসাহেব। আর এসেই লম্বা করে চুমু খেলে ডি'সুজা সাহেবকে···

কিন্তু সেদিন কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দেয় নি, দৌড়তে দৌড়তে সাইকেলে চড়ে তখন খবর দিতে এসেছে কল্ বয়।

—গার্ড-সাব, গার্ড সাব?

ডি'সুজা সাহেব বেরিয়ে আসতেই কল্-বয় বললে—সাব্, আপনার ভাই ··

কল্-বয় আর বাকিটা যেন বলতে পারলে না।

মিসেস ডি'সুজাও তখন বেরিয়ে এসেছে। বললে—কী হয়েছে?

—হুজুর, আপনার ভাই···

আমি যখন স্টেশনে গেলাম, তখন স্টেশনের প্ল্যাটফরম লোকে লোকারণ্য। ওদিকে আউটার সিগন্যাল থেকে এদিকের ক্রস-ওভার পর্যন্তও লোকে ভরে গেছে। অদ্ভুত সে-দৃশ্য। যেন মনে হয়, থার্টিন ডাউন আসবার আগে লাইনে ঝাঁপ দেবার জন্যে জনি তৈরি হয়েই ছিল। তারপর ঠিক যখন ইঞ্জিনটা হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট রুমটার সামনে এসে পৌঁছেছে—জনি একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে লাইনের ওপর! সে জায়গাটা টাটকা রক্তে একেবারে ভেসে গেছে।

দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই ডি'সুজা সাহেব শিশুর মত হাউ হাউ করে সেই দিকে চেয়ে কাঁদছে। আর তার পাশেই মিসেস ডি'সুজো চোখে রুমাল দিয়ে কান্না মুছছে।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন আর আশ্চর্য মানুষের মনের ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা। আবার চক্রধরপুরের জীবনে সেই গতানুগতিকতা। আবার প্রতিদিনকার মত থার্টিন ডাউন ভোররাত্রে এসে থামে আর চলে যায়। আবার অ্যাসিষ্টাণ্ট স্টেশনমাস্টার নাইট ডিউটিতে তন্দ্রা এলে একটু ঝিমিয়ে নেয় চেয়ারে হেলান দিয়ে। আবার গার্ড ডি'সুজা ডিউটিতে যাবার আগে পেছন ফিরে দাঁড়ায়—আর মিসেস ডি'সুজা দু'হাতে গলা জড়িয়ে লম্বা করে চুমু খায়। চক্রধরপুরের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গতিতে কোথাও কোনও ব্যতিক্রমই ঘটে না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক ব্যতিক্রম ঘটলো এবং আমি তার জন্যে সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না।

সেদিনও ডি'সুজা সাহেবের বাড়ির সামনের বাগানে টেবিল পড়েছে। মিসেস ডি'সুজা টি-পট থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে কাপে কাপে।

মিস্টার ডি'সুজা ডাকলে—গুড্ ইভ্নিং অথর, কাম্ অন্ বয়, হ্যাভ্ এ কাপ অফ টি প্লিজ—

মিসেস ডি'সুজাও বললে—ইয়েস্—প্লিজ—কাম্

চা খেতে খেতে হঠাৎ ডি'সুজা সাহেব বললে—তোমায় একটা গুড্ নিউজ দিই অথর, একটা খুব সুখবর—

ভাবলাম, আবার কি সুখবর! জনির চাকরি হবার সুখবর একদিন ডি'সুজা সাহেবই শুনিয়েছিল। আর আজ?

ডি'সুজা সাহেব মিলি মেমসাহেবের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে—তুমি শুনে সুখী হবে অথর—এবার মিসেসের বেবি হবে—

বেবি! আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম!

ডি'সুজা সাহেব তেমনি হাসতে হাসতেই বললে,—ইয়েস অথর, দিস্ উইল বি আওয়ার ফার্স্ট বেবি—আমাদের এই প্রথম ছেলে—

মনে হলো ডি'সুজা সাহেব যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মিসেস ডি'সুজার দিকে চেয়ে আরো অবাক হয়ে গেলাম। মনে হলো তার মুখখানা যেন সিঁদুরে রাঙা হয়ে উঠেছে এক নিমেষে! মনে হলো যেন জনির টাটকা কাটা রক্ত কেউ তার সারা মুখখানাতে মাখিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তা কেবল এক নিমেষের জন্যেই।

মিসেস ডিসুজা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—এ কি অথর, চুপ করে বসে আছো কেন, চা যে ওদিকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

তারপর ডি'সুজা সাহেবের দিকে চেয়ে বলে—তোমায় আর একটা স্যাণ্ডুইচ দেব ডিয়ার?

মনোরঞ্জন বোর্ডিং

ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি।

কালীঘাটের বাজারটা পেরিয়ে সোজা বাঁদিকে পড়ে।

ঠিক সন্ধ্যেবেলা।

গোটা পঞ্চাশেক পাওনা টাকা এক স্যাকরার দোকান থেকে নিয়ে আসছি। বাঁ-হাতি দোতলা বাড়িটার গা ঘেঁসে রাস্তা।

হঠাৎ দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে একটা চিৎকার আর গোলমালের শব্দ কানে এল।

বড় চওড়া করে ঢালা সাইনবোর্ড টাঙানো।

'মনোরঞ্জন বোর্ডিং।'

আর তারই দোতলার ওপরের বারান্দার ঘটনা। রাস্তার দিকের লম্বা রেলিঙের গা ঘেঁসে অমন জনপঞ্চাশেক লোক পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে যা একদৃষ্টে দেখছে গোলমালটা সেইখান থেকেই আসছে।

—মেরে খুন করে ফেলবো বেটাকে, বেটা বাপের হোটেল পেয়েছিস? খাওয়াচ্ছি বাছাধনকে, টের পাওয়াচ্ছি—

আর কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। শব্দ আসছে পটাপট, দুম দাম—

—চৌদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব না, কর্ বেটা বমি কর—

আবার কিল, চড়, ঘুষি লাথি।

কিন্তু অন্যপক্ষ বোধ হয় সত্যিই অপরাধী। কারণ ব্যাপারটা একেবারে একতরফা। আর সেই জন্যেই বেশী ভয়ের ব্যাপার বলে মনে হলো।

প্রতিবাদ নেই, ক্ষমা ভিক্ষা নেই—এ আবার কেমন মারামারি। শুধু উৎসাহী দর্শকবৃন্দ নিজেদের মধ্যে রেলিং-এ দাঁড়িয়ে মৃদু আলোচনায় ব্যস্ত।

কিছু লোক রাস্তায়ও জমে গেল। আমাদের উর্ধ্ব-দৃষ্টি।

একজন জিজ্ঞেস করলে—কী হলো মশাই—

কে উত্তর দেবে? অত সময় কারো নেই। সামনে যা ব্যাপার ঘটছে তার থেকে চোখ ফেরাতে যদি পারি তখন উত্তর পাবে তোমরা। মোট কথা কে-ই বা শোনে আর কে-ই বা উত্তর দেয়।

আর দেরী করা নয়। সিঁড়িটা আবিষ্কার করে সোজা ওপরে উঠে গেলাম।

সে এক দৃশ্য বটে !

হোটেলের দুটো ঝি ওপাশে দরজার পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে দেখছে।

ঠাকুর দু'জন রাঁধবার হাতা নিয়ে এঁটো হাতে দেখতে এসেছে। তারপর হোটেলের বোর্ডার ছাড়া রাস্তার বহু লোক সোজা ওপরে উঠে এসেছে দেখতে।

আর কেন্দ্রস্থলে······

বোধ হয় ওটি ম্যানেজার। বেশ চারটে পকেটওয়ালা ফতুয়া গায়ে আধা বয়সী লোকটি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ঈষৎ টিকি আছে কি নেই। কিন্তু গায়ে অত জোর আছে চেহারা দেখে কে বলবে !

এক একটা চড় গিয়ে পড়ছে, আর মনে হচ্ছে তার হাত যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

ঘুঁষিগুলো গিয়ে গিঁথছে বুলেটের মত।

—বেটা বাপের হোটেল পেয়েছ, চোদ্দপুরুষের হোটেল পেয়েছ—

যেন গাছ কি পাথর।

নির্বিকার নিরঙ্কুশ !

এক একটা ঘুষির চোটে একবার ওধারে টলে পড়ছে, আর একটা ঘুষির চোটে একবার এধারে গড়িয়ে আসছে।

না প্রতিবাদ, না ক্ষমা চাওয়া, না বিদ্রোহ, না কিছু।

কিন্তু মরে যাবে যে। খুন হয়ে যাবে যে। এতগুলো লোক সবাই বুঝি এই মজাই দেখতে চায়। সবাই বুঝি চায় চলুক এমনি করে অনেক রাত পর্যন্ত। সন্ধ্যেটা কাটুক এই রকম পাঁচ-মিশেলী মজায় বিনা পয়সার তামাসা।

এতক্ষণে নজরে পড়লো—

ক্ষয়া দড়ির মত পেটটা, হাল্কা লিকলিকে এক ফালি শরীর ! তবু তারই মধ্যে ছোটবড় বাহারে ছাঁট চুল। একটা গলার বোতাম খোলা পাঞ্জাবী গায়ে। ভদ্রলোকের মতই চেহারা তো !

এবার এক লাথি—

লাথিটা সোজা চোয়ালের উদ্দেশ্যেই ছোঁড়া হলো—

কিন্তু তার আগেই ধরে ফেলেছি। পেছন থেকে ঝাপটে ধরে টেনে এনেছি ম্যানেজারকে। লাথিটা যথাস্থানে লাগবার আগেই টিপ্‌ভ্রষ্ট হয়ে গেল।

আর ম্যানেজার হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অবাক হয়ে গেছে।

—কে আপনি ? আপনি কে ?

আমার তখন রাগে মেজাজ বেশ অস্থির।

—ওকে অত মারছেন কেন শুনি, ও যে মরে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন না ও যে মর-মর—

ম্যানেজার যেন হাসির খোরাক পেলে একটা।

বললে—মরবে কি বলেন, ও বেটা সাড়ে তিন টাকা খেয়েছে আমার—খেয়ে-দেয়ে এখন বলছে পকেটে পয়সা নেই—

চেয়ে দেখলাম ওর দিকে। পয়সা না-থাকার মত চেহারা নয়! অপরাধ অস্বীকার করবারও প্রয়াস নেই ও-পক্ষ থেকে।

ম্যানেজার লোকসানের শোকে আবার মারতে উদ্যত হচ্ছিল—বাধা দিলাম হাত দুটো ধরে ফেলে।

—ছাড়ুন, ছাড়ুন আমার হাত—

এক ঝট্‌কায় আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ম্যানেজার বোধহয় মোক্ষম মার দিত। কিন্তু এবার সামনে এগিয়ে গেলাম।

বললাম—আর যদি মারেন ওকে তো আপনাকে তুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব—

—মারবো না আমি, বলেন কি—আপনার তো পকেট থেকে যায়নি, আমার গেছে মশাই—করকরে সাড়ে তিন টাকার মাল—

সকলের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলতে লাগলো ম্যানেজার—

—দিয়ে উঠতে পারছে না আমার লোকরা, ভেট্‌কি মাছ ভাজা দু'বার করে চেয়ে নিয়েছে, ডবল ডিমের মাম্‌লেট মুগের ডাল দিয়ে খেয়েছে, ইলিশ মাছের সর্ষে বাটা, আর ডিমের কারি। শেষে কই মাছ করেছিলাম, তাও—তারপর মাংস—মাংসের কালিয়া চেটে চেটে খেয়েছে—মানে আঁষের যত দফা হয়েছিল সব খেয়েছে চেটে পুটে—শেষে—

ঠাকুর যোগ করে দিলে—মাটন্ কাটলেট্ একটা—

—আর ফাউল চপ্‌ও একটা—যুগিয়ে দিলে আর একটা ঠাকুর—

ম্যানেজার শুরু করলে আবার—তারপর রাজভোগ একটা, আর ছানার জিলিপি—

চুপ চাপ মাথা নিচু করে লোকটা সব শুনছে। অর্থাৎ সব সত্যি কথা!

ম্যানেজার আবার শুরু করলে—দু'জন লোক কেবল ওকে নিয়েই ব্যস্ত—যারা আট আনা, বারো আনার খেয়েছে তাদের দিকে তেমন নজর দেবার সময়ই ছিল না, বড় খদ্দের উনি, পাছে বিগড়ে যান, আমি নিজে তদারক করে খাইয়েছি মশাই—

—আবার হ্যাঁ, বল্‌ছে কি জানেন—ম্যানেজার থেমে দাঁত কট্‌মট করে ওর দিকে তাকালো একবার—যেন পেলে চিবিয়ে ফেলে এখনি। মনে পড়েছে তার।

—তা বলছে কি জানেন, মাংসয় ঝাল কম, আর মাম্‌লেট্‌টা ঠাণ্ডা, বুঝুন কত বড় খদ্দের—

তারপর আমার হাতটা ফস্‌ করে ছাড়িয়ে নিয়ে ম্যানেজার ধাঁ করে গিয়ে ওর গলা টিপে ধরেছে—

কোঁত করে ওর গলা দিয়ে একরকম শব্দও বেরুল।

—করছেন কি, মরে যাবে যে—

—মরবে না মশাই, বমি করিয়ে দেব, কর্‌, বমি কর্‌—

লোকটা সত্যিই বমি করে কিনা, সমস্ত লোকগুলো যেন তাই দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

এক ধমক্‌ দিয়ে ম্যানেজারকে টেনে আনলাম।

—ও হয় বমি করুক এইখানে, এই আমার চোখের সামনে, নয়তো সাড়ে তিন টাকা নগদ দিয়ে যাক—

অর্থাৎ যেন বমি করলে ওর দামটা নগদ উস্থল হয়ে যায়।

ম্যানেজারকে আমি জাপটে ধরে আছি, আর ম্যানেজারও ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

বললাম—তুলে একেবারে নিচের রাস্তায় ফেলে দেব আপনাকে, গরীব লোক, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হয়ত মাংসর গন্ধ নাকে গিয়েছিল, লোভ লেগেছে, আর সামলাতে পারেনি, অনেক খানি গিলে ফেলেছে, তারি জন্যে এত—

ম্যানেজার বললে—তা আমি তো দানছত্র করতে বসিনি মশাই—

—তা রাস্তার লোকের নাকে গন্ধই বা অমন যাবে কেন?

—আমি আমার ঘরের ভেতর রান্না করছি, কার নাকে গন্ধ গেল না-গেল......

কথায় কথা বেড়ে যায়। দর্শক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

পকেটে পঞ্চাশটা পাওনা টাকা রয়েছে, তারি থেকে সাড়ে তিনটে টাকা ঝনাৎ করে ফেলে দিলাম—

—নিন আপনার টাকা, চামার কোথাকার—

তারপর লোকটার দিকে চেয়ে আরো চিৎকার করে ধমকের সুরে বললাম—ভাগ্‌—ভাগ্‌ এখান থেকে—যা—যা—

এক মিনিট দেরী হোল না, চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সোজা ফটাফট্‌ নেমে গেল।

বিজয় গর্বে আমিও নেমে এলাম একটু পরে।

দর্শকরা বোধহয় একটু নিরাশই হলো।

হাত পঞ্চাশেক এসেছি। অর্থাৎ মনোরঞ্জন বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে একটা পানের দোকানে পান খেতে যাবো—

দেখি লোকটা দোকান থেকে পান চিবোতে চিবোতে বেরুচ্ছে—

আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।

বললে—মিছি মিছি আপনার ইয়ে সাড়ে তিনটে টাকা আজ গচ্চা গেল তো—

আমি তো স্তম্ভিত।

কিছু বলবারও অবসর দিলে না।

বললে—কেন স্যার দিতে গেলেন নগদ সাড়ে তিনটে টাকা—ও দেখতেন মেরে ধরে ঠিক ছেড়ে দিত শেষ পর্যন্ত—পুলিশেও দিত না, বমিও হোত না আমার—

আমি হাঁ করে চেয়ে আছি লোকটার দিকে, লোকটা বলে কি!

—কেন সেদিন কি হোল, এই মাস দেড়েক আগে—

যে-লোকটা কিছুক্ষণ আগেও একটা কথা মুখ ফুটে বলেনি, সে-ই ফুটপাথে পানের পিচ্‌টা লম্বা করে ফেলে আবার আরম্ভ করলে—

—এই মাস দেড়েক আগের ব্যাপার, ওই 'মলয়া হোটেলে' পুরো তিন টাকা খেয়েছিলাম, ওদিকে পকেট তো আমার চিরকাল গড়ের মাঠ, তারপর কিন্তু মারলে খুব মশাই, গায়ে তিন দিন ব্যথা ছিল—কিন্তু স্রেফ ফোকট্—একদম ফ্রি—

আর-একবার পানের পিচ্‌ ফেললে। তারপর হাসলে।

—কিন্তু মাংসের কারিটা আপনার গিয়ে 'মলয়া হোটেল' রাঁধে ভাল, এদের রান্না সত্যি বলতে কি মশাই আমার তেমন পছন্দ হয় না, মাংসতে আপনার ইয়ে একটু ঝাল না হলে—

তারপর একটু থেমে—

—তা ছাড়া 'মনোরঞ্জন বোর্ডিং'-এ ফ্যান্ নেই, খেতে বসে কেবল ঘামুন, ওখানে চেয়ার, টেবিল, সব আছে আজ্ঞে, পয়সা দিয়ে খেতে হলে 'মনোরঞ্জন বোর্ডিং-'এ কেন খাবো বলুন? এই সহজ কথাটা ওই ম্যানেজার বুঝলে না—কতরকম অবুঝ মানুষই থাকে দুনিয়ায়, হ্যাঁ—

লোকটা চলেই যাচ্ছিল।

ফিরে দাঁড়াল—

বললে—একটা কথা কিন্তু আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। মাংস রাঁধবে হোটেলের

ভেতরে—আর রাস্তায় তার গন্ধ' ভেসে আসবে—এ কেমন আইন মশাই? চার পাঁচ দিন উপোষ করার পর ওই গন্ধে লোভ সামলানো যায়···বলুন? আপনিই বলুন?

লোকটা আর একবার পানের পিচ্ ফেললে তারপর সোজা উদ্দেশ্য-হীনভাবে চলতে শুরু করল।

উপন্যাস

রায়বাহাদুর বললেন—আসল কথা হলো ফার্স্ট হতে হবে—তা সে সাঁতার কেটেই হোক, এভারেস্টের চুড়োয় উঠেই হোক, কিংবা নেচেই হোক। মোট কথা ফার্স্ট হওয়া চাই। তবেই আপনাকে লোকে পুজো করবে। এ এক বিচিত্র যুগে আমরা বাস করছি। সংসারে সবাই আমরা সাকসেস্ দিয়েই মানুষকে বিচার করি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, সৎপথে থেকে জীবন কাটিয়ে গেল। জীবনে একটা মিথ্যে কথা বললে না, কারোর কোনও ক্ষতি করলে না, সারাজীবন সততা নিষ্ঠা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে গেল, এমন লোক আমি অসংখ্য দেখেছি। কিন্তু কে তাদের মনে রেখেছে? কেউ তাদের স্মৃতিসভা করা দূরে থাক, তাদের নামোচ্চারণ পর্যন্ত করতেও শুনিনি কাউকে। কারণ তাদের সাকসেস হয়নি। আবার চিরকাল জাল-জোচ্চুরি করে পরকে ঠকিয়ে মিথ্যে কথা বলে জীবনটা কাটিয়ে দিলে, অথচ দু'চারখানা পদ্য কি একখানা উপন্যাস লিখে একেবারে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল—এমন ঘটনাও দেখলাম! তাহলে বলুন তো দাঁড়ালো কী?

অঘোরবাবুও রিটায়ার্ড গেজেটেড অফিসার।

তিনি বললেন—এই আমার কথাই দেখুন না রায়বাহাদুর। সারা জীবন ঘুঁষ নিলুম না, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে অফিসের কাজ করলুম, তার ফল হলো কি? না, এই আড়াই শো টাকা পেনশন—আড়াই শো টাকায় আজকাল সংসার চলে? অথচ আমি মশাই ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট!

কালীকিঙ্করবাবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন।

বললেন—তবে শুনুন, আমি যার বাড়িতে ভাড়া আছি সে-লোকটা মশাই একটা আকাট মুখ্যু, সারা জীবন কেবল গাঁজা-ভাং খেয়ে কাটিয়েছে, হঠাৎ হলো কি, রেস

খেলে একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে গেল—এখন বাড়ি করেছে গাড়ি করেছে, দিব্যি আরামে আছে—আর আমি বেটা…

রায়বাহাদুর হাতের কাছের একটা বুককেস থেকে একটা বই পেড়ে নিলেন হঠাৎ। তারপর পাতা উল্টে একটা জায়গায় এসে থামলেন। বললেন—এই দেখুন, এই লেখক কী বলছে শুনুন—In history as in life it is success that counts. Start a political upheaval and let yourself be caught, and you will hang as a traitor. But place yourself at the head of a rebellion, gain your point, and all future generation will worship you as the Father of their country. বুঝলেন ?

যাঁরা প্রতিদিন রায়বাহাদুরের বাড়িতে আড্ডা দিতে আসেন, তাঁরা সবাই কথাটা শুনলেন। প্রতিদিনই এমন আড্ডা হয়। বৃদ্ধ রিটায়ার্ড গেজেটেড অফিসারদের দল। সন্ধ্যাবেলা আসেন, আর ঘণ্টা দু'য়েক আজেবাজে আলোচনা করে চলে যান।

রায়বাহাদুর হাতের বইটা যথা-স্থানে রেখে দিয়ে বলতে লাগলেন—আপনারা কেউ সুশীতল ভট্টাচার্যির নাম শুনেছেন ? 'সুখের সংসার' 'বিধিলিপি' 'মিলন-বিরহ' এই তিনটে উপন্যাসের লেখক, সুশীতল ভট্টাচার্য ?

সুশীতল ভট্টাচার্যের নাম কেউই শোনেননি বললেন।

রায়বাহাদুর বললেন—তাঁর নাম যে আপনারা শোনেননি তা আমি ভালো করেই জানি, তবু একবার জিজ্ঞেস করে দেখলাম! যা' হোক, সেই সুশীতল ভট্টাচার্য ছিল পোর্ট কমিশনার্সের জেনারেল সেকশানের বড়বাবু। সুশীতল আর আমি, আমরা দু'জনেই এক-গ্রামের ছেলে, একই স্কুলে পড়েছি, একই সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, আই-এ পাশ করেছি। তারপর সে আমাকে পাশ কাটিয়ে বি-এ এম-এ সব কিছু পাশ করে অফিসে ঢুকেছে। সুশীতল বরাবরই ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করত—একেবারে গোড়া থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত! বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছে। পড়ার খরচ কখনও তার নিজের পকেট থেকে দিতে হয়নি! আর আমি ?

রায়বাহাদুর চাইলেন সকলের দিকে। বললেন—আর আমি ছিলাম স্কুলের মোস্ট অর্ডিনারী বয়। জীবনে কখনও ফার্স্ট তো হই-ই নি, এক-কথায় কোনও কিছুই হতে পারিনি। কিন্তু আজ আমিই হয়ে গেলাম রায়বাহাদুর। শুধু রায়বাহাদুরই নয়, এই গাড়ি বাড়ি এই যা-কিছু দেখছেন আপনারা সব করলাম আমার এই এক জীবনে! অথচ আই-এ পাশ করার পর আমি আর লেখাপড়াই করিনি! আমি

আই-এ পাশ করে সাত বছর বসে থাকার পর পোর্ট কমিশনার্সে ঢুকেছিলাম পঁচিশ টাকা মাইনেতে। আর সুশীতল এম-এ পাশ করে ঢুকেছিল সেই একই অফিসে। তার মাইনে ছিলো তখন চল্লিশ। আর আমার মাইনে হলো পঁচিশ টাকা। ছোট বেলায় আমরা যেতাম সুশীতলের কাছে অঙ্ক বুঝতে। বয়েসের অনুপাতে সুশীতলের মেধা ছিল বেশি। স্কুলের হেডমাস্টারমশাই সুশীতলকে আদর্শ ছাত্র বলে মনে করতেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন—একদিন সুশীতল গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। একদিন সুশীতল দেশের মুখও উজ্জ্বল করবে। সুশীতল ইংরিজী, বাংলা, অঙ্ক তিনটে সাবজেক্টেই ফার্স্ট হতো। এমন ছেলে আমাদের হরিনাভি হাই স্কুলের ইতিহাসে কেউ কখনও আগে দেখেনি।

তা এম-এ পাশ করার পর সুশীতল যখন পোর্ট কমিশনার্স অফিসে চাকরি নিলে, তখন সবাই বলেছিলেন—তা হোক, কিন্তু একদিন সুশীতল ওই অফিসের শীর্ষমণি হয়ে উঠবে—

সুশীতলের তখনও সেই বিনীত ব্যবহার সকলের সঙ্গে!

মাস্টার মশাইদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে সুশীতল সেই আগেকার মতই পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো। যদুবাবু কখনও জুতো পায়ে দিতেন না। সংস্কৃত পড়াতেন। এক-পা কাদা। তবু সেই কাদা পায়ে হাত দিতেও বাধতো না সুশীতলের।

যদুবাবু জিজ্ঞেস করতেন—কী সুশীতল, কী করছো আজকাল?

—আজ্ঞে পোর্ট কমিশনার্সের অফিসে চাকরি করছি।

—কত বেতন পাচ্ছো?

সুশীতল বলতো—চল্লিশ টাকা!

সেকালের চল্লিশ টাকা এখনকার মত নয়। তবু মাস্টার মশাইরা যেন খুশী হতেন না! বলতেন—তোমার উন্নতির রাস্তা খোলা আছে তো?

—আজ্ঞে তা আছে!

যদুবাবু জিজ্ঞেস করতেন—তেমন উন্নতি হলে কত বেতন হবে?

সুশীতল বলতো—তা তিন শোও হতে পারে, আবার হাজারও হতে পারে—

যদুবাবু তখন নিশ্চিন্ত হতেন।

বলতেন—হবে হবে, তোমার হবে, তোমার হাজার টাকা মাইনেই হবে—সায়েবদের আপিস তো, ও-বেটারা গুণের কদর জানে—

তা আমিও ঘটনাচক্রে সেই একই অফিসে চাকরি পেলুম। আমি আই-এ পাশ

করার পর সাত বছর বসে ছিলুম। চাকরি পাইনি কোথাও। সব জায়গায় দরখাস্ত পাঠিয়েছি আর দু'দিন বাদে জবাব এসেছে—'নো ভেকেন্সি'।

শেষকালে একদিন সুশীতলের অফিসেই গিয়ে হাজির হলাম।

সুশীতল তখন মাইনে পায় কম কিন্তু প্রতিপত্তি খুব তার। আমি তাকে আমার দুঃখের কথা সব খুলে বললুম। আমার বাবার মৃত্যুর কথা বললাম। সুশীতল সব মন দিয়ে শুনলে। বললে—একখানা দরখাস্ত তুমি দাও আমার কাছে, আমি দেখি কী করতে পারি—

তার কথামত দরখাস্ত একখানা দিয়ে এলাম পরদিন।

সুশীতল আমাকে নিয়ে একেবারে বড-সাহেবের ঘরে ঢুকে গেল। আমার হয়ে আমার দুঃখের কথা সবিস্তারে বললে বড়-সাহেবকে। বড়সাহেব তখন মিস্টার ফ্লেচার। সুশীতল গড়-গড় করে যেভাবে ইংরিজীতে সাহেবকে বলতে লাগলো, তা শুনে আমিই অবাক হয়ে গেলাম। সুশীতলকে আমি সত্যিই হিংসে করতাম বরাবর তার বিদ্যে-বুদ্ধির জন্যে। সেদিন তার ইংরিজী-বলা দেখে আরো হিংসে হলো! কবে আমি এমন করে সুশীতলের মত ইংরিজী বলতে পারবো! কবে আমি এমন করে সাহেবদের প্রিয়পাত্র হবো!

তা, বলতে গেলে, সুশীতলের জন্যেই আমার সেদিন চাকরিটা হলো বলা চলে। অর্থাৎ সে-ই এক রকম তাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিলে। আসলে বড-সাহেব ছিল উপলক্ষ্য মাত্র।

আমার অফিসে ঢোকার প্রথম দিনটি থেকেই সুশীতল নানা-রকম উপদেশ দিয়েছে। প্রথম দিন অফিসে যেতেই সুশীতল বললে—অফিসে এলে, এখন থেকে অন্যভাবে জীবন কাটাতে হবে তোমাকে। এ এক অন্য জগৎ, এখানে যতক্ষণ থাকবে, কাজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাববে না। দরকার হলে রাত সাতটা আটটা পর্যন্ত কাজ করতেও যেন কখনও পেছপা হোয়ো না—বুঝলে ভাই—

—আর একটা কথা!

সুশীতল বললে—সাহেবরা অন্য দেশের লোক, তারা তোমার বংশ-পরিচয়ও জানে না, তারা বামুন-কায়স্থও বোঝে না, ওরা বোঝে শুধু কাজ, যদি সাহেবদের মন পেতে চাও তো কাজ দিয়ে তাদের খুশী করতে চেষ্টা করবে, তবেই উন্নতি হবে—

আমি সত্যিই সুশীতলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সুশীতলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমি কখনও কার্পণ্য করিনি সারাজীবন। এই যে আজ এত বড় হয়েছি,

এত সম্মান-প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, আর্থিক জগতে সাধারণ লোকে যা কামনা করে তার সব কিছু পেয়েছি, এর প্রথম সূত্রপাত করেছিল সেদিন সেই সুশীতল। সেই সুশীতল ভট্টাচার্য। ওই 'সুখের সংসার' 'বিধিলিপি' 'মিলন-বিরহ' বই-এর লেখক!

অঘোরবাবু বললেন—তিনি উপন্যাস লিখতেন আবার চাকরিও করতেন নাকি?

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—অনেকে চাকরি করতে করতেই আবার লেখে শুনেছি, বঙ্কিম চাটুজ্জোও শুনেছি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-গিরি করতেন দিনের বেলায় আর রাত্রে নাকি বেশি রাত জেগে উপন্যাস লিখতেন—

রায়বাহাদুর বললেন—না, সে-কথা পরে বলছি—আমাদের সুশীতলের ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকম।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন রায়বাহাদুর—সুশীতল তখন মাইনে পেত চল্লিশ টাকা. আর আমি ঢুকলাম পঁচিশ টাকায়। আমি রোজ টিফিনের সময় সুশীতলের কাছে গিয়ে বসতাম। সুশীতলই আমাকে চা খাওয়াতো। সুশীতল বেশি মাইনে পেত আমার চেয়ে। তাই আমাকে চায়ের দাম দিতে দিত না। চা খেতে খেতে নানারকম উপদেশ দিত আমাকে। বলতো সাহেবরা অফিসে আসার আগেই অফিসে আসা ভাল। সকালবেলা অফিসের কাগজ-পত্র ফাইল যা কিছু সব কিছু সাহেব আসবার আগে পড়ে রাখা উচিত। সুশীতল নিজেও তাই করতো। অফিসে যখন কেউ আসেনি, দরোয়ান সবে গেট খুলেছে, ঝাড়ুদার ঝাঁটও দেয়নি তখন, সেই সময়েই সুশীতল নিয়ম করে অফিসে যেত। গিয়ে অফিসের কাগজপত্র পড়ে দেখে নোট লিখে রাখতো। সাহেব জিজ্ঞেস করলে যেন অপ্রস্তুত না হতে হয়। তারপর একে একে বিকেলবেলা পাঁচটার পর যখন সবাই বাড়ি চলে যেত তখনই সুশীতলের আসল কাজ আরম্ভ হতো! দেখা হলে আমাকেও সুশীতল সেই রকম করতে বলতো। আমি সারাজীবন লেট-লতিফ লোক। ঘুম থেকে উঠতেই আমার বরাবর দেরি হতো! তারপর তাড়াহুড়ো করেও কখনও ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারতাম না। তিন দিন লেট হলে একদিনের ক্যাজুয়েল-লিভ কাটা যেত। এ-রকম ক্যাজুয়েল-লিভ কাটা যাওয়া আমার হামশাই হয়েছে। জীবনে কখনও কাজ ঠিক সময়ে করতে পারিনি। বিকেল বেলা পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছি বরাবর!

সুশীতল এজন্যে আমাকে রোজ কথা শুনিয়েছে।

বলেছে—এ-রকম করে চাকরি করলে তোমার কিন্তু প্রমোশন হবে না ভাই, এই

তোমায় আমি বলে রাখলুম—যদি সাহেবদের হাত করতে চাও তো লেট-আওয়ার্স অফিসে থাকবে, সন্ধ্যে সাতটা-আটটা পর্যন্ত, যতক্ষণ সাহেবরা থাকে! আর ওদিকে সাহেবরা আসার আগে অফিসে ঢুকবে—

আমি সুশীতলের কথাগুলো মন দিয়ে শুনতুম। কথাগুলো কাজে লাগাবারও চেষ্টা করতুম, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক পালন করতে পারতাম না।

বলতাম—সকালে ঘুম থেকে উঠতেই যে দেরি হয়ে যায় ভাই—

সুশীতল বলতো—কেন দেরী হয়ে যায়? এই আমার কথা ভাবো তো, আমি কি করে আসি? আর তাছাড়া তোমাকে তো আমার মত সকালবেলা ছেলে পড়াতে হয় না, বাজার করতে হয় না, তা সত্ত্বেও পারো না কেন?

সত্যি সত্যি সুশীতলের অধ্যবসায় দেখে অবাক হয়ে যেতাম। থাকতো মনসাতলার একটা ছোট্ট দু কামরা ঘরে। তখন বিয়ে করেছে সুশীতল। একটা ছেলেও হয়েছে! সেই ঘরের ভাড়া দিত বারো টাকা। কিন্তু সে বড় জঘন্য ঘর। কিন্তু সেই ঘরেই সুশীতল বেশ নিশ্চিন্তে থাকতো। বলতো—মনসাতলায় থাকলে অফিসে হেঁটে যাওয়া যায় কিনা। পয়সা খরচ নেই। আর ভবানীপুরে থাকলে বাস-ট্রামেই অনেক খরচ পড়ে যাবে যে!

তা সেই কোন্ ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে রোজ সকালে রেস-কোর্সের দিকে গিয়ে মর্নিং-ওয়াক করতো সুশীতল। সেখান থেকে বাড়ীতে এসে ছাত্র পড়াতে যেত। তারপর ছাত্রের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে একেবারে বাজারটা সেরে বাড়ি আসতো। আর তারপর আধঘণ্টা কি তিন কোয়ার্টারের মধ্যে ভাত খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে অফিসে গিয়ে পৌঁছুতো।

সুশীতল নিজের সকাল বেলার রুটিনটা বলে আমাকেও তার অনুসরণ করতে উপদেশ দিতো। বলতো—এ-রকম না-করলে কিন্তু ভাই তোমার চাকরি করাই উচিত নয়। আর চিরকাল তো পঁচিশ টাকায় পড়ে থাকলে চলবে না—চাকরিতে তো উন্নতি করতে হবে—

আমি বলতাম—তা তো বটেই—

—তা হলে আর এ-রকম করো কেন? আমাকে দেখেও তো তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত!

তা সুশীতলের দেখাদেখি আমিও কয়েকদিন ভোরে উঠে বেড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেশিদিন নিয়ম মেনে চলা আমার ধাতে নেই। শেষকালে আবার আমার সেই আগেকার মত চলতে লাগলো। আবার বেলা আটটায় ঘুম

থেকে ওঠা, আর দেরি করে অফিসে যাওয়া আর সাহেবের কাছে বকুনি খাওয়া।

সুশীতল শেষকালে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে। একদিন বললে—না তোমার দ্বারা কিছু হবে না—

কিন্তু আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলে আশ্চর্য! তিন বছর চাকরি করবার পরেই একদিন হঠাৎ প্রমোশন হয়ে গেল আমার। কেন এবং কেমন করে যে প্রমোশন হলো তা খুলে বলার দরকার নেই। সুশীতল ছিল জেনারেল সেক্শানে আর আমি ছিলাম ট্রাফিকে।

দুপুর বেলা গিয়ে সুশীতলকে খবরটা দিলাম।

বললাম—ভাই আমার প্রমোশন হয়েছে—

সুশীতল অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কি? কোন্ গ্রেড?

বললাম—এ গ্রেড্—

—কী করে হলো?

বললাম—তা তো জানি না, হঠাৎ আজকে এস্টাবলিশমেণ্ট সেকশান থেকে লিস্ট বেরিয়েছে—দেখলাম—

সুশীতল খানিকক্ষণ কিছু কথা বলতে পারলে না।

তারপর বললে—তুমি নিজের চোখে দেখেছ? না, কারো মুখে শুনেছ?

বললাম—না, নিজের চোখে দেখলাম, আর আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন ভূপেশবাবু—

সুশীতল অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো নিজের মনে মনে! সুশীতলই আমাকে অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সুশীতলই আমার মুরুব্বি, সেই সুশীতলকেই আমি টপকে গেলাম, এটা যেন সুশীতলের ঠিক মনঃপুত হলো না। সুশীতল দশ বছর কাজ করে পঁয়তাল্লিশ টাকা পাচ্ছিল আর আমি তিন বছর চাকরি করেই তার সমান হয়ে গেলাম, আমার মাইনেও তার সমান-সমান হয়ে গেল। এটা ঠিক সুবিচার হলো না যেন। তাছাড়া সুশীতল এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ, কাজের লোক, সকাল বেলা আসে আর বেশি রাত পর্যন্ত খাটে। আর আমি রোজই লেট, আমার কামাইও অনেক। আমি আই-এ পাশ, খাটিও কম।

আমার অবস্থাটা সঙ্গীন হলো। অপ্রত্যাশিত প্রমোশন পেয়ে কোথায় আমি একটু আনন্দ করবো, তাও করতে পারলাম না। সুশীতলের সামনে মুখটা আমার গম্ভীর করেই থাকতে হলো। যেন প্রমোশন হওয়ায় আমিই অপরাধী হয়ে পড়েছি।

সুশীতল খানিক ভেবে বললে—বড়দিনের সময় তুমি কি ফ্লেচার সাহেবকে ভেট দিয়েছিলে কিছু ?

বললাম—না, আমি ভেট পাঠাতে যাবো কেন ?

—তা হলে ?

সুশীতল খুবই চিন্তিত হয়ে উঠলো। বললে—ফ্লেচার সাহেবই তো সেবার ফাইন করেছিল তোমায় ?

বললাম—হ্যাঁ—

—তা হঠাৎ সেই ফ্লেচার সাহেবই আবার তোমায় সিনীয়ার গ্রেড দিলে যে ?

বললাম—তাই তো দেখছি।

সুশীতল বললে—বোধ হয় সাহেব সে-সব কথা ভুলে গেছে—কিন্তু···

তারপর আবার যেন একটা সমস্যায় পড়লো সুশীতল! বললে—কিন্তু—এস্‌টাবলিশমেণ্ট সেকশান থেকেও কেউ সেইসব পয়েন্ট-আউট করেনি ?

বললাম—হয়ত করেনি! কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো ভাই, গ্রেড পেয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি—

সুশীতল বললে—তুমি এস্‌টাবলিশমেণ্ট সেকশনে কিছু ঘুঁষ-টুষ দিয়েছিলে নাকি ? নিদেন্ চা-রসগোল্লা-টোল্লা খাওয়ানো···

বললাম—কিচ্ছু করিনি, তুমি তো জানো আমাকে, ও-সব আমি করতে পারি ? ও-সব কি আমার দ্বারা পোষায় ?

শেষ পর্যন্ত ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা না পেয়ে সুশীতল হাল ছেড়ে দিলে!

কিন্তু আমারই হলো আসল মুশকিল! আগে যদিও বা দিনে একবার করে সুশীতলের সঙ্গে দেখা করতাম, তারপর থেকে ঘন-ঘন দেখা করতে লাগলাম। সময় পেলেই সুশীতলের সঙ্গে দেখা করতাম। পাছে সুশীতল না মনে করে যে সিনীয়র গ্রেড পেয়ে গিয়ে আমার অহঙ্কার হয়েছে। অফিসের ছুটির পর সুশীতলের সঙ্গে তার বাড়িতে যেতাম এক-একদিন। তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতাম। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতাম। সুশীতলের বাড়িতে গিয়ে চেয়ে চেয়ে চা খেতাম, মুড়ি খেতাম, পাপড়ভাজা খেতাম। আগে যদিও বা একটু দূরত্ব ছিল, সিনীয়র গ্রেড পাবার পর ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়িয়ে দিলাম।

রায়বাহাদুর বলতে লাগলেন—কিন্তু আবার বিপদ হলো। একটা বিপদ কাটতে না কাটতে আর একটা বিপদ ঘটে গেল তিন বছরের মধ্যেই।

হঠাৎ আর একটা গ্রেড পেয়ে গেলাম।

সুশীতলের মাইনে তখন ছাপান্ন টাকা—আমি একেবারে লাফিয়ে সত্তর টাকায় গিয়ে ঠেকলাম। সুশীতলকে গিয়ে খবরটা দিতে সুশীতল একটু হসলো শুধু। বললে—সত্যি—খুব সুসংবাদ—

সন্ধ্যেবেলা সুশীতলের সঙ্গে তার বাড়িতে গেলাম।

বৌদি বললেন—তাহলে আমাদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন কবে ঠাকুরপো?

ছেলে-মেয়েরাও বললে—কাকাবাবু আমাদের একদিন খাইয়ে দিন তাহলে!

বৌদিকে বললাম—সুশীতলের জন্যেই তো আমার চাকরি বৌদি, আপনাদের খাওয়ানো তো আনন্দের ব্যাপার, আপনি না-বললেও খাওয়াতাম—

পরদিন অফিসের পর বৌবাজারের দোকান থেকে সবচেয়ে সেরা মিষ্টি কিনে নিয়ে গেলাম সুশীতলের বাড়ি। প্রায় কুড়ি টাকার মিষ্টি কিনেছিলাম। বৌদি ছেলেমেয়েরা খুব খুশী। সুশীতল অফিস থেকে এসে সব দেখলে। কিন্তু কিছু মুখে দিলে না। মুখ যেন তার বেশ ভার-ভার!

বললাম—কী হলো সুশীতল, তুমি খাবে না? আমি আনন্দ করে নিয়ে এলুম—

সুশীতল বললে—আমার খেতে ভালো লাগছে না এখন, শরীরটা খারাপ, তোমরা খাও ভাই—

বলে পাশের ঘরের ভেতর গিয়ে কী করতে লাগলো। সেই সময়েই যে তার কী এত জরুরী কাজ পড়লো তা বুঝতে পারলাম না। আমার প্রমোশন সুশীতল যে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে! কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার কীসের অপরাধ? আমার নিজের যদি হাত থাকতো তো আমি সুশীতলকেও প্রমোশন দিয়ে দিতাম! সত্যিই তো, সুশীতল তো আমার চেয়ে অযোগ্য নয়! বরং নানা বিষয়ে সে আমার চেয়ে বেশি কাজের, বেশি পরিশ্রমী, বেশি নিষ্ঠাবান, বেশি বিদ্বান, বেশি বুদ্ধিমান। সে বিষয়ে তো কারো সন্দেহই ছিল না। তবু যে জীবনে কেন এমন অসামঞ্জস্য ঘটে, তার কিনারা কে করতে পারে।

অঘোরবাবু বললেন—বড় মর্মান্তিক, সত্যি! তারপর? তারপর কী হলো?

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—তা তাঁর তো মন খারাপ হওয়াটা অন্যায় নয় মশাই, তিনি আপনাকে চাকরি করে দিলেন, আর আপনি তাকে টপকে যাবেন, এটা তো মনে লাগবেই! তারপর!

রায়বাহাদুর বললেন—তারপর ব্যাপারটা আরো মর্মান্তিক হয়ে উঠলো! ফ্লেচার সাহেবের পর টাউনসেণ্ড সাহেব এলো। আমাকে ভারি পছন্দ তার। সব কাজেই ডাকে। আমিও তখন উৎসাহ পেয়ে মন দিয়ে কাজ করি। সকাল সকাল অফিসে যাই, লেট-আওয়ার্স অফিসে থাকি! সাহেবের কথায় আমি উঠি বসি। সাহেবও আমার কথায় ওঠে বসে!

সেবার আমার প্রমোশন হলো! একেবারে দেড়শো টাকার প্রমোশন! সাহেব নোট দিলে যে আমার মত এফিসিয়েণ্ট হ্যাণ্ড নাকি অফিসে দু'টি নেই।

সুশীতল কিন্তু তখন একশো তিরিশ টাকায় গিয়ে আটকে আছে। তখনও সেই মনসাতলায় দু'ঘরওয়ালা ভাড়াবাড়িতে ছ'টা ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে, আব হেঁটে হেঁটে অফিসে যাওয়া আসা করে। অফিস থেকে বাড়িতে ফাইল নিয়ে গিয়ে রাত জেগে কাজ করে। কাজের পাহাড় তাব সেকশানে। সেই আগেকার মতন ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠে, বেড়িয়ে আসে রেস-কোর্সের দিকে। তারপর ছাত্র পড়াতে যায়, ফিরে আসবার সময় খিদিরপুর বাজার থেকে মাছ, আলু, পটল, কিনে আনে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার সময় অফিসে আসে, বাড়ি যায় রাত আটটায় নটায় তারপর রাত্রেও বাড়িতে আলো জ্বেলে অফিসেব কাজ করে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। চোখে সেই প্রতিভার দীপ্তি নেই আগেকার মত। মোটা চশমা উঠেছে চোখে। গায়ের পাঞ্জাবী আধ-ময়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, পরনের ধুতিখানাও সাবান কাচা। আর তেমন করে আমাকে উপদেশ দেবার সাহস নেই। দেখা হলে না-কথা বললে নয় তাই কথা বলে।

বলি—কেমন আছো সুশীতল?

সুশীতল বেশিক্ষণ সামনে দাঁড়ায় না। বলে—আমাদের আর থাকা!

বলেই চলে যায়। যেন আমার চোখের সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু তখনও আমি সুশীতলের বাড়িতে যাই মাঝে মাঝে! গিয়ে বৌদির কাছে চেয়ে-চেয়ে চা মুড়ি খাই। বৌদির সঙ্গে রান্নাঘরের সামনে মোড়ায় বসে গল্প করি। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিই। সুশীতল অফিস থেকে ফিরে আমাকে দেখেই কাজের ছুতো করে কোথায় বেরিয়ে পড়ে। হয়ত উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। তারপর যখন বোঝে যে আমি চলে গেছি, তখন চুপি চুপি বাড়ি ঢোকে।

কিন্তু আমার বিপদের তখনও বুঝি অনেকখানি বাকি ছিল।

টাউনসেণ্ড সাহেব চলে যাবার আগে কি হলো কে জানে, আমাকে একেবারে গেজেটেড র‍্যাঙ্ক্ দিয়ে গেল! আর বসালো একেবারে সুশীতলের মাথায়। অর্থাৎ

আমিই তখন স্থশীতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কী বিপদ, আপনারা ভাবুন একবার। একেবারে ন'শো টাকার গ্রেড্—

যেদিন প্রমোশনটা হলো, সেইদিনই আমি গেলাম স্থশীতলের সেকশানে।

খবরটা আগেই পেয়েছিল সে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু মুখটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। যেন দেখতেই পায়নি আর কি। আমি সেই আগেকার মতই পাশে গিয়ে বসলাম। আমাকে হঠাৎ দেখেই স্থশীতল দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললাম—একি, দাঁড়ালে কেন স্থশীতল ?

স্থশীতল বললে—না, ঠিক আছে, বলুন—

হঠাৎ আমার হাসি এল। স্থশীতল—সেই আমাদের স্থশীতল ভট্টাচার্য, যার কাছে আমরা ইংরিজী অঙ্ক বাংলা শিখেছি, যার রচনা দেখে ধন্য ধন্য করেছেন হেড-মাস্টার, সেই স্থশীতলের ব্যবহার দেখে আমার হাসিই এল।

নিজের চেম্বারে গিয়ে চাপরাশি দিয়ে স্থশীতলকে ডেকে পাঠালাম।

স্থশীতল এসে গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকলো। বললে—আমাকে ডেকেছিলেন স্থার ?

আমি তার হাতটা ধরলাম। বললাম—স্থশীতল, তুমি এটা কী করছো ? কাকে স্থার বলছো ? তুমিই যে একদিন আমাকে এই অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে ! তুমি না ঢোকালে সেদিন আমি যে উপোষ করতাম ! সে-সব কথা সব ভুলে গেছো ?

স্থশীতল স্থির পাথরের স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল। আমার কথার কোনও উত্তর দিলে না।

তারপর খানিক পরে তাকে চলে যেতে বললাম। স্থশীতল যেন এতক্ষণ আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। আমি চলে যেতে বলাতে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে !

অঘোরবাবু বললেন—তা কষ্ট তো হবারই কথা রায়বাহাদুর—

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—সত্যি বড় প্যাথেটিক মশাই—

রায়বাহাদুর বললেন—তা আমার অবস্থাটার কথাটা আপনারা একবার ভাবুন ! আমার অবস্থাটা যে স্থশীতলের চেয়েও প্যাথেটিক। আমি যেন তার মাথার ওপর অফিসার হয়ে বসে আরো মহা-অপরাধ করে ফেলেছি ! আমার তখন বাড়িটা হয়ে গেছে। জমিটা অফিস থেকে লোন নিয়ে আগেই কিনেছিলাম। সেখানে বাড়ীটা আরম্ভ করে দিয়েছি। যেদিন গৃহপ্রবেশ হলো সেদিন আত্মীয়-স্বজন সকলকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন হয়েছিল। স্থশীতলকে বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম।

বলেছিলাম—সুশীতল, তোমার কিন্তু যাওয়া চাই-ই ভাই, না-গেলে আমি ভীষণ রাগ করবো—

বৌদিকেও বলে এসেছিলাম বিশেষ করে।

বলেছিলাম—আপনার কিন্তু যাওয়া চাই-ই বৌদি, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাবেন!

বৌদি বলেছিলেন—আমার ছ'টা ছেলেমেয়ে নিয়ে গেলে আপনাদের আনন্দ-টানন্দ সব পণ্ড হবে—

আমি বলেছিলাম—না, ছেলে-মেয়ে নিয়ে গেলে আনন্দ পণ্ড হবে, কে বললে? না নিয়ে গেলে সত্যিই আমি মনে করবো, আমি বড় হয়ে গিয়েছি বলে আপনাদের দুঃখ হয়েছে—

তা অনেক কষ্টে আমি সকলকে রাজি করিয়েছিলুম। আমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমি তখন আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার আরো বন্ধু জুটেছিল। আত্মীয়-স্বজন কৃপাপ্রার্থী শুভাকাঙ্খীদের সংখ্যাও তখন বেড়ে গিয়েছে। তখন আর বাসে-ট্রামে অফিস যাওয়া মানাত না, আর স্বাস্থ্যেও কুলোত না। পদমর্যাদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে যে অনিবার্য পরিবর্তন আসে আমারও তা এসেছিল। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের ব্যবহারে, তাদের পোশাকে পরিচ্ছদে, আচারে হাব-ভাবে ঐশ্বর্যের চিহ্ন প্রকাশ হোতো নিশ্চয়ই। তা আমার পক্ষে বন্ধ করার উপায় ছিল না। আমার বাড়ীতে তখন বিলাসের বাহুল্য প্রকাশ্যেই নজরে পড়তে আরম্ভ করেছে। আমার বাড়ীতে শহরের বিখ্যাত লোকদের পদধূলি পড়ে। প্রতিদিন দু'একখানা সম্ভ্রান্ত গাড়ি আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়ায় সমাজে আমার প্রতিপত্তি তখন উর্ধ্বমুখী। কিন্তু তবু আমি সুশীতলের সঙ্গে আগেকার সম্পর্ক বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করতুম। আমি তখনও সময় পেলেই সুশীতলের বাড়ি যেতাম, গিয়ে বৌদির কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে চা, মুড়ি, পাঁপড়ভাজা খেতাম। বৌদি বিব্রত হয়ে পড়তেন একটু। আমি গিয়ে হাজির হলে কী খেতে দেবেন, কোথায় বসতে দেবেন তাই নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। বৌদি ঠিক সেই আগেকার মতন আর ব্যবহার করতে পারতেন না আমার সঙ্গে। তাঁরও যেন কোথায় একটু সঙ্কোচ হতো তখন বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি গিয়ে আগেকার মতই ফরসা ট্রাউজার্স পরে মেঝের ওপর বসে পড়তাম। কিন্তু কোথায় যেন একটা সঙ্কোচের বেড়া ছিল, একটা দ্বিধার পাঁচিল ছিল—তা আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

আমার ভবানীপুরের বাড়ির গৃহ-প্রবেশের দিন পরিচিত বন্ধুবান্ধব সকলকেই নেমন্তন্ন করেছিলাম। হরিনাভির হেড মাস্টার মশাই, সংস্কৃতের মাস্টার যদুবাবু, খুঁজে

খুঁজে সকলকে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম। একদিন যারা আমার দুরবস্থার কথা জানতো তাদেরও বলেছিলাম। মনের মধ্যে হয়ত আমার প্রচ্ছন্ন একটা অহঙ্কার ছিল। আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সেটা বাইরে প্রকাশ করবার দুর্নিবার আকাঙ্খাকে হয়ত এই উপলক্ষ্যেই পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন আমি বিনীত কড়জোড়ে সকলকে অভ্যর্থনা করেছি, ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ সকলকে সমান মর্যাদা দিয়েছি।

হেড মাস্টার বললেন—তা তুমি যে বাবা এত উন্নতি করবে, তা আমরা তখন কল্পনাও করতে পারিনি—

তাঁর ধারণা তিনি অকপটেই প্রকাশ করলেন। সত্যিই তো. আমি সেদিন ইংরেজী, অঙ্ক, বাংলা তিনটেতেই কাঁচা ছিলাম। অনেকবার অঙ্কতে পাশ-নম্বরও পাইনি। তাঁর কোনও দোষই নেই।

যদুবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বেতন কত এখন?

যদুবাবু সেই আগেকার মতই আছেন। তিনি তখনও বেতন দিয়েই মানুষের মূল্যায়ন করেন দেখলাম।

আমার উত্তর পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আর সুশীতল কত বেতন পায়?

যদুবাবুর দোষ নেই। তিনি সেকালের মানুষ। কিন্তু সেকালেরই বা দোষ কী! একালে তো অর্থ-কৌলীন্য আরো বেড়ে গেছে! আরো কুটিল হয়ে উঠছে, আরো জটিল হয়েছে এ যুগ। সুশীতলের মাইনের অঙ্কটা শুনে তিনি প্রকাশ্যেই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন। বললেন—সুশীতলটা একেবারে অপদার্থ—

তা আমার কৃতিত্বে সবাই সুখী হয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন শেষ পর্যন্ত। সমস্ত দিন পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। তবু সুশীতলের কথা আমি ভুলিনি। সুশীতল এল না। তার স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ ই এল না। বুঝলাম, সুশীতলই তাদের আসতে দেয়নি।

আমি সেই রাত্রেই সুশীতলের জন্যে, সুশীতলের বাড়ির সকলের জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সে খাবার তারা ফেরত দেবে। আমার ড্রাইভার খাবারগুলো নিয়েই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু না, ততখানি অভদ্রতা করবার তখনও তাদের প্রবৃত্তি হয়নি। তারা সে-খাবার সেদিন গ্রহণ করেছিল।

শুধু তাই-ই নয়। আমার বাগান থেকে যখনই তরি-তরকারি এসেছে, পুকুর থেকে মাছ এসেছে, আমি তাদের বাড়িতেও কিছু অংশ পাঠিয়ে দিয়েছি বরাবর। তখনও সেসব অস্বীকার করবার মত অভদ্রতা করেনি তারা। আমি সেজন্যে সুশীতলের

ওপর খুশীই ছিলাম। কিন্তু সুশীতলের দুর্ভাগ্যকে দূর করার ক্ষমতা আমার হাতের মধ্যে ছিল না। যখনই সুযোগ এসেছে আমি তার উন্নতির জন্যে রেকমেণ্ড করেছি, তার প্রমোশনের জন্যে চেষ্টাও করেছি বরাবর। কিন্তু প্রত্যেকবারই ওপর থেকে সে-নোট প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে। একটা না একটা খুঁত দেখিয়ে প্রত্যেকবারেই তার কেস ফিরে এসেছে। এ-সব কথা সুশীতল জানতো না। আমি যে তার প্রমোশনের জন্যে এত চেষ্টা করে যাচ্ছি তা জানিয়ে আর তাকে কষ্ট দিতাম না।

এর পরেই আমি 'রায়সাহেব' হলাম।

আমি খুব যে ব্রিটিশের খয়ের-খাঁ ছিলাম তা নয় কিন্তু। টাউনসেণ্ড সাহেব ছিল আমার গুণগ্রাহী। সেই সাহেব আমাকে জানায়ওনি যে আমাকে 'রায়সাহেবি'র জন্যে রেকমেণ্ড করেছে। একেবারে হঠাৎ চমকে দেবার জন্যেই জানায়নি। খবরটা পেয়ে আনন্দ হলো নিশ্চয়ই, কিন্তু পুরোপুরি আনন্দটা যেন ভোগ করতে পারলুম না। খবরটা পেয়েই আমার প্রথমেই সুশীতলের কথা মনে পড়লো।

খবর নিয়ে জানলাম, সুশীতল সেদিন আসেনি অফিসে। বোধহয় খবরের কাগজেই খবরটা পড়েছিল সকাল-বেলা।

সেইজন্যেই বলেছিলাম আপনাদের, যে আমার জীবনে একটার পর একটা বিপদ এসেছে। সারা জীবন ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সে উন্নতি কখনও মনে-প্রাণে পুরোমাত্রায় ভোগে আসেনি। আমি গাড়ি চড়েছি, বাড়ি করেছি, পাখার তলায় আরাম করে রাত কাটিয়েছি, বাড়িতে রেফ্রিজারেটার, রেডিও, টেলিফোন নিয়েছি—কিন্তু সমস্ত বিলাস সমস্ত আরামের মধ্যেও ওই সুশীতলের কথাটা আমার মধ্যে কাঁটার মত খচ খচ করে কেবল বিঁধেছে। তাই আমি জীবনে এত সুখ পেয়েও কখনও তৃপ্তি পাইনি।

শেষকালে এক কাজ করলাম। সুশীতলের কোনও উপকার করতে না পেরে আমি সুশীতলের দুই ছেলের দু'টো চাকরি দিলাম। একটা মেয়েরও বিয়ে দিয়ে দিলাম।

এর পর অফিসে সুশীতলের সঙ্গে আর আমার দেখাও হতো না। আমি ইচ্ছে করেই তাকে আর আমার কামরায় ডেকে এনে তার অশান্তি বাড়াতাম না। সে তখনও জেনারেল সেকশনের বড়বাবু। তখনও মাইনে পায় একশো তিরিশ টাকা। আর টিউশানি থেকেও মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা উপায় করে। তবে তখন দুই ছেলের চাকরি হওয়াতে তার স্ত্রীর কিছু উপকার হয়েছিল।

তার ছেলেদের চাকরি করে দেবার পর বৌদি শুধু একটা চিঠি লিখে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছিলেন।

রায়বাহাদুর বললেন—কিন্তু তখন কি জানি যে সুশীতল শেষকালে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তার নিজের ওপরে সে এমন চরম প্রতিশোধ নেবে?

অঘোরবাবু বললেন—প্রতিশোধ কী রকম?

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—বলেন কি রায়বাহাদুর, নিজের ওপর প্রতিশোধ?

রায়বাহাদুর বললেন—হ্যাঁ, চরম প্রতিশোধ!

অঘোরবাবু তখন আর স্থির থাকতে পারছেন না। সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—ছেলে-মেয়েদের খুন করলে নাকি?

রায়বাহাদুর বললেন—না—

কালীকিঙ্কর বাবুও উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। বললেন—তবে কি আত্মহত্যা করলে নাকি? শিগগির বলুন!

—না, তাও না!

রায়বাহাদুর বললেন—শেষের দিকে আমি আর তেমন যেতে পারতাম না সুশীতলের বাড়ি আগেকার মতন। তার কারণ আমারও বয়েস বাড়ছিল, আগেকার মতন আর সে স্বাস্থ্যও ছিল না, পরিশ্রমও করতে পারতাম না তেমন। আমার ছেলেকে তখন জার্মানীতে পাঠিয়েছি, সে তখনও ষ্টুডেন্ট—তার খরচ পাঠাতে হয় মোটা। আমার দায়-দায়িত্ব বেড়েছিল আগেকার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু খবর রাখতাম সবই। খবর দিত সুশীতলের ছেলে। সে মাঝে মাঝে আসতো আমার কাছে। তার কাছেই শুনতাম সেই বুড়ো বয়েসে তখনও সুশীতল দুটো টিউশানি করছে সকালে-বিকেলে। হেঁটে হেঁটে অফিসে আসছে। তখনও একটা ছেলের চাকরি হতে বাকি। আর দুটো মেয়েরও তখন বিয়ে দিতে হবে!

কিন্তু আবার বিপদ ঘটলো আমার কপালে।

এবার আর একধাপ প্রমোশন পেলাম। 'রায়সাহেব' থেকে সেবার হলাম 'রায়বাহাদুর'।

এখন যেমন 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ'—এই সব হয়েছে, তখন ও-গুলোর নামই ছিল 'রায়সাহেব' 'রায়বাহাদুর'। তবে তখনকার দিনে একটা মহলে ওগুলোর একটু বেশি খাতির ছিল। অন্ততঃ সরকারী মহলে একটু বেশি প্রতিপত্তি। এখনকার

রাজ্যপালদের দরবারে যেমন 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ'দের খাতির, তখনকার দিনে লাটসাহেবদের দরবারে 'রায়সাহেব' 'রায়বাহাদুর'দের সামান্য একটু বেশি খাতির ছিল। কারণ এখনকার মত তখন ওগুলো যাকে তাকে দেওয়া হতো না। এখন যেমন 'সিনেমা-স্টার'রাও 'পদ্মশ্রী' পায়, তখন সে-সব ছিল না।

তা যাই হোক, সেবার সুশীতলের জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো ভাবলাম।

নিজেই সুশীতলের কেসটা রেকমেণ্ড করে ওপরে নোট পাঠালাম। নিজেও গিয়ে একেবারে খোদ কর্তাকে বললাম। বললাম—সুশীতল ভট্টাচার্য এতদিনের সিনীয়র লোক, কোয়ালিফায়েড, তার প্রমোশন হওয়া অবশ্য দরকার।

সাহেব ছিল জাঁদরেল। গড-উইন সাহেব। বললে—কিন্তু রায়বাহাদুর, শুধু কোয়ালিফায়েড হলে তো চলবে না, শুধু সিনীয়র হলেও তো চলবে না, ভট্টাচার্যির যে এজিলিটি নেই!

ওই একটা কথা! এজিলিটি!

ইংরেজী-ভাষায় অনেক কথা আছে যার বাঙলা তর্জমা করা সম্ভব হয়না। কিন্তু 'এজিলিটি' যে কী জিনিস তা এতদিন চাকরি করেও বুঝতে পারিনি। যার কোনও খুঁত নেই, তারও খুঁত বার করা সহজ। 'এজিলিটির' অভাব আছে বললেই হলো। কোনও প্রমাণের দরকার নেই।

গড্‌উইন সাহেবকে শেষ পর্যন্ত রাজি করিয়ে এনেছি কোনওরকমে, ঠিক এমন সময় সুশীতলই চাকরি ছেড়ে দিলে।

দরখাস্তখানা পেয়েই ডেকে পাঠালাম।

সুশীতল আসতেই বললাম—এ কী করছো সুশীতল?

সুশীতল কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম—তোমার প্রমোশনের সব ব্যবস্থা যে করে ফেলেছি। গড-উইন সাহেবও রাজি হয়ে গেছে—। তুমি এখন রিজাইন দিলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে সুশীতল। তুমি করছো কী?

সুশীতল তবু কোনও জবাব দিলে না।

আবার বললাম—তোমার এখনও দু'টো মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি। একটা নাবালক ছেলে রয়েছে, তাদের কথা ভাবো। আর তাছাড়া এখনও পাঁচ বছর রয়েছে চাকরির, মোটা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পাবে—

সে-সব কোনও কথাতেই কান দিলে না সুশীতল, শুধু পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল!

সেইদিনই অফিসের পর সুশীতলের বাড়ি গেলাম। বৌদিকে বুঝিয়ে বললাম সব। এখন রিটায়ার করলে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা পাবে সুশীতল, আর কোনও-রকমে পাঁচটা বছর চালিয়ে যেতে পারলে অন্ততঃ তিরিশ হাজার টাকা প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ডে জমতো। এমন বোকামী কেন সে করছে কে জানে! বিশেষ করে যখন দুটি মেয়ে রয়েছে বিয়ে দিতে, একটা নাবালক ছেলে।

কিন্তু কিছুতেই সুশীতল বুঝবে না। সুশীতলের স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সকলের সামনেই কথাগুলো বললাম। সুশীতল এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। বার বার কথাগুলো বলতে শেষ পর্যন্ত সুশীতল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর বহুদিন আর কোনও খবর রাখিনি। সুশীতল প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে অফিসে আসা বন্ধ করলে। আমার তখনও পাঁচ বছর সার্ভিস ছিল। আমার চাকরি ছাড়লে চলবে না। আমার ছেলে জার্মানী থেকে না ফিরলে চাকরি ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। আর তাছাড়া চাকরি ছাড়বোই বা কেন? আমার যা-কিছু সম্মান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সবই তো অফিসের জন্যে আর ওদিকে সুশীতল বোধহয় তখন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ভাঙছে আর খাচ্ছে। কিংবা সমস্ত দিনই টিউশানি করছে!

কিন্তু সে-যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে অমন করে নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার কল্পনা করেছে, তা কেমন করে কল্পনা করতে পারবো?

প্রথমে ব্যাপারটা জানতাম না। শুনলাম তার ছেলের কাছে।

একদিন ভোর বেলা তার ছেলে এল আমার বাড়িতে। সুশীতলের ছেলেকে এত ভোরে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো? তোমার অফিস নেই আজ?

ছেলে বললে—আছে কাকাবাবু, কিন্তু মা একবার আপনাকে এক্ষুনি ডাকছে—

—বৌদি? কেন?

—আপনি মার কাছ থেকেই সব শুনবেন!

হঠাৎ কী হলো বুঝতে না-পেরে তাড়াতাড়ি গাড়ি বার করতে বললাম। তারপর সোজা গেলাম মনসাতলায়। গিয়ে দেখি বাড়িতে প্রায় কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

বললাম—কী হলো বৌদি?

বৌদি চোখের জল মুছে বললে—আপনাকে একটু কষ্ট দিলুম ঠাকুরপো, আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। ওঁর মাথায় কী সব ভূত চেপেছে—

—সে কী ?

বৌদি বললে—হ্যাঁ ঠাকুরপো, উনি আপিস থেকে কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছেন, উনি বলছেন, ও টাকা ওঁর ; উনি যেমনভাবে ইচ্ছে খরচ করবেন, ওতে কারো নাকি অধিকারই নেই—পরশু চেক ভাঙিয়ে এনেছেন—

বলতে বলতে বৌদি কেঁদেই ফেললে। বললে—কী করে যে এত বছর সংসার চালিয়েছি তা শুধু ভগবানই জানেন, এই বিয়ে হবার পর থেকে শুধু দু'গাছা শাঁখা হাতে দিয়ে আছি, কখনও সোনার মুখ দেখিনি—আর আপনি ছিলেন তাই বড় মেয়েটার যা হোক একটা বিয়েও হয়েছে, আর ছেলে দু'টোরও চাকরি হয়েছে। এখনও দুটো মেয়ে রয়েছে বিয়ে দিতে, খোকা রয়েছে—ওদের কী হবে ঠাকুরপো ? আমার নিজের কথা আমি ভাবিনে, কিন্তু ওদের কথা ভাবলে আমার প্রাণটা যে হু হু করে ওঠে—

—কই, সুশীতল কোথায় ?

বৌদি বললে—ওই পাশের ঘরে রয়েছেন। কালকেই দু' হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন! টিউশানিগুলোও ছেড়ে দিয়েছেন—

—কেন ?

বৌদি বললেন—উনি বলছেন ওঁর যেমন খুশী টাকাগুলো খরচ করবেন, তাতে আমাদের কিছু বলবার নেই—

আমি পাশের ঘরে গেলাম। দেখি এলাহি কাণ্ড। চেয়ারে বসে একমনে কী লিখছে সুশীতল। আমাকে দেখেও কিছু বললে না।

বললাম—শুনলাম, তুমি নাকি কী সব পাগলামি শুরু করেছ ?

সুশীতল মুখ তুলে চাইলে আমার দিকে। বড় করুণ বড় কঠোর সে চাউনি।

আমি পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম—কী সব পাগলামি করছো ?

সুশীতল গম্ভীর গলায় বললে—তোমাকে কে ডেকে আনলে এখানে ?

বললাম—যেই ডাকুক, তুমি সব কী ছেলেমানুষী করছ, শুনছি—! কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে তুমি নাকি নিজেই খরচ করবে বলেছ ? কুড়ি হাজার টাকা তুমি কীসে খরচ করবে ?

সুশীতল বললে—ও-টাকার ওপর কারোর কোনও অধিকার নেই! আমি সারাজীবন কষ্ট করে চাকরি করেছি, ছেলে-মেয়েদের খাইয়েছি ; এখন আমি মুক্তি চাই। এতদিন আমি নিজের সুখ-সুবিধে নিজের স্বার্থ নিজের লাভ-লোকসান কিছু দেখিনি। সকালবেলা উঠে ছেলে পড়িয়েছি, বাজার করেছি, অফিসে গিয়েছি,

তারপর সারাদিন অফিসের কাজ করেছি, রাত্রেও অফিসের ফাইল নিয়ে এসে কাজ করেছি। নিজের কথা একবার ভাববার সময়ও পাইনি—কিন্তু এবার ঠিক করেছি, আর কারো কথা, আর কোনও কথা ভাববো না, এবার শুধু নিজের কাজ করবো—

—নিজের কাজ মানে?

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। নিজের কাজ মানে? এই স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবার সংসার এরা কি সুশীতলের নিজের নয়? এরা যদি তার নিজের না-হয় তো কার?

বললাম—এরাও তো তোমার নিজের লোক সুশীতল! এদের কাজই তো তোমার নিজের কাজ?

—না!

সুশীতলের মুখের চেহারাটা যেন আরো কর্কশ হয়ে উঠলো।

বললে—এতদিন ওদের সকলের কাজ করে করে আমি ফতুর হয়ে গেছি, এবার আমি কেবল আমার নিজের কাজ করবো। ছোটবেলা থেকে আমার বরাবর যা সাধ ছিল, সংসারের চাপে এতদিন তা করতে পারিনি। এবার ওরা বড় হয়ে গেছে, ওরা চাকরি করছে, মেয়ে দু'টোর বিয়ে ওরাই দেবে। আমি এখন থেকে লিখবো—ছোটবেলা থেকে আমার লেখক হবার সাধ ছিল, এবার আমি লিখবো কেবল—

—কী লিখবে?

—উপন্যাস!

আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারলাম না। ভালো করে জানবার জন্যে আবার জিজ্ঞেস করলাম—তুমি উপন্যাস লিখবে? সত্যি কথা বলছো?

সুশীতল বললে—হ্যাঁ—

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

সুশীতল বললে—হয়ত পাগলই বলবে তোমরা। কিন্তু জীবনে আমার একটা সাধ ছিল, সেটা না হয় মেটালামই। এতদিন সংসারের জন্যে নিজের সব কিছু তো জলাঞ্জলি দিয়েছি, এখন না-হয় পাগলামিই করলাম! আমার টাকা, নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা, সেই টাকা আমি খরচ করবো, পাগলামী করবো, যা-খুশী করবো, তাতে কার কী বলবার আছে?

তারপর একটু থেমে বললে—আমি আর কারোর কথাই শুনবো না—আমি একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করে দিয়েছি—নাম দিয়েছি 'সুখের সংসার'। এ-

সংসার দুঃখের সংসার নয়, সুখের। যে-সুখের সংসারের আশায় মানুষ বিয়ে করে, চাকরি করে, সংসার করে—সেই সুখের সংসার। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন লিখবো। আমার অনেক বলবার কথা মনে জমে উঠেছে। এতদিন যা বলতে পারিনি, এবার সব বলবো। বলা যায় না, হয়ত বাঙলা-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবো আমি, কিংবা হয়ত ভেসে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো—কিন্তু এই পথ থেকে আমাকে আর কেউ টলাতে পারবে না—ওই দেখ, কাগজ কিনে এনেছি কাল দু'হাজার টাকার—

ঘরের কোণের দিকে স্তূপীকৃত কাগজ রয়েছে দেখলাম—

সুশীতল আমার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার নিজের মনে লিখতে লাগলো।

অঘোরবাবু মন দিয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ। বললেন—তারপর ?

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—আমি অবিশ্যি বাঙলা উপন্যাসের খবর-টবর রাখিনে, তবে বঙ্কিম চাটুজ্জের নাম শুনেছি—শেষকালে সুশীতল ভট্টাচার্যের নাম হয়েছিল নাকি ?

রায়বাহাদুর বললেন—নামটা বড় কথা নয়। সেই কথাই তো আপনাদের গোড়ায় বলছিলাম—আমরা মানুষকে বিচার করি কেবল সাক্‌সেস দিয়ে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সৎপথে থেকে জীবন কাটিয়ে গেল। জীবনে একটা মিথ্যে কথা বললে না, কারোর কোনও ক্ষতি করলে না,—এমন আরো অনেক লোক দেখেছি—কিন্তু কে তাদের মনে রেখেছে ? কারণ তাদের সাক্‌সেস হয়নি! সুশীতল তাই সেই পঞ্চাশ বছর বয়েসে, স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একলা অমানুষিক পরিশ্রম করে উপন্যাস লিখতে লাগলো। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই লিখতে বসে, দুপুরবেলা একটু খেয়ে নিয়ে আবার লেখে। লেখে রাত্রি আটটা ন'টা পর্যন্ত! শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। কোথাও পৃথিবীর কোনও কোণে তার জন্যে এতটুকু সহানুভূতিও নেই। হয় সে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, নয় তো ভেসে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুশীতলদের বাড়িতে যখনই গিয়েছি, দেখেছি, লিখছে সে। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যেয়, রাত্রে—সব সময়ে। একবার লিখছে, আর একবার প্রুফ দেখছে। আবার কখনও নিজের লেখাই কাটছে আপন মনে।

ছ'মাস পরে তার প্রথম বই বেরোল—'সুখের সংসার'।

আমি জীবনে কখনও উপন্যাস পড়িনি। বিশেষ করে বাঙলা উপন্যাস। বঙ্কিম চাটুজ্জের লেখা পড়েছিলাম ছোটবেলায়, কিন্তু কী পড়েছি তা আজ আর মনে নেই। তারপর শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলে একজন লেখক ছিলেন শুনেছি, কিন্তু তার কোনও বই পড়িনি। 'সুখের সংসার' আমাকে একখানা দিয়েছিল সুশীতল। চারশো পাতার বই। আমি দশ পাতার বেশি পড়তে পারিনি। আর অন্য কারো মুখেও বইটার প্রশংসা শুনিনি।

একদিন যখন দেখা হলো, জিজ্ঞেস করলাম—লোকে কেমন বলছে সুশীতল?

সুশীতল তখন আর একখানা বই লিখতে শুরু করেছে। বললে—এটা তেমন ভালো হলো না—

জিজ্ঞেস করলাম—এবার কী বই লিখছো?

সুশীতল বললে—'বিধিলিপি'। এটার খুব নাম হবে—এটা ভাল হচ্ছে—

আবার মাস ছয়েক পরে 'বিধিলিপি' বেরোলো।

অনেক দিন পরে একদিন দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কেমন হলো সুশীতল? লোকে কেমন বলছে?

সুশীতল দেখলাম তখন সত্যিই বুড়ো হয়ে আসছে।

বললে—এটাও তেমন ভালো হলো না—তবে এবারের বইটা খুব ভাল হবে—

—কী নাম দিয়েছ এ-বইটার?

সুশীতল বললে—'মিলন-বিরহ'—

'মিলন-বিরহ'ও একদিন ছাপা হয়ে বেরোল। সব মানুষেরই মনের মধ্যে আর একটা মানুষ লুকিয়ে থাকে—সে মানুষটা বড় আশা করতে ভালবাসে। সে আশা করে যে তার অর্থ হবে, ঐশ্বর্য হবে, চাকরিতে প্রমোশন হবে, সব দিক থেকে মঙ্গল হবে। যার সে-আশা মেটে, লোকে তাকে বলে সাক্‌সেস্‌ফুল লোক—বলে পুরুষ-সিংহ। আর যার মেটে না তাকে বলে—অপদার্থ! শুনেছি ফরাসী দেশের লেখক ব্যালজাক নাকি অক্লান্ত পরিশ্রম করতো লেখার জন্যে—সেই ব্যালজাক পৃথিবীর লোকের কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ ব্যাল্‌জাক্‌ সাক্‌সেসফুল। আর সুশীতল? সুশীতল অফিসেও যেমন, বাড়িতেও তেমনি। সারাজীবন ব্যালজাকের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করে গেছে। কিন্তু তার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে বলেই লোকে তাকে অপদার্থ বলেছে। অফিসের সাহেব তাকে অপদার্থ বলেছে। তার স্ত্রী তাকে অপদার্থ বলেছে। যারা তার 'সুখের সংসার' 'বিধিলিপি, 'মিলন-বিরহ' পড়েছে, তারাও তাকে অপদার্থ বলেছে। হরিনাভি স্কুলের হেডমাস্টার, সংস্কৃতের

টীচার যদুবাবু, সবাই যখন শুনেছে যে এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পেলেও অফিসে সে মাইনে পায় একশো তিরিশ টাকা—তখন তাঁরাও তাকে অপদার্থ বলেছেন। কেউ কিন্তু তার পরিশ্রম দেখেনি, কেউ নিষ্ঠা দেখেনি, কেউ তার সততা দেখেনি, কেউ তার আন্তরিকতা দেখেনি। দেখেছে শুধু সাক্সেস্। তাই জন্যেই তো বলছিলুম—In history as in life it is success that counts. গান্ধীজী সাক্সেস্‌ফুল হয়েছিলেন বলেই তিনি মহাত্মা গান্ধী। ফাদার অব দি নেশন। হেরে গেলে তাঁকেই আবার আমরা বিশ্বাসঘাতক বলে ফাঁসি দিতাম। সাকসেস্-এর কোনও খুঁত থাকতে নেই। সাকসেস্ নিষ্কলুষ। সাকসেসের কাছে সব কিছু তুচ্ছ—এমন কি ব্যাকরণও তুচ্ছ—বলেছিলেন ভিকটর হুগো! ইসকাইলাস্ বলেছিলেন—মানুষের চোখে সাকসেসই ভগবান—।

তা তারপর আর একটা বই‌ও লিখতে শুরু করেছিল সুশীতল।

সুশীতল বলেছিল—এ বইখানা আমাকে নির্ঘাত অমর করে রাখবে—দেখো—

বিরাট বই সেটা। নাম দিয়েছিল 'মরীচিকা'।

অঘোরবাবু বললেন—সেই বই বেরিয়েছিল ?

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে মশাই—কোথায় যেন দেখেছি—

রায়বাহাদুর বললেন—না, সে-বই অর্ধেক লেখা হবার পর সুশীতল একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই সে বই আর শেষ হয়নি তার। সুশীতল ভেবেছিল একজনকে মুখে মুখে ডিক্‌টেশন দিয়ে লিখিয়ে শেষ করবে। কিন্তু তার অমর হবার শেষ চান্স আর সে পায়নি। তার কয়েকমাস পরেই সে মারা গিয়েছিল। তখন তার কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে প্রায় সবটাই বই ছাপাতে আর বাঁধাতে আর বিজ্ঞাপন দিতে খরচ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র সামান্য কয়েকটা টাকা খরচ হতে বাকি ছিল তখনও। কিন্তু সে-কটা টাকাও শ্মশানে তার সৎকারের সময় কাজে লেগে গেল।

আমেরিকা

মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো ? কলকাতা থেকে বম্বে যাবার পথেই মিস্টার রিচার্ডের সঙ্গে আলাপ। মাত্র চার ঘণ্টার আলাপ। দমদম থেকে উড়তে শুরু করছিলুম সন্ধ্যে ছ'টার সময়। ভাইকাউন্ট-এর ভেতরে মিস্টার রিচার্ডের সিট নাম্বার ছিল থ্রি-সি আর আমার থ্রি-ডি। একেবারে পাশাপাশি। মিস্টার রিচার্ডের বোধ হয় গল্প করবার মেজাজ ছিল তখন। তিনিই প্রথম আরম্ভ করেছিলেন।

বলেছিলেন—আর ইউ এ ভেজিটারিয়ান ? আপনি কি নিরামিষভোজী ?

আমি নিরামিষভোজী কি না, তা নিয়ে মিস্টার রিচার্ডের মাথা ঘামানোর কথা নয়। বুঝেছিলাম তিনি গল্প করতে চান পাশের লোকের সঙ্গে। তার পর আস্তে আস্তে অনেক কথা উঠলো। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। তের বছরে কী কী উন্নতি অবনতি হয়েছে, কী কী হয় নি, তারই ছেঁদো কথা সব। এ-সব বিদেশীদের মুখরোচক আলোচনা। এই প্রথম ইণ্ডিয়ায় এসেছেন মিস্টার রিচার্ড। গৌতম বুদ্ধের দেশ, লর্ড চৈতন্যের দেশ, সোয়ামী ভিভেকানন্দের দেশ, ল্যাণ্ড অব টেম্পলস্। দি গ্রেট ইণ্ডিয়া। ওদিকে ক্যাশমিয়ার আর এদিকে কুম্যারিকা, দি হিমালয়াস্ আর দি গ্যাঞ্জেস। বেনারসের সাধু, মথুরার পাণ্ডা, বৃন্দাবনের ভিখিরী, দিল্লির টাঙ্গাওয়ালা, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ। সব দেখা শেষ করে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে উঠেছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন নিজের দেশে, আমেরিকায়।

কলকাতার নাম শুনেই একটু কৌতূহল হলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কলকাতা কেমন লাগল আপনার ?

মিস্টার রিচার্ড আমার দিকে পাশ ফিরলেন। বললেন—বলবো ?

বললাম—বলুন না—

মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো ?

বললাম—তার মানে ?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—মাত্র এক দিন ছিলাম কলকাতার হোটেলে, এক দিনের অভিজ্ঞতায় কোনও দেশ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কিন্তু প্রথম দিনেই একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেই ঘটনাটা বললেই আপনি একটা স্টোরি পেয়ে যাবেন—কারণ শেষটা আমার আর দেখা হয় নি—

বললাম—তা হলে গোড়া থেকেই বলুন—

মিস্টার রিচার্ড বললেন— ঘটনাটা ঘটলো প্রথম নাইটেই। প্লেন এসে পৌঁছেছিল বিকেল চারটের সময়। এরোড্রোম থেকে সোজা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিরাট হোটেল, আগে থেকেই আমার রিজার্ভ করা ছিল রুম। স্টিউয়ার্ড, বয়, বাবুর্চি, ম্যানেজার, বোর্ডার সবাইকে দেখলাম—দেখলাম সবাই খুব কেয়ার নিলে আমার—আমি কী খাই, আমি কী খেতে ভালবাসি, আমি হট্ না কোল্ড, কী খাবার পছন্দ করি, আমার কখন কী দরকার সব খবর তারা জিজ্ঞেস করে নিলে—। বিকেল বেলা বেড়াতে গেলাম সিটিতে। গেলাম হগ্ মার্কেটে, দু একটা জিনিসপত্র কিনলাম—দেখলাম বেঙ্গলীজ আর ফানি পিপিল্! ফরেনারদের তারা দেবতা মনে করে এখনও, এই ইণ্ডিপেনডেনসের তেরো বছর পরেও—

মিস্টার রিচার্ড এবার একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলেন—

বললাম—তার পর?

মিস্টার রিচার্ড বলতে লাগলেন—চমৎকার লাগলো এই ক্যালকাটা আপনাদের—আগেকার সেই সেকেণ্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার! পশ্চিম দিকে অত বড় মাঠ, সিটির হার্টের মধ্যে এত বড় খোলা মাঠ কোথাও দেখি নি! গভরনস্ হাউসও দেখলাম! আপনাদের লেট্ মহাট্মা গান্ডি বলেছিলেন ইণ্ডিপেনডেনসের পরে ওটা মিউজিয়াম হবে! ভেবেছিলাম মিউজিয়ামটা দেখতে যাবো। আমার বেঙ্গলী গাইড বললে—তা নাকি হয় নি। তা না হয়েছে ভালই হয়েছে—এতদিন স্ট্রাগল্ করে এখন একটু আরাম করাই ন্যাচারাল, শুনলাম আগেকার সবই আছে, সেই গার্ড অব অনার, সেই আট ঘোড়ার বডিগার্ড, সেই এ-ডি-কং, ব্রিটিশ লিগেসির যা কিছু সব ইণ্ডিয়ানরা পুরো দমে ভোগ করছে—। বড় আনন্দ হলো দেখে—অবশ্য দেখলাম আপনারা ময়দান থেকে জেনারেল আউটরামের স্ট্যাচুটা সরিয়ে দিয়েছেন, দিয়ে সেখানে মহাট্মা গানডির স্ট্যাচু বসিয়ে দিয়েছেন—ভেরি গুড, ভেরি গুড—ভারি আনন্দ হলো ক্যালকাটা দেখে—। এতদিন মিস মেয়ো আর আলডাস্ হাক্সলির বইতে যা পড়েছি, দেখলাম সব মিথ্যে, সব প্রোপাগ্যাণ্ডা—সব ভিলিফিকেশন—আমি সন্ধ্যেবেলা টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—কবে একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ এতদিন পরে কোথায় রইল সেই ব্রিটিশ জাত—আর কোথায় রইল সেই কুইন ভিক্টোরিয়া, যিনি একে ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে নিয়ে একে জাতে তুলে নিলেন। হিস্ট্রীতে পড়েছি সেদিন নাকি কুইন ভিক্টোরিয়াকে ইণ্ডিয়ানরা 'মা' বলে

অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল—! আজ সেই কাণ্ট্রি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়েছে—এটা বৃটেনেরও প্রাইড, ইণ্ডিয়ারও গ্লোরি—চমৎকার, বিউটিফুল—

—তার পর ?

—তার পর ডিনারের পর নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছি। শোবার আগে আমার বয় আমাকে কফি দিয়ে গেছে। গাইড-বুকটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কত রাত মনে নেই, দরজায় একটা নক্ পড়লো। মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে—! প্রথমে মনে হলো ভুল শুনছি। খানিক পরে আবার একটা নক্—

উঠে পড়লাম। দরজার ভেতর থেকে বললাম—কে ? হুজ্ দ্যাট্ ?

খানিকক্ষণ চুপ চাপ !

উত্তর না পেয়ে আমি দরজা খুললাম। দেখি আমার বয় হুকুমালী।

হুকুম আলি মাথা নিচু করে সেলাম করতে লাগলো বার-বার। বিকেল থেকেই হুকুমালী আমার সেবা করছে। বড় ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট। বুঝলাম ব্রিটিশ-আমলের ফরেনারদের সার্ভ করে করে হুকুমালী আদব-কায়দায় দুরস্ত হয়ে গেছে।

হুকুমালী বললে—হুজুর গোস্তাকি মাফি হয়—

—কী হুকুমালী ? ক্যায়া মাঙতা ?

হুকুমালী বললে—একজন সাহেব হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়—

—কোন্ সাহেব ?

এতক্ষণ দেখতে পাই নি। টেরাসের কোণে অন্ধকারে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমেরিকান হাওয়াই কোট আর ট্রাউজার পরা, ইয়ং ম্যান অব সে থার্টি—বড় জোড় তিরিশ বছর বয়েস হবে। গায়ের রং ব্ল্যাক ট্যান। হাতে একটা লেদার পোর্টফোলিও ব্যাগ ! কাছে এসেই বললে—গুড ইভনিং স্যার—গুড ইভনিং—

বললাম—গুড ইভনিং ! ইয়েস ?

ইয়ং ম্যান বললে—ডু ইউ ওয়াণ্ট আর্টিস্ট স্যার ? আপনি আর্টিস্ট চান ?

—আর্টিস্ট !

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। আর্টিস্ট ! কিসের আর্ট ! ছবি আঁকবার জন্যে ? আমার ছবি আঁকবে ! পোর্ট্রেইট ! কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—আর্টিস্ট ?

ইয়ং ম্যান বললে—ভেরী গুড আর্টিস্ট স্যর, ইয়ং অ্যাণ্ড বিউটিফুল—

—তার মানে ?

ইয়ং ম্যান বললে—গার্লস স্যার—কলেজ গার্ল্স—এই স্যাম্পেল-ছবি আছে আমার কাছে, এই দেখুন—

বলে পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে একগাদা ফোটোগ্রাফস্ বার করলে। একগাদা মেয়েদের ছবি। ইয়ং সুইট গার্ল্স। চমৎকার চেহারা, ওয়েল ড্রেসড্, প্রায় ডজন খানেক—

ছবিগুলো দেখিয়ে বলতে লাগলো—যাকে আপনার ইচ্ছে, পছন্দ করতে পারেন, যাকে ইচ্ছে! সবাই রেসপেকটেব্ল সোসাইটির গার্ল, এই দেখুন, এ হচ্ছে মিস লোলিটা এর বয়েস নাইনটিন, এর বয়েস সেভেনটিন, আর এই যে দেখছেন বব্ করা চুল, এ হলো পাঞ্জাবী গার্ল—সব রকম আর্টিস্ট পাবেন আমার কাছে, চাইনিজ, বার্মিজ, বেঙ্গলীজ, অল ভ্যারাইটিজ—

আমি চুপ করে আছি দেখে ইয়ং ম্যান আরো বলতে লাগলো—অন্য এজেণ্টেরাও আপনার কাছে হয়তো আসবে, হয়তো অনেক রকম পিকচার দেখাবে, তবে কী জানেন, আমার কাছে আপনি কোনও ডিজ্অনেষ্টি পাবেন না—তা ছাড়া আমার স্টক-এর সঙ্গে অন্য এজেণ্টদের স্টক-এর তুলনা করলে আপনি নিজেই তফাৎটা ধরতে পারবেন—আপনি ফরেনার, আপনাকে ঠকিয়ে অন্তত ইণ্ডিয়ার বদনাম করবো না আমি—

তার পর ছবিগুলো নাড়তে নাড়তে আবার বলতে লাগল—আপনি হয়তো আমার কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না, ভাবছেন আপনাকে বিদেশী পেয়ে হয়তো আমি এই রাত্তির বেলা ঠকিয়ে দেব, আসলে এ-লাইনে সবাই-ই ঠকায়, তবে আমি নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি এইটুকু যে, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট—

বলে ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বার করলে। বার করে আমার হাতে এগিয়ে দিল।

দেখলাম—কার্ডটায় লেখা রয়েছে—A.C. Chakraverty, Artist Supplier.

হুকুমালী তখনও দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। সে এবার সাহস পেয়ে কাছে এগিয়ে এল।

বললে—হুজুর, এ-সাহেব বরাবর এই হোটেলের সাহেবদের সেবা করে আসছে, আজ পর্যন্ত ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা থেকে যত সাহেব এসেছে, সকলকে ইনিই আর্টিস্ট সাপ্লাই করেছেন—

চক্রবর্তী বললে—এরা সব জানে স্যার, এদের সঙ্গে আমার বহুদিনের কারবার, আমার কাছে কোনও ফ্রড্ পাবেন না—বিশ্বাস করে একবার আমাকে টেস্ট করে দেখুন, তার পর কার্ড তো আপনার কাছে রইলই—

মনে মনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম তখন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির

গ্র্যাজুয়েট, ইয়ং হ্যাণ্ডসাম চেহারা, এ এ-প্রফেসনে এলো কেন? কত জায়গায় তো ঘুরেছি, কায়রো, বেইরুট, ইরান, পিকিং, ফার ইস্ট, মিডল ইস্টের সব শহর দেখেছি, রাত্রেও সেখানকার হোটেলে কাটিয়েছি। কিন্তু এমন ঘটনা তো কখনও ঘটে নি। তা বলে একেবারে এই হোটেলের ভেতরে!

আমি চুপ করে আছি দেখে চক্রবর্তী যেন উৎসাহ পেয়ে গেল হঠাৎ।

বললে—রেট্ সম্বন্ধে আপনি ভাববেন না, আমার ফিক্সড্ রেট্ বটে কিন্তু কমপ্যারেটিভলি চীপ—খুব সস্তা, ঘণ্টা পিছু পঞ্চাশ টাকা, ফিফ্‌টি রুপীজ—

আমি হঠাৎ বললাম—হোটেলের ম্যানেজারের পারমিশন আছে?

আমার কথাটা শুনে ইয়ং ম্যান যেন চমকে উঠলো।

বললে—পারমিশন?

—হ্যাঁ, তুমি যে এই আর্টিস্টের ব্যবসা করছো, হোটেলের ভেতরে ঢুকেছ, ম্যানেজার জানে এটা? ম্যানেজারের অনুমতি আছে?

চক্রবর্তী কি বলবে বুঝতে পারলে না। এবার একবার হুকুমালির মুখের দিকে চাইলে।

বললে—স্যার, এর জন্যে আর পারমিশনের কী দরকার?

—পারমিশন আছে কি না আগে তাই বলো? আমার গলার আওয়াজে যেন পাজলড্ হয়ে গেল ছোকরা। একটু থতমত খেয়ে গেল। বুঝুন, কী তাজ্জব কাণ্ড আপনাদের হোটেলের ভেতর। টুরিস্টরা আসে ইণ্ডিয়া দেখতে, সবাই জানে তাদের হাতে অনেক টাকা থাকে। টুরিস্ট দেখলেই সবাই সব জিনিসের চড়া দর হাঁকে। সেটার তবু কারণ বুঝতে পারি। সব ইস্টার্ন দেশেই সেটা আছে। তাতে তেমন কিছু দোষ নেই। কিন্তু খাস ক্যালকাটার রেস্‌পেক্‌টেবল্ হোটেলের মধ্যে এ কী কাণ্ড বলুন তো। আবার বলছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট! আবার বলছে কলেজ-গার্ল, রেস্‌পেক্‌টেবল্ সোসাইটির গার্ল। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছে! এ-ও নিশ্চয়ই ব্লাফ। আমাকে টুরিস্ট পেয়ে ব্লাফ দিচ্ছে! রাস্তায় ফুটপাতে এ-রকম ঘটনা ঘটে, তা স্বাভাবিক! কিন্তু একেবারে হোটেলের ভেতরে। তবে কি শেয়ার আছে সকলের! ম্যানেজার, বয়, বাবুর্চী সবাই জড়িত!

আবার বললাম—পারমিশন আছে কি না, বলো শিগগির? কুইক্—

এবার যেন ছোকরা ভয় পেয়ে একটু পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

হুকুমালী এতক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সে টপ্ করে কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেল।

ছোকরাও পালিয়ে যায় দেখে আমি খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলেছি।

বললাম—চলো, ম্যানেজারের কাছে চলো, চলো শিগগির—

আমার মূর্তি দেখে ছোকরা ভয়ে শুকিয়ে গেল। মনে হলো যেন কেঁদে ফেলবে।

বললে—আমাকে ছাড়ুন স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি স্যার—

—নো, নেভার!

বলে ছোকরার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলাম। আমার জোরের সঙ্গে পারবে কেন? আমার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো সে।

বললাম—তোমাকে আমি পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করে দেব, চলো—

ছোকরা বলতে লাগলো—ছাড়ুন স্যার, প্লিজ, আমি আর কোনও দিন আপনার কাছে আসবো না—কথা দিচ্ছি স্যার—

সেই রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেও যেন তার মুখটা করুণ হয়ে উঠলো বড়। বড় প্যাথেটিক সে চেহারা। বড় অসহায়। বুঝলাম এ-ও এদের একরকম ছল্। আমার সামনে এমনি কথা দিয়ে পরের রাত্রে আবার কোনও টুরিস্টের ঘরে গিয়ে নক্ করবে। আবার তাকে জিজ্ঞেস করবে—ডু ইউ ওয়াণ্ট আর্টিস্ট স্যার? আবার পোর্টফোলিও থেকে ছবি বার করে স্যাম্পেল দেখাবে। এ-রকম ঘটনা আমাদের আমেরিকায় চলে। সেখানে এর চেয়েও বীভৎস কাণ্ড হয়। কিন্তু এখানে, এই ইণ্ডিয়ায়? এ যে আমাদের কাছে ল্যাণ্ড অব লর্ড চৈতন্য, ল্যাণ্ড অব গৌটম বুড্ঢা, ল্যাণ্ড অব মহাট্মা গান্ডি।

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে ঢুকলে তুমি এই হোটেলে? এত রাত্রে?

ছোকরা সবিনয়ে স্বীকার করলে। বললে—হুকুমালীকে বখ্শিস্ দিয়ে—

—কত বখ্শিস্ দিয়েছ?

ছোকরা বললে—এক টাকা—

তার পর একটু থেমে বললে—আমায় আপনি ছেড়ে দিন প্লিজ, আমি কথা দিচ্ছি আর কখনও আসবো না—বিশ্বাস করুন, আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, অভাবে পড়ে আমি এ-কাজ করেছি—আমার ছেলেমেয়েরা সব কদিন ধরে খেতে পাচ্ছে না, আমার ওয়াইফের টি বি—আমার···

বুঝলাম এ-সমস্ত ছল্। এ-সমস্ত বাঁধা বুলি। যখনই ধরা পড়ে যায়, তখনই এই সব বুলি আওড়ায়।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি গ্র্যাজুয়েট, তোমার সার্টিফিকেট আছে? তোমার ডিগ্রী আছে? আমাকে দেখাতে পারবে?

—হ্যাঁ স্যার, দেখাবো, আমি কালকে নিজে এসে আপনাকে দেখিয়ে যাবো!

ভাবলাম আমাকে বোকা পেয়েছে। কাল কি আবার ছোকরার পাত্তা পাওয়া যাবে!

বললাম—কাল দেখালে চলবে না, আজই দেখাতে হবে!

—আজ?

বললাম—হ্যাঁ, আজই—

ছোকরা বললে - কিন্তু এখন যে অনেক রাত, এত রাত্রে আমি কী করে দেখাবো আপনাকে স্যার? আমার কাছে তো নেই, সে আমার বাড়িতে আছে—

বললাম—আমি তোমার বাড়িতেই যাবো—চলো—

—আমার বাড়িতে যাবেন? এত রাত্তিরে?

বললাম—তুমি যে মিথ্যে কথা বলছো না তার প্রমাণ কী? আজ রাত্রেই তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসবো—চলো—

ছোকরা যেন কী ভাবলে খানিকক্ষণ। বললে—আপনি যাবেন?

বললাম—হ্যাঁ যাবো. ট্যাক্সি ভাড়া আমি দেব, তোমায় সেজন্যে ভাবতে হবে না। তোমার কথা যদি মিথ্যে হয় তো আমি তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেব—বি কেয়ারফুল।

ছোকরা বললে—কিন্তু আমি তো আপনাকে আমার কার্ড দেখালাম,—

আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছিল তখন। বললাম—কথা বলে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই—আইদার তুমি আমাকে তোমার কথার প্রমাণ দাও, নয়তো তোমাকে আমি পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করে দেব—

—চলুন।

শেষে সত্যিই রাজি হয়ে গেল ছোকরা। বললে—আপনার কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে, আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর—

তা হোক্, তবু আমার যেন কেমন জিদ চেপে গেল। মনে হলো যখন ইণ্ডিয়ায় এসেছি এখানকার আসল লাইফের সঙ্গে খাঁটি পরিচয় হয়ে যাক্। সমস্ত হোটেলের বোর্ডাররা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু নিচের লাউঞ্জ থেকে নাচের গানের শব্দ আসছে। ও-সব আমি অনেক দেখেছি। ইণ্ডিয়ায় এসে ওয়েস্টার্ন নাচ-গানের ওপর কোনও আকর্ষণ আমার তখন নেই, আমি আমেরিকান। এসেছি ইণ্ডিয়ায়—

ইণ্ডিয়া দেখবার জন্যে তখন ব্যস্ত। দেখবো লর্ড চৈতন্যের দেশকে, দেখবো লর্ড বুড্ঢার দেশকে, দেখবো ফ্রি ইণ্ডিয়াকে।

তখনও চক্রবর্তীর হাতটা ধরে আছি।

হাতটা থরথর করে কাঁপছে তখনও। কী পাতলা হাত। মনে হলো একটা মোচড় দিয়ে যেন হাতটা ভেঙে ফেলা যায়। যেন ভাল পেট ভরে খেতেও পায় না। তবু মনে হলো যদি পালিয়ে যায়। যদি পুলিশের ভয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তখন কি আর কোথাও খুঁজে পাবো আমি একে!

দারোয়ান ট্যাক্সি ডেকে দিলে।

ট্যাক্সিতে চড়ে চক্রবর্তীকে বললাম—কোন্ দিকে যেতে হবে ওকে বলে দাও—

চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে যেন কোনও কথা বেরোচ্ছে না তখনও। ট্যাক্সিওয়ালা চক্রবর্তীর চেনা মনে হলো। সে জানে কোথায় যেতে হবে। বহুদিন বহু টুরিস্টকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পাড়ায়। ভেবেছে আমিও তেমনি একজন টুরিস্ট। আমিও যথা নির্দিষ্ট জায়গায় যাবো, তার পর যথারীতি ঘণ্টা দু-এক সেখানে কাটিয়ে চলে আসবো। চক্রবর্তীকে তার কমিশন দেব। ট্যাক্সিওয়ালাকেও মোটা বখ্‌শিস্ দেব। যা সবাই দিয়ে থাকে। যা নিয়ম আর কি! তাই ট্যাক্সিওয়ালাও লম্বা স্যালিউট করেছিল আমাকে।

এ-সব আমার জানা ছিল। তাই চক্রবর্তীকে বললাম—তুমি ওকে ডেস্টিনেশন বলে দাও চক্রবর্তী—

চক্রবর্তী ড্রাইভারকে জায়গার নাম বলে দিলে। ট্যাক্সি হু হু করে চলতে লাগলো।

চক্রবর্তী হঠাৎ কথা বললে।

বললে—স্যার, আপনার কিন্তু কষ্ট হবে খুব—

বললাম—কেন, কষ্ট হবে কেন?

—সে অনেক দূর।

বললাম—কতদূর?

চক্রবর্তী বললে—সে টালিগঞ্জ বলে একটা জায়গা—

টালিগঞ্জ! আমার গাইড-বুকটা খুললাম। আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। নামটা কোথাও পেলাম না। তাতে বোটানিক্যাল গার্ডেনস্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেকস্, জু-গার্ডেন, গানটি-ঘাট, মুজিয়াম—সব নাম আছে, কিন্তু টালিগঞ্জের নাম তো নেই।

বললাম—টালিগঞ্জ কি কলকাতার বাইরে ?

চক্রবর্তী বললে—না স্যার, কলকাতার মধ্যে—

—কলকাতার মধ্যে তো গাইড-বুক-এ নাম নেই কেন ?

চক্রবর্তী বললে—সেখানে যে টুরিস্টদের কেউ যায় না স্যার ! টুরিস্টদের দেখবার মতন জায়গা নয় যে সেটা—

তা হবে ! হয়তো সুবার্ব ! শহরের ব্যাক্‌ওয়াড এরিয়া। টুরিস্টদের সে-সব জায়গা না-দেখানোই ভালো।

খানিক পরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এত প্রফেশন থাকতে এ-প্রফেশন নিলে কেন ?

চক্রবর্তী বললে—আমি চাকরি করতাম স্যার আগে, গভর্নমেণ্ট অফিসে চাকরি করতাম, দেড় শো টাকা মাইনে পেতাম—তার পর আমার চাকরি গেল—

—কেন ?

চক্রবর্তী বললে—একবার অফিসে স্ট্রাইক হলো, আমিও ধর্মঘট করেছিলাম, আমার টেম্পোরারী চাকরি ছিল, আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে। বললে আমি নাকি ডিস্টারবিং এলিমেণ্ট। 'বললে—আমি নাকি কমিউনিষ্ট—

চক্রবর্তীর মুখের দিকে চাইলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি সত্যিই কমিউনিস্ট নাকি ?

—না স্যার, আমি কমিউনিস্ট নই স্যার, আমি শপথ করে বলছি আপনাকে, আমি কমিউনিস্ট নই। আপ্ অন্ গড্ বলছি। আমার ওপর রাগ ছিল আমার অফিসারের। আমি দেখতাম আমাদের অফিসাররা অফিসের স্টেশন-ওয়াগান নিয়ে পিক্‌নিক্ করতে যায়, অফিসের চাপরাশিদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাট্‌না বাটায়, জল তোলায়, রান্না করায়—তবু আমি কোনও দিন কিছু বলি নি ! আমি জানতাম আমাদের ক্লার্ক হতেই জন্ম হয়েছে, আর বড়লোকের ছেলেদের, মিনিস্টারদের রিলেটিভদের অফিসার হবার জন্যে জন্ম ! তা-ও আমি কিছু বলি নি। তবু আমি কিছু বলি নি। কারণ আমার তো টেম্পোরারি চাকরি, আমার বিধবা বুড়ী মা আছে সংসারে—ওআইফ্ আছে, দুটো মাইনর ছেলেমেয়ে আছে—আমার ও-সব কথা বলা তো ক্রাইম—

—তবু তোমার চাকরি গেল ?

—হ্যাঁ স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি সাত বছর চাকরি করার পরও টেম্পোরারী

ছিলাম, তখনও আমার কনফার্মেশন হয় নি তাই আমার চাকরি গেল চাকরিও গেল, আর পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম স্ট্রাইক-ফাণ্ডে, তা-ও গেল—

বুঝলাম সমস্তই ছলনা। সমস্তই মিথ্যে কথা। সাত বছর চাকরি করার পর কেউ টেম্পোরারী থাকতে পারে ? আর শুধু স্ট্রাইক করার অপরাধেও কারোর চাকরি খতম হতে পারে না। পাঁচ টাকা স্ট্রাইক ফাণ্ডে চাঁদা দিলেও খতম্ হতে পারে না। তোমরা আমাদের আমেরিকাকে যত বড় ক্যাপিট্যালিস্টদের দেশই বলো, সেখানেও স্ট্রাইক করার জন্যে, ধর্মঘট করার জন্যে চাকরি যায় না। আমি মনে মনে বুঝলাম ছোকরা আমাকে ব্লাফ দিচ্ছে।

তবু মুখে কিছু বললাম না। জিজ্ঞেস করলাম—তার পর ?

—তার পর স্যার অনেক দরখাস্ত করলাম অনেক জায়গায়। কোথাও চাকরি পেলাম না। আর কতদিন না-খেয়ে থাকবো! কতদিন ধার করে চালাবো। ধারও কেউ দেয় না আর। বন্ধু-বান্ধবদের তো সকলেরই প্রায় আমার মত অবস্থা! শেষে আমার ওআইফ-এর সিরীয়াস অসুখ হলো। একদিন উপায় না দেখে ডাক্তার ডাকলাম। তখন রোগের খুব বাড়াবাড়ি। ডাক্তার দেখে বললেন—টি বি—

আবার ব্লাফ! বুঝলাম ছোকরা ফরেন টুরিস্ট পেয়ে আমার সহানুভূতি আদায় করবার চেষ্টা করছে! আমি এদের চিনি!

—তার পর ?

—তার পর এই এজেন্সিটা পেলাম।

বললাম—এজেন্সি মানে ?

চক্রবর্তী বললে—হাফ পার্সেণ্ট আমি পাই কিনা। টোট্যাল ইনক্যামের ওপর আমি পাই হাফ পার্সেণ্ট, বাকিটা জমা দিতে হয় অফিসে গিয়ে—

—তোমার অফিস আছে ?

—হ্যাঁ স্যার, আমি তো মাত্র কমিশন এজেণ্ট। মোটা প্রফিট্ তাদেরই—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় তোমার অফিস ? তারা কারা ?

চক্রবর্তী হঠাৎ খুব বিনীত গলায় বললে—তাঁদের আমি নাম বলতে পারবো না স্যার, এক্সকিউজ্ মি—

—কেন ?

—না স্যার, আমাকে মাফ করবেন, তাদের নাম-ঠিকানা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। আমাকে কেটে ফেললেও না। তাঁরা আমার বিপদের দিনে কাজ

দিয়ে সাহায্য করেছেন, অনেক উপকার করছেন, নইলে এতদিনে আমি পথে বসতাম, তাঁদের নাম আমাকে বলতে বলবেন না স্যার, আমার অধর্ম হবে তা হলে—তাছাড় আপনি তো চলে যাবেন, তার পর আমাকে কে বাঁচাবে ?

ট্যাক্সি চলছিল হু হু করে। কোথায় চলেছি, কোন্ দিকে চলেছি কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমার গাইডবুকে এ-দিককার কোনও নির্দেশ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—আর কতদূর ?

—আর বেশি দূর নয় স্যার, এসে গেছি—এবার বাঁয়ে চলো সর্দারজী।

তার পর একটু থেকে বললে—বাড়ি তো যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে যে কি দেখবো বুঝতে পারছি না স্যার—

—কেন ?

চক্রবর্তী বললে—সেই সকাল সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি স্যার, দেখেছিলাম আমার ওআইফের তখন খুব জ্বর, আজ মা বলেছিল ডাক্তার ডেকে আনতে, বেরোবার সময় বলেছিলাম ডাক্তার ডেকে আনবো—তা সকাল থেকে যেখানে গেছি, সেখানেই শুধু হাতে ফিরে এসেছি। ভোর বেলায় মিস্টা আগরওয়ালার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়ে বললাম—খুব ভাল আর্টিস্ট আছে. একবার দেখুন শুধু—তা কিছুতেই শুনলেন না। তিনি বললেন, তাঁর অন্য এনগেজমেণ্ট আছে—

অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো চক্রবর্তী। ক্যালকাটার সব বড় বড় লোক, বড় বড় মিলওনারস্, বড় বড় মার্চেণ্টস্। সকলে চক্রবর্তীর ক্লায়েণ্ট। সকলের কাছে গিয়েই হাজির হলো। সেই একই কথা, এক প্রস্তাব। ভাগ্য যেদিন খারাপ হয়, সেদিন ওই রকমই হয়। চক্রবর্তীর মনে হলো টাকার যেদিন তার সবচেয়ে বেশি দরকার সেইদিনই ভাগ্য যেন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সবচেয়ে বেশি। শেষকালে সারা ক্যালকাটা ঘুরেছে চক্রবর্তী, কোথাও কিছু কাজ মেলে নি। সব জায়গা থেকেই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাকে। ভোর বেলা বেরিয়েছে, তার পর সারা দিন আর খাওয়া হলো না। সারা দিনটাই উপোষ করে কেটে গেল চক্রবর্তীর।

চক্রবর্তী বললে—অথচ টাকা না হলে আমার চলবে না। শেষে হতাশ হয়ে যখন বাড়ি ফিরবো কি না ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো আপনার হোটেলের ভেতরে গিয়ে একবার খবর নিয়ে দেখি কেউ ফরেন টুরিস্ট আছে কিনা। হুকুমালী বললে—আজ বিকেলেই একজন আমেরিকান টুরিস্ট এসেছে। তাকে একটা টাকার লোভ দেখিয়ে শেষে আপনার·

বললাম—ডোণ্ট ট্রাই টু ব্লাফ মি, আমাকে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা কোর না—আমি তোমাকে এখনও সাবধান করে দিচ্ছি—তোমার কান্না শুনে আমি ভুলবো না, আমি আমেরিকান—

চক্রবর্তী বললে—কেঁদে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করছি না স্যার, কান্না শুনলে আজকাল ইণ্ডিয়ানরাও ভোলে না স্যার, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না, জেলে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু আমি জেলে গেলে যে মা, বউ, ছেলেমেয়ে সব মারা যাবে স্যার—বিলিভ মি, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি—

বলতে বলতে চক্রবর্তী হঠাৎ ড্রাইভারকে বললে—থামো—

ট্যাক্সিটা থেমে গেল।

চক্রবর্তী বললে—নেমে আসুন স্যার, এখানটায় বড় কাদা, গাড়ি ভেতরে যাবে না, আর মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হবে—

সে এক অদ্ভুত জায়গা। ক্যালকাটা সিটির মধ্যে যে অমন জায়গা আছে, তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, না দেখলে। চৌরঙ্গীর হোটেলের টেরাসে বসে সে জায়গার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।

চক্রবর্তী বললে—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি নিজে সার্টিফিকেটটা এনে দেখাচ্ছি—

কথাটা শুনে আমি চক্রবর্তীর কোটটা চেপে ধরলাম! আমার মনে হলো ছোকরা এবার সত্যিই পালিয়ে যাবার মতলব করছে। বললাম—নো নো আই ডোণ্ট বিলিভ ইউ—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, আমি যাবো তোমার সঙ্গে—

—তা হলে আসুন—

বলে চক্রবর্তী আমার আগে আগে চলতে লাগলো। আর আমি তার পেছনে। অন্ধকার রাত। দু-একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো আমাদের দেখে। কয়েকটা গরু রাস্তার ওপরে বসে বসে জাবর কাটছে। রিস্ট ওয়াচটার দিকে চেয়ে মনে হলো রাত বোধ হয় তখন দেড়টা—মিড-নাইট—

হঠাৎ চক্রবর্তী পেছন ফিরলো।

বললে—একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে স্যার—

আবার ব্লাফ। আবার ধাপ্পা। ভাবলাম এই মিডল-ক্লাস বেঙ্গলীজ আর ভেরি শ্লাই—এদের মতন ধড়িবাজ জাত আর দুনিয়ায় দুটি নেই। কিন্তু আমিও অ্যাডামাণ্ট, আমিও নাছোড়বান্দা। ভাবলাম যা থাকে কপালে, আমি এর শেষ দেখবোই—

বললাম—কী কথা ?

—দেখুন, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মাকে বলেছিলুম যে, আমি আফিস থেকে আসবার সময় ডাক্তার নিয়ে আসবো। আমি আপনাকে দেখিয়ে বলবো—এই ডাক্তার এনেছি—

বাঙালীদের ধড়িবাজির কাছে হার মানবো না, এই প্রতিজ্ঞা করেই বললাম—ঠিক আছে চলো—

—আর একটা কথা !

চক্রবর্তী আবার থমকে দাঁড়াল।

বললে—আর একটা কথা, আপনি যেন বলে দেবেন না যে আমি আর্টিস্ট সাপ্লাই-এর কমিশন-এজেন্সি করি !

—কেন, তারা কেউ জানে না ?

—না স্যার, কেউ জানে না ! আমার মা জানে না, ওয়াইফ জানে না, ছেলেমেয়েরাও জানে না। এমন কি পাড়ার লোকেরাও জানে না—তারা জানে আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করি—

বললাম—ঠিক আছে, তোমার কথাই রইলো—

আমি তখন যে-কোন অবস্থার জন্যেই তৈরী হয়ে রয়েছি। সুতরাং আমি আপত্তি করবো কেন ?

চক্রবর্তী একটি বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো। —মা, মা—ওমা—

ভেতর থেকে একটি ফিমেল্-ভয়েস্ শোনা গেল।

—কে ? খোকা ? খোকা এলি ?

আমি বাঙলা জানি না। তবু আন্দাজ করতে পারলাম।

দরজা খুলতেই দেখি একজন বুড়ী হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই যেন বিব্রত হয়ে গেল। বুঝলাম—চক্রবর্তীর মাদার।

মা বললে—হ্যাঁ রে, এত রাত্তির করতে হয় ? আমি এদিকে ভেবে-ভেবে অস্থির, বৌমা ছটফট করছে—এই এখন একটু ঘুমলো—

চক্রবর্তী বললে—আফিসের কাজে একটু দেরি হয়ে গেল মা—

বলে চক্রবর্তী ভেতরে ঢুকলো। আমার দিকে চেয়ে বললে—আসুন স্যার—

তার পর মা'র দিকে চেয়ে বললে—এই ডাক্তারবাবুকে একেবারে ডেকে নিয়ে এলাম মা—

চক্রবর্তীর মা আমার দিকে চেয়ে দেখলে এবার ভালো করে। তার পর বললে—হ্যাঁ রে খোকা, তুই সাহেব ডাক্তার আবার নিয়ে এলি কেন, আমাদের পাড়ার ফণি ডাক্তারকে ডাকলেই হতো—হোমিও-প্যাথিতেও তো রোগ ভাল হচ্ছে আজকাল—

—তা হোক মা—

বলে আমাকে চক্রবর্তী ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। আমি ঘরের ভেতরের চেহারাটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের মেঝের ওপর ছোট ছোট দুটো বেবি শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি গা, কম্প্লিটলি নেকেড। বুকের পাঁজরাগুলো গোনা যায়। আর তক্তপোষের ওপর বিছনায় ওয়াইফ শুয়ে আছে। চোখ দুটো আধ বোঁজা। বেশি বয়েস নয়—কিন্তু সমস্ত মুখখানা যেন রক্তহীন—ব্লাডলেস। কী প্যাথেটিক সিন! পৃথিবীতে এ-রকম দৃশ্য যে থাকতে পারে, তা আমেরিকানরা ভাবতেও পারে না—কল্পনা করতেও পারে না। একটা ঘরের মধ্যেই সমস্ত। সমস্ত সংসারটা যেন সেই একখানা ঘরের মধ্যেই শেষ। যেন নিশ্বাস, হাওয়া, প্রাণ, আনন্দ, যন্ত্রণা সব একটা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

চক্রবর্তী হঠাৎ বললে—মা ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—

মা চাবিটা দিয়ে বললে—ট্রাঙ্কের চাবিটা আবার কি করবি এখন?

—একটা জিনিস বার করবো।

বিছানার এক কোণে ওপর-ওপর দুটো ট্রাঙ্ক সাজানো ছিল। চক্রবর্তী বিছানার ওপরে উঠে চাবি দিয়ে ট্রাঙ্ক খুললো! তার পর ভেতর থেকে সব জিনিসপত্র বার করতে লাগলো একে একে। নানা বাজে জিনিসের স্তূপ। অনেক খুঁজে অনেক চেষ্টা করে বললে—এই যে পেয়েছি স্যার—পেয়েছি—

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বি-এ ডিগ্রীখানা গোল করে একটা কাগজে সযত্নে মোড়া ছিল। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে চক্রবর্তী।

আমি সেটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর খুলে দেখলাম না। আর খুলে দেখতে প্রবৃত্তিও হলো না। আমি যেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। আমায় যেন কেউ আফিম খাইয়েছে! আমার যেন সেখান থেকে আর নড়বার ক্ষমতাও নেই। অস্থি-চর্মসার একটা শরীর। প্রাণ তাতে আছে কি নেই বোঝা যায় না! শরীরটা কুঁচকে বেঁকে শুয়ে আছে। মনে হলো ও যেন চক্রবর্তীর ওয়াইফ নয়। ও যেন একজন টি বি পেসেণ্ট নয়। একটা উদ্ধত নোট-অব-ইন্টারোগেশন! বিংশ শতাব্দীর মডার্ণ সভ্যতার সামনে যেন একটা সুতীক্ষ্ণ নোট-অব-ইন্টারোগেশন ছাড়া কিছু নয়!

চক্রবর্তী আমার কাছে সরে এল এবার।

বললে—ওটা খুলে দেখুন স্যার—দেখবেন জেসুইন ডিগ্রী—ভাইস-চান্সেলারের সই আছে নিচেয়—

আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরের মধ্যে।

চক্রবর্তী চুপি চুপি বললে—আপনি একটা কিছু কথা বলুন স্যার নইলে আমার মা'র সন্দেহ হবে।

হঠাৎ একটা বেবি কেঁদে উঠলো। চক্রবর্তীর মা গিয়ে কোলে নিয়ে ভুলোতে আরম্ভ করেছে। ততক্ষণে তার কান্না শুনে আর একটা কাঁদতে শুরু করলো। সেই কান্নায় যেন সমস্ত পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সেই রাত দেড়টার সময়। ভুলে গেলাম আমি আমেরিকান। ভুলে গেলাম আমি টুরিস্ট, ভুলে গেলাম আমি ফরেনার। ভুলে গেলাম এ আমার প্রোগ্রামের বাইরে। ভুলে গেলাম আমার গাইড-বুকে এ জায়গায় নির্দেশ-সূত্র নেই। তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম।

—স্যার!

চক্রবর্তীর গলার আওয়াজে আমি যেন আবার আমার সেন্স ফিরে পেলাম।

বললাম—এসো বাইরে এসো—

চক্রবর্তী বাইরে এল আমার পেছন-পেছন।

বললাম—তোমার ওআইফকে হসপিট্যালে পাঠাও না কেন? এ রোগীকে কি বাড়িতে রাখতে আছে? এক ঘরে ছেলেমেয়ে মা সবাই থাকা, এটাও তো ডেঞ্জারাস—

চক্রবর্তী বললে—হসপিট্যালে আমার কারো সঙ্গে জানা-শোনা নেই স্যার—কোনও মিনিষ্টার যদি একটু লিখে দেন, তাহলেই হয়ে যায় কিংবা কোনও এম-এল-এ—

আমি আর কী বলবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম—প্রায় সাত শো টাকা রয়েছে। তাড়াতাড়ি টাকাগুলো চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—এই টাকাগুলো নাও চক্রবর্তী। চক্রবর্তী, কিপ ইট, তোমার ওআইফের চিকিৎসা কোর—

টাকাটা চক্রবর্তীর হাতে জোর করে গুঁজে দিলাম।

চক্রবর্তী কিছুতেই নেবে না। বললে—আমি এ নিতে পারবো না স্যার, এ আপনি কী করছেন—

শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে তাকে টাকাটা দিয়ে আমি আবার ফিরে এলাম ট্যাক্সিটার কাছে। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

চক্রবর্তী আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমি বললাম—আচ্ছা, তোমার ওয়াইফ-ছেলেমেয়েদের খেতে দাও না কেন?

চক্রবর্তী হাসলো এতক্ষণে। বললে—ফ্রান্সের রাণীও একবার ওই কথা বলেছিল স্যার, বইতে পড়েছি—

আমি বললাম—না, আমি সে-কথা বলছি না—আমেরিকা থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন গম, চাল, পাউডার মিল্ক ইণ্ডিয়াতে পাঠাই—সে সব তো তোমাদের জন্যেই পাঠাই, তা তোমরা খাও না কেন?

চক্রবর্তী একটু চুপ করে রইল। তার পর বললে—খবরের কাগজে পড়েছি আপনারা পাঠান—

বুঝলাম ঠিক জায়গায় পৌঁছোয় না সেগুলো।

বললাম—ঠিক আছে, কাল বিকেল ছ'টার সময় আমি চলে যাচ্ছি ক্যালকাটা ছেড়ে, তুমি বেলা তিনটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো? পজিটিভলি ঠিক বিকেল তিনটের সময়? ইউ মাষ্ট!

চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলে—কেন, কি জন্যে বলছেন?

—আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই, আরো কিছু টাকা। যা ছিল কাছে তা তোমাকে দিয়ে গেলাম, কালকে হোটেলে তোমাকে আরো তিন শো দিতে পারি! আই ওয়াণ্ট টু হেল্প ইউ—

চক্রবর্তী কিন্তু-কিন্তু করছিল, কিন্তু আমি তাকে রাজী করালাম জোর করে।

ট্যাক্সির ভেতরে আর একবার মনে করিয়ে দিলাম—ঠিক তিনটের সময় এসো কিন্তু, আমি ওয়েট করবো তোমার জন্যে—ঠিক তিনটে—

ঘড়িতে দেখলাম—রাত তখন হাফ-পাস্‌ড্‌ টু। আড়াইটে কাঁটায় কাঁটায়।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। সকালে আর কোথাও বেরলুম না। হুকুম আলি সামনে আসতে একটু সঙ্কোচ করছিল। কিন্তু খানিক পরে সে-সঙ্কোচ কেটে গেল। যে সব জায়গা দেখবো বলে ঠিক করেছিলাম সে সব কিছুই দেখা হলো না। হুগলী-রিভার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বোটানিক্যাল গার্ডেনস, লেইকস্‌, রেস কোর্স, গান্‌টি-ঘাট, কোথাও গেলাম না। রাত্রে যে বিউটিফুল ক্যালকাটা দেখেছি, তার কাছে আর সব যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। শুধু টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে গভর্ণরস্‌ হাউসটা দেখতে লাগলাম একদৃষ্টে। আর সামনে ময়দান। ফোর্ট উইলিয়াম, পলাশী গেট—

যথারীতি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে! আমার গাইড এসে ফিরে গেল।

বললাম—আমি নিজেই সাইট্-সীয়িং করে এসেছি—

হুকুমালিও দু-একবার উঁকি মেরে দেখে গেল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—তিনটে বাজে। চক্রবর্তী আসবে। বাকি তিন শো টাকা রেডি করে রেখে দিয়েছি পকেটে।

আর যেন দেরি সয় না। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম তিনটে বেজে গেছে। তিনটে পনেরো। তিনটে কুড়ি। থি্ থার্টি!

আমি উঠলাম। আর দেরি করা যায় না। এয়ার পোর্টের বাস আসবে। প্লেন ছাড়বে ছ'টায়। তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে।

হঠাৎ হুকুমালি এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—কে চিঠি দিলে?

হুকুমালি বললে—একজন বাবু এসে নিচে ম্যানেজারের কাছে চিঠিটা দিয়ে গেছে।

চিঠিটা সিল করা। খাম ছিঁড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। ভেতরে আমার দেওয়া সেই সাত শো টাকা। সাতটা একশ টাকার নোট! আর সঙ্গে একটা চিঠি। লিখেছে এ সি চক্রবর্তী—আর্টিস্ট সাপ্লায়ার।

লিখেছে—

ডিয়ার সার,

কালকে আপনার দেওয়া সাতশো টাকা ফেরৎ পাঠালাম পত্রবাহক মারফৎ। আজকে তিনটের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতিও রাখতে পারলাম না। কারণ কাল শেষ রাত্রের দিকে আমার স্ত্রী মারা গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ। ইতি—

এই। এইটুকু শুধু। আর কিছু নয়।

আমি চিঠিখানা আর টাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! কিছু ভাবতে পারলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল। হঠাৎ খেয়াল হলো সাড়ে চারটে বেজেছে। হোটেলের সামনে এয়ারপোর্টের বাস এসে পৌঁছেছে। হুকুমালী আমার স্যুটকেশ নিয়ে নেমে চলে গেল।

বললাম—তার পর?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—তার পর এই তো যাচ্ছি—।

তার পর হঠাৎ যেন বড় একসাইটেড হয়ে উঠলেন মিস্টার রিচার্ড।

বললেন—কিন্তু আমি আজ আপনাকে বলে রাখছি—দিস্ ইজ্ রং, দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল—এ অন্যায়, এ সততা পাপ—এ অনেষ্টির কোনও দাম নেই মডার্ণ পৃথিবীতে—দিস্ ইজ্ রং—দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যালি রং—

মিস্টার রিচার্ডের চিৎকারে আশেপাশের অন্য সিট থেকে সবাই আমাদের দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। ষোল হাজার ফুট ওপরে উঠে মাটির পৃথিবীর মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবাও যেন বিলাসিতা বলে মনে হলো আমার কাছে। এই দামী ডিনার আর লেমন-স্কোয়াশ খেতে খেতে দেশের কথা নিয়ে তর্ক করাও যেন অপরাধ। চোখের জল ফেলাও ক্রাইম! আমি তাই চুপ করে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে মিস্টার রিচার্ড আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো?

—কী?

—আমরা যে লক্ষ লক্ষ টন হুইট, রাইস আর পাউডার-মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়ার গরীব লোকদের জন্যে, সেগুলো কারা নেয়? সেগুলো গরীবদের হাতে পৌঁছয় না কেন? কে তারা? হু আর দে?

এরই বা আমি কি জবাব দেব। প্লেনের ভেতরে আমরা সবাই তো ফরসা দামী কোট স্যুট-টাই-ট্রাউজার পরে বসে আছি। সবাই মোটা দাম দিয়ে টিকিট কিনেছি। কিনে লেমন স্কোয়াশ খেয়েছি, টফি খেয়েছি, ডিনার খেয়েছি। ডিনারের পর কফিও খেয়েছি। আমাদের কী অধিকার আছে এ-আলোচনা করবার! ভাবলাম বলি—সাহেব, তুমি একদিনের জন্যে কলকাতা দেখে গিয়েই তোমার এই অবস্থা আর আমরা জন্ম কাটিয়েছি কলকাতায়, মনুষ্যত্বের এ অপমান আমরা প্রতিমুহূর্তে দেখছি। তাই আমাদের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, আমাদের গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ও-সব কথা থাক্, এসো, অন্য কথা বলি—লেট আস্ টক্ শপ্—

কিন্তু সে-সব কথাও বললাম না।

সামনে আলো জ্বলে উঠলো—আলোর মধ্যে লেখা ফুটে উঠলো—ফ্যাসেন ইয়োর বেল্টস্—

আমরা যে-যার নিজের নিজের পেটে বেল্ট্ বেঁধে নিলাম।

বাইরে চেয়ে দেখলাম—বম্বে সিটির আলোগুলো হীরের টুকরো হয়ে চারি-দিকে ছড়িয়ে আছে। প্লেন নামতে শুরু করেছে। স্যাণ্টাক্রুজে পৌঁছে গেলাম এক-মুহূর্তের মধ্যে।

পদ্মভূষণ

এযুগে এমন একটা বড় দেখা যায় না। এই ঘুঁষ, ভেজাল আর পরশ্রীকাতরতার যুগে এমন ঘটনা সত্যিই দুর্লভ। সবাই যখন যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে, তখন নিশিকান্ত কেন যে এই যুগে জন্মেছিল কে জানে! নিশিকান্ত এই যুগে না জন্মালেই হয়তো ভালো করতো। তাহলে নিশিকান্তও বেঁচে যেত, নিশিকান্তর ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী তারাও বাঁচতো। অন্ততঃ তারা এতখানি অভাব-অভিযোগ থেকে রক্ষা পেত!

একসময়ে আমরা একসঙ্গেই লেখাপড়া করেছি। সে-সব ছোটবেলাকার কথা। নিশিকান্ত ছিল আমাদের সমস্ত দিনের সঙ্গী। আমি, নিশিকান্ত, গোবর্ধন, কার্তিক— এই চারজন। তারপর' চারজনেই চারদিকে ছিটকে গিয়েছিলাম। উনিশ শো পঁচিশ ছাব্বিশ সালের সেই কলকাতা শহরের আবহাওয়া। তখনও মানুষ এত অমানুষ হয়নি। তখন শহরও এত সর্পিল হয়নি। লোকে তখন আশা করতে ভালোবাসতো। ভালোবাসতেও ভালোবাসতো।

তা সে-সব দিনের কথা থাক।

আমরা সবাই ছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তার মধ্যে নিশিকান্ত ছিল আবার একেবারে আসল মধ্যবিত্ত। অর্থাৎ নিশিকান্ত আমাদের মত টিফিনের পয়সা পেত না বাড়ি থেকে। ময়লা জামা-কাপড় পরে স্কুলে আসতো। তবু নিশিকান্তকে আমাদের ভালো লাগতো তার স্বভাবের জন্যে!

নিশিকান্ত বলতো—সৎপথে আছি ভাই, আমার ভয় কীসের? বাবা বলেছে, যে সৎপথে থাকে তার জন্যে ভগবান আছে মাথার ওপর—

এ-সব ছোটবেলাকার সরল বিশ্বাসের কথা। তবে আমরা ছিলাম ছোটবয়েস থেকেই পাকা। আমরা নিশিকান্তর কথা শুনে হাসতুম। আমি হাসতুম, গোবর্ধন, কার্তিক— ওরাও সবাই হাসতো। আমরা যখন ডিটেক্‌টিভ নভেল নিয়ে মশগুল, তখন দেখেছি নিশিকান্ত 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। গীতা পড়ছে। স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো লেকচার পড়ছে। এক একদিন ভালো বই পেলেই নিশিকান্ত দৌড়ে আসতো আমাদের বাড়ি। এসে বলতো—এই ছাখ, এই বইটা পড়ে ছাখ—

বইটা উল্টে পাল্টে দেখে ফিরিয়ে দিতাম নিশিকান্তকে। নিশিকান্ত যেন কেমন

বিমর্ষ হয়ে পড়তো। কিন্তু আমাদের কাছে তখন পাঁচকড়ি দে'র 'নীলবসনা সুন্দরী' বেশি ভালো বই মনে হতো। বেশি উপাদেয়।

যা হোক, বহুদিন পরে এই নিশিকান্তর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

তখন আমাদের সকলেরই বয়েস হয়ে গেছে। মনের সঙ্গে চেহারারও পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক। এতদিন পরে হঠাৎ কাউকে দেখে চিনতে পারার কথা নয়। তবু চিনে ফেললাম।

বললাম—নিশিকান্ত না?

মাঝখানে অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ বছর কেটে গেছে। কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি। পরের দিনই আবার চলে যেতে হবে। অনেক রাত্রে বালিগঞ্জ থেকে শেষ বাসে বাড়ি ফিরছিলাম। আমার দিকে চেয়ে নিশিকান্ত চুপ করে রইলো। বোধহয় চিনতে পারলো না। কিন্তু আমার সন্দেহ হলো ও নিশিকান্ত ছাড়া আর কেউই নয়। তাড়াতাড়ি নিশিকান্তর পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম—নিশিকান্ত, তুমি আমায় চিনতে পারছো না?

নিশিকান্ত বললে—তুমি?

কিন্তু সেই আগেকার নিশিকান্ত যেন আর নেই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে। গাল চুপসে গেছে। ময়লা পাঞ্জাবি। আমি কাছে গিয়ে বসতেই যেন একটু পেছিয়ে সরে বসলো।

বললাম—কী খবর তোমার? কী করছো? কোথায় আছো? আর সকলের খবর কী?

নিশিকান্ত যেন আমাকে এত রাত্রে এই বাসের মধ্যে দেখে খুশী হয়নি! যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে আমাকে।

বললাম—তুমি এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলে কেন?

নিশিকান্ত কথা শুনে হাসলো না। যেন আরো গম্ভীর হয়ে গেল। আমি সরে বসতেই নিশিকান্তও সরে বসলো। বললাম—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

হঠাৎ চমকে উঠলাম। নিশিকান্তর মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। নিশিকান্ত মদ খেয়েছে!!

সত্যিই চমকে ওঠবার মত ঘটনাই বটে! নিশিকান্তর এ-পরিবর্তনে সত্যিই মর্মাহত হলাম। আমাদের সেই নিশিকান্তর শেষকালে এই অধঃপতন!

আমার ভাবান্তর দেখে নিশিকান্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি উঠি, আমি এইখানে নামবো—

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আর একটু হলেই বাসের ঝাঁকুনিতে টলে পড়ে যাচ্ছিলো। আমি ধরে ফেললাম। তারপর আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লো। কোথায় নামছে, কেন নামছে—তাও যেন তার জ্ঞান ছিল না। বুঝলাম আমাকে এড়াবার জন্যেই নিশিকান্ত মাঝপথে নেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমিও উঠলাম। নিশিকান্ত বাস থেকে নামতেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম। নিশিকান্ত আমাকে দেখেই হন হন করে উল্টোদিকে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করছিল। আমি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ডাকলাম—নিশিকান্ত—

আর উপায় নেই দেখে নিশিকান্ত থমকে দাঁড়ালো মুখ নিচু করে।

আমি বললাম—কী হয়েছে তোমার নিশিকান্ত? তুমি কোথায় যাচ্ছো? কোথায় বাড়ি তোমার? আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলছো না কেন?

নিশিকান্ত মুখ নিচু করেই ছিল। আমি তার দুটো হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। নিশিকান্ত আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলো এতক্ষণে। দেখলাম তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে!

বললাম—কী হয়েছে তোমার বলো তো? কাঁদছো কেন?

নিশিকান্ত একটু থেমে বললে—আমি মদ খেয়েছি ভাই—

নিশিকান্তর কথা শুনে আমি কেমন বিহ্বল হয়ে গেলাম। নিশিকান্তর মদ খাওয়াটা যত বিচিত্র, মদ খেয়ে তার অনুতাপ করাটা আমার কাছে তার চেয়েও বিচিত্র লাগলো।

নিশিকান্ত মুখ নিচু করে আবার বললে—আমি জীবনে কখনও মদ খাইনি ভাই, তুমি বিশ্বাস করো, কখ্‌খনো খাইনি—আজকে এই প্রথম মদ খেলাম—তুমি বিশ্বাস করো—

আমি বললাম—তা না-হয় বিশ্বাস করছি, কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে নেমে পড়লে কেন? তোমার বাড়ি কোথায়?

নিশিকান্ত বললে—আহিরীটোলায়—

আহিরীটোলায় নিশিকান্তর বাড়ি আর নেমে পড়েছে এই ভবানীপুরে। আর এই এত রাত্রে!

বললাম—তা এখন তুমি কোথায় যাবে? বাড়ি যাবে না এখন?

নিশিকান্ত বললে—যাবো—

—তা হলে এখানে নামলে কেন ?

নিশিকান্ত প্রথমে কিছু জবাবদিহি করতে পারলো না। তারপর একটু থেমে বললে—সত্যি তুমি কী মনে করলে কী জানি। আমি সত্যিই বলছি জীবনে কখনও এর আগে মদ খাইনি, তুমি বিশ্বাস করো, এই প্রথম খেলাম—

বুঝতে পারলাম না নিশিকান্ত কেন বার বার তার অপরাধটা লঘু করবার চেষ্টা করছে। সারাজীবন যদি মদ না খেয়ে থাকে তো আজ এতদিন পরেই বা খেতে গেল কেন ? আর খেলেই যদি তো অনুতাপই বা কেন করছে তার জন্যে ?

বললাম—চলো, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—

নিশিকান্ত বললে—না, না, তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারবো—

বললাম—না তুমি টলছো, তুমি একলা গেলে কোথাও পড়ে যাবে, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি—আমার হাতে এখন কোনও কাজ নেই—

নিশিকান্ত আমার দিকে চাইলো মুখ তুলে। বললে—জানি না তুমি কি ভাবছো—

আশ্চর্য ! সেই নিশিকান্ত, যে বরাবর ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে চলতো, যে বরাবর সৎপথের মূল্য বুঝতো—সেই নিশিকান্তর চোখে আজ জল। সেই নিশিকান্ত আজ অনুতাপ করছে মদ খাওয়ার জন্যে। এই নিশিকান্ত কতদিন আমাদের উপদেশ দিয়েছে, ভালো ভালো কথা বলেছে। বলেছে—তোমরা ভাই সিগারেট খাচ্ছো, কিন্তু এটা জেনে রেখো সিগারেট খাওয়াটা ভালো নয়—

আমি, গোবর্ধন আর কার্তিক। আমরা তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট ধরেছি সবে। নিশিকান্তকেও সিগারেট ধরাবার কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাকে আমরা কিছুতেই দলে টানতে পারিনি। হাজার চেষ্টা করেও পারিনি।

নিশিকান্ত বলেছে—নেশা করা কি ভালো ভাবছো ? ওতে স্বাস্থ্যও নষ্ট, অর্থও নষ্ট। তা ছাড়া ওতে তো চরিত্রের অধঃপতন হয়—

আমরা বলতাম—সিগারেট তো কলকাতা শহরে সব্বাই খায় ভাই—কত বড় বড় কোম্পানি চলছে সিগারেটের, কত বাঙালীর ছেলে সিগারেট কোম্পানির অফিসে চাকরি করে সংসার চালাচ্ছে—আমরা যদি সিগারেট না-খাই তো তাদের সংসার কী করে চলবে ?

নিশিকান্ত বলতো—তারা সবাই উপোষ করবে, মরে যাবে। তা বলে আমরা কেন সিগারেট খেয়ে চরিত্র নষ্ট করবো ? সিগারেট তুমি বা তোমরা খেলে কিছু ক্ষতি

নেই তেমন, কিন্তু সমস্ত জাতটাই যদি একদিন নেশাখোর হয়ে ওঠে তো কী-সর্বনাশটা হবে বলো দিকিনি! আর তাছাড়া নেশা করাটা কি ভালো! শুধু সিগারেট কেন, কোনও নেশাই তো ভালো নয়। ও সিগারেটও যা মদও তাই। সিগারেট খেতে খেতে শেষকালে যে একদিন মদের নেশা ধরবে। তখন?

আমরা নিশিকান্তর যুক্তি শুনে হো হো করে হাসতাম। বলতাম—নিশিকান্তটা আর মানুষ হবে না কোনওকালে—

নিশিকান্ত বলতো—সিগারেট খাওয়াটাকেই যদি তোমরা মনুষ্যত্ব বলো তো আমি তোমাদের মতে সায় দিতে পারলাম না ভাই। আমি ও-সব নেশাখোরদের ঘৃণা করি। শুধু সিগারেট নয়, মদ, চা, পান, দোক্তা—কোনও নেশাই আমি সমর্থন করি না।

আমরা হাসতাম প্রথম-প্রথম। ছোটবয়েসে এই বুড়োর মত কথাবার্তা শুনে আমরা সবাই-ই হাসতাম। ভেবেছিলাম নিশিকান্ত একদিন সাবালক হবে। পৃথিবীটা চিনবে। তখন আবার তার মত বদলাবে। বুঝতে পারবে—'বোধোদয়' বা 'আখ্যানমঞ্জরী' দিয়ে বর্তমান জগৎটাকে বিচার করা যায় না। বিচার করা উচিতও নয়। কিন্তু নিশিকান্ত শেষ পর্যন্ত নিশিকান্ত হয়েই রইলো। সেই নিশিকান্ত আর শেষ পর্যন্ত বদলালো না। আমরা যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠলাম, তখন আমাদের চালচলন পোশাক-পরিচ্ছদ বদলালো, আমাদের হাব-ভাব কথাবার্তা সবই বদলালো। গোবর্ধন, কার্তিক তারাও আমার মতন একই কলেজে একই আবহাওয়ায় একই ক্লাবে যাতায়াত করতে আরম্ভ করলো। নিশিকান্ত আমাদের সঙ্গে একই কলেজে একই ক্লাবে এসে জুটলো। কিন্তু তার কোনও পরিবর্তন হলো না। সেই আগেকার মত খাটো ধুতি, মোটা শার্ট, ছোট চুল। আগেকার মতই সব রইলো; সিগারেট নয়, পান নয়, নস্যি নয়, চা নয়। একেবারে সাত্ত্বিক পুরুষ আমাদের নিশিকান্ত।

তারপর বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-যার কাজে ছড়িয়ে ছিটকে পড়লাম। গোবর্ধন বি-এ পাস করে ছোটখাটো ব্যবসা করবে বলে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো বড়বাজার অঞ্চলে। কার্তিক একটা চাকরি পেয়ে গেল মার্চেণ্ট অফিসে। আমি কিছু কাজ না-পেয়ে বাঙলায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভরতি হলুম। আর নিশিকান্ত! নিশিকান্তর বাবা মারা গেল সেই সময়ে। নিশিকান্ত একেবারে দিক-বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো। চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো চারিদিকে।

তারপর আমি নিজেই চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেলাম একদিন।

চাকরি মানে জীবিকা। নতুন পরিবেষ্টনীতে নতুন চাকরি নিয়ে সমস্ত ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম কলকাতা শহরকে। ভুলে গেলাম গোবধনকে, ভুলে গেলাম কার্তিককে, ভুলে গেলাম নিশিকান্তকে।

মাঝখানে দু'দিনের জন্যে একবার শুধু কলকাতায় এসেছিলাম। তখন হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল গোবধনের সঙ্গে। যুদ্ধের সময়। কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট চলেছে তখন। ব্যাফল্-ওয়াল্ দেওয়া কলকাতা শহর। ইভ্যাকুয়েশনের পরে কলকাতায় তখন দুর্ভিক্ষ চলেছে ভাতের। দলে দলে গ্রামের ছেলে-মেয়ে বুড়ো রাস্তায় ফুটপাথে এসে বাসা বেঁধেছে। ফ্যান চাইছে বাড়ি বাড়ি। রাত একটা দু'টো পর্যন্ত ভিখিরিদের ভিক্ষে চাওয়ার আর্তিতে গৃহস্থেরা অস্থির হয়ে উঠেছে। বাঙলা দেশের অবস্থা নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এমন সময় গোবর্ধনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। বিরাট একটা গাড়ির ভেতর থেকে গোবর্ধন আমায় ডাকলে। কাছে যেতেই গাড়িতে উঠিয়ে নিলে আমাকে। দেখলাম গোবর্ধনকে চেনাই যায় না একেবারে। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই বুঝতে পারলাম গোবর্ধন বড়লোক হয়েছে। সিল্ক, নেকটাই, সিগারেট, গাড়ি, সবটাই তার ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করছে।

অনেক কথার পর জিজ্ঞেস করলাম—আমাদের কার্তিকের খবর কী রে?

গোবর্ধন বললে—কারো খবর রাখবার সময় পাই না ভাই, আমার ফ্যাক্টরি নিয়ে বড় ব্যস্ত—

জিজ্ঞেস করলাম—কীসের ফ্যাক্টরি?

গোবর্ধন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—ঘি আর সরষের তেলের। আর সঙ্গে আছে চায়ের কারবার—

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম চলছে কারবার? দেশের তো অবস্থা খুব খারাপ দেখছি—

গোবর্ধন বললে—দেশের অবস্থা যা-ই হোক, আমার কারবার খুব ভালই চলেছে। মোটেই সময় পাই না ভাই। এই ছাখ না, সেই ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছি, বাড়ি ফিরবো সেই রাত এগারোটার সময়, তার আগে আর ফিরতে পারবো না—

তারপর একটু থেমে বললে—আমার নতুন বাড়িতে একদিন চল্—

—নতুন বাড়ি?

গোবধন বললে—হ্যাঁ, এক লাখ দশ হাজার দিয়ে একটা বাড়ি করলাম যে—আজই চল্—বাড়িটা দেখবি চল্—

গোবর্ধন সেদিন শেষ পর্যন্ত আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে

যাবার কথা সে-সময়ে ছিল না তার, কিন্তু আমাকে দেখাবার জন্যেই কিছুক্ষণের জন্যে বাড়িতে গেল। বিরাট বাড়ি। সামনে লন্। সুন্দর-সুন্দর ছেলে-মেয়ে হয়েছে তখন তার। কুকুর পুষেছে বাড়িতে। দু'খানা গাড়ি। ঘুরে ঘুরে দেখালে আমাকে। কোথায় বাথরুম। বাথরুমের ফিটিংস বিলিতি না দেশী তাও বললে। দেশী ফিটিংসের সঙ্গে বিলিতির কী তফাত তাও বুঝিয়ে দিলে। ইটালীয়ান মার্বেলের কী-কী গুণ তাও আমাকে জানালো। চা খাওয়াবার নাম করে নেপালী বয়, মুসলমান খানসামা, কিছু দেখাতেই আর বাকি রাখলে না। সমস্ত দেখাশোনা শেষ করে আমি সেদিন চলে এসেছিলুম। গোবর্ধনেরও কাজ ছিল। তবু সেদিন সেইটুকু সময়ের মধ্যেই গোবর্ধনকে পুরুষ-সিংহ বলে মনে হয়েছিল আমার। মনে হয়েছিল আমাদের দলের মধ্যে গোবর্ধনই বোধহয় একমাত্র মানুষের মত মানুষ হতে পেরেছে।

জিজ্ঞেস করলাম—তোর ফ্যাক্টরি কোথায়?

গোবর্ধন বললে—ফ্যাক্টরি তো একটা নয় আমার, তিনটে। একটা খিদিরপুরে, একটা বরানগরে, আর একটা বেহালায়। আর একটা ফ্যাক্টরি খুলবো—সুবিধে মত জমি পাচ্ছি না—

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু এত ঘি, সরষের তেল, চা—চলে তোর?

গোবর্ধন বললে—আমি তো সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারছি না রে—

—কিন্তু এত যে দুর্ভিক্ষ, এত লোক খেতে পাচ্ছে না, এত লোক রাস্তায়-রাস্তায় মরে পড়ে আছে, কারা তাহলে কিনছে এসব?

গোবর্ধন বললে—মিলিটারি। গভর্নমেণ্ট কিনছে লাখ-লাখ টাকার মাল। তা ছাড়া যারা মরছে তারা ছাড়া কি আর খাবার লোক নেই পৃথিবীতে?

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম গোবর্ধনের কথা শুনে। বললাম—কী করে এসব করলি তুই ভাই?

গোবর্ধন বললে—স্রেফ্ পরিশ্রম। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তবে দাঁড় করিয়েছি আমার কারবার। তোরা কেবল আরাম করতে চাস, তাই কিছু হলো না তোদের। এতে খাটুনি আছে ভাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করা পয়সা—টাকা ওমনি হয় নি, পরিশ্রম চাই, আর অনেষ্টি না-হলে ও-পরিশ্রম করেও কিছু হবে না। তোদের সেই ডিক্সনারির অনেষ্টি নয়—একে বলে কমার্শিয়াল অনেষ্টি, এ অন্ত জিনিষ—

যাহোক, এত কথা সেদিন আমার শোনবার অবসর ছিল না। তারও বলবার সময় ছিল না। তার অনেক কাজ। কাজের মানুষ গোবর্ধন। পুরুষ-সিংহ

গোবর্ধন। আমি গোবর্ধনের বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় শেষকালে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমাদের সেই নিশিকান্তর খবর কিছু জানিস ?

গোবর্ধন বলেছিল—আরে নিশিকান্তর কথা আর বলিসনি—

বললাম—কেন ?

—আরে তার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। একটু ড্যাশ নেই। একটু ড্যাশ না থাকলে মডার্ন পৃথিবীতে কি চলে ? লাইফে কি উন্নতি করা যায় ? এখন এ-পৃথিবী তো আর সেই আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের পৃথিবী নেই। ও বুঝলো না যে এটা টুয়েনটিয়েথ্ সেঞ্চুরি। এখন সব জিনিসের মানে বদলে গেছে! অনেষ্টির মানে বদলে গেছে, ট্রুথের মানে বদলে গেছে, লাইফের মানে বদলে গেছে। আমাদের ডিক্সনারি আবার নতুন করে লিখতে হবে—নইলে বাঙালীরা মানুষ হবে না। দেখছিস না, মারোয়াড়ীরা আমাদের সব ব্যাপারে হারিয়ে দিচ্ছে—সব ব্যাপারে আমরা পেছিয়ে পড়ছি—

যাহোক সেদিন গোবর্ধনের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। তারপর আর আমার দেখা করবার কোনও সুযোগ হয়নি তার সঙ্গে। আর পরদিনই কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম নিজের কর্মক্ষেত্রে।

আজ বহুদিন পরে আবার নিশিকান্তর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সত্যিই গোবর্ধনের কথার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। বুঝলাম নিশিকান্তর এ-যুগে জন্মানো উচিত হয়নি। এই আধুনিক যুগে নিশিকান্ত হয়তো সত্যিই আনফিট!

আমি তখন জোর করে নিশিকান্তকে ট্যাক্সিতে উঠিয়েছি।

প্রথমে নিশিকান্ত আপত্তি যা করবার করেছিল। কিন্তু তার আপত্তিতে আমি কান দিইনি। নিশিকান্তকে দেখে আমার সত্যিই মনে হলো ডিক্সনারি আবার যেন নতুন করেই লেখা উচিত। অনেষ্টির মানে নতুন করে লেখা উচিত, ট্রুথের মানে নতুন করে লেখা উচিত, লাইফের মানেও নতুন করে আবার লেখা উচিত।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন তোমার এ-রকম হলো নিশিকান্ত ? তুমিও তো বি-এ পাস করেছিলে!

নিশিকান্ত বললে—ভাই, ভাগ্য আমি মানি না, কিন্তু ভগবান আমি মানি, ভগবানকে আমি এখনও বিশ্বাস করি—যদি ভগবানে আমার বিশ্বাস অটুট থাকে তো একদিন আমার এ-অবস্থা কেটে যাবেই ভাই, এই তোমাকে আমি বলে রাখছি—

বললাম—রাখো তোমার ভগবানের কথা। তুমি তো বি-এ পাস করেছিলে তারপর চাকরি কি আর পেলে না?

নিশিকান্ত বললে—পেয়েছিলাম ভাই! ভগবান আমাকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিল। যখন তোমরা সবাই তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকার চাকরি পেলে, সেই সময়ে আমার ভাগ্য খারাপ, আমি পেলাম দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি—

—সে কী?

—হ্যাঁ ভাই। তখন আমার একটা পয়সা নেই পকেটে। একটা পয়সার জন্যে আমি আকাশ-পাতাল করছি। তখন আমার বাবার অসুখ! তাঁর অসুখে করে ডাক্তার দেখাতে পারছি না। মা'র গয়নাগুলো বেচে বেচে আমি খাচ্ছি। এদিকে বিয়েও করে ফেলেছি তখন। একটা মেয়েও হয়েছে। কী করে যে জীবন কাটাচ্ছি সে-সময়ে সে শুধু ভাই আমিই জানি। জুতো ছিঁড়ে গেলে মুচিকে দিয়ে সারাবার পয়সা পর্যন্ত নেই। এক-একদিন সমস্ত ফ্যামিলি মিলে উপোষ করেছি। পৃথিবীর কোনও লোক সে-সব ঘটনা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। নিজের দুঃখের কথা কাউকে জানানো স্বভাব নয় আমার। ধারও চাইতে পারি না কারোর কাছে। কারো কাছে হাত পাততেও আমার লজ্জা। কিন্তু সমস্ত লজ্জা আমার ভাই আজ ভেঙে গেছে। আমি এখন দু'শো টাকা ধার করে ফিরছি। এ-টাকা ক'টা না হলে কাল বাড়িওয়ালা আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিত। আমার মেয়ের চিকিৎসা হতো না। এই ছাখ ভাই, এই কুড়িটা দশটাকার নোট—

বলে হাতের মুঠোর মধ্যে দশটাকার নোটের বাণ্ডিলটা দেখালো।

নিশিকান্তর মুখের দিকে চাইলাম। অন্ধকারে ট্যাক্সির মধ্যে নিশিকান্তকে যেন বড় অসহায় দেখালো। যত অসহায় ভেবেছিলাম নিশিকান্তকে, তার চেয়েও সে অসহায়। নিশিকান্তকে জীবনে কখনও এমন হতাশা প্রকাশ করতে দেখিনি।

জিজ্ঞেস করলাম—তা সেই দেড়শো টাকার সে-চাকরি কোথায় গেল? সে-চাকরি কি চলে গেল?

—না, চলে যায়নি।

বললাম—টাকাগুলো পকেটে রেখে দাও নিশিকান্ত, পড়ে যাবে—

নিশিকান্ত বললে—না, এ পড়বে না, এ আমার কাছে রক্ত, এ-টাকা হারিয়ে গেলে আমি মরে যাবো—

তবু জোর করে টাকাগুলো তার জামার ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলুম

প্রকৃতিস্থ নিশিকান্ত, হয়তো কোন্ ফাঁকে নোটগুলো পড়ে যাবে কোথাও বলা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথা থেকে টাকা ধার করলে?

নিশিকান্ত বললে—গোবর্ধনের কাছ থেকে। আমি এখন সেখান থেকেই আসছি—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললাম—শেষ পর্যন্ত গোবর্ধনের কাছে গিয়েছিলে?

নিশিকান্ত বললে—হ্যাঁ ভাই শেষ পর্যন্ত গোবর্ধনের কাছ থেকেই টাকা ধার করে আনলাম—কিন্তু এও আমি বলে রাখছি ভাই, যে সৎপথে থাকে তার মাথার ওপর ভগবান আছে। আমার যদি ভগবানে বিশ্বাস অটুট থাকে তো আমি একদিন-না-একদিন তার পুরস্কার পাবোই—!

বললাম—তুমি তো বরাবরই সেই কথা বলতে—

নিশিকান্ত বললে—এখনও সেই কথাই বলি। আমার বাবার কাছে আমি এ শিখেছি। বাবা মারা যাবার সময় আমি তাঁর চিকিৎসা করাতে পারিনি পয়সার অভাবে, আমার একটা ছেলেও মারা গেল বিনা চিকিৎসায়—তাও আমি কখনও কারো কাছে হাত পাতিনি! কিন্তু আজ আর হাত না পেতে পারলুম না! আর গোবর্ধনও তাই আমার ওপর তার প্রতিশোধ নিলে—

—প্রতিশোধ নিলে?

নিশিকান্ত বললে—হ্যাঁ ভাই, গোবর্ধন আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের ওপর চরম আঘাত দিলে, চরম প্রতিশোধ নিলে আমার ওপর—

—কী রকম?

নিশিকান্ত বললে—বলছি সব। তুমি যখন শুনতে চাচ্ছো, তখন সবই বলবো, তোমার সময় আছে তো?

বললাম—আছে—সব শুনবো আমি, বলো!

নিশিকান্ত বললে—সেই দেড়শো টাকার চাকরিটার কথা বলছিলাম, সেইখান থেকে আরম্ভ করি—

নির্জন রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। একটা ট্র্যাফিক-লাইটের সামনে লাল আলো জ্বলতেই থেমে গেল গাড়িটা।

নিশিকান্ত বললে—তখন কলকাতার সব অফিসে ঘোরা শেষ হয়েছে। দরখাস্ত করে করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এমন সময়ে খিদিরপুরের একটা অফিস থেকে আমার দরখাস্তের উত্তর এল। ভাই, প্রথমে চোখকে বিশ্বাস করতে

পারিনি, দেড়শো টাকা মাইনে যেন স্বর্গ। সেই দিনই সেই অফিসে গিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনিও বললেন দেড়শো টাকা মাইনে। কোনও এক্সপেরিয়েন্সের দরকার নেই, বি-এ পাস হলেই হলো। তা আমাকেও পছন্দ হয়ে গেল তাঁর। চাকরিও হয়ে গেল। আমার মন থেকে যেন পাথর নেমে গেল। ফেরবার সময় পাড়ার দোকান থেকে এক সের মাংস কিনে নিয়ে গেলাম। বহুকাল ছেলে-মেয়েদের মাংস খাওয়াতে পারিনি—

আমার স্ত্রী বললে—আবার মাংস নিয়ে এলে কেন ?

বললাম—ছেলে-মেয়েরা খাবে।

ভাবলাম মাসকাবারি মাইনে পেয়ে দাম শোধ করে দেব। দেড়শো টাকা তো কম কথা নয়। দেড়শো টাকায় তখন অনেক কিছু কেনা যায়। শুধু মাংস কেন ! দই, রাবড়ি, রসগোল্লা—যেসব জিনিস ছেলেমেয়েরা শুধু চোখেই দেখেছে, খায়নি কখনও—সেই সব জিনিসও কেনা যায়। মনে হলো আকাশের চাঁদই হাতে পেয়ে গেলাম। দেড়শো টাকার সিংহাসনে বসে আমি তখন সুখের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছি। আর সকলের ছেলে-মেয়ের মত আমার ছেলে-মেয়েরাও ফরসা জামা-কাপড় পরবে, দুধ খাবে, মোটা হবে, স্বাস্থ্যবান হবে। কত আনন্দ তখন আমার !

কথা বলতে বলতে যেন নিশিকান্তর নেশা কেটে গেছে মনে হলো।

বললাম—তাড়াতাড়ি বলো, তারপর ?

নিশিকান্ত বললে—তারপর আমার স্ত্রী ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এল। চাকরি হয়েছে আমার দেড়শো টাকার, ভগবানের দয়া ছাড়া তো এ সম্ভব নয়। জীবনে বরাবর আমি ভগবানে বিশ্বাস করে এসেছি, সৎপথে থেকেছি, ভেবেছি আমার তো কোনও কষ্ট হবার কথা নয়। তাই এ-চাকরিও আমার তাঁরই দয়ায়—

—তারপর ?

নিশিকান্ত বলতে লাগলো—তারপর, পরের দিন গেলাম অফিসে। প্রথম অফিস-জীবন। গিয়ে আমার কাজ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। গলির মধ্যে একটা কারখানা। জন পঞ্চাশ লোক কাজ করছে। তাদেরই কাজের তদারকি করতে হবে আমাকে। এমন কিছু বিশেষ শক্ত কাজ নয়। দেখলাম টিন-টিন ঘি বোঝাই হচ্ছে গাড়িতে আর চালান যাচ্ছে বাইরে। টিন-টিন সরষের তেল বোঝাই হচ্ছে গাড়িতে আর চালান যাচ্ছে বাইরে। বিরাট কারবার। মালিক খুব অমায়িক লোক। অনেক কথা বললেন। তিরিশটা টাকা আমাকে দিলেন অ্যাডভান্স

হিসেবে। কেমন করে ছোট থেকে বড় হয়েছে কারবার, কেমন করে তিনি এই কারবার নিজে খেটে দাঁড় করিয়েছেন—অনেক ইতিহাস। আমাকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন—

—তারপর ?

বলতে বলতে নিশিকান্ত হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। মনে হলো যেন আবার ঝিমিয়ে পড়লো।

বললাম—কী হলো ? তারপর বলো ?

নিশিকান্ত বললে—তোমরা তো ভগবান মানো না ভাই, আমি মানি। সেদিন আমি ভাই আমার ভগবানের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। একেবারে মুখোমুখি। তোমরা আমায় বরাবর ঠাট্টা করতে আমি ভগবানে বিশ্বাসী বলে, আমি সিগারেট পান বিড়ি চা কিছু খাই না বলে। আমি অনেক দুঃখ আর অভাবের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছি, কিন্তু কখনও সেদিনের মত অমন করে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিনি—

—কেন ?

নিশিকান্ত বললে—জানি না, এও হয়তো আমার পরীক্ষা। কিন্তু সে পরীক্ষায় আমি পাশ করে গেলুম ভাই। আমি সেদিন মাংস খেয়ে দুধ খেয়ে রসগোল্লা খেয়ে চাকরি করতে গেছি, বোধ হয় সেই জন্যেই ভগবান আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে অত সহজে জীবনের পরীক্ষায় পাস করতে নেই—ওতে মানুষের ক্ষতি হয়। এ-জীবনটা তো ছেলেখেলা নয়। এখানে কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য সব আছে—এদের জয় করতে না পারলে মানুষের জীবন তো বৃথা। পণ্ডিতরা তাই মানুষের জীবনের সঙ্গে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের তুলনা করেছেন—

বললাম—রাখো তোমার তত্ত্বকথা, ব্যাপারটা কী হলো তাই বলো ?

নিশিকান্ত একটু দম নিলে। তারপর বললে—দুপুরবেলাই আমার বিশ্বরূপ দর্শন হলো—

—কি রকম ?

—দেখলাম ঘি-এর মধ্যে সাপের চর্বি মেশানো হচ্ছে মণ-মণ। এক টিন ঘি'তে তিন টিন সাপের চর্বি।

অবাক হয়ে গেলাম আমি। আমি হেড্ কারিগরকে জিজ্ঞেস করলাম—এ রকম চর্বি মেশাচ্ছো কেন ?

হেড্ কারিগর বললে—এই আমাদের হুকুম হুজুর,—

বললাম—কিন্তু এসব ঘি তো বাঙালীরাই খাবে, এতে যে মানুষ মরে যা‍বে সবাই—

হেড্ কারিগর হাসলো একটু। বললে—মরলে অনেক আগেই মরে যেত হুজুর, এতদিন যখন মরেনি, তখন আর মরবে না—কোনও ভয় নেই আপনার—

বললাম—কতদিন থেকে চলছে এসব ?

হেড্ কারিগর বললে—বরাবর। আগে এক টিন ঘি'তে আধসেরটাক চর্বি থাকতো, এখন লড়াই এর বাজারে চর্বির ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছি—

—এত সব চালান যাচ্ছে কোথায় ?

হেড্ কারিগর বললে—আপনি নতুন মানুষ তাই চমকে উঠেছেন, দু'দিন গেলে তখন সয়ে যাবে। এখন তো সবাই এই পাইল করছে হুজুর, ওই দাশ কোম্পানি করে, জেট্‌মল্ কোম্পানি করে, আমি তো সব কোম্পানিতেই কাজ করেছি। মালিক আমাকে বেশী মাইনে দিয়ে এখেনে নিয়ে এসেছে তো ওই জন্যে—

দেখলাম শুধু ঘি নয়, সরষের তেলের ব্যাপারেও তাই। সামনে ঘানি ঘুরছে কলের, কিন্তু ভেতরে পাইল্ হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে। চায়ের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে চামড়ার গুঁড়ো। বিরাট কারখানা। লোকেরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মাল সাপ্লাই করতে।

সারাদিন যে আমার কেমন করে কাটলো তোমায় কী বলবো ! লোকে তখন বাজারে ঘি পায় না। ভেজিটেবল ঘি'র গাড়ি এলে লোকে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ে। সেই বাজারে সিল্ করা টিনে আমাদের কারখানার ঘি-তেল পড়তে পায় না।

হেড্ কারিগর আমার দিকে চেয়ে বোধহয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—চালান লিখুন বাবু, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—

আমি চালান লিখতে গিয়ে যেন থমকে থেমে গেলাম। মনে হলো যেন আমি মানুষ খুন করছি। সেই একদিনের চাকরি আমার, সেই একদিনের পাপ আমার লক্ষ লক্ষ মানুষের অপমৃত্যুর কারণ হয়ে রইলো। আমি যেন তখন অসাড় হয়ে গেছি, আমি পাথর। আমার যেন তখন আর চৈতন্য নেই। যে-আমি সিগারেট খাইনি জীবনে, যে-আমি কখনও কোনও নেশা করিনি অন্যায় বলে, সেই আমি সেদিন আমার নিজের ভগবানকে যেন গলা টিপে মারলুম। আমার মনে হতে লাগলো খুন করবার আগে মানুষের যেন এই রকম মনের অবস্থাই হয়। কলকাতার রায়টের সময় আমি চোখের সামনে মানুষ খুন হতে দেখেছি। আর আমি, এই নিশিকান্ত, নিজে সেদিন নিজের হাতে মানুষ খুন করেছি লক্ষ লক্ষ—কেউ জানতে পারেনি, কেউ দেখতেও পায়নি—

কিন্তু দেখতে না পাক, জানতে না পারুক, আমি নিজে তো জানি। নিজে তো নিজেকে ফাঁকি দিতে পারি না। চোখের সামনেই দেখলুম আমি বিষ তৈরি করছি, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাই খাচ্ছে। সাপের চর্বি খাওয়াচ্ছি। শেয়াল-কাঁটার বিষ খাওয়াচ্ছি। রাস্তার ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা বাঁধাকপির পাতা শুকিয়ে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি। সারাদিন যে কী অশান্তিতে কাটলো! চোখের সামনে আমার ছেলে-মেয়েদের মুখগুলো ভেসে উঠলো। তারা রসগোল্লা খেয়েছে, এই টাকার আশায়। আমি মাসকাবারে এই টাকা নিয়ে গিয়ে তাদের মুখে খাবার তুলে দেব। খাবার তুলে দেব না বিষ তুলে দেব!

সন্ধ্যে সাতটার সময় হেড্ কারিগর বললে—বাড়ি যাবেন না হুজুর?

বাড়ি! বাড়ি যাবো! আমি হেড্ কারিগরের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সে মুখে কিন্তু কোনও বিকার দেখতে পেলাম না। সারাদিন ধরে সে গলা টিপে মেরেছে মানুষকে, সারাদিন ধরে ভগবানকেও সে হত্যা করেছে, অথচ মুখে তার পরিতৃপ্তির চিহ্ন। আমি তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বাইরে থেকে কারখানার সাইনবোর্ড দেখেও তো বুঝতে পারিনি, কারখানার মালিককে দেখেও তো বুঝতে পারিনি! তাঁর সিল্কের পাঞ্জাবি, তাঁর গাড়ি, তাঁর মিষ্টি কথা, কিছুই তো অন্যরকম নয়। চাকরির প্রথম দিন বলে তিরিশ টাকা অ্যাড্ভান্স দিয়েছিলেন তিনি। তিরিশটা টাকা! তখনও আমার বুকপকেটে তিরিশটা টাকার মিষ্টি স্বর শুনতে পাচ্ছি।

কখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি, কখন সন্ধ্যের অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি, কখন মানুষের ভিড় কাটিয়ে একলা-একলা নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে শুরু করেছি খেয়াল ছিল না ভাই। কলকাতায় তখন মুসলীম লীগের আমল। হঠাৎ একটা বিয়েবাড়ির সামনে এসে খেয়াল হলো। বাড়িটাকে ঘিরে আলো আর উৎসবের আয়োজন হয়েছে। নহবৎ বাজছে, রেডিও বাজছে। ঘিয়ের আর তেলের গন্ধে চমকে উঠলাম। জ্ঞান হতেই দেখি একটা ভিখিরি মরে পড়ে আছে বাড়ির সামনে। সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশ দিয়ে মড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ভদ্রলোকেরা সেজে-গুজে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে বাড়ির ভেতরে।

আমার মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো।

তোমরা বলবে আমি সেকেলে মানুষ। তোমরা বলবে আমি এ-যুগে অচল। তোমরা বলবে এ-যুগে অনেষ্টির কোনও দাম নেই, তোমরা বলবে ভগবান বলে কোনও জিনিসই নেই। কিন্তু আমার মনে হলো আমি যেন সমস্ত পৃথিবীতে

একলা। আমি একলাই সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। আমার ছেলে-মেয়ে যদি না খেতে পেয়ে মরে যায় তো যাক। আমার স্ত্রীও যদি উপোষ করে মরে যায় তো তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। আমি যদি মরে যাই তাতেও কারো কোনও লোকসান নেই। আমার ভগবান তো বাঁচবে। আমার ঈশ্বর তো বেঁচে থাকবে!

হঠাৎ পকেট থেকে সেই অ্যাডভান্সের তিরিশটা টাকা বার করে কাছের একটা পুকুরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিলুম। মনে হলো ওগুলোও যেন বিষ। ও-বিষ কারো কাছে পৌঁছোলে সেও যেন মরে যাবে।

তার পরদিন আর অফিসে গেলাম না। অফিসের দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এলাম।

তার পরদিনও না। তার পরের দিনও না।

সাত দিন পরে আমার স্ত্রী জোর করে আমায় অফিসে পাঠালো। মনে হলো—সত্যিই তো, আরো পাঁচজন যেমন করে সংসারে টিঁকে আছে, আমিও সেইরকম করে টিঁকে থাকবো—তাতে লজ্জা কোথায়? ভগবান তো আমাকে খাওয়াবে না। জীবন বড়, না আদর্শ বড়? এ-যুগে তো আদর্শের দাম নেই। আমার ছেলে-মেয়েদের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে আমি আমার সব আদর্শের কথা ভুলে গেলুম। আমি পায়ে পায়ে আবার অফিসে গেলাম। সেই সেদিনও অফিসের সামনে তখন ঘিয়ের আর তেলের টিন বোঝাই হচ্ছে লরীতে।

কিন্তু ভেতরে ঢুকেই চমকে গেলাম ভূত দেখে।

দেখলাম—আমার সেই চেয়ারে বসে আছে গোবর্ধন!

নিশিকান্ত বললে—গোবর্ধনকে চেনো তো? আমাদের সেই গোবর্ধন?

বললাম—খুব চিনি। মাঝখানে কলকাতায় এসে একদিন তার বাড়িতে গিয়েছিলাম—

একটু থেমে নিশিকান্ত বললে—জানো বোধহয় যে গোবর্ধন এবার পদ্মভূষণ হয়েছে?

বললাম—হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখেছি—

নিশিকান্ত বললে—সেদিন আমাদের গোবর্ধনকে আমি আমার চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম সত্যি! তা ভাবলাম তারই বা দোষ কী! আমিও তো একদিনের জন্যে ওই চেয়ারে বসেছি! আমি আর কাছে গেলাম না। সেখান থেকেই চুপি চুপি চলে এলাম বাইরে, তারপর আর কোন দিন সে-অফিসে ঢুকিনি—

নিশিকান্ত থামলো।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

নিশিকান্ত বললে—তার পরের ইতিহাস খুব সহজ। গোবর্ধন সেই চাকরি করে ব্যবসার হালচাল বুঝি নিলে। বুঝে নিয়ে নিজেই ওই ব্যবসা ধরলে। ধরে বড়লোক হলো। বাড়ি করলে, গাড়ি করলে। রাস্তায় চলতে চলতে অনেক দিন গোবর্ধনকে দেখেছি। সে এখন আর পায়ে হেঁটে বেড়ায় না। সে বড় বড় মীটিং-এ যায়। সভাপতি হয়। চ্যারিটি করে হাজার-হাজার টাকা। কংগ্রেসের ফ্লাড্-রিলিফ ফাণ্ডে চল্লিশ হাজার টাকা চ্যারিটি করেছে এই সেদিন। আর এখন তো পদ্মভূষণ হয়েছে—

ট্যাক্সিটা এতক্ষণে চিৎপুর রোডের সরু রাস্তা দিয়ে চলছিল। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

নিশিকান্ত বুঝতে পারলো না। বললে—তারপর আর কী?

বললাম—তারপর আজ কেন আবার গিয়েছিলে গোবর্ধনের বাড়ি?

—কেন গিয়েছিলাম জানো! গিয়েছিলাম অভিনন্দন জানাতে নয় ভাই। গিয়েছিলাম প্রাণের দায়ে। মেয়েটার অসুখ চলছে আজ তিন মাস ধরে। টাকার জন্যে ডাক্তার দেখাতে পারি না, এদিকে বাড়িভাড়াও জমে গেছে অনেক টাকা। কারো কাছেই টাকা ধার চাইতে পারি না। পৃথিবীতে কেউ নেই যে আমার কষ্টটা বোঝে। যেখানেই চাকরির চেষ্টা করেছি সেখানেই আমি টিঁকতে পারিনি। সব জায়গায় ভেজাল ভাই। হয় ঘি এ ভেজাল, নয় শিক্ষায় ভেজাল, নয়তো বুদ্ধিতে ভেজাল, নয়তো টাকায় ভেজাল। মানুষের মনে পর্যন্ত ভেজাল ঢুকেছে। ভগবানের নামেও ভেজাল দিচ্ছে সবাই! আমি সব জায়গা থেকেই চলে এসেছি—

—তারপর?

নিশিকান্ত বলতে লাগলো—আজ সকালে মেয়েটার বড় বাড়াবাড়ি হলো। একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকলাম। শেষকালে আমার স্ত্রীও আমাকে অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। বললে—এত লোক সংসার চালাচ্ছে আর তুমি চালাতে পারো না? তুমি এমন কী সত্যপীর হয়েছ?

তারপর বাড়িওয়ালাও এল। সেও দু'কথা শুনিয়ে দিলে। বললে—কালই আপনাকে বাড়ি খালি করে দিতে হবে, নইলে আমি চালাই কী করে? আমারও তো সংসার চলা চাই মশাই।

শেষে কিছু ঠিক করতে না পেরে গেলাম গোবর্ধনের কাছে। সন্ধ্যে থেকে তার বাড়িতে গিয়ে বসে ছিলাম। বাড়িতে তখন গোবর্ধন ছিল না। অনেক কাজের মানুষ সে। আমি সেইখানে তার সেই ঘরে বসে বসে ভাবছিলুম—কেমন করে এই বাড়ি, এই গাড়ি, এই টাকা, এই পদ্মভূষণ, এই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হয়েছে। কই কেউ তো গোবর্ধনকে ছি ছি করছে না! কেউ তো ধিক্কার দিচ্ছে না! গোবর্ধনের বাড়ির ইটালীয়ান মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর তো রক্তের দাগ লেগে নেই! খুনীর রক্ত! ভেজালের রক্ত! খবরের কাগজে তো গোবর্ধনের ছবি ছাপা হয়, সমাজে তো গোবর্ধনের সম্বর্ধনা হয়, সভায় তো সে সভাপতি হয়! তবে?

তবে-র উত্তর পেলাম না।

অনেক রাত্রে গোবর্ধন বাড়ি ফিরলো। আমাকে দেখে কিন্তু চিনতে পারলে ভাই। আমার এই ময়লা জামা-কাপড, আমার এই দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা দেখে না-চেনবার ভানও করলে না। একেবারে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলে। জিজ্ঞেস করলো—কী ভাই, হঠাৎ কী মনে করে?

বললাম—তুমি খুব ব্যস্ত, পরিশ্রম করে এলে,—কাল না-হয় বলবো—

কিন্তু গোবর্ধন আপত্তি করলে। বললে—সে হয় না, তুমি আমার এতদিনের বন্ধু, এত শিগ্‌গির তোমাকে ছাড়বো না।

তারপর একটু থেমে বললে—কী খাবে বল? চা, না কফি? না ঘোলের সরবৎ?

বললাম—আমি আজ বড বিপদে পড়েই এসেছি তোমার কাছে ভাই, খেতে আসিনি।

গোবর্ধন একেবারে সহানুভূতিতে গলে গেল যেন। বললে—কী বিপদ?

বললাম—আমার মেয়ের টাইফয়েড, তার চিকিৎসা করাতে পারছি না টাকার অভাবে—

গোবর্ধন বললে—ধার?

আমি বললাম—না ধার নয়, আগে সবটা শোন, আমার বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে আজ ছ'মাস—

গোবর্ধন বাধা দিয়ে বললে—আহা কত টাকা চাই বলো না?

বললাম—ধার চাইবো না। তুমি আমাকে চ্যারিটি করো, আমাকে কিছু টাকা দাও—তুমি তো কত টাকা কত দিকে দাও, আমাকে না-হয় তেমনি দিলে—আমি পারলে শোধ করবো, না পারলে শোধ করবো না—

গোবর্ধন হাসলো। বললে—এইটুকু কথা বলতে তোমার এত সংকোচ? তা কত টাকা বলো না?

বললাম—যা তুমি দিতে পারবে! একশো, দু'শো—যা পারো—

গোবর্ধন আবার হাসতে লাগলো। সে-হাসি শুনে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো যেন। আমার মনে হলো গোবর্ধন হাসছে না, যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। তবু আমি দাঁতে দাঁত চেপে রাখলুম। তবু আমি সহ্য করতে লাগলুম। আমার মনে পড়তে লাগলো কাল সকালে আমি ডাক্তার ডেকে আনবো, কাল সকালে আমার বাড়িওয়ালা আসবে বাকি ভাড়া নিতে।

হঠাৎ গোবর্ধনের গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম। গোবর্ধন বললে—টাকা তোমায় আমি দেব, এখুনি দেব—

—দেবে?

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলুম।

—দু'শো টাকাই দেব। কিন্তু একটা কাজ তোমায় করতে হবে নিশিকান্ত!

বললাম—কী কাজ?

—তোমাকে আমার সঙ্গে মদ খেতে হবে!

ভাই, তুমি কখনও তোমার ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছ? কখনও তোমার আত্মার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছো? জানি না তোমাকে কী বলে বোঝাবো আমার তখনকার মনের অবস্থা! আমি ভাবলাম উঠে দাঁড়িয়ে এক চড় মারি গোবর্ধনের গালে। নিজের পায়ের জুতো খুলে চাকর-বাকরের সামনে ওকে অপমান করি। মনে হলো গোবর্ধনের কুৎসিত মুখখানা আরো কুৎসিত করে দিই জুতো মেরে। জানি গোবর্ধনের কাছে আমি কিছু নই। গোবর্ধন সংসারে সমাজে বিখ্যাত মানুষ। সে হাজার হাজার টাকা দেশের কাজে দান করে। জানি তার ছবি নানা সূত্রে ছাপা হয় খবরের কাগজে। কলকাতার মানুষের সমাজে তার একটা কথার দাম অনেকখানি। আমি তার তুলনায় কিছুই নই। কিন্তু আমার কাছে গোবর্ধন সেই গোবর্ধনই। আমার কাছে গোবর্ধন খুনী, আমার চোখে সে ক্রিমিন্যাল, আমার চোখে সে ব্ল্যাকমারকেটিয়ার। গভর্নমেন্টের কাছে সে পদ্মভূষণই হোক আর পদ্মশ্রীই হোক, গোবর্ধন ক্রিমিন্যাল ছাড়া আর কিছু নয়। মনে হলো সেই ক্রিমিন্যাল গোবর্ধনই যেন আমার বিপদের সুযোগ নিয়ে আমাকে খুন করতে আসছে! আমার ওপর এতদিনকার রাগের প্রতিশোধ নিচ্ছে!

গোবর্ধন আমায় বললে—মদ খাবে তো বল। দিচ্ছি দুশো টাকা—

হঠাৎ কী যেন হলো। বললাম—খাবো!

আর গোবর্ধনের যে সে কী আনন্দ! মনে হলো এতদিন পরে যেন সে আমাকে বাগে পেয়েছে। বললাম—আনো মদ, আমি খাবো—

তারপর ভাই সেই ঘরেই বোতল এল। গোবর্ধনের মুসলমান খানসামা খাবার দিয়ে গেল। আর তার নেপালী চাকর বোতল নিয়ে এল। ঘরের দরজা বন্ধ করে গোবর্ধন গেলাসে মদ ঢাললো।

ট্যাক্সিটা এতক্ষণে আহিরীটোলার কাছে এসে গেছে। বললাম—তারপর? মদ খেলে?

—হ্যাঁ, খেলুম।

—কতখানি খেলে?

নিশিকান্ত বললে—যত দিলে তত খেলাম। আমি তখন মরিয়া হয়ে গিয়েছি। ভাবলাম মানুষ কত নিচে নামতে পারে আমি দেখবো আজ। আর শুধু মদ কেন, গোবর্ধন যদি আরো কোনও কঠিন কাজ করতে বলতো তাও করতুম। যদি তার বাড়ির দোতলা থেকে আমাকে নিচে লাফিয়ে পড়তে বলতো, তাও পড়তুম!

—তারপর?

নিশিকান্ত বললে—তারপর তো এই তোমার সঙ্গে দেখা।

তারপর হঠাৎ নিশিকান্ত যেন কান্নায় ককিয়ে উঠলো। বললে—তুমি বিশ্বাস করো ভাই, আমি যা বললাম, সব সত্যি, এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি, এতটুকু বানিয়ে বলিনি—আমি জীবনে কখনও এর আগে মদ খাইনি, জীবনে কখনও এমন অধঃপতন হয়নি আমার—

তারপর আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো নিশিকান্ত। বললে—তুমি হয়তো আমাকে ঘেন্না করছো ভাই, কিন্তু বিশ্বাস করো আমি রোজ মদ খাই না, এই আজই মাত্র খেয়েছি—

ট্যাক্সিটা আহিরীটোলার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলো। বললাম—আহিরীটোলায় এসে গেছি আমরা, বল না কোন দিকে যাবে?

নিশিকান্ত বললে—এইখানেই নামবো আমি—কিন্তু তুমি বলো, আমাকে ঘেন্না করছো না তো তুমি?

আশ্চর্য! এ এক অদ্ভুত মাতালের পাল্লায় পড়লাম তো! বললাম—তুমি অত

ভাবছো কেন? মদ খাওয়া কি এতই অন্যায়? মদ খাওয়া কি এতই পাপ? মদ তো আমিও খাই—

নিশিকান্ত আমার দিকে হতভম্বের মত চাইলো।

বললাম—এই তো আজও সন্ধ্যেবেলা আমি মদ খেয়েছি—

—তুমিও মদ খেয়েছ?

বললাম—হ্যাঁ, এই দেখ—

বলে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হাঁ করে নিশ্বাস ছাড়লাম। নিশিকান্ত আমার মুখে কীসের গন্ধ পেলে কে জানে! খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইলো। তারপর বললে—তুমিও মদ খাও ভাই?

বললাম—খাই—

—কিন্তু কেন খাও?—ওতে কি সুখ পাও তুমি? ওটা খাওয়া কি ভাল? ওটা খেলে যে চরিত্রের অধঃপতন হয়! জানো, আমাদের দেশে কত হাজার হাজার লোক খেতে না-পেয়ে মরে? তাদের কথা একবার ভাবো তো! গোবর্ধনরা খায়, খাক্! ওরা হলো পদ্মভূষণ, ওরা হলো বড়লোক। ইতিহাস তো ওদের দিয়ে চলে না। আমরা যারা গরীব মানুষ, আমরাই ইতিহাস গড়ি, আমাদের জন্যেই পৃথিবী এখনও চলছে, নইলে কবে অচল হয়ে যেত সমাজ সংসার সব কিছু, জানো—

বাধা দিয়ে বললাম—তুমি যাও নিশিকান্ত—অনেক রাত হয়ে গেছে। আর নয়, তোমার বাড়ি এসে গেছে—

ট্যাক্সি থেকে নেমে নিশিকান্ত চলে যেতে গিয়েও থামলো আবার। বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমি হেরে গেছি, কিন্তু তুমি ভাই হেরে যেও না, তুমি কেন খাবে ও-সব ছাইভস্ম?

বললাম—যাও, আর দেরি কোর না—

নিশিকান্তকে ধরে গলির ভেতর নিয়ে গেলাম। সরু লম্বা গলি। হঠাৎ গলির শেষ প্রান্তে আসতেই একটা বাড়ি থেকে মেয়েলী গলায় কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। নিশিকান্ত এবার একটু সচেতন হলো যেন। কান পেতে শুনলো খানিক চুপ করে। বললে—ওই, আমার বউ কাঁদছে—

—কেন?

নিশিকান্ত বললে—বোধহয় মেয়েটার অসুখ বাড়াবাড়ি হয়েছে—কিংবা বোধহয় মারা গেছে—

সহজ গলায় কথাটা বললে নিশিকান্ত। জীবনটাকে এত সহজ করে নিয়েছে নিশিকান্ত? বললাম—তাহলে কী হবে?

নিশিকান্ত বললে—সে যা হবার হবে, তুমি ভেবো না। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমার ভয় কী?

বলেই আবার বলতে লাগলো—কিন্তু আমার যা-হয় হোক ভাই, তুমি ঠিক থেকো, আমি তোমাকে আবার বলছি—সৎপথে থাকলে তার কোনও মার নেই, আমার বাবার কাছে আমি শিখেছি, মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন, এটা ভুলো না! ওই গোবর্ধনদের অনুকরণ কোর না ভাই, ওরা পদ্মভূষণ, ওরা আলাদা জাত···

কান্নার শব্দটা তখন ক্রমেই আরো করুণ হয়ে কানে আসছিল। নিশিকান্তকে শক্ত করে ধরে নিয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেলাম।

নিশিকান্তর মেয়েটা সেই রাত্রেই মারা গিয়েছিল।

ট্যাক্সো

সকলের শেষে বদ্রীদাস আগরওয়ালার ডাক পড়লো। হাকিমসাহেব তাকেও ডেকে পাঠালেন।

বদ্রীদাস আগরওয়ালা কারবারী লোক। বাজারের রাস্তার পুব-কোণে বদ্রীদাসজীর কারবার। মস্ত বড় গুদাম। গুদামের ভেতর টন্ টন্ ছোলা, তিসি, গম, চাল, সরষের বস্তা সাজানো। ওয়াগন থেকে রেলের সাইডিং-এ মাল আনলোড্ করে তার গুদামে এসে গাদা হয়। তারপর মাল গুণে হিসেব নিকেশ করে, গুদাম ঘরের দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে, চাবি কোমরের ঘুনসিতে ঝুলিয়ে দেয়। তখন হাসি বেরোয় বদ্রীদাস আগরওয়ালার মুখে।

অকারণ হাসি দেখে কেউ কেউ অবাক হয়। বলে—কী শেঠজী, হাসছেন কেন হঠাৎ?

বদ্রীদাসজী বলে—শালা ব্যাওসার বারোটা বাজিয়ে গেল—

—কেন ? বারোটা বাজলো কেন শেঠজী ?

বদ্রীদাসজী আসলে প্রাণখোলা লোক। বলে—বারোটা বাজবে না তো কি ছ'টা বাজবে মোশয় ? শালা ট্যাক্সো দিতে দিতে জান নিকলে গেলে ব্যাওসা কী-রকম চলবে ? শালা রেলের বাবুরা ট্যাক্সো নেবে, গাড়ির গাড়োয়ান ট্যাক্সো নেবে, কুলি-মজদুর ভি ট্যাক্সো নেবে ! এত ট্যাক্সো নিলে বারোটা বাজবে না ?

সত্যিই প্রাণখোলা মানুষ বদ্রীদাস আগরওয়ালা। মুখে কিছু আটকায় না বটে, কিন্তু কথাগুলো খাঁটি।

নিজেই বলে—আমি খাঁটি বলবো মোশয়, আমার মুখে বিলকুল খাঁটি কথা শুনবেন—

তা বটে। এই জেলায় আরো অনেক ব্যবসাদার আছে, আরো কারবারী আছে। বদ্রীদাসজী তাদের মত নয়। বাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে রুস্তমজীর পেট্রোল ডিপো আছে, বোস কোম্পানীর অয়েল মিল আছে, হনুমান পোদ্দারজীর রাইস মিল আছে, মনোহর সিং-এর মোটর ওয়ার্কশপ আছে। হরেক রকমের কারবার ছড়ানো আছে সারা শহরে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয় বছরে। কিন্তু কেউ বদ্রীদাসজীর মত খাঁটি কথা বলে না। এক-একজন বছরে বছরে নতুন নতুন গাড়ি কিনছে আর পরের বছরেই গাড়ি বদলাচ্ছে। এক-একজনের নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে—হাল ফ্যাশানের কনক্রীটের বাড়ি। ড্যাম্প-প্রুফ, এয়াররেড-প্রুফ, আর্থকোয়েক-প্রুফ বাড়ি সব। বোস কোম্পানীর প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাড়িটা তো এয়ার-কণ্ডিশন্ড করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। প্রাণকৃষ্ণ বসুর মেয়ের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে ডিনার-সেট কিনে আনা হলো বরকে দেবার জন্যে।

সেই প্রাণকৃষ্ণবাবুই কথায় কথায় বলেন—না মশাই, এবার বিজনেস গুটিয়ে ফেলতে হবে—কিছু প্রফিট থাকে না আজকাল—

হনুমান পোদ্দারজীর ছ'মাস ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বিকেলবেলার দিকে হাই ওঠে, ঘি খেলে অম্বল হয়। শেষকালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এলেন। আর সুইজারল্যাণ্ডে যখন একবার খরচপত্র করে যাওয়া, তখন কাছাকাছি দেশগুলোও দেখে আসতে হয়। সুতরাং লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম, বার্লিন, প্যারিস—কিছুই আর বাদ দিতে পারেন নি। এখন আবার দেশে ফিরে এসে সব খাচ্ছেন আর হজম করছেন।

কিন্তু তাঁরও মুখ ভার। বলেন—না স্যার, গভর্ণমেণ্টের জ্বালায় আর ব্যবসা করা দেখছি হয়ে উঠবে না। আর রুস্তমজী ? রুস্তমজী এই সেদিন পেট্রোল ডিপো খুললেন।

পাঁচ বছরও হয়নি। এরই মধ্যে একটা ফরেস্ট কিনে ফেলেছেন সি-পি'তে। দরকার হলেই প্লেনে করে যান সেখানে, আর পরদিনই ফিরে আসেন। বলেন—ট্যাক্স দিতে দিতেই গেলাম মশাই। এরা দেখছি আর ভদ্রলোকদের বিজনেস করতে দেবে না—

এই যুদ্ধের আগেও এ শহরের চেহারা এমন ছিল না। বাজারের আশে-পাশে ছিল শুধু খানকয়েক টিনের চালা।

বৃটিশ আমলে টাকায় আট সের দুধ বেচেছে গয়লারা। মাছ ছিল পাঁচসিকে সের। চালের দর তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় চড়েছিল বটে, কিন্তু আবার নেমে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ভোল্ পাল্টে গেল শহরের। মনোহর সিং এসে মোটর ওয়ার্কশপ খুললো। রুস্তমজী পেট্রোল ডিপো খুললো! বোস কোম্পানীর অয়েল মিল চালু হলো। হনুমান পোদ্দারজীর রাইস মিলও চললো।

কিন্তু বদ্রীদাস, যে-বদ্রীদাস সেই বদ্রীদাস আগরওয়ালাই রয়ে গেল।

বদ্রীদাসের সেই খাটো নুন-ময়লা ধুতি, সেই চুলভর্তি খালি গা, সেই টিনের গুদাম ঘর।

বদ্রীদাস সব দেখে চোখ মেলে আর বলে—শালা কত বাড়বি বাড়, আমি সকলকে একচোট দেখে লেব—! শালা কারবারের বারোটাই বাজুক আর একটাই বাজুক, আমি সকলকে দেখে লেব একচোট—

বদ্রীদাসের ছোট কাঠের ক্যাশ বাক্সটা সামনে থাকে, আর চাবির গোছাটা থাকে কোমরের ঘুনসিতে। আর কিছুর দরকার নেই। বদ্রীদাসের কন্‌ক্রীটের এয়ার-কণ্ডিশনড বাড়িও দরকার হয় না, হাল-মডেলের গাড়িও দরকার হয় না। বদ্রীদাসের মেয়ের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে বরের জন্যে ডিনার-সেটও আনাতে হয় না। বদ্রীদাস ঘি খেলেও হজম করতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করাতেও হয় না। অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ করে রিক্সায় চড়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে ডাল-রোটি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

তা এই বদ্রীদাসেরই একদিন ডাক পড়লো। ডাক পড়লো সকলের শেষে। হাকিম-সাহেব বদ্রীদাসকেও ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে।

হাকিম-সাহেবের বাঙলোর সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল বদ্রীদাস আগরওয়ালা। সেদিন বদ্রীদাস গায়ে পিরান চড়িয়েছে, পায়ে চটি গলিয়েছে, ধুতিটা ঝুল করে পরেছে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে অনেকবার গণেশজীকে নমস্কার করেছে।

—জয় বাবা গণেশজীউ, জয় বাবা সিদ্ধিনাথজীউ—

তারপর যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করেছে—আচ্ছা, হাকিম-সাহেব আমাকে বোলিয়েছে কেন বলুন তো ?

কে জানে কেন ডেকেছে হাকিম-সাহেব। কেউ বলতে পারেনি। কার এত মাথা ব্যথা! হাকিম-সাহেবের আর্দালীকেও জিজ্ঞেস করেছে বদ্রীদাস—আচ্ছা ভেইয়া, হাকিম-সাহেব আমাকে তলব দিয়েছে কেন ?

আর্দালী মুখ নীচু করে বলেছে—চাঁদা—

—চাঁদা ?

বদ্রীদাস আগরওয়ালা ভয়ে দশ হাত পেছিয়ে এসেছে শুনে। চাঁদা! কিসের চাঁদা হে। জোর করে ভয় দেখিয়ে হাকিম-সাহেব ট্যাক্সো আদায় করে নেবে নাকি!

আবার বদ্রীদাস আর্দালীকে জিজ্ঞেস করলে—ট্যাক্সো ?

আর্দালী বললে—না শেঠজী, চাঁদা—

তবু ভয় গেল না বদ্রীদাসজীর মন থেকে। যার নাম চাঁদা তার নামই তো ট্যাক্সো। ট্যাক্সো দিতে দিতেই তো জান নিক্‌লে গেল। রেলের বাবুদের ট্যাক্সো, গাড়ির গাড়োয়ানদের ট্যাক্সো, কুলিমজদুরদের ভি ট্যাক্সো—ট্যাক্সোর কি হিসেব-কিতাব আছে ? ইংরেজ জমানাতে ট্যাক্সো ছিল, কিন্তু সে এমন নয়। আজকাল যেন ট্যাক্সো বেড়েছে, কথায় কথায় ট্যাক্সো, উঠতে-বসতে ট্যাক্সো।

খানিক পরেই ডাক পড়লো ভেতরে। বদ্রীদাসজী উঠলো। উঠে ইষ্ট-দেবতাকে একবার স্মরণ করে নিলে উর্ধ্বনেত্র হয়ে। তারপর বললে—চলিয়ে আর্দালী-সাহেব, চলিয়ে—

বিরাট বৈঠকখানা। হাকিম-সাহেবের খাস-কামরা। প্রথমে ঘরে ঢুকে হাকিম-সাহেবকে দেখাই গেল না। এতবড় একটা টেবিল। টেবিলের এক কোণে বসেছিলেন তিনি।

বললেন—এসো বদ্রীদাসজী, এইদিকে এসো—

এতক্ষণে হদিস পেয়ে বদ্রীদাসজী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাকিম-সাহেবকে নমস্কার করলে! বললে—গুড মর্ণিং স্যার—

—এসো, এসো, এইখানে বোস—

বদ্রীদাসজী অতি সন্তর্পণে গিয়ে বসলো একটা ছোট চেয়ারে।

হাকিম-সাহেব বললেন—ওটাতে কেন, এদিকে এই গদি আঁটা বড় চেয়ারটায় বোস না—

বদ্রীদাসজী বিনয়ে নম্র হয়ে বললে—আমি ছোট আদমী, আমি এখানেই বসি হুজুর—

—না, না, তুমি ছোট আদমী কে বললে? তুমি এত বড় একজন হোলসেল মার্চেন্ট এখানকার।

বদ্রীদাস বললে—না হুজুর, আমি তো হুজুরের কাছে ছোট বেওসাদার আছি। আজকাল কত বড় বড় বেওসাদার এসেছে এখানে, হনুমান পোদ্দারজী আছেন, রুস্তমজী আছেন, মনোহর সিংজী আছেন, বোস কোম্পানী আছে—আমি তাদের কাছে কিছুই নই হুজুর!

হাকিম-সাহেব বললেন—তারা অবশ্য বড়ই, কিন্তু তুমিও ছোট নও বদ্রীদাসজী। আমি শুনেছি সব—

—কী শুনেছেন হুজুর?

—শুনেছি তোমার অনেক বড় কারবার, রাইসের হোলসেল্ মার্চেন্ট, গম, ডাল, তিসি, সরষে, গ্রাউণ্ড নাটেরও হোলসেল্ মার্চেন্ট তুমি!

বদ্রীদাস বললে—হুজুর সবই ঠিক বাত আছে!

হাকিম-সাহেব বললেন—কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কথা বলতে ডেকেছি বদ্রীদাসজী! তুমি শুনেছ বোধহয় এ'বছরে রবীন্দ্রনাথের সেন্টিনারি হবে—লোক্যাল কমিটি হয়েছে—শুনেছ তুমি নিশ্চয়ই?

বদ্রীদাস বুঝতে পারলে না ঠিক। জিজ্ঞেস করলো—কী বললেন হুজুর?

হাকিম-সাহেব এবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বললেন—রবীন্দ্র সেন্টিনারি, রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী—

বদ্রীদাসজী তবু বুঝতে পারলে না। বললে—ও কেয়া হ্যায় হুজুর?

হাকিম-সাহেব বললেন—তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোননি?

—উও কৌন্ থা হুজুর?

হাকিম-সাহেব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন—তিনি একজন মস্ত কবি ছিলেন। যেমন তুলসীদাসজী, তেমনি—

এতক্ষণে বুঝতে পারলে বদ্রীদাসজী। বললে—সন্ত্ তুলসীদাস?

হাকিম-সাহেব বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছ তুমি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি মস্ত বড় একজন কবি। সারা পৃথিবীতে তাঁর সেন্টিনারি উৎসব হচ্ছে, জার্মানী, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা—সব জায়গায়। দিল্লীতে হচ্ছে, বোম্বাইতে হচ্ছে, কলকাতাতেও

হচ্ছে—আমাদের এই শহরেও আমরা করছি। আমার কাছে গভর্ণমেণ্ট চিঠি লিখেছে, এখানেও সেন্টিনারি করতে হবে—

বদ্রীদাস বললে—তা আমি কী করবো হুজুর, আমি তো লিখতে ভি জানি না, পড়তে ভি জানি না—

হাকিম-সাহেব বললেন—না, তোমাকে লিখতে পড়তে, কিছুই করতে হবে না,—ও সব করবার অনেক লোক আছে—তোমায় শুধু চাঁদা দিতে হবে—

বদ্রীদাসজীর বুকে ছাঁৎ করে যেন একটা আঘাত লাগলো। বললে—ট্যাক্সো ?

হাকিম সাহেব এবার হাসলেন।—না না ট্যাক্স নয়—চাঁদা, ডোনেশন—

বদ্রীদাস বললে—ও তো একই বাত্ হলো হুজুর, বাংলায় যার নাম চাঁদা, হিন্দীমে তারই নাম ট্যাক্সো হুজুর, আমরা যারা বেওসা করি, তারা ওকে ট্যাক্সো বলি হুজুর—

—আচ্ছা, না-হয় ট্যাক্সোই হলো, তোমার কথাই রইল, এখন সেটা দিতে হবে তোমাকে !

বদ্রীদাসজীর এ-রকম অবস্থা সহ্য করা অভ্যেস আছে। এত বছর ধরে ট্যাক্সো দিয়ে কারবার করে আসছে, সবই তার জানা। কোথায় ওয়াগান পেতে গেলে কাকে ট্যাক্সো দিতে হয়, কোথায় সেলস্-ট্যাক্স জমা দিতে গেলে কাকে ট্যাক্সো দিতে হয়, কোথায় পারমিট পেতে গেলে কাকে ট্যাক্সো দিতে হয়—সব নখ-দর্পণে। ট্যাক্সো দিতে দিতে বুড়ো হয়ে গেল বদ্রীদাস আগরওয়ালা। ইংরেজ রাজত্বেও ট্যাক্সো দিয়েছে, এখন স্বদেশী জমানাতেও ট্যাক্সো দিতে হচ্ছে। সুতরাং ট্যাক্সো দিতে ভয় পাবার কথা নয় বদ্রীদাসজীর।

বদ্রীদাসজী বললে—কত ট্যাক্সো দিতে হবে হুজুর ?

হাকিম-সাহেব বললেন—জিনিসটা তোমায় বুঝিয়ে বলি বদ্রীদাসজী। তুমি বুদ্ধিমান কারবারী লোক, তুমি বুঝবে। আসলে গভর্ণমেণ্ট থেকে আমার ওপর হুকুম হয়েছে সেন্টিনারি করবার। সেই উপলক্ষ্যে এখানে একটা রবীন্দ্র-ভবন হবে, ভবনটা তৈরি করতে অনেক টাকা খরচ হবে। ইঁট দেবে এখানকার জমিদার চৌধুরীবাবু। চৌধুরীবাবুকে চেন তো ? এ-বছরে যিনি পদ্মশ্রী হয়েছেন—

বদ্রীদাসজী কোন উত্তর দিলে না। চুপ করে শুধু শুনতে লাগলো।

—আর সেমেণ্ট সুরকী লোহা আর যত কাঠ লাগবে, সব দেবে হনুমান পোদ্দারজী।

বদ্রীদাস হঠাৎ বললে—আচ্ছা হুজুর, হনুমান পোদ্দারজী এখনও পদ্মশ্রী হচ্ছেন না কেন ?

হাকিম-সাহেব সে কথার উত্তর না-দিয়ে বললেন—আর জমিটা দিচ্ছে আমাদের বোস্ কোম্পানীর প্রাণকৃষ্ণ বসু—তুবিঘে জমি—ওই যাঁর অয়েল-মিল আছে···ত যাক্‌কে এ সব কথা। আমরা মোটমাট হিসেব করে দেখেছি—সব শুদ্ধ আমাদের খরচ হবে এক লাখ টাকা—টোটাল এক লাখ টাকার বাজেট রাফ্‌লি—তা তুমি কত দিতে পারবে, এখন বলো ?

বদ্রীদাস কী বলবে ভেবে পেলে না।

হাকিম-সাহেব একটা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন—এই দেখ, এই লিস্ট্ দেখ, আমি তোমার নামে পাঁচ হাজার টাকা ধরেছি—পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে দিতে হবে—

বদ্রীদাসজী হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাত-জোড় করলে। বললে—হুজুর, আমি মরে যাবো হুজুর, বে-ফিকির মরে যাবো—

হাকিম-সাহেব বললেন—এটা তোমার বাড়াবাড়ি বদ্রীদাসজী, পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে কিছু না—

—না হুজুর, আজকাল ট্যাক্সো দিতে দিতে কারবারে বারোটা বেজে গেছে হুজুর, আমি মারা যাবো হুজুর, বে-ফিকির মারা যাবো, কিছু কম্‌তি করিয়ে দিন হুজুর—

হাকিম-সাহেব তবু গলবার পাত্র নন। বললেন—আমি তো তোমাকে কম্‌তি করেই ধরেছি বদ্রীদাসজী, আর সকলের অনেক বেশী বেশী ধরেছি, তোমার বেলায় কম করেই পাঁচ হাজার টাকা ধরেছি—

—পাঁচ হাজার রুপেয়া কেমন করে দেব হুজুর ? আমি বে-ফিকির মারা যাবো। আপনি তার চেয়ে আমার গলাটা কাটিয়ে লেন হুজুর—

হাকিম সাহেব বললেন—আঃ, তুমি দেখছি হাসালে বদ্রীদাসজী ! লোকে শুনলে বলবে কী বলো তো ! পাঁচ হাজার টাকা দিতে তুমি মরে যাবে, এ কেউ বিশ্বাস করবে ?

—না হুজুর, আমার কথা বিশোয়াস করুন, আমি একদম মারা যাবো, আমি বে-ফিকির মারা যাবো, আপনি বিশোয়াস করুন—

হাকিম-সাহেব এবার আরো কাগজ-পত্র বার করলেন। বললেন—তবে দেখ, এই লিস্টটা পড়ে দেখ—বলে লিস্ট্‌টা বদ্রীদাসের দিকে এগিয়ে দিলেন।

বদ্রীদাসজী বললে—এ দেখে আমি কী করবো হুজুর, আমি কী লিখি-পড়ি জানি?

—তবে শোন, আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি—

বলে হাকিম-সাহেব লিস্ট্‌টা নিজেই পড়ে শোনাতে লাগলেন—হনুমান পোদ্দার—দশ হাজার টাকা এবং ইঁট কাঠ সিমেণ্ট লোহা—। রুস্তমজী—পনেরো হাজার টাকা। প্রাণকৃষ্ণ বসু—দশ হাজার টাকা, আর দু'বিঘে জমি। মনোহর সিং—আট হাজার। জমিদার—এন চৌধুরী পদ্মশ্রী—সাত হাজার টাকা আর সমস্ত ইঁট। বদ্রীদাস আগরওয়ালা—পাঁচ হাজার।

তারপর বদ্রীদাসজীর দিকে চেয়ে হাকিম-সাহেব বললেন—দেখলে তো বদ্রীদাসজী, তোমার কত কম ধরেছি—

বদ্রীদাসজী কিছু কথা বললে না।

হাকিম-সাহেব আবার বলতে লাগলেন—সকলের কতো বেশী-বেশী ধরেছি আর তোমার কতো কম চাঁদা ধরেছি—দেখলে তো?

বদ্রীদাস এবার মাথা তুললো। বললে—না হুজুর, আমি পাঁচ হাজার দেব না—

—কেন? পাঁচ হাজার কি তোমার পক্ষে বেশী হলো?

—আজ্ঞে না হুজুর, তা নয়, আমি বিশ হাজার দেব! আপনি লিখে লিন, আমি কাল এসে আপনাকে বিশ হাজার টাকা ট্যাক্সো দিয়ে যাবো—

হাকিম-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন বদ্রীদাসজীর মুখের চেহারা দেখে। বদ্রীদাসের মুখের চেহারা বড় কঠিন হয়ে উঠেছে।

—আপনি লিখে লিন্ হুজুর। আপনি লিখে লিন্!

হাকিম-সাহেব বললেন—কেন বদ্রীদাসজী, তোমাকে তো আমি বিশ হাজার দিতে বলিনি, তুমি ওদের থেকে ছোট কারবারী, তোমাকে পাঁচ হাজারের বেশী দিতে হবে না—পাঁচ হাজার দিলেই আমাদের চলে যাবে—

বদ্রীদাস বললে—না হুজুর, আপনি লিখে লিন্ আমার নামে বিশ হাজার—

—কেন বদ্রীদাসজী? তুমি অত রেগে যাচ্ছো কেন?

বদ্রীদাসজী বললে—না হুজুর, রাগের কথা বলিনি, আমি বিশ হাজারই দেব। যত ট্যাক্সো চাইবে সরকার, তত দেব। যত চাইবে—

—কিন্তু তুমি ভুল করছো বদ্রীদাসজী, রবীন্দ্র-সেন্টিনারি তো সরকারী ব্যাপার নয়, এ তো এখানকার কমিটির ব্যাপার, আমি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বলছি—

বদ্রীদাসজী তবু নাছোড়বান্দা! বললে—রবীন্দরনাথের নাম আমি জানি না

হুজুর, রবীন্দরনাথের দোঁহা ভি আমি পড়িনি, আমি আপনাকে ট্যাক্সো দিচ্ছি, আপনিই আমার সরকার—আপনি যত ট্যাক্সো চাইবেন, তত দেব—আপনি লিখে নিন্—

সেদিন গদীতে ফিরে এসে বদ্রীদাসজীর আর খাওয়া হলো না, বিশ্রাম হলো না। মুনিম, মুহুরী, যত কর্মচারী আছে সকলকে ডাকলে। চাল, ডাল, গম, সরষে, তিসি সব জিনিসের হিসেব হতে লাগলো। অনেক রাত পর্যন্ত খাতা-পত্র নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগলো গদীবাড়ির ভেতরে। বদ্রীদাসজী নিজে লেখা পড়া জানে না। কিন্তু লেখা-পড়া হিসেব-পত্র করবার জন্যে লোক-জন আছে। খুঁটিয়ে সব মালের দর-দস্তুর যাচাই হলো। কিছু মাল সরিয়ে রাখা হলো আলাদা করে, কিছু মাল সামনে। সেদিন সমস্ত রাত ধরে সমস্ত গদীবাড়ি ওলোট-পালোট হয়ে গেল একেবারে।

বদ্রীদাসজী জিজ্ঞেস করলে—বোস কোম্পানীর গদীর কী খবর মুনিম্?

মুনিম বললে—ওদের ভি মাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে হুজুর—

—আর হনুমান পোদ্দারজী?

—ওদের ভি!

তারপর রাত যখন দু'টো তখন সবাই ছুটি পেলে। সেই রাত দু'টোর সময় বদ্রীদাসজী গদী থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।

পরের সপ্তাহে 'রাঢ়-সমাচার' পত্রিকার স্থানীয় সংবাদ-স্তম্ভে একটি খবর প্রকাশিত হলো। খবরটি এই:

সম্প্রতি এই জেলার কয়েকটি গ্রামে বন্যার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত অর্থকষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছে। চাল, ডাল, তেল, সরিষা, গম, তিসি, চিনি-বাদাম প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যাদির দর যে-হারে বাড়িয়াছে, তাহাতে এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। জেলার হাকিম-সাহেব "এই অগ্নি-মূল্য নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই নিজে ইহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন বলিয়া আমাদের প্রতিনিধিকে আশ্বাস দেন।

শেষ পৃষ্ঠা

যোগজীবনবাবু বলতেন—ভাতের সঙ্গে রোজ একটু করে নেবু খেও দিকি, ওতে সি-ভিটামিন আছে—

আমি বলতাম—নেবু তো রোজই খাই যোগজীবনবাবু—

—তাহলে আর এক কাজ কোর—

যোগজীবনবাবু বলতেন—তাহলে আর এক কাজ কোর, সকালবেলা খালি পেটে এক গেলাস গরম জলে নেবুর রস দিয়ে খেয়ে দেখ দিকি—

যে ব্যাপারই হোক না কেন, যার যা কিছুই হোক, যোগজীবনবাবু তার একটা-না-একটা প্রতিকার বাতলাবেনই। একেবারে ঘড়ি ধরে ইঞ্চি মেপে জীবন যাপন করতেন যোগজীবনবাবু। ভোর বেলা উঠতেন। উঠে মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে মাইল তিনেক খোলা মাঠে অক্সিজেন সেবন করে আসতেন। নিয়ম বাঁধা জীবন। কখনও এক পয়সার পান খেয়ে অপব্যয় করেন নি। কখনও একটা পয়সা বাজে খরচ করে নিজেকে বিড়ম্বিত করেন নি। কাঁটায় কাঁটায় অফিসে এসেছেন, এসে নিজের চেয়ারটিতে ঘাড় গুঁজে বসে কাজ করেছেন। আসতেন কাঁটায় কাঁটায়, যেতেন দেরি করে। কাজের জন্যে কখনও কোন অভিযোগ অনুযোগ শুনতে হয়নি যোগজীবনবাবুকে। কাজ ফাঁকি দিয়ে গল্প করা যোগজীবনবাবুর কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

কারো কোনও সমস্যার উদ্ভব হলেই যোগজীবনবাবুর কাছে যেতে হতো!

কারো হয়ত হাতে টাকা-কড়ি থাকে না। প্রত্যেক মাসে কেউ হয়ত হিসেব করে চালাতে পারে না সংসার।

কাছে এসে যোগজীবনবাবুকে ধরলে।

যোগজীবনবাবু বললেন—আপনারা ঠিক হিসেব জানেন না মশাই, কত মাইনে পান হাতে?

পরেশবাবু বললেন—একশো তেইশ টাকা তিন আনা—

যোগজীবনবাবু বললেন—বাড়িভাড়া কত লাগে?

পরেশবাবু বললেন—পঁচিশ টাকা—

যোগজীবনবাবু বললেন—ও তেইশ টাকা তিন আনা ছেড়ে দিন, ওই পঁচাত্তর টাকার মধ্যে আপনার বাজেট করতে হবে—তবে কুলোবে।

—তা পঁচাত্তর টাকায় আজকালকার বাজারে কুলোয় নাকি? ছেলেদের ইস্কুলের মাইনে, পড়ার বই, অসুখ বিসুখ, চাল ডাল দুধ—

যোগজীবনবাবু চম্‌কে উঠলেন। বললেন—আবার দুধ? দুধ কেন খাবেন? দুধ-টুধ চলবে না আপনার। আর ওই ছেলেদেরও ইস্কুলে পড়ানো চলবে না। এই দেখুন না, আমি! আমার কথাই ধরুন না, আমি আজ সাতাশ বছর দুধ কী জিনিস জানি না। আর ইস্কুল? ইস্কুলে দিয়েছিলাম ছেলেকে, তা ছেলের পড়াশোনায় মন নেই, মাঝখান থেকে আমারও টাকাটা বেঁচে গেল—

অফিসের যে-কোনও লোকই বিপদে পড়তো, পরামর্শ চাইতে যে-যোগজীবনবাবুর কাছে। কার মেয়ের বিয়ে আটকাচ্ছে, কার বাড়ি করা আটকাচ্ছে, কার ছেলের কলেজে ভর্তি হওয়া আটকাচ্ছে, সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন যোগজীবনবাবু। অথচ যোগজীবনবাবুকে দেখতাম তিনি নিজের সমস্যা নিয়েই দিনরাত ব্যতিব্যস্ত।

আমার সঙ্গেই একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল যোগজীবনবাবুর।

আমাকেই তিনি মনের কথা খুলে বলতেন সময়ে সময়ে।

দেখতাম প্রায়ই মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন অফিসে।

একটু নিরিবিলি পেলেই কাছে যেতাম। বলতাম—কী যোগজীবনবাবু, আবার কী হলো?

হঠাৎ চম্‌কে উঠে যোগজীবনবাবু কাজে মন দিতেন!

বলতেন—না কিছু না—এমনি—

এ অফিসের আদি অকৃত্রিম কর্মচারী যোগজীবনবাবু। কবে একদিন তাঁর কোন্ এক আত্মীয় বড় সাহেবকে বলে এখানে তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেইদিন থেকেই মনে প্রাণে এ-অফিসের কর্মচারী হয়ে গেলেন। নিয়ম করে অফিসে এসেছেন, নিয়ম করে টিফিন করেছেন, আর নিয়ম করে বাড়ি গিয়েছেন। একদিনের জন্যে অফিস কামাই করতে দেখেনি কেউ তাঁকে। হরতালের দিন যখন সবাই বাস-ট্রামের অভাবে বাড়িতে বসে আছে, তিনি সাত মাইল হেঁটে ঠিক সময়ে অফিস করে গেছেন। সবাই ছুটির পর যখন বাড়ি চলে গেছে, তিনি একলা আলো জ্বালিয়ে অফিসের ফাইল ডীল্ করেছেন।

একদিন নর্টন সাহেব হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন—এ কি, ব্যানার্জি? এতক্ষণ একলা-একলা কী করছো? বাড়ি যাও নি?

লজ্জিত হয়ে যোগজীবনবাবু বলেছেন—না স্যার, আর দু'টো আর্জেন্ট ফাইল রয়েছে কি না—

যে-সাহেব এসেছে সেই সাহেবই যোগজীবনবাবুর কাজ দেখে খুশী হয়েছে। গাদা

গাদা নোট লিখে গেছে যোগজীবনবাবুর পার্সোন্যাল ফাইলে। কেউ লিখেছে—এ রকম কাজের লোক অফিসে আর নেই। মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট অ্যাণ্ড এফিসিয়েন্ট সার্ভেন্ট্। জে, ব্যানার্জির কিছু প্রমোশন হয়েছে দেখলে আমি খুব খুশী হবো।

সাহেবই কি একটা? নর্টন সাহেব, গেহান্ সাহেব, ম্যাক্‌ফারসন সাহেব। আরো অনেক সাহেব এসেছে গিয়েছে। সবাই যোগজীবনবাবুর কাজ দেখে খুশী হয়েছে। সবাই যোগজীবনবাবুকে প্রশংসা করেছে। সবাই একবাক্যে লিখে গেছে —এমন কর্মচারী হয় না। যোগজীবনবাবুর কাজে কোনও খুঁত নেই। কেউ কোনও খুঁত ধরতে পারেনি তাঁর কাজের!

আমি বলতাম—এবার সি-গ্রেড্ হবেই যোগজীবনবাবু, দেখে নেবেন—

যোগজীবনবাবু কিছু বলতেন না, চুপ করে থাকতেন।

কিন্তু প্রতি বছরই প্রমোশনের লিস্ট বেরোত। কারো দশ টাকা, কারো কুড়ি টাকা, কারো পাঁচ টাকা বাড়তো। যোগজীবনবাবুর যে-কে-সেই। সেই যে একদিন পঁচিশ টাকায় ঢুকেছিলেন, তারপর স্বাভাবিকভাবে গ্রেড বেড়ে একশো তিরিশে এসে ঠেকেছে। তারপর কত বছর কেটে গিয়েছে, কত সাহেব এসেছে গেছে, কত উত্থান-পতন হয়েছে অফিসে, যোগজীবনবাবু সেই একই গ্রেডে আটকে আছেন।

নর্টন সাহেব একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—ব্যানার্জী, তুমি কোন্ গ্রেডে কাজ করছো?

যোগজীবনবাবু বলেছিলেন—বি গ্রেড স্যার!

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—কত বছর সার্ভিস হলো তোমার?

যোগজীবনবাবু বলেছিলেন—তেইশ বছর চলছে এখন স্যার!

সাহেব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—সে কি! তোমার ওপর তো দেখছি বড় ইনজাস্টিস্ করেছে অফিস—

বলে তারপরেই বলেছিলেন—আমি আজই তোমার সম্বন্ধে নোট্ দেব—

কিন্তু সেবারও প্রমোশন হলো না যোগজীবনবাবুর। নর্টন সাহেব সেই দিনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সামান্য তিন দিনের জ্বর। আর সেই তিন দিনের জ্বরেই নর্টন সাহেব মারা গেলেন। আর যোগজীবনবাবুর প্রমোশনও আটকে গেল।

এ শুধু সেবারই প্রথম নয়। প্রত্যেকবারই এই রকম একটা-না-একটা বাধা এসে সমস্ত গণ্ডগোল করে দিয়েছে। তবু সারা জীবন একনিষ্ঠতার সঙ্গে অফিসের

কাজ চালিয়ে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রমোশন হলো না বলে বিশেষ মনোকষ্টও ছিল না তাঁর। তাঁর চেয়ে কম কাজ করে, কাজে ফাঁকি দিয়ে অনেক লোক তাঁকে টপকে কেউ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছে, কেউ-বা সুপারভাইজার হয়েছে। যাকে হাতে কলমে একদিন কাজ শিখিয়েছেন সে-ই হয়ত একদিন আবার তাঁর ওপরওয়ালা হয়ে বসেছে। ওপরওয়ালা হয়ে তাঁকে হুকুম করেছে। আর তিনিও সে-হুকুম তামিল করেছেন বিনাপ্রতিবাদে।

যোগজীবনবাবু বলতেন—মনের শান্তিটাই হলো আসল কথা ভাই—মনের শান্তির দামই লক্ষ টাকা—প্রমোশন না-ই বা হলো—

শুধু একটা অশান্তি ছিল যোগজীবনবাবুর।

তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে। সেই ছেলেই ছিল আসল অশান্তির মূল।

বলতেন—প্রমোশন হয়নি বলে আমার কোনও ক্ষোভ নেই ভাই—ক্ষোভ শুধু ওই ছেলেটার জন্যে—

একমাত্র ছেলে হরিসাধন। ইস্কুলে ভর্তি করেছিলেন, বাড়িতে মাস্টার রেখেছিলেন পড়াবার জন্যে। যোগজীবনবাবুর অল্প সামর্থ্যে যা করা সম্ভব সবই করেছিলেন। ছেলে-অন্ত প্রাণ যোগজীবনবাবুর। ছেলের কথা ভাবতেই রাত্রে তাঁর ঘুম আসতো না।

অফিসের টেবিলে কাজ করতে করতে কতদিন দেখেছি যোগজীবনবাবুর চোখটা লাল জবাফুলের মত হয়েছে।

জিজ্ঞেস করেছি—এ কি, চোখে আপনার কী হলো যোগজীবনবাবু?

যোগজীবনবাবুর সেই কথাগুলো জীবনে ভুলতে পারবো না।

বলেছেন—কালকে সারা রাত ঘুম আসেনি ভাই—

—কেন? কী হয়েছিল?

যোগজীবনবাবুর তখন কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা।

বললেন—হরিসাধন, আমার ছেলে···

—হ্যাঁ আপনার ছেলে তো হরিসাধন, জানি! তা কী-হলো তার? অসুখ করেছে নাকি তার?

যোগজীবনবাবু বললেন—না ভাই, অসুখ করেনি—

বললাম—তাহলে একজামিনে ফেল করেছে—?

যোগজীবনবাবু বললেন—ফেল করবে কি, ইস্কুলই তো ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন—এখন তো সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়ায় আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়—

—তা আপনার ঘুম আসেনি কেন ?

যোগজীবনবাবু বললেন—সেই হরিসাধন, অফিস থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি একজোড়া বাঁয়া তবলা কিনে পিট্ছে চাঁই চাঁই করে—

তারপর একটু থেমে বললেন—তবলা জিনিসটার ওপর চিরকাল আমার ঘেন্না ভাই। তবলা জিনিসটা কোনও কালে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না—শেষকালে সেই আমারই ছেলে কিনা ভাই ছোটলোকদের মত তবলা পিটবে—

বললাম—তা ম্যাকফার্সন সাহেবকে বলে ছেলেকে আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিন না—

যোগজীবনবাবু বললেন—ভাই, তা তো বলতে পারতুম, আমি বললে সাহেব ঢুকিয়েও দিত, কিন্তু লেখা-পড়ায় একেবারে যে ক-অক্ষর গোমাংস—

এ-সব একেবারে গোড়ার দিকের কথা। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। যোগজীবনবাবু সেই একই চেয়ারে বসে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। নর্টন সাহেবের পর গেহান সাহেব এসেছে, গেহান্ সাহেবের পর ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব এসেছে, ম্যাক্‌ফার্সন সাহেবের পর টমসন্ সাহেব এসেছে, অফিসের নানা পরিবর্তন হয়েছে ইতিমধ্যে। আগে সুপারভাইজার ছিল দু'জন, তখন দশজন সুপারভাইজার হয়েছে। আগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিল তেরজন, বেড়ে হয়েছে তিরিশজন। নতুন নতুন ছোকরা ঢুকেছে অফিসে! সব বি-এ এম-এ পাশ করা ছোকরা। অফিসের বাড়িও আর সে-বাড়ি নেই। চারিদিকে সব ভোল্ পাল্‌টে গেছে গোটা পৃথিবীর। কিন্তু যোগজীবনবাবু সেই বসতেন অফিসে ঢোকবার সময় যে-চেয়ারে, এখনও সেই চেয়ারেই বসছেন। তাঁর আর কোন পরিবর্তনই হয় নি।

যোগজীবনবাবু তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তিনটিই মাঝারি কেরানী পাত্র। নিজের পছন্দ আর সামর্থ্য মত জামাই করেছেন। সেদিক থেকে কোনও সমস্যা নেই যোগজীবনবাবুর। আমরা অফিসের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব গিয়ে মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নও খেয়ে এসেছি।

কিন্তু সমস্যা ওই হরিসাধনকে নিয়ে। যোগজীবনবাবুর একমাত্র ছেলে হরিসাধন।

এক-একদিন বলতেন—যাক্ গে, আমি আর ভেবে কী করবো—রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবে, পরের দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াক্ আর জাহান্নমে যাক, আমি তো তা দেখতে আসছিনে—

আমরা সবাই সহানুভূতি দেখাতাম। সহানুভূতি দেখানো ছাড়া আমাদের আর কী করবার ছিল! তাঁর নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায় তা হয়নি।

তা না হোক, ছেলেটাও যদি মানুষ হতো তো তিনি তবু কিছুটা তৃপ্তি পেতেন। শেষ জীবনে অন্তত দেখে যেতে তাঁর ভালো লাগতো যে ছেলে একটা বাঁধা মাইনের চাকরী করছে। অন্তত মাস গেলে তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা টাকা আয় করছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আনন্দ পায় সব বাপই। যোগজীবনবাবু সেই সুখ থেকে বঞ্চিত। আমরা সবাই-ই যোগজীবনবাবুর দুর্ভাগ্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম।

বলতাম—যার ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, যে খায় চিনি তাকে যোগায় চিন্তামনি, জানেন তো! ও দেখবেন একটা-না-একটা কিছু হয়ে যাবেই, আপনি আর মিছি মিছি ভেবে কী করবেন—

যোগজীবনবাবু অত সহজে সান্ত্বনা পাবার লোক নন।

বলতেন—আরে ভাই, ভগবান কি অত সহজ মানুষ যে কিছু করলুম না, কিছু খাটলুম না, ওম্‌নি ওম্‌নি টাকা দেবে। ভগবানকেও নৈবিদ্যি দিতে হয়, ভগবানকেও পুজো করতে হয়, তবে ভগবান কথা শোনে—

তারপর একটু থেমে বলতেন—খোসামোদে সবাই ভোলে হে, স্বয়ং ভগবান ভোলে তো মানুষ কোন্ ছার—

বলতেন—লেখা-পড়া কাজ-কর্ম এ-সব হলো ভগবানের খোসামোদ, ওসব করলেই ভগবান তুষ্ট হয়, নইলে খালি হাতে ভগবান কেন দিতে যাবে তোমাকে শুনি?

কথাটায় যুক্তি আছে বৈকি! যোগজীবনবাবুর কথা উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিছু করবো না, শুধু চুপচাপ বসে থাকবো আর টাকা ওম্‌নি উড়ে আসবে, তা কখনও হয়?

যোগজীবনবাবু বলতেন—এই দেখ না, আমার কথাই ধর না, মন দিয়ে কাজকর্ম করি বলেই না এখনও চাকরি করে চলেছি, নইলে অফিসের যা হাল-চাল তাতে কবে আমার চাকরি চলে যেত—

যোগজীবনবাবুর মস্ত গর্ব ছিল তাঁর নিজের ওপর। না-হোক তাঁর প্রমোশন, না হোক চাকরির উন্নতি, কিন্তু চাকরি যে তাঁর আছে, সম্মানের সঙ্গেই যে তিনি চাকরি করে চলেছেন, সে তো তাঁর নিয়ম নিষ্ঠার জন্যেই। তিনি নিয়ম করে ঘুম থেকে ওঠেন, নিয়ম করে ভাত খান, নিয়ম করে অফিসে আসেন, নিয়ম করে ঘুমোন—এর জন্যেই এতদিন তিনি সুনামের সঙ্গে চাকরি চালিয়ে যাচ্ছেন! সমাজে পাড়ায় তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা! পাড়ার সবাই যোগজীবনবাবুকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলে

খাতির করে। সবাই জানে যোগজীবনবাবু ভদ্রলোক। তাঁর কথার মূল্য আছে। জীবনে কখনও তাঁর বাড়ি ভাড়া এক পয়সা বাকি পড়েনি! মুদির দোকানে নিয়ম করে তিনি মাসকাবারি দেনা শোধ করে দেন পয়লা তারিখে। পয়লা তারিখে খবরের কাগজওয়ালার দাম মিটিয়ে দেন তিনি বরাবর।

কিন্তু তাঁর ছেলে?

যোগজীবনবাবু যখন থাকবেন না, তাঁর অবর্তমানে লোকে বলবে কি? লোকে বলবে—যোগজীবনবাবু ছিলেন অত ভদ্রলোক, আর তাঁর ছেলের কিনা এই কাণ্ড!

যোগজীবনবাবু বলতেন—শেষ কালে আমার মুখেও যে চুন কালি মাখাবে ছেলে, সেই চিন্তাটাই বড় কষ্টের ভাই—

বলতেন—তবলা বাজিয়ে যে মানুষ কী সুখ পায় কে জানে ভাই, ও বাজিয়ে যে কী সুখ হয়, আর যারা শোনে তারাই বা কী সুখ পায়, তাও বুঝতে পারি না—

এমনি করেই বহুদিন কেটেছে যোগজীবনবাবুর। ছেলে তবলা বাজিয়ে দিন কাটিয়েছে—আর বাপ অবিশ্রাম খেটে টাকা উপায় করে সেই ছেলেকে বসিয়ে খাইয়েছে। কখন ছেলে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে, কখন ফিরেছে তার কোনও ঠিক ছিল না কখনও। যোগজীবনবাবুর স্ত্রী রাত্রে ছেলের খাবার নিয়ে বসে থেকেছে দিনের পর দিন। একটা পয়সা উপায় করে সংসারের সাশ্রয় করা দূরে থাক্ একটা বাড়ির কাজ করে কখনও উপকার করেনি বাপ-মায়ের। যোগজীবনবাবু সকালবেলা নিজের হাতে বাজার করে এনেছেন, নিজের হাতে আলু পটল বেগুন মাছ কিনে এনেছেন, মা রান্না করে দিয়েছে, আর ছেলে তাই খেয়ে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে—তবলা বাজানোর আড্ডা। ভদ্রলোকের ছেলের কলঙ্ক!

যোগজীবনবাবু বলতেন—সুকুমার রায়ের ছড়ায় পড়েছি—

আর একটি সে তৈরী ছেলে,
জাল করে নোট গেছেন জেলে।
আর একটি সে তবলা বাজায়,
যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পায়।

আমারও এ তাই হয়েছে ভাই—

সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের সেই ছড়াটা যেন একেবারে ধ্রুব সত্য হয়ে গেছে! অনেক অভাব অভিযোগ যোগজীবনবাবু মুখ বুজে সহ্য করেছেন, অনেক দুঃখ কষ্টেও তিনি হাসি মুখ বজায় রেখেছেন! অনেক বাধাবিপত্তিও তিনি নিঃশব্দে মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছেন। কোনওদিন কোনও দুঃখ কষ্টকে আমল দেননি

জীবনে। সবই তিনি ঈশ্বরের নিয়ম বলে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু ছেলের তবলা বাজানো তিনি কখনও বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছেন—এ অন্যায়, এ অযৌক্তিক, এও একরকমের পাপ! পাপই বৈকি! বিপথে যাবার অনেক রকম পন্থার মত এ-ও আর একটা পন্থা। তবলা বাজায় ছোটোলোকেরা। আর শুধু তবলা বাজানোতেই শেষ নয়। তবলার সঙ্গে আরো আনুষঙ্গিক আছে। তবলার সঙ্গে মদ, গাঁজা, বিড়ি সবই আসবে একে একে! ওগুলো তবলারই সমগোত্র। একটা এলেই অন্যগুলো আসবে। তাছাড়া একদিন ওই ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ আসবে। পাত্রপক্ষ খোঁজ নেবে ছেলের সম্বন্ধে। ছেলে করে কি? না তবলা বাজায়! ও বলতেও লজ্জা, শুনতেও লজ্জা।

যোগজীবনবাবু অফিস থেকে বাড়ী যান ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। অফিসে এসেও মনটা ভারি হয়ে থাকে।

আমরা দেখে বুঝতে পারি ছেলের জন্যেই চিন্তান্বিত যোগজীবনবাবু।

বলেন—আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই, সংসারে আমার শান্তি বলে পদার্থ নেই কোনও—

বলতাম—ভেবে আর কী করবেন যোগজীবনবাবু, ভেবে ভেবে কেবল শরীর নষ্ট—

যোগজীবনবাবু বলতেন—তোমাদের আর কী ভাই, তোমারা তো ভুক্তভুগী নও—

অফিসের অন্যান্য লোকেরা একে একে সবাই সাহেবকে বলে নিজের নিজের ছেলেদের অফিসে ঢুকিয়েছিল। সরকারী চাকরি। এতদিন বাপ চাকরি করছিল, ছেলে ঢোকাতে বাপের সাশ্রয় হলো। চাকরি হলো। চাকরি যাবে না, চির-জীবনের মত নিশ্চিন্ত জীবন।

একদিন বললাম—সুরেশবাবুর বড় ছেলে ঢুকলো আমাদের অফিসে, শুনেছেন বোধহয়?

যোগজীবনবাবু বললেন—তোমার ছেলেকেও ঢুকিয়ে দাও ভাই, যে-দিনকাল পড়েছে, এমন সুযোগ আর পাবে না—

বললাম—আপনার ছেলের কী খবর?

যোগজীবনবাবু বললেন—যথাপূর্বং তথা পরং—সে আবার নাকি তবলার মাস্টার হয়েছে শুনছি, কোন্ ইস্কুলে নাকি সে তবলা শেখায়—

বললাম—তাহলে তো দু'পয়সা উপায় করছে বলুন—?

যোগজীবনবাবু বললেন—আরে ভাই তুমিও যেমন, সে যা দু'চার টাকা উপায়

করছে তার নিজের বিড়ি সিগারেট মদ ভাড়েই খরচ করছে—সংসারে একটা পয়সা ঠেকায় না, এখনও আমাকেই তার জামা-কাপড় যোগাতে হয় এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত—

এমনি করে ছেলে একদিন তবলার ইস্কুল নিয়ে মেতে রইল দিন রাত। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেই যে আড্ডা চললো, তার আর কথাই নেই। যোগ-জীবনবাবু ভোরবেলা বেড়াতে বেরোচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন ছেলে হয়ত তখন ফিরছে।

একেবারে মুখোমুখি দেখা!

সেই ভোরের আধো-আলো অন্ধকারের মধ্যেই দেখলেন ছেলের গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে ঘড়ি, মুখে সিগারেট, আর লপেটা জুতো।

যোগজীবনবাবু বললেন—এখন বাড়ি ফিরছো নাকি ?

হরিসাধন মুখের সিগারেটটা সরিয়ে বললে—হ্যাঁ—

—তা এত দেরি হলো যে ?

'হরিসাধন বললে—আজ আসানসোলে একটা কনফারেন্স ছিল—

রাগ হয়ে গেল যোগজীবনবাবুর।

বললেন—তা এত রাত্রে বাড়িতে না ফিরলেই পারতে!

বলে আর সামলাতে পারলেন না তিনি। পাছে মুখে আরো কিছু কড়া কথা বেরিয়ে পড়ে তাই আর কিছু না বলে সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অফিসে এসে বললেন—ভাই, আমায় বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে—

বললাম—কেন ? আবার কী হলো ?

বললেন—ছেলের জ্বালায় আমি আর পাড়ায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই, সারা রাত বাইরে কাটায় ভদ্রলোকের ছেলে, এমন কথা কেউ কখনও শুনেছ ?

কিন্তু এসব ব্যাপারও অনেক কষ্টে সহ্য করেছেন যোগজীবনবাবু আর নিজের মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যে যোগজীবনবাবুর কাছে সবাই সব সমস্যার জন্যে যেত, সেই যোগজীবনবাবু নিজেই নিজের এক সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতেন। মুখটা তার ক্রমেই গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে উঠলো। অফিসে আসেন, অফিস থেকে যান, কিন্তু দিন দিন দুশ্চিন্তায় স্বাস্থ্য ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। শেষকালে চোখের দৃষ্টিও খারাপ হয়ে এল। আগে চশমা ছিল না, শেষে চোখের চশমা করাতে হলো! খেলে আর আগেকার মত হজম হতো না। শেষে বাড়ি থেকে কৌটো করে বার্লি

নিয়ে আসতেন! তারপর চুল পাকতে লাগলো মাথার। তারপর একটা দু'টো করে দাঁত পড়লো।

শেষে একদিন অফিস কামাই করলেন।

সবাই ভাবলাম পরের দিন অফিসে আসবেন। কিন্তু পরের দিনও এলেন না।

এমন তো কখনও হয় না। জীবনে যে-যোগজীবনবাবু কখনও একদিনের জন্যেও কামাই করেননি, সেই তিনিই কিনা এমন ভাবে অফিস কামাই করলেন!

সেদিন দরখাস্ত এল যোগজীবনবাবুর। তিনি অসুস্থ। লম্বা ছুটির দরখাস্ত করেছেন তিনি।

কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লাম যোগজীবনবাবুর জন্যে!

একটা ছুটির দিন দেখে গেলাম যোগজীবনবাবুর বাড়ি।

বৌবাজারের মধু গুপ্ত লেনের একটা ভাড়াটে বাড়ি। বহুদিন আগে মেয়েদের বিয়ের সময় ঠিকানাটা জানা ছিল। খুঁজে খুঁজে নম্বর মিলিয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দেখি বাড়িটার সামনে একটা বিরাট মটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বোধহয় ডাক্তার এসেছে!

বাড়ির সদর দরজা খোলাই ছিল।

কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে যোগজীবনবাবুর গলার আওয়াজ পেলাম—কে?

বললাম—আমি—

জানলার ফাঁক দিয়ে বোধহয় আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

বললেন—এসো এসো, ভেতরে চলে এসো ভায়া—

উঠোনটা পেরিয়ে পাশেই শোবার ঘর। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি একটা তক্তপোষের ওপর শুয়ে আছেন লেপ গায়ে দিয়ে।

বললাম—কেমন আছেন এখন?

যোগজীবন বললেন—ভালো নয় ভাই, বড্ড মাথাটা ধরেছে—

জিজ্ঞেস করলাম—ডাক্তার কি বলছে—?

যোগজীবনবাবু বললেন—ডাক্তারকে ডাকিনি, এ রোগে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না—ডাক্তারের সাধ্যি নেই এ সারায়—

—কেন? কী রোগ?

যোগজীবনবাবু বললেন—বাড়ির সামনে গাড়ি দেখলে? নতুন গাড়ি?

বললাম—হ্যাঁ দেখলাম তো। আমি ভেবেছিলাম ডাক্তারের গাড়ি—

যোগজীবনবাবু বললেন—না ডাক্তারের নয়, আমার ছেলের—আমার ছেলে বারো হাজার টাকা দিয়ে কিনেছে—

—সে কী ?

আমি অবাক হয়ে গেলাম যোগজীবনবাবুর কথা শুনে।

যোগজীবনবাবু আবার বললেন—হ্যাঁ ভাই, সারা জীবন চাকরি করে আমি উনিশ হাজার টাকা জমাতে পারিনি, আর আমার ছেলে কিনা লেখাপড়া না শিখে সেই অত টাকায় গাড়ি কিনেছে !

বললাম—কী করে হলো ?

যোগজীবনবাবু বললেন—কী করে হলো তা তো আমিই ভেবে পাই না, তাই ভেবে ভেবেই তো আমার এই মাথার অসুখ হয়েছে ভাই—আমি কী যে করি !

আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না।

যোগজীবনবাবু আবার বলতে লাগলেন—শুধু গাড়িই নয়—শুনেছি নাকি রেডিও থেকে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছিল একটা, তা নেয়নি। মাসে মাসে নাকি দেড়-হাজার টাকা ওর আয়—

—কী করে ?

যোগজীবনবাবু বললেন—তবলা বাজিয়ে !

—তবলা বাজিয়ে ?

—হ্যাঁ ভাই, শুধু তবলা বাজিয়ে।

যোগজীবনবাবুর কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছিল।

বললেন—কথাটা শোনবার পর থেকেই আমার মাথায় যন্ত্রণাটা সুরু হলো ভাই, তারপর যেদিন গাড়ি কিনলে ও, সেদিন থেকে মাথার যন্ত্রণাটা আরো বেড়ে গেছে—

তারপর একটু থেমে বললেন—আজ সকাল থেকে আবার মাথাধরাটা আরো বেড়ে গেছে ভাই—

বললাম—কেন ? আজকে আবার কী হলো ?

যোগজীবনবাবু বললেন—কালকে শুনলাম ছেলে নাকি রাশিয়ায় যাচ্ছে—ইণ্ডিয়ার ডেলিগেট হয়ে—

—কেন ?

যোগজীবনবাবু বললেন—শুনছি তো গভর্ণমেণ্ট থেকে নাকি ওকে পাঠাচ্ছে সেখানে—তাতে নাকি ভারতবর্ষের সম্মান বাড়বে, মর্যাদা বাড়বে—ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট এত লোক থাকতে কিনা ওই রাস্কেলটাকে পাঠাচ্ছে—

কথাটা বলে যোগজীবনবাবু হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না। যোগজীবনবাবুর এ কষ্ট আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝতে পারলাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই 'বোধোদয়' থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত যত মহাপুরুষ যত মহাজন যত কিছু মহাবাণী লিখে গেছেন, সেই সব কিছু আজ যেন যোগজীবনবাবুর কাছে হঠাৎ মূল্যহীন হয়ে গেছে। তিনি যেন তাঁর ছেলের হঠাৎ এই সম্মানে, ওই ভাগ্যোন্নতিতে বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আর যেন নিজেকে শান্ত রাখতে পারছেন না। আজীবনের ধ্যান-ধারণা-শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর সব কিছু যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। জীবনকে তিনি যে-মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর ছোটবেলা থেকে প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন সেই মূল্যবোধই যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আর তিনি যেন ঘটনার আকস্মিকতায় হঠাৎ একেবারে নিঃস্ব কপর্দকহীন হয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়েছেন।

যোগজীবনবাবুর চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠলো। তিনি ক্ষোভে দুঃখে হঠাৎ যেন উন্মাদের মত হয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন—তোমরাই বলো ভাই, এর কোনও মানে আছে ?

বলে সেই তক্তপোষের ওপর শুয়ে শুয়ে তিনি তাঁর মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

আমি চুপ করে রইলাম। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মত কোনও ভাষা আমি আর খুঁজে পেলাম না।

নাটকীয়

বৃন্দাবন আমার গল্পের নায়ক নয়, গল্প-সাপ্লায়ারও নয়। বৃন্দাবন আমার গল্পের বাহক।

বৃন্দাবন সাঁই।

'বৈতালিক' পত্রিকায় কাজ করে বৃন্দাবন। 'বৈতালিক' মাসিক পত্রিকা। ছেলে-ছোকরা আর মেয়ে-মহলে বেশ কাটতি 'বৈতালিকে'র। অনেকেই প্রকাশ্যে 'বৈতালিক' পড়ে, তবে বেশির ভাগই লুকিয়ে। লুকিয়ে পড়বার মত কিছু না থাকলেও তারা লুকিয়ে পড়ে। 'বৈতালিকে' সিনেমার মজাদার ছবি থাকে, বত্রিশ-রকমের সিনেমার খবর থাকে। সেই জন্যেই কাগজটার বাজারে চাহিদা বেশ।

তা সে যা' হোক, আসলে এ-গল্প, বৈতালিক নিয়ে নয়, 'বৈতালিকে'র বাহক বৃন্দাবনকে নিয়ে। বৃন্দাবন সাঁইকে নিয়ে।

পুজোর মাস চারেক আগে থেকে বৃন্দাবনের আগমন শুরু হতো। বৃন্দাবনের হাসিমুখ দেখে বুঝতে পারতাম পুজো আসছে।

বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করতো—কবে থেকে আসতে শুরু করবো?

অর্থাৎ কবে থেকে সে গল্পের স্লিপ নিতে আসবে। মানে সেই তারপর থেকেই বৃন্দাবনের আসা শুরু হবে। বৃন্দাবন আসবে, ঘরে বসবে, একটু জিরোবে, গল্প করবে। তারপর বলবে—তাহলে উঠি স্যার—

দুখানা স্লিপ নিয়ে বৃন্দাবন চলে যাবে। সে-পাতা দু'টো প্রেসে পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দেবে। তারপর পরের দিন আবার ঠিক ওই দুপুরবেলা এসে হাজির হবে। এসে ঘরে বসবে, একটু জিরোবে, গল্প করবে। তারপর বলবে—তাহলে উঠি স্যার—

একটা গল্পের পুরো কপি নিতে এই রকম করে বৃন্দাবনকে দিন সাত-আট এক নাগাড়ে আসতে হয়। এই নিয়মই চলে আসছে বরাবর। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বৃন্দাবন এই রকম বছরের পর বছর আমার কাছে আসে। গল্পের শেষ পাতাটা যেদিন নিয়ে যায় সেদিন বলে যায়—আবার আসছে বছরে দেখা হবে স্যার, আসি তাহলে—

কিন্তু বৃন্দাবন একটু বক্তার মানুষ। অর্থাৎ চুপ করে থাকতে তার যেন দম আটকে আসে।

আমি যখন তাকে বসিয়ে রেখে একমনে লিখি তখন তার চুপ করে থাকারই কথা। কিন্তু একটা না একটা ছুতো নিয়ে সে কেবল কথা বলেই চলে।

বলে—বুঝলেন স্যার···

আমি কিন্তু বুঝি না। আমি একমনে লিখেই যাই।

তখন উপায় না পেয়ে বলে—এক গেলাস খাবার জল পেলে ভালো হতো···

লেখা নিতে এসে এই রকম বিরক্ত করা বৃন্দাবনের চিরকালের স্বভাব। তবে আমি তার বক্তৃতায় তেমন কান না দিলেও একটু বিরক্ত হই বৈকি!

হঠাৎ কিন্তু আমাকে একদিন অবাক করে দিলে বৃন্দাবন।

বললে—এবারের গল্পটা আপনার ভাল হচ্ছে স্যার—

কথাটা শুনে আমি চম্‌কে উঠেছি। বৃন্দাবন এতদিন আমার কাছে গল্প নিতে আসছে, কিন্তু গল্প নিয়ে বা সাহিত্য নিয়ে কোনও দিন আলোচনা করেছে এমন

দুর্ঘটনা ঘটায়নি। তার মুখ থেকে আমার লেখার ভালো-মন্দ নিয়ে মন্তব্য শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

বললাম—তুমি আবার গল্প-টল্প পড়ো নাকি?

বৃন্দাবন বললে—না স্যার, ও-সব পড়বার টাইম কোথায় পাই বলুন, ছাপোষা মানুষ, পেট চালাতেই চক্ষু ছানাবড়া—

—তাহলে? কী করে বললে এবারের গল্পটা ভালো? ধরণীবাবু বলেছেন?

ধরণীবাবু মানে বৈতালিকের সম্পাদক।

বৃন্দাবন বললে—না স্যার, ধরণীবাবু গল্প পড়বেন? ততক্ষণে ফর্মার হিসেব কষলে দুটো পয়সা পকেটে আসবে। কে পড়ে বলুন তো আপনাদের গল্প? ওই যাদের কাজ-কম্ম কিচ্ছু নেই, তারাই পড়ে। বৈতালিক কি আর আপনাদের লেখার জন্যে বিক্রি হয় ভেবেছেন?

—তাহলে কী করে বললে এবারের গল্পটা ভাল হচ্ছে?

বৃন্দাবন বললে—আমি কী করে জানবো মশাই আপনার গল্প ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, বৌমা বলছিলেন তাই বললুম আপনাকে।

—বৌমা কে? তোমার পুত্রবধূ?

—না মশাই, আমার পুত্রই নেই তার আবার পুত্রবধূ! আমি তো বিয়েই করিনি। বিয়ে করবো কী করে বলুন? মাইনে যা পাই তা তো আপনারা জানেন না। ধরণীবাবু কি আমাদের বেশি মাইনে দেবার লোক? আপনারা তো বেশ মশাই ঘরে বসে লিখছেন আর একপাতা-একপাতা করে সাপ্লাই দিচ্ছেন! প্রাণ তো বেরিয়ে যাচ্ছে সেই আমারই। জুতো-জোড়ার চেহারা দেখেছেন? এই দেখুন! জুতোর সোল্ দিতে দিতে আমার কত টাকা বেরিয়ে গেল তার হিসেব কেউ করে?

বৃন্দাবন এ-রকম বাজে কথা বলে থাকে। এ তার স্বভাব।

তবু তাকে বাধা দিয়ে আসল কথাটা কোনও রকমে বার করে নিলাম। বৃন্দাবন যে-বাড়িতে ভাড়া থাকে, সেই বাড়ির মালিকের পুত্রবধূ হল বৌমা।

জিজ্ঞেস করলাম—খুব সাহিত্যের ঝোঁক আছে বুঝি তাঁর?

—খুব ঝোঁক মশাই। এই যে আপনার কাছ থেকে এক পাতা লেখা নিয়ে যাই, এটা সোজা প্রেসে গিয়ে দিতে পারবো না। এ বৌমার হুকুম। এটা সোজা প্রথমে বৌমাকে গিয়ে দেখাতে হবে, তিনি এটা পড়বেন, তারপর প্রেসে গিয়ে কম্পোজ ধরাতে দেব—! খুব লেখা-পড়া জানা মেয়ে কি না!

বললাম—তা গল্প তো আমার এখনও শেষ হয়নি!

—তা না হোক, তিনি ওই হাতের লেখাই পড়ে নেবেন। ছাপা হবার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁর সইবে না। তা এই আপনার কাছে এই ক'দিন ধরে তো লেখা নিয়ে যাচ্ছি। তিনি পড়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ কালকে আমাকে বললেন—এবারের গল্পটা খুব ভাল হচ্ছে রে বৃন্দাবন—

এখন, লেখা সম্বন্ধে প্রশংসা কোন্ লেখক না শুনতে চায়! বিশেষ করে অচেনা পাঠকের!

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বৃন্দাবনের কাছ থেকে অনেক কথা বার করে নিলাম। শুধু আমার লেখাই পড়ে, না অন্য লেখকের লেখাও পড়ে!

বৃন্দাবন বললে—অন্য লোকের লেখাও পড়েন, কিন্তু আপনার লেখাই বেশি খুঁটিয়ে পড়েন। এই তো শিবশ্যামবাবুর লেখাও তো আনতে যাই, তার লেখা কিন্তু দেখতে চান না। বলেন, ও ছাপা হলেই পড়বো'খন! কিন্তু আপনার লেখা আর ছাড়েন না, টাটকা-টাটকা কেউ পড়বার আগে না পড়লে তাঁর ভাত হজম হয় না মশাই—

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। এতদিন আসছে বৃন্দাবন, এ-কথা তো কোনও দিন বলেনি।

বৃন্দাবন বললে—তা এ কি আর বলবার মত কথা মশাই যে আপনাকে বলব? মেয়েছেলে মানুষ, আমাদের মতন তো আর খেটে খেতে হয় না, তাই সারাদিন বই পড়েন বিছানায় শুয়ে শুয়ে—

—কেন, খুব বড়লোক বুঝি?

—বড়লোক বলে বড়লোক! পাঁচখানা গাড়ি বাড়িতে। এই কলকাতাতেই তো দেড়শোটা বাড়ি ওদের। এই যে আমি আছি ওদের বাড়িতে, ভাড়া তো নেয় না।

—তোমায় ভাড়া দিতে হয় না? বিনা ভাড়ায় থাকো?

বৃন্দাবন বললে—ভাড়া নেয় না বটে, কিন্তু তেমনি যে 'বৈতালিক' দিই ফ্রি একটা করে কপি! একটা কপির দামই তো মশাই দেড় টাকা। পুজো সংখ্যা চার টাকা, তারপর বৈশাখ-সংখ্যা আছে, নব-বর্ষ সংখ্যা আছে—সেটা—কিছু নয়?

সেদিন এই পর্যন্তই কথা হয়েছিল।

বৃন্দাবনের তাড়াতাড়ি ছিল। একখানা তো মাত্র স্লিপ্। সেখানা ভাঁজ করে বুক-পকেটে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বললাম—খুব সাবধানে স্লিপ্‌খানা নিয়ে যাবে বৃন্দাবন, দেখো যেন হারায় না।

বৃন্দাবন বললে—না না, হারাবে কেন? আগে কি কখনও হারিয়েছি?

—না না, তা বলছি নে, আমার লেখার তো কপি থাকে না, হারালে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর নতুন করে লিখতে পারবো না—

বৃন্দাবন চলে গেল। তারপর যথারীতি পরের দিন আবার এসেছে।

সাধারণতঃ প্রতি বছর এই ভাবেই লেখা নিতে আসে বৃন্দাবন। সাত-আট দিন এলেই গল্প শেষ হয়ে যায়। তারপর সারা বছর আর তার দেখা পাওয়া যায় না। তারও আমার কাছে আসার প্রয়োজন হয় না, আমারও আর তাকে দরকার মনে হয় না। বলতে গেলে সারা বছর তাকে ভুলেই থাকি এক রকম। 'বৈতালিক' কাগজের মালিক ধরণীবাবু এই ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। তাই বছরের পর বছর এই নিয়মই চলে আসছিল।

বৃন্দাবন সম্বন্ধে যে-টুকু শুনেছিলাম তাতে জানতুম সে খুব কম টাকা মাইনে পায়। যে-বাড়িতে থাকে সে-বাড়ির মালিক দয়া করে তার কাছ থেকে ঘর-ভাড়া নেন না। তার বদলে বৃন্দাবন মালিকের কিছু ফাই-ফরমাশ খেটে দেয়। নিজের খাওয়াটা বৃন্দাবন হোটেল থেকে চালিয়ে নেয়। আর যেটুকু সময় হাতে থাকে সমস্তটা সময়ই 'বৈতালিক' পত্রিকার পেছনে দিতে হয়। 'বৈতালিক' মাসিক-পত্রিকা হলে কী হবে, কাজ তা বলে কম নয়,। বরং বেশিই। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই বৃন্দাবনের ঘাড়ে। সিনেমা ডিস্ট্রিবিউটার্সের অফিসে গিয়ে ছবির ব্লক নিয়ে আসতে হবে, কে যাবে সেখানে? ওই বৃন্দাবনকে পাঠাও। লেখকের বাড়িতে গিয়ে লেখার স্লিপ আনতে হবে, কে যাবে? ওই বৃন্দাবন। ম্যাটার দিতে হবে প্রেসে, কে নিয়ে যাবে? ওই বৃন্দাবন আছে। বলতে গেলে সারাদিনই কাজ বৃন্দাবনের। বৃন্দাবনের কাজের মাথামুণ্ডু নেই। এক কথায় সে 'বৈতালিক' কাগজের আলু।

এ-হেন বৃন্দাবন আমার কাছে এলেই বুঝতে পারি 'বৈতালিক' কাগজের পুজো-সংখ্যা আসন্ন।

দ্বিতীয় দিন যখন এল তখন বেশ তাড়াহুড়ো ভাব। বললে—স্লিপ্ হয়েছে? বললাম—একটু বসতে হবে আজ, লিখে দিচ্ছি—

—সে কি, এখনও লেখা তৈরি হয়নি? আমার যে আবার সময় নেই মশাই—

বললাম—তা আমারই কি সময় আছে ভেবেছ? আমার কি আর কাজ-কর্ম নেই—

—না স্যার, আমার সত্যিই অনেক কাজ। আপনার মত বাড়িতে চেয়ারে বসে থাকা কাজ নয় আমার—আমায় খেটে খেতে হয়।

এ-রকম বাজে কথা বলা অভ্যেস আছে বৃন্দাবনের, এ নিয়ে মেজাজ গরম আমি করি না।

বৃন্দাবন বললে—না, সে জন্যে নয় মশাই, বৌমা বড় তাগাদা দিচ্ছে—

—বৌমা তাগাদা দিচ্ছে কেন ?

—তা তাগাদা দেবে না ? যেটুকু লেখা দিয়েছেন, সেইটুকু পড়েই যে তিনি ছটফট্ লাগিয়েছেন। কালকে সারা রাত তাঁর ঘুম হয়নি মশাই।

—কেন ?

—আপনার গল্পের শেষটা কী হবে, তাই ভেবে ভেবে ; সেই জন্যেই তো সেদিন বলছিলাম আপনার গল্পটা এবার খুব ভাল হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠতেই আমাকে সকাল থেকে তাগিদ ! বলছিলেন—যাও বৃন্দাবন, গল্পটা নিয়ে এসো গিয়ে। আমি ভাবলাম একটু চা খেয়ে আসবো, তাও খেতে পারলাম না, একেবারে বাসি মুখে চলে এসেছি আপনার কাছে, তাগিদের চোটে আর বাড়িতে তিষ্ঠোতে দিলে না মশাই—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আপনি কী নিয়ে লিখছেন মশাই ?

বললাম—তুমি পড়ে দেখলেই পারো, তুমিই তো নিয়ে যাও হাতে করে—

—আমার আর ও-সব কপালে নেই মশাই, কাজের ঝঞ্ঝাটে আর ও-সব হল না। পর-জন্মে যদি হয় দেখি—

তা এক ঘণ্টা বসে থাকার পর পাতাটা লিখে বৃন্দাবনের হাতে দিলাম। বৃন্দাবন সেটা নিয়ে চলে গেল হন্ হন্ করে।

পরদিনই আবার বৃন্দাবন এল। একেবারে ভোরবেলা।

বললাম—কী হল ? এত সকালে ?

বৃন্দাবন বললে—বৌমা ঠেলে পাঠিয়ে দিলে, বললে, এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে এসো, আর তর সইছে না। তা শেষটা কী হবে বলুন তো স্যার ?

—কিসের শেষ ?

—গল্পের শেষটা। একটা মেয়েকে নিয়ে লিখছেন তো আপনি ? শেষ কালে সে মেয়েটার কী হবে ?

বললাম—যখন শেষ হবে তখনই দেখতে পাবে—

—না, বৌমা বলেছেন আগেই আপনার কাছে জেনে আসতে। গল্প যখন লিখছেন তখন শেষটা তো আগে থেকেই ছক্ করে রেখেছেন—

—ছক্ করে রেখেছি কে বললে তোমাকে?

—বৌমা। বৌমাই বলেছেন। বৌমা বলেছেন লেখকরা আগে থেকে শেষটা ছক বেঁধে রাখে। বৌমা লেখা-পড়া জানা মেয়ে যে। গ্র্যাজুয়েট পাস—

—কী রকম?

বেশ কৌতূহল হয়েছিল বৃন্দাবনের বৌমা সম্বন্ধে। বার বার বৌমার কথা বলে বলে সে প্রায় আমাকে বৌমা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলেছিল। কোথায় থাকতো বৃন্দাবনের বৌমা আর কোথায় থাকতুম আমি। কিন্তু বৃন্দাবনের বৌমার অনেক কিছুই জেনে ফেলেছিলাম। বৌমাকে কী-রকম দেখতে, বৌমার কত বয়েস, বৌমার স্বামী কী করে, বৌমা কী পাস—সব আমার জানা হয়ে গিয়েছিল।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা, এ-গল্পটা তোমার বৌমার এত ভাল লাগছে কেন বল দিকিনি?

বৃন্দাবন বললে—আপনি যে একটা মেয়েকে নিয়ে গল্প লিখছেন—

—তা মেয়েকে নিয়ে গল্প লিখলেই ভাল লাগতে হবে?

বৃন্দাবন বললে—আপনি নাকি একটা অদ্ভুত মেয়েকে নিয়ে গল্প লিখছেন, তার ক্যারেকটারটা নাকি খুব ভাল?

—কে বললে তোমাকে?

বৃন্দাবন বললে—কে আর বলবে? বৌমাই বললেন—আমি তো আর পড়ি-টড়ি না—বৌমাই বলছিল আমাকে যে, ক্যারেকটারটা নাকি খুব ইন্‌টারেস্‌টিং—

ক্যারেকটার ইন্‌টারেস্‌টিং হোক আর না হোক, বৃন্দাবন তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না কখনও। সে ওর স্বভাবে নেই। বরাদ্দ স্লিপ্‌টা নিয়ে বৃন্দাবন যথারীতি চলে যাবার পর আমি আবার লিখতে লাগলাম।

ছোট গল্প। এমন কিছু আহা-মরি ঘটনাও নয়। আসলে বহুদিন আগে আমার জীবনেই ঘটনাটা ঘটেছিল। সেইটে নিয়েই লিখছিলাম। ছোটবেলায় থাকতাম একটা মফঃস্বল শহরে। জায়গাটার নাম বদরগঞ্জ। এখন সেটা পাকিস্তান হয়ে গেছে।

আমাদের বাড়িটা ছিল দুটো বড় মাঠের মাঝামাঝি।

ওপাশে বদরগঞ্জের কোর্ট-কাছারি, ম্যাজিস্ট্রেট-মুন্‌সিফের কোয়ার্টার। সেখানে জেলখানাও ছিল একটা। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তারপর বাজার-হাট-স্কুল-কলেজ সমস্ত। বদরগঞ্জ স্টেশন থেকে নেমে ট্যাক্সি কিংবা রিক্সা করে সিনেমা-হাউস পর্যন্ত চারিদিকেই ঘন-বসতি। বদরগঞ্জে জাজেস-কোর্ট আছে,

মুন্সিফ কোর্ট আছে, ফৌজদারি কোর্ট আছে, রেজিস্ট্রেশন অফিসও আছে। এখন বদরগঞ্জের কী অবস্থা হয়েছে জানি না, কিন্তু তখন জায়গাটা বেশ জমজমাট ছিল। ইলেক্‌ট্রিক লাইট্‌, রেডিও, হোটেল-রেস্টুরেন্ট সব মিলে সন্ধ্যেবেলা বদরগঞ্জ সদর জমজমাট থাকতো।

আমাদের বাড়িটা একটু ফাঁকা জায়গায়। আমার কাকা শৌখিন মানুষ। শহরের বাইরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছিলেন।

বদরগঞ্জ থেকে আমাদের বাড়ি আসতে একটা ফাঁকা মাঠ পড়তো। এখন সেখানে নিশ্চয়ই বাড়ি হয়ে গেছে। সেই বাড়ির সামনে ছিল বাগান। কাকার ফুল-বাগানের শখ ছিল। শখ ছিল আমারও। বদরগঞ্জ থেকে অনেকখানি হেঁটে এলে তবে আমাদের বাড়ি পড়তো। চওড়া ইঁট-বাঁধানো রাস্তা। যারা বদরগঞ্জে অফিসের কাজ-কর্ম করতে যেত তাদের ছিল ওইটে যাতায়াতের রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে ফরাসগঞ্জের দিকে যাওয়া যেত।

ফরাসগঞ্জও বর্ধিষ্ণু জায়গা। সেখানেও অনেক মধ্যবিত্ত বড়লোকের বাস। অনেক বনেদী লোকেরও বাস ছিল সেখানে। তবে পুরনো টাউন। আর বদরগঞ্জ নতুন। ফরাসগঞ্জে ইলেকট্রিক লাইট তখনও আসেনি। রাস্তার দু'পাশে নর্দমা। কাঁচা রাস্তা, পানা-পুকুর, সবই ছিল। তাই যাদের একটু সামর্থ্য হতো তারাই চলে যেত বদরগঞ্জে। বদরগঞ্জে জমির দাম বেশি। বাজার-হাট-স্টেশন-কোর্ট-কাছারি সবই কাছে। কলেজ-স্কুল-সিনেমা যেতে গেলে বেশি হাঁটতে হয় না। সাইকেল-রিক্‌সার ভাড়াও দিতে হয় না। যারা সিনেমার শেষ শোতে টিকিট কাটতো, তারা রাত বারোটার সময় হেঁটে হেঁটে ফিরতো ফরাসগঞ্জে। অত রাত্রে সাইকেল-রিক্‌সাও ফরাসগঞ্জের দিকে যেতে চাইতো না। কারণ ফিরতে হবে ফাঁকা। তখন আর ফরাসগঞ্জ থেকে বদরগঞ্জে আসবার প্যাসেঞ্জার পাওয়া যাবে না।

আমি রাত জেগে-জেগে তখন পরীক্ষার পড়া পড়তুম।

সামনে একজামিন। দোতলায় কাকা-কাকীমা খুড়তুতো ভাই-বোনেরা সবাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাসটা অঘ্রাণ। বেশ হিম পড়তে শুরু করেছে অল্প-অল্প।

বাড়ির বাগান থেকে কেয়াফুলের গন্ধ আসছে। জানালাটা খুলে দিয়ে আমি একমনে হিস্ট্রি মুখস্থ করছি। চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। রাত জেগে পড়ে পড়ে তখন ঘুমকেও আর দোষ দেওয়া যায় না, এমনি শরীরের অবস্থা।

ঘুমটা তাড়াবার জন্যে আমি বাগানের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সামনে আকাশের

একপাশে চাঁদটা কুয়াশায় ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। মনে হল সেই ফাঁকা রাস্তায় একটু পায়চারি করলেই ঘুমটার হাত থেকে মুক্তি পাবো।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গেঞ্জিটার ওপর পাঞ্জাবীটা চড়িয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

সেই অত রাত্রে রাস্তাতেও কেউ নেই, সামনের খোলা বিরাট মাঠটাও ফাঁকা তখন। বিকেল বেলা মাঠের ওপর যারা ফুটবল-টল্ খেলে তারাও তখন যে-যার বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল বদরগঞ্জের দিক থেকে ফরাসগঞ্জের দিকে কে যেন আসছে।

এত রাত্রে আবার একলা-একলা কে আসবে।

কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মনে হল যেন একটা মেয়ে। একজন মেয়ে এত রাত্রে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে।

এ-ঘটনাটা বহুদিন ধরে আমার মাথায় ঘুরেছে। পরিচিত-অপরিচিত বহুজনকে এ-ঘটনাটার কথা বলেছি, কিন্তু লিখতে সাহস করিনি। ভেবেছি হয়তো লোকে অবিশ্বাস করবে। এবার বৈতালিক কাগজের ধরণীবাবু যখন ধরলেন, তখন কোনও উপায় না পেয়ে বদরগঞ্জের ওই গল্পটাতেই হাত দিয়েছিলাম। কার কী-রকম লাগবে সে-কথা ছাপা হবার আগে জানবার উপায় ছিল না।

ধরণীবাবু শুধু বলেছিলেন—তাহলে বৃন্দাবন পয়লা তারিখ থেকেই আপনার বাড়িতে যাবে, গিয়ে স্লিপ্ নিয়ে আসবে'খন···

সেইভাবেই স্লিপ্ দিচ্ছিলাম দিনের পর দিন।

সেদিন বদরগঞ্জের বাড়িতে হিস্ট্রি মুখস্থ করতে করতে যখন রাত্রে রাস্তায় বেরিয়েছি তখনই সেই ঘটনাটা ঘটল।

কাছে আসতেই দেখি একটা মেয়ে।

সাধারণতঃ একজন মহিলাকে অত রাত্রে একলা বদরগঞ্জের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখে একটু অবাক হবারই কথা। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা যায় না। আস্তে আস্তে সে-দিকে না চেয়ে বাড়ির বাগানের গেট খুলে আবার ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম।

পেছন থেকে মেয়েলি-গলার ডাক এল।

—শুনুন!

আমি পেছন ফিরে দেখি মেয়েটি আমাকেই ডাকছে।

বললাম—আমাকে ডাকছেন?

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, আমার একটু উপকার করবেন ?

—বলুন, কী উপকার করতে পারি আপনার ?

মেয়েটি বললে—আপনাকে একটু কষ্ট দিতাম—

তখনও আমি বুঝতে পারছি না কী বলতে চায় সে।

আবার বললাম—বলুন না কী করতে হবে ?

মেয়েটি বললে—দেখুন, আমি নাইট-শোর সিনেমা দেখে ফিরছি, ফরাসগঞ্জে যাবো, কিন্তু রাত হয়ে গেছে অনেক। একলা-একলা যেতে ভয় করছে—আপনি যদি একটু এগিয়ে দিতেন—

বললাম—রিক্সা পেলেন না ?

—না !

—ফরাসগঞ্জে কোন পাড়ায় আপনার বাড়ি ?

—দক্ষিণপাড়ায়।

ফরাসগঞ্জের কোনও লোককে আমি চিনতাম না। ফরাসগঞ্জের দিকে যাতায়াতও ছিল না বেশি। কাজকর্ম যা কিছু সবই বদরগঞ্জে।

মেয়েটি বললে—অত দূর এগিয়ে দিতে হবে না, ওই ফরাসগঞ্জের কাঠের পুল পর্যন্ত এগিয়ে দিলেই চলবে, বাকিটুকু আমি নিজেই যেতে পারবো।

এই স্লিপটা নিয়ে বৃন্দাবন ভাঁজ করে পকেটে পুরলো।

বললাম—সাবধানে নিয়ে যেও বৃন্দাবন, হারায় না যেন—

বৃন্দাবন চলে গেল। কিন্তু পরদিন এসেই আবার তাগাদা দিলে।

বললে—তারপর ? তারপর কী হল ?

জিজ্ঞেস করলাম,—কেন ?

—না না, বলুন না, বৌমা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তারপর কী হবে।

বললাম—দেখি, আজকে এখন লিখছি, লেখাটা হলেই জানতে পারবে—

বৃন্দাবন চুপ করে বসে রইল আর আমি লিখতে লাগলাম।

সেদিন আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না ! প্রথমত এত রাত, তারপর মেয়েটাকেও জানি না চিনি না !

একটু বোধহয় সঙ্কোচ করেছিলাম। সঙ্কোচের ছায়া মুখে-চোখে হয়তো ফুটে

উঠেছিল আমার। আমার অবস্থা দেখে মেয়েটি বললে—ঠিক আছে, আপনাকে আসতে হবে না, আমি একলাই যাচ্ছি—

বলে সত্যি সত্যিই মেয়েটি একলাই এগিয়ে যায় আর কি।

আমারও কেমন আত্মধিক্কার হল। এইটুকু উপকার করতে পারলাম না একটা মেয়ের। একজামিনেশনের পড়ার অজুহাতটা মিথ্যে। কত সময়ই তো আজে-বাজে নষ্ট করছি। আর এই মেয়েটার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে পারবো না!

বললাম—দাঁড়ান, আমি ঘরটায় তালা বন্ধ করে আসি—

তারপর বাইরে এসে বললাম···চলুন—

অন্ধকার রাস্তায় ফাঁকা মাঠের ধু-ধু নির্জনতার মধ্যে মেয়েটার পাশে পাশে চলতে চলতে অনেক প্রশ্ন জমে উঠেছিল মনের ভেতর, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে মেয়েটাই হঠাৎ বললে—এই কিছুদিন আগে একটা মেয়ের গলার হার ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কে একজন। সেইটে শোনার পর থেকেই তো সাবধান হয়েছি, নইলে সিনেমা দেখে বরাবর আমি একলাই ফিরি এখান দিয়ে—

বললাম—আজকাল পৃথিবীটাই বদলে গেছে, মানুষগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে—

মেয়েটি বললে—কেন এ-রকম হল বলুন তো?

বললাম—জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে···

মেয়েটি বললে—জিনিসপত্তোরের দাম বাড়ছেই বা কেন?

—যুদ্ধের ফলে।

—তা, যুদ্ধ তো অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে, এখনও দাম কমবে না?

বললাম—মানুষের লোভ যে বেড়ে যাচ্ছে। যার একখানা বাড়ি আছে তার দুখানা বাড়ি করবার ইচ্ছে হচ্ছে, একখানা গাড়ি থেকে দু'খানা গাড়ি করবার লোভ হচ্ছে—

মেয়েটি বললে—আসলে টাকা-টাকা করেই বোধহয় সবাই পাগল হয়ে গেছে।

বললাম—টাকা না হলে তো আবার চলবে না! যার যতটুকু দরকার তার বেশি সে আয় করতে চাইছে যে—তাইতেই গোল বেধেছে—

মেয়েটি বললে—আপনার বুঝি ইক্‌নমিক্‌স্ আছে বি-এ-তে?

বললাম—কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—আপনি এত জানলেন কী করে?

বললাম—আজকাল এসব কথা সবাই জানে, এ-সব জানতে গেলে লেখাপড়া জানার দরকার হয় না—আপনিও জানেন। জানেন না?

মেয়েটি বললে—আমি আর আপনাদের মতন কী করে জানবো, আমি বিশেষ কারোর সঙ্গে মিশি না—

—সে কি? মেশেন না মানে? তাহলে এত রাত্রে সিনেমা দেখতে বেরোলেন কি করে?

মেয়েটি বললে—নাইট-শোতে সিনেমা দেখছি বলে আপনি ভাবছেন আমি বুঝি খুব ফরওয়ার্ড মেয়ে? আমি মোটেই তা নই—

—তা আপনার একবার ভয়ও করল না, একলা এতদূরে সিনেমা দেখতে আসতে?

—নাইট-শো ছাড়া যে উপায় ছিল না আর!

—কেন?

—আমার বাবা সিনেমা দেখার ভীষণ বিরুদ্ধে। বাবার ধারণা সিনেমা দেখলে স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়ে যায়।

বললাম—শুধু আপনার বাবা নয়, পৃথিবীর সব বাবাদেরই সেই একই মত।

মেয়েটি বলতে লাগল—তা, বাবা আজকে সন্ধ্যেবেলা অফিসের কাজে কলকাতায় টুরে গেছেন, কালকে ফিরবেন। বাবা সন্ধ্যে সাতটার ট্রেনে কলকাতায় গেছেন, তাই তো নাইট-শো দেখতে হল।

—আর আপনার মা?

—মা থাকলে আসতে দিত নাকি? মা কবে মারা গেছে আমার। তা, এক দাদা আছে। দাদার নতুন বিয়ে হয়েছে তো, দাদা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে দরজা বন্ধ করে। শুধু বৌদিকে বলে এসেছি। আমি গেলে ঝি-টা দরজা খুলে দেবে—

কী যে হল আমার, হঠাৎ বলে ফেললাম—আপনার বুঝি সিনেমা দেখার খুব লোভ?

মেয়েটি বললে—কেন? আপনি দেখেন না?

বললাম—কখনও-সখনও। বছরে একবার কি দুবার—

—আপনার গার্জেনরাও বুঝি পছন্দ করে না সিনেমা দেখা? দেখুন, এখন বয়েস হবার পর কে আর কার বারণ শোনে!

রাস্তাটা সেখানে একটু সরু হয়ে এসেছিল। একে মাঝ-রাত, তায় অচেনা মেয়ে।

যার ভয় হবার কথা তার ভয় হচ্ছিল না কিন্তু। আমার সঙ্গে বেশ সহজ ভাবেই পাশে পাশে চলছিল। ভয় হচ্ছিল আমারই।

হঠাৎ মেয়েটি বললে—আপনার ভয় হচ্ছে বুঝি?

বৃন্দাবন পরের দিন ভোরবেলাই এসে হাজির। এত ভোরে কখনও আসে না সে।

এসেই বললে—দিন মশাই, স্লিপ্ দিন—

—এত সকাল সকাল এলে যে আজ?

—না মশাই, ভোরবেলাতেই আমায় বৌমা জাগিয়ে দিয়েছে। বললে—যাও, পরের স্লিপ্খানা গিয়ে নিয়ে এসো। খুব জমিয়ে দিয়েছেন আপনি গল্পটা এবার। সারারাত বৌমা ঘুমোতে পারেনি একেবারে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে—এর পরেরটা কী হবে? মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে বুঝি?

বৃন্দাবনের এ-সব কথার উত্তর না দিয়ে আমি তখন আবার লিখতে লাগলাম।

বললাম—আজকেই শেষ করে দেব, সেটা পড়লেই শেষটা বুঝতে পারবে।

আর তোমাকে খাটাবো না। ধরনীবাবুকে বোল তিনি যেন কিছু মনে না করেন। শরীরটা ভাল নয় বলেই এত দেরি হল শেষ করতে।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা বৃন্দাবনের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একেবারে কাঁদো-কাঁদো মুখ। ঘরে ঢুকেই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

জিজ্ঞেস করলাম—কী হল? হল কী তোমার?

বৃন্দাবন হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে স্যার, আমাকে বাঁচান আপনি! ধরনীবাবু জানতে পারলে আমার চাকরিটা খোয়া যাবে নির্ঘাৎ—

আমি ধমকে উঠলাম—তা, কী হল বলবে তো?

বৃন্দাবন কাঁদতে কাঁদতে বললে—আপনার লেখাটা বৌমা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে রাগ করে, এখন ধরণীবাবুকে কী করে আমি মুখ দেখাব স্যার? কী বলব?

আমার মাথায় তখন বজ্রাঘাত হয়েছে।

বললাম—ছিঁড়ে ফেলেছে? তোমার বৌমা? হঠাৎ ছিঁড়তে গেল কেন? কী হয়েছিল?

বৃন্দাবন বললে, বৌমার এতদিন বেশ লাগছিল, কাল স্লিপ্খানা নিয়ে পড়েই

একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে নর্দমায়। আমি ভয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠেছি—কিন্তু এখন তো যা-হবার তা হয়ে গেছে।

—তা তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন, কেন ছিঁড়তে গেল?

—ওই যে, ভীষণ রাগী মানুষ তো। এমনিতে বেশ হাসি-খুশী, কিন্তু রাগলে তো আর জ্ঞান থাকে না। রাগের চোটে দাদাবাবুকে যা-তা বলে ফেলে। শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই ওই জন্যেই তো ভয় করে বৌমাকে।

আমি আর থাকতে পারলাম না।

বললাম—রাখো তোমার বৌমা, আমার গল্প আমি আর লিখে দিতে পারবো না, তুমি যাও—

—তাহলে যে আমার চাকরি চলে যাবে স্যার।

—তা যায় যাবে, আমার অনেক লেখা বাকি আছে, তোমার দোষের জন্যে আমি দু'বার করে আর লিখতে পারব না, যাও—

তারপর ধরণীবাবুকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম যে আমি আর লিখতে পারব না বাকিটা। বুঝতে পারলাম বৃন্দাবনের চাকরিটা নির্ঘাৎ চলে যাবে।

কিন্তু অবাকের ওপর অবাক কাণ্ড।

সেই দিনই রাত্তিরে বসে বসে লিখছিলাম হঠাৎ আমার চাকর এসে বললে—একজন মেয়েমানুষ এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

দরজা খুলে দিতে মহিলাটি ভেতরে এল। আমি মুখটা দেখেই চমকে উঠেছি!

মহিলাটি গম্ভীর ভাবেই বললে—চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই?

বললাম—কোথায় দেখেছি আপনাকে বলুন তো?

—আর না-চেনার ভান করবেন না। আপনার লজ্জা করল না এমন করে একজন মেয়েমানুষকে অপমান করতে?

—তার মানে?

—তার মানেও কি আপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে? আপনার জন্যে একটা নিরীহ মানুষের চাকরিটা পর্যন্ত চলে গেল?

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

বললাম—তাহলে আপনিই আমার গল্পটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন?

বউটিকে ভাল করে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখতে লাগলাম। চেহারা বদলে গিয়েছে তো বটেই। বদলানোটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিনকার মাঝরাত্রে দেখা মেয়েটির

চোখের কোণে যে বিদ্যুৎটা বাইরের গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তা যেন আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা যেন আর চেপে রাখতে পারেনি, নিজেকে ধরা দিতে এসে সে যেন আরো নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে।

—গল্পটা ছিঁড়ে না ফেললে শুধু আমার নয়, আপনারও ক্ষতি হ্‌ত। আপনি এতবড় নাম করা লেখক হয়ে একজন মেয়ের নামে এই কলঙ্ক দিচ্ছেন, এতে আপনার কিছু গৌরব বাড়তো বলে মনে করবেন না।

বললাম—আপনি যে এখনও বেঁচে আছেন, তা সত্যিই আমি জানতাম না। বৃন্দাবন তার বৌমার কথা বলতো, কিন্তু সে যে আপনিই তা আমি কল্পনা করতেও পারিনি—

—আমি তো বাঁচবার জন্যেই সেদিন রাত্তিরে আপনার সঙ্গে গিয়েছিলাম, মরবার ইচ্ছে থাকলে আপনার মত একজন অচেনা-পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যাবোই বা কেন? কীসের দায়ে? সেদিন নিজের পেটটার সংস্থানও ছিল না আমার, তা জানেন? আজকে আপনাকে সে-কথা বলতে আর লজ্জা নেই।

—কেন? লজ্জা নেই কেন?

—আজ তো আমি বড়লোকের পুত্রবধূ, বড়লোকের ছেলের স্ত্রী, কলকাতায় দেড়শোখানা বাড়ি, পাঁচখানা গাড়ির মালিক আমরা!

বললাম—কীকরে এসব জোগাড় করলেন?

—যেমন করে সেদিন বদরগঞ্জে আপনাকে জোগাড় করেছিলুম!

বললাম—ওকে কি জোগাড় করা বলে?

—অভিধানে তাকে যে নামেই ডাকুন, আমি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে পাকড়েছিলুম আর, সেদিন আমার সে-ছাড়া আর কোনও পথই ছিল না।

—তা বলে ব্ল্যাক্‌-মেল্‌।

মেয়েটি বললে—বাঁচতে গেলে সবই করতে হয়। কেন, আর কেউ করেনি? আজকের যারা দেশের লীডার তারা ব্ল্যাক-মেল্‌ করছে না আমাদের? আপনি আপনার পাঠকদের ব্ল্যাক্‌-মেল্‌ করেন না? গান্ধী, নেহরু, লাল-বাহাদুর, ক্রুশ্চেভ, কেনেডি, মাও-সে-তুং, কে আমার চেয়ে কম অপরাধী বলুন তো? তারা আপনার মুখের গ্রাস, মনের শান্তি, রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে না? কই, তাদের নিয়ে তো আপনি গল্প লেখেন নি? যত দোষ করলুম আমি গেরস্থ ঘরের বউ বলে? সুখে আছি বলে? সারাটা জীবন কষ্ট করে এখন একটু টাকা-কড়ির মুখ দেখছি বলে? না কি লীডারদের বিরুদ্ধে লিখলে আপনার জেলে যাবার ভয় আছে বলেই

লেখেন না। হয়তো লিখলে পদ্মশ্রী পাবার আশাও নির্মূল হয়ে যেতে পারে, তাই লেখেন না। লেখেন যত আমার মত নিরীহ গৃহস্থ মেয়ে-পুরুষদের নিয়ে। যারা বেওয়ারিশ। যাদের হয়ে কথা বলবার কেউ নেই, প্রতিবাদ করতে পারে না, প্রতিশোধ নিতে জানে না—

আমি চুপ করে মেয়েটির কথা শুনছিলাম।

মেয়েটি আবার বলতে লাগল—এমন করে আমার বিরুদ্ধে না লিখে, তাদের কথা লিখুন তো দেখি কত সাহস আপনার?

তারপর আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললে—বেশ করেছি, আপনার লেখা ছিঁড়ে ফেলেছি। আর সাবধান করে যাচ্ছি আর কখনও নিরীহ মানুষদের নিয়ে লিখবেন না।

বলে আর দাঁড়াল না। ঘরের দরজাটা খুলে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে গেল। সেখানে একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, তাইতেই উঠে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন ধরণীবাবু টেলিফোন করলেন—কী হলো? বাকিটা লিখে দেবেন না?

বললাম—দু'বার করে আর লিখতে পারবো না আমি—আমাকে ক্ষমা করবেন।

—কিন্তু আধখানা যে ছাপা হয়ে গেছে! এখন কী হবে? আমি কালকেই বৃন্দাবনকে ডিসচার্জ করে দিয়েছি। তার জন্যেই এই কাণ্ডটা হলো, আর কখনও এমন হবে না মশাই, বাকিটা লিখে না দিলে যে বে-ইজ্জৎ হয়ে যাবো—

ধরণীবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম। শেষটা কি লিখে দেব আবার? কিন্তু সে যে বড় মর্মান্তিক!

মনে আছে তখন আমি প্রায় ফরাসগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি। ফরাসগঞ্জ থেকে আবার আমায় ফিরে আসতে হবে বদরগঞ্জে। রাত আরো বেড়ে যাবে।

ফরসাগঞ্জের কাঠের পুলটার কাছে আসতেই বললাম—এবার বোধহয় আপনি একলাই যেতে পারবেন।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, আপনাকে কষ্ট দিলাম, অনেক ধন্যবাদ—

বললাম—কষ্ট আর কী, আপনি আসুন এবার, আমি চলি—

মেয়েটি হঠাৎ বললে—না, একটু দাঁড়ান, আপনার হাতের সোনার আংটিটা খুলে দিন তো—

আমি চমকে উঠেছি।

বললাম—সে কী? কী করবেন আমার আংটি নিয়ে?

—বেশি কথা বাড়াবেন না, শিগ্‌গির খুলে দিন, নইলে এখুনি আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করবো, বলবো আপনি আমাকে একলা পেয়ে পাশবিক অত্যাচার করতে চেয়েছিলেন! দিন, দিন, শিগ্‌গির খুলে দিন—এই চিৎকার করলাম—

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সেদিন আংটিটা খুলে তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর লজ্জায় আর কারো কাছে সে-কথা প্রকাশ করিনি কোনদিন। মেয়েটা সেই আংটি নিয়ে তাড়াতাড়ি অন্ধকারে কাঠের পুলটা পার হয়ে ফরাসগঞ্জের দিকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

এমন মেয়েও যে স্বামী-সংসার-গাড়ি-বাড়ি নিয়ে সুখী গৃহিণী হতে পারে এ আমি কেমন করে কল্পনা করতে পারবো? সুতরাং এ বছরে 'বৈতালিকে'র শারদীয়া সংখ্যায় আর গল্প লেখা হয়নি। না-লেখার কারণটা আপনাদের কাছে প্রকাশ করে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে আপনারা মাফ করবেন।

হঠাৎ

সেবার বিলাসপুরের রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে 'নেতাজী জন্ম দিবস' পালন করবার অর্ডার বেরিয়ে গেল। ক্যালাঘান্ সাহেব তখন ডি-টি-এস হয়েছে। বিলাসপুরের ডি-টি-এস মানে সর্বেসর্বা, মানে বড় কর্তা। সার্কুলারটার নিচেয় ক্যালাঘান সাহেবের বিরাট সই। সার্কুলারটা অফিসের সব সেকশানে সেক্‌শানে ঘুরিয়ে নোট করানো হলো। রবিবার সন্ধ্যেবেলা মীটিং। মীটিংএর প্রেসিডেন্ট্ ক্যালাঘান সাহেব নিজেই।

ক্যালাঘান সাহেবের পুরো নাম বি-পি-ক্যালাঘান। খাঁটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাচ্ছা। মিহি গলায় যখন কড়াকড়া গালাগালি দিত তখন মনে হতো লোকটাকে খুন করে ফেলে দিই, চুকে যাক ল্যাঠা।

চিরকাল ক্যালাঘান সাহেব ডি-টি-এস ছিল না।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের বাচ্ছাদের তখন স্পেশ্যাল প্রেফারেন্স্। তারা চাকরির সুরুতেই কেরাণীদের মাথা হয়ে বসতো। তুমি কাজ-কর্ম জানো আর না-জানো যেহেতু তুমি দেবকুলে জন্মেছ তখন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তুমি সমান মাইনের অধিকারী নও। তোমার মাইনে ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি।

এ সেই ব্রিটিশ-রাজত্বের শেষের দিকের কথা। একেবারে সে-রাজত্বের অন্তিম সময়ে।

আমরা যখন চাকরিতে ঢুকলুম তখন ক্যালাঘান সাহেব চিফ কন্ট্রোলার, অন্ততঃ পঞ্চাশজন ডেপুটি কন্ট্রোলার আর কন্ট্রোলার তার অধীনে।

কাজও তেমনি। আমরা ক্লার্ক নই। ক্লার্কের চাকরি আমাদের নয়। রীতিমত সব রকম পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে তখন কন্ট্রোলার হয়েছি। সভ্য-ভব্য-ভদ্র উঁচুদরের চাকরি। ট্রেনের গতিবিধি কন্ট্রোল করা আমাদের কাজ। তার ওপর আবার যুদ্ধের সময়কার ট্রেন চলাচল।

একটা স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়বে তো আমাদের হৃৎকম্প হতো। খড়্গপুরের দিক থেকে কোনও স্পেশ্যাল ট্রেন আসছে। সেটা যাবে বিলাসপুরের দিকে। সেটা যতক্ষণ আমাদের এলাকার মধ্যে আছে, ততক্ষণ ক্যালাঘান সাহেবের শ্যেণ দৃষ্টি!

বলবে—ভেরি কেয়ারফুল! একটা মিনিট ট্রেন কোথাও লেট্ হলে আমি তোমাদের ফাইন করবো—

কোথায় যুদ্ধ বেধেছে জার্মানীতে, কিম্বা ইংলণ্ডে, নয় তো ফ্রান্সে। কিম্বা হয়ত সিঙ্গাপুরে। ইণ্ডিয়া থেকে পেট্রল যাচ্ছে, আর্মি যাচ্ছে, গোলা-বারুদ-বোমা-কামান যাচ্ছে। এক মিনিট সে ট্রেন লেট্ হলে যেন ক্যালাঘান্ সাহেবের স্বদেশ পরের হাতে চলে যাবে।

নিজের চেয়ারে বসে বসেই ক্যালাঘান্ সাহেব বলতো—হোপলেস-হোপলেস্-হোপলেস্—

পেছন ফিরে দেখি ক্যালাঘান সাহেব খবরের কাগজ পড়ছে আর নিজের মনেই ওই কথাগুলো বলে চলেছে।

যুদ্ধে ব্রিটিশের এক-একটা হার হয় আর ক্যালাঘান সাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। বড় স্বদেশ-ভক্ত ছিল তখন চীফ্ কন্ট্রোলার বি-পি-ক্যালাঘান।

যেদিন ফ্রান্সের পতন হলো সেদিন মুখটা লাল হয়ে উঠলো। সারা দিন দুঃখে ক্ষোভে অপমানে ক্যালাঘান সাহেব লাঞ্চ পর্যন্ত খেলে না। কেবল গুম হয়ে রইল।

আমরা পাশের লোককে বললাম—শালার বোধ হয় পিতৃবিয়োগ হয়েছে রে—

ক্যালাঘান সাহেব তখন আর হাসে না, কেবল মুখ খিঁচোয়।

শেষকালে যখন জাপান যুদ্ধে নামলো তখন ক্যালাঘান সাহেবের একেবারে মার-মূর্তি। তখন ট্রেনের কাজও যেমন বেড়ে গেল, ক্যালাঘান সাহেবের মেজাজও কড়া

হয়ে উঠলো। তখন একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কাকে কামড়াবে বলে হাঁস-ফাঁস করতে লাগলো।

আসামের দিকে তখন পনেরোটা-কুড়িটা করে স্পেশ্যাল ট্রেন যাচ্ছে। আমাদের নাওয়া-খাওয়া ঘুচে গেল। কোনও ট্রেনএ গোলা-বারুদ, কোনও ট্রেনে আর্মি, কোনও ট্রেনে পেট্রল। লাল মুখো গোরা সোলজাররা আসে, কিছুক্ষণ ট্রেনটা থামলে প্লাটফর্মে নেমে হৈ-হল্লা করে, তারপর ট্রেনটা চলে গেলে তখন আবার শান্তি।

কিন্তু ক্যালাঘান সাহেবের ষ্ট্রিক্ট্ অর্ডার—মিলিটারি স্পেশ্যাল যেন লেট্ না হয়—

আমার পাশে রামানাইয়া কাজ করতো। তার বড় খারাপ লাগতো।

সে বলতো—আমি চাকরি ছেড়ে দেব ভাই—এর কাছে আর চাকরি করা চলে না—

বলতাম—কেন, কী হলো?

রামাইয়া বলতো—রোজ রোজ ফাইন, আর পারা যায় না—

সত্যিই রোজ রোজ ফাইন-লিস্ট্ বেরোত আমাদের নামে। কারো পাঁচ টাকা, কারো দশ টাকা। কারো কারো আবার কুড়ি টাকা—

অথচ আমরা বুঝতে প্যরতাম সবটাই অকারণে!

যুদ্ধ যখন ছিল না তখন কত ট্রেন লেট্ হয়েছে, কত কন্‌ট্রোলার কত ভুল করেছে। তা নিয়ে ক্যালাঘান সাহেব মাথা ঘামায়নি। সামান্য ওয়ার্নিং দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে কাউকে কাউকে। কন্‌ট্রোলারের চাকরিতে সে সব গা সওয়া জিনিষ। সামান্য পাঁচ টাকা ফাইন হলেও কিছু গায়ে লাগতো না। তার কারণ চাকরিটাই এমনি। এক সঙ্গে পঞ্চাশটা স্টেশন-মাষ্টার টেলিফোন ধরে হুকুম চায় কোন ট্রেন আগে যাবে, কোন্ ট্রেন পরে। কন্‌ট্রোলার তার সামনে চার্ট দেখে হুকুম করে। হুকুমের একটু ভুল হলেই সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই মেল্ আট্‌কে গেল, আর তখন পৃথিবী রসাতলে যাবার জোগাড় হয়।

এ চাকরি যখন নিয়েছিলাম তখনই জানি এ-কাজ শক্ত। কিন্তু তখন তো জানতাম না কাজ যত শক্তই হোক, ক্যালাঘানকে খুশী করা তার চেয়েও আরো শক্ত।

কিন্তু জাপান যখন একে একে সিঙ্গাপুর বার্মা নিয়ে নিলে তখন ক্যালাঘান সাহেব তিড়িং মিড়িং করে লাফাতে লাগলো। দেখে মনে হলো যেন জাপানকে হাতের কাছে পেলে সাহেব একেবারে আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে খাবে। চার্চিলকে দেখিনি, কিন্তু চার্চিল সাহেবও যদি আমাদের চিফ্-কন্‌ট্রোলার হতো তো এমন করে হয়ত ক্ষেপে

গিয়ে আমাদের মুণ্ডপাত করতো না! রামাইয়া বলতো—তা আমরা তোর কী করেছি রে বাবা, জাপান যুদ্ধ করছে, তার ফল ভোগ করবো আমরা?

ওপাশে বসতো বসন্ত। বসন্ত নিরীহ বাঙালী। বলতে গেলে আমি আর বসন্ত, এই দুজনই মাত্র বাঙালী ছিলাম সারা অফিসের মধ্যে। আর সবাই মাদ্রাজী, গুজরাটি মারহাট্টি!

আমরা যখন ক্যালাঘানের বিরুদ্ধে নানারকম মন্তব্য করতাম তখন বসন্ত চুপ-চাপ নিজের কাজ করে যেত। তাকে ধম্‌কালেও সে মুখ বুঁজে সব সহ্য করতো।

আমি এক-একবার বলতাম—তুই কিছু বলিস না কেন? ও যে অত গালাগালি দেয় তোকে, তুই কিছু বলতে পারিস না?

বসন্ত বলতো—দূর, ও যদি কুকুর হয় তো আমিও কুকুর হবো?

বসন্তর এই চুপ করে থাকা আমার ভাল লাগতো না।

অবশ্য বুঝতাম, যুদ্ধের সময় কিছু রাগারাগি করা উচিত নয়। সেদিক থেকে বসন্ত ঠিকই করতো। তখন ডিফেন্স্-অব্-ইণ্ডিয়া চালু হয়েছে। কেউ কিছু বললেই ওই আইনে তাকে জেলে পুরতো ব্রিটিশ গভ্‌র্মেণ্ট।

আমরা কাজ করতে করতে যদি কিছু বলতুম তো এমনভাবে বলতুম যাতে ক্যালাঘানের কানে না যায়। ক্যালাঘানের অদ্ভুত কান। বাঙলা বলতে পারতো না, কোনও ভাষাই বলতে পারতো না। গুজরাটি, মারহাট্টি, তামিল, তেলেগু, কোনও ভাষাই নয়। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা। সব বুঝতে পারতো।

ক্যালাঘান আসতো সকাল ন'টার সময়। আমরা যেদিন খবরের কাগজে দেখতাম জার্মানী জিতেছে সেদিন জানতাম সাহেব লঙ্কা-কাণ্ড বাধাবে অফিসে।

আবার যেদিন দেখতাম জাপান আরো কোনও দেশ নিয়ে নিয়েছে সেদিন বুঝতাম আজ আমাদের কারো আর রক্ষে নেই। সকলের পাঁচ দশ টাকা করে ফাইন হয়ে যাবে।

আর হতোই তাই।

এমনি করেই চলছিল আমাদের কন্ট্রোল অফিস।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল সুভাষ বোস টোকিও-রেডিও থেকে বক্তৃতা দিয়েছেন! সে যে কী কাণ্ড হলো তখন সারা সহরে! সবাই চুপি-চুপি সুভাষ বোসের লেকচার নিয়েই আলোচনা করে। সবাই তখন থেকে জানতে পারলো নেতাজীর কথা!

চক্রধরপুর ছোট সহর। রেল-কলোনী। রেলের হেড্-কোয়ার্টার। নানা

জাতের লোকের বাস সেখানে। কিন্তু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও প্রচুর। তাই জোরে জোরে সুভাষ বোসের নাম করা চলে না।

চুপি-চুপি লুকিয়ে লুকিয়ে টোকিও রেডিও ধরে সবাই। সবাই আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। সুভাষ বোস ইণ্ডিয়াতে আসছে! এই ব্রিটিশ রাজত্ব আর থাকবে না, সেটা ভাবতেও আনন্দ, স্বপ্ন দেখতেও আনন্দ। সে যে কী আনন্দ তখন আমাদের তা এখনকার ছেলেদের বোঝানো যাবে না।

বসন্ত ডিউটির পর সাধারণতঃ বাড়ি থেকে কোথাও বেরোত না। কোথাও যেত না, কারো সঙ্গে কথাও বলতো না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে হাজির।

এসে চুপি চুপি বললে—শুনিছিস তুই?

বললাম—কী?

—নেতাজীর লেকচার?

বললাম—না—

বসন্ত বললে—আমি নিজের কানে সুভাষ বোসের লেকচার শুনেছি—

বসন্তের সে কী উল্লাস! বসন্তকে দেখেছি বরাবর চুপচাপ কাজ করে যেতে। সেই বসন্তই আবার হঠাৎ এই ব্যাপারে এত উত্তেজিত হয়ে উঠলো দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

বাড়ির দিকেই চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কী মনে করে আবার ফিরলো।

বললে—কাউকে যেন বলিসনি এসব কথা—

বললাম—পাগল, ডি-অব্-আই রুল্ চালু রয়েছে, জানি না ভেবেছিস?

বসন্ত বললে—না, তা নয়, তবে আমাদের অফিসে অনেক স্পাই রয়েছে—

—স্পাই?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ! যতগুলো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, সব্বাই। ওই নরিস, ওথ্বার্ণ, ডড্, সবাই স্পাই, ক্যালাঘান্ সবাইকে স্পাইং করতে রেখেছে—

তারপর আর দাঁড়ালো না। সোজা মাটির দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে বাড়ির দিকে চলে গেল।

বসন্ত আর আমি প্রায় একদিনেই চাকরিতে ঢুকেছিলাম। একদিনে ঢুকেছিলাম

বটে, কিন্তু কোনও দিনই বসন্ত আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশেনি। দুজনেই আমরা বাঙালী, সেই সূত্রে বসন্তর সঙ্গেই আমি মেলামেশা করতে চাইতাম।

কিন্তু বসন্তর দিক থেকে কোনও আগ্রহ না থাকাতে দুজনে ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি।

বসন্ত ঠিক কাঁটায় কাঁটায় অফিসে আসতো, নিজের কাজ করতো, আর কাজকর্ম নিখুঁতভাবে শেষ করে বাড়ি চলে যেত। তার অফিসের কাজের মধ্যে কোথাও ফাঁক কি ফাঁকি ছিল না বলে সেদিক থেকে ক্যালাঘান তার কিছু ক্ষতি করতে পারতো না। ফাইন যেমন সকলের হতো তেমনি বসন্তরও হতো। সেটা আইন, সেটা কানুন। কণ্ট্রোলারের কাজে ফাইন দিতে হয়নি, এমন কণ্ট্রোলারের জন্মও হয়নি বোধহয় ইতিহাসে।

তা সে যা'হোক, সেদিন অফিসে গিয়েই দেখি ক্যালাঘানের মূর্তি একেবারে অগ্নিশর্মা।

বুঝলাম—সুভাষ বোসের খবরটা সাহেবের কানেও গেছে।

সাহেব গজ্ গজ্ করছে নিজের মনে।

একবার কী কথায়-কথায় বললে—সুভাষ বোসের জাতটাই ব্যাস্টার্ডের জাত—

বসন্তর দিকে চেয়ে দেখলুম। বসন্ত নির্বিবাদে তখন কাজ করে চলেছে। যেন কথাটা তার কানে যায়নি।

এমন সমস্তক্ষণই চলতে লাগলো। বাঙালীর বাচ্ছারা ছোটলোক। আনগ্রেটফুল। ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট্ তাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, আর সেই নিমক-হারামের জাত সেই ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকেই ফাঁসাচ্ছে।

কথাগুলো সমস্ত অফিস শুদ্ধ লোকেই শুনছে। কিন্তু কেউ কিছু প্রতিবাদ করছে না।

আর প্রতিবাদ করবেই বা কে? বাঙালীকে গালাগালি করলে কাদের আর কী এসে যায়?

আমি চেয়ে দেখলাম বসন্তর দিকে।

দেখলাম বসন্ত ঘাড় গুঁজে একমনে কাজ করে চলেছে। যেন তার কানেই যাচ্ছে না কিছু।

আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগলাম কথাগুলো। অথচ সাহস হচ্ছে না কিছু বলবার। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা-ভদ্রতা আমাদের ভিরু করে দিয়েছে। আমরা গালাগালি খাবো, মার খাবো, তবু গালাগালি দিতে পারবো না। বঙ্কিমচন্দ্রের

লেথায় আমরা পড়েছি—'তুমি অধম, তা বলিয়া আমি উত্তম না-হইব কেন?' আমরা সবাই ওই শিক্ষাতেই মানুষ!

সেদিন ছুটির পর সমস্ত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেয়ালের আড়ালে মুখ লুকোলাম। ভাবলাম একবার বসন্তর বাড়িতে যাই। তাকে গিয়ে সব ব্যাপারটা বলি।

কিন্তু, ভেবে দেখলাম তাতেও অনেক বিপদ আছে।

কারণ, রেলওয়ের কোয়ার্টারে আমরা থাকি। পাশাপাশি লাগালাগি ঘর। একজনের খবর আর একজনের জানতে অসুবিধে নেই। কে কার সঙ্গে মেলামেশা করছে, কে কবে কী দিয়ে ভাত খেলে, তা জানতেও কারো বাকি থাকে না। একজন সিল্কের জামা পরলে আর একজনের চোখ টাটায়। এই রকম জগতেই আমরা বাস করছি তখন। সেই সময়ে সেই ক্যালাঘানের অত গালাগালির পর যদি সন্ধ্যেবেলা বসন্তর বাড়ি যাই তো সাহেবের কানে তা উঠবে!

সেই ভয়েই আর সেদিন বসন্তর বাড়ি গেলাম না।

কিন্তু পরদিন অফিসে গিয়েও সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। সেই ক্যালাঘানের গালাগালি।

দেখলাম রামাইয়া, দেশাই' ওরা সব ঘাড় গুঁজে কাজ করছে। নরিস, ডড্, ওথ্ম্যান তারা খুব হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত।

মিলিটারি স্পেশ্যাল ট্রেণ একটার পর একটা ছাড়ছে নাগপুর থেকে আর মণিপুরের দিকে চলেছে। গোলা-বারুদ-বোমা-সোলজার। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্স স্পেশ্যালও চলেছে। অফিসে কাজের কামাই নেই। কলকাতায় বোমা ফেলে গেছে জাপানিরা। একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা চারদিকে।

মাথার ওপর তখন ভাবনার শেষ নেই আমাদের। একে কাজের চাপ, তার ওপরে অতগুলো স্পেশ্যাল ট্রেন। সব চোখ তখন মণিপুরের দিকে। আমরা বলতাম—মণিপুর স্পেশ্যাল। আমরা জানতাম জাপানি সোলজাররা মণিপুর দিয়ে ইণ্ডিয়ায় ঢোকবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে যে নেতাজী সুভাষ বোসের আর্মি, তা আমাদের জানতে দেওয়াই হয়নি। আমরা সেই নেতাজীকে হটিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ মিলিটারি স্পেশ্যাল পাঠিয়েছি আর এক মিনিট সে-ট্রেন লেট্ হলে কনট্রোলারদের ফাইন করেছি, শাস্তি দিয়েছি—

আর সকলের ওপর ক্যালাঘানের সেই বাঙালীদের ওপর গালাগালি।

—বাঙালীর বাচ্চারা সব ব্যাস্টার্ড্স্—অল বাস্টার্ড্স্—

রামাইয়া, দেশাই, সুব্রহ্মনিয়ম, ওদেরও গায়ে একটু লাগছে। কিন্তু আমাদের মতন অতটা নয়। আমরাই দু'জন মাত্র বাঙালী। আমাদেরই যত দোষ। আমার মাথাটা যেন অপমানে মাটিতে মিশে যেতে চাইল। আমি চুপ করেই রইলুম।

কিন্তু হঠাৎ পেছন দিকে একটা গোলমাল উঠলো।

আমি সেই শব্দ শুনে পেছন দিকে দেখি আমাদের বসন্ত।

বসন্ত নিজের চেয়ারটা দু'হাতে তুলে নিয়ে ক্যালাঘানের মাথার ওপর জোরে বসিয়ে দিয়েছে আর ক্যালাঘান মাটিতে পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। মাথা দিয়ে তার গল্-গল্ করে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

কিন্তু বসন্তর মাথায় বোধ হয় তখন খুন চেপে গেছে।

বলছে—আর বলবি তুই? আর গালাগালি দিবি তুই বাঙালীদের? বল্, আর গালাগালি দিবি?

বলছে আর দুম্ দুম্ করে চেয়ারটা দিয়ে ক্যালাঘানের মাথার ওপর ঠুকছে।

আমরা যে-যার কাজ ছেড়ে তখন ছুটে গিয়েছি সেদিকে।

আমার ভয় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল বসন্তটা করছে কী? এখনই যে সর্বনাশ হবে তার নিজেরই।

আমি বসন্তর হাত দুটো চেপে ধরতে গেলাম। বললাম—কী, করছিস কী তুই?

বসন্ত আমাকে তেড়ে মারতে এল।

বললে—থাম্ তুই, তুইও না বাঙালী? তোর গায়ে বাঙালীর রক্ত নেই? তুইও কি সুভাষ বোসের জাত নোস্? যদি তুই খাঁটি বাঙালী হোস তো তুইও তোর চেয়ারটা নিয়ে মার ও-ব্যাটাকে। দেখি কে ওকে বাঁচাতে পারে!

রামাইয়া, দেশাই, সুব্রহ্মনিয়ম, তারাও একটু বোঝাতে চেষ্টা করতে গেল বসন্তকে। কিন্তু তার মারমুখ দেখে আর কেউ কিছু বলতে সাহস করলে না—

বসন্ত তখন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—আয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাচ্ছারা, দেখিয়ে দিচ্ছি তোদের বাঙালীদের গায়ে কত জোর। আয়, সামনে এগিয়ে আয় দেখি—

নরিস, ডড্, ওথ্‌ম্যান্ যারা ক্যালাঘানকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে আসছিল তারা বসন্তের মুখের ভাষা আর তার মূর্তি দেখে পিছিয়ে গেল।

বসন্ত তাদের দিক থেকে কোনও বাধা না পেয়ে তখন আবার ক্যালাঘানের মুখের ওপর নিচু হয়ে বলতে লাগলো—আর সুভাষ বোসকে গালাগালি দিবি? আর বাঙালীদের বাষ্টার্ড বলবি?

তারপর নিজের একটা পা ক্যালাঘানের মুখের ওপর তুলে ধরে বললে—এই পা ছুঁয়ে বল আর স্থভাষ বোসকে গালাগালি দিবি না। ছোঁ পা, পা ছোঁ—

কিন্তু সেই মুহূর্তেই এক অঘটন ঘটে গেল। কে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বুঝি অন্ত ঘর থেকে চুপি চুপি জি-আর-পি'কে টেলিফোন্ করে দিয়েছিল। খবর পেয়েই তারা ষ্টেশন থেকে দৌড়ে এসেছে। একদল আর্মড্ পুলিশ।

তারা এই অবস্থায় অফিসে ঢুকেই ওই দৃশ্য দেখে বসন্তকে ঘাড় ধরে তার পিঠে বেটন্ মারতে লাগলো। মারতে মারতে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিলে।

আমাদের চোখের সামনেই সমস্ত ঘটনাটা যেন সিনেমার মত ঘটে যেতে লাগলো। আমরা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলাম বসন্ত তাদের লাঠির ঘায়ে মার খেয়ে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো। কিন্তু সেই অবস্থাতেও সে একবারও ক্ষমা চাইলে না।

যখন তাকে জিজ্ঞেস করলে কেন তুমি মিষ্টার ক্যালাঘানকে মেরেছো? তখনও সে কেবল একটা কথাই বার বার বলতে লাগলো—বেশ করেছি মেরেছি, আবার মারবো—

তারপর এ্যাম্বুলেন্স এসে ক্যালাঘানকে ষ্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে গিয়ে হস্পিট্যালে রেখে দিলে। আর পুলিশরা বসন্তকে ধরে নিয়ে গিয়ে যে কোথায় রাখলে তার কোনও সন্ধানই আর পাওয়া গেল না। তখন যুদ্ধের সময়। ডিফেন্স-অব-ইণ্ডিয়া রুল পুরোপুরি চালু রয়েছে। কারো কিছু টুঁ শব্দ করবার ক্ষমতাও নেই। অনেক দিন আমার মনে হয়েছিল বসন্তের কথা। বসন্তর বুড়ো বাপ-মা তারাও তার কোনও খোঁজ আর পাননি। আমরাও পাইনি। একদিন তাঁরাও রেলের কোয়ার্টার খালি করে দিয়ে দেশে চলে গেলেন। কেউ আর বসন্তর খোঁজ পেলে না। আজ পর্যন্ত সে সেই রকম নিরুদ্দেশই রয়ে গেছে।

তারপর ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। কত কী পরিবর্তন হয়ে গেল সব। সেই স্থভাষ বোস নেতাজী হয়ে মানুষের মনে দেবতার আসন পেয়ে সারা ভারতবর্ষের বুকে অজর অমর হয়ে রইলেন। আর সেই ক্যালাঘান সাহেব?

আমি যখন বিলাসপুরে চাকরি করছি তখন ক্যালাঘান আবার প্রমোশন পেতে পেতে সেখানকার ডি-টি-এস হয়ে এল।

তখন ১৯৪৮ সাল। সেই সময়েই কলকাতার হেড্-অফিস থেকে অর্ডার এল বিলাসপুর রেলওয়ে স্টাফ্দের 'নেতাজী জন্ম দিবস' পালন করতে হবে।

রেল-ইনস্টিটিউট প্লাটফরমের পাশেই। আমি জানালা দিয়ে বাইরের প্লাটফরমে মানুষের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর সেদিনের সেই বসন্তের কথাটাই ভাবছিলাম।

বসন্তের চেহারাটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো। সেই রোগা স্বল্পভাষী নির্বিবাদী মানুষটা। সেও তো আমাদের আর পাঁচজনের মত আপোষ রফা করে বেঁচে থাকলেই পারতো! তবে কেন সে প্রতিবাদ করতে গেল? কেন সে পাপের প্রতিকার করতে গিয়ে অমন করে নিজের সর্বনাশ করলে?

ক্যালাঘান সাহেব তখন লেকচার দিয়ে চলেছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে। আর হাজার হাজার রেলওয়ে স্টাফ্ সে-লেক্চার চুপ করে মন দিয়ে শুনছে।

ক্যালাঘান সাহেব বলছে—পৃথিবীর গ্রেটেস্ট্ বীরদের মধ্যে নেতাজী একজন। তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর স্বদেশভক্তি, তাঁর বীরত্বের তুলনা নেই। তাঁর স্বার্থত্যাগ, তাঁর এই বীরত্ব-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা রইল···

হঠাৎ ··

হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো।

হঠাৎ কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো। আমি চমকে উঠলাম। বসন্ত না? ঠিক যেন বসন্তর মত গলার আওয়াজ। তবে কি বসন্ত বেঁচে আছে? বসন্ত কি তবে এতদিন পরে ক্যালাঘান সাহেবের লেকচার শুনতে এসেছে? লুকিয়ে লুকিয়ে?

না, তা নয়! বাইরে প্লাটফরমের দিকে চেয়ে দেখলাম ওয়ান ডাউন বম্বে মেল এইবার ছাড়লো। এতক্ষণ প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। টাইম হয়ে গেছে। এইবার ছাড়লো। বিরাট ডিজেল ইঞ্জিনটা বিকট আর্তনাদ করে সজোরে হুইশ্ল্ বাজালো।

আসল নকল

জয়পুরের পাথরের কাজের নাম-ডাক আছে। মার্বেল-পাথর নয়। হীরে পান্না নীলা—এই সব পাথর। সেবারে এমনি একটা পাথরের দোকানে গিয়েছি একটা ভালো দেখে পান্না কিনবো বলে।

সেই দোকানেই ঘটনাটা ঘটলো।

সত্যিই, তাই ভাবি মাঝে মাঝে। ভারতবর্ষের যেখানে গিয়েছি সেখানেই দেখেছি প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি, প্রতি মুহূর্তে সেই একই অখণ্ড আত্মার বিভিন্ন রূপ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙলা দেশের এই প্রান্তিক শহরেও যা, সুদূর রাজস্থানের আর এক প্রান্তিক সহরেও তাই।

প্রতাপ সরকার আমার বন্ধু। সে বললে—পান্না কিনতে চাও তো আমার চেনা-শোনা দোকান আছে, আমি নিয়ে যেতে পারি।

আমি বলেছিলাম—বেশি বড়ো কোনও দোকানে যেতে চাই না, সেখানে গলাকাটা দাম নিয়ে নেবে তারা!

কিন্তু প্রতাপ সরকার জয়পুরের বহুদিনের বাসিন্দা। রাজস্থান সেক্রেটারিয়েটে বহুদিন চাকরি করে চুল পার্কিয়ে ফেলেছে। তারপর নাটক-থিয়েটারের বাতিক আছে। উচ্চ-নীচ এখানকার সবাই চেনে তাকে মিশুক লোক বলে। বলতে গেলে তার হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করা যায়।

আমার প্রয়োজনের কথা শুনেই সে গাড়ি চালিয়ে আমায় কোথায় নিয়ে গিয়ে হাজির করলে তার ঠিকানা জানবার প্রয়োজন ছিল না আমার।

দেখলাম তেমন জাঁদরেল দোকান সেটা নয়।

একজন বুড়ো কারিগর তখন ঠুক-ঠুক করে কাজ করছে ভেতরের দিকে। দুপুর বেলা। দোকানের মালিক-টালিক কেউ নেই।

প্রতাপ একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

—কই গো, হরিবাবু, তোমাদের মালিক কোথায়? মিস্টার প্রেমলানি কোথায় গেল?

কাজ থামিয়ে হরিবাবু বাইরে এল। আপ্যায়ন করে বললে—বসুন বাবু, মালিক তো বাড়িতে খেতে গেছেন। কী দরকার, বলুন না—

—তুমি পারবে দেখাতে? আমার এই বন্ধুর একটা পান্নার দরকার ছিল। পাঁচ রতির পান্না হলেই চলবে।

বুড়ো হরিবাবু দোকানের কোণে রাখা একটা লোহার সেফ্ খুলে পান্না বার করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে গাড়ির শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখি একটা বিরাট গাড়ি এসে থেমেছে দোকানের সামনে। দেখেই মনে হয় বড় লোকের গাড়ি। সামনে উর্দি পরা ড্রাইভার। আর পেছনের সিট্ থেকে একজন মহিলা নামছে।

বেশ ঝল্-মলে শাড়ি। ফরসা রং। গলায় মুক্তোর হার, কানে মুক্তোর দুল। দু'হাতে মুক্তোর বালা। গাড়ি থেকে নেমে তর-তর করে একেবারে দোকানের ওপরে উঠে এল।

এসে ঢুকেই বললে—মুক্তোর গয়নার সেট আছে আপনাদের দোকানে? ঝুটো মুক্তো?

হরিবাবু কথাটা শুনে বোধহয় একটু অবাক হয়ে গেল।

বললে—ঝুটো মুক্তো?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ—ঠিক এই আমারটার মত—

বলে নিজের গলার মুক্তোর হারটা খুলে কাউণ্টারের ওপর ফেলে দিলে। হরিবাবু জিনিষটা নিয়ে চশমাটা ভালো করে এঁটে নিয়ে দেখতে লাগলো।

মহিলাটি বললে—এটা অবশ্য বিলকুল খাঁটি, খাঁটি মাল আমি চাই না। একটা বিয়ের ব্যাপারে আমি প্রেজেণ্টেশন্ দিতে চাই—ঠিক যেন এই রকম হয়—

হরিবাবু তখন জিনিষটা নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করছে।

মহিলাটি বললে—আমি কিন্তু ঠিক এই ডিজাইনের হার চাই, অন্য ডিজাইন হলে চলবে না—

হরিবাবু অনেকক্ষণ জিনিষটা দেখে বললে—কিন্তু এটা তো আপনার আসল মুক্তো নয়—

—হোয়াট্? আসল মুক্তো নয়? কী বলছো তুমি? কদ্দিন দোকানে কাজ করছো?

মহিলাটি বোধহয় আমাদের সামনে হরিবাবুর ওই কথায় একটু বে-ইজ্জৎ হয়ে গিয়েছিল। তাই হরিবাবুকে ধমকের সুরে কথা বলতে লাগলো।

—ঝুটো মানে? কী রকম লোক রেখেছে দোকানে যে মুক্তো চেনে না? জানো, আমি তোমার চাকরি খেয়ে দিতে পারি? তোমার দোকানের মালিক কোথায়?

হরিবাবু নিরীহ বৃদ্ধ কর্মচারী। তার গলা চড়ানো মানায় না।

বললে—আমি পঁয়ত্রিশ বছর এই কাজ করছি মা, আমি মুক্তো চিনবো না?

আমি বলছি মা, এ আপনার আসল মুক্তো কিছুতেই নয়। দোকানদার নিশ্চয়ই আপনাকে ঠকিয়ে দিয়েছে—

মহিলাটি থর-থর করে যেন রাগে কাঁপতে লাগলো।

বললে—তোমার বাবু কোথায় ?

হরিবাবু বললে—প্রেমলানি সাহেব খেতে গেছেন, তিনি পাঁচটার সময় দোকানে আসবেন।

—ঠিক আছে, তোমার বাবু আসুক, তখন তোমাকে দেখাবো।

বলে যেমন তড়িৎ বেড়ে এসেছিল, তেমনি তড়িৎ বেগে আবার চলে গেল। গিয়ে গাড়িতে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা সোঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটে গেল দু'তিন মিনিটের মধ্যে। আমি অবাক হয়ে তাকালাম প্রতাপের দিকে। প্রতাপ হরিবাবুকে বললে,—কি গো হরিবাবু, তোমার চাকরি যাবে নাকি ?

হরিবাবু দার্শনিকের মত ভঙ্গি করে হাসলো একটু।

বললে—বাবু, এই দেখতে দেখতে জীবন কেটে গেল আমার, আবার আরো কত দেখবো—কিন্তু ঝুটো মুক্তোকে আমি আসল কী করে বলি, বলুন ? আমার জিভ্ কেটে ফেললেও আমি তা বলতে পারবো না—

প্রতাপ আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের হরিবাবু অনেক দিনের লোক, কোথায় বাঙলা মুলুক, আর কোথায় এই রাজস্থান, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এইখানে এসে এই পাথর-কাটার কাজে ঢুকেছে।

আমিও অবাক হয়ে গেলাম প্রতাপের কথা শুনে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ দোকানের মালিক মিস্টার প্রেমলানি এসে হাজির। চেহারা দেখেই বোঝা যায় বড়লোক মানুষ। জাতে সিন্ধী। শুনলাম সারা ইণ্ডিয়ায় প্রেমলানি সাহেবের এই কারবার আছে।

প্রতাপ সরকারকে দেখে প্রেমলানি সাহেব হেসে হাত বাড়িয়ে দিলে।

বললে—কী খবর প্রতাপবাবু ?

প্রতাপ বললে—একটা পান্না কিনতে এসেছি সাহেব, বেশ নিদাগ পান্না চাই। কলকাতার লোক, বেশি দাম নেবেন না যেন—

প্রেমলানি সাহেব বললে—কেন, হরিবাবু আপনাদের পান্না দেখায় নি ?

প্রতাপ বললে—পান্না তো দেখাচ্ছিল হরিবাবু, ইতিমধ্যে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

—কী কাণ্ড।

হরিবাবু বললে—সেই ঠাকুরসাহেবের বিবি এসেছিলেন। তিনি একটা ঝুটো মুক্তোর হার কিনতে চাইছিলেন—

তারপর সমস্ত ব্যাপারটা শুনে প্রেমলানি সাহেব বললে—তা তুমি কেন ও-কথা বলতে গেলে?

হরিবাবু বললে—ঝুটো মুক্তোকে আমি কেমন করে খাঁটি মুক্তো বলি, বলুন?

প্রেমলানি সাহেব বললে—তা তুমি ঠাকুরসাহেবের বিবিকে দেখেও তার সঙ্গে তর্ক করতে গেলে? জানো তুমি ঠাকুরসাহেবের বিবি ওই-রকম লোক······

প্রতাপ বললে—ঠাকুরসাহেবের বউ কী রকম লোক প্রেমলানি সাহেব?

প্রেমলানি সাহেব বললে—আরে তার কথা আর বলবেন না প্রতাপবাবু। ঠাকুরসাহেব তো এই গেল বছরে ওকে বিয়ে করে এনেছে বোম্বাই থেকে। ওর মা সেকালের একজন ফেমাস সিনেমা-এ্যাক্‌ট্রেস ছিল। সেই বিয়ে করার পর থেকেই নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। এইটে তো ঠাকুরসাহেবের থার্ড ওয়াইফ—

—তিনটে বিয়ে?

—হ্যাঁ, আগের দুটোর সঙ্গে তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। প্রথমটা ছিল ইংরেজ, সেকেণ্ডটা ইহুদী, আর এটার কী জাত কে জানে। এর বোধহয় বাপেরও ঠিক নেই—

প্রতাপ অবাক হয়ে গেল শুনে।

বললে—তাই নাকি? আমি তো এ-সব ব্যাপার জানতাম না—

আমি এতক্ষণ বুঝতে পারছিলাম না কে ঠাকুরসাহেব, কার কথা এরা বলছে!

আমাকে প্রতাপ বুঝিয়ে দিলে—এখানকার রাজার মন্ত্রীর সব বংশধর। এখন তো স্টেট্‌-টেট্‌ সব গভর্মেণ্ট্‌ নিয়ে নিয়েছে, তাতে রাজাদের অবস্থাই সব খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর মন্ত্রী। তাদের ছেলে-নাতিরা সব লায়েক হয়েছে যে এক-একজন।

প্রেমলানি সাহেব বললে—ওদের ভেতরে আর এখন কিছু নেই, ওই বাইরেই যা ফুটানি—

বলতে বলতে হঠাৎ দোকানের সামনে আর একটা গাড়ি এসে হাজির।

প্রেমলানি সেদিকে দেখেই বললে—ওই ঠাকুরসাহেব এসে গেছে—

দেখলাম একজন দামী স্যুট পরা লোক গাড়ি থেকে নামলো। বেশ মাঝবয়েসী মোটা সোটা থল্‌থলে মানুষ।

দোকানে এসেই গড়-গড় করে কথা বলতে শুরু করে দিল—আরে, কী সর্বনাশ

করেছেন মিষ্টার প্রেমলানি। মিসেস্ আমার অফিসে গিয়ে মহা তম্বি করছে আপনার নামে। আপনার স্টাফ্ কে ছিল তখন?

প্রেমলানি সাহেব হাসতে লাগলো।

বললে—কেন, কী হয়েছে?

—আপনি শোনেন নি কিছু? আপনাকে আপনার স্টাফ্ কিছু বলে নি?

প্রেমলানি সাহেব বললে—হ্যাঁ, বলেছে—

—এদিকে আমি মিসেসকে বলেছিলাম ও-হারটার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর আপনার স্টাফ্ বলে দিলে কিনা ঝুটো মুক্তো। এখন আমি আমার মিসেসের কাছে কী করে মুখ দেখাই বলুন তো? আমার মিসেস জেনে ফেলেছে যে আমি তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি!

প্রেমলানি সাহেব বললে—ওই আমার হরিবাবুরই দোষ, ও যে আবার মিথ্যে কথা বলতে পারে না—

ঠাকুরসাহেব বললে—এখন তাহলে কী হবে? এবারেও দেখছি আবার আমাকে ডিভোর্স কেস্ করতে হবে।

প্রেমলানি বললে—তা আপনি মিসেসকে কী বললেন?

ঠাকুরসাহেব বললে—আমি বললাম—না, তা কখ্খনো হতে পারে না। ওরা মুক্তো চেনে না। আমি ওটা বোম্বাই থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি যে! আমি বলেছি অফিস থেকে ফিরে তোমাকে নিয়ে আমি সেই দোকানে গিয়ে প্রমাণ করে দেব! আমি যে এখন আপনার দোকানে এসেছি তা মিসেস জানে না—

—তা হলে তো ভালোই হয়েছে। আপনি বাড়ী গিয়ে মিসেসকে নিয়ে আসুন দোকানে। আমি সেটা দেখে বিচার করে বলে দেব যে ওটা আসল মুক্তো!

—ঠিক আছে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিসেসকে নিয়ে আসছি।

বলে ঠাকুরসাহেব চলে গেল।

জিনিষটা আমার কাছে খুব মজার লাগছিল।

প্রেমলানি সাহেব হরিবাবুর দিকে চেয়ে বললে—তুমি কী মুশ্‌কিলে ফেললে বলো দিকিনি ওঁকে। এ-বউও যদি আবার ওকে ডিভোর্স করে দেয়, তখন কী হবে বলো দিকিনি?

হরিবাবুও তেমনি লোক। বললে—কিন্তু আমি নকল জিনিষটাকে আসল বলে চালাই কী করে, তাই বলুন?

—তা বললে যদি ওর উপকার হয় তো বলতে তোমার দোষ কী? তুমি তো কারো ক্ষতি করছো না—

হরিবাবুর তখনও সেই এক কথা। বললে—আমার জিভ্ কেটে দিলেও আমি তা বলতে পারবো না বাবু। সে আমার দ্বারা হবে না—

—তাহলে ঠাকুরসাহেব যখন বিবিকে নিয়ে আসবে তখন যদি আমি তোমাকে বকি, তুমি তখন চুপ করে থাকতে পারবো তো?

হরিবাবু কিছু বলবার আগেই ঠাকুর সাহেবের গাড়ি এসে হাজির হলো। ঠাকুরসাহেব আর তার বউ গাড়ি থেকে নামলো।

প্রেমলানি সাহেব এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলে—আসুন আসুন ঠাকুরসাহেব, অনেকদিন যে আপনাকে দেখতে পাইনি। কেমন আছেন?

দোকানের ওপর উঠে এসে ঠাকুরসাহেব বললে—আপনার কাছে একটা কম্‌প্লেন আছে প্রেমলানি সাহেব। এই আমার মিসেস আপনার দোকানে এসেছিলেন একটু আগে একটা ঝুটো মুক্তোর নেকলেস কিনতে। ঠিক এর গলায় যে-নেকলেসটা রয়েছে সেই ডিজাইনের। কিন্তু এ-রকম আসল মুক্তোর নয়, ঝুটো মুক্তোর। একটা বিয়ের প্রেজেন্টেশনের জন্য। তা আপনার স্টাফ কে ছিল জানি না, সে নাকি বলেছে এটা ঝুটো মুক্তোর, আসল মুক্তোর নয়—

ঠাকুরসাহেবের বউ হরিবাবুর দিকে দেখিয়ে বললে—ওই যে, ওই লোকটা। ত্যাট্ ম্যান—

প্রেমলানি সাহেব হরিবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি? তুমিই বলেছো ওটা ঝুটো মুক্তো?

তারপর মিসেস ঠাকুরসাহেবকে বললে—আপনার হারটা দেখি একটু, দিন তো আমায়—

হারটা খুলে দিতেই প্রেমলানি সেটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর মুঠোর মধ্যে পুরে সূর্যের দিকে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলো। তারপর কাউন্টারের ওপর সেটা ফেলে রেখে দিয়ে হরিবাবুর দিকে চেয়ে বললে—তুমি বলেছ এটা ঝুটো? বলো, কথা বলো, উত্তর দাও—

হরিবাবু এক কোণে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল।

—কথা বলো! হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কথার জবাব দাও? এতদিন কাজ করছো, এখনও মুক্তো চেনো না? বসে বসে মাইনে নিলেই আমার দোকানের কাজ চলবে? বলো, কথার জবাব দাও—

হরিবাবু সেখানে তেমনি করেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কথা বলো, জবাব দাও? এটা ঝুটো মুক্তো?

ঠাকুরসাহেব বললে—থাক্ থাক্, ওকে আর বকবেন না মিষ্টার প্রেমলানি। ভুল হয়ে গেছে ওর, কী আর করবে! ছেড়ে দিন—

প্রেমলানি সাহেব বললে—না, ছাড়বো কেন? এতদিন দোকানে কাজ করছে, আর এই সামান্য মুক্তো চিনতে পারবে না? খদ্দেরই যদি খুশী না হলো তো ওকে আমার মাইনে দিয়ে রেখে লাভ কী? বেরোও এখান থেকে, বেরোও—

ঠাকুরসাহেব অনুনয় বিনয় করতে লাগলো—না, না, গরীব লোক, চিনতে পারেনি ঠিক, ছেড়ে দিন ওকে—

মিসেস ঠাকুরসাহেব বললে—মিষ্টার প্রেমলানি তো ঠিকই করছে, তুমি আবার ওকে ছেড়ে দিতে বলছো কেন? ওকে তো এখনি ডিস্‌চার্জ করে দেওয়া উচিত—

প্রেমলানি তখন ঠাকুরসাহেবের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? কত দিয়ে কিনেছিলেন নেকলেসটা?

ঠাকুরসাহেব বললে—পঞ্চাশ হাজার টাকা। কেন বলুন তো?

প্রেমলানি সাহেব বললে—আমি আপনাকে সত্তর হাজার টাকা দিচ্ছি। ক্যাশ্ ডাউন, বেচবেন আমাকে?

ঠাকুরসাহেব বললে—কী যে বলেন—

বলে নেকলেসটা নিয়ে স্ত্রীর গলায় পরিয়ে দিলে।

দেখে মনে হলো মিসেস ঠাকুরসাহেবের রাগ সন্দেহ সব কিছু যেন সুদে আসলে তখন উসুল হয়ে গেছে। আর কোনও অভিযোগ নেই।

শেষ পর্যন্ত শ' দেড়েক টাকার একটা ঝুটো মুক্তোর নেকলেস নিয়ে ঠাকুরসাহেব আর তার বউ গাড়িতে উঠে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুধু দেখলাম।

তারপর একদিন

তারপর একদিন কী হলো, হঠাৎ একজন পুলিস ইন্‌সপেকটার ঘরে এসে হাজির হলো।

পুলিস ইন্‌সপেকটার জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম তো হরিশ সরকার ?

সে অবাক হয়ে গেল। বললে—না তো, আমার নাম হরিশ সরকার হবে কেন ? আমার নাম তো অশেষ মজুমদার।

পুলিস ইন্‌সপেকটার হেসে উঠলো—বাঃ, আবার মিথ্যে কথাটাও তৈরি করে রেখেছেন দেখছি। ভাবছেন আপনার নাম-ধাম না-জেনেই আপনাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি !

—আমাকে অ্যারেস্ট করবেন ? কিন্তু আমি তো কিছু করিনি !

—করেছেন কি করেন নি, সে কোর্টে গিয়ে তার জবাব দেবেন। এখন থানায় চলুন !

অশেষ মজুমদার তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। তখন মুখ-টুক ধোয়াও হয়নি। কাল সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে এসে এই ঘরটাতে ঢুকেছে। ঢুকে কম্বল চাপা দিয়ে সেই আধ-পড়া বইটা নিয়ে আবার খানিকটা পড়েছে। তারপরে ঠিক রাত ন'টার সময় মধুবাবুর হোটেলে খেতে গিয়েছিল। মধুবাবুর হোটেল তখন বন্ধ ছিল। হোটেল কোনও দিন এমনিতে বন্ধ থাকে না। কিন্তু কাল দোকানের দরজায় তালা ঝুলছিল। হোটেল বন্ধ দেখে একটা অদৃশ্য ভয় সমস্ত শরীরটাকে যেন বিকল করে দিয়েছিল। হোটেল বন্ধ থাকলে খাবে কোথায়। পাশেই একটা মিষ্টির দোকান। আগে সন্দেশ-রসগোল্লা বিক্রি হতো সে-দোকানে। এখন সেখানে বেসনের খাবার বিক্রি হয়। কাচের বাক্সের ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে সেগুলো। দোকানদারের চেনা মুখ। দোকানদার জিজ্ঞেস করলে—কিছু নেবেন নাকি ?

অশেষ বললে—আচ্ছা, বলতে পারেন, মধুবাবুর হোটেলটা বন্ধ কেন ?

দোকানদার হেসে উঠলো—ছ'দিন বাদে মশাই আমরাও বন্ধ করে দেব দোকান—

অশেষ জিজ্ঞেস করলে—কেন, কী হলো বলুন তো ?

—মাল কোথায় যে বেচবো ?

অশেষ বুঝতে পারলে না।—মাল ! মাল মানে কী ?

—আপনি আছেন কোথায় ? কোন্ দেশে বাস করছেন ?

দোকানদার বোধ হয় আরো কিছু বলতো। কিন্তু বাজে কথা বলে মুখ করবে না বলেই চুপ করে নিজের কাজে মন দিলে! অশেষ মজুমদার আর সাড়া-শব্দ কিছু না পেয়ে অগত্যা ফিরে এল! রাস্তায় তখন লোক-চলাচল কমে এসেছে। বেশ শীত পড়েছে ক'দিন ধরে। কিন্তু কোথায় খাবার পাওয়া যায়! একটা পাউরুটির দোকান পেলে ভালো হতো। পাশেই একটা গলির ভেতরে ঢুকলে সেখানে পাউরুটির দোকান ছিল বলে মনে পড়লো। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই দেখলে দোকানের ঝাঁপ আধখানা বন্ধ। আধখানা ঝাঁপের ভেতরে উঁকি মেরে অশেষ জিজ্ঞেস করলে—রুটি আছে?

দোকানী তার দিকে না-চেয়েই বললে—না—

—একেবারে নেই?

এবারে দোকানী চেয়ে দেখলে চেহারাটা। বললে—বলছি তো নেই, আবার কেন বিরক্ত করছেন?

অশেষ বললে—দেখুন, যদি কোনও রকমে একটা রুটি দিতে পারতেন, আমার হোটেলটা আজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে—

—রুটি পেতে হলে কাল সকাল সাতটার মধ্যে আসবেন, যান্—

বলে দোকানী ঝাঁপটা আরো নিচু করে নামিয়ে দিলে।

আবার ফিরলো অশেষ। এখন অবশ্য ক্ষিধেটা সহ্য হচ্ছে। কিন্তু ক্ষিধের জন্যে যদি মাঝ-রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়! তাহলে কী করা যায়! গোটা-কয়েক কলা খেলে পেটটা ভরতে পারে। বাজারে গেলে হয়ত কিছু কলা কিনতে পাওয়া যেতে পারে! আসলে এত কাণ্ড কিছুই করতে হতো না যদি এই পাড়ায় চেনা-শোনা কেউ থাকতো তার, এই পাড়ায় কেন, কোনও পাড়াতেই অশেষ মজুমদারের চেনা-শোনা কেউ নেই।

বাজারের দিকে পা বাড়াতেই মধুবাবুর সঙ্গে দেখা। মধুবাবু পেছন থেকে ডাকলে—এই যে অশেষবাবু, আমি তো আপনাকেই খুঁজছিলুম—

মোটা-সোটা বেঁটে মানুষ মধুবাবু। এগারো বছর ধরে অশেষ এই মধুবাবুর দোকানে খেয়ে আসছে। প্রথম প্রথম তিরিশ টাকা নিত খাওয়ার জন্যে। দু'বেলা ভাত-ডাল-মাছ তরকারি। জীবনে কোনও দিন খাওয়ার বিলাস বলতে যা বোঝায় তা তার ছিল না। তাই কোনও দিন কম্‌প্লেন কিছু ছিল না অশেষের। অন্য খদ্দেররা চীৎকার করতো, অভিযোগ করতো। চালে কাঁকর থাকলে ভাত ফেলে দিত। কেউ কেউ টাকা বাকি রাখতো আবার। ভাতের হোটেল চালানো

বড় ঝকমারি ব্যাপার! কিন্তু অশেষ ঠিক কাঁটায় কাঁটায় নিজের ঘেরা ঘরটাতে গিয়ে বসতো আর যা দিত তাই-ই খেয়ে নিয়ে চলে আসতো। এমনি করে গেল দশটা বছর খেয়ে এসেছে। সকালবেলা খেয়ে নিয়েই অফিসে চলে গেছে। সেখানকার কাজ-কর্ম সেরে আবার সন্ধ্যেবেলা ঘরখানাতে ঢুকে পড়েছে।

ব্যতিক্রম হয়েছিল প্রথম কাল রাত্রে।

বহুদিন অশেষের মনে হয়েছে কিছু লোকের সঙ্গে মেশে। রাস্তায় বাসে ট্রামে ভিড়ের মধ্যে অনেকবার মানুষের সঙ্গে একাকার হতে চেয়েছে। কিন্তু মনে হয়েছে, ভিড়ের মানুষ যেন নিঃসঙ্গ মানুষ। কেউই ভিড় চায় না, কিন্তু বাধ্য হয়ে কোটি-কোটি মানুষ ভিড় সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে। আর বাধ্য হয়েছে বলেই বিরক্ত হয়ে সবাই সবাইকে ধাক্কা দিয়েছে।

হঠাৎ পেছনে আওয়াজ হলো—ও অশেষবাবু—

—আপনার হোটেল তো বন্ধ মধুবাবু! আমি তো হোটেল থেকেই ফিরে আসছি।

মধুবাবু বললে—আর আমি কিনা আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি—

—কেন?

—আপনি খেতে পান নি, আমি ভাববো না?

—কিন্তু হোটেল বন্ধ করে দিলেন কেন?

—আরে, বন্ধ আর করলুম কোথায়? গভর্মেণ্টই তো বাধ্য করলে দোকান বন্ধ করতে।

গভর্মেণ্টের নাম শুনে অশেষ যেন নিশ্চিন্ত হলো। বললে—ও, তাই বলুন—

—তাই বলুন, মানে?

অশেষ বললে—মানে, গভর্মেণ্ট দোকান বন্ধ করলে আর আপনি কী করতে পারেন?

—না না, তা বলছি না। আপনি মশাই এখনও সেই আনাড়িই রয়ে গেলেন বরাবর!

অশেষ মুখ তুলে চাইলে ভাল করে। আনাড়ি ছাড়া সেয়ানা কে আছে আজকের দিনে? সবাই-ই তো অশেষের মত অসহায়। সবাই, সবাই। সেদিন অফিসে পাশের বনমালীবাবুকে দেখে তাই-ই তো মনে হয়েছিল। বনমালীবাবুর হাতে যখন কাজ থাকে না, তখন ড্রয়ার থেকে বই বার করে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে।

মধুবাবু বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল অশেষবাবু—

—কী কথা? আমার এখনও খাওয়া হয়নি। আমি কলা কিনতে যাচ্ছিলুম—

—আরে মশাই, একটা দিন না-খেলে কী হয়? আমিও তো আজ খাইনি। এই খাবার ব্যবস্থা করবার জন্যেই তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!

—খাবার ব্যবস্থা করতে?

—হ্যাঁ! মধুবাবু অন্ধকারের মধ্যেই বেশ একটা মানে-ভরা হাসি হাসলেন বললেন—যেমন দেশ, তেমনি চাল-চলন করতে হবে তো! একদিন আমিই তে আপনাদের মাসে তিরিশ টাকায় ভাত খাইয়েছি। আজ পঞ্চাশ টাকাতেও পারছি না। কেন? বলুন তো কেন?

অশেষ বললে—তা জানি না।

—কিছু খবরই রাখবেন না তো জানবেন কী করে? দেশে কী ঘটছে তা তো আপনাদের খবর রাখা উচিত। মধুবাবুকে টাকা দিলুম আর মধুবাবু আমাদের খাওয়াবে, সে-যুগ চলে গেছে। সে-যুগ আর আসবে না।

তারপর কাঁধে হাত দিয়ে আড়ালে নিয়ে গিয়ে গলা নিচু করে বললেন—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে মশাই। আপনার ঘরে আর কে আছে?

অশেষ বললে—আর কে থাকবে? আমি একলাই থাকি?

—আর বাড়িওয়ালা?

—বাড়িওয়ালা তো থাকে শ্যামবাজারে। অতি ভদ্রলোক।

—আর কোনও ভাড়াটে নেই বাড়িটাতে?

—আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তারা দোতলায় থাকে।

—কী রকম লোক তারা?

—তাদের দেখিই নি কখনও তো কী করে বলবো তারা কী রকম লোক!

—আপনি তো বেশ মশাই। একবাড়িতে বাস করছেন আর তাদের দেখেনই নি! তা বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ, বলুন?

—আপনাদের কথা ভেবেই ব্যাপারটা করেছি। আপনারা আমার এতদিনের খদ্দের। আপনাকে আজ খাওয়াতে পারলুম না, এ যে আমার কী দুঃখ সে আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না মশাই। আমি নিজেও আজ খাইনি, তা জানেন?

—কেন? কী হলো-টা কী?

—আরে, চাল কোথায় পাবো যে খাবো? আপনাদের খাওয়াতে পারলাম না আর আমি নিজে খাবো? আপনি ভেবেছেন কী?

অশেষ বললে—আচ্ছা, কী ব্যাপার বলুন তো, কিছু পাওয়া গেল না কেন বলুন তো? চাল নেই?

—না! তবে আর বলছি কী!

—পাঁউরুটি?

—আটা-ময়দা থাকলে তবে তো পাঁউরুটি হবে! আপনি আছেন কোথায়?

—রসগোল্লা-সন্দেশ?

মধুবাবু এবার যেন রেগে গেলেন। বললেন—এই জন্যেই তো বলে বাঙালী। বাঙালীর কিস্যু হবে না মশাই এই আমি বলে রাখলুম। দেখে আসুন ইউ-পিতে গিয়ে, দেখে আসুন মাদ্রাজ, বোম্বাই গিয়ে। সেখানকার সব কড়া-কড়া লোক, সেখানে সব্বাই খেতে পাচ্ছে আর আপনাদের বাংলাদেশের কেবল এই অবস্থা। এ তো আপনাদের জন্যেই। আপনারা কিছু বলবেন না, কিছু করবেন না, তাই আপনাদের এত দুর্ভোগ!

অশেষ তবু কিছু বুঝতে পারলে না।

মধুবাবু বললে—চলুন, আপনার ঘরে চলুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক হবে না। নিরিবিলিতে বলতে হবে। মশাই, বাংলা-দেশের কয়লা আপনি পাঞ্জাবে গিয়ে কিনবেন এক দামে। এখানেও কয়লার যে দাম, সেই পাঞ্জাবেও সেই কয়লার সেই একই দাম। এখানকার লোহা ইস্পাত উড়িষ্যাতেও সেই একই দরে বিক্রি হচ্ছে! কিন্তু চাল?

অশেষ বললে—আমার ঘরে কি আপনি বসতে পারবেন? খুব ছোট্ট ঘর···

—রাখুন মশাই ঘরের কথা, বলা হচ্ছে চালের কথা, আপনি বলছেন ঘরের কথা। এই তো আমার পিসিমা এল পুরি থেকে, সেখানে এই কালকেও বাহান্ন পয়সা কিলো করে চাল বিক্রি হচ্ছে।

বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল। অশেষ দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো। আলোর সুইচ টিপে বললে—একটু বসবার অসুবিধে হবে আপনার, একখানা চেয়ার শুধু আছে—

—না মশাই, আমাদের অসুবিধে হলে চলবে কেন? এরই মধ্যে চালিয়ে নিতে হবে—

তারপর ঘরখানার চারদিকে দেখে মধুবাবু বললে—এই ঘরেই থাকেন বুঝি? ভারি চমৎকার ঘর তো। কত ভাড়া?

—এক শো' টাকা।

—বেশ সুবিধেয় পেয়েছেন তো। দশ বছর আগে নিয়েছিলেন তাই রক্ষে! এখন হলে গালে চড় মেরে দেড় শো' টাকা নিয়ে নিত। তা সে যা হোক, রান্নাঘর-টর নেই?

—আছে, কিন্তু ব্যবহার করা হয় না।

—কোথায় রান্নাঘর, দেখি?

পাশেই তিন ফুট-বাই-দু' ফুট একখানা ঘর। ঠিক ঘর নয়, একটা বাক্স। একেবারে খালি পড়ে আছে।

মধুবাবু বললেন—ঠিক এই ঘরখানাতেই আমার চলে যাবে।

তারপর বাইরে উঁকি দিয়ে কাকে যেন ডাকলেন—এ্যাই—এ্যাই—এখানে নিয়ে আয়—

অশেষ অবাক হয়ে দেখলে কে একজন লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। গো-বেচারা চেহারা, ময়লা কাপড়, ছেঁড়া আলোয়ান। তার পেছনে আর একজনের মাথায় একটা দু' মণি বস্তা! শীতের দিনেও মোট বয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোকটা।

মধুবাবু বললে—নামা, নামা, এইখানে নামা—খুব আস্তে, শব্দ করিস নি—

লোকটা বস্তাটা ধপাস্ করে মেঝের ওপর ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেঝের ধুলোগুলো ঝড়ের মতন উড়ে এসে নাকে লাগলো। অশেষ দেখতে লাগলো অবাক হয়ে।

বললে—এ সব কী মধুবাবু?

—কী আবার? চাল।

—তা এখানে চাল রাখছেন কেন? আমি এত চাল কী করবো?

—খাবেন মশাই খাবেন, আবার কী করবেন!

অশেষ বললে—আমি এত চাল খাবো কী করে?

—আরে মশাই, আপনাকে নিয়ে তো দেখছি অশেষ জ্বালা। একদিনে খেতে কে বলছে আপনাকে? আস্তে আস্তে, একটু-একটু করে খাবেন!

—কিন্তু আমি ভাত রাঁধবো কী করে? আমি তো রাঁধতে জানি না।

মধুবাবু অতি দুঃখের ভাবনার মধ্যেও হেসে ফেললেন।

—আরে আপনাকে রাঁধতে হবে কেন? আমিই রেঁধে দেব, আমার রাঁধবার লোক আছে। আমার শুধু রাখবার জায়গা নেই বলেই আপনার ঘরে রেখে দিয়ে গেলাম। চালের যা ব্যাপার, তা তো আর খবর রাখেন না। চাকরি করেন

অফিসে, আর থাওয়ার জন্যে আমার কাছে মাসকাবারি পঞ্চাশটি টাকা দিয়েই খালাস। কিন্তু আমি কোত্থেকে আপনাদের খাওয়াই, বলতে পারেন?

অশেষ চুপ করে রইল, কিছু বুঝতে পারলে না।

মধুবাবু বললে—কই, জবাব দিচ্ছেন না যে, বলুন কী বলবেন?

অশেষ বললে—আমি ও-সব বুঝি না, আমি শান্তিতে থাকবো বলেই আপনার হোটেলে থাই—

—সেই আপনাদের জন্যেই তো আমি এই এত অশান্তি ভোগ করছি মশাই, নইলে আমার আর কী!

তারপর যে-লোকটা চাল এনেছিল, সে চলে যাওয়ার পর মধুবাবুও চলে যাচ্ছিল। অশেষ ডাকলে। বললে—এ-ঘরে চাবি দিয়ে দেব?

—হ্যাঁ, তালা এঁটে বসে থাকুন। আপনার ঘরে কেউ আসে না তো?

অশেষ বললে—না, আমার ঘরে আর কে আসবে?

—আত্মীয়-স্বজন?

—আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। দূর সম্পর্কের যাঁরা আছেন তাঁরা দেশে থাকেন।

—বন্ধু-বান্ধব?

—আমার কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই। আমি শান্তিতে থাকবো বলে কারো সঙ্গে মেলা-মেশা করি না—

মধুবাবু বললে—খুব ভালো করেন মশাই, খুব ভালো করেন—। আজকাল কেউ আপন নয়, সবাই আজকাল স্বার্থপর হয়ে গেছে। আপনার ভালোটা কেউ চাইবে না—

মধুবাবু চলে যাবার পর অশেষ খানিকক্ষণ চুপ করে ভেবেছিল। কালকের থাওয়ার না-হয় সুরাহা হলো, কিন্তু আজ কী খাবে! তক্তপোষটার ওপর চুপ করে বসে ভাবতে ভেবেতে একটু তন্দ্রা এসেছিল।

তারপর হঠাৎ মনে হয়েছিল কে যেন দরজায় টোকা মারছে!

—কে?

সকালবেলা পুলিশের প্রশ্নে কালকের রাত্রের ঘটনাগুলো আবার সব মনে পড়তে লাগলো।

পুলিস ইন্‌সপেক্টার জিজ্ঞেস করলে—কে আপনার দরজায় ধাক্কা দিলে?

হঠাৎ যেন অশেষ মজুমদারের চোখের সামনে সব বোঁ বোঁ করে ঘুরতো লাগলো। সব যেন এলোমেলো। এতদিন এই দশ বছর দেশ ছেড়ে কলকাতায় আছে, সব স্মৃতি সব অভিজ্ঞতা যেন ঝাপ্সা হয়ে ফুটে উঠলো অশেষ মজুমদারের দৃষ্টির আগে! এই শহর, এই কলকাতা, এই দেশ, এই পৃথিবী থেকে সে বরাবর গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। আজকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারবেই বা কেন? তাকে একটু ভাবতে দাও, তলিয়ে যেতে দাও। জীবনের নিচের তলায় ডুব দিতে দাও।

বনমালীবাবু ড্রয়ার থেকে রোজ নতুন নতুন বাংলা বই বার করে পড়তো। লাল নীল মলাট। সেই অফিসের রং-চঙা চেহারা। বইগুলোর মধ্যে একবার ডুব দিলে আর বনমালীবাবুর জ্ঞান থাকতো না। অফিসের মধ্যে একেবারে কনিষ্ঠতম কেরানী অশেষ মজুমদার। বনমালীবাবু অশেষ মজুমদারের ঘাড়ে সব কাজ চাপিয়ে দিয়ে নভেল পড়তো আর মাঝে-মাঝে কেউ দেখছে কি না নজর দিত।

—এত কী পড়েন? একদিন জিজ্ঞেস করেছিল অশেষ।

—উপন্যাস হে, উপন্যাস!

—ওতে কী থাকে?

—সে কী হে? উপন্যাস কখনো পড়নি তুমি?

—ছোটবেলায় বাবা বারণ করতো উপন্যাস পড়তে।

—বাবা বারণ করলে, আর তুমিও পড়লে না?

অশেষ জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু কী থাকে ওতে?

—উপন্যাস পড়োনি, তা তোমাকে বোঝাব কী করে? তোমার তো মানুষ-জন্মই বৃথা হে! আশেপাশের মানুষের জীবনের সব কথা থাকে এতে।

—কিন্তু বাবা বলেছিলেন অনেক খারাপ-খারাপ জিনিস থাকে নাকি!

—তা প্রেম কি খারাপ জিনিস?

অশেষ মজুমদার সেদিন মহা মুশকিলে পড়েছিল প্রশ্নটা শুনে। যে-জিনিসের অস্তিত্বই নেই, সে জিনিস ভাল কি মন্দ তার বিচার সে কী করে করবে?

—প্রেম কোথায় হয়?

বনমালীবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে।

—সে কী হে? প্রেম কোথায় না হচ্ছে? বাড়িতে, রাস্তায়, গঙ্গার ঘাটে, ময়দানে, লেকে, বোটানিক্যাল গার্ডেনস্-এ, গান্ধী-ঘাটে। তুমি কখনও দেখনি?

অশেষ সত্যিই কিছুই দেখেনি। বলেছিল—আমি তো কোথাও যাই না—

—যাও না মানে ? অফিসে আসতে যেতে বাসের মধ্যে দেখতে পাও না ? তুমি কি চোখ বুজে ঘোরাঘুরি করো নাকি হে ? সিনেমাও দেখ না ? ভাল-ভাল সিনেমার জন্যে লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিউ দিতে দেখনি ?

অশেষ মজুমদার বলেছিল—আমি তো অফিস আর বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাই না।

—কেন, যাওনা কেন ? বাবা কি তাও বারণ করে গিয়েছিলেন ?

—না, আমি একটু শাস্তিতে থাকতে চাই কিনা।

বনমালীবাবু মুখ বাঁকালো। সিনেমা থিয়েটারের চেয়ে আর বেশী শান্তি কিসে হে ? মানুষকে শান্তি দেবার জন্যেই তো ও-গুলোর সৃষ্টি। বেশ আরাম করে লাইফটাকে ভোগ করে না নিলে বেঁচে থেকে ফয়দাটা কী ? ভগবান তোমাকে তৈরি করেছে, আর তুমি নিজেও কিছু তৈরী করে নাও। তুমি বিয়ে করে সংসার করো, বেশ আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে হুকুম চালাও। দুহাতে টাকা উপায় করে ব্যাঙ্কে রেখে বোম্ মেরে বসে থাকো। দেখবে ভগবানই বা কে, আর তুমিই বা কে ? দেখবে দুনিয়াতে বেঁচে থেকে কত আরাম !

এ-সব কথায় বিশেষ কান দেয়নি অশেষ। অশেষ মজুমদারের সঙ্গে বনমালী-বাবুর ওই জন্যেই বেশী মেলেনি। কারোর সঙ্গেই মেলেনি। শুধু বনমালীবাবুরই নয়, আরো অনেক বাবু আছে অফিসে, অনেক সাহেব, অনেক বড়-সাহেব। অফিসটা তো এই পৃথিবীটারই একটা ছোট সংস্করণ ! অফিসটাই যেন মাপে বড় হয়ে এই পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। এই পৃথিবীতে কেউ চাপরাশি, কেউ পিওন, কেউ জেলার-বাবু, কেউ ক্যাশিয়ার, কেউ বা ম্যানেজার, আবার কেউ বা জেনারেল ম্যানেজার। মালিককে কখনও দেখা যায় না অফিসে। মালিক আড়ালে থেকেই কল-কাঠি নাড়ে। কেউ-ই বুঝতে পারে না কাল কার কপালে কী আছে। কাকে ফাইন করবে মালিক, কাকে প্রমোশন দেবে, কাকে ডিমোশন করবে, কাকে আবার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেবে, আবার কাকে কখন ডিসচার্জ করবে তা অফিসে কেউ আগে থেকে হদিশ দিতে পারে না।

কিন্তু তা নিয়েও অশেষ মজুমদার কখনও মাথা ঘামায় নি। দূর থেকে ভিড় দেখেই সরে এসেছে। দায়িত্বের ভিড়, ভাবনার ভিড়, ভয়ের ভিড়। মানুষের ভিড়ের চেয়ে সে-ভিড় কি কিছু কম বিপদের ? তার চেয়ে মধুবাবুর হোটেলের নিরাপদ নিশ্চিন্ততা আছে, নিজের একতলার ঘরখানার নির্বাধ নির্জনতা আছে, সেখানেই সে নিজের জীবনের কৈবল্য চেয়েছিল। ভয় যেমন খারাপ জিনিস, আবার

তা ভালোও বটে! সেই ভয়ই তাকে নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার মধ্যে অবগাহন করতে সুবিধে করে দিয়েছিল।

মধুবাবু নিজের হোটেলের সামনে ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে থাকতো। পয়সা-টাকা-আনি-দু'আনিগুলো গুণতো, আর হিসেব লিখতো। হিসেবের গোলক-ধাঁধার মধ্যে ডুবে গেলেও জ্ঞানটা পুরোমাত্রার থাকতো টন্‌টনে!

জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে বোঁচা, অশেষবাবু আজকে খেলে না তো?

বোঁচা সর্দার চাকর। বলতো—হ্যাঁ বাবু, খেয়ে গেছেন—

—সে কী রে, কখন খেলে? আমি তো দেখতে পেলুম না—

তা তেমনি মানুষই বটে অশেষ মজুমদার। কেউ দেখতে পেত না। কেউ যাতে দেখতে না-পায় আপ্রাণ সেই চেষ্টাই করতো সে! কেউ দেখতে না পেলেই তো ভালো। সে গুণ্‌তি থেকে বাদ পড়ে যাবে। তাকে জীবনের প্রতিযোগিতায় বাঁচবার জন্যে লড়াইও করতে হবে না, কিউতে দাঁড়াতেও হবে না। কত লোক তো এমনি করে চোখের আড়ালেই থেকে গেল বরাবর। কবে জন্ম হলো, কবে মরে গেল তা কেউ জানতেও পারলো না। পৃথিবীর আদিম অন্ধকারের দিনে যেমন করে ক্রমিরা বাঁচতো, তেমনি।

তা হোক, তবু তো এতে হুড়োহুড়ি নেই, হাঁফানো নেই, দৌড়ানো নেই। শান্ত নিরিবিলি নির্বেদ নিরুদ্বেগ জীবন।

কিন্তু হঠাৎ যেন ক'দিন থেকে একটু-একটু অস্বস্তি লাগছিল। সন্ধ্যেবেলা ব্ল্যাক-আউট হয়ে যেত। অফিস থেকে ফিরতে রাস্তায় অন্ধকার-অন্ধকার লাগতো। লোকে বলতো যুদ্ধ বেধেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ! হবেও বা। কী মশাই, যুদ্ধের খবর আপনি শোনেন নি? না, আমি কী করে শুনবো বলুন? খবরের কাগজও পড়েন না? না। রেডিও-ও শোনেন না? না। খবরের কাগজ শুনলে, কিম্বা রেডিও শুনলে আমি যেন যুদ্ধের হাত থেকে বেঁচে যাবো। ও না-পড়লেও যা হবে, পড়লেও তাই-ই হবে। খবরের কাগজ পড়লেও তো মাথার ওপর বোমা পড়া কেউ ঠেকাতে পারবে না?

তা তখনও বুঝতে পারেনি যে, মধুবাবুর হোটেলও একদিন বন্ধ হয়ে যাবে! মধুবাবুর হোটেলের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধের যে একটা ক্ষীণ সম্পর্ক আছে তা সে কল্পনা করতেও পারেনি তখন! কাল যখন অনেক রাত্রে বাজারের দিকে যাচ্ছিল, তখনও জানতে পারেনি যে এই যুদ্ধের সঙ্গে সেও জড়িয়ে পড়বে। বাইরের ব্ল্যাক-আউট আর আতঙ্ক তাকেও এমন করে একান্তভাবে গ্রাস করবে।

অথচ সে তো মুক্তপুরুষ। সংসারে বাস করেও যে ভালো করে সংসারী হলো না, সেই-ই তো সত্যিকারের মুক্তপুরুষ। কোনও দায় নেই, কোনও দায়িত্ব নেই। যে সমাজ তাকে দায়িত্ব দেয় নি, সে সমাজের ওপরও তার কোন দায়িত্ব নেই। সংসার করতে গেলেই সন্তান চাই। সন্তান হলেই এ-সমাজে তাকে স্কুলের টিচারদের ঘুঁষ দিতে হবে। কোশ্চেন বলে দেবার জন্যে কোচিং ক্লাসে ভরতি করতে হবে। তারপর আছে সন্তানদের ভবিষ্যৎ। সেখানে ঘুঁষ, খোসামোদ, ইন্‌ফ্লুয়েন্স, সব কিছু না করতে পারলে তোমার ছেলে প্রতিযোগিতার ভিড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপর আছে দল। দল না পাকালে তুমি বাতিল। কারো-না-কারো দলে তোমাকে যোগ দিতেই হবে। দলে না ভিড়লে তুমি পেছিয়ে পড়বে। তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। এই সভা-সমাজে তুমি কুলীন হয়েও হরিজন!

ছোটবেলায় বাবা বলেছিল—সব সময় সত্যি কথা বলবে বাবা, সত্যের মার নেই—

কিন্তু অশেষ মজুমদারের মনে হয়েছিল, বাবা সেদিন তার সেই অল্প বয়েসে মারা গিয়ে যেন বেঁচে গেছেন। তাঁকে কিছুই দেখে যেতে হলো না।

বাবা আরো বলেছিল—তুমি বড় হয়ে কী হবে কিছু ভেবেছ?

বড় হয়ে অশেষ মজুমদার কী হবে তা সেই অল্প বয়েসে ভাবতে পারেনি। শুধু মনে হয়েছিল কিছু হয়েই বা কী হবে? কিছু যে হতেই হবে তারই বা কী মানে আছে? ডাক্তার? ইঞ্জিনীয়ার? কেরানী? কবি? ঘুঁষ না দিলে তো কিছু হবারই উপায় নেই! যেখানেই যাও সেখানেই ভিড। সেই ভিড সরিয়ে সামনের সারিতে যেতে গেলেই ঘুঁষ চাই। বাবার বড় ভাবনা ছিল ছেলের জন্যে। ছেলের ভবিষ্যতের জন্যে! কিন্তু একটা ক্ষীণ আশা ছিল বাবার মনে। এই তো ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চলে গেল। এবার ইণ্ডিয়া স্বাধীন। স্বাধীন দেশের নাগরিক তোমরা। আর আমরা সারা জীবন ইংরেজের লাথি-ঝাঁটা-গালাগালি খেয়ে এলুম। আমাদের কপালে যা ছিল তা তো ভোগ করেছি! এবার তোমরা সুখের মুখ দেখতে পাবে, এইটেই আমার তৃপ্তি। এই তৃপ্তি নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি। এবার থেকে আর তোমাদের কাউকে খোসামোদ করতে হবে না। এবার তোমরাই দেশের রাজা, তোমাদের স্বজাতির লোকরাই ভাইসরয় হবে, তোমাদের নিজের লোকরাই রাজ্য চালাবে। তখন আমাদের কথা মনে করো। আমরা অনেক কষ্ট করে তোমাদের মানুষ করেছি বাবা, অনেক সহ্য করেছি। এবার সব গোলমাল মিটে গেল। এবার শান্তি!

সে সব সেই আঠারো বছর আগেকার কথা। ১৯৪৭ সালের কথা।

—তারপর ? তারপর কী হলো ?

তারপর মধুবাবু চলে যাবার পর আমি চুপ করে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। বড় ক্ষিধে পাচ্ছিল। কিন্তু কিছু করবার উপায় ছিল না। হঠাৎ মনে হলো দরজায় কে যেন ধাক্কা দিলে। বললাম—কে ?

দরজা খুলে দিতেই দেখি একটা লোক উঁকি মারছে। লোকটাকে চিনতে পারলাম। ওই লোকটাই মধুবাবুর চাল নিয়ে এসেছিল আমার ঘরে।

লোকটা চোখ পিট্-পিট্ করে বললে—কত দর দিলেন ওই এক বস্তা চালের ?

বললাম—আমি তো কিনি নি। ও তো ওঁর চাল, উনি রেখে গেলেন !

—তা যারই চাল হোক, আপনি বেচবেন ?

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি, বললাম— ওঁর চাল, আমি কী করে বেচবো ?

লোকটা বললে—আমি দেড় শো টাকা দর দেব, আমাকে দিন না বেচে—

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা বলে কী !

লোকটা হাসতে লাগলো। বললে—এ সব তো হামেশাই হচ্ছে, আপনি কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। মাঝখান থেকে আপনি মুফোত্ কিছু টাকা পেয়ে যেতেন ?

বললাম—আমি কেন মাঝখান থেকে টাকা নিতে যাবো ?

লোকটা বললে—আপনি তো অবাক করলেন মশাই, সবাই টাকা নিচ্ছে আর আপনিই বা নেবেন না কেন ?

—সবাই মানে ?

—সবাই মানে সবাই। আমি তো এ-লাইনে আঠারো বছর রয়েছি মশাই, সবাইকেই তো দেখলুম, কে নেয় না তাই বলুন ? যারা যত বড়-বড় লোক, তাদেরই ততো খাঁক্তি !

বললাম—বেশি বাজে বকবেন না আপনি, এখন যান এখান থেকে—

আমার তখন একটু রাগ হয়ে গিয়েছিল। একে রাত হয়েছে তায় খাওয়া হয় নি রাত্রে। কিন্তু লোকটা তবু গেল না। বললে—মিছিমিছি রাগ করছেন কেন মশাই, যা সবাই করে আপনিই বা তা করবেন না কেন ?

—কে করে !

—জানতে চান কে-কে করে? কিন্তু কাউকে যেন বলবেন না মশাই, তাহলে ডিফেন্স্ অব ইণ্ডিয়ার আইনে আপনাকে পুলিশে ধরবে!

এবার ভালো করে লোকটার মুখে ইংরিজি উচ্চারণ শুনে একটু চমকে গিয়েছিলাম। লোকটা তো তাহলে কুলি-মজুর শ্রেণীর নয়!

লোকটা বললে—দেড় শো টাকা মাটি খুঁড়লেও আপনার আসবে না—ওমনি যখন পাচ্ছেন তখন নিয়ে নিন্ না—

বললাম—আপনি যান, আমি অন্য লোকেদের মত নই—আমি ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাই না। মধুবাবু আমার হোটেলের মালিক তাই আমার ঘরে চালটা রাখতে দিলুম—আপনি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন—

তারপর আরো সব কী-কী কথা হয়েছিল মনে নেই, যখন লোকটা চলে গেল তখন বেশ শাসিয়ে গেল আমাকে। বললে—বেচবেন না তো?

আমি দরজাটা জোরে বন্ধ করে দিয়ে বললাম—না—

লোকটা বাইরে থেকে শাসাতে লাগলো—দেখে নেব, আপনি চাল বেচেন কি না, দেখে নেব! খুব লায়েক হয়ে গেছেন একেবারে! ঢের ঢের সাধু লোক দেখা আছে আমার, সব ব্যাটাকে চিনি নিয়েছি—আচ্ছা…

তারপর আমি আর সে-কথায় কান না দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আর তারপর আপনারা এসে এখন দরজা ঠেললেন। আমি বলছি আমার নাম হরিশ সরকার নয়। আমি স্ক্যাক্সটন্ এণ্ড জ্যাকবসন্ কোম্পানীর ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক, আমার অফিসে গিয়ে আপনারা খবর নিতে পারেন, আমি বাড়িওয়ালাকে যে রসিদ দিই তা দেখতে পারেন, মধুবাবুর হোটেলের হিসেবের খাতা দেখতে পারেন, সব জায়গায় আমার নাম অশেষ মজুমদার লেখা আছে, কোনও কালে আমার নাম হরিশ সরকার নয়—

পুলিশের ইনসপেকার বললে,—সে-প্রমাণ আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে দেবেন, এখন থানায় চলুন—

তারপর একদিন আর একটা দেশে, আর এক লোকে সভা বসলো। স্বর্গলোক বলো স্বর্গলোক, নরক-লোক বলো নরক-লোক। স্বর্গ-নরক সবই যদি কল্পনা হয় তো হোক, কিন্তু অশেষ মজুমদারের কিছু এসে যায় না তাতে। অশেষ মজুমদারেরা পৃথিবীর নিরীহ নাগরিক! তারা পৃথিবীর এক কোণে নিরিবিলিতে শান্তিতে বাস করতে চায়। তারা কোনও কিছু নিয়ে কাড়াকাড়ি করে না। তারা সকাল বেলা

জীবিকার জন্যে অফিসে গিয়ে ঢোকে আর বিকেল বেলা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের কোঠরে মাথা গোঁজে। তারা সকলের পিছু সারিতে দাঁড়িয়ে সকলের আড়ালে থেকে একটু শান্তি পেতে চায়। অশান্তি হবে বলে নিঃশব্দে বেঁচে থেকে নিজের আর্জি কখনও জোর-গলায় চিৎকার করে কাউকে জানায় না। তারা শুধু বলে—আমি আছি, কিন্তু তোমাদের অস্তিত্বের ব্যাঘাত ঘটিয়ে নয়। তোমরাও থাকো, কিন্তু আমার অস্তিত্বকে তোমরা অনুগ্রহ করে বিপন্ন কোর না। আমি তোমাদের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াবো না।

কিন্তু আশ্চর্য, অশেষ মজুমদারদের সেই শান্তির জগতেই হঠাৎ এই বিপর্যয়টা বাধলো।

সমস্ত রাত তার সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে কাটলো। জন্ম-মৃত্যু-জীবন, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু যেন তার সেদিন নিরর্থক হয়ে গিয়েছিল। কিছু নেই। আনন্দ বলে কিছু নেই, দুঃখ বলেও কিছু নেই। অশেষ মজুমদারের মনে হয়েছিল একদিন এই কোটি কোটি বছর ধরে যে-পৃথিবী চলে এসেছে, এইটেই যেন এর স্বাভাবিক গতি। তোমরা যা যা বলেছ আমি তার সব কিছু মেনে এসেছি। সত্য কথা বলে এসেছি, সদাচরণ করে এসেছি, সৎভাবে জীবন যাপনও করে এসেছি। কিন্তু তবু আমাকে তোমরা মুক্তি দিলে না, তবু তোমরা আমাকে অকারণে বিপন্ন করলে। আমিই যদি অমৃতের পুত্র হই তো সে-অমৃতে আমার দরকার নেই। আমিই যদি দেবতার অংশ হই তো সে-দেবতা আমার পুজোর যোগ্য নয়। আমাকে কেন তোমরা এত কষ্ট দিচ্ছ? আমি তো বলেছি আমি হরিশ সরকার নই, আমি অশেষ মজুমদার। আমি হরিশ সরকারকে চিনি না। তবু তোমরা আমাকে সারা দিন সারা রাত যন্ত্রণা দিয়েছ। এতদিন তাহলে তোমরা আমাকে সমস্ত মিথ্যে কথা বলে এসেছ? সব স্তোকবাক্য?

পুলিশের ইনসপেকটর বলেছিল—এখনও সত্যি কথা বলুন, আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব—

অশেষ মজুমদার বলেছিল—সত্যি কথাই তো বলছি—

—তাহলে আর ছাড়লাম না।

—কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছি?

—সে জবাব আমি আপনার কাছে দেব না। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে দেব।

কিন্তু এই পৃথিবীটাই তো একটা হাজতখানা। এই বিরাট হাজতখানার মধ্যে

তো প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অকারণ অপরাধে কোটি কোটি মানুষকে এমনি করে যন্ত্রণা দেয় পুলিশ ইনসপেকটার। কেউ জানতে পারে না কী তার অপরাধ, কেন সে অপরাধী। অশেষ মজুমদার তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। একটু আলো দাও, একটু বাতাস দাও, একটু শান্তি দাও। অন্যায়ের প্রতিকার করো বলবো না। কারণ অন্যায়ই এখানে ন্যায়, অশান্তিই এখানে শান্তি, এ আমি সার জেনে নিয়েছি। জেনে নিয়েছি তোমাদের উপনিষদ বেদ গীতা মহাভারত সব মিথ্যে। জেনে নিয়েছি পরম কারুণিক পরম মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান বলে কেউ নেই। ওসব তোমাদের স্তোকবাক্য, ওসব তোমাদের ধাপ্পাবাজি!

হঠাৎ অশেষ মজুমদারের মনে হলো যেন একটা নতুন জায়গায় এসে পড়েছে সে। এ কোথায় নিয়ে এসেছে তাকে! ও কে? ওই যে বসে আছে ওখানে?

সত্যিই আর এক দেশে, আর এক লোকে তখন আর এক সভা বসেছে। অশেষ মজুমদার চোখ তুলে ভালো করে চেয়ে দেখলে। অনেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের দিকে সবাই একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তারপর স্তোত্রপাঠ সুরু হলো। পরম কারুণিক পরম মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান! আমরা পাপী, আমাদের পাপ খণ্ডন করো পতিতপাবন। আমাদের মুক্তি দাও তুমি, আমাদের পরিত্রাণ দাও—

—এ কে?

সর্বশক্তিমানের গলার শব্দে স্তোত্রপাঠ বন্ধ হয়ে গেল।

—করুণাময়, এর নাম হরিশ সরকার। এর নিবাস তেরোর সি কাঁকুলিয়া রোড। কলিকাতা—

—এ কী করেছে?

এমন সময় পেছন দিকে যেন আর একটা শব্দ হলো। সভায় আর একজন আসামীকে ধরে আনা হচ্ছে। চেনা-চেনা মনে হলো মুখটা। কোথায় যেন দেখেছে। বেঁটে খাটো মানুষটি। মাথায় গান্ধী টুপি! হঠাৎ মনে পড়ে গেল! এরই নাম তো লালবাহাদুর শাস্ত্রী!!!

অবাক কাণ্ড! লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীকে এখানে আনলো কেন পুলিশ ইনসপেকটর! পুলিশ ইনসপেকটর ওঁকেও ধরেছে?

শাস্ত্রীজী এসে আর একটা কাঠগড়ায় হাত-জোড় করে দাঁড়ালেন।

—ও কে?

—করুণাময়, ওর নাম লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ওর নিবাস দশ নম্বর, জনপথ, দিল্লী—

—ও কী করেছে ?

পুলিশ ইনসপেকটর সওয়াল করলে—এরা দুজনেই আইন ভেঙেছে,—

—কোন্ আইন ?

—দু'জনেই শান্তি চেয়েছিল !

সর্বশক্তিমানের চোখ দুটো হঠাৎ রাগে লাল হয়ে উঠলো। অশেষ মজুমদারের মনে হলো তার পায়ের তলার পাটাতনটাও যেন কাঁপতে শুরু করেছে। সর্বশক্তিমানের রাগের আক্রোশে যেন সমস্ত বিশ্ব-চরাচর লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে এখনি।

—শান্তি ?

—হ্যাঁ মঙ্গলময় ! শান্তি !

—কী আশ্চর্য ! আমি বার বার হুকুমনামা জারি করেছি না যে শান্তি চাওয়া অপরাধ !

পুলিশ ইনসপেকটর বললে—এই এক নম্বর আসামী হরিশ সরকার শান্তি পাবার জন্যে কারোর সঙ্গে ঝগড়া করতো না, কারো সঙ্গে বন্ধুত্বও করতো না। একলা কাঁকুলিয়া রোডের তেরোর সি নম্বর বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকতো আর হোটেলে খেত। আর দু'নম্বর আসামী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, এ ইণ্ডিয়ার শান্তির জন্যে রাশিয়াতে তাসখন্দে গিয়ে শান্তি-চুক্তি করেছিল—

—কী সর্বনাশ ! কিন্তু আমার হুকুম কি এরা শোনে নি ? আমি তো বলে দিয়েছি গাড়ি চাইলে গাড়ি দিতে পারি, বাড়ি চাইলে বাড়ি দিতে পারি। যা কিছু চাইবে মানুষ সব আমি দেব। একনিষ্ঠভাবে চাইলে আমি কিছুতে বাধা দেব না। কিন্তু আমি তো হুকুম দিয়ে দিয়েছিলুম যে শান্তি যেন কেউ না চায়। শান্তি আমি দেব না। শান্তি চাইতে নেই, শান্তি দিতেও নেই ! শান্তি চাইলে সে মহাপাতক হবে !

সঙ্গে সঙ্গে যেন মাথার ওপর বাজ পড়লো বিকট শব্দ করে। সর্বশক্তিমান একটা কান-ফাটা চিৎকার করে বলে উঠলেন—যাও—কেউ তোমরা কিছু কাজ করছো না —যাও—

অশেষ মজুমদারের মনে হলো যেন বাজটা তাদের মাথার ওপরেই পড়লো।

তারপর একদিন ভোর বেলা একটা খবরে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে গেল। কাঁকুলিয়া রোডের তেরোর সি নম্বর বাড়িতে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। নাম

অশেষ মজুমদার। স্ট্যাণ্টন এ্যাণ্ড জ্যাকবসন্ কোম্পানীর অফিসের কনিষ্ঠ ডেসপ্যাচ ক্লার্ক। কেউ জানে না কীসে তার মৃত্যু হলো। আর একজন মারা গেলেন তাসখন্দে। নাম লালবাহাদুর শাস্ত্রী। নিবাস দশ নম্বর জনপথ! নিউদিল্লি। প্রথম খবরটা আর খবরের কাগজে ছাপা হলো না। শেষ-খবরটা ছাপা হবার পর খবরের কাগজে আর জায়গা ছিল না। কিন্তু দু'জনে একই অপরাধে অপরাধী। একজন শাস্তি পেতে চেয়েছিল, আর একজন শাস্তি দিতে। দুজনেই গরীব। একজন অখ্যাত গরীব, আর একজন বিখ্যাত। অত্যন্ত বিখ্যাত গরীব। গরীব ইণ্ডিয়ার বিখ্যাত গরীব প্রাইম মিনিস্টার।

রাত আটটার সওয়ারী

নতুন পাড়ায় ফ্ল্যাট্ নিয়েছিলাম। দোতলা ফ্ল্যাট্। সামনে দেড়শো ফুট চওড়া রাস্তা। নানা কারণে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। আমার আর এ-ফ্ল্যাট্ পাওয়া সম্ভব ছিল না। সেলামী লাগেনি, অথচ ভাড়াটাও কম। আবার খুব হট্টগোলও নেই চারদিকে।

রতনবাবু বললেন—ওই দেখুন, সামনেই পার্ক, যেদিন ইচ্ছে হবে, ওখানে গিয়ে বসতে পারেন, আর যদি সিনেমায় যেতে ইচ্ছে হয় তাও যেতে পারেন কিছু দূর হেঁটে গেলেই—

আমি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। নতুন পাড়ায় বাসা উঠিয়ে নিয়ে আসার মধ্যে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ আছে। অনেকটা নতুন বিয়ে করার মত। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। দোতলা থেকে চারদিকটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। রতনবাবু আশেপাশের নানা লোকের পরিচয় দিচ্ছিলেন। কেউ প্রফেসার, কেউ বড় বিজ্নেসম্যান, কেউ গুজরাটি, কেউ হেড-মিস্ট্রেস। পাচমিশেলী মানুষ সব। সবাই অবস্থাপন্ন। সবাই নানা কাজের সূত্রে এ-পাড়ায় এসে ডেরা নিয়েছে। ঠিক মধ্যবিত্ত বলবো না, আবার পুরোপুরি উচ্চবিত্তও নয়। অথচ বাইরের ঠাট্ বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টায় আয়ের সমস্ত অংশটাই ব্যয় করে আভিজাত্য কিনতে হয় এদের। মূল্যটা খুবই বেশি পড়ে বটে, কিন্তু সুনাম বাঁচে। চিংড়ি মাছের

আঁশ্‌টে দুর্গন্ধটা ঢাকতে হয় দামী সিল্কের শাড়ির চোখ-ধাঁধানো বাহার দিয়ে অনাহার-উপবাসের গ্লানি চাপতে হয় কাজলকালো সুর্মা দিয়ে। তাতে এ-পাড়ার লোকের পেট না ভরুক ইজ্জত বাঁচে। আর কলকাতার এই সমাজের কাছে পেটটা কিছু নয়, ইজ্জতটাই ষোল আনা।

—ওই দেখুন, ওই দিকে চেয়ে দেখুন—

আমি রতনবাবুর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম।

—ওই যে একটা রিক্সা আসছে দেখেছেন? খোলা রিক্সা, রিক্সার ওপর একজন ভদ্রলোক বসে আছে, দেখতে পেয়েছেন?

দেখলাম। রিক্সাটা আস্তে আস্তে সামনের ফুটপাত ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো একটা বাড়ির সামনে। রিক্সাওয়ালাটা রিক্সাটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—এইবার দেখুন ভদ্রলোক কী করে!

কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই করলে না। সেই রিক্সার ওপরেই চুপ-চাপ বসে রইল। রিক্সাওয়ালাটা তখন একটু জিরিয়ে নিলে। হাওয়া খেতে লাগলো। বেওয়ারিশ রাস্তা। কারোর কিছু বলবার নেই। ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালো। খানিকক্ষণ ওপর দিকে চাইলে।

রতনবাবু বললেন—এইবার দেখুন কী করে—

তারপর কী হলো কে জানে! রিক্সাওয়ালাটা আবার রিক্সাটা তুলে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। তারপর যেদিক দিয়ে এসেছিল, আবার সেইদিকে চলতে লাগলো ঠুন-ঠুন শব্দ করতে করতে। তারপর ক্রমে ট্র্যাফিকের ভিড়ে আর রিক্সাটাকে দেখা গেল না।

—দেখলেন তো?

বললাম—ভদ্রলোক কে?

রতনবাবু বললেন—অদ্ভুত লোকটা। শুনেছি এককালে খুব নামকরা লোক ছিল, এখন এই অবস্থা। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। ওই রোজ এই রাত আটটার সময় রিক্সায় করে ওখানে এসে দাঁড়াবে, তারপর খানিক পরেই আবার চলে যাবে—এমনি রোজ—

—কেন আসে? কী করতে আসে?

রতনবাবু বললেন—আমি প্রথম-প্রথম দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, পরে সব শুনলুম, বড় তাজ্জব ব্যাপার মশাই—

এ-পাড়ায় প্রথম সেই দিনই ভদ্রলোককে দেখি! রাত আটটার সময়েই আসতো,

প্রতিদিন। ঢিল্-ঢিলে হাওয়াই শার্ট গায়ে। পরনে কোনও দিন ধুতি, কোনও দিন ট্রাউজার। বেশ প্রৌঢ় মানুষ। আধ-ফর্সা। পৃথিবীর যুদ্ধোত্তর যুগের মাথা-গুলিয়ে-যাওয়া আর একজন মানুষ। একদিন সংসার, সুখ ঐশ্বর্যের আশায় আরো অনেকের মতই কলকাতা সহরকে আশ্রয় করেছিল। আশ্রয় করে এখানকারই একজন হয়ে বেঁচে উঠতে চেয়েছিল। তারপর হারিয়ে গেছে। এই দক্ষিণ কলকাতার সামাজিক-অর্থনৈতিক ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে গিয়ে একেবারে সশরীরে হারিয়ে গেছে।

সেই প্রথম দিনেই কাহিনীটা বলেছিলেন রতনবাবু। একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ! গল্পের মত, উপন্যাসের মত। আর শুধু উপন্যাসের মতও নয়, আরব্য উপন্যাসের মত!

সেই প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করতে লাগলাম ব্যাপারটা। ঠিক আটটার সময় এসে দাঁড়ায় রিক্সাটা। আর ভদ্রলোক চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়। তারপর আবার ফিরে চলে যায়।

যেখানে এসে রিক্সাটা দাঁড়ায়, ঠিক তার সামনের দোতলার ওপরেই থাকতেন ভূপতিবাবু। ভূপতিবাবু আর ভূপতিবাবুর স্ত্রী।

রতনবাবুর মুখে গল্পটা শোনার পর থেকেই কেমন সমস্ত ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে কল্পনা করে নিতে ভালো লাগতো। একেবারে সূত্রপাত থেকে। এই পৃথিবীও একদিন সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে সুরু করেছিল। ভূপতিবাবুর বোধহয় সেটা স্মরণ ছিল না। ভূপতিবাবু ছিলেন আলসে প্রকৃতির মানুষ। পকেটে রুমাল নিতে ভুলে যেতেন। মানিব্যাগে পয়সা থাকতো না। অনেক দিন ট্রামে উঠে তবে খেয়াল হয়েছে। আবার মাঝপথে নেমে এসেছেন।

কঙ্কা অবাক হয়ে যেত। কঙ্কাবতী। কঙ্কাবতীই চালিয়ে নিত ভূপতিকে।

সংসারে এমন এক-একটা মানুষ থাকে, যাদের সংসার করা উচিত নয়। সংসার করার যোগ্যতাও যাদের নেই। ভূপতি ঠিক সেই ধরণের মানুষ। এই যে এখানে এসে ফ্ল্যাট ভাড়া করে সংসার পেতে বসেছিল কঙ্কা, সে বলতে গেলে তার নিজের চেষ্টাতেই।

নিজেই একদিন বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিল।

বাড়িওয়ালা বলেছিল—ষাট টাকার কমে আমি দিতে পারবো না—

অন্তত তখন পর্যন্ত ষাট টাকার কমে কেউ ফ্ল্যাটই পায়নি ও-বাড়িতে। আর দামও ওঠবার দিকে। সেই ষাট টাকা দর ওপরে উঠতে উঠতে আজ আড়াইশো টাকা

পর্যন্ত উঠেছে। কিন্তু সেদিন কঙ্কাবতী যে কীভাবে পঞ্চাশ টাকায় সেই ফ্লাট ভাড়া করে একেবারে রসিদ পর্যন্ত হাতে নিয়ে চলে এসেছিল, তার ইতিহাস কারো জানা নেই। সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো। তখন ভূপতি সামান্য একটা কলেজের মোটামুটি আয়ের প্রফেসার।

বাড়িওয়ালা শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার স্বামী কী করেন?

—তিনি প্রফেসারি করেন, সামান্য মাইনে পান!

—তা তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন না-হয়, আপনি কেন কষ্ট করে এসেছেন?

কঙ্কা বলেছিল—তিনিই যদি এ-সব পারবেন তাহলে আমি মেয়েমানুষ হয়ে আপনার কাছে আসি?

মোটকথা, তারপর থেকেই দেখা গেল ফ্ল্যাটে দামী পর্দা ঝুলছে জানলায়, দরজায় গাড়িও এসে দাঁড়াচ্ছে, চাকর-ঝি-ঠাকুর সবই দেখা যাচ্ছে বাড়ি থেকে ঢুকতে বেরোতে। যে-ভাড়াটে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দেয়, তারই পরনে ক্রেপ্-সিফন্-বেনারসীর ছড়াছড়ি।

পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরাও শুনতে পায় কঙ্কার গলা। কঙ্কাবতী ঠাকুরকে বলছে—ঠাকুর আজকে চপ্-এ কিস্‌মিস্ দিতে ভুলে গেছ তুমি।

বাজার থেকে ফুল কিনে আনেনি বলে একটা চাকরই বরখাস্ত হয়ে গেল একদিন। ধোপা কাপড়ে নীল কম দিয়েছিল বলে সে ধোপাই বাতিল হয়ে গেল রাতারাতি। আবার হারমোনিয়মটা টিউন্ করতে দিয়েছিল একটা দোকানে সেটা ভালো পছন্দমত টিউন্ হয়নি বলে দশ টাকা কম দিয়ে দোকানদারকে বিদায় করে দিলে।

রতনবাবু বলেছিলেন—আমরা পাশের ফ্লাটে থাকতুম কিনা, তাই সবই টের পেতাম—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—তা এত টাকা কোত্থেকে আসতো? স্বামী কত মাইনে পেতো?

দেখছি সব সময় টাকাটাই আসল নয়। গুছিয়ে খরচ করতে পারলে সংসারে অনেক ভালভাবেই থাকা যায়। একটু পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি করে থাকবার ইচ্ছে থাকলে থাকা সম্ভব—তার জন্যে টাকার বেশি দরকার হয় না। কঙ্কাবতী হয়ত সেই ধরনেরই স্ত্রী। ভূপতিবাবুর ভাগ্য ভালো ছিল। ঠিক সকাল সাতটায় চা আসতো, বেলা দশটায় ভাত আসতো। কোথা থেকে অল্প মাইনেতে কুলিয়ে যেত সব ভূপতিবাবু তা বুঝতে পারতেন না।

রতনবাবুর কাছে গল্পটা শোনবার পর থেকেই বার-বার বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখতুম। এখন আর সেই ভূপতি সরকার নেই, সেই কঙ্কাবতী সরকারও নেই। জানালার সেই পর্দা নেই, রাস্তার সামনে গাড়িও দাঁড়িয়ে থাকে না। এখন ও-ফ্ল্যাট্‌টা যারা ভাড়া নিয়েছে তারা হয়ত তেমন সৌখীন লোকও নয়। ছেঁড়া গেঞ্জি, ময়লা লুঙ্গি শুকোতে দেয় তারা। সেই বাহারি ফুলগাছের টবগুলোও নেই আর। কঙ্কাবতীরা যাবার সময় সব নিয়ে চলে গেছে। ফ্ল্যাট্‌টার সমস্ত বাহার উপ্‌ড়ে নিয়ে চলে গেছে।

আমি রতনবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কোথায় গেছে তারা ?

রতনবাবু সবই জানেন। ভূপতি সরকার আর কঙ্কাবতী সরকারের নাড়ী-নক্ষত্র সমস্ত কিছুই জানেন। আসলে রতনবাবু না হলে আমি এ-গল্প লিখতেই পারতুম না।

মাঝে মাঝে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ নাকি আনন্দ-উৎসবে মুখর হয়ে উঠতো কঙ্কাবতীর সংসারটা।

রতনবাবু বললেন—আপনি ভাববেন না আমি দূর থেকেই ওদের দেখেছি, কাছে গিয়ে নিজের লোকের মতই হয়ে গিয়েছিলুম একেবারে। কঙ্কাবতী সরকারের একটা গুণ ছিল, পরকে বড় শিগ্‌গির আপন করে নিতে পারতেন—

মাঝে-মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন মিসেস সরকার। আমি যেতেই বলতেন—কেমন আছেন ?

আমি কেমন আছি এ-খবরটা জানবার আগ্রহ যদি কারো থাকে তো আপনি তার ওপর আকৃষ্ট না হয়ে পারেন ? কেবল আপনার মনে হবে তাহলে আপনার ভাল-মন্দ ভাববার একজন লোকও আছে পৃথিবীতে !

বলতাম—খারাপ থাকলে নিশ্চয়ই খবর পেতেন—

কঙ্কাবতী সরকার বলতেন—তাই তো ভাবছিলুম খুব, অনেক দিন আসেন নি, খারাপ লাগছিল খুব—

পৃথিবীর সকলের জন্যেই কঙ্কাবতী সরকার ভাবতেন খুব।

তাই শুধু আমি একলাই নয়, অনেক ভক্ত জুটে গিয়েছিল কঙ্কাবতী সরকারের। এক-এক করে অনেক লোকই আমার মত এসে জুটতো কঙ্কাবতী সরকারের আসরে। ঘন-ঘন চা আসতো, বিস্কুট আসতো, সিগারেট আসতো। আমরা সবাই কঙ্কাবতী সরকারের রূপের প্রশংসা করতাম, তার রুচির প্রশংসা করতাম, তারপর আসর ভেঙে যাবার পর আবার সবাই যে-যার বাড়ি চলে আসতাম।

আমাদের সকলের সংসারেই দুঃখ-দারিদ্র্য-বিড়ম্বনা-অভাব-অনটন সমস্ত কিছুই

ছিল। আমরা সকলেই তখন প্রায় সামান্য অবস্থার মানুষ। কেউ চাকরি করি, কেউ বেকার, কেউ কমিশন্-এজেন্ট্, কেউ বড়লোক বাপের ছেলে। কঙ্কাবতী সরকার কলকাতা সহরে না থাকলে আমরা যে কে কোথায় থাকতাম বলা যায় না। হয়ত রাস্তার ফুটপাথে নয় তো চায়ের দোকানেই আশ্রয় নিতে হতো। এক কাপ চা নিয়েই সন্ধ্যে কাবার করে দিতে হতো সেখানে। কঙ্কাবতী সরকারের আসরে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। আমরা দিনে-দিনে দলে ভারি হয়ে উঠলাম। কঙ্কাবতী সরকারের বাড়ির আসর জম-জমাট্ হয়ে উঠলো।

একদিন রমেন আমাকে চুপি-চুপি বললে—ভাই আমি আর এখানে আসবো না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। রমেন আমার অনেক আগের লোক। আমার সঙ্গে মিসেস সরকারের পরিচয় হবার আগেই সে এই দলে এসে ঢুকে পড়েছে।

—না ভাই, আমি বুঝতে পেরেছি মিসেস সরকারের মতলব আলাদা—

জিজ্ঞেস করলাম—কী মতলব্?

রমেন কিছু বললে না। কিন্তু দেখলাম আস্তে আস্তে সে এখানে আসা ছেড়ে দিলে। আমি হাজার প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে কোনও কথা আদায় করতে পারলুম না।

রমেন বলেছিল—আসলে ও একটা কাউয়ার্ড—

—কে? কার কথা বলছিস?

—ওই ভূপতিবাবু, খুব ভাল মানুষ সেজে থাকে, বই নিয়ে লেখা-পড়া করে, কিন্তু দেখবি, একদিন এ-সব আড্ডা-টাড্ডা সব উঠে যাবে, কিছ্ছু থাকবে না—

রমেনের কথায় সেদিন হেসেছিলাম। কিন্তু তখনও কি জানতুম যে আমার জন্যে আরো অনেক বিস্ময় জমা হয়ে রয়েছে?

সে এক অদ্ভুত যুগ কলকাতা সহরের ইতিহাসে। চালের দাম বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের দাম কমছে। কমতে কমতে মানুষের আত্মা রাস্তার ফুটপাথে এসে নেমেছে। সংসারের স্টক্-এক্সচেঞ্জের বাজারে মানুষের দাম জিরোয় এসে দাঁড়িয়েছে। চৌরঙ্গীর অন্ধকার গলির মোড়ে-মোড়ে সস্তায় মানুষ বিক্রী হতে সুরু করেছে—টাকায় একজোড়া। টাকা দিয়ে তখন সমস্ত কলকাতা সহরের মানুষগুলোকেই কিনে ফেলা যায়। ভেবেছিলাম কঙ্কাবতী সরকারের সংসার বুঝি সে-ছোঁয়াচ থেকে বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু না, আমার ধারণা ভুল। আমার ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ পেলাম দু'দিন পরেই।

হঠাৎ একদিন কঙ্কাবতী সরকার আমার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত শ্রদ্ধা একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলেন।

বললেন—একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে রতন—

তখন সবাই চলে গিয়েছে। কঙ্কাবতী সরকারের গলার স্বরটা হঠাৎ অন্যরকম শোনালো।

বললাম—কী বলুন ?

কঙ্কাবতী বললেন—একটা কাজ করতে হবে তোমাকে, আমার এই সোনার বালাটা কোথাও কারো কাছে রেখে কিছু টাকা এনে দিতে হবে—

এ আর এমন কি শক্ত কাজ ! বোধ হয় টাকার খুব জরুরী দরকার হয়ে পড়েছে ! এমন সকলেরই হয়। তাড়াতাড়ি সেই রাত্রেই বেরোলাম কঙ্কাবতী সরকারের সোনার বালাটা নিয়ে। অত রাত্রে কোথায় দোকান খোলা পাবো। কিন্তু টাকাটা জরুরী দরকার। সব জায়গায় ঘুরলুম। সব দোকান বন্ধ। কিন্তু বালাটা শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতে কেমন বাধলো। বহুদিনের পুরোন এক বন্ধুর কথা মনে পড়লো। সোনা-রূপোর দোকান আছে তাদের। সেই অত রাত্রে তার কাছেই গেলাম। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। সে বললে—আচ্ছা দেখি বালাটা—

বালাটা নিয়ে পরীক্ষা করলে, বললে—এ তো গিল্টী—

বললাম—ভাই, তা কখনও হতে পারে না—তুমি ভালো করে দেখ—

তারা বংশ-পরম্পায় সোনার ব্যবসা করছে। সোনা তারা দেখলেই চিনতে পারে। বললে—টাকা ধার চাও, তা দিতে পারি, কিন্তু এ আমি রাখবো না—

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। বালাটা নিজের কাছে রেখে তিনশো টাকা দিলাম কঙ্কাবতী সরকারের হাতে।

কঙ্কাবতী সরকার যে কী খুশী হলেন বলা যায় না।

বললেন—তিন শো ? তা দরকারের সময় তিন শো, তিন শোই সই, কিনেছিলুম পাঁচশো টাকায়—

আমি কিছু বললাম না। আমার মুখ দেখে তিনি কী ভাবলেন কে জানে।

বললেন—কালকেই তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেব বুঝলে ? তুমি আজ আমার এখানে খেয়ে যাও—

আমি তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

—খাও না, আজকে চিকেন করেছিলাম, স্টু, তোমার কোনও ভয় নেই, আমি বেশি মশলা দিয়ে রান্না করি না—

তারপরে মিসেস সরকারের বোধহয় সে-টাকার কথা আর কোনও দিন মনেই পড়েনি, কিম্বা সোনার বালাটার প্রয়োজনও হয়নি। ও-কথা আর কোনও দিন উত্থাপনই করেন নি তিনি। আমিও তুলিনি। আমার বন্ধুর দেনা আমি আমার নিজের পকেট থেকেই শোধ করে দিয়েছিলাম আস্তে আস্তে।

সোনার বালাটার সূত্র ধরেই একদিন আমার সঙ্গে কঙ্কাবতী সরকারের সম্পর্কের দেয়ালে ফাটল ধরল। শুধু রমেন নয়, দেখলাম আরো অনেকেই কঙ্কাবতী সরকারের আড্ডায় আসা কমিয়ে দিলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের পুরোন দল ভেঙে যেতে লাগলো। তখন আবার কোথায় থেকে সব নতুন লোক আসতে সুরু হলো। আগে তাদের কখনও দেখিনি। দু দিনেই তারা একেবারে আত্মীয় হয়ে উঠলো। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। আমরা যে এতদিনের পুরোন, তবু আমাদের চেয়েও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো তারাই। তাদের কেউ-কেউ আসতো গাড়ি নিয়ে। গাড়িতে করে কঙ্কাবতী সরকার, কঙ্কাবতী সরকারের দুই ছোট-ছোট মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে যেত তারা।

তারপর থেকেই আমি যেন পেছিয়ে পড়তে লাগলাম। তারা যেন আমাকে হটিয়ে দিলে।

তাদের সকলের মধ্যে আবার মিস্টার সান্যালের প্রতিপত্তিটা সকলের চেয়ে বেড়ে উঠলো।

মিস্টার সান্যাল যে কোথা থেকে কেমন করে কোন্ সূত্রে এসে জুটলো তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু একেবারে রাতারাতি ঘরের লোক হয়ে এল।

মিস্টার সান্যাল বললে—ভূপতিবাবুর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না মিসেস সরকার?

কঙ্কাবতী সরকার বললেন—তিনি বেশি ভিড়-টিড় পছন্দ করেন না—তিনি একলাই নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকতে ভালবাসেন—

—নিজের কাজকর্ম কী?

—বসে বসে বই লেখেন!

—কী বই?

কঙ্কাবতী সরকার বললেন—রিসার্চ প্রবন্ধ—নানারকম গবেষণার লেখা—

মিস্টার সান্যাল লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—ভেরি গুড্, ভেরি গুড্—আমি এক মিনিট তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো মিসেস সরকার, বেশি সময় নষ্ট করবো না—

শেষ পর্যন্ত কঙ্কাবতী সরকার আলাপ করিয়ে দিলেন—ইনি হলেন পাব্লিসিটি ব্যুরোর চীফ, আর্টিস্ট, মিস্টার সান্যাল—

ভূপতি সরকার সাচ্চা ভদ্রলোক। হাসলেন একটু। বললেন—কোনও কাজ নেই তো আমার, তাই একটু লেখা-পড়ার চর্চা করে থাকি—

—খুব ভালো, খুব ভালো মিস্টার সরকার, আমাদের দেশে লেখা-পড়ার চর্চা তো ক্রমেই কমে যাচ্ছে, একুডিশন্ কারো নেই, লেখা-পড়া এখন প্রায় কমার্স হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা এ-সব বই আপনি ছাপেন না কেন?

ভূপতি সরকার বললেন—ছাপার জন্যে তো ঠিক লিখি না, আর ছাপবেই বা কে? আমার তো কারোর সঙ্গে জানা-শোনা নেই—

—আমার সঙ্গে কত পাব্লিশারের জানা-শোনা আছে, আমাকে দিন, আমি ছাপিয়ে দিতে পারি—

এর পর থেকে মিস্টার সান্যাল এ-বাড়ির একেবারে গার্জেন হয়ে গেল। কঙ্কাবতী সরকারের মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হবে। কে ভর্তি করে দেবে? মিস্টার সান্যাল আছে। কঙ্কাবতী সরকারের স্বাস্থ্য খারাপ, ডাক্তার বলেছে চেঞ্জে যেতে। কিন্তু চেঞ্জে গেলে সংসার দেখা শোনা করবে কে? সব ব্যবস্থাই করে দিলে মিস্টার সান্যাল। নিজে মিসেস সরকার আর মিসেস সরকারের মেয়েদের নিয়ে ওয়ালটেয়ারে চলে গেল। কলকাতার সংসার দেখা-শোনা করবার জন্যেও পাকা বন্দোবস্ত করে দিলে। ভূপতি সরকারের যেন কোনও অসুবিধে না হয়। খাওয়া-দাওয়া-কলেজে যাওয়ার কোনও ত্রুটি না হয়।

হঠাৎ যেন মিস্টার সান্যালের মাথায় বুদ্ধিটা এল। বললে—আপনি টেলিফোন নেন্ নি কেন?

কঙ্কাবতী সরকার বললেন—ওতে অনেক খরচ, কে চালাবে?

মিস্টার সান্যাল বললে—সে কি? এই আপনি চেঞ্জে যাচ্ছেন, এখন টেলিফোন থাকলে সেখান থেকে রোজ টেলিফোন করা যেত, নইলে মিস্টার সরকারের জন্যে আপনার সেখানে গিয়েও তো ভাবনার শেষ থাকবে না—

তা আশ্চর্য ক্ষমতা সত্যি মিস্টার সান্যালের। যে টেলিফোন তিন চার বছর চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না, সেই টেলিফোনই দু'দিনের মধ্যে এসে গেল। সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ওয়ালটেয়ারে চলে গেল। সেখান থেকে রোজ রাত্রে টেলিফোন করতেন কঙ্কাবতী সরকার। রোজ জিজ্ঞেস করতেন—তোমার খাওয়া-দাওয়া ঠিক চলছে তো?

ভূপতি সরকার বলতেন—হ্যাঁ,—

—রোজ এক পো করে দুধ খাচ্ছো তো?

—এ মাসের ইন্সিওরেন্স্ প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে?

—রাত্তিরে পাখা চালিয়ে শুও না যেন, আবার সেইরকম ঠাণ্ডা লাগবে, খুব সাবধান—

যেন ওয়ালটেয়ারে গিয়েও কঙ্কাবতী সরকারের স্বস্তি নেই এতটুকু। একবার করে খবর না নিলে যেন তিনি ওয়ালটেয়ারে গিয়েও শান্তি পাচ্ছেন না। আমি যেতাম ভূপতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। দেখতাম তিনি নিজের লেখা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেন। বলতেন—দাঁড়াও, দুধটা খেয়ে আসি, নইলে বকুনি খেতে হবে—

আবার একদিন সদলবলে ফিরে আসতেন কঙ্কাবতী সরকার। এসেই সমস্ত সংসার নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন। একটু ক'দিনের জন্যে বাইরে গেছেন আর সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে। আবার তিনি কোমর বেঁধে লেগে যেতেন গুছোতে।

এবার কিন্তু মিস্টার সান্যাল আর ছাড়লে না। ভূপতি সরকারের প্রবন্ধগুলো পড়ে ফেলেছে।

এবার একেবারে হুড়মুড় করে ভূপতি সরকারের ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—কী কাণ্ড করেছেন আপনি?

—কেন?

—আপনি এত বড় একটা জিনিয়াস, আর একটা কলেজের মাস্টারি নিয়ে এনার্জি নষ্ট করছেন? আপনি চাকরি ছেড়ে দিন—

পাশেই কঙ্কাবতী সরকার ছিলেন। তিনি বললেন—বা রে, চাকরি ছাড়লে আমরা খাবো কী?

মিস্টার সান্যাল বললে—মিস্টার সরকারের যা প্রতিভা তাতে বাঙলা দেশই একদিন খাওয়াবে—

—কী করে? বাঙলা দেশ কি এত উদার 'বলে আপনি মনে করেন মিস্টার সান্যাল? এটা তো ঝগড়া-ঝাঁটির দেশ—

মিস্টার সান্যাল বললে—বাঙলা দেশ না খাওয়ায় তো আমি আছি। আমি খাওয়াবো।

—আপনি খাওয়াবেন কী করে?

মিস্টার সান্যাল বললে—আমি মিস্টার সরকারের সমস্ত বই পাব্লিশ্ করবো, দেখি বাঙলা দেশ ভালো জিনিষের কদর করে কি না, বাঙলা দেশ সম্বন্ধে আমি এখনও আস্থা হারাই নি মিসেস সরকার—আমি দেখিয়ে দেব বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাত নয়, বাঙালী গুণের কদর করতে জানে—

মিস্টার সান্যালের যে রকম কথা সেই রকমই কাজ।

অর্থাৎ সেইদিন থেকেই তিনি কাজে লেগে গেলেন। বড় বড় করে সাইনবোর্ড পড়লো ওই বাড়িটার সামনে। পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা। সব ক্যাপিট্যাল মিস্টার সান্যালের। মিস্টার সান্যাল নিজেই নিজের গাড়ী করে কলেজ স্ট্রীটে বই দিয়ে আসেন দোকানে দোকানে। নিজেই স্টাফ্ রেখেছেন প্রুফ দেখতে, বই ছাপাতে, বই বাঁধাতে। ভূপতি সরকারের সারা জীবনের জ্ঞান সারা বাঙলাদেশকে জানিয়ে দেওয়া চাই।

কঙ্কাবতী সরকারও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। বললেন—এ কীসের টাকা?

—এই রয়্যালটির টাকা!

—এত?

সাত হাজার টাকা। এক বছরে শুধু বই বিক্রির রয়্যালটি বাবদ ভূপতি সরকারের প্রাপ্য হয়েছে সাত হাজার টাকা! তাও এখনও অনেক বই ছাপতে বাকি আছে। বাঙলাদেশ জানুক কত বড় একজন গুণী তাদের কলকাতা সহরেই বাস করছে। বাঙলাদেশের চোখ খুলুক।

মিস্টার সান্যাল বললে—এবার আপনি চাকরী ছেড়ে দিন মিস্টার সরকার—

এবার আর কঙ্কাবতী সরকারও আপত্তি করতে পারলেন না।

ভূপতি সরকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে পাকাপাকি বসলেন বাড়িতে। পাকাপাকিভাবে গবেষণা করতে লাগলেন। কলেজের মাস্টারি করে বড় জোর তিন-শো চার-শো টাকা আসবে। কিন্তু এবার নিজের রয়্যালটির টাকাতেই সংসার চালাবেন তিনি। একেবারে পুরোপুরি স্বাধীন। এবার মিস্টার সান্যাল সব ভার তুলে নিয়েছেন নিজের ঘাড়ে। কোথা থেকে চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা আসবে তা আর দেখবার দরকার নেই কারো। কোম্পানীর ব্যালেন্স্-শীট মিলিয়ে ডেবিট-ক্রেডিট মিলিয়ে প্রতি বছর প্রফিটটা তুলে দিতে লাগলো মিস্টার সান্যাল। তুলে দিতে লাগলো কঙ্কাবতী সরকারের হাতে! আসলে সেই তখন থেকেই দেখলাম সংসারের সচ্ছলতা বেড়েছে। আগে আড়াই টাকা পাউণ্ডের চা আসতো, পরে সাড়ে চার টাকা পাউণ্ডের চা আসতে লাগলো। কঙ্কাবতী সরকারের সব ঘরে পাখা ছিল না। তখন থেকে ঘরে-ঘরে পাখা ঝুলতে লাগলো।

মিস্টার সান্যাল স্ট্রীক্ট্ অর্ডার দিয়ে দিলে—মিস্টার সরকারকে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না, তাঁকে একলা থাকতে দিতে হবে, তাঁকে বিশ্রাম দিতে হবে, সংসারের ঘূর্ণিপাকের খবর কানে গেলে তাঁর ধ্যান ভেঙে যাবে, তাঁর প্রতিভা নষ্ট হবে—

সেই হলো সূত্রপাত !

আমাদের দল আগেই ভেঙে গিয়েছিল। নতুন যে দল এসেছিল তারাও তখন পাতলা হয়ে গেছে। মিস্টার সান্যাল তখন সকলকে ছাপিয়ে একচ্ছত্র হয়ে উঠেছে। উঠতে-বসতে মিস্টার সান্যাল। সারা দিনের মধ্যে প্রথম একবার আসে ভোরবেলা। এসে এখানেই চা খায়। ঘণ্টাখানেক বড় জোর থাকে। কিন্তু সারাদিনের সংসার-চালনার সব রসদটুকু ওই সময়ের মধ্যেই দিয়ে চলে যায়। তারপর তার নিজের কাজ।

সকালবেলা এসেই তাকে পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। মেয়েদের প্রাইভেট টিউটারদের মাসকাবারি মাইনে, দুধের হিসেব, ধোপার বিল, সংসার-খরচের অনাবশ্যক অনিবার্যতা।

যার যা পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে মিস্টার সান্যাল চা খেয়ে -চলে যেত। আসতো আবার সেই রাত্রে। সেই রাত আটটার সময়। গাড়িখানা এসে দাঁড়াতো নিচের ফুটপাথের গা ঘেঁষে। আমরা গাড়ি দেখেই বুঝতে পারতাম মিষ্টার সান্যাল এসে হাজির হয়েছে। তার পর দেখতাম কোনও দিন রাত দশটা, কোনও দিন রাত এগারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো গাড়ীটা। রাস্তাটা আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে যেত। কঙ্কাবতী সরকারের বাড়ির বাইরের দিকের আলোও নিবে আসতো, তখনও গাড়িটা ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। কখন কত রাত্রে ক'টার সময় মিস্টার সান্যাল চলে যেত তা আর টের পেতাম না।

এমনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

কচিৎ কদাচিৎ রাত্রে যখন কঙ্কাবতী সরকারের বাড়িতে যেতাম, দেখতাম তিনি যেন বদ্‌লে গিয়েছেন। তাঁর চেহারাটাও যেন বদ্‌লে গিয়েছে। তিনি যেন একটু মোটা হয়ে গিয়েছেন। ভূপতি সরকারও বেশ মোটা হয়ে গিয়েছেন সারাদিন বসে থেকে থেকে। মেয়ে দুটিও তখন বড় হয়েছে। স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠেছে।

কঙ্কাবতী সরকার বলতেন—ওদের বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করা দরকার মিস্টার সান্যাল—

মিস্টার সান্যাল বলতো—তাড়াতাড়ির কী আছে ?

—কিন্তু ওরা তো বড় হচ্ছে—

—কিন্তু আমি তো আছি—

ওদিকে পাব্‌লিকেশন, আর একদিকে দুই মেয়ের বিয়ে, আর এই প্রকাণ্ড সংসার। মিস্টার সান্যাল যেন অকূলের কাণ্ডারী হয়ে এসেছিল। এখানে কবে

একদিন কোন্ সূত্রে কোথায় কঙ্কাবতী সরকারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে একেবারে জালে জড়িয়ে গিয়েছিল। আমি দেখতাম মিস্টার সান্যালও যেন আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ভারি হয়ে যাচ্ছে। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো পাতলা হয়ে আসছে।

তবু মিস্টার সান্যাল তখনও কলেজ স্ট্রীটের দোকানে-দোকানে গিয়ে ভূপতি সরকারের বই গছিয়ে দিয়ে আসে। তারা আপত্তি করে, বলে—না স্যার, যেগুলো দিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলোই এখনও বিক্রি হয় নি, ওই দেখুন, গাদা হয়ে পড়ে আছে—

মিস্টার সান্যাল বলতো—আপনারা একটু পুশ্ করুন না, খদ্দেরকে বুঝিয়ে বলুন, ভাল জিনিস তারা তো পায় না—ভালো জিনিস পেলে কেন নেবে না—

—না মশাই, বই নিয়ে যান আপনি, আমাদের অত বই রাখারার জায়গা নেই—

—সামনে লাইব্রেরী-সিজন্ আসছে, দেখুন না চেষ্টা করে—

তারা বলতো—দরকার হলে আমরা নিজেরাই চেয়ে পাঠাবো—আপনাকে আর পয়সা খরচ করে এতদূর আসতে হবে না—

কঙ্কাবতী সরকারও একদিন টের পেলেন। দেখলেন মিস্টার সান্যাল যেন টাকার ব্যাপারে একটু টানাটানি সুরু করেছে।

একদিন জিজ্ঞেস করলেন—ওঁর বই কী রকম বিক্রী হচ্ছে?

মিস্টার সান্যাল বললে—খুব ভালো, দোকানদারেরা কেবল বই চেয়ে পাঠাচ্ছে, আমি সাপ্লাই করে উঠতে পারছি না—

—কিন্তু তাহলে এ কোয়ার্টারের রয়্যালটির হিসেবটা তো এখনও পাই নি?

—আমার অডিটারের অসুখ, তাই একটু দেরি হচ্ছে, হিসেবটা হয়ে গেলেই টাকাটা দিয়ে দেব—

কঙ্কাবতী সরকার বললেন—আগে কিন্তু আপনার এরকম দেরি হতো না—

মিস্টার সান্যাল কঙ্কাবতী সরকারের মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলো, এমন করে তো কখনও কথা বলেননি মিসেস সরকার।

—তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছো?

কঙ্কাবতী সরকার বললেন—সন্দেহ করার কথা নয়, কিন্তু সংসার তো আমাকেই চালাতে হয়, তাই বললাম—

মিস্টার সান্যাল বললে—তোমার সংসার তুমি চালিয়েছ না আমি চালিয়েছি?

কঙ্কাবতী সরকার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আপনি আর আসবেন না এখানে!

—তুমি রাগ করলে ?

—মান-অভিমানের কথা নয়। আমি যা বলছি তাই করুন—

—কিন্তু আমি চলে গেলেই কি তোমার সংসার বেশি ভালো করে চলবে ?

আমি আমার ফ্ল্যাটের বাথরুম থেকে সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। আমিও চমকে উঠলাম।

মিস্টার সান্যাল আবার বললে—এত বছর ধরে যে-করে সব চালিয়ে এসেছি তার জন্যে তো তোমার কোনও কৃতজ্ঞতাও নেই!

—কিন্তু তার জন্যে আপনি তো অনেক কিছুই উশুল করে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে!

—ছিঃ, অত চেঁচিও না, ওরা হয়ত এখনও জেগে আছে!

কঙ্কাবতী সরকার তবু যেন মরীয়া হয়ে উঠলেন। বললেন—ওরা সব জানে, ওদের বয়েস হয়েছে,—

—তুমি ওদের মা হয়ে এই কথা বলছ ? তোমার লজ্জাও হচ্ছে না ?

কঙ্কাবতী সরকার বললেন—লজ্জা থাকলে কি আর আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতুম ?

মিস্টার সান্যাল বললে—এতখানি অকৃতজ্ঞতা কিন্তু আমি আশা করিনি কারো কাছ থেকে—

—আমার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করবেন না। আমার মতন কে এমন করে দিনের পর দিন মেয়ে স্বামীর সামনে বাইরের লোকের সঙ্গে ফ্লার্ট করেছে ?

মিস্টার সান্যালের বোধ হয় আর সহ্য হলো না। এ কথার কোনও জবাব না খুঁজে পেয়ে যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারপর অনেকক্ষণ পরে বললে—এত বছরে কত টাকা আমার লোকসান গেছে তার হিসেব দেব ?

—লোকসানের হিসেব তো আমিও দিতে পারি—

—কিন্তু শুধুই কি লোকসান হয়েছে তোমার ? কিছুই লাভ করো নি ?

—লাভ ? লাভ করেছি দুর্নাম। দুর্নামে পাড়ার লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না। এখানে আমার বাড়িতে আগে অনেক লোক আসতো, আজ সবাই আসা ছেড়ে দিয়েছে, এই আমার লাভ! মেয়েদের বিয়ে দিতে পারিনি ভালো পাত্রের অভাবে, এই আমার লাভ!

মিস্টার সান্যাল বললে—এর জন্যেও কি আমিই দায়ী ?

—দায়ী আমি কাউকেই করতে চাই না আজ! একদিন আমার অভাব-অনটনের দিনে যারা যারা আমাকে সাহায্য করেছিল, বলতে গেলে তারা সবাই দায়ী!

—কিন্তু অভাব-অনটন তো তোমার নিজেরই সৃষ্টি!

—নিজেরই না হয় সৃষ্টি! কিন্তু কেন আমি ভাল বাড়িতে থাকতে পাবো না অন্য লোকের মত, কেন আমি ভালো খেতে পরতে পাবো না অন্য লোকের মত? আমি তো দেশের লোক, এই সমাজের মানুষ তো আমিও! আমি কি সত্যিই অন্যায় করেছি কিছু? সমাজের দেশের গভর্ণমেণ্টের কোনও দোষ নেই?

আমি শুনতে পেলাম কথাগুলো বলতে বলতে কঙ্কাবতী সরকারের গলা যেন ধরে এল। মনে হলো তিনি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

—আপনি ছ'মাস একটা পয়সা দেন নি, মেয়েদের কলেজের মাইনে বাকি পড়েছে, মাইনে না পেয়ে দুটো চাকর চলে গেছে, মাছ আসছে না আজ তিন মাস, আমি মা হয়ে তো এসব দেখছি! আর আমারই কি মুখ ফুটে এ-সব কথা বলতে ভাল লাগছে মনে করেন?

মিস্টার সান্যাল বললে—আর তুমি যদি জানতে যে আমার কী বিপদ চলছে, তা হলে এত কথা বলতে তোমার সত্যিই বাধতো! আজ দুবছর হলো আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে, আমার চাকরী গেছে, আমার বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন্ হয়ে গেছে! আমি যে এখনও আসি এখানে তা কেবল একটু শান্তির জন্যে! সেই শান্তিটুকুই আজ চলে গেল—

কথাগুলো বলার পর অনেকক্ষণ চুপ-চাপ! কোনও আওয়াজ পেলাম না। রাত অনেক হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে কঙ্কাবতী সরকারের গলা শোনা গেল—তার চেয়ে আপনি আর এখানে আসবেন না—

—কিন্তু এখানে না এসে কোথায় যাব? কোথায় যাবার জায়গা আছে আমার? আমার যে কোন জায়গা নেই যাবার। সারাদিন টাকার চেষ্টায় ঘুরি, বাড়ীতে শান্তি নেই, তোমার এখানে আসাও ঘুচে গেল, আমি কী করি?

কঙ্কাবতী সরকার যেন অনুকম্পায় নরম হয়ে এলেন। বললেন—আপনি আমায় ভুলে যেতে চেষ্টা করুন—

মিস্টার সান্যাল বললে—পারলে সে ভালোই হতো! কিন্তু পারবো না যে—

—আপনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন! এবার আমি অন্য ব্যবস্থার চেষ্টা

দেখি! ভাবছি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে গিয়ে নতুন করে আবার জীবন আরম্ভ করি—

—তুমি হয়ত পারবে! কিন্তু আমি?

—আপনিও চেষ্টা করুন, নিশ্চয়ই পারবেন! আপনার ক্ষতির জন্যে আমার যদি কিছু করবার থাকতো তো করতাম! আমি ওঁর চাকরির জন্যে চারিদিকে অ্যাপ্লিকেশন্ করেছি, যদি হয়ে যায় তো আপনাকে রেহাই দিয়ে যাবো!

মিস্টার সান্যাল বললে—শেষ পর্যন্ত এই একটা আশ্রয়ই ছিল আমার, দেখছি সেও গেল—

—বলুন, আমি যা বললুম তাই করবেন?

—কী?

—কাল থেকে আর আসবেন না! যে কদিন চাকরি না পান উনি, সে ক'দিন আমার গয়না কটা বেচে চালাবো! দয়া করে আপনি আর আসবেন না এখানে! ইচ্ছে করলেও আসবেন না—

মিস্টার সান্যালের যেন তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

—যান, অনেক রাত হয়ে গেছে।

বলে কঙ্কাবতী সরকার বোধ হয় মিস্টার সান্যালের হাত ধরে তুললেন। বললেন—আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছি এ চলতে দেওয়া উচিত নয়, আমার বয়েস হয়ে গেছে অনেক, এবার অন্যভাবে জীবন চালাতে হবে। কলকাতা সহর থেকে চলে যেতে পারলেই বোধ হয় ভালো হতো। কলকাতা থেকে না চলে গেলে হয়ত নিজেকে বদলানো শক্ত হবে! কিন্তু তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, আপনি উঠুন এবার, যান—

—কিন্তু কোথায় যাবো?

কঙ্কাবতী সরকার এবার রেগে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন—যেখানে খুসী যান্, যাহান্নমে যান্, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? যান্—

আর তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেবার শব্দ হলো।

বুঝলাম, মিস্টার সান্যালকে কঙ্কাবতী সরকার বাইরে বার করে দিয়েছেন। সেই অন্ধকার মাঝ রাত্রে বার কয়েক নাম ধরে ডাকলো মিস্টার সান্যাল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আমি এতদিন ধরে এই পরিণতিটুকুর জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলুম। আমার যেন আশা মিটলো!

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

রতনবাবু বললেন—কলকাতা সহরের এই ফ্যামিলিরই ইতিহাস আপনাকে বললাম। এ-সব ফ্যামিলি আসলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত। এদেরই আমরা বেশির ভাগ দেখি রাস্তায় ট্রামে মার্কেটে। এদের ঐশ্বর্য দেখে আমরা হিংসে করি। এরাই আমাদের চোখের সামনে আট টাকা সেরের মাছ ছোঁ মেরে কিনে নিয়ে যায়। এরাই গানের জলসায় পঁচিশ টাকার টিকিট কিনে গান শোনে, এরাই টেস্ট্ ম্যাচে পঞ্চাশ টাকার সিজন্ টিকিট কিনে ক্রিকেট খেলা দেখে, এরাই পুজোর ছুটিতে মুসৌরি দার্জিলিং-এ বেড়াতে যায়। আগে এদের চিনতাম না। কঙ্কাবতী সরকারকেই প্রথম দেখি। তারপর বিয়ে করেছি, আমারও সংসার হয়েছে। এখন কঙ্কাবতী সরকারে কলকাতা সহর ছেয়ে গেছে। হাজার হাজার কঙ্কাবতী সরকার চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

—কিন্তু তারপর কী হলো বলুন ?

—তারপর তো আর কিছু নেই, তারপর রোজ মিস্টার সান্যাল সকালে এসেছে, রাত্রে এসেছে, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পায়নি! সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দরজা ঠেলেছে কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এসেছে। বর্ষা গ্রীষ্ম শীত সব মাথার ওপর দিয়ে কেটে গেছে। এখন টাক পড়ে গেছে মাথায়। মাংস ঝুলে গেছে শরীরের। আগে সকালে রাত্রে দুবারই আসতো। এখন বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সামর্থ্য কমে গেছে, শুধু রাত্রে আসে। রাত আটটার সময়—

—আর কঙ্কাবতী সরকার ?

—কঙ্কাবতী সরকার দু'এক মাস পরেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। অন্য এক ভাড়াটে এসে ঢুকলো আবার আমার পাশের ফ্ল্যাটে। শুনেছি ভূপতি সরকার নাকি পাটনা ইউনিভার্সিটিতে ভাল চাকরি পেয়েছেন। বারো শো টাকা মাইনে। ভাল-ভাল বই লিখেছিলেন একদিন। তার যোগ্য সমাদর হয়েছে এতদিনে। তবে সবই শোনা কথা। আমি পাটনায় কখনও যাইনি! সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। শুনেছি সেখানে মেয়েদেরও ভাল-ভাল জায়গায় বিয়ে হয়েছে। এক মেয়ে বার্লিনে গেছে পড়তে, আর এক মেয়ে আমেরিকায়।

বললাম—কঙ্কাবতী সরকারেরই কিন্তু আসল দোষ !

রতনবাবু বললেন—দোষ-গুণ বিচার করতে যাবেন না। ফরমুলা দিয়ে জীবনকে বিচার করা যায় না। ও আমি অনেকবার ভুল করেছি। শুধু ওই মিস্টার সান্যালের কথা ভেবেই কষ্ট পাই। স্ত্রী সেই পাগলা গারদে। একটা নাকি মেয়ে আছে। সে-ই বাপকে দেখে। তার বিয়েও হয়নি। সারাদিন বাড়িতেই থাকে। কিন্তু

রাত আটটা বাজলেই মনটা ছটফট করে ওঠে। আর কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে পারে না। একটা বাঁধা রিক্সা আছে, সেইটে চেপে এখানে চলে আসে। আগে গাড়ীতে আসতো, এখন রিক্সায় আসে। এখানে এসে ওই একটুখানি দাঁড়ায়, তারপর আবার চলে যায়। দেখবেন, কাল যদি লক্ষ্য করেন, কালকেও রাত আটটার সময় মিস্টার সান্যালকে দেখতে পাবেন। আমি তাই মিস্টার সান্যালের নাম দিয়েছি—'রাত আটটার সাওয়ারী।'

দু'কান কাটা

চুঁচড়োর একটা মাদ্রাসায় সভা হয়েছিল। বক্তৃতা জলযোগ সেরে যখন ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ এক মহিলা আমার রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন।

বললেন—নমস্কার, আপনি হয়ত চিনতে পারবেন না আমাকে—

সত্যিই চিনতে পারলাম না।

বললাম—কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

মহিলাটি বললেন—থাক, আমায় আর চিনে দরকার নেই,—লাভও নেই কিছু—

তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আমি আপনাকে ঠিক চিনেছি, তবে আপনার যে দুটো নাম আছে তা আজ প্রথম জানলাম।

দুটো নাম! আমার তো একটাই নাম। বাপ মায়ের দেওয়া নামটাই তো সর্বত্র ব্যবহার করি! ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটিতে, মাসিক-সাপ্তাহিক, কিম্বা বইতে সেই নামটাই তো লিখি। আর আমার তো কোন ছদ্মনাম নেই যে সে-নামেও লোকে চিনতে পারবে!

মহিলাটি বললেন—আজকে আপনি হয়ত ভুলেই গেছেন সে-সব দিনের কথা, ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক—

বিব্রত হলাম একটু। বললাম—অন্ধকারে হয়ত ঠিক চিনতে পারছি না—

মহিলাটি বললেন—চিনতে না পারলেই তো আপনার সুবিধে—

সভার গেটের কাছে, আশে-পাশে কিছু লোকজন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল এইভাবে কথা বলতে। আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম

রাস্তার দিকে। সভার উদ্যোক্তারা সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই কথা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। গণ্যমান্য ব্যক্তি আমি, দশজনের সামনে হয়ত মহিলাটি কী বলতে কী বলে ফেলবেন কে জানে। চোখের একপাশ দিয়ে লক্ষ্য করলাম মহিলাটি তখনও সঙ্গ ত্যাগ করেনি। মুখ নীচু করে আমাদের সঙ্গেই চলেছেন।

ছু-একজন ছেলেমেয়ে অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। সেই অন্ধকারেই তাদের খাতায় কিছু লিখে দিচ্ছি। আর একটু একটু করে এগোচ্ছি।

এখান থেকে পাশের এক ভদ্রলোকের বাড়িতে জলযোগের আয়োজন হয়েছে। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলাম। জলযোগের সময় অনেকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কেউ সেই সুযোগে সেই পুরোণ প্রশ্নটাই করলে—আপনার সাহেব বিবি গোলামের ঘটনা কি সত্যি ?

একজন জিজ্ঞেস করলে—ভূতনাথ কি এখনও বেঁচে আছে ?

আর একজন বললে—আসলে কোন্ বাড়িটার গল্প আপনি লিখেছেন ? বাড়িটা কোন রাস্তায় ?

লক্ষ লক্ষ বার এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। চিঠির জবাবেও লিখে জানিয়েছি। কিন্তু এখনও যে আরো কতদিন ধরে কত লোককে এর জবাবদিহি করতে হবে কে জানে। ভেবেছিলাম এতক্ষণে বোধ হয় মহিলাটিকে এড়াতে পারবো। কিন্তু রসগোল্লাটা মুখে পুরতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়লো এককোণে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

চোখের দৃষ্টি দেখে ভয় পেলাম, যেন চোখ দিয়ে বলতে চাইছেন—আপনার যে দুটো নাম আছে তা আগে বলেন নি কেন ?

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম, সকলকে বললাম—চলুন—

নিজে বুঝতে পারলাম না কেন এত ভয় করতে লাগলো। অচেনা মহিলা, কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না! সভা আজ ভালোই হয়েছে। ভালো ভালো কথা ভালো করে বলেছি। কোথাও কেউ গোলমাল করেনি। মন দিয়ে শুনেছে সবাই। তবু একজনের জন্যে, একজন মহিলার জন্যে কেমন যেন আতঙ্ক হতে লাগলো। সেই এক মহিলা। আমাকে চিনলেন কী করে! কোনও দিন কোনও সূত্রে তো এঁকে দেখেছি বলে মনে পড়লো না। সারা জীবন তো মহিলাদের সঙ্গ এড়িয়েই চলেছি। অনেক মহিলা দেখা করতে চিঠি দিয়েছেন, অনুরোধ জানিয়েছেন পরিচয় করতে, কিন্তু কোনও দিন তো রাজী হয়নি। বারবার সে অনুরোধ নানা ছুতোয় তো এড়িয়েই গিয়েছি ? তবে ?

জীবনের নানা অবস্থায় আমাকে নানা চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। আমার কোনও খুঁত নেই, আমার কোনও কলঙ্ক নেই, এমন কথা জোর গলায় বলতে পারার জোর অবশ্য আমার নেই আজ। কিন্তু ঠিক জীবনের এই পর্যায়ে সে-খুঁত সে-কলঙ্ক কেউ জানুক এও আমি আর চাই না। যারা আমাকে আগে দেখেছে, অনেক আগে, যখন আমি অখ্যাত অজ্ঞাত ছিলাম, অবাধে যেখানে সেখানে বিচরণ করতাম—তাদের সঙ্গে আজ দেখা হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়। আমার আগেকার অবস্থাটার কথা ভুলে যাক সবাই, আমার বর্তমান অবস্থাটার ওপাশের দৃশ্যের ওপর আমি তো বার বার যবনিকাই টানতে চেয়েছি।

সঙ্গীর দল সঙ্গেই ছিল। আমাকে ঘিরে ছিল তারা। তাদের আবরণের মধ্যে নিজেকে আড়াল করেই চলেছিলাম। একলা থাকতে সত্যিই যেন ভয় করছিল। হঠাৎ চোখটা ফেরাতেই দেখি সেই মহিলাটি! আমার দিকে চেয়ে আছেন।

একজনকে আড়ালে ডেকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম—উনি কে? চেনেন ওঁকে?

ছেলেটি তার দিকে চেয়ে বললে—উনি তো এখানেই থাকেন—সিনেমা হাউসের পাশের বস্তিতে—

—কিন্তু উনি কেন আমাদের সঙ্গে চলেছেন?

ছেলেটি বললে—ওঁর অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেছে। আজকাল··

ছেলেটি আরো কিছু বলবার আগেই রাস্তায় এসে পড়লাম। গাড়ি তৈরী। এই গাড়িটা সোজা কলকাতায় পৌঁছে দেবে আমাকে। থমকে দাঁড়ালাম। আবার যেন ভয় করতে লাগলো। মনে হলো এদের সকলকে চারিদিকে রেখে যেন গাড়িতে উঠে ভালোয় ভালোয় দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারি। তারপর একবার গাড়িটা চলতে আরম্ভ করলে আর ভয় নেই।

কিন্তু হঠাৎ মহিলাটি এবার সকলকে চমকে দিয়ে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। মনে করতে চেষ্টা করলাম কবে নিজের আসল নাম ভাঁড়িয়ে চুঁচুড়োর সিনেমা হাউসের পাশের বস্তির মধ্যে এসেছি। হয়ত আমারই মত চেহারার অন্য কেউ, অন্য কাউকে হয়ত ঠিক আমারই মত দেখতে। সে হয়ত কোনও ভাবে ঠকিয়ে গেছে এঁকে। ভুল নাম, ভুল ঠিকানা বলে কোনও সুবিধে আদায় করেছে অন্যায় ভাবে। কিন্তু তবু আমায় ভয় করতে লাগলো কেন? আমার মনে যদি কোনও পাপ না থাকে তো কেন আমি ভয় পেলাম এমন করে? এই

এতগুলো ছেলের সামনে কি আজ সত্যিই বে-ইজ্জৎ হয়ে যাব? ছি ছি রব উঠবে সারা দেশময়?

মহিলাটি হঠাৎ বললেন—পালিয়ে যাবেন না—বলুন—জবাব দিন, আপনার ক'টা নাম?

সমস্ত আশ-পাশের লোক হাঁ হাঁ করে উঠেছে। এক মুহূর্তে যেন একটা প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু সেই একটি মুহূর্তেই যেন আমি বিশ্ব-পরিক্রমা করে নিলাম।

একটি মুহূর্ত বটে! কিন্তু ওই গলার শব্দ যেন আমার জীবনের সমস্ত অতীত মুহূর্ত-সমষ্টিকে একেবারে ম্লান করে দিলে। মনে হলো আমার খ্যাতি নেই, আমার অর্থ নেই, নিতান্ত অবজ্ঞাত অবহেলিত একজন মানুষ একটি সামান্য মেয়ের কৃপাপ্রার্থী হয়ে এই চুঁচড়োর মাদ্রাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার গলায় ফুলের মালা, আমার এই ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় সব যেন মিথ্যে! আমি প্রতারক, আমি ভণ্ড! আমার সব মনে পড়ে গেল।

অনেক দিন আগে!

অনেক দিন আগের কথা কি এমনি করে মনে পড়তে হয়! আর এই এমনি অবস্থায়!

তখন কি জানতাম একদিন এমনি করে আমার কাছে কেউ জবাবদিহি চাইবে! এমনি করে এত লোকের সামনে আবার সে-অপকীর্তির জবাবদিহিও করতে হবে! আর তা জানলে কি এখানে আসতাম, এই চুঁচড়োয় সিনেমা হাউসের পাশের মাদ্রাসায়!

বিপিনবাবুকে আমি চিনতাম না।

আমি চিনতাম না, বলাইও চিনতো না। কোথায় তাঁর বাড়ি, কেমন বাড়ি, কী তাদের অবস্থা তাও জানতাম না, জানতো নিকুঞ্জ, নিকুঞ্জই এসে নানারকম খবরা-খবর দিতো।

তখন আমরা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটা মেসে থাকি। আমি বলাই আর নিকুঞ্জ, তিনজনে একটা ঘরের মধ্যে তিনটে তক্তপোষে শুই। বলাই বেশি রাত জাগতে পারে না। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

নিকুঞ্জ মাঝরাতে হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ডাকে—দাদা, ঘুমোলেন নাকি?

নিকুঞ্জ জানতো আমার ঘুম আসতে দেরি হয়। নিকুঞ্জ জানতো আমি শুয়ে শুয়ে

অনেক রাত পর্যন্ত আকাশ-পাতাল এলোপাথাড়ি ভাবি। তখন মনটাও খুব চঞ্চল ছিল। লেখক হবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু লেখা আসতো না আমার মাথায়। যা বলতে চাই তা প্রকাশ করতে পারতাম না ঠিক মতন। সমস্ত দিন কলকাতার রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতাম। মাঠে মনুমেন্টের তলায় গিয়ে অকারণে বসে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে-সব যুদ্ধের আগেকার কথা। কোনও বৈচিত্র্য নেই কোথাও। হয়ত এক একদিন কোথাও বেরুলাম না। কলেজ কামাই করে চুপচাপ শুয়ে পড়ে রইলাম তক্তপোষের ওপর। পাশের বাড়ির জানালায় একটা কাক কা-কা করে চিৎকার করে ডাকছিল, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার এসে শুই। মেসের অন্য সব লোক যে-যার কাজে বেরিয়ে গেছে। নিচের কলতলাতেও ঝি-এর বাসন মাজার শব্দ থেমে গেল, তখনও আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। বিকেলবেলা বলাই ফিরে আসবার আগেই আমি বেরিয়ে পড়তাম। কখনও গিয়ে বসতাম লাইব্রেরিতে। হাতের কাছে যা পেতাম, পড়তাম।

বলাই পোস্টাফিসে চাকরি করতো। খাটুনি ছিল তার আপিসে। গাধার খাটুনি। সারাদিন ধুলো-ময়লা ঘেঁটে এসে এক কাপ চা খেয়ে তবে সুস্থ হতো। সকালবেলা তার ছোলা ভিজোন থাকত। নুন আদা দিয়ে তাই সে খেত।

বলাই বলতো—দাদা, আমাদের পোস্টাপিস নিয়ে একটা গল্প লিখুন তো—আর তো পারি না—

—কেন? কী হলো?

বলাই বলতো—কাজের আর শেষ নাই দাদা, কাজের যেন পাথা গজায়—এত চিঠি লোকে কোথায় লেখে বলুন তো? কাকে লেখে?

বলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো। তার নিজের চিঠি লেখার লোক নেই ভেবে যেন হতাশ হয়ে পড়তো।

নিকুঞ্জ আসতো রাত করে। বলতো—ছেলে পড়াতে যায়। দিনের বেলায় কোথায় কোথায় কাজের চেষ্টায় ঘুরতো কে জানে, আর সকাল-সন্ধ্যের টিউশনি করতো। অর্ধেক দিন খাবার সময় পর্যন্ত পেত না। খেটে-খেটে হয়রান হয়ে থাকতো কিন্তু তবু রাত্রে ঘুম আসতো না তার। আজকের দিনে এমন ঘটনা তেমন সচরাচর হয় না। তখন অফিসে একটা চাকরি খালি নেই, একটা লোক মরেও না যে কোথাও চাকরি খালি হবে। বসে বসে বহু ছেলের খবরের কাগজ দেখে চাকরির দরখাস্ত করাই ছিল সারাদিনের কাজ। এ-সব দিন আমি দেখেছি। যুদ্ধের আগেকার সেই সব দিনগুলো।

হঠাৎ আবার অন্ধকারের মধ্যে নিকুঞ্জ আস্তে আস্তে ডাকে—দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

হয়ত কোনও ঘটনা ঘটেছে রাস্তায়, কোনও কথা মনে পড়েছে সেই কথা বলবে। নিকুঞ্জর যত কথা এই রাত্রে। বলাই সারাদিন পোস্টাপিসে কাজ করে এসে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার দিক থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু আমারও যেমন অহেতুক ভাবনা, নিকুঞ্জরও তেমনি। কারোরই ঘুম নেই—

নিকুঞ্জ মাঝে মাঝে বলতো—দেখবেন দাদা, একদিন নিশ্চয় আপনার নাম হবে দেখে নেবেন।

বলতাম—তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক নিকুঞ্জ, তাই-ই যেন হয়—

—কিন্তু আমি যা বলি, সেই সব লিখুন দিকি, কোনও বেটা আর আটকাতে পারবে না আপনাকে, ওই সব বেকারি, দুঃখ-দুর্দশা, ওসব নিয়ে আর লিখবেন না দাদা, ও তো দু'দিনের। আমাদের দুঃখ, ও হাজার লিখেও আপনি ঘোচাতে পারবেন না—

—তাহলে কী নিয়ে লিখবো ?

নিকুঞ্জ বলতো—কেন, প্রেম ? প্রেমের গল্প লিখতে পারেন না ? বড় লোকেরা যেমন করে প্রেম করে, গরীবরা তেমন করে প্রেম করতে পারে না ভেবেছেন ?

বলতাম—গরীবরা খাওয়া-পরার কথা ভাববে, না প্রেম করবে ?

—তবেই আপনি গল্প লিখেছেন দাদা ! আপনি হাসালেন।

রাগ হয়ে যেত, বলতাম—তুমি যা জানো না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, বরং চাকরির চেষ্টা দেখো, দুটো পয়সা রোজগারের চিন্তা করো, কাজ হবে—

এর পর আর কথা বলতো না নিকুঞ্জ। অন্ধকারের মধ্যে আবার দুজনে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। আমি চিন্তা করতাম আমার গল্প-উপন্যাসের কথা, আর নিকুঞ্জ হয়ত টাকা-পয়সার চাকরি-বাকরির কথাই ভাবতো।

সেদিন রাত্রেও নিকুঞ্জ, বলাই আর আমি শুয়ে আছি।

নিকুঞ্জ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—দাদা ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—কী ?

নিকুঞ্জ বললে—কোমল মানে কী দাদা ?

বললাম—'কোমল' মানে নরম।

নিকুঞ্জ বললে—নরম ? ঠিক জানেন ?

বললাম—হ্যাঁ, ঠিক জানি।

নিকুঞ্জ বললে—কিন্তু কোমল মানে তো পদ্ম!

বললাম—রাত্তিরবেলা তোমার হঠাৎ মানের দরকার হলো কেন নিকুঞ্জ?

নিকুঞ্জ এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই জিজ্ঞেস করলে—দাদা, বাঙলা ডিক্সনারি আছে?

—কেন? কী হবে?

নিকুঞ্জ বললে—'কোমল' মানেটা একবার দেখতাম।

বললাম—আমি তো তোমায় বললাম, কোমল মানে নরম!

নিকুঞ্জ বললে—আপনি অবশ্যি বাঙলায় এম্-এ পড়েছেন, কিন্তু বড় ভুল হয়ে গেল তো!

বললাম—কিসের ভুল?

নিকুঞ্জ আর কিছু কথা না বলে চলে গেল। নিকুঞ্জ বেশীদূর লেখাপড়া করেনি। তবে ছাত্র পড়ায় তাই হয়ত মাঝে মাঝে আটকে গেলে আমায় প্রশ্ন করে। এক-একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে অঙ্ক কষাতে আসে। বলে—এই অঙ্কটা একটু বলে দিন না দাদা, নইলে একেবারে বে-ইজ্জৎ হয়ে যাবো।

বলে—ক্লাস এইটে আজকাল খুব শক্ত শক্ত অঙ্ক দেয় দাদা, দেখেছেন? ফেল করিয়ে ইস্কুলের কী লাভ হয় বলুন তো?

নিকুঞ্জ বলে—এই দেখুন—পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৮০ বৎসর। দশ বৎসর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত?… দেখেছেন স্যার, কী শক্ত? আমিই হিমসিম খেয়ে গেছি অঙ্ক করতে, তো ক্লাস এইটের মেয়ে পারবে কেন?

মেয়ে!

বললাম—তুমি আবার মেয়েদেরও পড়াও নাকি? বলো নি তো আগে?

নিকুঞ্জ বললে—আজ্ঞে, আপনি রাগ করবেন বলে বলিনি—

হাসি এল। বললাম—তুমি যা ইচ্ছে করো আমার তাতে রাগ করবার কী আছে? কিন্তু তারই যে ভবিষ্যৎটা খারাপ হচ্ছে। নিজেই তো ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছ কিনা সন্দেহ!

—কী করবো দাদা, খুব ধরলে ওর মা!

—কার মা?

নিকুঞ্জ বললে—আজ্ঞে সবিতার মা।

আমি আর ঘাঁটালাম না নিকুঞ্জকে। কে সবিতা, কে-ই বা তার মা, কোথায়

তাদের বাড়ি—অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল আমার কিন্তু সেদিনের মত কৌতূহল দমন করে নিলাম। নিকুঞ্জও আর বেশী কথা বলে না। লক্ষ্য করি চান করতে করতে নিকুঞ্জ হয়ত গুণ-গুণ করে গান করছে। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে সে-গান। হঠাৎ ভিজে কাপড়ে আসতে আসতে আমার সামনে পড়ে যেতেই গানটা থামিয়ে দেয়। কিম্বা দেখি ঘন ঘন দাড়ি কামাচ্ছে। আমার দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় মুখ দেখে মাঝে মাঝে। কিম্বা ঘন ঘন কাপড়ে সাবান দিতে দেখি। দেখি বেরোবার সময় প্রাণপণে কোঁচাটাকে কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে টান করছে।

সেদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ ও-পাশ থেকে আবার আওয়াজ এল—দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—বলো।

নিকুঞ্জ বললে—আপনি রেগে যাবেন না তো ? একটা গোপন পরামর্শ ছিল।

গোপন পরামর্শ !

বললাম—গোপন পরামর্শ আমার সঙ্গে, না বলাই-এর সঙ্গে ?

নিকুঞ্জ বললে—না দাদা, আপনার একার সঙ্গে।

—কিন্তু ঘরে তো বলাই রয়েছে।

নিকুঞ্জ বললে—ও থাক দাদা, ও অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ও পোস্টাপিসের খাটুনি খেটে হয়রান হয়ে আছে এখন—

তারপর একটু থেমে বললে—আমি একটু মুস্কিলে পড়ে গেছি দাদা, একটা মস্ত সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার !

বললাম—কী হলো, টিউশনিটা গেছে ?

—না, টিউশনিটা গেলে বাঁচতুম, আর বোধ হয় টিউশানি করতেই হবে না, বসে বসে খেতে পারবো সারা জীবন।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সবিতার মা আর পড়াবে না মেয়েকে ?

নিকুঞ্জ বললে—না দাদা, আর পড়াবে না। বলে লেখাপড়া শিখে কী হবে ?

বললাম—তাহ'লে বিয়ে দেবে বুঝি মেয়ের ?

নিকুঞ্জ বললে—মেয়ের বয়েস তো হয়েছে। ক্লাস এইট-এ পড়লে কী হবে ! আর তা ছাড়া নিজের বাড়ি রয়েছে মেয়ের মা'র। শশী হালদার লেনের বাড়িটা যে ওদের নিজের। বাড়ির লোভে পাত্রের কি অভাব হবে ভাবছেন ?

বললাম—কার সঙ্গে বিয়ে হবে ? পাত্র ঠিক হয়েছে ?

নিকুঞ্জ বললে—হ্যাঁ দাদা, পাত্র ঠিক হয়েছে।

—পাত্র কী করে ?

নিকুঞ্জ একথার কোন উত্তর দিলে না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর আলো জ্বাললো হঠাৎ। তারপর বলাই-এর বিছানার কাছে গিয়ে মুখ নামিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলে।

বললে—গোপন পরামর্শ কি না, তাই ভাল করে দেখে নিলাম বলাই ঘুমোচ্ছে কি না ঠিক—

আমি তখন আরো কৌতূহলী হয়ে উঠেছি! শেষ পর্যন্ত নিকুঞ্জটার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি। বেচারী অনেকদিন ধরে পড়াচ্ছে। পড়াতে পড়াতে একটা মায়া পড়ে গেছে। কতদিন পড়িয়ে এসে বলেছে—আজকে আর খাবো না দাদা, পেট ভর্তি—

—কেন ?

নিকুঞ্জ বলছে—সবিতার মা ছাড়লে না, খুব পেটভরে খাইয়ে দিলে দাদা—

আবার একদিন রাত্রে হঠাৎ হয়ত ডেকেছে—দাদা ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—বলো।

নিকুঞ্জ বলেছে—বলাইটা ঘুমিয়েছে এতক্ষণে, তাই চুপ করে ছিলাম, আচ্ছা একটা অঙ্ক বলে দেবেন ? দুইটি সংখ্যার গুণফল ৮১৬, একটি ৫১, অপরটি কত ?

রাগ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—এই বিদ্যে নিয়ে কেন তুমি ক্লাশ এইট-এর ছাত্রীকে পড়াতে যাও বলো তো ? তোমার নিজের বিদ্যে কতদূর ?

নিকুঞ্জ বললে—আমার বিদ্যে তো আপনি জানেন দাদা, কিন্তু ওদের বলেছি বি-এ পাশ—

বি-এ পাশ ! বললাম—ওরা তাই বিশ্বাস করেছে ?

—বিশ্বাস করবে না কেন ? ওদের কাছে তো মাইনে নিই না।

বললাম—মাইনে না নিয়ে পড়াও, তাতে তোমার লাভ ?

নিকুঞ্জ কেমন গম্ভীর হয়ে যায় খানিকক্ষণ, তারপর বলে—লাভ ?

আমার দিকে চেয়ে কী বলবে যেন ভেবে পায় না, কিম্বা যা বলতে চায়—তা যেন লজ্জায় বলতে পারে না। তারপর একটু আমতা আমতা করে বলে—ওরা লোক কিন্তু খুব ভালো।

বললাম—ভালো লোক বলেই বুঝি মিথ্যে কথা বলে ঠকাচ্ছো ? তুমি বি-এ পাশ এ কথা বলতে গেলে কেন ?

নিকুঞ্জ বললে—বি-এ পাশ না বললে যে আমাকে মাষ্টার রাখবে না।

এ-সব কথা আমার জানা ছিল না। এর জন্যে নিকুঞ্জকে বকাবকিও কম করিনি। মিথ্যে কথা বলে, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের সর্বনাশ করার প্রবৃত্তিকে আমি নিকুঞ্জর কাছে বার বার নিন্দে করেছি! ওদের কথা উঠলেই আমি নিকুঞ্জকে বলেছি—তুমি আর ওখানে যেও না নিকুঞ্জ, ওখানে আর তোমার যাওয়া উচিত নয়।

নিকুঞ্জ কথা দিয়েছে—না না দাদা, আমি কথা দিচ্ছি আর ওখানে যাবো না।

বলতাম—হ্যাঁ, নিজের জীবনটা তো নষ্টই করেছ! আর একজন নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট করবার কী অধিকার আছে তোমার?

নিকুঞ্জ বলতো—হ্যাঁ দাদা, ঠিক বলছেন, আমার আর যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু না গেলে যদি ডেকে পাঠায়?

—ডেকে পাঠালেও যাবে না। বামন হয়ে তোমার আকাশের চাঁদে হাত দেবার দরকার কী?

নিকুঞ্জ বলতো—ঠিক বলেছেন, ওতে অকারণ অশান্তি কেবল, আপনি ঠিকই বলেছেন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার দরকার কী আমার? আর আমি কি একটা পাত্র? আমার না আছে চাল-চুলো, না আছে চাকরি, না জানি লেখা-পড়া—সবিতার কাছে আমি একটা কিছুই না দাদা, আপনি তাকে দেখেননি, দেখলে বুঝতে পারতেন। আমি তার বাঁ-পায়ের ক'ড়ে আঙুলের নখের যুগ্যিও নই—

এই সব কথা আমার সঙ্গে আগে হয়েছিল। সুতরাং আমি জানতাম নিকুঞ্জ আর ওদের বাড়ি যাবে না।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম তবু—আর ওদের ওখানে যাও না তো নিকুঞ্জ?

নিকুঞ্জ বলতো—দাঁড়ান দাদা, বলাই ঘুমোচ্ছে কিনা দেখে নি—

বলে বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালতো। তারপর বলাই-এর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতো। তারপর বলতো—না বলাই ঘুমিয়েছে। এবার কী বলছিলেন বলুন?

বললাম—বলছিলাম, তুমি আর ওদের বাড়ী যাও না তো?

নিকুঞ্জ বলতো—কমিয়ে দিয়েছি দাদা, আগেকার মত আর যাই না—নেহাৎ একেবারে না গেলে কী মনে করবে তাই যাই, তা আজকে গিয়েছিলুম, সেখান থেকেই এই আসছি—

—সেখান থেকেই খেয়ে এলে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবিতার মা না খাইয়ে ছাড়লে না, তা আর কী করবো বলুন, তবে কাল থেকে আর যাবো না। এই আপনার সামনে দিব্যি গালছি—

তা এমনি করেই দিন কাটছিল। ক'দিন নিজের সমস্যাতে নিকুঞ্জর খবরও আর নেওয়া হয়নি। বলাইও সকাল বেলা চলে যেত পোস্টাপিসে আর নিকুঞ্জ কখন কত রাত্রে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তো খবর রাখতে পারতাম না।

সেদিন অনেক রাত্রে আবার নিকুঞ্জর গলা শুনলাম—দাদা ঘুমোলেন নাকি ?

আর তারপর যখন শুনলাম সবিতার পাত্রও ঠিক হয়ে গেছে, তখন আরো নিশ্চিত হলাম।

বললাম—ভালোই হয়েছে, এবার আর ওবাড়ি যেও না—

নিকুঞ্জ বললে—বলেন কি দাদা, আমি যে পাত্র, আমার সঙ্গেই যে বিয়ে হচ্ছে—

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম! নিকুঞ্জর সঙ্গে বিয়ে? নিকুঞ্জই পাত্র ?

—কিন্তু একটা মুস্কিল হয়ে গেছে দাদা, আপনাকে একটু উপকার করতে হবে, একটু সাহায্য করতে হবে আমায়, তা না হলে বিয়েটা হবে না।

বলাই যেন একবার পাশ ফিরলো ঘুমোতে ঘুমোতে। নিকুঞ্জ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে আবার আরম্ভ করলে—দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবো না, তুমি এখন ঘুমোও—

তারপর অনেকবার ডেকেছে নিকুঞ্জ, আমি সে-রাত্রে আর কোনও সাড়া দিইনি, সকালবেলা উঠেও নিকুঞ্জ আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু ঘরে বলাই থাকতে সুবিধে হয়নি। তারপর আমিও বেরিয়ে গিয়েছি।

কিন্তু পরের দিন রাত্রিবেলা আবার সেই কাতর ডাক—দাদা ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—কি বলো ?

বলাই-এর ঘুম তখন অঘোর। পাশ থেকেই বুঝতে পারছি বলাই তখন ঘুমে অচেতন। সেদিন থেকে কোনও বাধাই নেই। নিকুঞ্জও তাই দেখে অন্যদিনের চেয়ে বেশি সাহস পেয়ে গেল। যেন এবার কান্নার মতন শোনালো নিকুঞ্জর গলাটা! বললে—দাদা, আপনি যদি সাহায্য না করেন তো আত্মহত্যা করবো আমি, আমি বিবাগী হবো। এই বলে রাখলাম আমি—

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

নিকুঞ্জ বললে—নিজের দাদা মা বাবা কেউ নেই, তাই আপনাকে দাদা বলে মনে করি, এখন আপনিও যদি বিমুখ হন তো আমার বেঁচে কি লাভ ?

বলে সত্যি সত্যিই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো নিকুঞ্জ।

নিজেও কেমন বিরক্ত হলাম। বললাম—কী সাহায্য তোমার চাই শুনি?

নিকুঞ্জ কান্না থামালো। বললে—বেশি কিছু নয় দাদা, আপনাকে একবার যেতে হবে ওদের বাড়ি।

অবাক হতে যেন আমার তখনও বাকী ছিল। আমাকে যেতে হবে? ওদের বাড়ি?

—হ্যাঁ দাদা, ওরা আপনাকে ডেকেছে—

—আমাকে ডেকেছে কেন?

—আজ্ঞে, আমি বলেছি, আপনি আমার হয়ে সাক্ষী দেবেন।

—সাক্ষী?

নিকুঞ্জ বললে—হ্যাঁ দাদা, আপনি সাক্ষী না দিলে আমার বিয়েই হবে না। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। আপনি গিয়ে বলবেন ওর মাকে যে আমি বি-এ পাশ, আমাদের দেশে মস্ত বাড়ি, আমাদের এককালে খুব টাকাকড়ি ছিল, এখন বেশি নেই, আর বলবেন আমার সঙ্গে বিয়ে হলে সবিতার কিছু কষ্ট হবে না—এই সব সাক্ষী দিতে হবে—

এতখানি মিথ্যে বলার অনুরোধ যে করতে পারে, সে আমার মতে মানুষও খুন করতে পারে। নিকুঞ্জর কথা শুনে নিকুঞ্জর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

অনেকদিন আগেকার কথা। অনেক বছর আগেকার কথা। মনের চিন্তার মোটা মোটা পর্দাগুলোই শুধু আজ মনে আছে, কিন্তু তার ভগ্নাবশেষগুলোর কথা কি এতদিন পরে মনে থাকা সম্ভব? মনে আছে নিকুঞ্জ শেষ পর্যন্ত আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল হাউ হাউ করে। বলেছিল—আমার যদি উপকার হয় তো আপনার কী ক্ষতি দাদা? আমার ভালোর জন্যে না হয় একটু মিথ্যেই বললেন।

সত্যি মিথ্যের প্রশ্ন নয় অবশ্য। কিন্তু সেদিন আমার সে-কথা মনে হয়নি আমার মনে হয়েছিল একটি মেয়েকে ঠকিয়ে যদি নিকুঞ্জ তার সর্বনাশ করে তো আমি কেন তার মধ্যে নিমিত্তের ভাগী হই। আমি কেন এই মিথ্যাচারের মধ্যে নিজের দায়িত্বের অপপ্রয়োগ করি। নিকুঞ্জ যদি ইচ্ছে হয় তো করুক যা খুশি। আমার কী! আমি নিকুঞ্জরই বা কে আর সেই মেয়েটারই বা কে? এক মেসের একটি ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এক সঙ্গে রাত কাটানো ছাড়া আর কিসের সম্পর্ক আমার নিকুঞ্জের সঙ্গে? কেন আমি আমার শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা আর প্রতিষ্ঠার এমন অপব্যয় করতে যাবো অকারণে?

প্রথম দু'একদিন কিছু বলিনি। নিকুঞ্জর সঙ্গে কথাই বলিনি।

বললাম—আর কাউকে গিয়ে বলো গে যাও, আমার দ্বারা ও কাজ হবে না—

কিন্তু মেসের ঠাকুরের কাছে একদিন হঠাৎ শুনলাম নিকুঞ্জবাবু কদিন ধরে ভাত খাচ্ছে না। কখন আসে, কখন যায়, কখন ঘুমোয় কিছুই টের পায় না। একদিন দেখলাম উস্কো-খুস্কো চুল, রুক্ষ চেহারা, শুকনো মুখ। আমাকে দেখে সরে পড়ছিল, কাছে ডাকলাম। বললাম—কী খবর? কোথায় থাকো?

নিকুঞ্জ মুখ নীচু করে বললে—আমার আর থাকা, বেঁচে আছি কোন রকমে।

বললাম—আর সেই তারা? তোমার ছাত্রী?

—তারাও সেই রকমই আছে।

বললাম—বিয়ে হয়ে গেছে তার?

নিকুঞ্জ বললে—আপনি তো আর কিছু করলেন না, সে-ও সেইরমক ঝুলছে।

বললাম—তুমি সত্যিই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও?

নিকুঞ্জ বললে—সে তো আপনাকে বলেই দিয়েছি দাদা?

—তাহলে আমার সামনে প্রতিজ্ঞা করো মেয়েটাকে কোনও কষ্ট দেবে না।

নিকুঞ্জ বললে—ভালবাসার মানুষকে কেউ কষ্ট দিতে পারে?

—দিতে পারে কি না পারে, সে-কথা শুনতে চাই না। তুমি কষ্ট দেবে না বলো?

—কথা দিচ্ছি কষ্ট দেব না।

বললাম—মেয়ের যে বাড়ী আছে, তা খেতে না পেলেও বিক্রী করবে না?

—করবো না, কথা দিচ্ছি দাদা, এই আপনার পা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি।

মনে আছে নিকুঞ্জর কথামত শেষ পর্যন্ত শশী হালদার লেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম, বেশ ছোট একতলা বাড়ি একটা। সামনে পৈঁঠে। বাড়ির লাগোয়া একটা জাঁতিকাটা ফুলের গাছ। সঙ্গে নিকুঞ্জ ছিল। সবিতার বিধবা মায়ের নামেই বাড়িটা। বাপের নাম বিপিনবিহারী বিশ্বাস না রায়। নিকুঞ্জই সব বলছিল। ওই একটি মেয়ে নিয়েই মা বিধবা হয়েছিলেন। তারপর কষ্টে-স্বষ্টে মেয়েকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন। বাউণ্ডুলে নিকুঞ্জটা যে এমন জায়গায় কেমন করে জুটলো কে জানে!

নিকুঞ্জই দরজার কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে একজন দরজা খুলে দিতেই নিকুঞ্জ তাকে কী যেন বললে চুপি চুপি। তারপর আমাকে ডাকলে—আসুন দাদা, ভেতরে আসুন—

কেমন করে সমস্ত জিনিসটা অভিনয় করবো তাই তখন ভাবছি।

নিকুঞ্জ বলে ছিল—আপনার নাম বলবেন রমেশ গাঙ্গুলী, পাবনায় আপনাদের বাড়ী, আমি আপনার খুড়তুতো ভাই, ভুলবেন না যেন—

ঘরের ভেতরে বসেছিলাম তক্তপোষের ওপর। নিকুঞ্জ তাড়াতাড়ি একটা তালপাতার পাখা নিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগলো। বললে—মাকে ডেকেছি, মা এখুনি আসছেন—

সেদিনের সেই মিথ্যে অভিনয়ের জন্যে আজ চুঁচড়োর এই মাদ্রাসার সামনে দাঁড়িয়ে যে এমন করে জবাবদিহি করতে হবে তা যদি তখন জানতাম! সংসারে সব অপরাধেরই যে একদিন জবাবদিহি করতে হয় তাও যদি জানতাম। যদি জানতাম নিকুঞ্জ তার সব প্রতিজ্ঞা এমন করে ভাঙবে!

মনে আছে একে একে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন মহিলা। থান ধুতিটা বদলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার সামনে। আমি তক্তপোষের ওপর বসেছিলাম, আর তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বলেছিলেন—তোমার নামই তো রমেশ গাঙ্গুলী? তুমিই তো বাবা নিকুঞ্জর দাদা?

বললাম—হ্যাঁ, নিকুঞ্জ আমার খুড়তুতো ভাই।

—বেশ বাবা, নিকুঞ্জ তোমার কথা প্রায়ই বলে। নিকুঞ্জ তো আমার ঘরের ছেলের মতই হয়ে গেছে, অমন ছেলে হয় না বাবা, ও না থাকলে কী যে করতাম, আমার অসুখের সময়ে কী সেবাটাই করলে তোমার ভাই। পেটের ছেলে থাকলেও অমন করে করতে পারতো না—তোমাকে একটু জলখাবার এনে দিই বাবা—

—না না, থাক, আমি খেয়ে এসেছি।

নিকুঞ্জ দৌড়ে ভেতরে গেল। বললে—আমি আনছি মা—

মহিলাটি বললেন—বুঝছোই তো বাবা, মেয়ের বিয়ে বলে কথা। একটু তো খোঁজ খবর নিতে হয়, তাই তোমাকে ডাকা। আমার তো পয়সা কড়ি কিছু নেই। তবু পেটের মেয়েকে তো আর যার তার হাতে তুলে দিতে পারি না, আর নিকুঞ্জর স্বভাব চরিত্র তো এত বছর ধরে দেখছি। আর যখন বি-এ পাশ—

বললাম—হ্যাঁ বি-এ'টা পাশ করেছে ও—

মহিলাটি বললেন—তাই ভেবে দেখো বাবা, বি-এ পাশ পাত্তোর আমি কোথায় পাচ্ছি, আমার কি টাকা আছে না সোনা-দানা আছে, কত্তা এই বাড়িটা করে গিয়েছিলেন তাই মাথা গুঁজে আছি কোনরকমে—

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—না, নিকুঞ্জ আপনার জামাই হিসেবে ভালোই, লেখাপড়া

জানে—চেষ্টা চরিত্র করে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবেই, আর আমরাও তো আছি—

মহিলাটি বললেন—তুমি মত করছো বাবা? আমার তো বাবা ভয় করছে—

বললাম—না, আপনার ভয় করবার কিছু নেই। বংশ আমাদের খুব বিখ্যাত, গাঙ্গুলী-বংশ বললে ওদিকে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই চিনতে পারবে। এখন অবিশ্যি অবস্থা পড়ে গেছে—

মহিলাটির মুখ, আনন্দে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ডাকলেন—খুকি, ও খুকি—

ভেতর থেকে একটি মেয়ে বাইরে এল। দেখে মনে হলো নিকুঞ্জর পছন্দ আছে বটে। এসে আমার সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলাটি বললে—প্রণাম কর মা এঁকে, ইনি নিকুঞ্জের জ্যাঠতুতো দাদা—

মেয়েটি প্রণাম করতে আসতেই আমি পা দুটো টেনে নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করলাম।

মহিলাটি মেয়ের পিঠে হাত দিয়ে বললেন—নিজের পেটের মেয়ে বলে বলছি না, এমন লক্ষ্মী বউ বাবা তুমি কোথাও দেখতে পাবে না, লেখা-পড়া, সেলাই-ফোঁড, রান্না-বান্না সব কাজ শিখিয়েছি মনের মত করে—

তারপর মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন—যাও মা, দাদার জন্যে জলখাবার পাঠিয়ে দাও—

মেয়েটি চলে যেতেই মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—তা তুমি কোথায় বিয়ে করেছো বাবা?

হঠাৎ এ-প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। এ প্রশ্নের জবাব তো তৈরী করে আসিনি। কী বলবো ঠিক বুঝতে পারলাম না। নিকুঞ্জ ঘরে ঢুকছিল একটা রেকাবিতে রসগোল্লা নিয়ে। সে বললে—দাদা বিয়ে করেছে রামপুর হাটে, মুকুজ্জেবাড়ি—

মহিলাটি বললেন—তা বৌমা কোথায়?

নিকুঞ্জই আমার হয়ে জবাব দিলে, বললে—রামপুরহাটে, কলকাতায় থাকি মেসে, দাদা তো এম-এ পড়ছে, এই বছরে পাশ করলেই চাকরিতে ঢুকবে, তখন কলকাতায় বাসা করেই বৌদিকে আনবে, তখন দু'ভাই দু'বউকে নিয়ে কোনও কষ্ট হবে না আমাদের—

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—দেশে মাথার ওপর তোমাদের কে আছেন, কাকা জ্যাঠা……

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—কাকার অসুখ—

নিকুঞ্জ আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—জ্যাঠামশাই মারা গেছেন আজ সাত বছর হলো, সাত বছরই তো, না দাদা ?

বললাম—হ্যাঁ, ঠিক সাত বছর।

নিকুঞ্জ বলতে লাগলো—জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর থেকেই আমাদের অবস্থাটা খারাপ হতে লাগলো। আমার বাবা, ছোট কাকা—সব তো জ্যাঠামশাই-এর কাছেই মানুষ, আমার জ্যাঠামশাই, এই রমেশদার বাবা, ছিলেন দেবতুল্য মানুষ—

—বাবা, এই মিষ্টি দুটো খেয়ে নাও।

বললাম—কেন আবার এ-সব আনতে গেলেন—বলে মিষ্টিটা মুখে পুরে দিলাম।

মহিলাটি বললেন—আমার তো খোঁজ খবর নেবার লোক নেই—আমি একা বিধবা মানুষ। নিকুঞ্জ এ-বাড়ির ছেলের মতন, যখন যা দরকার হয়েছে করেছে। মাইনে-পত্তোরও দিতে পারিনি। খুকিকে লেখা-পড়া শেখানো, সবই ও করলে এতদিন—

বললাম—নিকুঞ্জকে জামাই করলে আপনার কোনও কষ্ট হবে না—

—তোমরা তাই বলো বাবা, তোমাদের মুখ চেয়েই আমার মেয়েকে নিকুঞ্জর হাতে তুলে দিচ্ছি। আমার দেখবার কেই-বা আছে বলো, তিনি যেদিন হঠাৎ চলে গেলেন······

বলতে বলতে হঠাৎ ভদ্রমহিলা চোখে আঁচল দিলেন। খানিকক্ষণের জন্যে কোনও কথা বলতে পারলেন না মুখ দিয়ে। তারপরে একবার সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন—শেষের সময়টা আর কিছু কথা বেরোয়নি বাবা। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর, আমি তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলাম—কিছু বলবে তুমি ? তা তখন তাঁর কথা বলবার ক্ষমতাই নেই, বলবেন কী ? আমার যে তখন কী অবস্থা বাবা, তোমাকে কী বোঝাবো, ডাক্তার আর কী করবে—আমি একলাই কাঁদতে লাগলুম, খুকি তখন এই এতটুকু—এক হাতে তাকে কোলে জড়িয়ে আছি, আর এক হাতে কর্তাকে···

একটা কথা না বললে খারাপ দেখায়, তাই বললাম—বাড়িতে আর কেউ ছিল না ? পাড়া-পড়শী কি আত্মীয়-স্বজন ?

—কেউ না বাবা, একটা লোক নেই তখন সামনে, যার ওপর মেয়েটাকে অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্যে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তারপর ?

নিকুঞ্জ এতক্ষণে কথা বললে বললে—মাথার ওপর ভগবানই ছিল একমাত্র ভরসা। গরীবের আর কে থাকে দাদা?

—ঠিক বলেছ নিকুঞ্জ, আমি ভগবানের ওপরই বিশ্বাস করে বরাবর জীবন কাটিয়েছি বাবা, কর্তা বেঁচে থাকতেও একদিনের তরে কারো খোসামোদ করিনি। এই যে বাড়ি উনি করে গেছেন, এ-ও ভগবানের দয়া, নইলে কর্তা ছাপাখানায় কাজ করতেন তো, কত আর পয়সা পেতেন, তাই থেকেই নিজে না খেয়ে জমিয়ে জমিয়ে এইটে করতে পেরেছিলুম। এইটে ছিল বলেই না আজ মাথা গোঁজবার একটা জায়গা রয়েছে। তারপর তোমাদের মত দু'পাঁচজন ভদ্রলোক ছিল তাই মেয়েটিকে মানুষ করতে পেরেছি। মেয়ে-ইস্কুলের হেড্-দিদিমনির কাছে গিয়ে বললুম—বিধবার মেয়ে, মাইনে আমি দিতে পারবো না, একে আপনাকে পড়াতে হবেই—

তা আমার কপাল যেমন একদিকে ভেঙ্গেছে, ভগবান অন্যদিকে তা পুষিয়েও দিয়েছেন। ভাবিইনি একদিন ও মেয়েকে মানুষ করতে পারবো, লেখাপড়া শেখাতে পারবো—তা সবই যখন হলো বিয়েটাও কি আটকাবে? শেষে নিকুঞ্জও জুটে গেল আমার কপালে, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলে বড় ভরসা পেলাম, বি-এ পাশ জামাই হবে, তাই কি খুকি ভাবতে পেরেছিল, আর এতবড় বংশ?

অনেক কথার পর কী বলিবো বুঝতে পারছিলাম না, বললাম—এবার আসি—

—সে কি বাবা, আমার খুকিকে পছন্দ হয়েছে তো?

বললাম—নিকুঞ্জকে যে অপনাদের পছন্দ হয়েছে এ-ই তো যথেষ্ট!

—কী যে বলো বাবা, ভগবান ছিল মাথার ওপর তাই তোমরা জুটে গেলে, নিকুঞ্জ যদি একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারে, আর পারবেই না-বা কেন, বি-এ পাশ করেছে—

নিকুঞ্জ আগ বাড়িয়ে বললে—চাকরি তো আমি এতদিন মনে করলে কবে...... দাদা আমায় কতদিন বলেছে, দাদা ইচ্ছে করলেই আমার একটা চাকরি করে দিতে পারে—

ভদ্রমহিলা বললেন—তা দাও না বাবা, এবার তো তোমার ভাই-এর—বিয়ে-থা হোল—! চাকরিটা হলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতুম বাবা, বাড়িটা তো রয়েছে, চাকরিটা হলেই আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজতে পারতুম।

বললাম—হ্যাঁ, চাকরি একটা এবার ওকে করে দিতে হবে—

ভদ্রমহিলা বললেন—তা হলে বিয়েটা কবে দিতে চাও বলো বাবা! এমাসে তো আর দুটো দিন, এত তাড়াহুড়োর মধ্যে কি আর হয়ে উঠবে।

বললাম—কেন হবে না, কলকাতা সহরে বিয়েতে আবার কীসের ভাবনা—দেরি করে লাভ নেই।

ভদ্রমহিলা বললেন—না, তা নেই, কিন্তু এত সব করবে কে বাবা?

বললাম—আমি আছি, নিকুঞ্জ আছে। নিকুঞ্জ একলাই সব করতে পারে।

নিকুঞ্জ হঠাৎ বললে—মনে নেই দাদা, তোমার বিয়ের সময় আমিই তো সব বাজার হাট করলাম—

ভদ্রমহিলা বললেন—আমার মেয়ের বিয়ে তো আর তেমন বিয়ে নয় বাবা,—কর্তা বেঁচে থাকলে ধার-দেনা করেও আমি কিছু খরচ করতাম—

আমি বললাম—না, না, সে কথা আপনি ভাববেন না, থাকলে তো নিকুঞ্জরই থাকবে, আপনি আসছে পঁচিশেই ব্যবস্থা করুন—

কথা বলে চলেই আসছিলুম, হঠাৎ মা মেয়েকে ডাকলেন।

—ওরে খুকী, শুনে যা—

খুকী এল। এসে প্রথম বারের মত পায়ের ধুলো নিলে।

ভদ্রমহিলা বললেন—আশীর্বাদ করো বাবা, যেন সুখী হয় ও—

আশীর্বাদ করলাম। কী বলে আশীর্বাদ করলাম তা মনে নেই আজ। মুখে শুধু এই যে আশীর্বাদ মনে মনে করলেও চলে। মনে আছে মেয়েটিকে ভালো করে দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করেছিলাম তখন। বেশ স্বাস্থ্যবতী, লক্ষ্মীপ্রতিমা চেহারা। আয়ত দুটি চোখে লজ্জা জড়ানো। একমাথা চুল একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। মনে মনে বড় অনুশোচনা হলো, এমন মেয়ের আমি কী সর্বনাশ করলুম। কেন করলুম। কী আমার স্বার্থ এতে!

রাস্তায় বেরিয়ে নিকুঞ্জ প্রায় আমার পা জড়িয়ে ধরার উপক্রম করলে।

বললে—দাদা, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো, আমার মায়ের পেটের দাদা হলেও এমন করে করতো না আমার জন্যে—

তখনও অনুশোচনার জ্বালা জ্বলছিল মনে মনে।

বললাম—তোমার জন্যে খুব খারাপ পাপ করলাম নিকুঞ্জ—কিন্তু বিয়ের পর যদি মেয়েটিকে কষ্ট দাও তো তোমার ভালো হবে না তা বলে রাখছি—

—কী যে বলেন দাদা, আমি ওকে কষ্ট দেব? জানেন না দাদা, আমি দরকার হলে ওর জন্যে প্রাণ দিতে পারি।

বললাম—প্রাণ তোমার দিতে হবে না, কিন্তু ওকে কষ্ট না দিলেই হলো—মেয়েটিকে দেখে পর্যন্ত কেমন যেন পাপবোধ আরো বেড়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাত্রে বলাই ঘুমিয়ে পড়ার পর নিকুঞ্জ বলল—দাদা, ঘুমোলে নাকি ?

মনে আছে সেদিন রাত্রেও নিকুঞ্জকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম যদি কোনওরকম ভাবে নিকুঞ্জ কষ্ট দেয় মেয়েটিকে তো আমি তার শাস্তি দেব নিজের হাতে। নিকুঞ্জ চাকরি করবে একটা, সেই চাকরিতে যা মাইনে পাবে সব যেন শাশুড়ির হাতে এনে তুলে দেয়। এখন যতদিন চাকরি না হয়, ততদিন টিউশনির টাকাগুলোও তুলে দিতে হবে শাশুড়ির হাতে।

বললাম—যতদিন শাশুড়ি বেঁচে থাকবে ততদিন শাশুড়ির হাতে দেবে, শাশুড়ি যখন থাকবে না তখন বউ-এর হাতে তুলে দেবে—রাজি তো ?

বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল পঁচিশে। হাতে তখন আর কয়েকটা দিন মাত্র ছিল।

বললাম একদিন—তোড়জোড় কেমন চলছে নিকুঞ্জ ?

নিকুঞ্জ বললে—আজকে গিয়েছিলাম সবিতার গহনা পছন্দ করতে—

এমনি করে আর কিছুদিন মাত্র তখন বোধহয় হাতে ছিল। কয়েকটা দিন পরেই যথারীতি আমিও নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে পারতাম নিকুঞ্জর বিয়েতে। কিন্তু হঠাৎ সেই সময়েই একটা ঘটনা ঘটে গেল। দিল্লীতে একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। এতদিনে তার উত্তরও ঠিক এই সময়ে পাওয়া গেল। চাকরিটা ছিল জরুরী। এম-এ পরীক্ষার ফলটা যখন ইচ্ছে বেরোক, তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা ছিল না মোটে। সুতরাং আমাকে দিল্লী চলে যেতেই হলো। নিকুঞ্জকে ঠিক অকূল সাগরে ফেলে গেলাম বলা চলে না।

যাবার সময় নিকুঞ্জ বললে—ঠিক এই সময়েই চলে যাচ্ছেন দাদা ?

বললাম তাতে কি হয়েছে। সব ব্যবস্থা তো করে দিয়েছি, আর যদি কিছু দরকার থাকে তো বলাইকে বলো না—

নিকুঞ্জ বলেছিল—না দাদা, থাক, ওকে আর বলে দরকার নেই—আমি একলাই সব পারবো—

তারপর আমি আর কিছুই জানি না। কলকাতা থেকে নতুন জায়গা রাজধানীতে গিয়ে নতুন করে স্থির হয়ে বসতেই কেটে গেল কয়েকদিন। তারপর এক বাসার পর অন্য বাসায় বদল করতে করতে অনেকবার ঠিকানা বদলে যখন পাকা ঠিকানায় জুত করে বসতে পারলাম, তখন নিকুঞ্জর বিয়ে হয়ে পুরোন হওয়ার কথা। তারপর থেকে নিকুঞ্জর আর কোন খবর জানি না। নিকুঞ্জর বউ কিম্বা শাশুড়ি তাদের কারোর খবরই জানতাম না আর। তাছাড়া নিজেকে তার বদলে

'রমেশ গাঙ্গুলী'তে রূপান্তরিত করেও মনে মনে খুব সুখী ছিলাম না। সুতরাং ও-প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতেই চেয়েছিলাম। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কথা ভুলেও গিয়েছিলাম।

আজ এতদিন পরে সেই সেদিনকার সবিতার এই পরিবর্তন দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। নিকুঞ্জ শেষকালে বউকে এখানে এনে তুলেছে! শশী হালদার লেনের সে বাড়িটা থেকে উঠে এখানেই বা আনতে গেল কেন? সে বাড়িটাও কি বিক্রী করে দিয়ে টাকাগুলো খেয়ে বসেছে? বউটার গায়ে একটা গয়নাও কি রাখতে নেই? শেষে এই হাল করে ছেড়েছে বউটার?

গাড়িতে উঠেও যেন মেয়েটার চোখ দুটো সামনে দেখতে পেলাম। যেন জল্ জল করে জ্বলছে। অন্ধকার গাড়িটা কখন চলতে আরম্ভ করেছে। কখন সভার উদ্যোক্তা ভদ্রলোকেরা যথারীতি বিদায় নিয়েছে, কিছুই যেন আমার খেয়াল ছিল না। মনে হলো যেন মেয়েটিও আমার সঙ্গে দৌড়চ্ছে। হঠাৎ স্পষ্ট গলায় যেন আবার বললে—বলুন, আমার কথার জবাব দিন?

কী আর জবাব দেব! তখন অনুশোচনায় আমার সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ ড্রাইভারকে বললাম—গাড়ি ঘোরাও—

অন্ধকারে একটা চৌমাথার সামনে গাড়ি ব্রেক্ কষে থমকে দাঁড়াল। বললাম—সিনেমা হাউসের দিকে একবার নিয়ে চলো তো।

ড্রাইভার আবার গাড়িটা পিছনের দিকে ঘোরাল। এতক্ষণে সহর ছাড়িয়ে অনেকদূরে চলে এসেছিলাম। আবার সেই বাজারের পথ। যে-পথ দিয়ে সভা করতে গিয়েছিলাম। রাস্তায় ভিড় রয়েছে বেশ। সিনেমা হাউসের সামনে আরো ভিড়, আরো আলো, আরো জৌলুষ। সিনেমায় কোনও গান জোরে বাজছে।

বললাম—এর পেছনের বাড়ীতে যেতে হবে একবার—

ড্রাইভার বস্তীটা আন্দাজ করে গাড়ীটা নিয়ে দাঁড় করালো। আমি গাড়ি থেকে নামলাম। ফুলের মালা, সিল্কের চাদর সব গাড়ির ভেতর রেখে এলাম। তারপর বড় লাইটপোস্টটার নিচে বিরাট নর্দমাটা পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ছোট বড় নানান মাপের খাবার ঘর। টিম্‌টিমে আলো জ্বলছে ভেতরে। কোনও কোনও বাড়ি অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও লোকজন, মেয়েমানুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কল-শব্দে মুখর হয়ে রয়েছে আবহাওয়া।

এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে সবিতা।

বস্তীর সব বাড়িগুলোই না হয় খুঁজবো। না হয় না-ই চিনলাম বাড়িটা।

নিকুঞ্জ নামটা বললে কি আর চিনতে পারবে না? না হয় চেহারার একটা বর্ণনা দেব। বস্তীতে সবাই সবাইকে চেনে। সহরের মধ্যে আলাদা কথা। আশে-পাশের লোকজনের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে-চেয়ে দেখি, অন্ধকারে ভালো ঠাহর হয় না। কিন্তু হঠাৎ নিকুঞ্জকে দেখে ফেলতেও তো পারি। চিনে ফেলতেও তো পারি! আমার সেদিনকার সেই অভিনয়ের জন্যেই তো এত কষ্ট বউটার।

একজনকে সামনে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো। বললাম—নিকুঞ্জ না?

—কে?

লোকটা যেন আর একটু হলে আমার সঙ্গে ধাক্কা খেত! বললে—কাকে চাই বাবুজী?

বললাম—নিকুঞ্জ বলে কেউ আছে ভাই এখানে? নিকুঞ্জ গাঙ্গুলী?

লোকটা বললে—বাঙালী আছে? নেহি বাবুজী—আমি নতুন আদমী, ছ' মাহিনা এসেছি—

তবে! আবার এগিয়ে গেলাম। চীৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হলো।

একবার একটা ফাঁকা জায়গায় এসে চীৎকার করে ডাকলাম—নিকুঞ্জ—

—কিস্‌কো মাঙ্‌তা বাবুজী?

বললাম—নিকুঞ্জ গাঙ্গুলী বলে একজন থাকে এখানে, কোন্ বাড়িটা বলতে পারো ভাইয়া?

আরো কয়েকজন আমার কথা শুনে কাছে এল। নিকুঞ্জ গাঙ্গুলী। ও নাম কেউ জানে না। ও নামের কেউ এখানে থাকে না।

বললাম—তার বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে·········

চেহারাটার একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম, তবু কেউ চিনতে পারে না। তবে কি নিকুঞ্জও নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে পরিচয় গোপন করে এখানে বাস করছে? নিজের নামটাও হয়ত বদলে ফেলেছে। বলা যায় না। হয়ত সর্বস্ব খুইয়ে বউ-এর রোজগারে খায় শেষ পর্যন্ত। নইলে অত রাগ কেন বউটার? আমার ওপর অত রাগ, অত ঘৃণা নিয়ে কেন জবাবদিহি চেয়েছিল আমার? আমার অভিনয়ের জবাবদিহি!

হঠাৎ একটা গলার আওয়াজ শুনে যেন খুব চেনা মনে হলো।

—আরে, দাদা না?

দেখি বলাই! লুঙ্গি পরা, খালি গায়ে দাঁড়িয়ে। আমি তাকে দেখে অবাক হয়ে গেছি, আমাকে দেখেও বলাই অবাক হয়ে গেছে।

বললে—দাদা, আপনি ?

বললাম—তুমি ? তুমি এখানে কী করতে ? এখানকার পোষ্টাপিসে বদলী হয়েছো নাকি ?

বলাই চুপ করে আমায় পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—চলুন দাদা, আমার বাড়ি চলুন, এসেছেন যখন এখেনে পায়ের ধুলো দিতেই হবে—

বললাম—আমি এসেছি নিকুঞ্জকে খুঁজতে, তার কাছে একবার নিয়ে চলো আমাকে, তোমার বাড়ি আর একদিন যাবো—

বলাই কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—নিকুঞ্জ ?

বললাম—হ্যাঁ, নিকুঞ্জর বউ-এর সঙ্গে দেখা হলো একটু আগে, বউটাকে বড় কষ্ট দিয়েছে, তাকে একবার শায়েস্তা করতে চাই, বলতে গেলে আমিই তো ওদের বিয়ের জন্যে দায়ী।—

বলাই থমকে দাঁড়াল কথাটা শুনে।

বললে—সে কি দাদা, আপনি কিছু শোনেননি !

কী শুনবো ! বলাই বললে—নিকুঞ্জর বিয়ে তো হয়নি ওখানে দাদা।

সে কী ! এত মিথ্যে কথা, এত অভিনয়, সব কি জানাজানি হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত !

বলাই বললে—নিকুঞ্জ তো মিথ্যে কথা বলেছিল ওদের কাছে। ও তো বি-এ পাশ করেনি।

বললাম—তা সে-কথা ওরা জানলে কী করে ?

বলাই হাসতে লাগলো। বললে—সে কথা আমিই ওর মার কাছে গিয়ে সব বলেছিলুম দাদা।

—তুমি বলেছিলে ? তুমি জানলে কী করে ?

বলাই বললে—আজ্ঞে, আপনারা যখন কথা বলতেন রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে আমি যে তখন সব চুপি চুপি শুনতাম—

—তুমি সব জানতে ?

বলাই হাসতে হাসতে বলতে লাগলো—হ্যাঁ দাদা, আপনি দিল্লী যাবার পরই আমি গিয়ে সব ফাঁস করে দিলাম সবিতার মাকে, বিয়ে ভেঙে গেল—নিকুঞ্জ সেই যে পালালো আর এ-মুখো হলো না—

—তাহলে মেয়েটার সঙ্গে কার বিয়ে হলো ?

বলাই বললে—আজ্ঞে, আবার কার সঙ্গে হবে, আমাকেই বিয়ে করতে হলো শেষ কালে।

আমি কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বলাই-এর আপাদ মস্তক চেয়ে দেখতে লাগলাম। দাঁত বার করে হাসছে তখনও। যেন মহা কীর্তি করেছে একটা। কী বলবো বুঝতে পারলাম না। কী বলা উচিত তাও বুঝতে পারলাম না।

বলাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

বললে—আপনার বইটা সিনেমায় দেখলুম দাদা, আপনার খুব নাম হয়েছে চুঁচড়োয়। একটা উপকার করুন না দাদা, আমার একটা চাকরি করে দিন না। পোষ্টাপিসের সে চাকরিটা আমার গেছে, ইন্‌শিওরের খাম চুরি করেছিলুম বলে। এখন বড় কষ্টে আছি দাদা, বউটা যা রোজগার করে—ভদ্দলোকের বাড়ি বাসন মেজে তাইতেই কোনরকমে সংসার চলছে—আপনার তো এখন খুব নাম ডাক। কাউকে বলে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন না—

বলে বলাই খালি গা চুলকোতে লাগলো। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যেই যেন এক নতুন জগৎ দেখতে পেলাম। নিকুঞ্জকে জানতাম এক কান কাটা। কিন্তু বলাই যে এমন দু'কান কাটা তা যেন এতদিনে জানতে পারলাম।

ভেজাল

এতদিন সরষের তেলে ভেজাল চলছিল, ঘি-এ ভেজাল চলছিল, ওষুধে ভেজাল চলছিল। কোর্টে, কাছারিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সর্বত্র ভেজালে ভেজালে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার যা দেখলাম তারপর আমার বাক্‌রোধ না হয়ে আর কোনও উপায় রইল না।

ছোটগল্প ছোটও হতে হবে আবার নাকি গল্পও হতে হবে। গল্পটা ছোট হলো কি না সেটা তবু মেপে বলা সম্ভব, কিন্তু গল্প হলো কি না সেটা বিচার সাপেক্ষ। বিজ্ঞান যেমন অঙ্ক-ঘটিত, গল্প তেমনি রস ঘটিত। অবশ্য অঙ্কেরও রস আছে। আমার এক অঙ্ক-রসিক বন্ধু আছে সে যখন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্রাম করবার জন্যে অঙ্ক কষতে বসে।

রস যে পায় সে পায়। মানে, নিতে জানলে পাথর থেকেও রস নেওয়া যায়। যেমন অশ্বত্থ গাছ। সঞ্জীবচন্দ্র পাহাড়ের ফাটলে সেই রকম একটা অশথগাছকে জন্মাতে দেখে গাছটাকে খুব রসিক বলে ঠাউরেছিলেন। কিন্তু আমি জানি আর একটা অশথ গাছকে। গাছটা আমাদের ছাদের কার্ণিশে জন্মেছিল। গাছটাকে দেখে সঞ্জীবচন্দ্রের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল স্বভাবতই। সত্যিই মনে হয়েছিল বাহাদুর গাছ বটে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম গাছটা শুকিয়ে গেছে। সিমেণ্ট-কংক্রিটের মধ্যে রস খুঁজতে গিয়ে বেচারি বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিককে গালাগালি দেওয়া শক্ত। কারণ বিজ্ঞান বুঝতে গেলে বোদ্ধাকে মোটামুটি বৈজ্ঞানিক হতে হয়। কিংবা অন্য বৈজ্ঞানিকের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য বুঝতে গেলে বোদ্ধা না হলেও চলে। কারণ রস-বোদ্ধা নিরঙ্কুশ। তিনি বলবেন—আমি রস পেলাম না মশাই, সুতরাং এটা নিরস বস্তু।

অর্থাৎ অশথ-গাছটা যে সিমেণ্ট-কংক্রিটের ফাটলের মধ্যে বাঁচতে পারলো না সেটা যেন অশথ-গাছের রস-গ্রহণের অক্ষমতায় নয়, সিমেণ্ট-কংক্রিটের নিরসতার দোষে!

ব্যাপারটা ঠিক এই রকই ঘটেছিল!

আমার বন্ধু বিশ্বনাথ প্যাটেল তখন বোম্বাই-এর পুলিসের বড়কর্তা। বোম্বের মদ-চোলাই-কারবার ধরার কাজের অফিসের হেড।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মদ খাওয়া বন্ধ করতে পেরেছ-টেরেছ কিছু?

বন্ধু বললে—পারবো কী করে? পাবলিক-এর ভালোর জন্যেই প্রোহিবিশনটা হয়েছে, অথচ পিপ্‌লই সাপোর্ট করছে না প্রোহিবিশন! এতে কখনও মদ-খাওয়া বন্ধ করা যায়?

বললাম—তুমি নিশ্চয়ই মদ খাও না?

প্যাটেল বললে—না ভাই, অতটা হিপোক্রিট এখনও হতে পারিনি—

—কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে তোমার বাবা মদ খেতেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মদ খেয়ে গেছেন!

প্যাটেল বললে—এ তো ভারি আশ্চর্য। বাবা মদ খেয়েছেন বলে আমি মদের বিরুদ্ধে বলতে পারবো না?

—আলবৎ পারবে! তোমার বাবা মদ খেতেন বলেই আরো জোর করে প্রতিবাদ করবে। হিটলারের বাবা মদ খেত বলেই হিটলার ছিল টিটোটেলার।

—তাহলে কী বলতে চাও!

বললাম—আমি বলতে চাই এই যে, তোমার চেয়ে আর বেশি ভালো করে কেউ জানে না যে মদের নেশা ছাড়া কত শক্ত !

প্যাটেল বললে—সেইজন্যেই তো আমরা পারমিটের ব্যবস্থা করেছি। যারা পুরোন নেশাখোর, তাদের আমরা পারমিট দিই, সেই পারমিট দেখালে তারা একটা লিমিটেড কোয়ানটিটি লিকার পায়—

—তাতে কি তাদের চলে ?

প্যাটেল বললে—চলে না তো বটেই। তবু নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল। একেবারে না খেতে পেলে তারা মারা যাবে, তাই এই ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা চাই দেশ থেকে মদ খাওয়া উঠে যাক। এতে অনেক টাকা রেভিনিউ বন্ধ হচ্ছে বটে কিন্তু মানুষের মর‍্যাল ভাল হচ্ছে।

বিশ্বনাথ প্যাটেলের বাবাকে আমরা দেখেছি। নাগপুরে বিশ্বনাথদের বহু পুরুষের বাস। গণেশপুজোর দিন বিরাট হৈ-চৈ হতো। সেদিন নাগপুরের গণ্যমান্য লোকদের নেমন্তন্ন হতো তাদের বাড়িতে। বড়লোক মানুষ। বিশ্বনাথের বাবার ছিল ফরেস্ট। ফরেস্ট থেকে প্রচুর টাকা আমদানি হতো। সেকালে সেই টাকায় সব রকম বাবুয়ানি করেও অপব্যয় করবার মত অনেক টাকা বাড়তি থাকতো।

আমরা দেখেছি সেই সব মাতলামি। গণেশ পুজোর দিন সকাল থেকেই আসর বসতো গানের। এদিকে গানও চলছে, ওদিকে মদও চলছে। শেষকালের দিকে আর জ্ঞান থাকতো না বিশ্বনাথ প্যাটেলের বাবার। তখন তিনি বাড়ির উঠোনেই নাচতে আরম্ভ করতেন। বিরাট ভুঁড়িওয়ালা চেহারা। ধপ্‌ধপ্‌ করছে গায়ের রং। গায়ের জামা তখন মাতলামির চোটে ছিঁড়ে গেছে। সেই ছেঁড়া জামা, পরণের ধুতি খসে খসে যাচ্ছে, আর তিনি ধেই ধেই করে নেচে চলেছেন।

আমরা ছোটরা সবাই বারান্দার ভেতরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়োদের সব মাতলামি দেখে মজা পাচ্ছি আর হাসছি। বিশ্বনাথের মা'ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। কিন্তু কিছু করবার উপায়ও নেই।

চাকরটা উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলেছিল কর্তাবাবুর কাণ্ড দেখে।

বিশ্বনাথের মা আর থাকতে পারলেন না।

বললেন—এ্যাই ধনিয়া, দাঁত বার করে হাসছিস যে বড় ? খুব মজা পেয়েছিস, না ! মজা দেখবার জন্যে তোমাকে রাখা হয়েছে ? দেখছিস না কর্তাবাবু মাতলামি করছে ? কর্তাবাবুদের কোমরের কাপড়ের কশি খুলে যাচ্ছে, সেদিকে নজর নেই ?

হঠাৎ কী যে হলো, কর্তাবাবুরও নেশা চটে গেল।

ডাকলেন—এই ধনিয়া, দাঁত বার করে হাসছিস যে বড় ? খুব মজা পেয়েছিস, না ? মজা দেখবার জন্যে তোমাকে রাখা হয়েছে ? দেখছিস্ না আমি মাতলামি করছি ? আমার কাপড়ের কশি খুলে গেছে, নজরে পড়ছে না তোর ?

ধনিয়া বহুদিন ধরে কর্তাবাবুকে সেবা করে আসছে। বাবুর কথায় লজ্জায় পড়ে গেল।

কর্তাবাবু বললে—আমার মাথায় জল ঢাল বেটা, বাল্তি আন্—যা—

বিশ্বনাথের বাবার এ-সব কাণ্ড দেখে আমরা সবাই হাসাহাসি করেছি বহুদিন। যে এ গল্প শুনেছে সে-ই হেসেছে।

এবার সেই কর্তাবাবুর ছেলেকেই বোম্বেতে এসে মদ-খাওয়া বন্ধ করবার চাকরি করতে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

তা বিশ্বনাথ প্যাটেল সত্যিই ভাল ছেলে। আমাদের পাড়ার যতগুলো ছেলে এক ক্লাসে পড়তাম, তাদের সকলের চেয়ে ভালো।

বিশ্বনাথ বললে—আসলে ভাই মদ কেউ খায় না, মদই সকলকে খায়।

বললাম—তা আমি জানি। জানি বলেই তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি শেষকালে এই চাকরিতে ঢুকলে। এখানে কি তুমি কিছু কাজ দেখাতে পারবে ?

বোধ হয় বিশ্বনাথের নিজের মনেও সন্দেহ ছিল। আর তা ছাড়া চাকরি মানেই চাকরি। চাকরিতে তো বাছ-বিচার করার উপায় থাকে না সব সময়ে। বিশ্বনাথকেও নিজের অনিচ্ছাতে এই চাকরি নিতে হয়েছিল। কিন্তু বোম্বেতে এসে যে বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে, আর বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হবার ফলে যে এমন একটা ছোটগল্প জুটে যাবে তা কল্পনাই করতে পারিনি।

বোম্বেতে আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠাইমা থাকতেন। দূর সম্পর্কের হলেও এককালে জ্যাঠাইমার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করতেন। আমাদের বিপদ-আপদের দিনে সাহায্য করেছেন। এখন অনেক বয়েস হয়েছে। প্রায় আশি! কিন্তু তবু স্বাস্থ্য ভাঙেনি। জ্যাঠাইমা এখনও ছোলা ভাজা মটর ভাজা খেতে পারতেন চিবিয়ে চিবিয়ে। বোম্বেতে জ্যাঠাইমা'র জামাই বিরাট বড় লোক ব্যবসায়ী। ভদ্রলোক মহারাষ্ট্রী। কী ভাবে আমার জাঠতুতো বোনের সঙ্গে কলেজে পড়তে পড়তে ভদ্রলোকের বিয়ে হয়ে যায়। তখন অবস্থা তত ভাল ছিল না তাদের। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হতে শুরু

করে। তখন একটার পর একটা প্রপার্টি করতে আরম্ভ করে। আমার ভগ্নিপতি শেষকালে এত টাকার মালিক হয়ে পড়ে যে, টাকার আর শেষ থাকে না। বোম্বের সমস্ত লোক তার নাম বললেই চিনতে পারে।

আমি এমনিতে হোটেলেই উঠেছিলাম। জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করিনি।

টেলিফোন করতেই জ্যাঠাইমা বললেন—তুই হোটেলে উঠতে গেলি কেন? আমার এখানে চলে আয়—

জ্যাঠাইমা যে-রকম ভাবে হুকুম করলে তার পর আর আমার হোটেলে থাকা চললো না।

সেইদিনই আমার ভগ্নিপতি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে তুললো। দিদি যদিও অবাঙালীকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু ভগ্নিপতিকে পুরো বাঙালী করতে ভোলেনি। নামেই শুধু মিস্টার দেশপাণ্ডে, কিন্তু আসলে ভেতো বাঙালী। চেহারা দেখে কে বলবে যে, এই মানুষটাই হাজার হাজার লোক খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। বোম্বের কাপড়ের মিল আর শেয়ার-মার্কেটটাকে যেন মিস্টার দেশপাণ্ডে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে। সকাল থেকে যে-সব লোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কিউ দেয়, তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আর ওদিকে আমার দিদি বেশ স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দিন রান্নাঘরের ভেতরে কী অমানুষিক পরিশ্রম করে কেবল ভাল ভাল রান্না করে যায়।

মিস্টার দেশপাণ্ডে বললে—তোমার দিদির ওই কেমন শখ দেখ না, কেবল রান্না, রান্না আর রান্না—

দিদির বোধ হয় রান্নার বাতিক ছিল।

বাড়িতে যে আসবে তাকে দিদি না খাইয়ে ছাড়বে না। শুধু খাওয়ানো নয়, খেতে হবে, রান্না কেমন হয়েছে বলতে হবে। আর একবার রান্নার প্রশংসা করলে তো আর কথাই নেই, বার বার খাইয়ে তার পেটে গ্যাসট্রিক-আল্‌সার না করিয়ে দিয়ে আর তাকে ছাড়বে না।

আমি আমার জামাইবাবুর দিকে চেয়ে বললাম—আপনি? আপনার তো পেট ভাল রয়েছে! আপনার তো আল্‌সার হয়নি?

দিদি বললে—ওঁর কথা ছেড়ে দাও—উনি কি এ সব খান নাকি? এসব ছুঁয়েই দেখবে না—

—কেন? আল্‌সারের ভয়ে?

জামাইবাবু হাসতে লাগলো। কিছু কথা বললে না।

দিদি হাসতে হাসতে বললে—ওঁর পেটে কি আর খাবার জায়গা থাকে? সন্ধ্যে থেকেই তো চলে কি না!

তা সত্যিই তাই। সন্ধ্যে থেকেই জামাইবাবুর বোতল আসে। সোডা আসে। যারা জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধব তারাও খায়। দিদি তখন রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। যারা অতিথি তারাও খাবে। আর খাওয়াও সামান্য কিছু নয়। একেবারে পুরো ডিনার। টাকা পয়সার অভাব নেই সংসারে। সুতরাং অঢেল খাওয়া। যে যত পারো খাও। দিদি যেমন খাওয়াতে ভালবাসে, অতিথিরও তেমনি কামাই নেই। ব্রেকফাস্টের সময় কেউ এলে সে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবে। লাঞ্চের সময়ে লাঞ্চ, ডিনারের সময় ডিনার।

আর আমার জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা থাকতো দোতলায়। দোতলায় শাশুড়ির জন্যে জামাইবাবু এলাহি পুজোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেখানে ছিল শাশুড়ির ঠাকুরঘর, গঙ্গাজলের জালা। কোষাকুষি। হরিণের চামড়ার আসন। শাঁখ, ধূপ-ধুনোর বন্দোবস্ত। সকাল থেকে উঠেই জ্যাঠাইমা তার পুজোর জোগাড় নিয়ে ব্যস্ত। বেলা তিনটের সময় একমুঠো ভাত খেত। তাও নিরিমিষ। আর রাত্তিরটা উপোষ।

জ্যাঠাইমার ব্রহ্মচর্য ছিল বড় কঠোর। ওই এক মেয়ে নিয়ে জ্যাঠাইমা বিধবা হয়েছিল। ছোটবেলা থেকে নাগপুরে দেখেছি জ্যাঠাইমা ঠিক ওই রকম করেই দিন কাটিয়েছে। জ্যাঠামশাই টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া বাড়ি-ভাড়ারও আয় ছিল। সেই টাকাতেই মেয়ে কলেজের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছে, এম-এ পাশ করেছে। আর জ্যাঠাইমা তার গুরুদের নিয়ে মেতে দিন কাটিয়েছে।

জ্যাঠাইমা বললে—আমি বাবা ওদের কাছে খাইনে—

—কেন? খাওনা কেন তুমি?

জ্যাঠাইমা বললে—ওখেনে বড় নোংরা ওরা, কেবল মুরগী-টুরগী রাঁধে, ও-সব আমার ভাল লাগে না। গেলে আবার কাপড় কাচতে হবে তো—

ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিকটা দেখলাম সেই রকমই রয়েছে জ্যাঠাইমার।

জ্যাঠাইমা জিজ্ঞেস করলে—ক'দিন থাকবি বোম্বেতে?

বললাম—কাজ শেষ হয়ে গেলেই চলে যাবো—

—জন্মাষ্টমীর দিন থাকবি?

—কবে জন্মাষ্টমী?

—এই তো রবিবার। খুব ভালো করে 'ঝুলন' পুজো করি জন্মাষ্টমীর দিন। অনেক লোকজন আসবে, এবার অনেককে নেমন্তন্ন করেছি কি না, সবাই খাবে এখানে!

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এখানে এসেও সেই তখনকার মত পুজো-আচ্চা নিয়েই মেতে আছ জ্যাঠাইমা? তোমার দেখছি কিছুই বদলায়নি!

সত্যিই বয়েস বাড়লেও চেহারা সেই আগেকার মতই আছে।

অদ্ভুত সত্যবাদী ছিল জ্যাঠাইমা। একবার একটা সত্যি কথা বলার জন্যে একটা চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি জ্যাঠাইমার হাত-ছাড়া হয়ে যায়।

উকীল বলেছিল—আপনার কিছু বলবার দরকার নেই, আপনি শুধু বলবেন যে, আমি এই সাক্ষীকে চিনি—আর কিছু বলতে হবে না।

জ্যাঠাইমা বলেছিল—কিন্তু আমি যে ওকে চিনি না।

—তা না চিনলেই বা, চিনি বলতে দোষ কী! আপনার চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তিটা যে বেঁচে যাবে, সেটা ভাবছেন না?

জ্যাঠাইমা বলেছিল—না বাবা, সে আমি বলতে পারবো না, মিথ্যে কথা আমার আসে না—

—কিন্তু ভেবে দেখুন, চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তিটা যে আপনার হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!

জ্যাঠাইমা বলেছিল—তা হোক বাবা, পরলোকে গিয়ে কি আমি মিথ্যে কথা বলে নরকে যাবো?

তা সে-সব কথা যাক্, দেখলাম জামাই-এর বাড়িতে এসেও জ্যাঠাইমার সেই স্বভাব যায়নি। এখানেও সেই ধর্ম-কর্ম এখানেও সেই বাছ-বিচার, এখানেও সেই ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যের মাপকাঠি নিয়ে মাথা উঁচু করে দিন কাটাচ্ছে।

বললে—টাকাই থাকুক তোর আর যা-ই থাকুক, আসলে তো সেই পাপ-পুণ্য নিয়ে পরকালে বিচার হবে তোর!

তা এর পর দিনই প্যাটেলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা আমাদের নাগপুরের বিশ্বনাথ প্যাটেল!

আর অনেক দিন পরে দেখা। সুতরাং ছাড়লে না। অফিসে টেনে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প করলে। বন্ধু-বান্ধব কে কী করছে জিজ্ঞেস করলে।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—কোথায় উঠেছিস তুই?

বললুম সব। মিস্টার দেশপাণ্ডের নাম শোনেনি এমন লোক বোম্বেতে নেই তাও জানলাম।

বললাম—এত তো তোদের প্রোহিবিশন, এত তো তোরা চেষ্টা করছিস, আমার ভগ্নিপতি তো মদ খায়, তার মদ খাওয়া তো বন্ধ করতে পারিস নি। তার মদ খাওয়া বন্ধ করতে পারলে বুঝতুম তোর কেরামতি!

বিশ্বনাথ বললে—আমি তো ভাই নতুন এখানে এসেছি, একবার দেখি চেষ্টা করে কিছু করতে পারি কি না!

তারপর একটু থেমে বললে—আসলে কী হয়েছে জানিস, কারোর কোনও কো-অপারেশন পাচ্ছি না, গভর্নমেণ্টও কোনও সাহায্য করছে না, পাবলিকও না।

—কেন? গভর্নমেণ্ট কেন সাহায্য করছে না?

—গভর্নমেণ্ট অফিসাররাও যে প্রায় সব মাতাল। সবাই মদ খায়। আমাদের ডিপার্টমেণ্টের প্রায় সব পুলিস অফিসাররাই যে খায়—কাকে বারণ করি! তা ছাড়া, বেশি চেষ্টা করতে গেলে আমিই হয়ত কোন্‌দিন খুন হয়ে যাবো—

—কেন?

—পুলিস যে বহু টাকা ঘুঁষ পায়! আমি বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাদের অনেক টাকা আয় কমে যাবে।

বললাম—কিন্তু পাবলিক? পাবলিকের তো সাহায্য করা উচিত; তারা কেন কো-অপারেট করছে না?

বিশ্বনাথ বললে—সে অনেক কথা আছে ভাই, তোকে সে-সব কথা বলা যাবে না।

—কেন?

বিশ্বনাথ বললে—তবে ছাখ, তোকে দেখাচ্ছি—

বলে বিশ্বনাথ একজন কনস্টেবলকে একটা ফাইল আনতে বললে। ফাইলটা দিয়ে কনস্টেবলটা চলে যেতেই বিশ্বনাথ আমাকে ফাইলটা দেখালে।

বললে—এই ছাখ্—কত লোকের মদের পারমিট দেওয়া হয়েছে, তুই নিজেই ছাখ—।

আমি নামগুলো পড়তে লাগলাম। অসংখ্য নামের লিস্ট। কাউকেই চিনি না। তার মধ্যে আবার অনেক মেয়ের নাম রয়েছে। ডাক্তাররা যাদের সার্টিফিকেট দিয়েছে, তাদের মদের পারমিট দেওয়া হয়েছে। আমার ভগ্নিপতি মিস্টার দেশপাণ্ডের নামও রয়েছে তার মধ্যে।

বিশ্বনাথ বললে—এই মেয়েদের লিস্টটা ভাখ্, এই ভাখ্ এক আশি বছরের বুড়ি, সেও মদ খায়—কার কথা আর বলবো? কার নামেই বা দোষ দেব ?

জিজ্ঞেস করলাম—কে ?

বিশ্বনাথ বললে—এই যে মিসেস ভট্টাচার্য, বয়েস আশি,—

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দেখলাম আমার জ্যাঠাইমার নাম। শ্রীমতী আরতি বালা ভট্টাচার্য, এজ্—এইট্টি—মাসে পনেরো বোতল—

আমি বললাম—এ তো আমার জ্যাঠাইমা—একে যে আমি ভাল করে জানি—

বিশ্বনাথ বললে—তা জানিস, বেশ করিস, আমি নিজে গিয়ে এর এন্‌কোয়ারি করেছি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি মদ খান? তিনি বললেন—হ্যাঁ বাবা, আমি মদ খাই—

প্যাটেলের কথা শুনে আমি রেগে গেলাম। রেগে চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম।

বললাম—আর যার সম্বন্ধেই তুই বলিস্ আমার জ্যাঠাইমার সম্বন্ধে ওকথা বলিস নি, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না—জানিস জ্যাঠাইমা চল্লিশ হাজার টাকার প্রপার্টি ছেড়ে দিয়েছে শুধু একটা সামান্য মিথ্যে না বলার জন্যে !

বলে আর দাঁড়ালাম না। সেখান থেকে উঠে সোজা চলে এলাম জ্যাঠাইমা'র বাড়িতে।

জ্যাঠাইমা তখন পুজো করছিল। জন্মাষ্টমীর পুজো। জ্যাঠাইমার ঘরে তখন অনেক ভিড়। বোম্বের বিধবা মহিলাদের ভিড়। ব্রাহ্মণ পুরুত পুজো করছে। থরে-থরে নৈবেদ্য সাজানো।

আমার কেমন জ্যাঠাইমাকে ভণ্ড মনে হলো। মনে হলো, এতদিন যা কিছু করে এসেছে জ্যাঠাইমা সব যেন লোক-দেখানো।

আমি কিছু না-বলে তেতলায় চলে এলাম। কিন্তু মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগলো জ্যাঠাইমা কিনা মদ খায়! বাইরের এই পুজো, উপোষ, একাদশী, বার-ব্রত সমস্ত কিছু তাহলে জ্যাঠাইমার ভণ্ডামি!

বেশিক্ষণ কিন্তু থাকতে পারলাম না। রাত হলে যখন সবাই বাড়ি চলে গেছে, তখন আবার দোতলায় নামলাম। দেখলাম, জ্যাঠাইমা গুরুদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তখন প্রণাম করছে।

আমাকে দেখেই বলল—কীরে, প্রসাদ খাবি ?

বললাম—জ্যাঠাইমা, একটা কথা বলবো, তুমি মদ খাও ?

জ্যাঠাইমা হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে—আমি মদ খাই ? কে বললে তোকে ?

—বলবে আবার কে ? আমি পুলিসের খাতায় তোমার নাম দেখে এলুম ! পনেরো বোতল মদ তোমার মাসে বরাদ্দ—ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে !

—ও, তাই বল্ !

বলে জ্যাঠাইমা হাসলো।

—হাসছো কেন ? খাও না তুমি ?

জ্যাঠাইমা বললে—হ্যাঁ খাই—

বলে জ্যাঠাইমা একটু থামলো। তারপর বললে—তা সে তো সবাই খায়—

—সবাই খায় ? সবাই মানে ?

—মানে স্বরমাও খায়। বাড়িতে যে-যে আছে চাকর-বাকর-ঝি সবাই-ই খায়। সবাই পনেরো বোতল খায়।

—তার মানে ?

—জামাই পায় মাত্তোর পনেরো বোতল। পনেরো বোতলে কী চলে ? তাই আমাদের সকলের নামেই পারমিট আছে। পুলিশ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল —আপনি মদ খান ? আমি বলেছিলুম—হ্যাঁ—এই পর্যন্ত ! পনেরো বোতলে যে জামাই-এর চলে না রে। তাই তো ওই মিথ্যে কথা বলতে হলো আমাকে ! চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তির জন্যে একদিন মিথ্যে কথা বলতে পারিনি, কিন্তু জামাই-এর জন্যে মিথ্যে কথাটা বেমালুম বলে ফেললুম। কী করবো বল্ বাবা ! নইলে যে জামাই-এর আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে ! ও কি বাঁচবে ?

জ্যাঠাইমার কথা শুনে বড় কষ্ট হলো। ভাবলাম, এ কী হলো ইণ্ডিয়ার। একজন খাঁটি মানুষও রইল না আর। জ্যাঠাইমার মত মানুষকেও শেষকালে মিথ্যেবাদী বানিয়ে ছাড়লে ! আশি বছরের বুড়ো জ্যাঠাইমাও ভেজাল হয়ে গেল। এর চেয়ে যদি জ্যাঠাইমা সত্যি-সত্যিই পনোরো বোতল মদ খেত, সে-ও যে ভাল ছিল।

গল্প না-লেখার গল্প

আমাকে মুশকিলে ফেলেছেন আপনি। গল্প লিখবো না বলেই তো এখানে চলে এসেছি। বেশ হাত-পা-কল্পনা আকাশে আর এখানকার সমুদ্রে মেলে দিয়ে বসে আছি। এমন সময় আপনার চিঠি এল। আপনার চিঠির উত্তরটা না-দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আমিও গল্প লেখার দায় থেকে অব্যাহতি পাই! এই আকাশ, এই সমুদ্র, এই ব্রেকার্স, এই টুরিস্ট-হাউস, এই সাইপ্রাস, গাছ সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাহলে আমি আবার একাত্ম হয়ে যেতে পারি। কিন্তু আপনার চিঠিই আজকে আমার কাল হলো। আপনার চিঠিই আমাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিলে যে আমি গল্প-লেখক।

আচ্ছা গল্প কেন লেখে লোকে, বলতে পারেন? শুধু গল্প লেখাই বা কেন? গান, ছবি, মূর্তি, যা কিছু শিল্প আছে পৃথিবীতে, তাদের পেছনে কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করে? নিজেকে প্রতিষ্ঠা? আত্মপ্রকাশ? কিম্বা মানুষের মনোরঞ্জন? এ-সম্বন্ধে হাজার-হাজার বইতে হাজার-হাজার ব্যাখ্যা তো আপনি পড়েছেন। তাদের মধ্যে কোনটা সত্যি বলে আপনার মনে হয়, বলুন তো?

আসলে আমি এখানে এসেছিলাম বিশ্রাম করতে। এই মহাবলীপুরম্-এ। তা আপনি জানেন। আসবার আগে আপনাকে আমি এ কথা বলে এসেছিলাম। বলেছিলাম পুজোর সময় এ-বছরে কিছু লিখবো না। সেইভাবেই নিজের মনকে তৈরিও করে নিয়েছিলাম। এই মহাবলীপুরম-এর শান্ত নিরিবিলি টুরিস্ট-হাউসে বসে কেবল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবো ভেবেছিলাম। লেখা মানেই তো কেবল খ্যাতির পেছনে দৌড়োনো। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিযোগিতায় নেমে পরীক্ষা দেওয়া। এবার—মানে এই পুজোর সময় ভেবেছিলাম সেই প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকবো।

কিন্তু আপনার চিঠিই আমার কাল হলো।

আপনার চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মানুষ থেকে হঠাৎ আবার গল্প-লেখকে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম। আমার বিশ্রাম নষ্ট হলো, আমার ঘুম নষ্ট হলো, আমার খিদে নষ্ট হলো, আমার শান্তি নষ্ট হলো। এ যে কী যন্ত্রণা তা কেউ বুঝতে পারবে না। মানুষ হওয়া বেশ আরামের। কিন্তু গল্পলেখক হওয়া বড় কষ্টের। সৃষ্টিই যে কষ্টের জিনিস!

হাতের কাছে আর কাউকে পাই না। এমন কেউ নেই যাকে নিয়ে গল্প

বানাই। সারা টুরিস্ট হাউসে আমি একলা। সবসুদ্ধ ছ'খানা ঘর আছে টুরিস্ট-হাউসে। সবগুলোই ক'দিন ধরে ফাঁকা। কোনও গেস্ট নেই। কাকে আশ্রয় করে গল্প লিখবো বলুন ?

যার সঙ্গে রোজ দু'বার তিনবার করে দেখা হয়, সে এই টুরিস্ট-হাউসের ম্যানেজার। মিস্টার চন্দ্রগেশম্। সকালবেলাই একবার আসে জানতে—ব্রেকফাস্টে আমি আজ কী খাবো ? কর্ন-ফ্লেক্স্ না কোয়েকার ওটস্, না ওম্‌লেট না এগ্ ফ্রাই।

আবার দশটার সময় আর একবার আসে—ল্যাঞ্চে কী খাবো ? রোস্ট-চিকেন না চিকেন গ্রিল্, না চিকেন-কারি। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই রকম রোজই আসে। তারপর কখনও কখনও বসে দু'চার মিনিট গল্পও করে। ভদ্রলোকের জন্ম এর্ণাকুলামে। স্ত্রী-পুত্র থাকে হায়দরাবাদে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এই ক'দিনে অনেক কথাই জেনে নিয়েছি মিস্টার চন্দ্রগেশম্ সম্বন্ধে।

আমি আপনার চিঠিটা পড়ছিলাম, এমন সময় মিস্টার চন্দ্রগেশম এল।

বললে—গুড্ মর্নিং স্যার—

বললাম—গুড্ মর্নিং চন্দ্রগেশম।

চন্দ্রগেশম বললে—আজকে লাঞ্চে তাহলে কী খাবেন, বলুন ?

বললাম—ও নিয়ে আর ভাবতে ভাল লাগছে না, আপনার যা-খুশি তৈরি করুন—

চন্দ্রগেশম সে-জাতীয় ম্যানেজার নয়, যে আমি যা-খুশি করতে বলবো আর সে-ও যা খুশি বানিয়ে দেবে। বড় অনেস্ট লোক মিস্টার চন্দ্রগেশম্। বড় পরিশ্রমী। বড় আপরাইট। টুরিস্ট-হাউসের একটা পয়সা এদিক-ওদিক করবে না। প্রত্যেকটি নয়া-পয়সার হিসেব খাতায় লিখে ক্যাশে জমা দেবে। এই মহাবলীপুরম টুরিস্ট-হাউসে নানা-চরিত্রের লোক আসে, নানা উদ্দেশ্য নিয়ে। মাদ্রাজ সিটি থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে এমন চমৎকার নিরিবিলি জায়গা আর একটা নেই। রাত এগারোটা বারোটার সময় হঠাৎ এক-একদিন একটা গাড়ি এসে হাজির হয়। সঙ্গে থাকে মেয়ে-মানুষ, আর থাকে বোতল। একটা ঘর খুলে দেয় ম্যানেজার। তারপর ঘরের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আবার ভোর হবার আগেই কখন যে তারা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়, তা কাক-পক্ষীতেও টের পায় না। আমিও সকালে ঘুম থেকে উঠে আর তাদের দেখতে পাই না।

কিন্তু মিস্টার চন্দ্রগেশম্ হিসেবের খাতায় সে-টাকাটা ঠিক জমা দিয়ে লিখে রাখবে। এতটুকু গোলমাল হবে না তার হিসেবে।

অথচ এইগুলোই তো ম্যানেজারদের উপরি ইনকাম। হেড-অফিস সেই ম্যাড্রাসে। এখানকার খুচরো হিসেবের খবর রাখা সেখান থেকে সম্ভব নয়। এই টাকাগুলোই যদি মিস্টার চন্দ্রগেশম্ নিজের পকেটে পোরে তো মাসে আটশো-ন'শো টাকা উপরি আয় হতে পারে তার। আগে মিস্টার চন্দ্রগেশমের জায়গায় যে ছিল, এই রকম করে প্রচুর টাকা উপায় করে অনেক প্রপার্টি করে নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

আমি বলতাম—আপনি সত্যি খুব অনেষ্ট লোক মিস্টার চন্দ্রগেশম্—

মিস্টার চন্দ্রগেশম্ বলতো—মিস্টার ম্যাক্ মারকুইস্‌ও আমাকে তাই বলতেন—

—কে? মিস্টার-ম্যাকমারকুইস কে?

—আমাদের 'উটি-ইউরোপীয়ান ক্লাবের' প্রেসিডেন্ট! উটকামণ্ডের কমিশনার অব পুলিস—

তারপর শুরু হতো মিস্টার চন্দ্রগেশমের গল্প। গল্প ঠিক মত করতে পারত না মিস্টার চন্দ্রগেশম। আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গল্প বার করতে চেষ্টা করতাম তার মুখ দিয়ে। লেখাপড়া বেশি শেখেনি মিস্টার চন্দ্রগেশম। কিন্তু অনেস্টি শিখেছে, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াস্ হতে শিখেছে। অন্যলোকের বিশ্বাসভাজন হতে শিখেছে। মানুষ যার জন্যে লেখাপড়া শেখে' সেই জিনিসটাই শিখে নিয়েছে। এই মহাবলীপুরম-এর টুরিস্ট-হাউস তৈরি হয়েছে ১৯৫৭ সালে। তার দু'বছর পর থেকে এইখানে চাকরি করছে মিস্টার চন্দ্রগেশম। একদিনের জন্যে ছুটি নেয়নি, একদিনের জন্যে সিক-রিপোর্ট করেনি। এমন ডিউটিফুল মানুষ আমি অন্তত আমার জীবনে দেখিনি।

বললে বিশ্বাস করবেন না, যে মহাবলীপুরম সী-বিচে বেড়াবার জন্যে আমি এক হাজার মাইল দূর থেকে এত টাকা খরচ করে এসেছি, যে সী-বিচে স্নান করবার জন্যে ইউ-কে, ইউ-এস-এ, ফ্রান্স, ইটালী থেকে দলে দলে লোক রোজ আসছে। সেই সী-বিচেই মিস্টার চন্দ্রগেশম একদিনও যায়নি। যত সব মূল্যবান রুইনস্ আছে সমুদ্রের ধারে, তাও কোনও দিন দেখতে যায়নি মিস্টার চন্দ্রগেশম।

মিস্টার চন্দ্রগেশমকে বললেই বলবে—সময় কোথায় বলুন আমার, এই তো আপনার লাঞ্চের জন্যে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, এখন চাকর পাঠাবো ভিলেজে ফাউল কিনতে। তারপর দুপুর বারোটায় জেলে-পাড়ায় পাঠাবো ফিশ কিনতে—ডিউটি তো আগে—

এমনি করেই আঠারো বছর বয়েস থেকে মিস্টার চন্দ্রগেশম জীবন আরম্ভ

করেছিল। এইটেই লোকটার ক্যারেকটার। আমি এই টুরিস্ট-হাউসে আসার পর দিন থেকেই এইভাবে দেখে আসছি মিস্টার চন্দ্রগেশমকে।

এই এমন সময় আপনার চিঠি এল।

চিঠিটা তখনও হাতে ধরা রয়েছে। আমি মিস্টার চন্দ্রগেশমের দিকে চেয়ে দেখলাম। হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায়, তাকেই বিপদের সময় লোকে আশ্রয় করে। কিন্তু আমি জানতাম মিস্টার চন্দ্রগেশম আমার আশায় ছাই দিয়ে দেবে। তাই চন্দ্রগেশমকে এড়াবার জন্যেই বললাম—আমার লাঞ্চের জন্যে ভাবতে হবে না, আপনি যা-খুশি বানিয়ে দেবেন, আমার খাওয়ার অত বালাই নেই—

মিস্টার চন্দ্রগেশম বললে—তা বললে তো শুনবো না স্যার, আমাদের টুরিস্ট-হাউসের যে বদনাম হয়ে যাবে—

বললাম—কেন, বদনাম হবে কেন?

মিস্টার চন্দ্রগেশম বললে—আপনি স্যার খেয়ে যদি খুশী না হন, তো বদনাম হবে না? আপনার তৃপ্তি না হলে আপনি কেন এখানে এত টাকা খরচ করে থাকবেন? আপনার কীসের দায়? আমি যখন স্যার 'উটি-ইউরোপীয়ান ক্লাবে' চাকরি করতাম, তখনও আমি তাই বলেছিলাম মিস্টার ম্যাক-মারকুইসকে। মিস্টার ম্যাক-মারকুইসের নাম শুনেছেন? 'উটি-ইউরোপীয়ান 'ক্লাবে প্রেসিডেন্ট? উটাকামণ্ডের পুলিশ কমিশনার—

বুঝতেই পারছেন আপনার চিঠি পাবার পর গল্প সম্বন্ধে যে একটু ভাববো তারও ফুরসুত দিলে না মিস্টার চন্দ্রগেশম। আমার গল্প লেখা মাথায় উঠলো!

তাকে সরাবার জন্যেই আবার বললাম—আপনি আমার লাঞ্চের জন্যে ভাববেন না, আপনি এখন গিয়ে চাকরকে ফাউল কিনতে পাঠান—

মিস্টার চন্দ্রগেশম-এর হঠাৎ কী হলো কে জানে। চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসে পড়লো। আমি এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম।

মিস্টার চন্দ্রগেশম বললে—আপনার কাজের ব্যাঘাত করছি না তো স্যার?

বললাম—না না, ব্যাঘাত আর কি, এই চিঠিটা এল কি না, তাই পড়ছিলাম—

মিস্টার চন্দ্রগেশম হঠাৎ বললে—আপনাকে আমার একটা জিনিস দেখিয়েছি?

—কী জিনিস? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মিস্টার চন্দ্রগেশম আবার বললে—কিছু দেখাইনি আপনাকে?

—কী? জিনিসটা কী, বলুন না?

মিস্টার চন্দ্রগেশম নিজের মনেই যেন ভাবতে লাগলো আমাকে জিনিসটা

দেখিয়েছে কি দেখায়নি। তারপর একটু ভেবে নিয়ে নিজের মনেই যেন বললে—তাহলে কাকে দেখালুম?

তারপর আবার আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি ঠিক বলছেন আপনাকে দেখাইনি?

আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—কী? জিনিসটা কী, তাই বলুন না?

তবু যেন মিস্টার চন্দ্রগেশমের সন্দেহ গেল না। এমন তো হয় না। এমন তো হবার কথা নয়। যেন মহা মুশকিলে পড়লো মিস্টার চন্দ্রগেশম!

মিস্টার চন্দ্রগেশমকে এতদিনের মধ্যে একবারও এমন বিভ্রান্ত অবস্থায় দেখিনি। কী এমন জিনিস, যা না-দেখাবার জন্যে মনে শান্তি পাচ্ছে না।

—সেদিন কুইন অব গ্রীস এসেছিল, তাঁর সেক্রেটারিকেও দেখিয়েছি। তারপর কুইন এলিজাবেথ এসেছিল, তাঁর সেক্রেটারিকেও দেখিয়েছি, আর আপনাকেই দেখালাম না?

বলতে বলতে মিস্টার চন্দ্রগেশম উঠে চলে গেল।

আপনার চিঠিটা আবার একবার পড়লাম। আপনি লিখেছেন—'পুজোর সময় আপনার একটা লেখা চাই-ই। দু'পাতা হোক তিন-পাতা হোক আপত্তি নেই। আমি বিজ্ঞাপনে নাম দিয়ে দিলাম।'

আপনি তো চিঠি লিখেই খালাস। এবং বন্ধুত্বের দাবীতে হুকুম করেই খালাস। পাঠকও আমার ওপর দাবী করে বসে। বলে—তুমি যত বই লিখবে, সবগুলো ভালো হওয়া চাই। আগেকার লেখার চেয়েও ভাল হওয়া চাই। একটা বই ভাল লিখলে চলবে না, ভালর চেয়েও ভাল-ভাল বই লিখতে হবে। উত্তরোত্তর ভাল লিখতে হবে।

পাঠকদের এ-দাবী যে অসম্ভব তা কেমন করে তাদের বোঝাই? মন-শরীর-মেধা সব কিছুরই তো একটা সীমা আছে। এটা স্বীকার করি না বলেই আমরা এই পুজোর সময় এক-একজন ছ'খানা সাতখানা উপন্যাস লিখে ফেলি এক মাসে। এর জন্যে পাঠকরাও যেমন দায়ী, সম্পাদকরাও তো তেমনি দায়ী। তাই তো কিছু লিখবো না বলে এখানে পালিয়ে এসে বসে আছি। এই মহাবলীপুরম-এ!

সুতরাং আপনাকে মিনতি করি, আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করুন আপনি। এবারকার পুজো-সাহিত্যের উৎসবে আমি না-ই বা রইলুম। হয়ত এবার গল্প

না-লিখেই আপনার পত্রিকার আমি বেশি উপকার করতে পারবো। যাতে ভালো লিখতে পারি তার সাধনা না-হয় করবো এ-বছরটা।

আপনি আরো লিখেছেন—'নিন্দা প্রশংসার কথা ভাববেন না, Kepler-এর কথা ভাবুন তো……'

Kepler-এর কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন আপনি। আমার ডায়েরীর পাতায় Kepler-এর সেই কথাগুলো টোকা আছে। ভদ্রলোক নিন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তবু কিন্তু কী তেজ। তিনি তাঁর বইতে লিখে গিয়েছেন—"I dare insult mankind by confessing I am he who has turned science to advantage. If I am pardoned, I shall rejoice ; if blamed, I shall endure it. The die is cast, I have written this book, and whether it is read by posterity or by my contemporaries, is of no consequence. I may well wait for a reader during one century, when God Himself, during six thousand years, has not sent one observer like myself."

আপনি আরো লিখেছেন—'আপনি দূরে আছেন তাই টের পাচ্ছেন না, ফিরে এলে আপনার জন্যে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা অপেক্ষা করছে। আপনার বিরুদ্ধে এক সাহিত্যিক আপনারই কৃপাধন্য একটি পত্রিকায় এক জঘন্য প্রবন্ধ লিখেছে—'

আপনি আমাকে সত্যই অবাক করলেন দেখছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ জঘন্য প্রবন্ধ লিখেছে বলে ভয় পাবো? ভয় পেয়ে কলম থামাবো? আমি অন্তত সাতজন প্রাতঃ-স্মরণীয় ইংরেজ কবির নাম করতে পারি, যারা তাদের নিজের দেশে অসম্মান পেয়েছিলেন। শুধু অসম্মান নয়, ঠাট্টা, বিদ্রূপ সব পেয়েছিলেন। Wood সাহেবের একটা বই আছে তার নাম 'World of Proverb and Parable'—সেই বই-এর ২২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—"Reviewers ought to learn lessons of modesty, for almost all the greatest poets of our age, in our own country, specially, have been greeted with showers of ridicule—Byron, Wordsworth, Coleridge, Keats, Southey, James Montogomery, Tennyson."

না না, আপনি ভুল করবেন না। সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনি একটা উদাহরণ দেখান তো যিনি নিন্দে পাননি, অথচ বিখ্যাত……

আবার মিস্টার চন্দ্রগেশম এসে হাজির। সত্যিই চিঠিটা শেষ করতে দেবে না দেখছি।

বললে—না, আমারই ভুল হয়েছিল স্যার, আপনাকে জিনিসটা দেখানো হয়নি।

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে বুঝলেন দেখানো হয়নি?

—বাঃ, আমার ডায়েরীতে যে সব নোট করা থাকে—

তারপর হঠাৎ গলাটা নিচু করে বললে—আপনার এখন একটু সময় হবে?

—কেন? কী হবে?

—আপনাকে একবার দেখাতুম সেইটে!

—কোনটা?

—আপনি একবার চলুন না স্যার, পাঁচ মিনিটে আপনাকে দেখিয়ে দেব, নইলে পরে হয়ত ভুলেই যাবো, তখন আর দেখানো হবে না আপনাকে—

আমি সত্যিই খুব বিরক্ত বোধ করছিলাম।

বললাম—কিন্তু এখন যে আমি একটা চিঠি লিখছি—! কী জিনিস আপনি দেখাবেন? সেটা এখানে আমার ঘরে নিয়ে আসতে পারেন না?

মিস্টার চন্দ্রগেশম কী যেন ভাবলে।

বললে—আচ্ছা, তাই-ই আঁনছি, আপনার কাছেই আনছি, আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না স্যার, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে—এখ্খুনি আসছি—

মিস্টার চন্দ্রগেশম চলে গেল। আমি আবার আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে একজন টুরিস্ট-হাউসের চাকর একটা ট্রাঙ্ক মাথায় করে এনে হাজির। পেছনে-পেছনে মিস্টার চন্দ্রগেশম।

বললে—আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না স্যার, এখ্খুনি সেরে ফেলবো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে—

বলে ট্রাঙ্কের তালাটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললে। তারপর ডালাটা খুলে ভেতর থেকে আর একটা কাঠের বাক্স বার করলে। সেটাও বন্ধ। সেটারও চাবি খোলা হলো।

জিজ্ঞেস করলাম—এতে কী আছে?

—দাঁড়ান না দেখাচ্ছি আপনাকে। পোকায় কাটবে বলে এত যত্ন করে রেখে দিয়েছি, দেখছেন না ন্যাপ্থলিন্ দিয়ে রেখেছি!

তখনও বুঝতে পারছি না আমাকে কী দেখাবে চন্দ্রগেশম। এমন কী জিনিস, যা এত যত্ন করে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।

শেষকালে ভেতর থেকে একটা প্যাকেট বেরোল। আগাগোড়া কাপড়ে জড়ানো। সেই কাপড়টা খুলে ফেলতেই একটা ফাইল বেরোল।

তখনও বুঝতে পারছি না জিনিসটা কী, কীসের ফাইল!

মিস্টার চন্দ্রগেশম ফাইলটা নিয়ে আমার হাতে দিলে। বললে—এটা পড়ে দেখুন—

অগত্যা ফাইলটা নিয়ে পড়তে লাগতাম। বহুদিনের পুরোন জমানো কয়েকটি সার্টিফিকেট! একটার পর একটা সাজিয়ে গেঁথে রাখা। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কবে কোন্ সাহেব মিস্টার চন্দ্রগেশমকে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে, কর্মক্ষমতার সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে, আর শেষকালে মিস্টার চন্দ্রগেশমের ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করে নিচেয় সই করে দিয়েছে, তারই ফাইল। একটার পর একটা সাজানো।

—এইটে দেখুন, এইটে মিস্টার ম্যাক্‌মারকুইসের লেখা, 'উটি-ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট, আবার ওদিকে উটাকামণ্ডের পুলিশ কমিশনার—

পড়ে দেখলাম মিস্টার ম্যাক-মারকুইস লিখেছে—মিস্টার চন্দ্রগেশম অত্যন্ত সৎ কর্মঠ ব্যক্তি। আমি আমার জীবনে এমন সচ্চরিত্র এমন কর্মনিষ্ঠ লোক দেখিনি। I wish him success in future life. ইতি—

—আর দেখুন, এইটে নেলোরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হর্নবি লিখেছেন, হর্ন্‌বি সাহেব আমাকে খুব ভালবাসতো কিনা।

পড়ে দেখলাম মিস্টার হর্নবি লিখেছেন—এমন সৎ কর্মী, এমন পরিশ্রমী ওয়ার্কার আমার আর কখনও নজরে পড়েনি। মিস্টার চন্দ্রগেশম এই প্রতিষ্ঠানের গর্ব। I wish him all success in future life.

—এই দেখুন, এটা ত্রিচনাপল্লীর সার্কেল অফিসারের লেখা—

—এই দেখুন, এটা চক্রবর্তী রাজা-গোপালচারীর লেখা—

—এই দেখুন এটা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর লেখা—

—এই দেখুন, এটা প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্র প্রসাদের লেখা—

একটার পর একটা সাজানো। সাল তারিখ মিলিয়ে খুব যত্ন করে ফাইলে গেঁথে রেখেছে মিস্টার চন্দ্রগেশম। সেই মিস্টার চন্দ্রগেশমের যখন কুড়ি বছর বয়েস তখন থেকেই সব্বাই কামনা করে এসেছে যেন তার সাকসেস হয়। তারপর পঁচিশ বছর বয়েস হয়েছে, তখনও সাকসেস্ হয়নি। পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন, পঞ্চান্ন থেকে এখন পঁয়ষট্টিতে এসে পৌঁছেছে মিস্টার চন্দ্রগেশম।

এখনও সাকসেস্ হয়নি। এখন দেড়শো টাকা মাইনেতে এখানে এই মহাবলীপুরম্-এর টুরিস্ট-হাউসে চাকরি করছে। ব্রিটিশ রাজত্ব চলে গেছে, কংগ্রেস রাজত্ব এসেছে। রাজা বদলেছে, রাজ্য বদলেছে। ইতিহাস সমস্ত কিছু বদলে দিয়েছে। ভূগোলও বদলে গেছে পৃথিবীর। কিন্তু মিস্টার চন্দ্রগেশম বদলায়নি। সকলের সব শুভ-কামনা ব্যর্থ করে মিস্টার চন্দ্রগেশম এখন মূর্তিমান ব্যর্থতা হয়ে বেঁচে রয়েছে। শুধু পৃথিবীর তাবৎ বিখ্যাত লোকদের হাতে লেখা শুভেচ্ছাগুলো সারা জীবন ধরে সযত্নে বাক্সর মধ্যে পুরে রেখে নিজের মনের তৃপ্তি খুঁজেছে। লোক পেলেই দেখায়। দেখায় আর সার্টিফিকেট চায়। আর সকলের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করবার চেষ্টা করে।

—এই দেখুন, এটা স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের—

আমি আর দেখতে পারলুম না। আমার সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। আমি এতক্ষণে ভয় পেলাম। আমি মিস্টার চন্দ্রগেশমের দিকে চেয়ে দেখলাম। ভদ্রলোকের তখন হাসি-হাসি মুখ। কিন্তু আমার মনে হলো ও হাসি নয়। ও ছলনা। মিস্টার চন্দ্রগেশম্ যেন ওই কাগজ ক'টা নিয়ে নিজের ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করছে। ওই কাগজ ক'টা দেখিয়ে মিস্টার চন্দ্রগেশম যেন আত্মপ্রবঞ্চনা করছে। নিজেকেই ঠকাচ্ছে যেন মিস্টার চন্দ্রগেশম।

আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ও পারবো না। আপনি যে সাহিত্যিকের কথা লিখেছেন, তিনি যত ইচ্ছে কলা-কৌশল করুন, কলা-কৌশল করে যত ইচ্ছে সার্টিফিকেট জোগাড় করুন, আমাকে তার দলে ফেলবেন না। আমি সার্টিফিকেট চাই না।

মিস্টার চন্দ্রগেশম তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—আপনিও একটা সার্টিফিকেট দেবেন স্যার? দিন না! আমি আপনারটাও ফাইলে রেখে দেব?

এরপরে আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। গল্প না-লিখতে পারার জন্যে আশা করি কিছু মনে করবেন না। এবারের পুজো সংখ্যায় এই গল্প না-লিখতে-পারার গল্পটাই ছেপে আমায় আশা করি, এক বছরের জন্যে অব্যাহতি দেবেন।

মহারাণী

মহারাণী কলকাতায় আসছেন। মহারাণী মানে নাহারগড় স্টেটের খাস মহারাণী। নাহারগড়ের যুবরাজ বিন্ধ্য প্রসাদের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি সেখানেই চলে গিয়েছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে আজ প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। আসলে মহারাণী সাধারণ ঘরেরই মেয়ে। নেহাৎ পাঁচ-পাঁচী। ডাক নাম ছিল গৌরী। গৌরী দেবী নামটাই ছাপানো হতো কাগজে।

মহারাণী এত দিন পরে কলকাতায় আসছেন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কলকাতায় মহারাণীর এস্টেট ছিল জানতাম। মার্লিন প্রেস না কোথায় একটা প্যালেস ছিল। সারা বছর ফাঁকাই পড়ে থাকতো। বিরাট বাড়ি শুনেছি সেটা। বাড়ি, বাগান, চাকর, মালী সবই ছিল, শুধু মালিক ছিল না। মালিক থাকতো ছোটনাগপুরে, নিজের রাজ্যে।

টেলিফোন পেয়ে তাই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—আপনি কি মিস্টার মিত্র ?

বললাম—হ্যাঁ, কথা বলছি—

বোধ হয় ভদ্রলোক মহারাণীরই নায়েব-গোমস্তা-সেক্রেটারি কেউ হবেন। সম্পত্তি দেখা শোনা করেন।

বললেন—মহারাণী বুধবার সন্ধ্যেবেলা কলকাতায় আসছেন, চার ঘণ্টার জন্যে, রাত্রেই আবার চলে যাবেন সুইজারল্যাণ্ডে—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এত বছর পরে গৌরী দেবীর সঙ্গে যোগসূত্রটা ঠিক তাড়াতাড়িতে ধরতে পারিনি।

—আপনি বিকেল পাঁচটার সময় এলেই চলবে, পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা আপনাকে টাইম দিয়েছেন—

আমি রাজি হলাম। রাজি না হবারও কারণ ছিল না। রাজি না-হয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ গৌরী দেবীকে আমি ভাল করেই চিনে নিয়েছিলাম।

তখনকার দিনে গৌরী দেবীর বেশ নাম ছিল। এখনকার লোকে সে-নাম ভুলে গেছে। সে যুগেই দু'একটা ছবিতে ভাল অভিনয় করে নাম করেছিলেন গৌরী দেবী। 'ঋষির প্রেম' কি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিম্বা 'পুরাণ-ভকত'-এ ভাল

পার্ট করেছিলেন। সবে তখন টকী সুরু হয়েছে। এক-একটা ছবি আসে আর আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি। টিকিট-ঘরের জানালা-দরজা ভাঙা-ভাঙি হয়। রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা দাশগুপ্তার যুগ তখন। সেই যুগেই আরো কয়েকটা ছবি করলেই গৌরী দেবী একেবারে ফিলম-স্টার হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ গৌরী দেবী একদিন ফিলম্ লাইন থেকেই একেবারে চলে গেলেন।

কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। এ-গল্পের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই।

বলতে গেলে গৌরী দেবীর সঙ্গে আমার সামান্যই আলাপ। আমি তখন সেই বাচ্চা বয়েসে একটা নাটক লিখে ফেলেছিলাম। একেবারে আস্ত তিন অঙ্কে সমাপ্ত সম্পূর্ণ একখানা নাটক। কাঁচা বয়সের লেখা হোক আর যাই হোক নাটকখানা পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের ভাল লেগেছিল। সামাজিক বিষয়-বস্তু। নাম দিয়েছিলাম 'ত্রিভুজ'। ক্লাবে আমি ছিলাম সব চেয়ে কম বয়সের মেম্বার। বড়োরাই পাণ্ডা। নিজের মাস্টারমশাই আসতেন সন্ধ্যেবেলা, তাই রিহার্শালে কোনও দিন যেতে পারতাম না। ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় ছিল না। শুধু অতুলদা'র কাছে শুনেছিলাম বিখ্যাত অভিনেত্রী গৌরী দেবী হিরোইনের পার্ট করতে রাজি হয়েছেন। অতুলদা'ই ছিল ক্লাবের ড্রামাটিক সেক্রেটারি। অতুলদা অনন্যকর্মা লোক। অতুলদা'ই চেষ্টা করে বড় বড় লোককে ক্লাবে আনতো। তখনকার দিনে মেয়র-শেরিফ-লাটসাহেব কাউকেই ক্লাবের ফাংশনে আনতে বাকি রাখেনি অতুলদা। সেই অতুলদা যে আমার নাটকে গৌরী দেবীকে হিরোইনের পার্ট করতে রাজি করতে পেরেছে, তা শুনে আমি খুব বেশি অবাক হয়নি। শুনে আনন্দ হয়েছিল খুবই নিশ্চয়। ভেবেছিলাম ডি-এল-রায়ের মত কি গিরীশ ঘোষের মত না-হোক, একটা ছোটখাটো নাট্যকার আমি বড় হয়ে হবোই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন অতুলদা এল বাড়িতে।

আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাহলে কি আমার নাটক হবে না?

—না তা নয়, গৌরী দেবী বলছেন ওই লাভ-সীন্‌টা ঠিক লেখা হয়নি। ডায়ালগ্‌গুলো পছন্দ হচ্ছে না ওঁর—

—তাহলে কী হবে? প্লে করবেন না উনি?

অতুলদা বললে—কিছু বুঝতে পারছি না।

জিজ্ঞেস করলাম—উনি কী বললেন?

—জিজ্ঞেস করলেন ড্রামাটিস্ট্ কে? আমি তোর নাম করলুম। তখন উনি

আবার জিজ্ঞেস করলেন—ড্রামাটিস্টের বয়েস কতো ? আমি তোর বয়েসটাও বললাম। বললাম—সেকেণ্ড ইয়ার স্টুডেন্ট—

—শুনে কী বললেন ?

—শুনে গৌরী দেবী বললেন—লাভ্ সম্বন্ধে এর কোনও আইডিয়াই নেই—

—কেন ?

অতুলদা বললে—তা কিছু বললেন না। আমি তো অতো বড় আর্টিস্টকে মুখের ওপর কিছু বলতে পারি না। তখন আমি বললাম—এখন কী করা যায় বলুন ? শুনে গৌরী দেবী বললেন—ড্রামাটিস্ট্‌কে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি তার সঙ্গে একটু ডিস্‌কাস্ করবো—

খানিক থেমে অতুলদা বললে—তুই এক কাজ কর, তুই একবার গিয়ে দেখা কর গৌরী দেবীর সঙ্গে—। গিয়ে ডিস্‌কাস্ করে স্থাথ্ না কী বলেন।

বললাম—আমি একলা যাবো ?

—হ্যাঁ, তুই একলাই যা—আমার যাওয়া ঠিক হবে না। যা-যা বলেন তাই-তাই-ই করা যাবে, অতো বড় আর্টিস্ট্ যখন পাওয়া গেছে তখন ওর টেস্ট্ মত নাটক বদলালে ক্ষতি কী ?

—বাড়ির ঠিকানা কি ?

অতুলদাই ঠিকানা বলে দিয়েছিল। অতুলদাই বলতে গেলে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। দিন-ক্ষণ ঠিক করে আমি একদিন গিয়ে হাজির হলাম গৌরী দেবীর বাড়ি। টালিগঞ্জের আনোয়ার শা রোডের ওপর বাড়ি। তখন আনোয়ার শা রোড আরো জঙ্গল-ভর্তি ছিল। সামনে নিউ থিয়েটার্সের দু নম্বর স্টুডিও। আমি সেই স্টুডিও বাঁয়ে রেখে আরো কিছু দূর গিয়ে ডানহাতি একটা বাড়ির গেট খুলে ভেতরের বাগানে ঢুকে পড়লুম।

গৌরী দেবীকে সশরীরে কখনও দেখিনি। সিনেমায় দেখা ছিল। চাকর দরজা খুলে দিতেই আমি আমার নাম বললাম। চাকরটা আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ড্রয়িংরুমে বসালো। বেশ সাজানো ঘর। চারদিকে পরিপাটি আসবাব। দেয়ালে গৌরী দেবীরই কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টাঙানো।

একটা সোফার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিলাম। চাকরটা পাখা ঘুরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

ভাবছিলাম জীবনে কখনো কোনও এ্যাক্‌ট্রেসের বাড়ি ঢুকিনি। এরা কী-

রকমভাবে কথা বলবে আমাদের মত সাধারণ লোকের সঙ্গে তারও অভিজ্ঞতা ছিল না। তা ছাড়া বহুদিন বহুরাত পরিশ্রম করে নাটকটা লিখেছি। এর অভিনয় না হলে সব পরিশ্রমটাই পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে। আর গৌরী দেবী অভিনয় না করলে শেষ পর্যন্ত এ-নাটকের অভিনয়ই হবে না। পাড়ার ক্লাবের লোকেদের নাটকটা আকর্ষণ নয়, আকর্ষণ হলো গৌরী দেবী। নাটকের তো অভাব নেই বাঙলা ভাষায়। শেষ পর্যন্ত আমার নাটক না নিয়ে হয়ত অন্য কোনও নাটক পছন্দ করে বসবে। গৌরী দেবীরই কোনও পছন্দসই ড্রামাটিস্টের নাটক। সেই গৌরী দেবীই অভিনয় করবেন, ক্লাবও থিয়েটার করবে, মাঝখান থেকে আমিই শুধু বাদ পড়ে যাবো।

হঠাৎ যেন সেন্টের গন্ধ নাকে এসে লাগলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আঁচলটা ওড়াতে ওড়াতে ঘরের ভেতর এসে হাজির হলেন গৌরী দেবী।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে নমস্কার করলাম।

গৌরী দেবী সামনের সোফাটায় বসলেন। বললেন—বোস তুমি—

চেয়ে দেখলাম সেজে গুজেই এসেছেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁত।

বললাম—আমাকে অতুলদা পাঠিয়েছেন আপনার কাছে, আমার একটা ড্রামা ও'দের ক্লাব প্লে করছে, আপনি বলেছিলেন একটা সীন্ নিয়ে একটু ডিসকাস্ করবেন আমার সঙ্গে—

গৌরী দেবী বললেন—একটা সীন্ নয়, পুরো ড্রামাতেই আমার আপত্তি—

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না।

গৌরী দেবী আবার বললেন—হ্যাঁ, ওদের আমি বলিনি, কিন্তু ড্রামাটাই আমার ভালো লাগেনি—ওটা ড্রামাই হয়নি—

বললাম—কেন? ও-কথা বলছেন কেন? ও'রা তো সবাই ভাল বলছেন—

—ও'রা বলুন গে, ও'রা তোমার মুখ-রাখা কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমি তো আর্টিস্ট, আমি তো বুঝি কীসে ড্রামা হয় আর কীসে ড্রামা হয় না—

আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম গৌরী দেবীর মুখের দিকে। আমি এখানে আসবার সময় আশাই করিনি এমন হতাশ করবেন আমাকে গৌরী দেবী।

বললাম—কোন্ জায়গাটায় ডিফেক্ট আছে আপনি যদি বলে দেন তো আমি সেটা সংশোধন করতে পারি—

গৌরী দেবী বললেন—সংশোধন করলেও হবে না—আগাগোড়াই ডিফেক্ট্—

এর পর আর আমার কোনও কথা বলবার রইল না।

গৌরী দেবী বললেন—আসলে তোমার লাভ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, ওভাবে প্রেম হয় না—বিশেষ করে নাটকে—

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু······

গৌরী দেবী বাধা দিয়ে বললেন—যে জিনিস সম্বন্ধে তোমাদের এক্সপিরিয়্যান্স নেই তা নিয়ে লেখো কেন তোমরা ? শুধু তুমি একলা নও, আজকাল অনেকের লেখাতেই এটা দেখেছি—আসলে কেউ লিখতে জানে না—

বললাম—কোন্‌টা সম্বন্ধে বলছেন ?

—ওই লাভ্ সম্বন্ধে ! প্রেম সম্বন্ধে ! তোমার বয়েস কতো ?

বললাম—উনিশ !

—উনিশ বছর বয়েসে কতটুকু জানা সম্ভব ! ক'টা মেয়ের সঙ্গে মিশেছো ? এক মা-বোন ছাড়া সংসারে কার সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয় তোমাদের ?

আমি স্বীকার করলাম যে, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। আর মা ছাড়া আমি অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিই নি। তা ছাড়া আমার নিজের বোনও নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের সে-যুগে মেয়েদের সঙ্গে মেশবার সুযোগই ছিল না এখনকার মত।

—তাহলে ? তোমার 'ত্রিভুজ' নাটকে হিরোইন্‌কে করেছো অপরূপ রূপসী, আর হিরোকে করেছো আগ্‌লী। হিরো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে-হিরোকে হিরোইন্ কী করে ভালবাসবে ? যদি নায়ক খোঁড়া হয় তাহলে নায়িকা তাকে ভালবাসতে পারে ?

—কিন্তু খোঁড়াদের কি বিয়ে হয় না ? স্ত্রীরা কি খোঁড়া স্বামীদের ভালবাসে না ? বইতে পড়েছি স্যার ওয়ালটার স্কট তো খোঁড়া ছিলেন, তাঁরও তো বিয়ে হয়েছিল, তাঁর স্ত্রী তো তাঁকে ভালোইবাসতো !

গৌরী দেবী যেন চটে গেলেন।

বললেন—দেখ, যা জানো না তা নিয়ে তর্ক কোর না, লাইফের ট্রুথ্ আর লিটারেচারের ট্রুথ্ কি এক ? নাটক কি লাইফের কার্বন্-কপি ?

আমি শুনেছিলাম গৌরী দেবী গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু তাঁর যে এত জ্ঞান তা জানতাম না। কথাগুলোর কোনও জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। আর তখন আমি এত ভেবে-চিন্তে লিখিনি। নাটক লিখবো বলেই নাটক লিখেছি। বেশ জমাটি

হলেই হলো, শেষ পর্যন্ত সাস্‌পেন্স থাকলেই হলো। তার বেশি আর কিছু জানতাম না!

বললাম—তাহলে কী করবো?

—নাটকটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ও তোমার পণ্ডশ্রম হয়েছে মনে করো!

বললাম—আর কি আমার উৎসাহ হবে? খুব ইন্‌স্‌পিরেশন্‌ নিয়ে লিখেছিলাম, আর ওঁরাও বললেন প্লে করবেন, তাই দু'মাস রাত জেগে লিখে ফেলেছিলাম—

গৌরী দেবী বললেন—কিন্তু আমি তার কী করবো! আমি তো বলছি প্লে করতে পারি আমি যদি হিরোকে খুব বিউটিফুল দেখতে করে দাও! ও হয় না, কোনও ইয়াং মেয়ে ও-রকম খোঁড়া ছেলেকে ভালবাসতে পারে না! ও রকম চেহারা দেখলে আমার মুখ দিয়ে প্রেমের কথা বেরোবে না!

বললাম—কিন্তু প্লে করলে আপনি দেখতেন খুব হাততালি পেতেন, দর্শকদের সিম্‌প্যাথি পেতেন—

—না না না, আমি তো বলেছি জীবনে বা আর্টে অসুন্দর জিনিসের ঠাঁই নেই! খোঁড়া লোক দেখলে আমার গুলী করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে—খোঁড়া লোককে কি কুঁজো লোককে আমি দেখতে পারি না—

—সত্যি বলছেন?

—সত্যি বলছি না তো মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—রাস্তায় খোঁড়া ভিখিরি দেখলেও আপনার মায়া হয় না?

গৌরী দেবী বললেন—রাস্তার ভিখিরিকে কি আমি ভালবাসি? তার সঙ্গে কি আমার ভালবাসার সম্পর্ক? তার দিকে তো একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলেই হলো। কিন্তু স্বামী? খোঁড়া স্বামীকে আমি কী করে ভালবাসবো? তার দিকে চেয়ে দেখতেই যে আমার ঘেন্না হবে! তুমি তো শেষ দৃশ্যে তাদের বিয়ে হলো দেখিয়েছ—অ্যাব্‌সার্ড! একেবারে অ্যাবসার্ড! আর্টের এলিমেণ্টরি নলেজ্‌ও তোমার নেই—! তুমি অন্য নাটক লেখো কিংবা হিরোকে সুস্থ-স্বাভাবিক-সুন্দর করে দাও, আমি গ্ল্যাড্‌লি প্লে করবো!

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আর অত কথা থাক্‌, এই যে তুমি, তুমি তো সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে খোঁড়া ছেলেটার চূড়ান্ত প্রেম দেখিয়েছো, তুমি নিজে কোনও খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারবে? খোঁড়া মেয়েকে দেখলে তোমার প্রেম জাগবে? বলো, উত্তর দাও—

তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন—আরে, নাটক লেখা যদি অত সোজা

হতো তো বাঙলা দেশে কেউ আর বাদ থাকতো না, সবাই ড্রামাটিস্ট্ হয়ে যেতো—

আমার আর কোনও কথা বলবার রইল না। আমি চুপ করে রইলাম। গৌরী দেবীর শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে সরে পড়ে যাচ্ছিল, আর বার বার তিনি সেটাকে তুলে দিচ্ছিলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম আবহাওয়া, আর ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দু'জন, সেই কম বয়েসের চোখ দিয়ে গৌরী দেবীকে যে-রকম সুন্দরী দেখেছিলাম, পরে আর কখনও কোনও মেয়েকে আমার চোখে অত সুন্দর মনে হয়নি। পায়ের আঙুলের নখগুলো রং করা, হাতের নখগুলোও রঙিন। গাল ঠোঁট শাড়ি ব্লাউস সবই রঙিন। সেদিন গৌরী দেবী আমার জন্যে অনেকখানি সময় নষ্ট করেছিলেন। সে-জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু গৌরী দেবীর মতের সঙ্গে আমি মতে মিলাতে পারিনি! সৌন্দর্য কি শুধু বাইরের জিনিস? ভালবাসা কি সত্যিই দেহ-নির্ভর? তাহলে মন নিয়ে কেন এত মারামারি? আমার সেই অল্প অপরিণত বয়েসেই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, গৌরী দেবীর কথা সত্য নয়! গৌরী দেবী বড় আর্টিস্ট্ হতে পারেন, কিন্তু নাটক সম্বন্ধে তাঁর মতটাই শেষ মত নয়!

গৌরী দেবী দাঁড়িয়ে উঠলেন।

বললেন—আমার আবার এখুনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—

আমিও দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। বললাম—তাহলে অতুলদা'কে গিয়ে কী বলবো?

—বোল, ও নাটকে আমি প্লে করবো না।

—কিছু কারণ বলবো?

গৌরী দেবী বললে—হ্যাঁ তাও বলতে পারো, বোল ঘোড়ার সঙ্গে প্রেম হয় না, ঘোড়াকে ভালবাসা যায় না—

এর পরে আমি আর দাঁড়াইনি। আমি তাঁকে নমস্কার করেই সেদিন গৌরী দেবীর বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম। আমার জীবনে নাটক লেখার সেই প্রয়াসের সেখানেই ইতি হয়েছিল!

বাড়ি ফিরে আসতেই অতুলদা বললেন—কী রে, কী হলো?

সব বললাম। নাটক হয়নি। নাটক লেখাতেই গোলমাল আছে। যা-যা গৌরী দেবী বলেছিলেন সব খুলে পরিষ্কার করে বললাম।

সব শুনে অতুলদা বললেন—বড় ভাবিয়ে তুললে, এতদূরে প্রগ্রেস করে এখন পেছিয়ে যাওয়া, বড় মুশ্কিলে ফেললে দেখছি।

বললাম—আপনারা অন্য প্লে ধরুন না—

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাই-ই হয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা চলতি নাটক ধরে

প্লে করা হয়েছিল। গৌরী দেবী তাতে প্লে-ও করেছিলেন। হাততালি পেয়েছিলেন খুব, তারিফ পেয়েছিলেন খুব। অত বড় আর্টিস্ট, তিনি যে দয়া করে একটা অ্যামেচার ক্লাবের প্লে'তে নেমেছিলেন তাতেই সমস্ত লোক ধন্য হ গিয়েছিলেন! প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়েছিল। শুধু আমি সে-প্লে দেখতে যাইনি। দেখতে যাইনি অভিমানে নয়, ক্ষোভে। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হলো বলে নয়, আমার শিল্প-প্রচেষ্টার কদর্থ হলো বলে। সবাই জানলো এবং বিশ্বাস করলো আমার নাটক নাটকই হয়নি। সবাই বুঝলো আমি নাটক লিখতে পারি না। নাটকের এ-বি-সি-ডিও আমি জানি না। ক্লাবের রিহার্শালে এসেই গৌরী দেবী সকলকে সে-কথা বলে গিয়েছেন শুনলাম। আমি ক্লাবে সকলের চোখে সেদিন থেকে ছোট হয়ে গেলাম। বলতে গেলে সেদিন থে আমি ক্লাবের সঙ্গে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম!

এরপর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে-ক্লাবও উঠে গেছে। গৌরী দেবীও সিনেমা-থিয়েটারের লাইন থেকে বিদায় নিয়েছেন। রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা দাশগুপ্তার মত গৌরী দেবীও অভিনেত্রী-জীবন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কিন্তু বড় হঠাৎ। ঠিক উঠতির সময়ে। পরে শুনলাম নাহারগড় স্টেটের যুবরাজ বিন্ধ্যপ্রসাদ সিং-কে বিয়ে করে ফেলে তিনি নাহারগড় স্টেটের মহারাণী হয়ে গেছেন। ছোটনাগপুরের বিরাট স্টেট্ নাহারগড়। কোটি টাকার রেভিনিউ স্টেটের। নানা রকম কথা ছড়ালো। একজন বললে গৌরীদেবী দল-বল নিয়ে থিয়েটার করতে যান নাহারগড়ে, সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে। যুবরাজ বিন্ধ্যপ্রসাদের নজরে পড়ে যান গৌরী দেবী। মহারাজার আপত্তি সত্ত্বেও গৌরী দেবীকে তিনি বিয়ে করে বিলেতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন।

এ-সব অনেক বছর আগেকার কথা। এর পর স্টেট্ মহারাজার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মহারাজাও মারা গেছেন। কিন্তু স্টেটের যা প্রপার্টি তার সবটুকু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট নিতে পারেনি। বহু সোনা, বহু জুয়েলারী সুইজারল্যাণ্ডে ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বাপ মারা যাবার পর বিন্ধ্যপ্রসাদ মহারাজ হয়েছেন। গৌরী দেবীও মহারাণী হয়েছেন। নাহারগড়েই বিরাট প্যালেস তৈরি করেছেন। এয়ার-কণ্ডিশন্ড প্যালেস। তারপর এইবার,—এই গেলবারে জেনারেল ইলেকশানের সময়—মহারাজা নাহারগড় থেকে পার্লামেণ্টের ক্যাণ্ডিডেট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের নমিনেশন পেয়ে এম-পি হয়েছেন। এ-সব খবর সে-সময় খুব শুনেছিলাম। শুনেছিলাম গৌরী দেবী নাকি প্রজাদের প্রত্যেকের

বাড়িতে পায়ে হেঁটে গিয়ে গিয়ে ভোট চেয়ে চেয়ে বেড়িয়েছেন। যে-মহারাণীকে তারা জীবনে চোখে দেখেনি, সেই তাঁকেই কষ্ট করে ভোট চাইতে দেখে প্রজারা কেঁদে ভাসিয়েছিল। প্রজারা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল ধন্য হয়ে গিয়েছিল মহারাণীমার কষ্ট দেখে। সেই সব ছবি কিছু কিছু বোম্বাই-এর ইংরিজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল।

তা এতদিন পরে সেই মহারাণী কলকাতায় আসছেন। সুইজারল্যাণ্ডে যাবার পথে। আর আমাকে দেখা করতে অনুমতি দিয়েছেন, এতে আমার কৃতার্থ হবারই কথা। কিন্তু তবু আমি মনে মনে কৃতার্থ হতে পারিনি। আমার নাটক লেখা হয়নি বলে নয়। জীবন সম্বন্ধে আমার বোধই বদলে গিয়েছিল এই ক'বছরে। বাংলা দেশে এখন লোকে আমাকে গল্প-উপন্যাসের লেখক বলে জানে। কিন্তু সেদিন সেই গৌরী দেবীর দেওয়া আঘাত আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। নাট্যকার হতে পারিনি বলে তবে কি আমার মনে ক্ষোভ আছে? এখনও কি আমি নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারিনি?

দেখা হলে মহারাণী আর কী-ইবা বলবেন আমাকে? কীই বা বলতে পারেন?

বড়জোর সবাই যেমন মাতব্বরি করে সেই রকম দু'চারটে মাতব্বরির কথা বলবেন। আমার লেখার কী দোষ-ত্রুটি তাই-ই খুঁটে খুঁটে বলবেন। কোন্ লেখককে এ-দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি তা তো জানি না। একমাত্র তোমার আর বাল্মিকী ছাড়া পৃথিবীর সব লেখককেই সমালোচকের কুৎসা-কটূক্তি শুনতে হয়েছে। যে লেখক সমালোচককে ভয় করে তার লেখাই উচিত নয় এই সিদ্ধান্তই জীবনে পাকা করে নিয়েছি।

তাই গৌরী দেবীর নিমন্ত্রণ পেয়ে তৈরি হয়েই গেলাম।

বুধবার। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা। ঠিকানা মিলিয়ে মার্লিন প্লেসে গিয়ে পৌঁছোলাম। গেটে দারোয়ানের কাছে নাম ধাম কুলুজী দিলাম।

যথাসময়ে সে আমাকে ভেতরের পার্লারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। তারপর বোধহয় ভেতরে গিয়ে খবর দিলে। আমি চুপ করে বসে বসে বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। বাগানের তেমন যত্ন নেই। মহারাজ বা মহারাণী কেউই কলকাতায় কখনও আসেন না। বছরের অর্ধেকটাই কাটে বাইরে। এখনই মহারাজা এম-পি হওয়াতে দিল্লীতে আছেন। চাকর-বাকর-মালী কেউই তাই মন দিয়ে কিছু কাজ করে না।

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ মতন লোক শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—আপনি এসেছেন ? এই আধঘণ্টা হলো মহারাণী এসেছেন, এসেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—

হঠাৎ বাইরের বাগানের দিকে একটা শব্দ হতেই চেয়ে দেখি দু'জন উর্দি-পরা চাকর একটা ছোট ছেলেকে হাতে ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বছর চারেক বয়েস হবে। ফুট্‌ফুটে ফর্সা চেহারা। চমৎকার দামী সাজ-পোষাক।

জিজ্ঞেস করলাম—ও কে ? কার ছেলে ?

ভদ্রলোক বললেন—আমাদের মহারাজকুমার, মহারাণীর এই প্রথম ছেলে, একটিই হয়েছে—

কী রকম যেন ভূত দেখতে লাগলাম চোখের সামনে।

ভদ্রলোক বললেন—মহারাজকুমারকে নিয়েই মহারাণী সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছেন, অপারেশন করতে—

অপারেশন করতে! দেখি ছেলেটা খোঁড়াচ্ছে। একটা পা সোজা কিন্তু আর একটা পা ত্রিভঙ্গ হয়ে বেঁকে গেছে। সেই খোঁড়া পায়ে বেড়াতে গিয়ে বড় অদ্ভুত ভঙ্গি করতে হচ্ছে ছেলেটিকে। বড় করুণ, বড় কষ্টকর সে দৃশ্য।

ভদ্রলোক বললেন—আমি খবর দিচ্ছি মহারাণীকে—

বলে ভদ্রলোক আবার ভেতরে চলে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হলো আমার নাট্যকার হওয়া হয়নি, তা না হোক। কিন্তু আমার সেদিনের সেই আঘাতের প্রতিশোধ ঈশ্বর এমন করে নিলেন কেন ? আমি তো এ চাইনি। আমি তো এ কল্পনাও করতে পারতাম না। গৌরী দেবী কি এই খোঁড়া ছেলেকে ভালবাসতে পারবেন ? নিজের পেটের সন্তানকে তিনি গুলী করে মারতে পারবেন ? তবে কেন সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাচ্ছেন অপারেশান করবার জন্যে ! তাকে সুস্থ সুন্দর করে তোলবার জন্যে ? লাইফের ট্রুথ আর লিটারেচারের ট্রুথ কি সত্যি আলাদা ? লিটারেচার কি সত্যিই লাইফের কার্বন্-কপি নয় তাহলে ?

আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে নামলাম। তারপর গেট পেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায়। রাস্তায় নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম। মহারাণীর পরাজয় যেন আমারও পরাজয়! গৌরী দেবীর এ-লজ্জা আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারতাম না। আমি রাস্তার মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যেন খানিকটা স্বস্তি পেলাম।

সিসিফাস

জব্বলপুরের ডাক-বাঙলোয় বসেছিলাম। আসলে জব্বলপুর নয় হাওবাগ-জব্বলপুর। এখন সে ডাক-বাঙলোর চেহারা কী-রকম হয়েছে জানি না। আগে পঁচিশটা বড় বড় আমগাছ ছিল। তিনটে মেহগনি গাছ আর সাতটা অশথ গাছ। মানে দিনের বেলাতেও জায়গাটা বেশ অন্ধকার মনে হতো।

বিরাট কম্পাউণ্ড। কিছু ফুলের কেয়ারি ছিল বটে। কয়েকটা গোলাপ। সামান্য অর্ডিনারী কিছু সিজন্-ফ্লাওয়ারের বেড। কিন্তু লোকের অভাবে তখন তেমন যত্ন নেবার কেউ ছিল না।

মাসের মধ্যে বার দুই তিন আমাকে ওই ডাক বাঙলোয় উঠতে হতো। ভোর বেলা ন্যারো-গেজ ট্রেনটা পৌঁছত। আমি ডাক-বাঙলোয় জিনিসপত্রগুলো রেখে নেপিয়ার টাউনে আমার অফিসে চলে যেতাম। তারপর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমার কাজ সেরে আবার এসে বসতাম। দু'টো বড় বড় ঘর। সামনে বিরাট ছাউনি-ঢাকা বারান্দা। সেইখানে ইজি-চেয়ারটা টেনে এনে বসে থাকতাম আর বাগানটার দিকে এলোমেলোভাবে চেয়ে থাকতাম। কোনও কাজকর্মও ছিল না। এমনি করে যখন অনেক রাত হতো তখন দুনিচাঁদ এসে ডিনারের ব্যবস্থা করে দিত। আর আমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তাম।

মাত্র দিন দুই তিনের কাজ, তারপর আবার বিলাসপুরে ফিরে আসা।

সেদিনও তেমনি বসে আছি। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কম্পাউণ্ডের ভেতরে দু'চারটে আলোর পোস্ট আছে, সেগুলো যথারীতি দূরে দূরে জ্বলছে। জ্বলছে, কিন্তু তেমন আলো হচ্ছে না। শীতকালের কুয়াশায় সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

দুনিচাঁদ আমার কাছে টাকা নিয়ে গেছে। দরকার মত আনাজপত্র, মাছ, ডিম, বাজার থেকে কিনে আনবে। এনে রাঁধবে। তারপর যথারীতি ডিনার!

আমি মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবছি, হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠে দশ হাত পেছিয়ে এসেছি। এসেই চীৎকার করে ডেকেছি —দুনিচাঁদ, দুনিচাঁদ—

দেখি একটা বিরাট ময়াল সাপ নিঃশব্দে বাগানের ফ্লাওয়ার বেড পেরিয়ে একেবারে আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

দুনিচাঁদ-এর আউট-হাউসটা অনেক দূরে। একেবারে উল্টোদিকের বাগানের পেছন দিকে। সেখানে দুনিচাঁদ থাকে! দুনিচাঁদের বউ থাকে। জমাদার জমাদারনী থাকে। সেদিকটায় কখনও যাইনি। আর তাছাড়া আমার মত লোকের

সেদিকে যাওয়ার কখনও দরকারও হয়নি। ভাবলাম চীৎকার করে ডেকেই বা কী হবে। ততক্ষণে সাপটা তো একেবারে আমার বেড-রুমের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

সাপটা তখন মুখ থেকে একটা চেরা জিভ বার করছে আর আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি আরো জোরে চেঁচাতে লাগলাম—ঢুনিচাঁদ, ঢুনিচাঁদ—

ঢুনিচাঁদ সে-ডাক না-শুনুক ভগবানই বোধহয় আমার সে-ডাক শুনলেন। ঢুনিচাঁদের অত তাড়াতাড়ি বাজার থেকে ফিরে আসার কথা নয়। কিন্তু কেন জানি না আমার ডাক শুনে সে দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলো।

বললাম—আমার ঘরে সাপ ঢুকেছে ঢুনিচাঁদ, শিগ্‌গীর একটা লাঠি নিয়ে এসো—

ঢুনিচাঁদ কোত্থেকে একটা লাঠি নিয়ে এল। এসে ঘরের ভেতর উঁকি মেরেই থেমে গেল। বললে,—আরে, এ যে এজরা মেমসাহেবের সাপ—

বলে লাঠিটা রেখে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। যেন এজরা মেমসাহেবের সাপ হলে ভাবনার আর কোনও কারণ নেই। এজরা মেমসাহেবের সাপ হলে যেন আর তাকে মারবারও দরকার নেই। আর তাছাড়া এজরা মেমসাহেবই বা কে?

ঢুনিচাঁদ বললে—আপনি একটু সবুর করুন হুজুর, আমি মেমসাহেবকে ডেকে আনছি—

বলে বাগানের দিকেই চলে যাচ্ছিল। আমি ডাকলাম।

বললাম—কোথায় যাচ্ছ? কে এজরা মেমসাহেব?

ঢুনিচাঁদ বললে—ওই যে সতেরো নম্বর কোঠী, আমি যাবো আর আসবো হুজুর—বলে ঢুনিচাঁদ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতদিন ধরে জব্বলপুরে আসছি, এতদিন ধরে এই রেস্ট-হাউসে উঠছি, এতদিন ধরে এই বাগানের সামনের বারান্দায় বসছি, কখনও এমন করে এই সাপের মুখোমুখি হইনি। আর এই রাস্তার সতেরো নম্বর বাড়িতে এজরা মেমসাহেব বলে যে কেউ আছে তাও শুনিনি। আর সেই মেমসাহেব যে আবার সাপ পোষে তাও জানতাম না।

মিসেস এজরাকে দেখলাম।

বুড়ি থুথ্‌ড়ি একেবারে। থল্ থল্ করছে গায়ের চামড়া। বয়েস বোধহয় সত্তরের কাছাকাছি, ঢিলে গাউন। যেমন ভাবে যে-অবস্থায় ছিল মেমসাহেব সেই অবস্থাতেই চলে এসেছে। জুতো মোজা টুপি পরবার সময় পর্যন্ত পায়নি।

যেন নিজের ছেলে হারিয়ে গেছে এমনি করে হন্ত-দন্ত হয়ে এল। নিজেই ডাকলো—সিসি-সিসি—ডারলিং—

সঙ্গে বাড়ির চাকর-বাকর আয়া তারাও এসেছিল।

মেমসাহেব আমাকে দেখেই পাগলের মতন বলে উঠলো—সিসি কোথায়? কোন ঘরে বাবু?

ঢুনিচাঁদ ঘরের ভেতরটা দেখিয়ে দিলে।

মেমসাহেব নির্ভয়েই ঘরে ঢুকে পড়লো। তারপর ডাকতে লাগলো—সিসি—মাই ডারলিং—

তারপর সবাই মিলে ঘরে ঢুকে সিসিকে ধরলে। একটা চাকর কাঁধে করে তুলে নিলে সাপটাকে। সাপটাও তাকে বেশ আদর করে জড়িয়ে মুখটা উঁচু করে রইল! তারপর মেমসাহেব তাদের পেছন পেছন চলতে লাগলো আর আদর করে বলতে লাগলো—সিসি-সিসি—মাই ডারলিং—

তারপর যাবার মুখে বোধহয় হঠাৎ আমার কথাটা মনে পড়লো।

আমার দিকে ফিরে মিসেস এজরা বললে—থ্যাঙ্কিউ বাবু, তুমি আমার সিসিকে খুব বাঁচিয়েছ, অন্য কোথাও চলে গেলে আমি খুঁজে পেতাম না। হি ইজ সো নটি—

বলে সাপটার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে আদর করে বলতে লাগলো—সিসি মাই ডারলিং—

আমি তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম।

মিসেস এজরার বোধহয় হঠাৎ খেয়াল হল যে আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশটা যথেষ্ট হয়নি। তাই আবার ফিরে এল! বললে—হোয়াট ক্যান্ আই ডু বাবু ফর ইউ? আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?

বললাম—আমার জন্যে কিছু করতে হবে না—

—আর ইউ এ রেলওয়ে এমপ্লয়ী? তুমি কি রেলওয়ে-ম্যান?

মিসেস এজরা বোধহয় জানতো যে রেলের লোকেরাই এই ডাক-বাঙলোতে উঠে থাকে।

বললে—তাহলে তুমি কাল আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে, তোমার যদি কোনও অবজেকশান না থাকে—

বলে মেমসাহেব-সিসি মাই ডারলিং—করতে করতে চলে গেল।

মনে আছে সে-রাত্রে রেস্ট-হাউসের মধ্যে ভালো করে ঘুমোতে পারিনি, ভুনিচাঁদ বললে—ও পোষা সাপ হুজুর, ও কাটবে না, মিছিমিছি ভয় পেয়েছিলেন—

বললাম—এবার থেকে আমি আর এখানে উঠবো না—

আমি রেস্ট-হাউসে না উঠলে ভুনিচাঁদেরই ক্ষতি। বাজারে দু'টো একটা পয়সা যা বাঁচাতে পারে সেইটেই ওর লাভ। আর তাছাড়া তেমন কোনও ভিজিটারও আসে না রেস্ট-হাউসে। ভুনিচাঁদ যতই বলুক যে পোষা সাপ তা বলে ভয় কি কমে? সাপ কখনও পোষ মানে?

সেদিন রাত অনেক হয়েছিল খাওয়া-দাওয়া করতে। সুতরাং তখন আর বেশি কথা হল না। ভুনিচাঁদ চলে গেল এঁটো বাসনপত্র নিয়ে।

কিন্তু ভোর বেলাই মিসেস এজরার চাকর একটা চিঠি নিয়ে এল।

মেমসাহেব লিখেছে—তোমাকে কাল ভালো করে থ্যাঙ্কস দেওয়া হয়নি। আমি অত্যন্ত এজিটেটেড ছিলাম। সিসিকে তুমি যে বাঁচিয়েছ তার জন্যে আমি আবার তোমাকে থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। হি ইজ্ সো নাইস্ ডারলিং। আজ যদি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আমার বাড়িতে আসো তো আমি খুব খুশী হবো। ইওরস্ ট্রুলি—মিসেস এজরা

চিঠির উত্তরে আমি জানিয়ে দিলাম যে আমি তার সঙ্গে লাঞ্চ খাবো। ভুনিচাঁদকেও আমি আমার দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত করতে বারণ করে দিলাম। সকালবেলা অফিস থেকে সোজা একেবারে চলে গেলাম মিসেস এজরার বাড়ি। সতেরো নম্বর বাড়িটা খুঁজতে কষ্ট হলো না। রেস্ট-হাউসের ঠিক পাশের বাড়িটাই রেস্ট-হাউসের মতই বিরাট বাড়িটা। বিরাট কম্পাউণ্ড বিরাট এরিয়া।

মিসেস এজরা নিজে সত্তর বছরের বুড়ী হলে কী হবে, লোকজন চাকর-খানসামা প্রচুর।

মিসেস এজরা থপ থপ করতে করতে এগিয়ে এসে বললে—গুড মর্নিং মিস্টার···

তারপর বললে—কী যেন আপনার নাম?

আলাপ-পরিচয় হবার পর নিজে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিলে। তারপর নিজে বসলো অন্য চেয়ারে। খাবার-দাবারের প্রচুর আয়োজন করেছিল বুড়ি। খেতে খেতে অনেক গল্প করতে লাগলো। সবই নিজের জীবনের গল্প। নিজের আর নিজের স্বামীর গল্প। মিস্টার এজরা নাকি এককালে ভালো শিকারী

ছিল। নিজের হাতে ইণ্ডিয়ার বাঘ ভালুক কুমীর শিকার করেছে। সে-সব জানোয়ারের চামড়া দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো।

—কই, ওই রোস্টটা খেয়ে নিন মিস্টার……

আমি বললাম—মিস্টার মিত্র—

অনেক বয়েস হয়েছে তাই মাঝে মাঝে নামটা ভুলে যাচ্ছিল। পুরোন গল্প বলতে বলতেও নাম সাল তারিখের ভুল হচ্ছিল বার বার।

—আপনি আমার যে উপকার করেছেন মিস্টার মিত্র তার জন্যে আমি ভেরি গ্রেটফুল আপনার কাছে। সিসি আগে এত দুষ্টু ছিল না জানেন! আগে শুধু মিল্ক দিলেই স্যাটিসফায়েড থাকতো এখন আর মিল্ক খেতে চায় না—ওই রেস্ট-হাউসের বাগানে অনেক ফ্রগ আছে কিনা, তারা ডাকে, তাই ও যায়—। আমি ওকে শুধু মিল্ক খাইয়ে রাখতে চাই!

ড্রয়িং- রুমের সামনের দেয়ালেই মিস্টার এজরার বিরাট অয়েল-পেন্টিং টাঙানো। বেশ গোঁফ-দাড়িময় মুখ। পুরুষালি চেহারা। ইহুদীদের সমাজে মিস্টার এজরার নাকি খুব সম্মান প্রতিপত্তি ছিল। ব্যবসা করে প্রচুর টাকা উপায় করেছিলেন তিনি। কারবারটা ছিল মদের। লাইসেন্স পেয়ে অনেকগুলো মদের দোকান করেছিলেন তিনি সি-পিতে। মদের দোকান দেখাশোনা করবার দরকার হতো না কিছু। অঢেল সময় ছিল হাতে। তিনি শিকার করতে যেতেন জঙ্গলে। সি-পিতে তো জঙ্গলের অভাব নেই। আমিও সঙ্গে যেতাম। ক্যাম্প করে রাত কাটাতাম জঙ্গলের মধ্যে। দেখুন না, কী চমৎকার চেহারা মিস্টার এজরার। এত ভাল চেহারা আপনি পাবেন না আমাদের জু'দের কমিউনিটিতে। কেমন, ঠিক নয়?

আমি বললাম—হ্যাঁ, ঠিক—

—আমাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। উই ওয়্যার এ হ্যাপি কাপল্—জানেন, এখানকার সবাই আমাদের হিংসে করতো।

—আর ওই দেখুন ওঁর ইয়াং ডে'জএর ছবি। দেখেছেন কী চমৎকার চেহারা! জানেন মিস্টার মিত্র, ও-রকম হাজব্যাণ্ড হয় না!

খাওয়া-দাওয়া তখন হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি তখন থেকে কেবল বক্ বক করেই চলেছিল। তারপর আমাকে নিয়ে গেল নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে। সারি সারি সাজানো ঘর। সব ঘরের দেয়ালময় শুধু মিস্টার আর মিসেস এজরার ছবি। দুজনে নানাভাবে ছবি তুলিয়েছে। নানা ঢঙে, নানা ভঙ্গিতে।

শেষকালে একটা ঘরে গেলেন। সেটা সিসি'র ঘর। সেখানে সিসি থাকে।

একটা ডবল খাট। বিছানা বালিশ। সোফা কৌচ। কাচের একটা কেস। সিসি তখন খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে বোধহয়। আধখানা কাচের কেসের মাথায়, আর আধখানা বিছানায় লটকে পড়ে আছে।

—আসুন, কিচ্ছু ভয় নেই। ও কামড়ায় না কাউকে। ভারি ভালো আমার সিসি।

বলে সিসির দিকে হাত বাড়িয়ে আদর করতে লাগলো—সিসি-সিসি—মাই ডারলিং—

মনে হলো মিসেস এজরা যেন সিসির মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুম খেল। কিন্তু আমার তখন গা ঘিন্ ঘিন্ করছে।

বললাম,—আমি এবার আসি মিসেস এজরা।

বুড়ি বললে—সে কি, আপনাকে যে আমার অ্যালবাম দেখোনো হয়নি—আসুন অ্যালবাম দেখাই—

বাধ্য হয়ে এ্যালবামটাও দেখতে হলো। এ্যালবামের ভেতরে সিসির নানা ধরনের ছবি, নানা ভঙ্গীর ছবি। বুড়ি সিসি'র নানা গল্প বলে যাচ্ছিল কিন্তু কিছুই তখন আর আমার কানে যাচ্ছিল না।

হঠাৎ বুড়ি জিজ্ঞেস করলে—বলুন তো এর 'সিসি' নাম রেখেছি কেন?

বলে নিজেই আবার বললে—সিসিফাসের নাম শুনেছেন—গ্রীক মাইথলজির সিসিফাস?

সিসিফাস দেবতাদের অভিশাপে মর্ত্যে এসেছিল শাস্তি ভোগ করতে। পাপের শাস্তি, অন্যায়ের শাস্তি। একটা পাথরকে কেবল সে পাহাড়ের চূড়োর ওপর তুলতে চেষ্টা করবে আর পাথরটা গড়িয়ে পড়ে যাবে। এ কাহিনীটা ছোটবেলায় পড়া ছিল।

—আমার কী মনে হয় জানেন মিস্টার মিত্র, এই সেই সিসিফাস—

—কেন?

—এ আগের জন্মে সাপ ছিল না নিশ্চয়ই, কারোর অভিশাপে সাপ হয়ে জন্মেছে! জানেন, এ আমার কথা বোঝে। আমি ঘুমোতে বললে ঘুমিয়ে পড়ে, খেতে বললে খায়, আমি ধমক দিলে মাথা নিচু করে। আর একদিন আসবেন আপনি, এর গল্প বলবো আপনাকে সব—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কোত্থেকে আপনি পেলেন একে?

—সে এক মজার হিস্ট্রি মিস্টার মিত্র, লর্ড জেহোরাই পাঠিয়ে দিয়েছেন, সব একদিন বলবো আপনাকে—

তা সেদিন বোধহয় মিসেস এজরা লাঞ্চের পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমিও আর বেশিক্ষণ থাকিনি। আসবার সময় মিসেস এজরা বলেছিল—আর একদিন আসবেন মিস্টার মিত্র—গল্প বলবো আপনাকে—জব্বলপুরে এলেই আসবেন।—

তারপর আমি রেস্ট-হাউসে ফিরে এসে সেদিনকার মত বিশ্রাম নিয়েছিলাম।

কিন্তু তখনও জানি না যে মিসেস এজরা একদিন আমার গল্পের কত বড় চরিত্র হয়ে উঠবে।

ভুনিচাঁদ বিকেল বেলা ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেছে।

বললে—কখন এলেন হুঁজুর? রাত্তিরে খাবেন তো? না রাত্তিরেও আপনার নেমন্তন্ন?

বললাম—না, এখানেই খাবো।

—সাপ দেখলেন নাকি?

বললাম—হ্যাঁ, কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

ভুনিচাঁদ বললে—সবাইকে মেম-সাহেব দেখান কিনা—

—সবাইকে দেখান?

—হ্যাঁ হুঁজুর, সবাইকে দেখান মেম-সাহেব।

—কেন দেখান?

—ওই সাপটা হুঁজুর এজরা সাহেবকে গিলে খেয়ে ফেলেছিল।

আমি চমকে উঠেছি কথাটা শুনে।

ভুনিচাঁদ বললে—হ্যাঁ হুঁজুর, জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন সাহেব। সেখানেই সাপটা সাহেবকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর সবাই কত বললে সাপটাকে মেরে ফেলতে, মেমসাহেব কিছুতেই শুনলে না, এখন ওই সাপটাকে নিজে পুষেছে, খাওয়াচ্ছে দাওয়াচ্ছে, ওর পেছনে মাসে কত টাকা খরচ করছে। জানেন হুজুর, ওই সাপটার সঙ্গে বুড়ি এক বিছানায় শোয় এখন।

আমি ভুনিচাঁদের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিলাম তার কথা শুনে। এ যেন বিশ্বাস করতেও আমার ভয় হচ্ছিল। কিন্তু কেন যে মিসেস এজরা এ-রকম অদ্ভুত আচরণ করতো তাও আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

আর তার পরের বার যখন জব্বলপুরে গিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম মেমসাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু তা আর হয়নি। শুনলাম ক'দিন আগেই মেমসাহেব হার্ট ফেল করে মারা গেছে।

কুড়ি মিনিটের গল্প

ভেজালের আলোচনা চলছিল। এই যে আজ চারদিকে ভেজালের রাজত্ব চলেছে, চালে, ডালে, তেলে, দুধে, ঘিয়ে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, মনুষ্যত্বে—এই নিয়েই বন্ধুরা তর্ক-বিতর্ক করছিল। অর্থাৎ তাদের সকলেরই বক্তব্য ছিল এই যে, এইভাবে ভেজাল চলতে থাকলে ইণ্ডিয়া একদিন রসাতলে যাবে।

একজন বললে—দিনকাল এমনই পড়েছে যে, এখন খাঁটি মিথ্যে কথাও আর শুনতে পাওয়া যায় না—মিথ্যে কথার মধ্যেও লোকে আজকাল ভেজাল চালাচ্ছে—

এতক্ষণ আমি চুপ করে ছিলাম। আমার বাড়িতেই আড্ডা। সুতরাং আমার নিজের পক্ষে শ্রোতার ভূমিকাই শ্রেয় বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু আর মুখ না খুলে থাকতে পারলাম না।

বললাম—আমি একবার খাঁটি মিথ্যে বলেছিলাম—

—কী রকম? কী রকম?

খাঁটি মিথ্যে কথা জিনিসটা একটু গোলমেলে। ব্যাখ্যা না করলে ও জিনিসটা ঠিক বোঝানো যায় না। অন্তত একটা উদাহরণ দিতে হয়।

বললাম—তবে শোন—

বন্ধুরা এতক্ষণ তর্ক করছিল। এবার গল্পের গন্ধ পেয়ে চুপ করলো। আমি বলতে শুরু করলাম।

ইটার্সি স্টেশনে ট্রেনটা থামলো। আমি যাচ্ছিলাম বোম্বেতে। বেলা ধরো তখন প্রায় সাড়ে দশটা কি এগারোটা। কিন্তু ট্রেনে চড়লে সকাল দশটা-এগারোটাও মনে হয় যেন দুপুর একটা। বিশেষ করে তখন আবার মে মাস। লাল ধুলোয় প্লাটফর্ম ভর্তি। জব্বলপুর থেকে উঠেছি। সুতরাং লাঞ্চ খাওয়ার প্রশ্ন আর ওঠে না। সঙ্গে খাবার আছে। ট্রেন ছাড়বার পর তার সদ্ব্যবহার করবার ইচ্ছে ছিল।

টাইম-টেবলে লেখা ছিল ইটার্সিতে কুড়ি মিনিট স্টপেজ।

বাইরের দিকে চেয়ে ছিলাম। ট্রেনটা ইটার্সিতে পৌঁছোতেই থার্ড-ক্লাশ প্যাসেঞ্জারদের ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি হল্লা-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। ভেণ্ডাররা চিৎকার শুরু করলো—'পুরি গরেম' 'চায় গ্রাম' 'গ্রেম জিলেবি'—

ওদিককার সব স্টেশনেই এই একই দৃশ্য। দেশ ভেদে রুচিভেদ হয় জানতাম। কিন্তু দেশভেদে যে কার্য-কারণ ভেদ হয় তা জানতাম না। একই সূর্য

বাঙলা দেশেও ওঠে আবার সি-পি-তেও ওঠে। কিন্তু দেশভেদে যে তারও তাপের তারতম্য হয় তা জানা ছিল না। ইটাসির ধুলোটা পর্যন্ত যেন আমার কাছে আরো বেশি গরম মনে হলো। মাথার ওপর জলন্ত সূর্যটাকে যেন সেদিন নিষ্ঠুরতর বলে মনে হলো আমার। অবশ্য এর কারণ বোধহয় সেই-ই আমার প্রথম ওই লাইনে পাড়ি দেওয়া।

ট্রেন সবে মাত্র তখন প্লাটফর্মে থেমেছে।

জানালার ধারে মুখ রেখে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ একজন দেহাতি লোক ট্রেনের জানালায় কাকে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে আমার কামরার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

ভাবলাম দেহাতি লোক, হয়তো কোনও কামরায় জায়গা নেই বলে উঠতে পারেনি। আমার কামরাটা ফাঁকা দেখে ভেতরে ঢুকতে চায়।

ভারি গলায় বললাম—ইহা নেহি, ইয়ে ফার্স্ট ক্লাশ কম্পপার্টমেন্ট—

ময়লা পাঞ্জাবি আর একটা ছোট মোটা ধুতি লোকটার। মাথায় গান্ধী টুপি।

লোকটা কিন্তু তাতে বিচলিত হলো না।

বললে—না বাবুজী, আমি কামরায় উঠবো না, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী বাত আছে, আমার একটা উপকার করতে হবে মেহেরবানি করে—

ভাবলাম সেই চিরাচরিত পন্থায় ভিক্ষে না চেয়ে লোকটা নতুন কায়দায় কিছু আদায় করে নিতে চায় আমার কাছ থেকে।

—এই পাঁচশো টাকা আপনার কাছে রাখুন বাবুজী!

বলে ট্যাঁক থেকে দশ টাকার নোটের একটা মোটা বাণ্ডিল আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি তো অবাক।

—আমি এক বুঢ্ঢা ঠাকুর-সাহেবকে আপনার কাছে আনছি, আপনি তার হাতে এই পাঁচশো টাকা দিয়ে দেবেন—

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—কে ঠাকুর-সাহেব?

লোকটা বললে—এখানকার পিপারিয়া মৌজার ঠাকুর-সাহেব। ঠাকুর-সাহেবের আশি বছর উমের, খুব বুড়ো মানুষ। মুশাফিরখানাতে বসিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি। আপনার মত একজন বাঙালীবাবুকেই খুঁজছিলাম, আপনি যদি এই উপকারটুকু করেন তো ঠাকুর-সাহেব বেঁচে যান—

—কিন্তু টাকাটা আমি না দিয়ে তুমি নিজেই তো ঠাকুর-সাহেবের হাতে দিতে পারো ?

লোকটা বললে—আমি টাকা দিলে কাজ হবে না বাবুসাহেব—

—কেন ? কাজ হবে না কেন ?

লোকটা বললে—সব বাত আপনাকে বলবার ওয়াক্ত নেই বাবুসাহেব, এখানে প্যাসেঞ্জার-গাড়ি সির্ফ্ বিশ মিনট্ ঠাহ্রবে—! আপনাকে কিছু তকলিপ করতে হবে না, টাকাটা ঠাকুর-সাহেবের হাতে দিয়ে শুধু বলবেন—আপকা লেড়কা ছেদিলাল দিয়া—

—কে ছেদিলাল ?

—ঠাকুর-সাহেবের লেড়কা। আমি ঠাকুরসাহেবের বড় ছেলে, ছেদিলাল আমার ছোট ভাই—

—তোমার নাম কী ?

লোকটা বললে—আমার নাম বাবুসাহেব, দরবারালাল।

ব্যাপারটা কী-রকম গোলমেলে লাগছিল। দরবারালালের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে আমি পিপারিয়া মৌজার ঠাকুরসাহেবের হাতে দিয়ে বলবো—এটা আপনার ছোট ছেলে ছেদিলাল দিয়েছে !

বললাম—ছেদিলাল কেন পাঁচশো টাকা দেবে ?

দরবারালাল বললে—ছেদিলাল আপনার অফিসে চাকরি করে যে। ছেদিলাল যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। বদমাস গুণ্ডাদের সঙ্গে মিশে মিশে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। তাই বাবা তাকে বকেছিল। বকতে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাঙালিবাবুর দফ্তরে চাকরি করছে। আমি এ-সব কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছি, তাই তো বাবা এখনও জিন্দা আছে, নইলে কবে বাবা মারা যেত—

কথাটা আমি তখনও ঠিক হজম করতে পারছিলাম না। কোথায়ই বা আমার অফিস আর কোথায়ই বা ছেদিলাল। তবু যদি মিথ্যে কথাটা বললে বুড়ো বাপের প্রাণটা বাঁচে তো বাঁচুক না। তাতে আমার কীসের ক্ষতি !

বললাম—কিন্তু আমি তো ছেদিলালকে চিনি না। যদি কথা বলতে গিয়ে কিছু উল্টো পাল্টা বলে ফেলি ?

দরবারালাল বললে—আপনাকে তো কিছুই বলতে হবে না। ঠাকুর-সাহেব যা বলবেন তাতে আপনি শুধু 'হ্যাঁ' বলে যাবেন—

—ছেদিলাল কবে বাড়ি থেকে পালিয়েছে ?

দরবারালাল বললে—সাত সাল আগে।

তারপর বললে—আর বেশি কথা বলবার সময় নেই বাবুসাহেব, ট্রেন ছেড়ে দেবে, আমি যাই ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে আসি—

বলে দরবারলাল ছুটতে ছুটতে প্লাটফর্ম পেরিয়ে মুসাফিরখানার দিকে চলে গেল। আমি সেই পাঁচশো টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। জীবনে অনেক রকম বিচিত্র ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। অনেক প্রিয়-অপ্রিয় ঘটনার মোকাবিলাও করতে হয়েছে। কিন্তু এর আগে যত কিছু ঘটনা দেখেছি শুনেছি পড়েছি তার কোনওটার সঙ্গেই এই ঘটনার যেন কোনও মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর বেছে বেছে ভগবান ঠিক আমাকেই কেন এ-সব ঘটনার মুখোমুখি ফেলেন তাও বুঝতে পারি না।

দেখলাম দূরে দরবারালাল আসছে। সঙ্গে একজন বৃদ্ধ অথর্ব মানুষ। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। চোখের ওপর একটা মোটা কাচের চশমা দু'দিকের কানের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা। বুড়োর গায়েও দেহাতি তাঁতে বোনা ময়লা পাঞ্জাবি, পরনে মোটা খাটো ধুতি। ঠাকুর-সাহেবকে দু'হাতে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল দরবারলাল। একেবারে আমার কামরার সামনে নিয়ে এসে দাঁড় করালো ঠাকুর সাহেবকে। মনে হলো ঠাকুর-সাহেব যেন চশমা থাকা সত্ত্বেও ভাল করে দেখতে পায় না।

দরবার ঠাকুর-সাহেবকে বললে—সেই বাংগালীবাবু—

ঠাকুর-সাহেব আমার দিকে তার ছানি-পড়া চোখ দিয়ে চেয়ে বললে—আপনিই বাংগালীবাবুজী ?

দরবারালাল বললে—এঁরই নাম মুখার্জি সাহেব, ছেদিলাল এই মুখার্জি সাহেবের দফতরেই কাম করে—

বুড়ো মানুষটা যেন নিজের ছেলের মনিবকে দেখে কৃতার্থ হয়ে গেল।

বললে—আপনার বহুত মেহেরবানি মুখার্জি সাহাব, ছেদিলালকে আপনি নোকরি দিয়েছেন—ছেদিলাল খারাপ লেড়কা নয় মুখার্জি সাহাব। ওকে গুণ্ডা-বদমাসরা খারাপ করে দিয়েছিল। ভালো করে মন দিয়ে দফতরের কাম করে তো ছেদিলাল ?

বললাম—হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে কাম করে। আপনি কিছু ভাববেন না।

কথাটা শুনে বুড়োর মুখখানা যেন আনন্দে আটখানা হয়ে উঠলো।

বললে—আমি জানতুম বাবুসাহেব ও অনেক বড় হবে, মহল্লার সবাই ওর নামে

তুষমনি করে ওকে খারাপ করে দিয়েছিল। আসলে ছেদিলাল আমার খুব ভাল ছেলে মুখার্জি সাহাব—

বললাম—হ্যাঁ খুব ভাল ছেলে—

—আপনি বলছেন ভাল ছেলে?

বললাম—হ্যাঁ, ভাল ছেলে বলেই তো ওকে চাকরি দিয়েছি আমার অফিসে।

ঠাকুর-সাহেব কী যেন ভাবলে আপন মনে। তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে এখন আর দারু খায় না?

বললাম—না, না, মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে ছেদিলাল—

বুড়ো বলতে লাগলো,—জানেন বাবুজী, ছেদিলাল আমার ছেলে। এই দরবারা-লাল বড় আর ওই ছেদিলাল ছোট। আমি ওই ছেদিলালকেই বেশি ভাল-বাসতাম বাবুজী, বেশি পেয়ার করতাম। ছেদিলাল মদ খেত বলে আমি অনেক বকেছি, কিছুতেই আমার কথা শুনতো না। পিপারিয়ার মহাজনদের কাছে হুণ্ডিতে টাকা ধার করতো ছেদিলাল। তবু আমি কিছু বলতাম না বাবুজী। ভাবতুম উমের হলে সব দোষ কেটে যাবে। আমি এই দরবারাকে না-জানিয়ে ওর হুণ্ডি ছাড়িয়ে দিতুম। হাজার-হাজার টাকা দিয়েছি ছেদিলালকে বাবুজী, কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু শেষে ও মেয়েমানুষের পেছনে লাগলো। তখন আমি আর থাকতে পারলুম না বাবুজী, আমি একদিন ওকে চড় মারলুম—

বলতে বলতে বুড়ো সেই প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে।

দরবারালাল এতক্ষণ চুপ করে বাপকে দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে।

আমার দিকে চেয়ে কী যে ইঙ্গিত করলে। তারপর বাপকে বললে—বাবা এইবার ট্রেন ছেড়ে দেবে—

বুড়ো কিন্তু সে-কথা শুনলো না।

বললে—সেই যে ছেদিলাল বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল বাবুজী, আর এল না। আমার সঙ্গে একবার দেখাও করলে না। তা বাপ-মা ছেলেকে বকে না বাবুজী? তাই আমিই ছিলাম ওর বাপ-মা সব কিছু। তা-বাপ-মা ছেলেকে বকে না বাবুজী? বাপ বকলো বলে গোসা করে একেবারে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হয়? আপনিই বলুন মুখার্জি সাহাব?

তারপর চোখের জলটা মুছে নিয়ে বুড়ো আবার বলতে লাগলো—তারপর দরবারালাল বললে ছেদিলাল নাকি কলকাতায় আছে, কলকাতায় ভালো নোকরি

করছে। তা ভালোই করেছে বাবুজী! আমার কাছে না আসুক, ছেদিলাল যে বেঁচে আছে এটুকু জেনেও মনে সুখ পাই বাবুজী!

বলে আবার কাঁদতে লাগলো ঠাকুর-সাহেব।

—আজকে দরবারালাল বললে মুখার্জি সাহাব ট্রেনে করে বোম্বাই যাচ্ছে, স্টেশনে গেলে দেখা হবে। তাই এলাম বাবুজী! দারবারালাল আমাকে আনছিল না। পিপারিয়া এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে বাবুজী। তা হোক আমি বললুম, ছেদিলালকে না দেখতে পাই আমি ছেদিলালের মালিক মুখার্জি সাহাবকে তো দেখতে পাবো। তা হলেই আমার ছেদিলালকে দেখা হবে!

দরবারালাল আবার মনে করিয়ে দিলে—বাবা, ট্রেন ছাড়বার টাইম হয়ে গেছে—

তারপর আমার দিকে আবার ইঙ্গিত করলে চোখ দিয়ে।

এবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলুম। সেই পাঁচশো টাকার বাণ্ডিলটা ঠাকুর-সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—ঠাকুর-সাহেব, ছেদিলাল এই টাকাটা আপনার কাছে আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে। বলেছে বাবাকে এটা দিয়ে দেবেন—

—টাকা?

—হ্যাঁ মাইনে থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এই পাঁচশো টাকা আপনাকে পাঠিয়েছে!

বুড়োর মুখখানা এবার দেখবার মত হয়ে উঠলো। টাকাটা হাত পেতে নিয়ে ছোট ছেলের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

—ছেদিলাল টাকা পাঠিয়েছে! ছেদিলাল টাকা পাঠিয়েছে!

বুড়োর কান্না শুনে দু'একজন প্যাসেঞ্জার আশে-পাশে জড়ো হচ্ছিল।

—কত টাকা আছে এতে?

বললাম—পাঁচ শো—

টাকার অঙ্কটা শুনে বুড়ো যেন আর সামলাতে পারলে না।

বললে—এত টাকা আমার কী হবে বাবুজী! আমার তো টাকার দরকার নেই—ছেদিলালই আমার টাকা, ছেদিলালই আমার মোহর—এ টাকা আমি নেব না, আপনি ছেদিলালকে দিয়ে দেবেন—তার টাকার কত দরকার—

দরবারালাল বললে—আপনি টাকা নিন বাবা, সে কত ভালবেসে আপনাকে দিয়েছে—আপনি টাকা ফিরিয়ে দিলে সে রাগ করবে—

—রাগ করবে? তবে আমি ফিরিয়ে দেব না।

তারপর আবার কী যেন ভাবতে লাগলো ঠাকুরসাহেব।

বললে—কিন্তু ছেদিলাল মাইনে পায় কত, মুখার্জিসাহাব—

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—সত্তর টাকা—

—সির্ফ সত্তর টাকা? সত্তর টাকায় কী করে চলবে তার মুখার্জিসাহাব? আমি দু'শো টাকা নিচ্ছি, এই বাকি টাকাটা তাকে দিয়ে দেবেন। বলবেন, যেন ভাল-ভাল জিনিস খায়। দুধ খেলে শরীর ভাল থাকে। এই টাকা দিয়ে তাকে দুধ খেতে বলবেন, ঘি খেতে বলবেন, মাখন খেতে বলবেন বাবুজী—আমার দরকার নেই। আমি তো দু' দিন বাদে মারা যাবো, আমি এ টাকা নিয়ে কী করবো? তার এখন জোয়ান বয়েস, সে এখন পেট ভরে ভাল-ভাল চিজ্‌ খাক। নিন্‌ বাবুজী, এই তিনশো টাকা তাকে দিয়ে দেবেন—

বলে তিনশো টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলে।

আমি নিচ্ছিলাম না। কিন্তু দরবারালাল বললে— নিন্‌ না মুখার্জিসাহেব, নিন্‌ না, বাবা দিচ্ছেন, নিন্‌ না—বলবেন, আমাদের টাকার দরকার নেই। সে আচ্ছা থাকলেই আমরা খুশী হবো।

ওদিকে হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠলো। এবার ট্রেন ছেড়ে দেবে।

দরবারালাল ঠাকুরসাহেবকে ধরে সরিয়ে নিলে।

—আচ্ছা রাম-রাম মুখার্জিসাহেব, রাম-রাম।

ট্রেনটা ছেড়ে দেবে একটু পরেই। ইঞ্জিন থেকে হুইশ্‌ল-এর শব্দ হলো। দেখলাম দরবারালাল বাবাকে নিয়ে প্লাটফর্মের ধুলোর ওপর দিয়ে মুসাফিরখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাকে যে তিনশো টাকা দিয়ে গেল, এটার কী হবে? টাকাটা তখনও আমার মুঠোর মধ্যে ধরা রয়েছে, কার টাকা, কে দিলে, কাকে দেব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। এ টাকা আমিই বা নেব কেন? কোথাকার লোক আমি, ঘটনচক্রে এসে পড়েছিলাম এই ইটার্সি স্টেশনে, আবার কোথায় চলে যাবো। আর কোথায় তিন ক্রোশ দূরে পিপারিয়া, সেখানকার ঠাকুরসাহেব আর তার ছেলে দরবারালাল। আর কোথায়ই বা তার ছোট ছেলে ছেদিলাল। জীবনে কখনও ওদের নামও শুনিনি, দেখিনি, ওদের সঙ্গে কথা বলিনি। কখনও দেখবোও না হয়ত ভবিষ্যতে। কিন্তু হঠাৎ কুড়ি মিনিটের স্টপেজে এসে কত বড় একটা নাটকের সাক্ষী হয়ে রইলাম। খাঁটি মিথ্যে কথা বললাম। এও যেন এক পরমাশ্চর্য ঘটনা।

ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করেছিল।

হঠাৎ দরবারালাল দৌড়তে দৌড়তে এসে আমার কামরায় উঠলো।

বললে—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাবুজী, আপনি ও-সব কথা না-বললে বাবা মারা যেতেন—

টাকাটা আমার হাতেই ছিল তার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললাম—নাও, নাও, এটা নাও, আমি ভাবছিলাম টাকা নিয়ে কী করবো—

দরবারালাল টাকাটা নিতেই এসেছিল বুঝতে পারলাম। তারপর সেটা ট্যাঁকে গুঁজে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল।

বললাম—তোমার ছোট ভাই এখন কোথায় আছে দরবারালাল ?

দরবারালাল মুখ ফিরিয়ে বললে—ছেদিলাল তো নেই হুজুর, সে মারা গেছে, সাত সাল আগেই মারা গেছে—

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো।

—একটা আওরৎকে খুন করার জন্যে তার ফাঁসি হয়ে গেছে। বাবাকে সে-সব কথা বলিনি। সাত সাল ধরে সে-কথা চেপে রেখেছি। তাঁকে খুশী রাখবার জন্যে বলেছি ছেদিলাল বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গিয়ে কলকাতায় চাকরি করছে। কিন্তু আজকাল ছেদিলালকে দেখবার জন্যে বাবা ভারি ছটফট করে। তাই মাঝে-মাঝে জাল চিঠি পড়িয়ে শোনাই। এর আগে একটা জাল চিঠি শুনিয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল যে, মুখার্জিসাহেবের হাত দিয়ে টাকা পাঠাচ্ছে ছেদিলাল। আজ আপনি ভাগ্যিস ছিলেন ট্রেনে, তাই বাবাকে একটু শান্তি দিতে পারলাম। আচ্ছা রাম-রাম—

বলে চলন্ত ট্রেন থেকেই দরবারলাল প্লাটফর্মের ওপর লাফিয়ে পড়লো।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা তখন খুব জোরে চলতে আরম্ভ করেছে।

এমন হয় না

ভদ্রলোক বললেন, আপনি পুলিশে চাকরি করেন ?

পুলিশের চাকরি শুনেই ভদ্রলোক যেন মুখ বাঁকালেন। মনে হল, পুলিশকে ভদ্রলোক তেমন সুনজরে দেখেন না।

আমি অবশ্য তখন পুলিশের চাকরিই করি। সে আজ থেকে ক' বছর আগেকার কথা। পুলিশের চাকরি হলেও সাধারণ পুলিশ নয়। সাদা-সিধে পোশাকে ট্রেনে বাসে ট্রামে ঘুরে বেড়াই। কে কোথায় ঘুঁষ নিচ্ছে তারই খবর রাখি। তারপর একদিন যথারীতি এস-পিকে গিয়ে রিপোর্ট করি, তারপর একদিন ট্র্যাপ করা হয়।

এসব কথা এ-গল্পে অবান্তর।

তবু এই প্রসঙ্গেই এ-গল্পটার কথা উঠলো।

ভদ্রলোক বললেন, আমি মশাই খুনী আসামী হয়ে একেবার পুলিশের খপ্পরে পড়েছিলাম, সাধে কি আর পুলিশের নামে ভয় পাই ?

—কি রকম ?

ভদ্রলোক বললেন, সে এক ভীষণ ব্যাপার মশাই। সেই থেকে আমি কোর্ট আর পুলিশের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছি—

ট্রেনে এক কামরায় চলেছি। পাশের দিকে অন্য প্যাসেঞ্জাররা যে-যার দল পাকিয়ে গল্প করতে ব্যস্ত। আমরা দুজন মুখোমুখি বসে ছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আজ থেকে অনেক দিন আগে। আমি তখন এজেন্সি-বিজনেস করি। সামান্য কমিশনে অল্প প্রফিটে খুশি থাকি। সেই সময়ে একবার একটা অর্ডার পেলাম রামকান্ত বোস লেন থেকে। রামকান্ত বোস লেন দেখেছেন ?

বললাম, না—

ভদ্রলোক বললেন, সে এক অদ্ভুত লেন মশাই, দোকান-পাট কারখানা বস্তি সব এক লাগোয়া। একেবারে গায়ে-গায়ে লাগানো। তিরিশের একের বি রামকান্ত বোস লেন খুঁজে পাওয়া কি সহজ ?

আমি যখন পৌছুলাম সেখানে, তখন রাত হয়ে গেছে অনেক। অন্ধকারে বাড়ির নম্বর দেখা যায় না ভালো করে। রাত নটা বেজেছে তখন। কাকে আর জিজ্ঞেস করি কোন্ বাড়িটার নম্বর তিরিশের একের বি।

একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, মশাই, তিরিশের একের বি বাড়িটা কোথায় হবে ?

সে-লোকটা বাস্তবাগীশ লোক মনে হলো ; বললে, ওই দিকে দেখুন—

বলে লোকটা যেদিকে যাচ্ছিল, সেই দিকেই চলে গেল।

আমি বাড়ির নম্বরটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম। একবার এদিক একবার ওদিক করে করে শেষকালে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাটির বাড়ি, টিনের চাল। খানিকটা আবার খোলা। ছোট ছোট কাঠের জানলা। ভেতরেও অন্ধকার। কাকে ডাকবো, কার নাম ধরে চেঁচাবো বুঝতে পারছিলাম না।

অর্ডারটা পেয়েছিলাম কে একজন জে, কে, গাঙ্গুলীর কাছ থেকে।

বাড়ির নম্বর, নাম, ধাম সমস্তই আমার কাছে ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই কাজে লাগলো না।

আমাদের এই বিজনেসে এরকম ঘটনা নতুন নয়। নানা জায়গা থেকে অর্ডার আসে আমার ফার্মের ঠিকানায়। যাদের টেলিফোন আছে, তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি। আর তখন মশাই আমার নিজের কারবারে আমিই ম্যানেজার আর আমিই ক্লার্ক। আবার আমিই আমার নিজের চাপরাশি তখন। অফিসে তালা-চাবি দিয়ে বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসি। সারা দিন অফিস চালাই, আর সন্ধেবেলা বেরোই পোর্টফোলিও ব্যাগটা নিয়ে। তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াই। পার্টির বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে তখন দেখা করবার সময় হয় আমার।

—কিসের বিজনেস আপনার ?

—আরে মশাই, বিজনেস কি আমার একটা জিনিসের ? হরেক রকম মালের অর্ডার সাপ্লাই করতে হয়। কেউ চায় এক টন তেঁতুল-বিচি, কেউ ঝ্যাটার কাঠি, কেউ আবার চায় ফড়িং—

—ফড়িং ?

—হ্যাঁ মশাই, পাখির খাবার। আর একসঙ্গে কেউ তো এক-টন তেঁতুলবিচি সাপ্লাই করতে পারে না। তাই সকলের কাছ থেকে দশ সের, বিশ সের করে জোগাড় করে সাপ্লাই করতে হয়।

—অত তেঁতুল-বিচি দিয়ে কী হতো ?

ভদ্রলোক বললেন, ওই যে' আটার সঙ্গে ভেজাল দেওয়ার জন্তে। তেঁতুলবিচি গুঁড়ো করে আটার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আর ধরবার উপায় নেই। যাকগে, এসব বাজে কথা···আপনাকে আসল ব্যাপারটা খুলে বলি—

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ট্রেনটা তখন পেণ্ড্রা রোড স্টেশনে এসে থেমেছে।

বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, এই চা-ওয়ালা—এই—

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি চা খাবেন নাকি ?

বললাম, দিন—

পুলিশের চাকরিতে সাধারণত তখন কারো কাছ থেকেই কিছু খেতাম না। কার মনে কী আছে, তা তো বলা যায় না। তবু ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু সন্দেহ হবার মত মনে হল না। তারপর ভদ্রলোক আমার সম্পূর্ণ অচেনা। সারাজীবনে আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই। আমার সঙ্গে তাঁর শত্রুতাই বা কী থাকতে পারে ?

চা খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, তারপর শুনুন—আমি সেই বাড়ির সামনের দরজার কড়া নাড়তে লাগলাম—

দরজার পাল্লা দুটো খোলাই রয়েছে। কিন্তু না বলে-কয়ে তো ভেতরে হুট করে ঢুকে পড়তে পারি না। কিন্তু করবোই বা কী ? আমারও তো কাজ। কাজ মানে ব্যবসা। সারা কলকাতা সহর টহল দিয়ে দিয়ে জুতোর শুকতলা ক্ষইয়ে ফেলি। তারপর আবার সেই অত রাত্রে বাড়ি ফেরাও আছে। আবার পরদিন ভোরবেলা উঠেই বেরোতে হবে।

শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম।

ঢুকতে ঢুকতে ডাকতে লাগলাম, গাঙ্গুলীবাবু, গাঙ্গুলীবাবু—

কিন্তু কোথায় গাঙ্গুলীবাবু ? সামনের দিকে একখানা ঘর। সে-ঘরটা পেরিয়ে উঠোন। উঠোনের চারদিকে আবার সার-সার ছোট ছোট ঘর মনে হল কোণের দিকের একখানা ঘরে যেন টিম-টিম করে আলো জ্বলছে। আলো যখন জ্বলছে, তখন নিশ্চয়ই লোক আছে।

সেই দিকে চেয়ে আবার ডাকলাম, গাঙ্গুলীবাবু—

কিন্তু কা-কস্য পরিবেদনা ! কেউই উত্তর দিচ্ছে না।

বড় মুস্কিলে পড়লাম। কী করবো বুঝতে পারলাম না উঠোনটা পেরিয়ে গিয়ে আবার ডাকলাম, গাঙ্গুলীবাবু আছেন—?

তবু উত্তর নেই। ভাবলাম ফিরে যাবো কিনা। কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাওয়া কি উচিত হবে !

একবার কী মনে হলো—আরো এগিয়ে গেলাম।

ঘরটার ঠিক দরজার সামনে যেতেই আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠলো। আমি এক নজর সেদিকে দেখেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠেছি।

আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না। যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম, সেই দিক দিয়েই বাইরে চলে এলাম। রাস্তায় আমাকে কেউ দেখতে পেলো কিনা তা আর তখন ভাববার সময় নেই। এক নিশ্বাসে বৌবাজার থানায় গিয়ে হাজির হলাম।

থানার অফিসার-ইন-চার্জ আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী চান?

আমি কি আর তখন কথা বলতে পারছি মশাই যে সব খুলে বলবো? আমার তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে। আমি কোন রকমে চেয়ারটার ওপরে বসে পড়ে বললাম, এক গ্লাস জল যদি কাউকে দিয়ে আনিয়ে দিতে পারেন—

জল এলো। জল খেলাম।

ও-সি খানিক পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে বলুন তো আপনার?

বললাম, আমি এখুনি রামকান্ত বোস লেন থেকে আসছি। তিরিশের একের বি রামকান্ত বোস লেন। বাড়িতে কোন লোকজন দেখতে পেলাম না। তাই বাড়ির মালিকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভেতরের উঠোনে ঢুকে গিয়েছিলুম। সদর দরজা খোলা ছিল কিনা। কিন্তু উঠোনের ভেতরে গিয়ে ডাকতেই নজরে পড়লো কোণের দিকের একটা ঘরের ভেতরে একটা লোক খুন হয়ে পড়ে আছে। রক্তে সমস্ত মেঝে একেবারে ভেসে যাচ্ছে—

—তারপর?

বললাম, তারপর সেই দেখে আর সেখানে দাড়াই নি, সোজা দৌড়োতে দৌড়োতে আপনার কাছে আসছি···

—কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন কী করে? আলো জলছিল?

বললাম, মোমবাতি কিম্বা কেরোসিনের ল্যাম্প হয়তো জলছিল একটা—

—যার বাড়িতে আপনি গিয়েছিলেন, সে ভদ্রলোকের নাম কী?

বললাম, মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলী, এই দেখুন, এই তার চিঠি, চিঠি পেয়েই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—

ও-সি চিঠিটা হাতে নিলে। পড়ে দেখলে আদ্যোপান্ত। তারপর বললে, এ-চিঠিটা আমার কাছে থাক—

বলে আমার নাম-ধাম-পরিচয়-কুলুজি সব টুকে নিলে। তারপর দুজন কনস্টেবলকে ডাকলে। তাদের সঙ্গে নিয়ে বেরোল।

যাবার সময় আমাকে বললে, আপনি বসুন এখানে, আমি আসছি—

আমাকে বসিয়ে রেখে অফিসার-ইন-চার্জ বাইরে চলে গেল।

থানায় বসে থাকতে থাকতে আমার বড় ভয় করতে লাগলো মশাই। পুলিশের খপ্পরে পড়লাম শেষকালে। না জানি কী হিতে-বিপরীত হবে! তাছাড়া, শেষ পর্যন্ত আমায় যদি না ছাড়ে? আমাকে যদি হাজতে রেখে দেয় আটকে! ভালো করতে এসে শেষকালে কি নিজেরই খারাপ হবে নাকি? পুলিশকে তো বিশ্বাস নেই। কিছু মনে করবেন না মশাই। আমরা সাধারণ মানুষ, ব্রিটিশ-আমলের লোক, পুলিশের ভয় এখানো আমাদের কাটে নি।

তা সেই রকম চুপচাপ বসে আছি থানায়। কত লোক আসছে যাচ্ছে। কত টেলিফোন আসছে। কেউ আমার দিকে দেখছে না। আমলই দিচ্ছে না আমাকে।

এমনি করে প্রায় এক ঘণ্টা কাটলো।

হঠাৎ ও-সি এসে ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সেই তুজন কনস্টেবল, আর একজন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোককে দেখিয়ে ও-সি বললে, দেখুন তো, একে চিনতে পারেন কিনা?

ভদ্রলোক আমার দিকে তখন একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে।

আমিও চেয়ে দেখছি। কেউ কাউকে চিনতে পারছি না।

ও-সি বললে, এঁর নামই তো মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলী। আপনি এঁকে আগে কখনো দেখেন নি?

বললাম, না, আমি কী করে দেখবো ওঁকে! আমি তো ওঁর চিঠি পেয়েই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা বললে।

বললে, আর আমি এদিকে আপনার জন্যে হাঁ করে বসে আছি। মালটা আমার আর্জেন্ট দরকার, আর আপনি আসছেন না। চোদ্দ তারিখে আপনাকে চিঠি লিখেছি আর পনেরো দিন হয়ে গেল আপনার কোন খোঁজখবর নেই।

আমি বললাম, আমি আর একটা পার্টির কাজে বাইরে গিয়েছিলাম, কলকাতার বাইরে—আর আমি ছাড়া তো আমার অন্য কোন স্টাফ নেই—

—তা আপনি আমার বাড়িতে আজকে কখন গিয়েছিলেন?

—এই তো, তখন রাত প্রায় নটা হবে।

—সেকি মশাই, আমি সন্ধে ছটা থেকে বাড়িতে বসে আছি, যাবো কোথায়? বাসে ট্রামে কি জায়গা পাওয়া যায় যে আপনার মত ঘুরে বেড়াবো?

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। আমি নিজে গিয়ে দেখে

এলাম, নিজে বাড়ির উঠোনে ঢুকলাম, আর দেখলাম একজন লোক খুন হয়ে পড়ে রয়েছে, আর ভদ্রলোক বলছে কিনা আমি যাই নি !

ভদ্রলোক আবার বললে, তাহলে আপনি বোধ হয় অন্য কোন বাড়ির ভেতর ঢুকেছিলেন—

বললাম, তা কখনো হতে পারে ? আমার চোখ নেই ? আমি স্পষ্ট দেখলাম তিরিশের একের বি লেখা রয়েছে দরজার মাথায় !

ভদ্রলোক বললে, আপনি দেখাতে পারেন আমাকে ?

বললাম, নিশ্চয় দেখাতে পারি—

ভদ্রলোক বলল, যদি না দেখাতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার নামে মানহানির মামলা করবো মশাই, আপনি পুলিশের সামনে আমাকে বে-ইজ্জৎ করেছেন !

—আমি আপনার বে-ইজ্জতি করেছি ? বলছেন কী আপনি ?

—বে-ইজ্জতি করছেন না ? পুলিশ অফিসার যদি প্রমাণ করেন যে আমি আমার বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে খুন-খারাপির কারবার করি, তখন তো আমাকে ফাঁসিতে লট্‌কাবেন ?

আমি বললাম, দেখুন মশাই, আমি ভেবেছিলাম আমি হয়তো খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বো, সেই জন্যেই এই থানায় এসে এজাহার দিয়েছি। নইলে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন রাগ নেই। আর রাগ থাকবেই বা কেন ? আপনি তো আমার অচেনা লোক। আপনাকে আমি এর আগে কখনো দেখিই নি। আর রামকান্ত বোস লেনেও আমি জীবনে কখনো যাই নি এর আগে—

—তাহলে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, খবরদার বলছি আমার সঙ্গে আপনি অমন করে কথা বলবেন না। যা দেখেছি তাই আমি বলেছি—

পুলিশ অফিসার বললেন, আপনারা ঝগড়া করছেন মিছিমিছি। কে মিথ্যে কথা বলছেন আর কে বলছেন না, তার প্রমাণ আমি করবো। আপনি যে-বাড়িতে গিয়ে খুনটা দেখেছিলেন, সেটা আর একবার দেখাতে পারবেন ?

বললাম, নিশ্চয়ই দেখাতে পারবো। চলুন, আমি আপনার চোখের সামনেই দেখিয়ে দেবো—

পুলিশ অফিসার বললেন, তাই চলুন—আর আপনিও চলুন আমার সঙ্গে—

সেদিন যে কী বিপদে পড়েছিলুম কী বলবো মশাই। পুলিশকে আমি বরাবরই ভয় করি, অথচ শেষকালে সেই পুলিশের পাল্লায়েই পড়তে হলো আমাকে।

তা সেই রাত্রেই আবার তিনজনে মিলে সেই রামকান্ত বোস লেনের বাড়িতে গেলাম। সেই তিরিশের একের বি নম্বরের বাড়িতে।

গাঙ্গুলীবাবু বললেন, এই দেখুন, এই আমার বাড়ি। এই বাড়িতেই আপনি এসেছিলেন তো?

আমি ভালো করে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

—বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিন মশাই। শেষকালে যেন বলবেন না যে আমি আপনাকে ধাপ্পা দিয়েছি। ঠিক করে দেখে বলুন, এই বাড়িতেই আপনি এসেছিলেন কিনা—

আমি কী বলবো! রামকান্ত বোস লেনের কোনও বাড়িটা এক রকমের নয়। কোনটা পাকা বাড়ি, কোনটা মাটির, কোনটা টিনের চাল। গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িটাও মাটির বাড়ি। আমার কেমন মনে হতে লাগলো এই বাড়িতেই আমি ঘণ্টাখানেক আগে ঢুকেছিলুম।

—নম্বরটা ভালো করে দেখুন!

দেখলাম নম্বরটার দিকে চেয়ে।

—কী লেখা আছে?

বললাম, তিরিশের একের বি।

—এই বাড়িতেই আপনি ঢুকেছিলেন?

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তখন তো ভেতরে কোন লোকজন ছিল না—সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার লাগছিল—ভেতরে একটা উঠোন ছিল—

ভদ্রলোক বললেন, আমার বাড়িতেও একটা উঠোন আছে। চলুন, গিয়ে দেখবেন চলুন—

আমি ভেতরে ঢুকলাম। ভদ্রলোক আগে আগে চলতে লাগলো। পুলিশ অফিসারটিও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

আমি ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। ঠিক সেই রকমই বাড়িটা বটে, কিন্তু আসবাবপত্র ভরা, লোকজন রয়েছে। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা রয়েছে।

—কী দেখছেন?

অফিসারটি বললেন, কী দেখছেন?

আমার তখন মুখে কথা আটকে যাচ্ছে। কী বলবো বুঝতে পারলাম না।

—কী মশাই, বলুন কিছু? কোথায়, কোন্ ঘরে খুন-খারাপি দেখেছিলেন?

বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

অবাক হলো ; বললে, এক রাস্তায় তো দুটো বাড়ির একই নম্বর হতে পারে না। আপনি মিছিমিছি আমাকে খুনের দায়ে জড়াতে চেয়েছিলেন—আমি কি আর তা বুঝি না ?

অফিসার-ইন-চার্জও আমাকে বললে, এখন তো দেখলেন সব, এখন বুঝলেন সব আপনার মনের ভুল ?

বললাম, তা হতে পারে, আমি হয়তো ভুলই দেখেছিলুম—

তারপর আর কী বলবো ? চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

জে. কে. গাঙ্গুলী ভদ্রলোক তখন জিতে গেছে। তখন আরো তম্বি বেড়ে গেছে তার। দু-চার কথা শোনালো। আমার তখন চুপ করে থাকার পালা, তাই আমি সব কিল হজম করে গেলুম।

রাস্তায় এসে পুলিশ অফিসার বললে, যান, বাড়ি চলে যান—এবার থেকে নিজে সঠিক না হয়ে কিছু অ্যালিগেশন দেবেন না যার-তার নামে—

আমি নমস্কার করে ক্ষুণ্ণ মনে চলে এলাম।

ট্রেনের ভদ্রলোক বললেন, এ তো গেল সেই দিনের ব্যাপার। আমি ভাবলাম ঝঞ্ঝাট চুকলো। আমি আমার কারবার নিয়ে থাকবো, দুটো পয়সার ব্যবস্থা করবো, তা নয় যত ছেঁড়া ঝামেলা—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, এবার আর এক কাপ চা খাবেন নাকি ?

আর একটা স্টেশন এসে পড়েছিল। কিছু লোক উঠলো, আবার কিছু লোক নামলোও।

বললাম, তারপর ?

ভদ্রলোক বললেন, আর এক কাপ খেলে পারতেন, চা'টা এখানে করে ভালো—

বলে গরম চায়ে ঘন-ঘন চুমুক দিতে লাগলেন। তারপর সবটা নিঃশেষ করে মাটির ভাঁড়টা টিপ করে প্ল্যাটফর্ম আর গাড়ির ফাঁকে ফেলে দিলেন।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ?

ট্রেনটা আবার চলতে লাগলো। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক বোধ হয় এতক্ষণ গল্পটা আগাগোড়া শুনছিলেন।

বললেন, আপনি রামকান্ত বোস লেনের কথা বলছেন তো ?

আমরা দুজনেই চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলাম সেই দিকে। বেশ মোটা-সোটা বয়স্ক প্রবীন ভদ্রলোক।

—আমি মশাই ওই রামকান্ত বোস লেনেই একবার একটা বাড়ি কিনতে গিয়েছিলাম, সে কী বিপদ মশাই, আমার ক'টা টাকাই গচ্চা গেল—

এতক্ষণ যে-ভদ্রলোক গল্প বলছিলেন তিনি বললেন, সেকি! আমিও তো বাড়ি কিনতে গিয়েছিলাম। কত নম্বরের বাড়িটা বলুন তো?

—তা মনে নেই, অনেক দিন আগেকার ব্যাপার তো!

—কী হয়েছিল আপনার?

পেছনের ভদ্রলোক বললেন, এক দালালের কথায় ভুলে বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলুম। সামনে, আপনি যা বললেন, ওই মাটির একখানা ঘর, ভেতরে আরো চার-পাঁচখানা ঘর, মধ্যিখানে একটা উঠোন—

—দালালটার কি রকম চেহারা বলুন তো?

পেছনের ভদ্রলোক বললেন, কালো, বেঁটে, কোঁকড়ানো চুল মাথায়···

—ঠিক বলেছেন, বেটা মহা শয়তান। আগে তো বুঝতে পারি নি, আমিও মশাই ওই দালালের পাল্লায় পড়েছিলুম। ওঃ, কী ডেঞ্জারাস লোক! আপনার কাছে কত টাকা ঠকিয়েছে?

—তা বারোশো টাকার মতন।

—বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

পেছনের ভদ্রলোক বললেন, না দেখা করলে বারোশো টাকা কার হাতে দেবো? বাড়িটার দরদস্তুর ঠিক হলো পনেরো হাজার টাকায়। আমি তার নিমতলা ঘাট রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। দেখলাম ভদ্রলোক বেশ প্রবীন। বললেন বাড়িটা তাঁর এক পিসিমার কাছ থেকে পাওয়া। পিসিমার কেউ ছেলেমেয়ে ছিল না উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি ওটা পেয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির দরকার নেই, সেই জন্যেই বেচে দিতে চান।

দুজনে কথা বলছিলেন। আর আমি বসে বসে দুজনের কথা শুনতে লাগলাম।

শেষকালে বললাম, আসল ব্যাপারটা কী হলো খুলে বলুন—আমি আপনাদের কথা ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারছি না।

আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন, আসলে ব্যাপারটা হলো ওই নিমতলা ঘাট রোডের ভদ্রলোকই হলেন বাড়ির মালিক। তিনি ওই সম্পত্তিটা পেয়েছিলেন পিসিমার কাছ থেকে।

—সে তো শুনলাম। তারপর?

—তারপর ওঁর মত আমিও একদিন বাড়ি দেখতে গেলাম। দালাল সঙ্গে করে

আমাকেও নিয়ে গেল। দেখি সেই বাড়িটা—ঠিক সেই বাড়িটা, আমি অনেক দিন আগে যে-বাড়িটা দেখেছিলাম রাত নটায়। ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। নম্বরটা ভালো করে লক্ষ্য করলাম। পঞ্চাশের বি। সেদিন রাত্রে ওই নম্বরটাই আমি তিরিশের একের বি বলে ভুল করেছিলাম।

দালালটা বললে, কী হলো, কী দেখছেন?

আমি বললাম, দেখছি, বাড়িটা পুরোন—

দালাল বললে, হ্যাঁ, মালিক তো বলেইছেন আপনাকে যে পুরোন বাড়ি। নইলে এই সাত কাঠা জমির ওপর বাড়ির কখনো পনেরো হাজার টাকা দাম হয়? আপনিই বলুন না। এই জমির ওপর আপনি দু'তলা বাড়ি তুলে ভাড়া দিন না, মাসে মাসে আপনার পাঁচশো টাকা ভাড়া আসবে বে-কসুর!

দালাল অনেক কথা বলছিল, কিন্তু আমার কানে সে-সব কথা যাচ্ছিল না।

একবার ভাবলাম এ-বাড়ি নিয়ে কী করবো, বাড়ি ফিরে যাই। আবার ভাবলাম দেখিই না জিনিসটা কী! সেদিন যে মানুষ-খুন দেখে ভয় পেয়েছিলাম, ভয় পেয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছিলাম, সে রহস্যটা কী!

দালাল বললে, চলুন, ভেতরে চলুন—

দালালের পেছন-পেছন ভেতরে গেলাম। ঠিক সেই বাড়ি, সেই ঘর, সেই উঠোন। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও নোংরা, জঞ্জাল, কিছু নেই।

—এই দেখুন, পেছনে কত জায়গা। একতলাতেই আপনার দশখানা বেড-রুম করতে পারবেন আপনি ইচ্ছে করলে। তারপর দোতলা তুললে পুবদিকের রোদ পাবেন, দক্ষিণের বাতাস পাবেন, উত্তরের আলো পাবেন।

আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলাম, এ-বাড়ি এতদিন বিক্রি হচ্ছে না কেন? কেউ কি এর আগে কিনতে এসেছিল?

—না মশাই, মালিকের কি টাকার অভাব? বাড়ি বিক্রির গা-ই নেই কর্তার।

আমি কিছু বললাম না মুখে। আমি যে এ-বাড়িতে আগে এসেছি তাও জানালাম না। আমি যেন এ-পাড়াতে এই প্রথম আসছি এই রকম ভাব দেখালাম। আমি মশাই অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসা করি, আমি অত সহজে ছাড়বো কেন? দালালটার কথার ভাবে বুঝলাম আগে অনেক খদ্দের বাড়ি কিনতে এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন এক কারণে কিনতে পারে নি বলেই বাড়িটা এতদিন খালি পড়ে আছে। আর,

তাছাড়া, এ-বাড়ির দামও কম। কেন কম? এ-বাড়ির দাম পঁচিশ হাজার বললেও তো কেনবার লোকের অভাব হবে না।

দালালটা বললে, আমি নিজে গা করে মালিককে দিয়ে বেচাবার চেষ্টা করছি, তাতে আমি দুটো পয়সা পাই—

আমি সমস্ত বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। তারপর আবার বাইরের রাস্তায় এসে বললাম, ঠিক আছে, বাড়িটা তো দেখা হলো, আমার পছন্দও হয়েছে—এবার বায়না করার ব্যাপার—

দালাল বললে, বারোশো টাকায় বায়না হবে, তারপর সার্চ-টার্চ করতে লাগবে মাসখানেক। মাসখানেক পরেই দলিল রেজিষ্ট্রি হবে।

বললাম, তাই ঠিক রইল—

—কবে তাহলে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, বলুন?

বললাম, যেদিন তোমার সময় হবে, আমার টাকা রেডি—

দালালটা বললে, আমি তাহলে মালিকের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে খবর দেবো।

দালাল চলে গেল। আমিও অন্য দিকে চলতে লাগলাম।

একজন লোক দেখছিলাম অনেকক্ষণ থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিল। নিচু স্ট্যাটাসের লোক। খালি গা, পায়ে চটি। বিড়ি খাচ্ছে ফুক-ফুক করে।

দালালটা চলে যেতেই আমি তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। লোকটাও একটু যেন উৎসাহ পেয়ে কাছে এলো।

বললে, আপনি বাড়িটা কিনছেন নাকি?

বললাম, তুমি কে?

লোকটা বললে, আমি এই পাড়াতেই থাকি। তা বাড়িটার কত দাম বলেছে?

বললাম, পনেরো হাজার—

লোকটা বিড়িটায় সুখটান দিলে। তারপর বললে, আপনার টাকা, আপনি কিনবেন, তাতে আমার কিছু বলবার নেই। তবে যা করবেন একটু ভেবেচিন্তে করবেন মশাই—

—কেন? একথা বলছো কেন? বাড়িটার কিছু গলদ আছে?

লোকটা বললে, গলদ তো আছেই, গলদ না থাকলে অ্যাদ্দিন বিক্রি না হয়ে শুধু শুধু খালি পড়ে আছে? একটা ভাড়াটে পর্যন্ত নেই, দেখতেই তো পেলেন!

—কী গলদ?

লোকটা আবার একটা বিড়ি ধরালে।

বললে, গলদ তো আছেই, নইলে বিক্রি হচ্ছে না কেন? এ তো স্ট্রেট কথা মশাই, এই ভাড়াটে-বাড়ির দুর্ভিক্ষের সময় একটা ভাড়াটেও আসছে না, গলদ না থাকলে এমন হয়?

—তা কী গলদ তুমি জানো কিছু?

—জানি না, তবে লোকের মুখে নানান কথা শুনতে পাই তো!

—কী শোনো?

লোকটা বললে, না, না, তা আমি বলবো না, আপনি নিজের পকেটের পাইস খরচ করে বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন, আমি কেন তাতে বাদ সাধবো?

বললাম, না, এখনো আমি বায়নার টাকা দিই নি, তুমি বলো—গলদটা কী, তাই বলো আমাকে।

লোকটা বললে, আমি নিজের চোখে কিছু দেখিনি মশাই, যা শুনেছি তাই আপনাকে বলতে পারি।

—বলো।

—আরে মশাই, তাহলে আপনাকে সত্যি কথাটাই বলি। আপনি গেরস্ত মানুষ, আপনার কতকগুলো টাকা মিছিমিছি নষ্ট হবে, এটা আমি চাই না।

—তার মানে?

—তার মানে, বাড়ি আপনি কিনছেন কিনুন, কিন্তু টিঁকতে পারবেন না এ-বাড়িতে, এও বলে রাখছি। কোন মানুষ ও-বাড়িতে টিঁকতে পারবে না।

আমি আরো অবাক হবার ভান করলাম।

বললাম, সেকি! কী বলছো তুমি?

—হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলছি মশাই। আপনি তো জানেন না। আগে যারা কিনতে এসেছিল তারা জানে। এ-বাড়ির দরজায় তালা-চাবি দেওয়া রয়েছে দেখলেন তো? ওই বাড়ির তালা-চাবি আবার যখন-তখন খুলে যায়।

—খুলে যায়, মানে?

—খুলে যায় মানে কে খোলে কে বন্ধ করে তার ঠিক নেই।

—তাহলে কি ভূতের বাড়ি বলছো? ভূতের উপদ্রব আছে?

লোকটা বললে, তা কী করে বলবো মশাই! যা শুনিচি তাই বললাম। অনেকে আবার রাত্তিরবেলা বাড়িতে ঢুকে খুন-খারাপি কাণ্ড দেখেছে।

—সেকি!

—তাই তো বলছিলুম, ও-বাড়ি আপনি কিনবেন না মশাই। যদি বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে না চান তো কিনবেন না।

বলে লোকটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছিল। আমি চেপে ধরলাম।

বললাম, আরো কী কী জানো ও-বাড়ি সম্বন্ধে তাই বলে যাও, আমি ছাপোষা মানুষ, বাড়ি কিনে ঝামেলা পোয়াতে চাই না—

লোকটার যেন গা নেই আর, আমাকে এড়াতে চাইছে।

বললে, ওই তো বললাম মশাই, যা জানি সব আপনাকে বললুম।

বলে লোকটা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। আমি কী করবো বুঝতে পারলাম না আমি সোজা নিজের অফিসে চলে গেলাম।

অনেকদিন পরে একদিন অফিসে কাজ করছি, হঠাৎ একজন লোক ঘরে ঢুকলো। মুখখানার দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলী!

—কী চাই আপনার?

গাঙ্গুলীবাবু বললে, নমস্কার, আমার সেই মালটার কী হলো?

বললাম, কী মাল?

—মনে নেই, আপনি সেই আমাদের পাড়ায় গিয়ে ভুল করে আমার বাড়ি মনে করে অন্য বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন? মনে নেই?

যেন এতক্ষণে মনে পড়লো, এমনি ভাবে বললাম, ও মনে পড়েছে—

গাঙ্গুলীবাবু বললে, সেদিন পুলিশের সামনে আপনি অমন করে কথা বললেন শুনে মনটা বড় খিঁচড়ে গিয়েছিল, তাই কিছু কটু কথা শুনিয়েছি আপনাকে, কিছু মনে করবেন না। তা আমার সেই মালটার কী হলো?

—কোন্ মালটা বলুন তো?

গাঙ্গুলীবাবু বললে, সেই যে দেড় টন হাড়?

এতক্ষণে যেন মনে পড়লো। বললাম, হ্যাঁ, নানান কাজের চাপে আর ও-কথা মনেই ছিল না। আমি চেয়েছিলাম দেড় টন হাড়, কিন্তু এখন আমার কাছে পার্টি বলছে তিন টন হাড় চাই—

গাঙ্গুলীবাবু বললে, তা তিন টন চাইলে তিন টনই দিতে পারি—

—কত তারিখের মধ্যে দিতে পারবেন?

—আপনি যেদিন বলবেন। আমার মশাই ট্যাংরাতে নিজের গোডাউন আছে। মালের অভাব কী?

বললাম, আপনি মশাই কোত্থেকে এত হাড় জোগাড় করেন? কিছু মনে করবেন না একথা জিজ্ঞেস করছি বলে—

—না, না, তা মনে করবো কেন? বড় শক্ত কারবার মশাই। গ্রামে-গ্রামে আমার লোক আছে। বাঙলা দেশের ক্ষেতে-খামারে-ভাগাড়ে যত গরু-মোষ মরে, আমি পয়সা দিয়ে তা কিনে নিই। পাকিস্তান না হলে আমি আরো মাল সাপ্লাই করতে পারতুম। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই একটু মুস্কিল হয়েছে। ক্ষেত-খামার-ভাগাড় ওয়েস্ট-বেঙ্গলে আর অত কোথায় বলুন না।

—তা এত গরু-মোষ মরে?

গাঙ্গুলীবাবু বললে, তা মরে না? মানুষই তো আজকাল মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে। একবার নিমতলার শ্মশানে গিয়ে দেখে আসুন না, চিতে জ্বলছে তো জ্বলছেই। শ্মশান কখনও খালি যেতে দেখেছেন?

তা বটে! গাঙ্গুলীবাবু যা বললে তাতে বুঝলাম বাঙলাদেশের গ্রামে-গ্রামে তার টাকা দাদন দেওয়া থাকে মুচিদের কাছে, চামারদের কাছে। রাস্তায়-ঘাটে বনে-বাদাড়ে গরু-ছাগল-মোষ মরলেই তারা কিনে নেয়, কিম্বা কুড়িয়ে নেয়। তারপর তার হাড় জড়ো করে গাঙ্গুলীবাবুর গুদামে পাঠিয়ে দেয়!

আমি এত সব জানতুম না। এতদিন আমি নানা রকম অর্ডার সাপ্লাই করেছি। ঝাঁটার কাঠি, তেঁতুল-বিচি, পোকা-মাকড়। কিন্তু হাড় এই প্রথম। একটা বিলিতি কোম্পানি অর্ডার দিয়েছিল হাড়ের—তারা ইয়োরোপে পাঠাবে। কিন্তু গাঙ্গুলীবাবুই বললে, পাকিস্তান হবার পর থেকেই নাকি কারবারের অবস্থা খারাপ চলছে। হাড়ের সাপ্লাই কমে যাচ্ছে। পাকিস্তান মার্কেটটাই হাড়ের কারবারে ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে, আরে, আপনি তা জানেন না? এই যে জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানে অত হিন্দু মরলো, মরলো কেন তা বুঝলেন না? বোন্-মার্চেন্টরা মতলোব করেই তো ওটা করলে। লক্ষ লক্ষ মানুষের হাড় সাপ্লাই করে পাকিস্তানের বোন্-মার্চেন্টরা একেবারে রাতারাতি লাল হয়ে গেল। আর আমরা এখানে বসে শুধু বুড়ো আঙুল চুষছি—

তারপর একটু থেমে বললে, তা থাকগে, সে-সব বাজে কথা। কপালে যখন কষ্ট আছে তখন আর কাকে দোষ দেব? আপনি আমার তিন টন মাল কাটিয়ে দিন—দরের জন্যে আপনি ভাববেন না।

বললাম, ঠিক আছে, আমি আজই পার্টিকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

গাঙ্গুলীবাবু চলে গেল।

আমি ভাবতে লাগলাম। আমার মাথায় হঠাৎ উদয় হলো বোন্‌-মার্চেন্টদের দুরবস্থার কথা। পাকিস্তান লাভ করছে আর ইণ্ডিয়া লোকসান দিচ্ছে!

পরদিনই অফিস বন্ধ করে তখনি বাড়ি চলে এলাম।

পরদিনই হঠাৎ দালালটা এসে হাজির।

বললে, কী হলো স্যার, সেই যে বায়না করবেন বলেছিলেন বাড়িটার?

বললাম, আরো কিছুদিন সময় চাই—আর এক সপ্তাহ।

দালালটা চলে গেল।

চলে যাবার সময় বললে, এই চান্সটা ছাড়বেন না স্যার, নইলে এমন সস্তায় বাড়ি আর পাবেন না।

দালালটাকে কথাটা স্পষ্ট করে বললাম না। শুধু বললাম, টাকাটা জোগাড় করেই তোমায় খবর দেব।

দালাল মানুষ, সহজে ছাড়তে চায় না। বেচা-কেনা হলেই দালালের লাভ। কিন্তু আমি ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখে কিছু করবো না ঠিক করলাম। ওদিকে মিস্টার গাঙ্গুলীও কেবল্ তাগাদা দিচ্ছে অর্ডারের জন্যে। আমি কী করবো বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মনে-মনে গোঁ চেপে গেল। একজন ভদ্রলোকের বাড়ি, তিনি সেটা বেচতে চান। দরও সস্তা। তবু কে এর পেছনে আছে, যার জন্যে লোকটা এত বাধা দিচ্ছে?

সেদিন খবরের কাগজে হঠাৎ একটা খবর পেয়ে চমকে উঠলাম। বেশ বড় বড় করে ছাপা হয়েছে সামনের পাতায়। খবরটা পড়ে পর্যন্ত আমার কেমন সন্দেহ হতে লাগলো।

খবরটা ছিল এই—একটা মাল বোঝাই লরী মীর্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। লরীটা পাশের ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। উল্টে যেতেই লরীর মালগুলো রাস্তায় পড়ে ছত্রাকার হয়ে যায়। ড্রাইভার আর কুলি-কাবারি যে ক'জন গাড়িতে ছিল তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে। তাদের কোনও পাত্তা নেই। পুলিশ এসে লরীর মাল আটক করে। লম্বা লম্বা কাঠের প্যাকিং-কেস। যে-প্যাকিং-কেসগুলো ভেঙে যায়, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কয়েকটা মানুষের মৃতদেহ। পুলিশ-[illegible]রা মৃতদেহগুলো তদারক করছে।

খবরটা পড়েই আমি মশাই সোজা বাসে চড়ে মীর্জাপুর স্ট্রীটে গিয়ে হাজির হলাম।

গিয়ে দেখি, সেখানে পুলিশ-পাহারাওলাতে জায়গাটা ভর্তি। মানুষের ভিড়ও হয়েছে যথেষ্ট। সবাই কৌতূহলী হয়ে একে-ওকে জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছে মশাই ? কী হয়েছে এখানে ?

কিন্তু কেউ বলতে পারছে না কোথা থেকে মালটা আসছিল, কিম্বা কোথায় যাচ্ছিল। একমাত্র ভরসা লরীটা।

শুনলাম, লরীর মালিকেরও নাকি পাত্তা নেই। যে-নম্বরে গাড়ি রেজিস্ট্রি করা আছে, সে-নম্বরটাই নাকি জাল। গাড়ির মালিকের যে নাম-ঠিকানা পুলিশের খাতায় লেখা আছে, সে নাম-ঠিকানারও নাকি কোনও হদিস নেই।

আমি আর কী করবো, সোজা আবার আমার অফিসে চলে এলাম।

কিন্তু অফিসে বসেও কিছু কাজ করতে পারলাম না। সন্ধেবেলা আমি সেই থানায় গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে একটু সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু গিয়ে দেখলাম থানার অফিসার-ইন-চার্জ অন্য লোক। আগেকার অফিসার বদলি হয়ে অন্য থানায় চলে গেছে।

আমি নিজের নাম-ধাম-পেশা-পরিচয় দিয়ে বললাম, দেখুন, আমার সন্দেহ হয়, ওই মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলীকে।

—কে মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলী ?

—ওই তিরিশের একের বি নম্বর বাড়িতে যিনি থাকেন।

—সে কী ? সেই মিস্টার গাঙ্গুলী তো আমার এখানে এসেছিলেন। তিনি তো বোন্ মার্চেন্ট ?

বললাম, হ্যাঁ, তিনিই। এই দেখুন—

বলে পকেট থেকে আমার কাগজপত্র সব বার করে দেখালাম। দেখালাম, আমি তাকে তিন টন হাড়ের অর্ডার দিয়েছি। তাঁর ট্যাংরায় হাড়ের গোডাউন আছে। আরো বললাম, আমি রামকান্ত বোস লেনের পঞ্চাশের বি নম্বরের বাড়িতে গিয়ে কী দেখেছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বললাম।

অফিসার-ইন-চার্জ সব দেখলেন সব শুনলেন ! তারপর দলবল সমেত জিপ নিয়ে চলে গেলেন রামকান্ত বোস লেনে মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলীর বাড়িতে।

ট্রেনটা আবার একটা স্টেশনে এসে থামল।

ভদ্রলোক গল্প থামিয়ে বললেন, আর এক কাপ চা হবে নাকি ?

বললাম, না থাক, তারপর কী হলো বলুন ?

পেছনের ভদ্রলোকও বললেন, ওঃ, আমি তো খুব বেঁচে গেছি মশাই—বারোশো টাকার ওপর দিয়ে কেটে গেছে। তারপর ? তারপর ?

ভদ্রলোক বললেন, তারপর আর কি, মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলী অ্যারেস্টেড হলো, হাতে হাত-কড়া পড়ল। কোর্টে কেস উঠল।

আমি মশাই রোজ কোর্টে যাই হিয়ারিং-এর সময়। কিন্তু মানুষটা অদ্ভুত ভয়-ডর কিছু নেই।

পাবলিক-প্রোসিকিউটর যত জিজ্ঞেস করে—আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু জানেন ততই গাঙ্গুলীবাবু বলে, না।

কিছুই জানে না মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলী। সে একেবারে ইনোসেণ্ট।

—আপনি হাড়ের ব্যবসা করেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনি হাড় কোথায় পান ?

—মফঃস্বল থেকে। আমার টাকা দাদন দেওয়া থাকে গ্রামের চামারদের কাছে।

যা হোক, এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপার আপনাদের শোনবার দরকার নেই। যেদিন রায় বেরোল, সেদিন আমিও বসে আছি কোর্টে।

ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিলেন।

বললেন, বেড়ে চা করেছে মশাই, এক কাপ খেলে পারতেন।

বললাম, না, থাক ; আপনি বলুন, তারপর কী হলো ? কী রায় বেরোল ?

ভদ্রলোক বললেন, জজসাহেব মশাই আসামীকে ছেড়ে দিলে।

—ছেড়ে দিলে, মানে ?

—ছেড়ে দিলে মানে, মুক্তি দিয়ে দিলে আসামীকে। একেবারে ইনোসেন্ট সিটিজেন মিস্টার জে. কে. গাঙ্গুলী। তাকে অন্যায়ভাবে নাকি আসামী করা হয়েছে এই মামলায়। সেই মন্তব্য করলেন জজসাহেব!

—সত্যিই ছেড়ে দিলে ?

পেছনের ভদ্রলোকও জিজ্ঞেস করলেন, ছেড়ে দিলে ? বলেন কী ?

পাশের ভদ্রলোকও বললেন, হ্যাঁ মশাই, ছেড়ে দিলে। কিন্তু ভগবান যাকে মারে, জজসাহেব তাকে কী করে ছাড়বে, বলুন ? কোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে একজন বৃদ্ধ লোক ছুরি মেরে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় সেই গাঙ্গুলীবাবুকে খুন করে ফেললে।

—সে কী?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ মশাই। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। আমরা তখন কোর্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। চারদিকে লোক গমগম করছে। সেই সময়ে সেই কাণ্ড। বুড়ো লোক, বয়েস প্রায় পঞ্চাশের ওপর।

শুনে আমি দৌড়ে গেলাম সেখানে। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য।

বুড়ো লোকটাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ যে সেই নিমতলা ঘাট রোডের বৃদ্ধ লোকটি! পঞ্চাশের বি নম্বরের বাড়িটা যার কাছে কিনতে গিয়েছিলাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে পেলাম না। ততক্ষণে পুলিশ-দারোগা সবাই এসে তাঁকে ধরে ফেলেছে। আর তিনিও পালাতে চেষ্টা করছেন না। বেশ হাসিমুখে তাদের হাতে ধরা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে থানার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

—তারপর?

—তারপর সংক্ষেপে বলি। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কেস উঠল কোর্টে। তাঁর বৃদ্ধ বয়েসের কথা ভেবে জজসাহেব তাকে বসতে বললেন।

জজ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিছু বলবার আছে?

বৃদ্ধ বললেন, বলবার আছে বলেই তো আমি ওকে খুন করেছি ধর্মাবতার। আমার নাম বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। জীবন আমার ছেলে। ওই সে, কে, গাঙ্গুলী। অত বড় শয়তান ছেলে পৃথিবীর আর কোনও বাপের যেন না হয় ধর্মাবতার। আজ তাকে নিঃশেষ করতে পেরে আমি শান্তি পেয়েছি। আমার ছেলেকে আমি ছোটবেলা থেকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। সে মাতাল, সে ঠগ, সে জোচ্চোর। আমার বংশের সে একমাত্র ছেলে হলেও আজ তাকে খুন করে আমি এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলছি না তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। কারণ সে আমার বংশের কলঙ্ক। সে হাড়ের ব্যবসা করতো। হাড়ের খুব চাহিদা আছে বিদেশে। তাই ওই ব্যবসা করবে বলে আমার কাছে টাকা চেয়েছিল, কিন্তু আমি দিই নি। যাহোক, আজ সে মারা গেছে এখন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি আছি।

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—আর সে শুধু একলা নয়, তার সঙ্গে আরো অনেকে আছে। তাদের নাম-ধাম বলতে পারলে আমি খুশি হতুম। কিন্তু তারা ভাগ্যবান বলেই আজ পার পেয়ে গেল। সে মানুষের হাড়

বেচতো। মেডিক্যাল কলেজের যত বেওয়ারিশ ডেড-বডি, সেইগুলো সে কিনতো কিনে আমার পঞ্চাশের বি নম্বরের বাড়িটার মাটির তলায় ঘর করে সেখানে ছাল-চামড়া-মাংস পুঁতে ফেলতো—আর হাড়গুলো ট্যাংরার গোডাউনে গিয়ে জমা করতো। আমি তার পৈশাচিক কাজ পছন্দ করতাম না বলে ওই বাড়িটা অনেকদিন ধরে বেচবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যতবার খদ্দের এসেছে, ততবার সে তাদের ভয় দেখিয়ে দালাল লাগিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। মাঝখান থেকে দালালরা টাকা খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওই জমি-বাড়ি আমি জলের দরে বেচে দিতে চেয়েছি—তবু সে তাতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই সেদিন লরীটা রাস্তায় ভেঙে পড়ে গিয়ে সব ফাঁস হয়ে গেল। আর জীবন ধরা পড়লো। তখন মনে ভারি আনন্দ হলো এই ভেবে যে, ভগবান যাকে শাস্তি দেন নি, মানুষের আদালতে হয়তো সে উচিত শাস্তি পাবে। কিন্তু দেখলাম, মানুষের আদালতে ধর্মের বিচার হয় না। আর হবেই বা কী করে? দেশের মানুষও তো আজ অমানুষ হয়ে গেছে। তাই সেদিন যখন ধর্মাবতারের রায় বেরোল, যখন সে হাসিমুখে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছিল, তখন আমি আর থাকতে পারলাম না ধর্মাবতার। কোর্টের উঠোনের ডাবওয়ালাটার কাছ থেকে কাটারিটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে খুন করলুম। ধর্মাবতারের চোখে হয়তো আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু আমি জানি মাথার ওপর আর একজন যে ধর্মাবতার আছেন, তাঁর দরবারে সব সময় ন্যায়বিচার হয়। আমি জানি আজ এই মানুষের আদালতে শাস্তি পেলেও সেই পরলোকের ধর্মাবতারের কাছে আমি মুক্তি পাবোই।

—তারপর?

ভদ্রলোক একটু দম নিলেন। তখন তাঁর নামবার সময় হয়ে এসেছে। মালপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন। ট্রেনটা থামলো।

বললেন, তাহলে আসি মশাই, নমস্কার।

—তারপর কী হলো বললেন না?

—তারপর আর কী হবে, বৃদ্ধের বয়েসের কথা ভেবে তার চোদ্দ বছরের জেল হয়ে গেল—লাইফ সেনটেনস্।

কুলিরা মালপত্র নামিয়ে নিয়েছে। ট্রেনটা ছেড়ে দেবে।

—নমস্কার।

বললাম, আচ্ছা, এ-ব্যাপারটা কি সত্যি? কলকাতা শহরে ভেতরে ভেতরে এই ব্যাপার ঘটে?

ট্রেনটা তখন নড়তে শুরু করেছে। বললেন, এর চেয়েও বীভৎস ব্যাপার ঘটছে মশাই এখন কলকাতাতে। আর মিথ্যে গল্প শুনিয়ে আপনাদের লাভ কি আমার? আর এ তো আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

—আপনার নামটা বলে গেলেন না?

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে আমিই সেই হতভাগা বাপ—আমারই নাম· বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, এই তো দু'বছর হলো আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি।

তিননম্বর সাক্ষী

তারপর আমার ডাক পড়লো। আমিই ছিলাম তিন নম্বর সাক্ষী।

জীবনে কখনও সাক্ষী হইনি আগে। কোর্টের আবহাওয়াও ঠিক আমার মানসিকতার অনুকূল নয়। আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে কোর্ট এ্যালার্জির ক্রিয়া করে।

কিন্তু এ-যুগে ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কাজ বাধ্য হয়েই করতে হয় আমাদের। হয়ত জীবনটাই এ-যুগে যন্ত্র হয়ে উঠেছে। পদে পদে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজারো বাধার সঙ্গে হোঁচট খেতে হয়। তখন হাঁপিয়ে উঠি, শিউরে উঠি, রেগে উঠি আর কখনও কখনও বা নিজেই নিজের শত্রু হয়ে উঠি।

ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে যে-প্রতিজ্ঞা যে-শপথ নিতে হয় তা নিলুম।

কিন্তু কী বলবো আমি? আমি যা দেখেছি তা যদি বলি তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? তা কি কেউ শুনবে? ভাববে আমি বোধহয় মিথ্যে কথা বলছি।

তখন আর ভাববার সময় ছিল না অত। চোখের সামনে তখন একজোড়া চোখ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। সমস্ত কোর্ট ভর্তি লোক আমাকে দেখছে। আমি তিন নম্বর সাক্ষী হলেও আমিই যে প্রধান সাক্ষী। আমিই যে সেই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী।

আমি ওপরের দিকে মুখ করে বলতে লাগলাম···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক্—

সেদিন কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমি যা বলিনি, এখন আজকে আপনাদের আমি সেই কথাই বলি।

ট্রেনটা যখন হাওড়া ষ্টেশন ছাড়লো তখন অতটা খেয়াল করিনি।

শুধু লক্ষ্য করেছিলাম চেহারাটা। এক সঙ্গে সারা রাত কাটাতে হবে যার সঙ্গে তার দিকে চেয়ে দেখাটা স্বাভাবিক। বেশ সুন্দর চেহারা ভদ্রলোকের।

অর্থাৎ পুরুষের যেমন চেহারা হলে সুন্দর দেখায় ঠিক তাই।

আমার কামরাতে মাত্র দুটো বার্থ। আমার ছিল ওপরের বার্থ, তাঁরটা নিচের। সকলেই নিচের বার্থ চায়। কিন্তু সব সময়ে চাইলেই তো সব জিনিস পাওয়া যায় না। সুতরাং বার্থ রিজার্ভেশন্ করবার সময়ে ওপরের বার্থ পেয়ে মনটা খুব খুশী হয়নি।

কিন্তু উপায়ও ছিল না আর তখন। শুধু রিজার্ভেশন্ স্লিপের ওপর নামটা দেখেছিলাম।

ভদ্রলোকের নাম কে-ভট্টাচার্য।

কোথাকার কে-ভট্টাচার্য, কী করেন তিনি, কিছুই জানার উপায় ছিল না। তাই আমি যখন ট্রেনে গিয়ে উঠলাম তখন আগ্রহ ছিল তাঁকে দেখবার।

এক সময়ে মিস্টার ভট্টাচার্য এলেন। কোথায় যাবেন তিনি তা তখন জানি না। সঙ্গে মাল-পত্র বিশেষ কিছু নেই।

একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বৈ কি! দূরের যাত্রী নিশ্চয়ই। তাহলে সঙ্গে বাক্স বা বিছানা নেই কেন?

তিনি গাড়িতে উঠলেন। উঠে আমার পাশে বসলেন। আমি আড়চোখে তাঁর দিকে দেখলাম। ধুতি পাঞ্জাবী পরা। খদ্দরের পোশাক। হয়তো স্বদেশী করেন মনে হলো। কিন্তু যদি স্বদেশীই করেন তো এম্-পি বা এম্-এল-এও হতে পারেন। কিংবা হয়ত স্কুলটীচার। টীচার হলে ফার্স্ট ক্লাসে কেন? তাহলে কি ব্যবসাদার? অনেক সময়ে ব্যবসাদাররাও আজকাল খদ্দর পরেন। তাতে গভর্নমেন্টের কাজ পেতে সুবিধে হয়।

ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না।

তিনি জানালার ধারে বসে ছিলেন বাইরের দিকে চেয়ে। গাড়ির মধ্যে আমি রয়েছি তাতে তার যেন কোনও ভাবান্তরও হচ্ছে না।

ট্রেন ছাড়তেই আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম—আপনি কতদূর যাবেন?

মিস্টার ভট্টাচার্য এতক্ষণে আমার দিকে চাইলেন। বেশ অন্যমনস্ক ভাব যেন। যেন আমি প্রশ্ন করে তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালাম।

বললেন—নাগপুর।

নাগপুর কথাটা বলেই তিনি আবার আগেকার মত চুপ করে গেলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

ট্রেনটা দুলছিল। আমিও চুপ করে বসে, তিনিও। বাইরে অন্ধকার, দেখবার কিছু নেই। রাত আটটা বেজে গেছে। আমি খাওয়া-দাওয়ার পাট বাড়ি থেকেই চুকিয়ে এসেছি। হয়ত তিনিও তাই।

আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আবার একটা প্রশ্ন করলাম।

বললাম—আপনার তো নিচের বার্থ, আপনি যখন শোবেন তখন বলবেন, আমি ওপরের বার্থে উঠে যাবো—

ভদ্রলোক বললেন—আমি ওপরেই শোব—

বললাম—আপনি কেন ওপরে কষ্ট করবেন—আমিই ওপরে শোবখন্—

ভদ্রলোক আমার কথায় কেমন যেন বিচলিত হলেন বলে মনে হলো। বললেন—আপনার মতো এমন কথা তো কাউকে আগে কখনও বলতে শুনিনি, আপনি আমাকে অবাক করলেন—

বললাম—তা নয়, আপনার নামে নিচের বার্থটা বুক করা আছে বলেই বলছি—

ভদ্রলোক বললেন—সে-কথা কি সবাই মানে ?

বললাম—যারা মানে না তাদের কথা ছেড়ে দিন, আমি তাদের দলে নই—

কথাটা শুনে ভদ্রলোক আমার দিকে সোজাসুজি এতক্ষণে এই-ই প্রথম আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন।

ভদ্রলোক বললেন—আপনি আমাকে আবার ভাবিয়ে তুললেন দেখছি—

বললাম—কেন, আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি ? পৃথিবীর সব লোক কি আর খারাপ হয়ে গেছে ?

ভদ্রলোক বললেন—সব লোক খারাপ হয়ে গেছে, সবাই। একটাও ভালো লোক নেই আর পৃথিবীতে। যারা ছিল সবাই চোর-ডাকাত-বদমাইশ হয়ে গেছে—

বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখদুটো যেন লাল হয়ে উঠলো।

আবার বলতে লাগলেন—আপনি হয়ত ভাগ্যবান তাই ভালো লোক কিছু কিছু দেখেছেন, কিন্তু আমি একজন হতভাগা, আমার কপালেই সব জোচ্চোর জুটেছে, সব বদমাইশ্ জুটেছে—

—তার মানে ?

আমি আরো স্পষ্ট উত্তর শোনবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম—তার মানে ?

মিস্টার ভট্টাচার্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—জানেন, আমি বাবার তিন লাখ টাকা খরচ করে একটা স্কুল করেছিলাম, ইচ্ছে ছিল দেশের ছেলেদের মানুষ করবো, সব টাকাটা আমার জলে চলে গেল ? একটা ছেলেও মানুষ হলো না ?

আমি ভদ্রলোকের রাগের কারণ বুঝতে পারলাম। বুঝলাম ভদ্রলোক আদর্শবাদী। তাঁর অনেক আশায় জলাঞ্জলি পড়েছে বলেই এমন হতাশ হয়ে গেছেন। এমন পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

বললাম—কোথায় করেছিলেন স্কুল ?

—রামনগরে।

—রামনগর কোথায় ?

ভদ্রলোক বললেন—আসানসোলের কাছে একটা গ্রামে। চল্লিশ বিঘে জমি নিয়ে বিরাট বিল্‌ডিং করেছিলাম। আশে-পাশের গ্রামের সমস্ত ছেলেদের এনে ভর্তি করিয়েছিলাম সেখানে। বোর্ডিং-স্কুল। আমি নিজে থাকতুম সেখানে। ছেলেরা যা খেত আমিও তাই খেতুম। ছেলেরা যেমন ভাবে থাকতো, আমিও ঠিক তেমনি ভাবেই থাকতুম। ছেলেরাই ছিল আমার সর্বস্ব—

বেশ গল্পের আমেজ পাচ্ছিলাম ভদ্রলোকের কথায়।

কথায় কথায় ভদ্রলোক সবই বলতে লাগলেন। কে-ভট্টাচার্য মানে করুণা ভট্টাচার্য। তাঁর বাবা ছিলেন সেকালে ভাইসরয়ের পার্সোন্যাল-সেক্রেটারির অফিসের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্। অনেক টাকা মাইনে পেতেন তিনি। সংযমী পুরুষ বলে বাজে খরচের বাহুল্য ছিল না। সেই যুগে করুণা ভট্টাচার্য ইংরেজী স্কুলে পড়ে ইংরেজি-নবীশ হয়েছিলেন। তারপর বাপের সুপারিশের সুবাদে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে যথারীতি আই-সি-এস পাশ করে চাকরি পেয়েছিলেন ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের এডুকেশন্‌-মিনিষ্ট্রিতে।

সে-সব ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের গৌরবময় যুগের কথা।

মিস্টার ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন—তখন দেখেছি মানুষ ব্রিটিশদের ঘেন্না করেছে, ব্রিটিশরাও ইণ্ডিয়ানদের জেলে পুরে রেখেছে, আমাদের অনেককে ফাঁসি দিয়েছে, কিন্তু তারা যেখানেই দেখেছে মনুষ্যত্ব সেখানে তাকে রেস্‌পেক্ট করেছে। কিন্তু এখন ?

বলতে বলতে মিস্টার ভট্টাচার্য যেন ভেঙে পড়লেন।

বললাম—আপনাকে দেখে বোঝা যায় না যে আপনি একদিন সিভিল-সার্ভিসে ছিলেন—

মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন—সিভিল সার্ভিস আমি করেছি বটে, কিন্তু তার জন্যে নিজের ওপর আমার ঘেন্নার শেষ ছিল না। তাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যাবার পরই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম—

বললাম—আপনি কি জানতে পেরেছিলেন যে দিশি গভর্নমেন্ট আপনাকে সম্মান করবে না? আপনাকে যথাযথ স্কোপ্ দেবে না?

—না, সে-জন্যে আমি চাকরি ছাড়ি নি।

—তবে?

—আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম এই ভেবে যে আমার তখন প্রচুর টাকা জমে গিয়েছিল হাতে। আমার আর টাকার দরকার ছিল না।

ভদ্রলোক প্রথম যখন গাড়িতে উঠেছিলেন তখন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর সে-ভাব কেটে গিয়েছে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা চেহারাটা নিয়ে এতক্ষণে পেছনের গদীতে হেলান দিয়ে বসেছেন। তিনিই একতরফা কথা বলে যেতে লাগলেন, আমি বলতে গেলে শুধু শ্রোতা।

টাকা তাঁর হাতে তখন প্রচুর জমে গেছে। শুধু নিজের মাইনের টাকা নয়, পৈত্রিক টাকাও ব্যাঙ্কে মজুত ছিল অনেক। আর ঠিক সেই সময়েই আমার স্ত্রীও মারা গেলেন। একটা ছেলে নেই, একটা সংসার নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কার জন্যে চাকরি করবো? কার জন্যে সংসার করবো? তাই ভাবলুম ছোট সংসারের চেয়ে একটা বড় সংসারের ভার নিলে কেমন হয়! বরাবর দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে লজ্জা পেয়েছি, লেখা পড়ার অভাব দেখে ভয় পেয়েছি। ভাবলুম তাদের নিয়েই সংসার করবো এবার।

তারপর রামনগরের ওই জমিটা সস্তায় পেয়ে কিনে ফেললুম। আর তারপর সেখানে একটা ছোট বাড়ি করে নিজে থাকতে লাগলাম।

মিস্টার ভট্টাচার্য গল্প বলে চলেছেন, আর আমি একমনে শুনে চলেছি।

অনেক অভিজ্ঞতা মিস্টার ভট্টাচার্যের, অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক লেখা-পড়া শিখেছেন। অনেক শাস্তিও পেয়েছেন, অনেক দুর্ভোগও সহ্য করেছেন জীবনে।

বললাম—আপনি বলুন, আমার শুনতে খুব ভাল লাগছে—

মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন—আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, আপনি বরং এবারে শুয়ে পড়ুন, আমি ওপরে যাচ্ছি—

বললাম—না না, আপনি বলুন, আপনার যদি বলতে কষ্ট না হয় তো বলুন। এখন তো রাত বেশী হয়নি, মাত্র ন'টা বেজেছে, এখনও অনেক সময় আছে—

—তাহলে শুনুন।

বলে মিস্টার ভট্টাচার্য আরম্ভ করলেন—আমি একদিন এই ইণ্ডিয়াতেই আই-সি-এসএর চাকরি করেছি, আবার এখনও সেই ইণ্ডিয়াকেই দেখছি। কিন্তু যারা বলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভালো ছিল, আমি তাদের দলে নই। আমি জানি যে নিজের দেশের স্বদেশী গভর্নমেণ্ট যত খারাপই হোক তা বিদেশী গভর্নমেণ্টের চেয়ে ভালো। বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল এইটেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আজকে আমার সেই বিশ্বাসের ভিতের ওপরেই চিড় ধরেছে—

—কী ভাবে?

মিস্টার ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন—আজকে আপনি আমাকে দেখছেন আমি খালি হাতে ট্রেনে এসে উঠেছি। আমার কাছে আজ কয়েকটা মাত্র টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার সেই তিন লাখ টাকা, সেই স্কুল, সেই জমি কিছুই আমার নেই, সব চলে গেল!

—কী করে গেল? কেন গেল?

মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন—আমাদের এই গভর্নমেণ্টের জন্যে। আর গভর্নমেণ্ট মানেই তো আমরা। আমাদের নিজেদের দোষেই সব গেল। তার জন্যে আমি আমাদের নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই দোষ দিই না···

বললাম—আপনি সবটা স্পষ্ট করে খুলে বলুন—

—স্পষ্ট করে আর কী বলবো? আমার অনেক স্বপ্ন ছিল যে বিদেশে ইংলণ্ডে আমেরিকায় যেমন দেখে এসেছি, আমাদের দেশেও আমি তেমনি একটি ইন্‌স্টিটিউশন গড়বো। সেখানে সবাই সৎ হবে, সবাই পরিশ্রমী হবে, সবাই নিজের নিজের সাধ্য আর সাধ অনুযায়ী লেখা-পড়া করবে। কিন্তু তা হলো না! কেন হলো না সে-কথা বলতে সমস্ত রাত কেটে যাবে—

—তবু অল্প কথায় বলুন।

মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন—লাষ্ট উনিশ বছরের লম্বা ইতিহাস কি এক-কথায় এক ঘণ্টার মধ্যে বলা যায়? এক একটা চিঠি লিখেছি গভর্নমেণ্টের কাছে তার উত্তর আসতে ছ'মাস লেগেছে। আবার কখনও বা কোনও উত্তর আসেনি। তার জন্যে আবার চিঠি লিখতে হয়েছে। শেষকালে সামান্য একটা কাজের জন্যে আমাকে টাকা-সময় সব কিছু নষ্ট করে দিল্লী যেতে হয়েছে, নয় তো কলকাতা কিংবা পাটনা

যেতে হয়েছে। এককালে আমি নিজেই তো সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেছি, সেদিন চিঠির উত্তর না-দেওয়াটাকে ক্রাইম্ মনে করেছি। যে কাজে গাফিলতি করেছে তাকে পানিশমেণ্ট দিয়েছি। কিন্তু আজ সেক্রেটারিয়েটে কাজ না করলেই লোকের প্রমোশন হয়। মিনিষ্টারের রিলেটিভ্ হলে তার কাজ না-করলেও চলে। আজ কাজটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো কে কার আত্মীয়—

—তারপর ?

মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন—তবু তো স্বীকার করেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। স্কুলের বাড়ি তৈরি হলো, ছাত্র ভর্তি হলো, ছেলেদের থাকবার বন্দোবস্ত হলো। আমি দিনরাত পরিশ্রম করে তাদের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেলাম। কিন্তু তাতেও বাধা আসতে লাগলো ওপর থেকে। চিঠি আসতে লাগলো চল্লিশ টন সিমেণ্ট কোথা থেকে কিনলে তার হিসেব দাও। রেশনের জন্যে এ্যাপ্লাই করে দিয়েছিলাম, পাটনা সেক্রেটারিয়েট থেকে চিঠি এল ফর্ম ফিল-আপ না করলে রেশন-কার্ড দেওয়া হবে না। এক-একটা জিনিসের ফয়শলা হতে একবছর দু'বছর কেটে গেল—

মিস্টার ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন—তাতেও আমি দমিনি, তাতেও আমি আমার কাজ পুরোদমে চালিয়ে গিয়েছি—। কিন্তু তখনও জানি না যে শুধু সদিচ্ছে থাকলেই আজকের পৃথিবীতে চলে না, সেই সদিচ্ছেকে নষ্ট করবার জন্যে হাজার হাজার মানুষ আড়ালে বসে ষড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত। তারা চায়না কোথাও কারো ভালো হোক, কোথাও কেউ কারো ভালো করুক। আমি যে রামনগরের স্কুল নিয়ে ছেলেদের মানুষ করবার জন্যে আমার সব কিছু ত্যাগ করেছি, এ বোধহয় কারো সহ্য হলো না।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন, সহ্য হলো না ? আপনার সঙ্গে কি তাদের কিছু শত্রুতা ছিল ?

মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন—আমি তাদের কাউকে চিনিই না, তা শত্রুতা থাকবে কী করে ? কিন্তু গভর্নমেণ্টের কাছে তো আমাকে নানা কাজে চিঠি লিখতে হতো। আজকাল বোধহয় হিমালয়ে গিয়ে সাধনা করতে গেলেও গভর্নমেণ্টের পারমিশন্ নিতে হয়, এমনি দিনকাল পড়েছে—।

শেষকালে আমি চিঠি লিখলাম দিল্লি সেক্রেটারিয়েটে এই বলে যে গভর্মেণ্ট যেন আমার কাজে বাধা না দেয়, তাহলেই আমি ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু তাতে ইণ্ডিয়া-গভর্নমেণ্টের বোধহয় অপমান-বোধ হলো। কয়েক

কি, আমার কাছে একদিন একজন পুলিশ অফিসার পাঠিয়ে দিলে প্লেন ড্রেসে। তিনি এন্‌কোয়ারি করতে এলেন আমি স্কুল করে কী মতলব হাঁসিল করছি।

—সে কী?

—হ্যাঁ, তিনি কী রিপোর্ট দিলেন জানি না। তারপর থেকেই শুরু হলো প্রচণ্ড বাধা। তখন লোক এল ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিস থেকে, লোক এল ষ্টেট্‌ সেক্রেটারিয়েট থেকে। তাঁরা কেউই বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে আমি নিঃস্বার্থভাবে ছেলে মানুষ করতে চাইছি। আমার স্ত্রী মারা গেছে, ছেলে মারা গেছে, আমি এক্স-আই-সি-এস, আমি যে সব কিছু ছেড়ে গ্রামের মধ্যে বসে বসে স্কুল করে দেশ-সেবা করবো এটা তাঁদের মনঃপূত হলো না, তাঁরা কথায় কথায় আমার কৈফিয়ৎ চাইতে লাগলেন—

ভদ্রলোক এক নাগাড়ে গল্প বলে যাচ্ছিলেন। এবার থামলেন।

তারপর বললেন—জানেন, আমি এককালে সাহেব ছিলাম, এখন হয়েছি পাকা স্বদেশী। কেউ সন্দেহ করলেন আমি আমেরিকার স্পাই, কেউ বা ভাবলেন আমি রাশিয়ার স্পাই। তারপর থেকেই আমার স্কুলের ওপর নজর রাখা শুরু হলো। একজন টীচারকে একদিন অ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেল পুলিশ। অপরাধ কী? না, সে একজন কমিউনিষ্ট—ছেলেদের ষ্ট্রাইক করার মতলব দিচ্ছিল—

এমনি করেই চলছিল। কিন্তু আর বেশিদিন চললো না। যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি জমি কিনেছিলাম তাঁর ভাই একদিন কোর্টে মামলা ঠুকে দিলে। তার বক্তব্য যে আমি বে-আইনী করে জমিটা কিনেছি। কারণ সেও জমির একজন শরিক।

বললাম—তারপর?

—সেই মামলা চললো পাঁচ বছর ধরে। একদিকে মামলা, আর একদিকে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে নন্‌-কোঅপারেশন, সমস্ত মিলে আমাকে একেবারে পাগল করে তুললো। তখন ভাবলাম কেন আমি স্কুল করতে গেলাম। কেন আমি সমস্ত টাকাটা নিয়ে স্বইজারল্যাণ্ড চলে গেলাম না। সারা জীবনটা তাহলে আমি সেখানে মদ খেয়ে জুয়া খেলে কাটিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু তখন আর তার উপায় নেই। আমার স্কুলে তখন ভাঙন ধরেছে। একদিন কংগ্রেস দলের সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলের মারামারি হয়ে গেল। আমি জানতাম না যে আমার টীচারদের মধ্যেও দু'টো দল আছে।

ভদ্রলোক আবার থামলেন। একটু যেন দম নিলেন মনে হলো।

তারপর বলতে লাগলেন—তখন ঠিক করলাম স্কুল তুলে দেব। কিন্তু তাতেও বাধা এল টীচার আর স্টুডেন্টদের কাছ থেকে। তারা বললে স্কুল তাদের। একটা কমিটি ছিল স্কুলের। তারা মিটিং করলে। মিটিং করে রেজলিউশন্ পাশ করলে যে স্কুল তুলে দেওয়া বে-আইনী। তারা খবর পাঠালে স্টেট-এডুকেশন মিনিস্টারের কাছে। সেখান থেকে তারা একজন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাঠিয়ে দিলে। সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেটরই হলো সর্বময় কর্তা। তিনি আমার এতদিনকার সমস্ত স্বপ্ন, পরিশ্রম, সমস্ত কল্পনা, শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু নষ্ট করে দিয়ে নিজের রাজত্ব চালাতে লাগলেন। স্কুলের ছেলেদের খাওয়া খারাপ হয়ে গেল, পচা টিফিন দেওয়া হতে লাগলো। এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কথার ওপর কথা বলবার অধিকার কারো রইল না। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিজের লেখা টেকস্‌ট-বুক চালাতে লাগলো স্কুলে। তার ফ্যামিলি এসে উঠলো স্কুল বাড়ীতে। স্কুলের ডেভেলপ্‌মেন্ট্ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে তার তিনতলা বাড়ি হলো পাটনাতে। সামনে বাগান হলো, তাতে সুইমিং-পুল হলো। কারো কিছু বলবার রইল না আর।

—আর আপনি কিছুই বললেন না?

—আমি আর বলবো কী? আমার তো তখন কিছুই ক্ষমতা নেই। আজও যদি যান্, গিয়ে দেখবেন রামনগরের সেই 'মডার্ণ মাল্‌টিপারপাস্ বয়েজ স্কুল' এখনও আছে। সেখানে এখন আর পড়ানো হয় না। শুধু হয় হরতাল, শুধু হয় পলিটিক্স। ক্রিকেট খেলার সময় সেখানে ক্লাসের ভেতরে ট্রানজিস্টার সেট নিয়ে খেলার রীলে শোনায় টীচাররা—

—তারপর?

ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তিন নম্বর সাক্ষী। আমার আগে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। স্কুলের হেডমাষ্টার সাক্ষ্য দিয়ে গেছে।

তারা দুজনেই প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে মিস্টার ভট্টাচার্যের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল। তাঁর স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পর থেকেই তিনি নাকি অস্থির-চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্কুল নিয়ে আর বেশি মনোযোগ দিতে পারতেন না। তাতে শিক্ষার অবনতি হতে আরম্ভ করেছিল। তখনই গভর্নমেন্ট থেকে স্কুলটার ভার দিয়েছিল একজন অভিজ্ঞ সৎ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রাবের ওপর।

আমি অন্য রকম সাক্ষ্য দেওয়াতে কোর্টে একটু চাঞ্চল্য শুরু হলো।

—আপনি কি মনে করেন যে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্যেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন?

বললাম—না।

—তাহলে কীসে বুঝলেন যে তিনি স্বাভাবিক সুস্থ চিত্তের মানুষ ছিলেন?

বললাম—আমি ট্রেনে যতক্ষণ কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে ততক্ষণ আমার মনে হয়েছে একজন উচ্চ-শিক্ষিত সুস্থ দায়িত্ব-সম্পন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলছি।

—কখন তিনি শুতে গেলেন?

—আন্দাজ রাত একটার পর। আমি নিচের বার্থে শুলাম, আর তিনি ওপরের বার্থে। ভোর বেলা রায়গড় স্টেশনে যখন ট্রেনটা এল তখন আমার ঘুম ভাঙলো। তখন দেখলাম, তিনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু যখন বিলাসপুর এল তখনও যখন তিনি উঠলেন না তখন আমার কেমন সন্দেহ হলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়েছে। বুঝলাম তিনি কোনও ঘুমের পিল্ বেশি মাত্রায় খেয়ে সুইসাইড্ করেছেন।

—কিন্তু কেন তিনি সুইসাইড্ করলেন এ-সম্বন্ধে আপনার কোনও কৌতূহল জেগেছে?

বললাম—হ্যাঁ—

—তাহলে বলুন, সুইসাইড্ করবার তাঁর কারণ কী হতে পারে?

বললাম—তিনি শুতে যাবার আগে আমাকে একটা কথা বলেছিলেন।

—কী কথা?

—বলেছিলেন—প্রেজেণ্ট ইণ্ডিয়াতে কোনও ভালো লোকের স্থান নেই। ভালো লোকদের পক্ষে ইণ্ডিয়াতে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা।

আমার কথা শুনে সমস্ত কোর্ট অবশ্য নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর আমিও অব্যাহতি পেয়েছিলাম সাক্ষ্য দেওয়ার বিড়ম্বনা থেকে।

আমি কাঠগড়া থেকে নেমে আসতেই চার নম্বর সাক্ষীর ডাক পড়লো।

কিন্তু যেদিন এই মামলার নিষ্পত্তি হলো সেদিন এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়েছিল যে, ভট্টাচার্যের মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্যই তিনি আত্মহননের পন্থা নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর জন্যে কেউই দায়ী নয়।

ভদ্রলোক

আর একবার ট্রেণে আসছিলাম দিল্লী থেকে। এক সঙ্গে এক-কামরায় অনেকক্ষণ কাটাবার ফলে যা হয় মিস্টার রামলিঙ্গমের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিল। এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা হয় নি। মিস্টার রামলিঙ্গম শিক্ষিত মানুষ। শুধু শিক্ষিত বললে কম বলা হবে। ভারতবর্ষে যাঁদের পণ্ডিত বলে গণ্য করা হয় তিনি তাঁদের দলে।

কথায় কথায় জানতে পারলাম তিনি অক্সফোর্ডের পি-এইচ্-ডি। এখন দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে আছেন। আগে পনেরো বছর ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে, নানা বিষয়ের বই পড়ে, নানা অভিজ্ঞতার অভিসম্পাত কুড়িয়ে এখন জ্ঞান-বৃদ্ধ হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটা জ্ঞান সেটা কেতাবী। তাতে চাকরি পাওয়া, হয়ত সুবিধে হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা কতটুকু হয় সন্দেহ! অথচ সংসারে তকমারও একটা দাম আছে বৈ কি!

মিস্টার রামলিঙ্গম বললেন—জানেন, তকমার হয়ত কিছু দাম নেই। অন্ততঃ মাঝে-মাঝে আমার তাই-ই মনে হয়—

বললাম—সে কী? কেন?

জিনিসটা বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম?

—জানেন, একজন এই আমাকেই একদিন চড় মেরেছিল?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললাম—সে কী? কেন?

মিস্টার রামলিঙ্গম বললেন—আমি কিছুই করিনি বলতে গেলে—

—যে চড় মেরেছিল সে কে?

মিঃ রামলিঙ্গম বললেন—যাদের আমরা ছোটলোক বলি তাদেরই একজন!

একটু থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন—আমি পনেরো বছর কলকাতায় কাটিয়ে গিয়েছি। কলকাতার সম্বন্ধে কিংবা বাঙালীদের সম্বন্ধে অ-বাঙালীরা কী বলে তা আমি জানি। কলকাতাকে তো নেহরুজী বলেছিলেন 'এ সিটি অব্ দি ডেড্'। প্যাটেলজী বাঙালীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে বাঙালীরা নাকি ফোঁশ্ ফোঁশ্ করে কাঁদতে পারে। বাঙালীদের নিন্দে আমি অনেক শুনেছি। বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগও আমি অনেক শুনেছি। তবু কলকাতাকে আমি রেসপেক্ট্ করি।

কলকাতাই ইণ্ডিয়ার মধ্যে একমাত্র সিটি যেখানে এই যুগেও প্রাণ আছে, যা বোম্বাইতে নেই, মাদ্রাজে নেই, দিল্লীতে তো নেইই। আমি অকারণে আপনাকে তোষামোদ করছি না। আমি এমন অনেক বাঙালীকে জানি যারা অর্থ স্বার্থ সব কিছুর ক্ষতি স্বীকার করেও সারা রাত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে। এ জিনিষ কি আপনি বোম্বাইতে পাবেন, না দিল্লীতে পাবেন? পাবেন না। বাঙালীর কাছে টাকার চেয়ে আনন্দটা বড়, তাই তারা বড়বাজারে মারোয়াড়িদের বসিয়ে নিজেরা কেরানী-পাড়ায়, উকীল-ব্যারিস্টার পাড়ায় সরে এসেছে। এসে নিশ্চিন্ত হয়ে রসের কারবার করেছে। রসের কারবারে তাই বাঙালীই রাজা। অথচ এই তেল-নুন-মশ্‌লার সংসারে রসের দাম কি কিছু সস্তা?

মিস্টার রামলিঙ্গম বেশ ভালো গল্প বলতে পারেন। একটা প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে আরো অন্য অনেক প্রসঙ্গ জড়িয়ে ফেলেন।

বললাম—সেই ঘটনার কথাটা তো বললেন না, সেই চড় মারার কাহিনী—

মিস্টার রামলিঙ্গম বললেন—আপনার কাছে হয়ত সে-ঘটনার কোনও গুরুত্ব নেই, কিন্তু আমার জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

—কী রকম?

—সেই কাহিনী বলবার জন্যেই প্রসঙ্গটা ওঠালাম। এই দেখুন না, আমি চাকরি করি দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে। ছুটি পেলে আমার নিজের দেশ কোচিন যেতে পারি। তা না গিয়ে আমি যাই বেঙ্গলে। সেখানে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের সঙ্গেই ছুটি কাটিয়ে আনন্দ উপভোগ করি—। আপনি খিদিরপুর দিয়ে আলিপুরের ট্রামে চড়ে কখনও স্টার্ণডেল্ রোডের মোড়ে নেমে ন্যাশান্যাল লাইব্রেরীর দিকে গেছেন?

বললাম—গিয়েছি—

—তাহলে তো আপনি দেখেছেনই। ঠিক সেই মোড়ের মাথায় একটা খাবারের দোকান আছে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন ওই একটা দোকানই ছিল ওখানে। একজন বাঙালীর দোকান। ওই মোড় ছাড়িয়ে পূব দিকে গেলে আর এক মাইলের মধ্যে কোনও খাবারের দোকান পড়বে না। আমি সাধারণতঃ লাইব্রেরীতে যেতাম বিকেল বেলা। এবং থাকতাম প্রায় রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। তখন আবার লাইব্রেরীর ভেতরে কোনও ক্যান্টীন্‌ও ছিল না। আমি সেই আদি যুগের কথা বলছি।

মিস্টার রামলিঙ্গম একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—দোকানের নাম লেখা ছিল মাথায়। কী একটা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। কিন্তু ভেতরে চা-ও বিক্রি হতো। আমি

তখন মিল্‌টন সম্বন্ধে রিসার্চ করছি। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যেতাম ওখানে। গিয়ে ওইখানে এক কাপ চা আর সিঙ্গাড়া খেয়েই লাইব্রেরীতে চলে যেতাম। দোকানের মালিক খালি গায়ে সামনে একটা কাঠের ক্যাশ-বাক্স নিয়ে বসে থাকতো আর তার স্টাফ চা বিক্রি করতো।

আসলে লোকটা ছিল পয়সা-পিশাচ। দাম নিত বেশি আর মাল দিত খারাপ। প্রতিবাদ করলে কানে তুলতো না।

বলতো—আপনার ইচ্ছে হবে খাবেন আর না ইচ্ছে হবে খাবেন না—

আমার খুবই খারাপ লাগতো তার কথা শুনে। ব্যবসাদার হলেই যে অভদ্র ব্যবহার করতে হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু লোকটার এই অভদ্র ব্যবহারের একটা মানে আমি খুঁজে বার করেছিলাম। সে জানতো যে তার আশে পাশে এক মাইল রেডিয়াসের মধ্যে আর কোনও খাবারের দোকান নেই, তাই সে যেমন জিনিস দেবে খদ্দেরকে তা কিনতেই হবে।

কিন্তু তখন কি জানি একদিন সেই অশিক্ষিত অভদ্র দোকানদারের হাতেই আমাকে অমন করে চড় খেতে হবে ?

সত্যিই লোকটা পিশাচ !

একদিন ভাঙা কাপটা দেখিয়ে রেগে গিয়ে বলেছিলাম—তোমরা এই ভাঙা কাপ বদলাতে পারো না ?

দোকানদার বলেছিল—আপনার না পোষায় আপনি চা খাবেন না, আমাদের অত ভালো কাপ কেনবার সামর্থ্য নেই—

এ-কথার আমি কী জবাব দেব বলুন তো ? ওই দোকান ছাড়া আমারও কোন গত্যন্তর ছিল না। আমাকে ওখানে খেতে হবেই !

একে তো লোকটার খালি গা, ময়লা কাপড়। যাদের আমরা অশিক্ষিত ছোটলোক বলি লোকটা ঠিক তাই। টাকা-পয়সা-আনি-দুয়ানি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যখনই যেতাম দেখতাম মন দিয়ে টাকা-পয়সা হিসেব করছে। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে কে কী খাচ্ছে, কে কী পয়সা দিচ্ছে। তাকে দেখে মনে হতো পয়সা ছাড়া সে পৃথিবীতে অন্য কিছু জানে না। বাইরের পৃথিবীতে মানুষের কত সমস্যা, কত স্বপ্ন, কত আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে, সে দিকে চোখ মেলে দেখবার সময় ছিল না তার। কিন্তু তাহলে আর ওদের ছোটলোক বলি কেন ? ছোটলোক মানে তো গরীব লোক নয়। ছোটলোক তারাই যাদের দৃষ্টি নিচের দিকে, যাদের নজর সংসারের তুচ্ছ প্রয়োজনের ওপরে উঠতে পারে না।

তা যাহোক, পৃথিবীতে যে শুধু একরকম লোকই থাকবে তার কোনও মানে নেই। সব রকমের মানুষ আছে বলেই তো এখানে এত বৈচিত্র্য!

একদিন এক কাণ্ড হলো।

তখন শীতকাল। সেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোতেও দেরি হয়ে গেছে। বিকেল পাঁচটার পর থেকেই অন্ধকার হয়ে যায় চারদিক। আমি যথারীতি ধর্মতলাতে ট্রাম বদলে আলিপুরের ট্রামে চড়ে স্টার্ণডেল্ রোডের মোড়ে এসে নেমেছি। হঠাৎ মনে হলো প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। লাইব্রেরীতে পড়া-শোনা করতে করতে যদি আরো ক্ষিধে পেয়ে যায় তো মুশ্‌কিলে পড়বো। তখন হয়ত পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারবো না পড়ার মধ্যে। তার চেয়ে কিছু ক্ষুন্নিবৃত্তি করে নেওয়া ভালো, এই ভেবে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গিয়ে ঢুকলুম।

আমি দোকানে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানদার বিরক্ত হয়ে উঠলো—আর চা হবে না, সময় উৎরে গেছে—

খদ্দের লক্ষ্মী, এ-কথা প্রত্যেক দোকানদারই স্বীকার করে। কিন্তু ও যেন খদ্দের দেখে বিরক্ত হলো।

বললাম—চা না হোক, অন্য কিছু?

দোকানদারের যেন তবু গা নেই। তাচ্ছিল্যভরে বললে—রসগোল্লা, পান্তুয়া, রাজভোগ দরবেশ মিহিদানা আছে—

আমার সত্যিই তখন খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। তবু শীতকালে ঠাণ্ডার মধ্যে ওই সব কন্‌কনে ঠাণ্ডা জিনিস খেতে রুচি হচ্ছিল না।

জিজ্ঞেস করলাম—গরম নোন্‌তা কিছু?

একজন কর্মচারী বললে—না—

দেখুন, আমরা হলাম সাউথ-ইণ্ডিয়ান। বাঙালীদের মত আমরা অত মিষ্টি-খাবারের ভক্ত নই। নোন্‌তা কিছু পেলেই আমরা খুশী হই বেশী।

কী করবো বুঝতে না পেরে অনেকক্ষণ সেই ভাবেই সেই দোকানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম তাহলে কি অগত্যা মিষ্টি খেয়েই পেট ভরিয়ে নেব? অথচ তা ছাড়া তো আর অন্য কোনও গতিও নেই। আশেপাশে আর কোনও মিষ্টির দোকানও নেই!

হঠাৎ দোকানদারটা জিজ্ঞেস করলে—আপনি রুটি খাবেন?

বললাম—রুটি?

—হ্যাঁ গরম-গরম রুটি আছে আর কপির ডাল্‌না—

আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম আমি।

ধমকের সুরে বললাম—তা এতক্ষণ বলনি কেন দাও, দুটো রুটি আর কপির ডাল্না দাও—

বলে ভেতরে ঢুকে একটা টেবিলে বসে বললাম—এক গ্লাস জল—

দোকানদার চিৎকার করে বললে—এই, বাবুকে গরম-গরম দু'খানা রুটি সেঁকে ঘি মাখিয়ে দাও। আর এক বাটি কপির তরকারি—

যেমন হুকুম হলো তেমনি এল। পরিষ্কার প্লেট, পরিষ্কার গরম-গরম রুটি, খাঁটি ঘি আর এক বাটি কপির তরকারি।

আরো দু'খানা রুটি নিয়ে একজন আমার সামনে এল।

—আর নেবেন ?

বললাম—দাও—

এমনি করে ছ'খানা রুটি খেতেই পেটটা ভরে গেল। আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বার করলাম।

দোকানদারটা তখন একমনে টাকা-পয়সা-আনি-দুয়ানি হিসেব করছে!

আমি একটা দু'টাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—দাও, চেঞ্জ—

দোকানদার আমার দিকে মুখ তুলে চাইল। জিজ্ঞেস করলে—কীসের চেঞ্জ ?

বললাম—ছ'খানা রুটি আর কপির তরকারির দাম কেটে নিয়ে বাকি চেঞ্জ দাও—

দোকানদার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে—ওর দাম নেব না।

—দাম নেবে না মানে ?

দোকানদার আবার বললে—আমাদের নিজেদের খাবার হচ্ছিল, দেখলুম আপনার খুব খিদে পেয়েছে, তাই দিলুম। এ দোকানে রুটি বিক্রি হয় না—

বলে আবার সে নিজের ক্যাশ-বাক্সের টাকা-পয়সা-আনি-দুয়ানি গুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমার দিকে আর ফিরে চাইবার ফুরসৎ হলো না তার।

আমার মনে হলো লোকটা যেন আমার গালে কষে এক চড় মারলে। আমি অক্সফোর্ডের পি-এইচ্.-ডি, মিলটন্ নিয়ে রিসার্চ করছি। একটা অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকের কাছে আমি যেন হঠাৎ খুব ছোট হয়ে গেলাম।

মিস্টার রামলিঙ্গম বললেন—বিশ্বাস করুন, আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না তার সামনে। মনে হলো এর চেয়ে যদি সে সত্যি-সত্যিই আমাকে চড় মারতো তাহলেই যেন ভালো হতো। আমার উপযুক্ত শাস্তি হতো।

আলোচনা দাসী

হাসির গল্প লেখা বড় শক্ত। কান্নার গল্প লেখাও যেমন শক্ত, হাসির গল্প লেখাও তেমনি। আসলে গল্প লেখাই আমার কাছে শক্ত। গল্প-লেখক হিসেবে যখন একবার খ্যাতি হয়ে যায় তখন গল্প লেখা আরো শক্ত হয়ে যায়! দশজনে এসে তাগাদা করে। ভাববার সময় দেয় না। লেখবারও সময় দেয় না।

শেষ পর্যন্ত আমার গল্প-সাপ্লায়ার হরিপদকে ডাকতে হলো।

হরিপদ এল। আমার ফরমাশ শুনে খানিকক্ষণ ভাবলে। বরাবর বিপদের দিনে আমাকে হরিপদই উদ্ধার করেছে। হরিপদই বলতে গেলে আমার ভাগ্য-নিয়ন্তা। তার কাছে ফরমাশ দিলেই রেডি-মেড গল্প পেয়েছি। কিন্তু হাসির গল্পের কথা শুনে কেমন যেন ভাবনায় পড়লো হরিপদ। এর আগে হরিপদকে গল্প নিয়ে কখনও এমন ভাবনায় পড়তে দেখিনি।

হরিপদ বললে—আপনি বড় ভাবনায় ফেললেন মশাই—

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে—আচ্ছা দাঁড়ান মশাই, আমাকে একটা রাত টাইম দিন, আমার, বউ-এর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি, তারপর কাল আপনাকে বলে যাবো—

তারপর চলে যাবার সময় ফিরে দাঁড়াল। বললে—তা হাসির গল্পের জন্যেও পাঁচ টাকা? তা হয় না—

বললাম—না হয় না হবে, ওর বেশি আমি দিতে পারবো না—

হরিপদ বললে—এ আপনার বড় অন্যায় জুলুম মশাই, হাসি-কান্নার এক দর? আমার মগজে হাসি নেই, আমি কোত্থেকে হাসির গল্প সাপ্লাই করবো আপনাকে? হাসি কোথায় আছে বলুন সংসারে? হাসি তো আর কান্নার মত পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে না। আপনি যে সেই মুড়ি-মিছরির এক দর করে ফেললেন মশাই—

বললাম—তা তোমার পাঁচ টাকায় না পোষায় তো দরকার নেই, আজকাল অনেক গল্প-সাপ্লায়ার আসছে, তারা তিন টাকায় এখখুনি গল্প-সাপ্লাই করতে রাজী। বাড়ীতে এসে দু'বেলা খোশামোদ করে যাচ্ছে—

হরিপদ ক্ষুণ্ণ হলো। বললে—এই তো আপনাদের দোষ। এখন আপনার নাম হয়েছে কিনা, এখন তো বলবেনই। অথচ এই হরিপদ ছিল বলে তবু নাম-ধাম করেছেন। নইলে সে-সব দিনের কথা ভাবুন তো একবার, যখন এক-টাকায় এই

শর্মা আপনাকে গল্প সাপ্লাই করেছে, আর আপনি পত্রিকার অফিসে-অফিসে ধর্ণা দিয়ে বেড়িয়েছেন আর জুতোর সুখতলা ক্ষইয়ে ফেলেছেন। এরই নাম দুনিয়া মশাই, আমার দুনিয়া চেনা হয়ে গেছে—

হরিপদর এ-সব কথা নতুন নয়। এ-ধরনের কথা প্রত্যেকবার বলবে, রেট বাড়াবার জন্যে দর-কষাকষি করবে, আর শেষ পর্যন্ত গল্প ঠিকই সাপ্লাই করবে। এ হরিপদর পুরোন কায়দা। আমি ওতে বিচলিত হই না।

হরিপদ তখনও যায়নি। বললে—তা হলে কী করবো? যাবো, না···

বললাম—সে যা তোমার মর্জি—

হরিপদ আবার ফিরে এল। বললে—আপনিও যে সেই হরিবিলাসবাবুর মতন করলেন দেখছি!

বললাম—হরিবিলাসবাবুর কথা ছেড়ে দাও, আমি তো আর হরিবিলাসবাবু নই···

—একদিন তো হরিবিলাসবাবুর মত হবেন, তখন আপনারও বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, টেলিফোন হবে, সব কিছু হবে। তখন আপনিও হরিবিলাসবাবুর মত আমাকে আর চিনতেই পারবেন না। অথচ এই হরিবিলাসবাবুকে কে চিনতো শুনি? এই শর্মা না-থাকলে ওই সব মোটা-মোটা কেতাব ভেবে লেখবার সময় ছিল ও'র? না, বিদ্যে ছিল?

বললাম—অন্য লেখক সম্বন্ধে আমার ঘরে বসে আলোচনা করতে হবে না, আমি ওসব পছন্দ করি না, তুমি যাও—

হরিপদর আরো হয়তো কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার দিক থেকে কিছু গরজের প্রমাণ না-পাওয়ায় রেগে-মেগে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, পর দিন ভোর বেলাই হরিপদ এসে হাজির। অন্য রকম চেহারা। হাসি-হাসি মুখ।

হরিপদ চেয়ারে বসে বললে—পেয়ে গেছি মশাই—

বললাম—কিন্তু পাঁচ টাকার বেশি দেব না, তা বলে রাখছি—

—তা আর কী করবো। পাঁচ টাকা পাঁচ টাকাই সই। ক'দিন র‍্যাশন আনা হচ্ছে না টাকার অভাবে। এই টাকাটা পেলে সোজা র‍্যাশনের দোকানে গিয়ে আগে চালটা নিয়ে আসবো, বউকে বলে এসেছি—

বললাম—বলো তাহলে, আমি শুনছি—। কোথায় পেলে গল্পটা?

—আজ্ঞে, আমার নিজের জীবনের গল্পটাই আপনাকে দিয়ে দিলুম—

—তার মানে ? তোমার জীবনে হাসির গল্প আছে নাকি ?

হরিপদ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার একেবারে মনে ছিল না। বউকে গিয়ে কাল রাত্তিরেই বললুম। বললুম যে, একটা হাসির গল্প চাই, বড় ভাবনায় পড়েছি। বউ বললে—কেন, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা বলে দাও না, ওটাও তো হাসির। তা, আমিও ভেবে দেখলুম। সত্যিই তো, সেটাও তো এক হাসির ব্যাপার, শুনলে হাসতে হাসতে পেট একেবারে ফেটে যাবে।

আমিও একটু অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সেকি ! তোমার জীবনে যে আবার এত হাসি আছে তা তো জানতাম না, তুমি তো চিরকাল কাঁসি বাজাও আর ভ্যারেণ্ডা ভেজে বেড়াও বলেই জানতুম—

হরিপদ হাসতে লাগলো।

—না স্যার, মানুষকে বাইরে থেকে যা দ্যাখেন তা সে নয়, আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও আবার আর একটা মানুষ লুকিয়ে থাকে।

ও বাবা, হরিপদ যে আবার দার্শনিকের মত কথা বলে।

বললাম—ও কথা থাক, এখন তোমার গল্পটা বলো—

হরিপদ বললে—ঠিক আছে, তাহলে আপনার একটা ওই সিগ্রেট দিন—

দিলাম সিগারেট। হরিপদ নিজের পকেট থেকে দেশলাই বার করলে। ধরালে সিগারেটটা। তারপর ধোঁয়া ছাড়লো। আর তারপর মুখ উঁচু করে ভাবতে লাগলো।

বললাম—তুমি গল্প বানাচ্ছো নাকি ? আমাকে ঠকাচ্ছো ?

হরিপদ বললে—না স্যার, আপনি বলছেন কি, আপনাকে আমি ঠকাবো ? আমার ধম্ম বলে একটা কিছু নেই ? আমি নেমকহারাম বলতে চান ? কী যে বলেন আপনি। আমাকে আপনি কি সেই রকম পেয়েছেন নাকি ? আমি পাঁচটা টাকার জন্যে আপনার কাছে ধম্ম বক্সি দেব ?

সে এক এলাহি কাণ্ড করে বসলো হরিপদ। যেন মিথ্যে বানানো গল্প বললে হরিপদ পরকালে নরক-বাস করবে, এই রকম ভাব করতে লাগলো।

বললাম—যা হোক, এবার বলো তোমার গল্প—

—তবে শুনুন—

বলে হরিপদ নাক 'চোখ-মুখ কুঁচকে আরম্ভ করলে—তবে শুনুন, আমি স্যার চিরকালের বাউণ্ডুলে মানুষ। আপনি হয়তো ভাবছেন এখনই আমার এই দুর্দশা, আসলে তা নয়। চিরটা কাল আমার দুর্দশায় কেটেছে, আমি জন্ম-হাবাতে।

মানে, কোনও কালেই আমার রোজগার ছিল না। সেই ছোটবেলাতেও যেমন, এখনও তেমনি। খাই-দাই-কাঁসি-বাজাই গোছের। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই স্যার। অথচ দেখুন, আমিই আবার অন্য রকম হয়ে যেতে পারতুম। আমি আপনার চেয়েও বড়লোক হয়ে যেতে পারতুম। মানে, ভাগ্য অন্যরকম হলে আজকে আমিই আপনাকে এইখানে বসে দশ হাজার টাকার চেক লিখে দিতে পারতুম। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি। কিন্তু আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আমিই আজকে দশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে বসতে পারতুম।

আমি হরিপদর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—দশ লক্ষ টাকা! বলছো কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দশ লক্ষ টাকায় এক-এর পর ক'টা শূন্য দিতে হয় তা আমি জানি না বটে, কিন্তু সেই দশ লক্ষ টাকারই মালিক হয়ে গিয়েছিলুম আমি একদিন—

—কী রকম? সে-টাকাটা সব খুইয়েছ?

—আজ্ঞে, সেই গল্পটাই তো বলছি। দশ লক্ষ টাকা কি চালাকি কথা, বলুন? দশ লক্ষ টাকা ক'টা লোকের আছে বলুন তো? আমার বাবারও ছিল না, আমার ঠাকুর্দারও ছিল না, আমার ঠাকুর্দার বাবারও ছিল না। আমার চোদ্দ-পুরুষেও কারো দশ লক্ষ টাকা ছিল না। দশ লক্ষ টাকা দূরের কথা মশাই, এক লক্ষ টাকাও দূরের কথা, এক হাজার টাকাই ছিল না কারো। আমরা মশাই বনেদী গরীব লোক। আমরা মশাই জীবনে কখনও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাইনি। খেতে পাইনি বটে, কিন্তু তার জন্যে কখনও মানুষ খুন করিনি, ডাকাতি করিনি, চুরি-চামারি করিনি! আমরা তাই কপালের মার হজম করে দু'বেলা আয়েস করে তাস পিটেছি, বিড়ি টেনেছি আর পেট ভরে আড্ডা দিয়েছি। ভেবেছি পয়সা যখন আমাদের কপালে নেই, তখন এ নিয়ে ভেবে ভেবে আর ব্লাড প্রেশার করি কেন? তার চেয়ে টাকার কথা না-ভাবাই ভাল। সেই ভেবে সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরোতুম আর বেলা তিনটের সময় একবার বাড়ি ফিরে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে আবার বেরোতাম আড্ডা দিতে। সারা দিন কেমন করে কাটতো সে আর বুঝতে পারতুম না। গ্রামের মানুষ আমরা। আমাদের ভৈরবগঞ্জ অজ পাড়াগাঁ হলে কী হবে, একটা সিনেমা-হাউস ছিল। সেই সিনেমা-হাউসের সামনে গিয়ে লাইন দিতুম। ব্যাপারীরা যারা গঞ্জে আসতো কেনা-বেচা-সওদা করতে, তারা দেখতো সেই ছবি। আমরা আগে থেকে লাইন দিয়ে সেই সব টিকিট কিনে রাখতুম, তারা এসে দেখতো

হাউস-ফুল্‌। তখন আমাদের কাছে বেশি পয়সা দিয়ে টিকিট কিনতো। আমরা চার আনার টিকিট ছ' আনায় বেচতুম। ছ' আনার টিকিট ন' আনায় বেচতুম। সেই বাড়তি পয়সা দিয়ে আমরা চা-সিগারেট-বিড়ি খেতুম, ফুর্তি করতুম। ভৈরবগঞ্জে একটা হোটেল ছিল। তার নাম 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হিন্দু হোটেল'। সেই হোটেলের সামনে ছিল হোটেলের চায়ের দোকান। মানে, খুচরো খদ্দেররা সেইখানে বসে বিশ্রাম করতো, চা খেতো, বিড়ি খেতো। আর যারা একদিন-দুদিনের জন্যে ভৈরবগঞ্জে কারবার করতে আসতো, তাদের জন্যে ভেতরে থাকবার বন্দোবস্ত ছিল। কুয়ো ছিল, পায়খানা ছিল, নাইবার জন্যে ঘেরা ঘর ছিল। মোট কথা, পাড়াগাঁয়ে যা কিছু আরাম পাওয়া সম্ভব সবই ছিল 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হিন্দু হোটেলে'। রেট কিন্তু বেশি নয়। দিনে মাথা পিছু পাঁচ সিকে দিলেই থাকা-খাওয়া···

আমি বাধা দিলাম। বললাম—হোটেলের খবর শুনে আমার কী লাভ হরিপদ? সেই দশ লাখ টাকার কী হলো, বলো?

হরিপদ বললে—এই-ই তো আপনাদের দোষ স্যার, আপনি নিজে স্টোরি-রাইটার হয়ে এত অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, তাহলে আপনার পাঠকদের কী হবে বলুন তো—

—তুমি একটু ছোট করে,বলো না, আমি ঠিক গুছিয়ে লিখে দেব'খন—

—তাই কখনও হয় স্যার? আপনার সঙ্গে আমার তফাৎটা কোথায় বলুন তো? আপনিও গল্প লেখেন, আমিও গল্প লিখি, আপনি লেখেন কাগজে-কলমে আর আমি লিখি মনে মনে মুখে-মুখে। মাঝখান থেকে ক্ষীরটা আপনারাই মারেন, আর আমরা উপোস করে মরি—

বললাম—বাজে কথা রাখো তোমার, গল্পটা বলো—

—তাহলে শুনুন, একদিন ভৈরবগঞ্জে শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে একলা বসে আছি। তখন টা-টা করছে রোদ্দুর। তারই মধ্যে দু'কাপ চা খেয়ে ফেলেছি। আর ট্যাঁকে পয়সা নেই যে খাবো। বসে বসে ভাবছিলুম কোথায় যাই এই রোদ্দুরের মধ্যে। অথচ বাড়ি যেতেও ইচ্ছে করছে না। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। থাকবে কেন? কেউ তো আমার মত বাউণ্ডুলে নয়। সকলের বউ আছে, সংসার আছে। সবাই যে-যার বাড়িতে আরাম করে ঘুমোচ্ছে। আমার বাড়িও নেই, ঘরও নেই, সংসারও নেই, বউ-ছেলে-মেয়ে কিছুই নেই। থাকবার মধ্যে আছে কেবল আমার এক বিধবা বুড়ি মা।

তা, সেই দিন সেই দুপুর বেলা সেই শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলেই কাণ্ডটা ঘটলো।

—কী কাণ্ড?

—সেই দশ লক্ষ টাকার কাণ্ড।

—তার মানে, তুমি দশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে পেলে নাকি?

হরিপদ বললে—না স্যার, কুড়িয়ে পেলাম না। তা, কুড়িয়ে পেলামও বলতে পারেন বৈ কি!

—তা, দশ লক্ষ টাকা পেয়েও তুমি উড়িয়ে দিলে?

হরিপদ হো-হো করে হাসতে লাগলো।

বললে—না স্যার, দশ লক্ষ টাকা পেয়ে পাগলও হয়ে যাই নি, উড়িয়েও দিই নি। সে এক মজার ব্যাপার হলো, সেইটেই তো বলছি আপনাকে—

হরিপদর গল্প বলা এই রকমই। হরিপদ আমাকে অনেক গল্প দিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে ঘষে মেজে দাঁড় করাতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়। অনেক ফালতু কথা বলে, অনেক ঘোরায়, অনেক ডাল-পালা জুড়ে দেয়, যা গল্পের পক্ষে অনাবশ্যক। গল্পের একটা নিজস্ব গতি আছে, একটা নিজস্ব পরিণতিও আছে। একটু এদিক-ওদিক হলে আঘাটায় গল্পের ভরা-ডুবি হয়। সেই জন্যেই সব লেখকের সব গল্প শেষ পর্যন্ত পড়া যায় না। পড়তে ভাল লাগে না। তার কারণও এই। যে-গল্পের শেষ নেই, সে-গল্প গল্পই নয়। আর সেই অবধারিত শেষের দিকে যে গল্প একাগ্র হয়ে এগোয় না, সে-গল্প পাঠকেরও মন জয় করতে পারে না। তাই গল্প পড়তে পড়তে পাঠক ঘুমিয়ে পড়ে, পাঠক হাই তোলে, পাঠক বই বন্ধ করে রেখে গল্প করতে শুরু করে। তা, হরিপদকে আমার জানা ছিল বলেই আমি মাঝে-মাঝে বাধা দিয়ে তাকে আসল গল্পের বাঁধা পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু হরিপদকে যদি আমি সায়েস্তাই করতে পারবো তো আমি না হয়ে হরিপদই সাহিত্যিক হয়ে যেত, আর আমি তাকে গল্প সরবরাহ করতাম!

হরিপদ ততক্ষণে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলেছে। লম্বা টান দিয়ে হরিপদ বললে—তাহলে এবার ব্যাপারটা কী হলো বলি—

বললাম—বেশি ডালপালা দিও না, আসল গল্পটা বলো! ডালপালা যদি লাগাতে হয় তো আমিই জুড়ে দেব, তোমায় সে-সব ভাবতে হবে না—

হরিপদ বললে—আমাকে আর আপনাকে গল্প-লেখা শেখাতে হবে না স্যার, নেহাৎ বানান ঠিক হয় না তাই নিজে লিখি না, নইলে কি আর স্যার আপনাদের কাছে এসে ধর্ণা দিই? ভাবছেন আপনারা গল্প লিখে কত টাকা পান আমি জানি না? আজকাল এক-একজন লেখক বাড়ি-গাড়ি সব করছেন, আমি কিছু দেখছি

না মনে করেছেন? আমাকে আপনি তো দেবেন মাত্তোর পাঁচটা টাকা, অথচ চালের মণ আশী টাকা হয়ে গেছে, সে-খবর রাখেন?

তারপর একটু থেমে বললে—সেবার যে-গল্পটা আপনার সিনেমায় হলো, ওটা কার বলুন? বুকে হাত দিয়ে বলুন, কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন গল্পটা? আপনি তো হাজার দশেক টাকা মেরে দিয়ে বেশ কাশ্মীর ঘুরে এলেন, আর আমি বউকে একটা নতুন শাড়ি পর্যন্ত কিনে দিতে পারিনি, তা জানেন?

এবার আমাকে শক্ত হতে হলো। বললাম—দরকার নেই তোমার গল্প বলে, আমি অন্য লোক দেখবো, এমন অনেক লোক আছে যারা বিনা পয়সায় আমাকে গল্প বলে যাবে, তা জানো? আমার কাছে অনেক লোক আসে তাদের জীবনী নিয়ে উপন্যাস লেখাবার জন্যে, এবার থেকে তাদের কাছ থেকেই গল্প নেব, আমারও পাঁচটা করে টাকা বেঁচে যাবে—

হরিপদ এই কথায় জব্দ হলো। বললে—আমি কি তাই বলিছি নাকি স্যার? আমি কি বলিছি আপনাকে গল্প দেব না? আমি আপনাকে কত গল্প দিয়েছি বলুন তো? সব আপনি ভুলে গেলেন? আজকে চালের দাম আশী টাকা হয়েছে বলেই তো একটু মাথাটা গরম হয়ে গেছে। নইলে আমার মত মাথা-ঠাণ্ডা লোক আপনি দেখেছেন?

বললাম—তাহলে বলো তোমার গল্পটা—

হরিপদ বললে—আপনি যে বড় বাধা দেন স্যার, গল্প বলতে বলতে বাধা দিলে রস কেটে যায় না?

বললাম—ঠিক আছে, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেই ভৈরবগঞ্জের 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হিন্দু হোটেলে'র মধ্যে দুপুরবেলা দশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে পেয়ে গেলে—

—না স্যার, কুড়িয়ে পেলুম বল্লে ভুল হয়। আমি আপনাকে খুলেই বলছি সবটা—

হরিপদর ভয় হয়েছিল হয়তো টাকাটা পাবে না আর। সত্যিই বড় অভাবগ্রস্ত লোক হরিপদ। কখনও ফরসা জামা-কাপড় পরতে দেখিনি হরিপদকে। বেশ পেট ভরে বিড়ি খেতেও পারেনি কখনও। ভাত তো দূরের কথা। নিজের অভাব-অভিযোগ নিয়েই বরাবর তাকে বিব্রত থাকতে দেখেছি। পাঁচটা করে টাকা তো মাত্র পায় আমার কাছ থেকে, কিন্তু সেই পাঁচটা টাকাই যখন হাত পেতে নেয়, তখন

সে এক দেখবার মত চেহারা হয় তার। চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে যায়, ঠোঁট-দুটো ফাঁক হয়ে আসে। যেন লাখ টাকা তার হাতে এসে গেছে—এমনি ভাবখানা।

আজ সেই হরিপদর মুখে তার দশ লাখ টাকা পাওয়ার ঘটনা শুনে সত্যি-সত্যিই হতবাক হয়ে গেলাম।

হরিপদ বলতে লাগলো—যাক গে, আসল গল্পটা এবার শুনুন—সেই ভৈরবগঞ্জের শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে একদিন এক ভদ্রলোক এসে উঠলেন। কোনও ভদ্রলোককে এমনিতে কালীমাতা হোটেলে কখনও দেখিনি। যারা ধান-চালের ব্যাপারী তারাই মাথা গোঁজবার জন্যে ওই হোটেলে দু'চার দিনের মেয়াদে আসে। তারপর কাজ ফুরোলে আবার সওদা নিয়ে চলে যায়।

আমি একটু তেরছা চোখে ভদ্রলোককে দেখলাম। অচেনা মুখ। হাতে একটা ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে কাগজ-পত্র কী সব রয়েছে। একমনে তাই পড়ছিলেন।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক মুখ তুললেন। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন।

আমি ডাকা-বুকো মানুষ। আমার অত ভয়-ভীত্ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—কোত্থেকে আসা হচ্ছে আপনার?

ভদ্রলোক বললেন—আমি আসছি কলকাতা থেকে—

—তা, এখানে কোথায় এসেছেন?

ভদ্রলোক বললেন—এই ভৈরবগঞ্জে এসেছি—

বললাম—ভৈরবগঞ্জে, তা তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাজটা কী?

ভদ্রলোক যেন একটু দ্বিধা করতে লাগলেন। বললে—আপনি কি এই ভৈরবগঞ্জে থাকেন?

বললাম—আমার জন্ম মশাই এই ভৈরবগঞ্জে—জন্ম কর্ম সবই এই ভৈরবগঞ্জে। আপনি ভৈরবগঞ্জ সম্বন্ধে কী জানতে চান, বলুন না! আমি সব বলে দেব—

ভদ্রলোক বললেন—আমি একজন লোককে খুঁজতে এসেছি,—

—কোন লোক বলুন? আমি খুঁজে বার করে দেব—

ভদ্রলোক বললেন—সে এখানে থাকে না, থাকে পাত্সরে—

—পাত্সর? পাত্সরও চিনি। পাত্সরে আমার মামার বাড়ি।

ভদ্রলোক যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন—পাত্সরে আপনার মামার বাড়ি? আপনি পাত্সরে গেছেন?

—বলেন কি মশাই, মামার বাড়ি যাবো না? ভাগ্নে হয়ে জন্মেছি আর মামার আদর পাবো না, এ কি হতে পারে? আপনি বলছেন কী?

আসলে মশাই, আমার মামারা এখন সবাই মারা গেছে। মামার বাড়ি বলতে এখন আর আমার কিছুই নেই সেখানে। মামারা মারা গেছে, মামীরাও মারা গেছে। মামাতো ভাইরা আছে বটে, কিন্তু আমাকে এখন আর তারা মানুষ বলেই ভাবে না। আর, আমার টাকা-কড়ি কিছু নেই, রোজকারপাতি করি না, কেন দেখবে বলুন? আপন বাপ-মাই আজকাল টাকা না দিতে পারলে হতচ্ছেদ্দা করে তো মামাতো ভাই!

তা, আমি সে-কথা ভাঙলুম না মশাই। ভাবলাম, দেখি না ভদ্রলোকের কী মতলোব!

ভদ্রলোক বললেন—আমি পাতসরে গিয়েছিলুম—কিন্তু সেখানে থাকতে পারলুম না, আমার কোনও কাজ হলো না—এত মশা, এত নোংরা—একটা হোটেল নেই যে থাকি—

পাতসর নোংরা জায়গাই বটে। এককালে গঞ্জ ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া মহামারী হয়ে দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। যাদের একটু টাকা-কড়ি ছিল তারা সব পাতসর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। বলবার মত লোক আর কেউ নেই সেখানে।

বললাম—আপনি কি আর সে-রকম জায়গায় থাকতে পারবেন মশাই, আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, আমরাই বলে সেখানে গিয়ে পালাই-পালাই করি—কেন মিছিমিছি সেখানে যেতে গেলেন?

—আমি কি সাধ করে গিয়েছি, চাকরির দায়ে যেতে হয়েছে—

জিজ্ঞেস করলাম—কী কাজ আপনার?

ভদ্রলোক বললেন—আমি অ্যাটর্নী-অফিসে কাজ করি, অ্যাটর্নী-অফিসের বাবু। আমাদের ফার্মের নাম হলো 'গাঙ্গুলী মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি'। অফিস থেকে এত চিঠি লেখা হচ্ছে তবু একটা উত্তর নেই, শেষকালে আসতে হলো আমাকেই—। এসব দেশে আগে কখনও আসিনি আমি, একটা ভালো হোটেলও নেই যে থাকি, এই 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে' এসে এখন উঠেছি, এখান থেকেই যদি মহিলাটির ঠিকানা পাই, সেই চেষ্টা করছি—

—মহিলাটির নাম কী বলুন?

ভদ্রলোক বললেন—আলোচনা দাসী—

—আলোচনা দাসী!

অদ্ভুত নাম। পাতসর অবশ্য ছোট গ্রাম। বড় জোর তিনশো ঘর বামুন-

কায়েত। আর সব চাষা, কামার-কুমার। তারা কেউ চাষ করে, কেউ বা মাছ ধরে।

কেউ বা যজমানি বৃত্তি করে।

পাত্‌সের গিয়ে যে কেউ বাইরের লোক থাকতে পারে এমন কল্পনা করা অসম্ভব। আমি নিজেই কোনওদিন সেখানে গিয়ে রাত কাটাতে পারিনি।

ভদ্রলোক বললেন—সেখানকার কাদা আর মশা দেখে আমি মশাই বাপ্‌-বাপ্‌ বলে পালিয়ে এসেছি—

আমি বললাম—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি গিয়ে তাকে আপনার কাছে এনে হাজির করবো।

—আপনি চিনতে পারবেন?

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—চিনতে পারবো না বলছেন কেন? আমি তো তাদের চিনিই—

ভদ্রলোক যেন নিশ্চিন্ত হলেন আমার কথা শুনে। বললেন—তাহলে তো ভালোই হলো, আমাকে আর কষ্ট করে সেখানে যেতে হবে না—এখানে এনে তার হাতেই চিঠিটা দিয়ে দেব, আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে—

ভদ্রলোককে কথা দিয়ে আমি তো পাত্‌সরে ছুটলাম তখনি। আসলে আমি পাত্‌সরের কাউকেই চিনতাম না। আমার মামারা ছিল, তারা সবাই মারা গেছে তখন। মামাতো ভাই-বোনেরাও আর কেউ নেই তখন। ছোটবেলায় পাত্‌সরে গিয়েছিলাম। তারপর পেটের ধান্দায় আর কখনও যাওয়া হয়নি ওদিকে। কিন্তু দশ লাখ টাকার ব্যাপার, এমন সুসংবাদটা গিয়ে দেব, আমার ভাগ্যেও তো ছিটে-ফোঁটা কিছু মিলতে পারে!

দুর্গা বলে তো গেলাম পাত্‌সরে।

প্রথমে গিয়ে কাউকেই কিছু ভাঙলুম না। মামাদের বাড়িটা ভেঙে পড়ে আছে। ভেতরে কিছুই নেই। একটা কাঁঠাল কাঠের বিরাট সিন্দুক খালি পড়ে আছে আর গোটা কতক কুলো-ডালা। বিদেশে যে-যার চাকরি করছে। এ বাড়ির মায়াও কারো নেই। কেউ ভাগ চাইতেও আসবে না কোনও দিন।

পাড়ার দু-একজন বৃদ্ধ মানুষ এল দেখা করতে। দু-একটা উপদেশ-টুপদেশ দিলে। কিছুটা খোঁজখবরও নিলে। দিদিমা কেমন আছে? অমুকের বিয়ে হয়েছিল কোন্নগরে, তারা কী করছে? ছেলে-মেয়ে ক'টা? ইত্যাদি ইত্যাদি

অনেক খবর। আমি কিন্তু সে-সব খবরের জন্যে তখন বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার মাথায় তখন কেবল আলোচনা দাসী ঘুরছে।

নিজের হাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়ে দুটো খেয়ে নিয়ে সারা দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আর সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে নিজের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

এমনি করেই দু'টো দিন কেটে গেল। কোনও কিনারা পেলাম না। গাঁয়ের মানুষ দেখলেই আলাপ জুড়ে দিই। জিজ্ঞেস করি, কার কোথায় দেশ। কার কোথায় আত্মীয়-স্বজন থাকে। যেমন লোকে জিজ্ঞেস করে পরস্পরকে। কারো ঢাকায় আদি বাড়ি। কারো রাজসাহীতে। তখন মশাই পাকিস্তান হয়নি। তখন দেশেও অকাল পড়েনি। তখনও মানুষ এখনকার মত হা-টাকা যো-টাকা করতো না। তখন তবু লোকে আত্মীয়-স্বজনের খবরাখবর নিত। হরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন—এবার একটা বিয়ে-থা করে ফেল বাবা—

বললাম—বিয়ের কথা-বার্তা তো চলছে, আর বিয়ে না করলে চলছেও না—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই, কতদিন আর হাত পুড়িয়ে খাবে—

হাত পুড়িয়ে খাওয়ার কথাটা আমিই পাত্‌সরে গিয়ে তুলে দিয়েছিলাম। তা ছাড়া, ভাল মাইনে পাই মাসে মাসে তাও সবাই জেনে গিয়েছিল পাত্‌সরে।

দুর্গাপদবাবু বললেন—কত পাও? তিনশো টাকা?

—তিনশো টাকা তো শুধু মাইনে, উপরিতেও শ'তিনেক পাই—

—ছ'শো টাকা পাও, অথচ এখনও বিয়ে করোনি? তুমি তো মানুষ খুন করবে হে!

সত্যিই সে এক অদ্ভুত দেশ পাত্‌সর। সমস্ত গ্রামটা যেন আমার মাইনের খবর শুনে বেসামাল হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতির করতে লোকের ভিড় জমে গেল বাড়িতে।

হরেনবাবু বললেন—তুমি বাবা ওই ভাঙা বাড়িতে থেকো না, আমার বাড়িতে চলে এসো—

দুর্গাপদবাবু বললেন—তুমি বাবা তার চেয়ে আমার বাড়িতে এসো না, আমি থাকতে তুমি নিজের হাতে রান্না করে খাবে এটা তো ভালো দেখায় না—

রাতারাতি আমি একেবারে সকলের পরম আত্মীয় হয়ে গেলাম মশাই। সকলেই আমার কাকা, জ্যাঠা, মাসিমা, পিসীমা হয়ে গেল। কার কোথায় দেশ, আত্মীয়-স্বজন কার কোথায় থাকে, তাও জেনে নিলাম।

শুধু হরেনবাবু, রমেশবাবু, পরেশবাবুই নয়, কত যে মাসীমা, কাকীমা দিদিমা পাতিয়ে ফেললুম দুদিনের মধ্যেই, তার ঠিক নেই।

ন'মাসীমা বললে—তুমি বাছা আইবুড়ো হয়ে আর ক'দিন থাকবে?

—একটা ভাল দেখে পাত্রী দেখে দিন্ না আপনারা, আমি বিয়ে করছি—

—তা, পাত্রীর কি অভাব বাবা এখানে! আমার বড় জা'-এর মেজ মেয়েই তো রয়েছে, তাকে বিয়ে করো না তুমি!

এমন মুশকিলেই পড়লুম মশাই তখন যে কী বলবো? আমি তো আমার আসল উদ্দেশ্য খুলে বলতে পারি নে সকলকে। আমি ভৈরবগঞ্জে ভদ্রলোককে বলে এসেছি দু-একদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। কিন্তু আমার যদি দেরি হয় ফিরতে, ভদ্রলোক কি আর আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন?

আমি সেই দিনই একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিলুম ভৈরবগঞ্জের ঠিকানায়। লিখে দিলুম আমার অসুখের জন্যে আমি পাত্‌সরে আট্‌কে পড়েছি। আমি না-ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

এদিকে তখন গাদা-গাদা মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি। পাত্‌সরে মেয়েরও গাদা মশাই। এত আইবুড়ো মেয়ে যে আছে পাত্‌সরে, তা জানতুম না। সকালে মেয়ে দেখি, দুপুরে মেয়ে দেখি, বিকেলে মেয়ে দেখি, আবার রাত্তিরেও মেয়ে দেখি। সব ডাগর-ডাগর মেয়ে। সকলকেই নাম জিজ্ঞেস করি। আমি পাত্র হিসেবে ভাল। তিনশো টাকা মাইনে পাই। কে আর না আমাকে মেয়ে দেখাবে?

কেউ নাম বলে—কমলা—

কেউ বলে—লক্ষ্মী—

সবই বাহারে নাম। ডাগর-ডাগর মেয়ে। মা কি মাসীমার বেনারসী শাড়ি পরে ভারি-ভারি সোনার গয়না গায়ে দিয়ে সেজে-গুজে সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি নাম জিজ্ঞেস করি, লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করি। দেখতেও কেউ কেউ রূপসী। আসলে টাকার জন্যেই কারো বিয়ে হচ্ছে না। আমি তো টাকা নেব না। তাই মেয়েদের বাপ-মায়ের বড় আগ্রহ আমার সঙ্গে যার যার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে।

কাউকেই আর পছন্দ হয় না।

হবে কী করে? কারো নাম তো আলোচনা দাসী নয়। আমি তো সুন্দরী খুঁজছি না। আলোচনা দাসী নাম হলেই আমার পছন্দ হয়ে যায়। আমি আর কিছু চাই না।

শেষকালে মশাই একজন পাত্রী নাম জিজ্ঞেস করতেই বললে—তার নাম আলোলতা দাসী!

চমকে উঠলুম মশাই। আলোলতা আর আলোচনা কি এক?

বুড়ো বাবা সামনে ছিল। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম—আলোলতা কী রকম নাম? একে বুড়ো মানুষ, তায় চোখে দেখতে পায় না বুড়ো।

বললে—বাবাজী, আমরা তো ঠাকুর-দেবতার নামই দিয়ে থাকি ছেলে-মেয়েদের, কিন্তু ও যখন জন্মালো তখন ওর মামা শহরে থাকে কি-না, সে-ই ও-নাম দিয়েছিল—

—সে মামা এখন কোথায়?

—সে বাবাজী বিয়ে-থা কিছু করে-টরেনি। আলোকে আমার বড় ভালবাসতো সে। পূজোর সময় আমার মেয়েকে শাড়ি কিনে দিত, গয়না দিত—তারপর চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে যে কোথায় চলে গেল, আর কোনও খোঁজ-খবর নেই, শুনেছিলাম ব্যবসা করছে, অনেক খোঁজ করেছি, কিছু খবর পাইনি। কেউ বলে মারা গেছে, কেউ বলে, কোটিপতি হয়ে বিলেতে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করেছে, কেউ বলে বর্মা মুলুকে…

—বর্মা?

আমি কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠেছি। বর্মা! আমার তখন মাথায় বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে। বর্মা! বর্মায় চলে গিয়েছে মামা!

আমি জিজ্ঞেস করলাম—বর্মায় গেছে জানলেন কী করে?

—আমরা আর কী করে জানবো। লোক-মুখে শুনেছি।

—কোন্ লোক? কারা?

—সে কি মনে আছে বাবাজী? বহুকাল আগে কে কার কাছে শুনেছে, তারপর আমাদের কাছে বলে গেছে। সে আর আমাদের বিশ্বাসই হয় না। এতদিন যখন খোঁজ-খবর নেই, তখন আর কি সে বেঁচে আছে?

তা, এ-সব কথা আমার আর শোনবার দরকার ছিল না তখন। মামাই হোক আর দাদামশাই-ই হোক, তা নিয়ে ভাবনার কারণ নেই। আমি মশাই তখন ছট্‌ফট্ করছি। ওদিকে ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে এসেছি ভৈরবগঞ্জে। আর কতদিন আটকে রাখা যায় তাকে।

—আমি তাহলে এখানেই বিয়ে করবো। আপনারা ব্যবস্থা করুন—

মেয়ের বাবা বললে—তাহলে বাবা দেনা-পাওনার কী হবে?

বললাম—আমি একটা পয়সা নেব না—

—সে কি বাবা? আমার কি অত সৌভাগ্য হবে?

বুড়ো ভদ্রলোক যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখ দুটো তাঁর ছল্-ছল্ করে উঠলো। হরেনবাবু, রমেশবাবু পাত্‌সরের যারাই কথাটা শুনলে তারাই অবাক হয়ে গেল। এত ভাল পাত্র আর একটা পয়সাও নেবে না!

—অবাক কাণ্ড!

—তাহলে কবে বিয়েটা হবে?

—আজই করুন, আজই ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমার তো আবার অফিসের ছুটি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

—তা বলে আজ কী করে হয়? আমার তো যোগাড়-যন্তর করতে হবে। দু-দশ জনকে খবর দিতে হবে।

—তাহলে কাল। তার পরে হলে আমি আর বিয়ে করবো না কিন্তু—

তা, এমন ভাল পাত্র হাত-ছাড়াই বা কী করে করা যায়। সুতরাং ভদ্রলোক তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। অবস্থা ভদ্রলোকের শোচনীয়। বয়েসও অনেক। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। স্ত্রীও বহুদিন মারা গেছে। অর্থাৎ. মেয়ের মা। এত তাড়াতাড়ি সব যোগাড় করা সম্ভব নাকি! কিন্তু তখন আর উপায় নেই। পরদিনই পাজি-পুঁথি দেখিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করা হয়ে গেল। আমিও সেই অবস্থাতেই বিয়ে করতে গেলাম মশাই।

সবাই আমার ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল।

হরেনবাবু বললেন—কী বাবাজী, এত ভাল ভাল মেয়ে দেখালাম তোমাকে, শেষকালে কালীবাবুর মেয়েকে পছন্দ হলো?

রমেশবাবুরও ওই এক কথা।

মাসীমা, পিসীমা, দিদিমা যে যেখানে ছিল সকলেরই ওই এক কথা। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে তো পাত্রীকে দেখতে ভাল নয়। তার ওপর গায়ের রং কালো। তার ওপর একটা পয়সাও যৌতুক নিলাম না। এতে সব্বাই বললে— এমন হীরের টুকরো ছেলে মাটির দরে বিকিয়ে দিল।

আমি সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম মশাই।

এরা তো জানে না মশাই আমার কী মতলোব! আমি তখন লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছি। আমি যখন এই পাত্‌সরে গাড়ি হাঁকিয়ে আসবো, তখন বুঝবে কেন আমি বিয়ে করলাম এমন মেয়েকে।

হরিপদ বলতে লাগলো—তারপর শুনুন, আমি তো বিয়ে করে আর একদিনও দেরি করলুম না—

ফুলশয্যাটা সেরে পরের দিন ভোরবেলাই বৌ নিয়ে এলাম ভৈরবগঞ্জে। বাড়ি নয়, একেবারে সোজা হাজির হলাম শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে।

ভদ্রলোক আমাকে দেখে হাতে স্বর্গ পেল।

বললেন—কী মশাই, এতদিন কোথায় ছিলেন?

আমি বললাম—এই তো মশাই আপনার আলোচনা দাসীকে নিয়ে এলাম যে সঙ্গে করে।

বললাম—এই নিন্, ইনিই আপনার আলোচনা দাসী—আমার স্ত্রী—

ভদ্রলোক সামনে যেন তখন সাপ দেখেছে।

বললেন—আপনার স্ত্রী!

হ্যাঁ মশাই, নিজের বিয়ে-করা স্ত্রী—এখন দিন একে আপনার টাকা—

ভদ্রলোক আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—আপনার নাম তো আলোচনা দাসী?

আমার স্ত্রী ভয়ে জড়-সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ-সব ব্যাপার কিছুই বলিনি তাকে। বললাম—বলো, তোমার নাম বলো উকিলবাবুকে—

আমার স্ত্রী মশাই মুখ্যু মেয়েমানুষ। কেন নাম জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তাও বুঝতে পারলে না। মুখ নীচু করে বললে—আলো—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—আপনি যাকে খুঁজছেন এ সেই। এই আমার স্ত্রী—

ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের অনেক চিঠি দেওয়া হয়েছিল, একটা উত্তর পর্যন্ত পাইনি—চিঠি কি পান নি?

—চিঠি পেলে কি আর কেউ উত্তর দেয় না মশাই? এ কি হয়?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি বুঝি একেবারে বিয়ে করে নিয়ে এলেন ওকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ের কথা আগে থেকেই চলছিল, এখন এই সূত্রে পাকাপাকি হয়ে গেল, তাই বিয়েটা সেরেই একেবারে চলে এলাম—এখনও বউ নিয়ে বাড়ি যাইনি—

—ভালোই করেছেন—

বলে ভদ্রলোক কাগজপত্র-বার করে সব লিখে নিলেন। বললেন—আপনার ভাগ্যটা ভাল মশাই, আপনার বুদ্ধিটাও পাকা—

বললাম—টাকাটা পাবো তো ঠিক—?

ভদ্রলোক বললে—পাবেন না কেন? নিশ্চয়ই পাবেন! আমি আগে জানলে মশাই নিজেই এই বিয়েটা করে ফেলতুম—আমার মাথাতে বুদ্ধিটা আসেই নি—

—তা, কবে পাবো টাকাটা ?

ভদ্রলোক বললেন—এইটে সই নিয়ে আগে অফিসে যাই, তখন আপনাকে জানাবো—

—কত দেরি হবে পেতে ?

—দেরি কিসের ? গভর্নমেণ্টের অফিসে যা দেরি, নইলে দেরি আমরা নিজেরা করবো না, টাকাটা পেলেই আপনার স্ত্রীর নামে পাঠিয়ে দেব—

—মনি-অর্ডার না চেক্ ?

—দশ লাখ টাকা মনি-অর্ডারে পাঠাবো কী করে মশাই ! তাই কখনও কেউ পাঠায়, না, পোস্ট-অফিসই অ্যালাও করে ? আপনার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট্ আছে ?

বললাম—না—

—তাহলে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলে ফেলুন—

তা, সেই ব্যবস্থাই হলো। ভৈরবগঞ্জে ব্যাঙ্ক নেই। ব্যাঙ্ক ছিল কালীনগরে। পরদিনই সেখানে গিয়ে পাঁচটা টাকা ধার করে একটা স্ত্রীর নামে অ্যাকাউণ্ট খুললুম মশাই।

আমার নতুন টাটকা বউ। তখন তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়নি। দিদিমা তো বউ দেখে অবাক। পাড়ার লোকজন সবাই ভিড় করে দেখতে এল। সবাই বউ দেখে কিন্তু মুখ বেঁকালো। শেষকালে বিয়ে করে নিয়ে এলাম এই বউকে ! আর বউ পেলাম না ? বউ-এর কি আকাল হয়েছে ? সামনের দুটো দাঁত উঁচু। রংটাও কালো। লেখা-পড়াও জানে না ! এ কেমনধারা বউ ?

রাত্রিবেলা খিল বন্ধ করে বউ বললে—ও লোকটা কে ?

—কোন্ লোকটা ?

—ওই যে-লোকটা আমার টিপ্‌সই নিলে ?

—ও একজন উকিল !

বউ বললে—উকিল সই নিলে কেন ? কিসের কোন্ টাকার কথা বলছিলে তুমি ওকে ?

আমি কিছু প্রকাশ করলাম না। বউ-এর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। দেখলুম আড়ালে মুখ ঢেকে বউ চুপি-চুপি কাঁদছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কাঁদছো কেন ?

বুঝলাম সবাই তাকে দেখে কুৎসিত বলেছে বলেই মনে কষ্ট পেয়েছে। তখন তার কান্না থামাবার জন্যে সব ব্যাপারটা খুলে বললাম। বললাম লাখ টাকা পাওয়ার

কথাটা। কেন তাকে বিয়ে করেছি। আরো বললুম—টাকাতে সব দোষ ঢেকে যাবে। তখন দেখবে সবাই আবার তোমাকে তখন সুন্দরী বলবে। আজ যারা তোমার নিন্দে করছে, কাল তারাই আবার তোমার গুণ গাইবে। সবই বুঝিয়ে বললাম। মনে হলো, সমস্ত শুনে যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। আর কান্নাকাটি করে না।

বললাম—তারপর?

গল্প বলতে বলতে গলাটা বোধহয় শুকিয়ে এসেছিল।

বললে—দাঁড়ান মশাই, একটা বিড়ি ধরাই আগে, গলাটা ভিজিয়ে নিই—তখন থেকে এক নাগাড়ে বলছি তো—

বললাম—তুমি কি আর মুফৎ বলছো হরিপদ? আমি কি তোমাকে ফোকটে খাটাচ্ছি বলতে চাও?

হরিপদ বিড়ি টানা বন্ধ রেখে বলে উঠলো—তা, আপনি তো দেবেন মশাই মাত্তোর পাঁচটি টাকা, পাঁচ টাকা দিয়ে আবার কথা শোনাচ্ছেন? হরিবিলাসবাবুকে এ-গল্পটা দিলে আমাকে খুশী হয়ে বখশিশ দিয়ে দিতেন—

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম—তা, বখশিশ কি আমি দিই না তোমাকে? বখশিশ দিই নি কখনও?

—কী দিয়েছেন শুনি? কী বখশিশ আমাকে দিয়েছেন? একবার পুজোর সময় শুধু একটা কাপড় দিয়েছিলেন বউকে, তা ছাড়া আর কখন কী দিয়েছেন শুনি? হরিবিলাসবাবু গতবারে আমাকে একজোড়া জুতো, আমার ছেলের পাঞ্জাবী, বউএর শাড়ি, কত কী দিয়েছেন, তা জানেন? অথচ আপনি আর হরিবিলাসবাবু! তিনি এখনও গাড়ি বাড়ি কিছুই করতে পারেন নি—

আমার আর এ-সব কথা ভাল লাগছিল না। বললাম—বলো, তোমার ও-সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই আমার, শেষটা কী হলো, বলো!

হরিপদ রেগে উঠলো। বললে—দাঁড়ান মশাই, আপনি দেখছি ভালো করে বিড়িটাও খেতে দেবেন না—

তারপর বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে সেটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আমারও যেমন হয়েছে, আমি নিজে লেখাপড়া জানলে কি আর আপনাদের দরজায় ধন্না দিই? লেখাপড়া জানলে আমি নিজেই গল্প লিখতুম মশাই, আপনার কাছে এসে এমন করে দরবার করতে হতো না—

বললাম—তা, শেষটা কী হলো বলবে তো? তুমি বড্ড জ্বালাও আমাকে—

—তা, বেশ তো আর জালাবো না, আমি চললুম—হরিবিলাসবাবুর কাছে গেলে এতক্ষণ সাতটা সিগ্রেট খাইয়ে দিতেন—

বললাম—তা, সিগ্রেট তো আমিও দিতে পারি, তুমি অত চটছো কেন? সিগ্রেট খাবে তুমি?

—এখানেই দেখুন আপনার সঙ্গে আর হরিবিলাসবাবুর সঙ্গে তফাৎ, সিগ্রেট খাবো কিনা এটাও কি জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? নাগাড়ে বিড়ি খেয়ে গেলে মানুষের গলা জ্বলে না?

হাসলুম মনে মনে। তাড়াতাড়ি সিগ্রেট আনিয়ে দিলাম দোকান থেকে। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে প্যাকেটটা পকেটে পুরে হরিপদ বললে—আঃ—

তারপর যেন একটু ঠাণ্ডা হলো।

বললাম—বলো, এইবার বলো তোমার শেষটা—

হরিপদ বললে—কত খাটালেন বলুন তো, এ-খাটুনি পাঁচ টাকায় পোষায়? চালের দর একটাকা কিলো, তা জানেন? আপনিও মশাই কংগ্রেসের মত হয়েছেন, বেশি খাটিয়ে নিয়ে কম মজুরি দিচ্ছেন, আমি বুঝি না কিছু—?

বুঝলাম চাপ দিয়ে হরিপদ কিছু বেশি আদায় করতে চাইছে।

বললাম—আচ্ছা, ঠিক আছে, গল্পটা যদি শেষ পর্যন্ত ভালো লাগে তো না-হয় আরো একটা টাকা দিয়ে দেব—

হরিপদ বললে—আপনি যে মশাই হাসির গল্প চেয়েছেন, দুঃখের গল্প চাইতেন তো দেখতেন আপনাকে আমি কাঁদিয়ে দিতুম—

—ও-সব ভণিতা থাক, তোমার গল্পটা বলো, আমার একটু তাড়া আছে—

—তা, আমার কি তাড়া নেই ভেবেছেন? আমারও তো তাড়া থাকতে পারে, আমিও তো কাজের মানুষ, দশটা ফিকিরে ঘুরতে হয় আমাকে—

—থাক্ গে, তারপর?

হরিপদ সিগারেটে টান দিলে একবার। তারপর মুখটা গম্ভীর করে বললে—শেষটা মশাই বড্ড হাসির—

—হাসির মানে?

—হাসির নয় তো কী! টাকা তো আমি পাই নি। টাকা পেলে কি আমি পাঁচটা টাকার জন্যে আপনার কাছে এসে এই রকম বক্ বক্ করি? টাকা পেলে আপনার নাকের ডগা দিয়ে মটর-গাড়ি হাঁকিয়ে যেতুম না?

—সবই বুঝছি, তুমি বলো এখন হরিপদ, শেষটা বলো! আর পারছি না—

হরিপদ দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললাম—দাঁড়ালে কেন?

—যাবার সময় হয়ে এল, দাঁড়াব না—

—তা, শেষটা বলে যাবে তো?

—আরে মশাই, যেমন হয়েছে শালা গভর্মেণ্টের কাণ্ড, তেমনি হয়েছে শালা পোস্টাপিসের কাণ্ড। কী সর্বনাশটা আমার করলে বলুন তো?

—কেন, পোস্টাফিস তোমার কী সর্বনাশ করলে?

—পোস্টাপিসই তো গণ্ডগোলটা বাধালে মশাই, নইলে আমাকেও আর অত কাণ্ড করে ওই কালো-কুচ্ছিৎ বউ বিয়ে করতে হতো না, এত ভোগান্তিও হতো না আমার—বিয়ে না করলে আজ পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করে কাটাতে পারতুম—

—কী রকম?

—তবে শুনবেন?

বলে হরিপদ ফস্ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললে। তারপর একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—তবে শুনুন মশাই, আমি তো বউ নিয়ে এসে দু'হাতে টাকা ধার করছি আর ওড়াচ্ছি। তখন আর আমায় পায় কে? দু'দিন পরেই তো আমি দশ লাখ টাকা পেয়ে যাচ্ছি! তা, বহুদিন হয়ে গেল টাকা আর আসে না। শেষকালে আমি একদিন বউকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলুম। এসে সেই অ্যাটর্নী-অফিসে গেলুম। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বললাম—কী মশাই, আমার টাকা কোথায়? আপনি আমার বউ-এর সই-সাবুদ নিয়ে গেলেন আর টাকা পাঠাবার বেলায় ঢুঁ ঢুঁ?

তা, ভদ্রলোক কী বললে জানেন? বললে—কিছু মনে করবেন না, আমাদের একটা ঠিকে-ভুল হয়ে গিয়েছিল। বুঝুন মশাই, আমার অত টাকা ধার হয়ে যাবার পর বললে কিনা ঠিকে-ভুল হয়ে গিয়েছিল—

—কী ভুল?

হরিপদ বললে—আরে মশাই, বলে কিনা পোস্টাপিসের টেলিগ্রামের ভুল। বর্মা থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে কলকাতার অ্যাটর্নী-অফিসে, টেলিগ্রামে লিখেছে আলোকণা দাসী, তার বদলে এরা লিখেছে আলোচনা দাসী। ইংরিজীতে সি-এইচ্‌টা ক'ও হয় চ'ও হয়। সেই ভুল হয়েছে আরকি! আর গ্রামের নাম পাকুসর, লিখেছে পাত্‌সর। বুঝুন একবার গভর্মেণ্ট অফিসের কাণ্ডটা—ওরা ভুল

করবে, আর মাঝখান থেকে আমার মত গরীব লোকের হয়রানি! ছি ছি! দিন মশাই, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন, র‍্যাশন নিয়ে গেলে তবে বউ উনুনে হাঁড়ি চড়াবে, এখনও সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি মশাই—দিন দিন—দেরি করবেন না—র‍্যাশনের দোকান আবার বারোটা বাজলে বন্ধ হয়ে যাবে—দিন—

বেলমোতিয়া

যত বাড়ছে ততই মনে হচ্ছে আমার অবাক হবার ক্ষমতা বুঝি আর শেষ হবার নয়। এমন একদিন ছিল যখন মনে হতো সব দেখা সব শোনা সব বোঝা শেষ হয়ে গেছে। দেখবার শোনবার বোঝবার আর কিছুই নেই। তবু এখনও সূর্যাস্ত দেখলে দুচোখ ভরে চেয়ে থাকি। একটা ফুল ফোটাবার শব্দ শোনবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কান পেতে থাকি। বই পড়তে পড়তে একটা শব্দর মানে বোঝবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই এখনও।

আর মানুষ!

মানুষের বৈচিত্র্যেরই কি শেষ আছে। আজ মনে হয় এ-বৈচিত্র্যের বুঝি শেষ হবেও না কোনদিন। এই সেদিনের কথা। দশ বারো বছর আগের ঘটনা। বিলাসপুর থেকে তিরিশ মাইল দূরে নিপানিয়া গ্রামে তখন আছি আমি। উদ্দেশ্য কিছু নয়, বিশ্রাম। নিপানিয়া নাম হলে কী হবে, জল প্রচুর। গ্রামের নাম নিপানিয়া, নদীর নাম নিপানি! অভিধানে তাকেই বলে নিপানি যাতে জল নেই। কিন্তু এ গ্রামের আর এই নদীর নাম যে কে দিয়েছিল তা জানি না কারণ নদীতে জলও প্রচুর। ওই নিপানিই ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ।

ইচ্ছে ছিল শহর থেকে দূরে বেশ কিছুদিন নিরিবিলিতে কাটাবো। বিলাসপুরের কারখানা, লোকো-শেড, ইঞ্জিন, ধোঁয়া আর গোলমাল থেকে দূরে গিয়ে সভ্যতাকে ভুলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সেখানে সেই অজ পাড়াগাঁয়ের চেয়েও অধম সেই নিপানিয়াতে গিয়ে যে অবাক হতে হবে আমাকে তা আর ভাবিনি। আমাকে সত্যি অবাক করে দিয়েছিল দুখমোচন কুর্মির বউ বেলমোতিয়া।

আশ্চর্য মেয়ে ওই বেলমোতিয়া। কোনও মেয়েমানুষ যে স্বামীকে এত

ভালবাসতে পারে, আমি এ-যুগে অন্তত তার প্রমাণ পাইনি। আর শুধু আমি কেন, আপনারাও যে পাননি তার সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।

সেই বেলমোতিয়ার সঙ্গে আজ এতদিন পরে আবার দেখা। আর এই দেখা না হলে হয়ত এ-গল্প লেখার কোনও দরকারই হতো না।

দেখা হওয়ার পর থেকেই কেবল ভাবছি এ কেমন করে হয়! ভাবছি এ কেমন করে হতে পারে। ভাবছি এ কেমন করে সম্ভব হলো! বেলমোতিয়া এ কাজ কেন করতে গেল? বেলমোতিয়া কি তবে তার মরদকে ভালবাসত না? সবটাই কি তবে তার ছলনা? দুখমোচনের জন্যে কেন সে সেদিন অমন করে কেঁদেছিলো? কেন সে তার মরদের চিতার ওপর ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলো? সবটাই কি তার লোক দেখানো না কি কুন্দনলাল দুখমোচনের চেয়েও দেখতে সুন্দর, না কি কুন্দনলাল কিছু যাদু জানে!

কে জানে! আমি কুন্দনলালকে আর কতটুকুই জানি। কুন্দনলালের তখন আর কী-ই বা বয়েস!

আসলে কুন্দনলালের বাপ হরবনস্‌লালই আমাকে নিপানিয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। নিপানিয়া হলো হরবনস্‌লালের জন্মভূমি। কুন্দনলালেরও জন্মভূমি। দুখমোচন কুর্মি আর বেলমোতিয়ারও দেশ ওই নিপানিয়া।

হরবনস্‌লাল আমাদের বিলাসপুরে রেলওয়ের লেবেল ক্রসিং-এ গেটম্যানের চাকরি করতো। রেলের খাতায় হরবনস্‌লালের বয়েস যা-ই লেখা থাক, যখন সে রিটায়ার করলো তখন কম করেও তার বয়েস সত্তরের কম নয়। কোন্ সাহেবের বুঝি হঠাৎ একদিন নজর পড়লো তার ওপর। তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেল যে, যে-বয়েসে তার রিটায়ার করবার কথা তার পরেও সে চাকরি করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দেওয়া হলো তাকে আর একদিন দেশ কোয়াটার ছেড়ে দিয়ে তাকে তার নিপানিয়াতে ফিরে যেতে হলো চিরকালের মতো!

যাবার আগের দিন আমার কাছে এসেছিল হরবনস্‌লাল। যথারীতি প্রণাম করলে। ছেলে কুন্দনলালও সঙ্গে ছিল। সেও আমার পায় হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বললাম—তাহলে তুমি দেশেই ফিরে যাচ্ছ হরবনস্‌লাল?

হরবনস্‌লাল বললে—জী হুঁজুর, আমার দেশ নিপানিয়াতেই যাচ্ছি—

আরো অনেক কথা বললে। হরবনস্‌লালের বউ মারা গিয়েছিল বহুকাল আগে। এই কুন্দনলালের জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে। সাহেবকে অনেক ধরেছিল কুন্দনলালের

চাকরীর জন্যে। কিন্তু মাত্র বারো বছর বয়েসের ছেলেকে কী করে আর গেট-ম্যানের চাকরি দেওয়া যায়, তাই সাহেব বলেছিল আঠারো বছর বয়েস হলেই তার চাকরি করে দেবে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন চালাবে কি করে তুমি ?

হরবনস্‌লাল বলেছিল—ক্ষেতি আছে, চাষ-বাস করবো, আর আছে এই কুন্দনলাল—

—গাঁয়ে তোমার আর কে আছে ? কোনও ভাই কি কাকা কি জ্যাঠা কিংবা তাদের ছেলেমেয়ে কেউ নেই ?

—না হুঁজুর, আমার কোন রিস্তাদার নেই। শুধু আমি আর আমার এই লেড়কা কুন্দনলাল। তামাম দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

—দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়-স্বজন ?

—না হুঁজুর, তাও নেই। মাথার ওপর শুধু ভগবান আছে, তার ওপর ভরসা করে দিন কাটিয়ে দেব কোনও রকমে। যদি সাহেব কুন্দনলালকে কোনওদিন রেলে চাকরি করে দেয় তো তখন আবার আসবো এখানে। কুন্দনলাল কোয়ার্টার পেলে সেখানে থাকবো। কুন্দনলালের সাদি দেব, ওর বউ আমাকে দেখবে, ওর বালবাচ্চা যদি হয় তো তখন তাদের নিয়ে থাকবো—

এই রকম অনেক সাধ ছিল হরবনস্‌লালের। যা সব বাপেরই থাকে। কিন্তু হরবনস্‌লাল কি জানতো তার সব সাধ সব আশা এমন করে নষ্ট হয়ে যাবে ?

কিন্তু সে কথা এখন থাক !

আর তা ছাড়া এ তো হরবনস্‌লালের গল্প নয়, এ বেলমোতিয়ার গল্প। সুতরাং বেলমোতিয়ার গল্পটাই বলি। যে বেলমোতিয়ার সঙ্গে এই এতদিন পরে আবার দেখা হলো।

সেই বারো বছর আগে কিছু দিনের জন্যে হঠাৎ মনটা একটু নিরিবিলির জন্য ছটফট করে উঠলো। এ-রকম মন ছটফট করা আমার প্রায়ই হয়। তখন আর কিছু ভালো লাগে না। তখন শহর ছেড়ে সভ্যতা ছেড়ে লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে নিরিবিলিতে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ঠিক সেই সময় হরবনস্‌লালের কথা মনে পড়েছিল। বলেছিল তার দেশ নিপানিয়া খুব নিরিবিলি গাঁ। সেখানে না আছে ইলেকট্রিকসিটি, না আছে পাকা রাস্তা, না ড্রেন, না কিছু। একেবারে আদিম পৃথিবী নিপানিয়া। রেডিও, সিনেমা, খবরের কাগজ, মোটর গাড়ি কিছুই এখনও সেখানে পৌঁছয়নি। ভেবেছিলাম শান্তি

যদি কোথাও থাকে তো সে ওই নিপানিয়াতেই। হরবনস্‌লাল আরো বলেছিল, আমি যদি তার দেশে যাই তো আমার থাকতে কোন অসুবিধে হবে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে সে তার বাড়িটা মেরামত করে নিয়েছে। টিন দিয়ে ছাদ ঢেকেছে। ক্ষেতি কিনেছে, খামার করেছে। অর্থাৎ মাথা গোঁজবার মত একটা আশ্রয়, আর মোটা খাওয়ার জোগাড় আছে।

যা ভেবেছিলাম সত্যিই তাই। অমন একখানা গ্রাম যে এখনও ইণ্ডিয়াতে থাকতে পারে তা কল্পনাও করতে পারা যায় না।

প্রথম দিকে হরবনস্‌লাল আমাকে দেখে যেন স্বর্গ হাতে পেয়ে গিয়েছিল, সে যেন আশা করেনি সত্যি-সত্যিই আমি গিয়ে পৌছুব তার দেশে। সংসার বলতে বাবা আর বেটা। হরবনস্‌লাল আর কুন্দনলাল। আমি গিয়ে যেন তাদের গৌরব বাড়িয়েছি। আমাকে নিয়ে হরবনস্‌লাল ক'দিন খুব ঘোরাঘুরি করলে। বাপ বেটায় মিলে আমাকে গ্রামের ঐশ্বর্য দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। ঐশ্বর্য মানে খোলা আকাশ, অবারিত চানার ক্ষেত আর নিপানি নদী। নদীর ওপারে শ্মশান।

কিন্তু দু'দিন যেতে-না-যেতেই মুশকিল হলো। হরবনস্‌লাল অসুখে পড়লো। ভাবলাম, বুড়ো হয়েছে, অসুখ তো হবেই, আবার একদিন সেরেও যাবে।

হরবনস্‌লাল আমাকে বল্লে—আমার কী হবে বাবু।

আমি বললাম—তুমি অত ভাবচো কেন শিগ্‌গির সেরে উঠবে।

—কিন্তু আপনাকে কে দেখাশোনা করবে? আপনিও এলেন আর আমিও অসুখে পড়ে গেলাম—

—তাতে কি হয়েছে? আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না—

—কিন্তু আমি মারা গেলে কুন্দনলালের কি হবে বাবু, কুন্দনলালকে কে দেখবে?

বুড়ো বয়েসে সব বাপের মনেই যে দুর্ভাবনা হয়, হরবনস্‌লালেরও তাই হয়েছিল। কুন্দনলালের কেউ নেই যে তাকে দেখবে। সবে তখন বারো বছর বয়েস তার, কুন্দনলালও বাপ বলতে অজ্ঞান। ছোটবেলা থেকেই বাপকে সে দেখে এসেছে, বাপকেই সে একমাত্র নিজের বলে জানে। আমিও অভয় দিলাম হরবনস্‌লালকে যে, সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে। আর তেমন কিছু হলে আমি তো আছি। আমিই কুন্দনলালকে দেখবো। আমি সাহেবকে বলে রেলেতে কুন্দনলালের নোকরি করে দেব। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বোঝালাম। শুনেই আরাম পেয়ে হরবনস্‌লাল চোখ বুজলো। আর সেই রাত্রেই হরবনস্‌লাল মারা গেল।

আমার অবস্থা সত্যিই কাহিল হয়ে উঠলো।

কোথায় আমি এসেছিলাম নিরিবিলিতে কিছুদিন কাটাবো বলে, তা নয়, সেই কুন্দনলালকেই তখন আমার ঠাণ্ডা করবার পালা। আশে-পাশের বাড়ির কিছু লোকজন খবর পেয়ে এল। আমি নতুন লোক। বিদেশ বিভুঁই। আর ওদের সমাজের নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। কোথায় ডাক্তার কোথায় শ্মশান তাও জানি না। কোথায় কাঠ, কোথায় পুরুত তাও আমার অজানা। টাকাকড়ি আমার সঙ্গে ছিল। সেজন্যে আমার ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ সব ব্যাপারে টাকাটাই তো সব নয়। শুধু টাকা ঢাললেই তো আর মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না। আর সব চেয়ে মুসকিল হলো কুন্দনলালকে নিয়ে; সে বাবার নিষ্প্রাণ দেহটাকে জড়িয়ে ধরে রইল। কিছুতেই আর তাকে ছাড়বে না। সবাই মিলে তাকে ধরে রইল।

কিন্তু মৃত্যু তো কারো হুকুম মানবার গোলাম নয়। মানুষকে যখন মৃত্যু এসে ধরে তখন সে আর বড়লোক গরীব লোক বিচার করে না। কার কী কাজ বাকি রইল তা দেখবার দায় নেই তার। তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। স্বীকার করে নেওয়াই স্বাস্থ্যকর।

এ-সব কথা আমি বুঝলেও কুন্দনলালকে বোঝানো বৃথা। এ বোঝাবার জিনিসও নয়। কেবল যার হয়েছে সেই বুঝতে পারে। গ্রামের দু'চারজন লোক যারা এসেছিল, তারা ছেলেটাকে তাদের নিজের ভাষায় অনেক বোঝাতে লাগলো। বুড়ো হলে সকলেরই বাবা মারা যায়, একদিন সকলকেই মরতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক আজে বাজে কথা।

শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রে নিপানির ধারে শ্মশানে নিয়ে গেলাম হরবনসলালকে।

হরবনসলালকে কত বছর দেখে আসছি। সেই সব কথা মনে আসছিল। শ্মশানে গেলে যে-সব কথা মনে আসা স্বাভাবিক সেই সব সাময়িক বৈরাগ্যের কথাই সকলের মনে আসে। হরবনসলাল মানুষটা সত্যিই ভালো ছিল! বড় সৎ, বড় বিনয়ী, বড় ভদ্র, বড় অল্পে তুষ্ট। রেলের চাকরিতে এমন একটা বড় দেখা যায় না। সেই তারই মধ্যে হরবনসলাল নিজের সততার জোরে এতদিন চাকরি করে এসেছে মাথা উঁচু করে, এটা কম কথা নয়।

চারিদিকে খাঁ খাঁ ফাঁকা মাঠ আর দূরে আকাশের গায়ে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মত সার-সার পাহাড়। আর সামনে হরবনসলালের চিতাটা দাউ দাউ করে জলছিল। আর আমি সেই বিদেশ-বিভুঁইএর শ্মশানের এক কোণে কুন্দনলালকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। মনে আছে তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা পর্যন্ত সেদিন খুঁজে পাইনি আমি। মাত্র বারো বছর বয়েস। আশে পাশে আশ্রয় পাবার মত কেউ

নেই তার। একমাত্র আমিই বলতে গেলে সেদিন তার পরম আত্মীয়। আর যারা শ্মশানে গেছে তারা শুধু শেষ কর্তব্য করতে গেছে। কর্তব্য শেষ করে তারা আবার যে যার বাড়ি চলে যাবে। তখন কুন্দনলালকে একলাই এই কুটিল পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার নিজের অস্তিত্বের জন্যে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। তখন তার আশে-পাশে কেউ থাকবে না। যারা তার মৃত বাপকে শ্মশানে নিয়ে গেছে তারাই হয়ত আবার তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করে তার জমি, তার ক্ষেত, তার বাড়ি, সব দখল করে নেবে। এই-ই হয়, এই-ই হয়ে আসছে, এই-ই হবে চিরকাল।

কুন্দনলাল তখনও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদছিল। আমি তার মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। আর কিছুক্ষণ পরেই হরবনস্লালের মরা দেহটা ছাই হয়ে যাবে। তারপর কুন্দনলালকে নিয়ে তার ফাঁকা বাড়িতে ফিরে যাবো।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো, অভাবনীয় কাণ্ড।

বোধ হয় জন বারো লোক অন্য দিক থেকে একটা মৃতদেহ আনছিল। সাধারণত মৃতদেহ আনবার সময় যে ধরণের গোলমাল হয়, সমবেত চিৎকার হয়। এ যেন অন্যরকম। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়েলি গলার আর্তনাদ।

আমি কুন্দনলালকে নিয়ে উঠলাম। যারা এলো তারা বেশ দলে ভারি। কিন্তু মনে হলো আকণ্ঠ মদ্যপান করেছে। দুর্গন্ধে তাদের কাছে টেঁকা যায় না। তারা চিতার আয়োজন করতে লাগলো। তার মধ্যে একটি মেয়েকে সবাই ধরে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। মেয়েটা যতবার ছাড়া পেতে চাইছে ততবার তারা তাকে জোর করে ধরে রাখছে।

আমি বুঝলাম, মেয়েটি সদ্য বিধবা হয়েছে। স্বামীর শোকে অধীর! অবশ্য এটাও স্বাভাবিক। শ্মশানে এ-রকম বিচিত্র ঘটনা অনেকবার অনেকে দেখেছে। এ দৃশ্য যে দেখেছে একবার, কেবল সেই এর মর্মন্তুদ দিকটা উপলব্ধি করতে পারবে।

কুন্দনলালও বোধ হয় এই দৃশ্য দেখে খানিকটা আত্মস্থ হয়ে এসেছিল। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল যে শোক শুধু তার একলার নয়। তার একার শোক অন্যের মধ্যে দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়ে চুপ করে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপর যে ঘটনা ঘটলো তা দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

দেখি চিতাটা যখন তৈরি হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ হৈ-চৈ গোলমাল চেঁচামেচি সুরু হল।

আর স্থির থাকতে পারলাম না। সোজা গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছে তোমাদের?

ওদের ভাষাও ভাল বুঝি না, তার ওপর মদে চুর হয়ে আছে।

আমাদের দলেরই একজন বললে—হুঁজুর ওই বেলমোতিয়া—

মেয়েটার কিন্তু সেদিকে কান নেই, সে তখন জলন্ত চিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সকলের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—ওকে ধরে রেখেছ কেন?

হুঁজুর, ও 'সতী' হবে। ওর মরদের সঙ্গে পুড়ে মরবে—

—কেন?

ওরা যে-সব উত্তর দিচ্ছিল, আমাদের দলের লোকেরা তা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

ব্যাপারটা যে এ-রকম একটা কিছু তা আমি আগেই একটু অনুমান করতে পেরেছিলাম, এবার আরো খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। ওর নাম বেলমোতিয়া। নিপানিয়ার পাশের গ্রামে থাকে। ওর মরদের নাম দুখমোচন। বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানুষটা ছিল। অবস্থাও ভালো ছিল, স্বামী-স্ত্রীতে খুব সদ্ভাবও ছিল। একজনকে ছেড়ে আর একজন নাকি কখনও থাকতে পারতো না, এমনই পায়ার ওদের। ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। এমন কি দু'জনেরই শ্বশুর শাশুড়িও কেউ নেই। এখন দুখমোচনের দুঃখে বেলমোতিয়া প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়বার অবস্থা। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃসহায় হয়ে পড়েছে।

লোকগুলো দেখলাম, মদে একেবারে চুর।

একজন বললে—হুঁজুর, ও যদি পুড়ে মরতে চায় তো আমাদের কী কসুর?

আর একজন বললে—আমরা মানা করেছি হুঁজুর, ও শুনবে না কিছুতেই—

সবাই ওই এক-কথাই বলতে লাগলো। কিন্তু মনে হলো সবাই যেন মজাটাও দেখতে চায় মনে মনে। এ-রকম দেখবার জিনিস তো রোজ রোজ মেলে না কোথাও। বিশেষ করে নিপানিয়ার মত অজ্ পাড়াগাঁয়ে। এদেশে সকাল বেলা সূর্য ওঠে, তারপর থেকে মাঠে আর ক্ষেতে কাজ করতে করতেই বেলা পুইয়ে যায়, আর তারপর সূর্য ডুবে যায়। এমনিই চলে দিনের পর দিন। হঠাৎ তারই মধ্যে বৈচিত্র্য আসাতে যেন সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

যারা এতক্ষণ কাঠ সাজাচ্ছিল তারা দুখমোচনকে চিতায় তুলে দিলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে বেলমোতিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিতায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকগুলো তাকে ধরতেও গেল না। একজন চিৎকার করে উঠলো—কালী মাঈ কি জয়—

'জয়' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য লোকেরাও দোহার দিয়ে উঠলো—জয় !!!

সারা শ্মশান তখন বেশ গুলজার হয়ে উঠেছে। একজন বেশ সকলের সামনেই একটা মদের হাঁড়ি থেকে হুড় হুড় করে মদ ঢালতে লাগলো গলায়! বেলমোতিয়া তখন চিতায় উঠে দুখমোচনকে জড়িয়ে ধরেছে। ধরে সেই মড়ার সঙ্গেই যেন কথা বলতে সুরু করে দিলে। এ যেন তাদের বিয়ের রাত। এ যেন ফুলশয্যায় শুয়ে স্বামী-স্ত্রীর একাকার হওয়া। শ্মশানে যে আমরা এতগুলো চেনা-অচেনা লোক রয়েছি এ যেন বেলমোতিয়ার খেয়ালই নেই। তার স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। সে তার স্বামীর মৃত্যুপথের সহযাত্রী হয়ে বেহুলার মত তার লখীন্দরকে যেন পুনর্জীবন দিয়েছে।

একজন কোত্থেকে এসে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলো। আর একজন কোত্থেকে একটা ঢোল এনে ঢাঁই-ঢাঁই করে বাজাতে লাগলো। অন্য লোকগুলোরও তখন নাচ পেয়ে গেছে। তারা নাচতে সুরু করে দিলে। সে এক বীভৎস কাণ্ড।

আমাদের দলের যারা তারাও বোধ হয় কিছু ভাগ পাবার আশায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের হরবনস্‌লালের চিতাটার তখন প্রায় নিবু-নিবু অবস্থা।

আমি আর থাকতে পারলাম না।

কুন্দনলালের হাতটা ছেড়ে দিয়ে সোজা গিয়ে চিতার ওপরে লাফিয়ে উঠেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে বেলমোতিয়ার হাত ধরে টেনে তাকে নীচেয় নামিয়ে এনেছি। তখন তার চরম অবস্থা। কাপড়েরও ঠিক নেই খোপারও ঠিক নেই। বেলমোতিয়া যেন তখন আর এই মর জগতেই নেই।

বেলমোতিয়াকে নামিয়ে নিয়ে একটা লোককে চিতায় আগুন দিতে বলে দিলাম।

অন্য লোকদের আপত্তিতে বেলমোতিয়া বিশেষ কান দেয় নি, কিন্তু আমাকে অচেনা লোক দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর এক পলক দেখে নিয়েই হাত-পা ছুঁড়ে আবার চিতায় ওপর ওঠবার চেষ্টা করলে।

আমি এক ধমক দিলাম—থামো—

বেলমোতিয়া ঠিক এমন হুকুম আমার মুখ থেকে আশা করে নি। সেই অবস্থাতেই আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

আমি বললাম—চিতায় উঠলেই তোকে পুলিশে ধরিয়ে দেব—

তারপর অন্য সকলের দিকে চেয়ে বললাম—আর তোদেরও সকলকে পুলিশের হাতে তুলে দেব—

সামনের লোকটা হাত জোড় করে বললে—না হুঁজুর, আমরা ওকে মানা করে-ছিলুম—ও শুনলে না কিছুতে—

আরও যে-কজন লোক ছিল তাদের নেশা তখন মাথায় উঠেছে, বললে—হুঁজুর, আমরা কিছু জানি না, আমরা কোন কসুর করিনি—

এবার সবাই আমার পায়ে ধরতে এল। আমার এক হাতে বেলমোতিয়া। তাকে একটা হাত দিয়ে গায়ের জোরে ধরে রেখেছি। অন্য হাতে তাদের সকলকে পা ছুঁতে বারণ করলাম। বললাম—চল, সবাই থানায় চল আমার সঙ্গে।

—হুঁজুর আমাদের রেহাই দিন হুঁজুর।

বেলমোতিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে তখন প্রাণপণে আমার হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। জোয়ান মেয়েমানুষ। তার ওপর তার স্বামী মারা গেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। তার জোরের সঙ্গে আমি পারব কেন? আর সত্যিই তো, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর অসহায় অবস্থার কথাটা অনুভব না করতে পারলেও কিছুটা তো অন্তত বুঝতে পারি। কিন্তু আমার যত রাগ এই লোকগুলোর ওপর, যারা মজা দেখবার জন্যে এই এতদূর শ্মশান পর্যন্ত এসেছে। আর হয়ত বেলমোতিয়ার ঘাড় ভেঙেই ভাঁটিখানা থেকে মদ গিলেছে। আর এখন শ্মশানে শবদাহ করবার নাম করে মজা দেখতে এসেছে।

আমি ধমক দিয়ে আবার বললাম—চল, সবাইকে একসঙ্গে হাজতে পুরবো—

বেলমোতিয়া এবার এক কাণ্ড করলে। হঠাৎ আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আমার হাতে এক কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু বোধহয় ভাগ্যটা ভাল ছিল। আমি যদি যন্ত্রণায় হাতটা ছেড়ে দিতাম তো সঙ্গে সঙ্গে সে চিতায় গিয়ে লাফিয়ে উঠতো। চিতা তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। তখন আর তাকে বাঁচাতে পারতাম না।

—ছাড়, আমাকে ছাড়—

সেদিনকার সেই বেলমোতিয়ার চেহারা, সেই আচরণ আমার আজও মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই এলোমেলো একমাথা রুক্ষ চুল, সেই আলুথালু কাপড় আর সেই নিপানিয়ার মাঝরাতের শ্মশান। সেই বীভৎস ভয়াল অবস্থার মধ্যে একদিকে আমি, আর একদিকে একদল মজা-লোভী অশিক্ষিত মাতাল চাষা।

আমার কথা শুনে বোধহয় বেলমোতিয়ার শ্মশান-বন্ধুরা মনে মনে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। চেয়ে দেখলাম তাদের সবাই একে একে নিঃশব্দে কখন গা-ঢাকা দিয়েছে। বেলমোতিয়াও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলো তার দলের কেউ-ই সেখানে আর নেই।

আমি তখন তাকে বোঝাতে লাগলাম—যে মারা গেছে তার সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মরে কোন লাভ নেই। পৃথিবীতে একদিন সবাই মারা যাবে। শুধু কেউ আগে আর কেউবা পরে। মানুষ এ পৃথিবীতে শুধু কিছুদিনের জন্যে এসেছে। তারপর তার কাজ শেষ হোক আর না-হোক তাকে একদিন চলে যেতেই হয়। এর জন্যে কেঁদেও যেমন কোন ফল হয় না, প্রাণপাত করেও তেমনি কোনও উপকার হয় না কারো। প্রাণ দেবার ক্ষমতা যেমন মানুষের হাতে নেই, প্রাণ নেবার ক্ষমতাও তেমনি বে-আইনী। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ছেঁদো কথা।

কিন্তু বুঝতে পারলুম বেলমোতিয়ার কানে কোনও কথাই যাচ্ছে না। এবং না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। একবার দুখমোচনের জ্বলন্ত চিতাটার দিকে চায় আর হু-হু করে কেঁদে ওঠে। বোধহয় তার সমস্ত পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। একদিন তাদের বিয়ে হয়েছিল। একসঙ্গে এক ঘরে এক ক্ষেতে তারা কাজ করেছে। বর্ষায় শীতে গ্রীষ্মে তাদের জীবন একই খাতে কেটেছে। সেই সমস্ত অতীতের স্মৃতির ওপর তখন আগুন জ্বলছে। আর কিছুক্ষণ পরে দুখমোচনের শেষ চিহ্নটুকুও নিঃশেষ হয়ে আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

মনে আছে অনেকক্ষণ কথা বলবার পর যেন বেলমোতিয়া একটু শান্ত হলো।

দুখমোচনকে যারা শ্মশানে বয়ে নিয়ে এসেছিল তারা ততক্ষণ পুলিশের ভয়ে সরে পড়েছে। তাদের একজনকেও আর তখন আশে-পাশে কোথাও দেখা গেল না।

আস্তে আস্তে দুখমোচনের চিতাটাও নিভে এল। দুখমোচনের শেষ কৃত্য আমিই সম্পন্ন করলাম শেষ পর্যন্ত। কী জানি কী হলো বেলমোতিয়া আমাকেই যেন তার পরম নির্ভরস্থল হিসেবে মেনে নিয়েছিল। আমার একটা কথাতেও তখন আর সে আপত্তি করলো না।

আমি নদী থেকে মাটির কলসী করে জল নিয়ে আসতে বললাম। নিঃশব্দে জল নিয়ে এল।

বললাম—চিতার ওপর জল ছিটিয়ে দাও নিজের হাতে—

চিতাটা যখন সম্পূর্ণ নিভে গেল, তখন বেলমোতিয়া আবার আমার কাছে এসে দাঁড়াল। যেন আমি ছাড়া তখন কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জায়গাই নেই তার।

আমাদের দলের ধনীরামকে জিজ্ঞেস করলাম—বেলমোতিয়ার বাড়িতে কে আছে আর?

ধনীরাম বললে—ওর আর কেউ নেই হুঁজুর—

—শ্বশুর কি শাশুড়ী?

—না, তারা অনেকদিন আগে মারা গেছে।

—দেওর কি ননদ?

—তাও নেই হুঁজুর।

—বেলমোতিয়ার নিজের বাপ-মা-ভাই কি বোন, তারা?

—না না হুঁজুর, কেউ কোথাও নেই ওর, সেই জন্যেই তো পুড়ে মরতে যাচ্ছিল।

ভারি ভাবনা হতে লাগলো বেলমোতিয়ার জন্যে। এই অজ্ঞ গণ্ডগ্রামে কোথায় কার কাছে কার হাতে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে যাবো এই অনাথা বিধবাটাকে?

—জমি-জমা কিছু নেই ওর?

—হ্যাঁ হুঁজুর তা আছে। কিন্তু বিধবার সম্পত্তি কি আর থাকবে? কে হয়ত ঠকিয়ে সব হাত করে নেবে।

সত্যিই মুশকিলে পড়ে গেলাম। রাত এখন শেষ হয়ে আসছে। ভোর হলেই বেলমোতিয়ার জীবনে নতুন করে নতুন সমস্যা দেখা দেবে। কাল আবার সূর্য উঠবে পৃথিবীতে। আবার সংসার কড়ায় গণ্ডায় তার পাওনা আদায় করে নেবে। সংসার তার নিজের নিয়মেই চলবে। কে এল কে গেল, কে মরলো কে বাঁচলো তা দেখবার দায়-দায়িত্ব তার নেই। তখন কোথায় থাকবে এই কুন্দনলাল আর কোথায় থাকবে এই বেলমোতিয়া তাও কেউ খোঁজ রাখবার সময় পাবে না। আর আমি? আমিই বা কোথায় থাকবো বা থাকবো কি না তা-ই বা কে বলতে পারে। আমি এসে ছিলাম নিপানিয়াতে দুদিন বিশ্রাম করতে। এই দুদিনের মধ্যেই মহাকালের আমোদ-লীলা চোখের সামনে দেখে গেলাম। এইটেই আমার পরম লাভ বলে মনে হলো। এর বেশি কিছু চাইবারও যেন রইল না তখন। তখন মনে হলো এর বেশি যেন কিছু চাইতে নেইও।

ধনীরাম আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি যাবার আগে একটা কিছু বিহিত করে দিয়ে যান হুঁজুর—

কিন্তু আমি বিহিত করার কে? আমার নিজের ব্যাপারই বা কে বিহিত করে?

তা অত কথা ভাববার সময় ছিল না তখন।

তখন বেশ সকাল হয়েছে। বেশ স্পষ্ট মুখটা দেখতে পেলাম বেলমোতিয়ার। চরম শোকের ছাপ তখনও লেগে আছে কচি মুখখানার ওপর। আমার দৃষ্টিটা লক্ষ্য করেই বোধহয় ময়লা মোটা হাতে-বোনা দেহাতী শাড়ির আঁচলটা দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে ফেললে।

আমি সান্ত্বনা দিতে গেলাম। বললাম—তুমি ভেবনা বেলমোতিয়া, তোমার একটা কিছু ব্যবস্থা করে তবে আমি যাবো—

ধনীরামও বেলমোতিয়াকে বুঝিয়ে বললে—হুঁজুর আমাদের রেলের বড় অফিসার, তোর একটা ব্যবস্থা করে যাবেনই—

তখন শ্মশানে আস্তে আস্তে আরো কয়েকটা মৃতদেহ আসতে শুরু করেছে। গত রাত্রের অন্ধকারে যে শোক উত্তাল-উদ্দাম হয়ে সমস্ত শ্মশান-ভূমিকে আলোড়িত করে তুলেছিল, এখন দিনের আলোর রুক্ষতার স্পর্শ পেয়ে তা যেন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল। আমি আর ধনীরামরা মিলে বেলমোতিয়াকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। খাঁ খাঁ করা বাড়ি, বাড়িটার মধ্যে ঢুকেই বেলমোতিয়া আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আশেপাশে প্রতিবেশীদের কয়েকজন এল। তাদের বলে এলাম বেলমোতিয়ার দেখা শোনা করতে। তারপর কুন্দনলালকে নিয়ে হরবনস্‌লালের বাড়ি চলে এলাম।

সেখানেও সেই একই শোক, একই শূন্যতা!

কুন্দনলাল বাড়িতে ঢুকেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো—সাহেব আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না হুঁজুর, আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

কী মুশকিল! আমি বললাম—আমার সঙ্গে তুই কোথায় যাবি কুন্দনলাল! আমার নিজেরই কি থাকবার বাঁধা ঠাই আছে? আমার যে বদলির চাকরি।

কুন্দনলাল বললে—আমি আপনার সঙ্গে থাকবো হুঁজুর, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাবো।

ছোট ছেলে। সে বোঝে না যে আমি তার কেউ নই। সব বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই তো সারা জীবন আমি ছটফট করে ঘুরে বেড়াই।

তবু কিছুতেই কুন্দনলাল আমার কথা শোনে না। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে রইল।

শেষে একটা মতলব বার করলাম।

সেই দিনই বিকেলবেলা কুন্দনলালকে নিয়ে গেলাম বেলমোতিয়ার বাড়িতে। বেলমোতিয়ারও তখন সেই অবস্থা। সেও সারাদিন কিছু রান্না করে নি, খায়নি, জল স্পর্শ করেনি। পাড়ার লোক যারা এসেছিল তারা বললে—সারাদিন কেবল কেঁদেছে হুঁজুর, আমাদের কথা মোটে শোনেনি—

আমি বেলমোতিয়ার কাছে গিয়ে বসলাম।

বললাম—আমার একটা কথা রাখো বেলমোতিয়া, তোমারও কেউ নেই কুন্দনলালেরও কেউ নেই—এক বাপ ছিল, তাও গিয়েছে। আমি বলি কুন্দনলালকে তুমি নিজের ছেলের মত মানুষ করো—ছেলে থাকলে তুমি তো আর মরতে পারবে না। মনে করে নাও না যে কুন্দনলাল তোমার ছেলে—

পাশে দাঁড়িয়ে যারা শুনছিল তারাও কথাটা সমর্থন করলে।

প্রস্তাবটা সকলেরই বেশ মনঃপুত হলো বলে মনে হলো!

বললাম—কুন্দনলাল নিজের বাপকে হারিয়েছে, মনে করো না দুখমোচনই ওর বাপ ছিল—তুমিই ওর মা! মায়ে ছেলেতে মিলে আবার তোমরা দুজনে মাথা তুলে বাঁচবার চেষ্টা করো না—মিছিমিছি কেঁদে কী করবে? যে গেল সে তো আর হাজার কাঁদলেও ফিরবে না। এমনি করেই তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এমনি করেই সবাই বেঁচে আছে। সংসারে একটা লোক দেখাও দিকিনি যে কোনও শোক পায় নি?

এসব ছেঁদো কথাতে কাজ হয় না জানি। তবে শোকের সময় এই কথাই বলতে হয়। এই কথা বলাই নিয়ম।

সেই ব্যবস্থাই সবাই স্বীকার করে নিলে সেদিন। সেদিন থেকে কুন্দনলাল বেলমোতিয়ার সেই ছেলে হয়েই কাটাতে লাগলো। যে-কদিন ছিলাম নিপানিয়াতে দু'জনের সেই সম্পর্ক পাতিয়ে চলে এসেছিলাম।

এরপর কয়েক বছরের মধ্যে আমার জীবনের ওপর দিয়ে যেন কালবৈশাখী ঝড় বয়ে গেল। সাত বছরে সাত জায়গায় বদলি হলাম। বিলাসপুর থেকে খড়্গপুর। খড়্গপুর থেকে ওয়ালটেয়ার। ওয়ালটেয়ার থেকে খুরদা রোড। খুরদা রোড থেকে কলকাতা। আবার ঘুরে ফিরে কলকাতা থেকে সেই বিলাসপুর।

বিলাসপুরে এসে হঠাৎ একদিন দেখি, লেভেল-ক্রসিং এর গেট-এ সবুজ-পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুন্দনলাল। ঠিক যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতো হরনন্দলাল।

আমি ট্রলী করে যাচ্ছিলাম। কুন্দনলালকে দেখে থেমে গেলাম।

কুন্দনলালও আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমাকে দেখেই সেলাম করলে সে।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমিই কুন্দনলাল না?

কুন্দনলাল বললে—হাঁ হুজুর, হ্যারিস সাহেবকে ধরে আমি আমার বাপের জায়গায় নোকরি পেয়েছি—

—তোমার দেশের খবর কী? নিপানিয়ায় জমি-জমা সব কে দেখছে?

—হুঁজুর, গেল বছর গরমিতে ক্ষেতি খামার সব শুকিয়ে গেল, তাই দেশ ছেড়ে চলে এসেছি, এবার ছুটী পেলে আবার জমি-জমা দেখতে যাবো।

তখন বলি-বলি করেও কথাটা বলতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল। শেষকালে আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করে ফেললাম—আর বেলমোতিয়া ?

কুন্দনলাল বললে—ওই তো—

বলে আমাকে তার গুমটি ঘরটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

দেখলাম ছোট গোল ছাদ-ওয়ালা গুমটি ঘরের সামনে ছেলে কোলে একটা বউ দাঁড়িয়ে আছে। চিনতে পারলাম না ঠিক।

কুন্দনলালই আমাকে সঙ্গে করে গুমটি ঘরের সামনে নিয়ে গেল। এই কি সেই বেলমোতিয়া ? কিছুতেই চিনতে পারলাম না। মাথার সিঁথিতে তেল-সিঁদুর লেগে রয়েছে। আমি কিছুতেই সেদিনকার সেই পুরোন বেলমোতিয়াকে তার মধ্যে খুঁজে পেলাম না। তার ওপর মাথায় সিঁদুর। তবে কি বেলমোতিয়া আবার বিয়ে করেছে ! যে একদিন মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় উঠে 'সতী' হতে চেয়েছিল সে আবার বিয়ে করলো নাকি শেষ পর্যন্ত ? কাকে ?

আমি বোধহয় মনের বিস্ময় আর চেপে রাখতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করে ফেললাম—তোমার কি আবার বিয়ে হয়েছে নাকি বেলমোতিয়া ?

মনে মনে সত্যিই খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, যাক্, বেলমোতিয়া যে তার দুখমোচনকে ভুলতে পেরেছে, সেটা ভালোই হয়েছে। কারণ ভুলে যাওয়াটাই তো স্বাস্থ্যকর।

কুন্দনলালই কিন্তু আমার ভুলটা ভেঙে দিলে।

বললে—না হুঁজুর, সাদি করতাম না আমরা। কিন্তু আমাদের ওই ছেলেটা হবার পরই নিপানিয়ায় সব লোক আমাদের একঘরে করে দিলে, ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিলে, তাই সাদি করে ফেললাম। বেলমোতিয়া নিজে তাকে সাদি করে নিতে বললে।

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। দেখলাম কুন্দনলালও কথাটা বলে বেশ হাসছে। বেলমোতিয়াও একটু লজ্জার হাসি হেসে কোলের ছেলেটাকে নিয়ে নিচু হয়ে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। কাণ্ডটা দেখে আমি তখন এমন হতবাক হয়ে গিয়েছি যে, আশীর্বাদ করার সহজ কথাটাও যেন একেবারে ভুলে গেলাম। তখন আমি হাঁ করে শুধু বেলমোতিয়ার মুখের দিকে নিস্পন্দ হয়ে দেখছি।

শূন্য

আমাদের পাড়ার ফটিক পাগলার হঠাৎ একত্রিশ বছর বয়েসে পাগলামি সেরে গেল। অর্থাৎ সে একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক ভাল মানুষ হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে তাকে দেখে আসছি আমরা। আমরা তাকে পাগল বলেই জানতুম। ফটিক পাগলা বলেই ডাকতুম তাকে। তাতে সে কিছু মনে করত না। বরং হাসত। হয়তো মনে মনে সে আমাদেরই পাগল ভাবত। কিন্তু হঠাৎ একত্রিশ বছর বয়েসে সে যে ভাল হয়ে যাবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি।

কিন্তু ফটিক পাগলা ভাল না হলেই বোধ হয় ভাল হত।

ফটিক পাগলা বলত, আপনারা হাসছেন বটে দাদা, কিন্তু দেখবেন একদিন ফটিক পাগলা যা বলে তাই-ই ফলে যাবে—তখন আপনাদের কাঁদতে হবে।

ফটিকের অদ্ভুত স্বভাব ছিল। আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানে সকাল বেলার দিকে আমরা সবাই জড়ো হতুম। নিতাই ঘোষের চায়ের দোকানে ছিল আমাদের নিত্যকারের আড্ডা। সকালবেলা একবার দোকানে না গেলে দিনটা জমত না ঠিক। নিতাই-এর হাতের চা না খেলে আমাদের সকালটা মাটি হয়ে যেত। বাজারের থলিটা নিয়ে আমার মত আরো কয়েকজন ছিল নিতাই-এর নিত্যকারের খদ্দের। ওই শুধু এক কাপ চা। আর কিছু নয়। বেগুনি-ফুলুরি-আলুর চপ অবশ্য ভাজত নিতাই। কিন্তু সেদিকে আমাদের কোনো লোভ ছিল না। ওগুলো ছোটবেলায় খেতুম। তারপর বড় হয়ে শুধু চা।

এখানেই এসে জুটত ফটিক পাগলা।

পাগলা ফটিক ঠিক পুরোপুরি পাগল নয়। কেমন ক্ষেপাটে মতন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাজারের থলিটা নিয়ে এসে বসত দোকানে। কাপের পর কাপ চা খেত। তারপর নটা-দশটা বাজবার পর বাজার করে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

ফটিক বলত, দুনিয়াটাই মিথ্যে দাদা, শুধু দু দিনের মায়া!

আমরা বলতাম, কেন ফটিক, মায়া বলছ কেন?

ফটিক বলত, মায়া নয়? এই যে আপনারা বিয়ে-থা করেছেন, ছেলেপুলে হয়েছে, ভাবছেন বেশ সুখে আছেন! কিন্তু ভাবুন তো একবার শেষ দিনকার কথাটা? যখন সবাই পড়ে থাকবে, আর আপনি খাটে চড়ে শ্মশানে যাবেন—

শ্মশানটা আমাদের চায়ের দোকানের কাছেই ছিল। সামনে দিয়ে দিন-রাত

মড়া নিয়ে যেত লোকেরা। সামনে চওড়া রাস্তা। আমরা দোকানের ভাঙা বেঞ্চিতে বসে সব স্পষ্ট দেখতে পেতাম। রাস্তা দিয়ে লোকজন চলেছে, মটরগাড়ি, রিক্শা, ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। ভোর থেকেই এ রাস্তায় ভিড় হয়ে যেত। সারা গঞ্জের লোকের বাজার-অফিস-কোর্ট-কাছারি সব এই রাস্তাতেই করতে হয়। উকীলের দল এই রাস্তাতেই কাছারিতে যায়, ব্যাপারীরা এই রাস্তা দিয়েই গঞ্জে যায়। ছেলে-মেয়েরা এই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়।

আমরা বসে বসে কজন চা খেতাম আর বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে লোক দেখতাম।

পাগলা ফটিক হঠাৎ বলে উঠত, অত বাহার ভাল নয় গো!

কথাটা কাকে লক্ষ্য করে সে বলছে দেখতে গিয়ে নজরে পড়ল একটি মহিলা বেশ সেজে-গুজে চলেছে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। এখানকার মেয়ে-স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্। নতুন এসেছে।

পাগলা ফটিকের কথায় আমরা একটু লজ্জা পেলাম। কথাটা জোরেই বলেছিল ফটিক। কিন্তু যদি শুনতে পেত? যদি হেডমিস্ট্রেসের কানে যেত কথাটা?

বললাম, ছিঃ, তোমার আক্কেল নেই ফটিক, অত জোরে বলতে আছে?

পাগলা ফটিকের বিকার নেই।

বলত, কেন বলব না দাদা? ভাবছেন, ওই সব সাজ-গোজ থাকবে? একদিন তো এই রাস্তা দিয়েই শ্মশানে যেতে হবে, সেটা মনে থাকে না?

আমরা বলতাম, সে তো সবাই যাবে, একদিন সবাইকেই তো যেতে হবে, তা বলে এখন থেকে কাঁদতে বসব নাকি?

ফটিক বলত, কাঁদতে বলছি না দাদা, না কেঁদেও তো থাকা যায়! এই আমাকেই দেখুন না, আমি সাজ-গোজ করতে পারি না? আমি সিল্কের জামা, কাঁচি ধুতি, বার্নিশ করা লপেটা জুতো পরতে পারি না?

আমরা বলতাম, তা পরো না কেন?

সত্যিই ফটিকের বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিল। এই চণ্ডীতলাতেই দুখানা বাড়ি। তিন শ বিঘে ধান-জমি। পাকা বসতবাটি। ফটিক পাল বাপের এক ছেলে। ছেলেই সব সম্পত্তি পেয়েছে। তবু ছেঁড়া চটি, ছেঁড়া গেঞ্জি, আট হাতি ধুতি। অথচ ফটিক পালকে কৃপণ-কঞ্জুষ বলা চলবে না। দান-ধ্যান আছে। বন্ধু-বান্ধবদের পেছনে খরচ করে। এই নিতাইএর দোকানে বসেই কেউ কিছু খেতে চাইলে কখনও নিরাশ করে না।

ফটিক পাল বলে, দাও না গো নিতাই, তোমার দোকানে কী আছে বাবুদের দাও না।

নিতাই ঢালাও সবাইকে দিয়ে যায়। তেলেভাজা নিমকি সিঙাড়া কচুরি গরম-গরম সকলের প্লেটে দিয়ে যায়। যে যত খেতে পারে, যে যত চায়।

ফটিক বলে, আর কী নিবি রে, আর কে কী খাবি বল্ না, লজ্জা করিস নে—

এত খরচ করে এত খাইয়ে-দাইয়েও ফটিক পাল ফটিক পাগলা হয়েই ছিল। তা নিয়ে কখনও রাগ করত না ফটিক পাগলা।

ফটিক পাগলা বলত, সত্যিকারের পাগল হলে তো বেঁচে যেতুম দাদা, তেমন ভাগ্য কি কপালে আছে? পাগলা আর হতে পারলুম কই ভোলা শিবের মত?

তা ভোলা শিবই বলা যায় ফটিক পালকে। একেবারে ভোলা মহেশ্বর। কিন্তু এই ভোলা মহেশ্বরই একদিন একত্রিশ বছর বয়েসে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি বদলে গেল।

কেন বদলে গেল ফটিক পাগলা, সেই কাহিনীটাই বলছি।

নিতাইএর চায়ের দোকানেই ছিল আমাদের সকাল বেলাকার নিয়মিত আড্ডা। আমরা যে-যার কাজে যাবার আগে এক ঝোঁক দোকানের বেঞ্চিতে বসে তবে যেতাম। ফটিকও আসত। কাপের পর কাপ চা খেত। আর হঠাৎ যদি সামনে দিয়ে 'বল হরি হরি বোল' বলে চিৎকার করতে করতে শ্মশানযাত্রীর দল যেত তো ফটিক পাগলা উঠে পড়ত। তখন আর তাকে আটকে রাখা যেত না। বলত—উঠি ভাই!

এই এক নেশা ছিল ফটিক পাগলার। মড়া গেলেই পেছু নেবে। অচেনা লোকদের দলে ভিড়ে যাবে। তারপর তাদের সঙ্গে ভাব করবে। জিজ্ঞেস করবে—কোত্থেকে আসছেন দাদারা?

কেউ আসে পশ্চিমপাড়া থেকে, কেউ শিমুলতলা থেকে, কেউ ফতেপুর থেকে। আশেপাশের বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে এই চণ্ডীতলার শ্মশানই সকলের একমাত্র ভরসা। অনেক দূর দূর থেকে মড়া নিয়ে আসে তারা। তাদের দলে ভিড়ে পড়বে ফটিক পাগলা। তাদের বিড়ি-সিগারেট খাওয়াবে। চা-বিস্কুট খাওয়াবে। তার পর তাদের সঙ্গেই ঘাটে বসে আড্ডা জমাবে। তাদের জিজ্ঞেস করবে—কোথা থেকে আসছে তারা, কী অসুখ হয়েছিল, কোন্ ডাক্তারে দেখছিল। তারপর যখন চিতায় তোলবার সময় হবে তখন বলবে—একবার হাতটা এঁর দেখব দাদা?

—কার হাত ?

—এই এঁর।

তা হাত দেখতে আর আপত্তি হবে কেন তাদের ? তারা আপত্তি করে না কেউই। ফটিক পাগলা আস্তে আস্তে খুব যত্ন করে মড়ার ডান হাতটা নিয়ে চিৎ করে হাতের পাতাটা দেখে। নিজের ডান হাতের পাতা দিয়ে মড়ার হাতের পাতাটা চিতিয়ে দেয়। তার পর নিবিষ্ট মনে হাতের রেখাগুলো দেখে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে দেখে। আর নিজের মনে-মনেই কী যেন মিলিয়ে নেয়।

লোকগুলো অবাক হয়ে যায় কাণ্ড দেখে। বলে—কী দেখছেন অমন করে ? ফটিক পাগলা হাত দেখতে দেখতেই বলে, দেখছি মিলছে কিনা।

—কী মিলছে ?

—এঁর আয়ু, আয়ুরেখাটা মিলিয়ে দেখছি ! মিলছে ঠিক।

বলে হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার পর আর সেখানে দাঁড়ায় না বলে—আসি দাদা, নমস্কার।

তার পর আবার এসে নিতাইএর দোকানে বসে ফটিক পাগলা। হাতটা ভাল করে ধুয়ে বলে, আর এক কাপ চা দাও নিতাই।

আমরা বলতাম, কী দেখলে ফটিক ? হাত দেখলে ?

ফটিক পাগলা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, হ্যাঁ, মিলে গেল, চৌষট্টি বছর তিন মাস তের দিন বয়েসে মৃত্যু লেখা রয়েছে হাতে, ঠিক মিলে গেল।

আমরা হাসতুম ফটিক পাগলার কথা শুনে। আমাদের হাসতে দেখে ফটিক পাগলা কিন্তু রাগত না। বলত—হাসছ তোমরা দাদা, হেসে নাও, কিন্তু এও তোমাদের বলে রাখছি, মিলতে বাধ্য, এ পর্যন্ত একটা কেস্‌ও মিথ্যে হয় নি, তা জান ?

ওই এক নেশা ছিল ফটিক পাগলার। মড়া দেখলেই পিছু নেবে, তার পর আয়ুরেখা দেখে মৃত্যুর বয়েসটা মিলিয়ে নেবে। ওই নেশাটার জন্যেই আসলে ফটিক পাগলা নিতাইএর দোকানে আসত, এসে চা নিয়ে বসত, আর রাস্তার দিকে চেয়ে থাকত। তার পর মড়া দেখলেই পেছু নিত !

বলতাম, এ নেশাটা ছাড়ো না ফটিক, লোকে কী ভাবে বল তো ? এই জন্যেই তো সবাই তোমাকে পাগল বলে !

ফটিকের সেই এক জবাব। বলত, পাগল হতে আর পারলুম কই দাদা, ভোলা শিবের মত পাগল হতে পারলে তো বেঁচেই যেতুম।

শুধু মড়ার হাত নয়। আমাদের হাত দেখেও সকলের আয়ু বলে দিয়েছিল ফটিক পাগলা। আমার আয়ু ছিল ফটিকের মতে পঁচাত্তর বছর এক মাস চোদ্দ দিন। যজ্ঞেশ্বরের আয়ু ছিল পঁয়ষট্টি বছর তের দিন। এমনি সকলেই আমরা হাত দেখিয়ে নিজের নিজের আয়ু জেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করি নি। হেসেছিলুম শুধু ফটিক পাগলের পাগলামি দেখে। কিন্তু তাতে ফটিক পাগলার কিছু এসে যেত না। সেও আমাদের পাগলামি দেখে হাসত। বলত, তোমরা আজ হাসছ, কিন্তু একদিন কাঁদতে হবে, তখন আমার কথা মনে রেখো।

শুনে আমরা আরো হাসতুম। ফটিক পাগলার পাগলামি দেখে আমাদের মজার খোরাক আরও বেড়ে যেত!

আমরা জিজ্ঞেস করতুম, আর তুমি কদ্দিন বাঁচবে ফটিক? তোমার কদ্দিন আয়ু?

—আমার?

বলে ফটিক পাগলা আবার নিজের হাতের তেলোটা চিৎ করে নিজেই দেখত। বলত, আমার অল্পায়ু দাদা, আমি বেশী দিন বাঁচব না।

—তবু কদ্দিন শুনি?

ফটিক পাগলা বলত, বেশী দিন বাঁচব না বলেই তো আর বিয়ে-থা করলুম না। শেষে মিছিমিছি একটা অবলা মেয়েকে বিধবা করে যাব সে তো নয়।

—তবু বল না কদ্দিন? আমরা মিলিয়ে নেব!

ফটিকও হাসত। বলত, বেশ তা হলে মিলিয়ে নিও দাদা, ফটিক পালের ক্যালকুলেশান কখনও মিথ্যে হয় না। আমি ঠিক মরব উনিশ শো একান্ন সালের তেরোই জুন রাত্তিরে, তখন আমার বয়েস হবে একত্রিশ বছর একুশ দিন—

—কটার সময় মারা যাবে?

—রাত আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে, ঘড়ি দেখে সময় মিলিয়ে নিও, ফটিক পালের ক্যালকুলেশান কখনও মিথ্যে হয় নি আজ পর্যন্ত।

বলে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেত ফটিক পাগলা। ওই গম্ভীর চেহারা দেখলেই আমাদের কেমন ভারী হাসি পেত। আমরা তখন যত হাসতুম ফটিক পাগলা তত গম্ভীর হয়ে যেত।

তা করে উনিশ শো একান্ন সাল আসবে, ততদিনের কথা আমরা তখন আর বিশেষ ভাবতাম না। কিন্তু ফটিক পাগলার কথাগুলো শুনে আমাদের মজা লাগত। ফটিক পাগলা বলত, এ যদি সত্যি না হয় তো আমি আমার কান কেটে ফেলব, এই বলে রাখলুম দাদা, আমার ক্যালকুলেশান্ কখনও মিথ্যে হয় নি, হবেও না।

তার পর আমাদের তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্যে বলত, এই যে এতদিন ধরে আমি রিসার্চ করছি, এ কি বলতে চাও ওমনি-ওমনি? এতে আমার খাটুনি হয় না? না কি তোমরা মনে কর এটা ছেলেখেলা! ছেলেখেলার বয়েস আমার আর নেই, এইটে জেনে রেখে দাও।

তা সত্যি-সত্যিই ফটিক পাগলা নিজের মৃত্যু-তারিখটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত। নিজের বিধবা মাকেও বলেছিল। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী সকলকেই বলেছিল। বলতে গেলে সে তৈরিই হয়ে ছিল মৃত্যুর জন্যে। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে রেখেছিল। তার মা আর তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে গিয়েছিল। ফটিক বলত—সব ওরাই দেখা-শোনা করবে, ওরা জাল-জোচ্চোর নয়, আমি সাধু-মহারাজের হাত দেখেছি, অনেক দিন পরমায়ু—

একবার একটা কাণ্ড হয়েছিল।

সেদিনও মড়ার পেছন-পেছন গেছে ফটিক পাগলা। সকলের সঙ্গে ভাবটাব করেছে। চা-বিস্কুট খাইয়েছে, বিড়ি-সিগারেট বিলিয়েছে। তারপর যখন চিতেয় ওঠাবার সময় হয়েছে তখন বললে, দাদা একটা কথা বলব?

—কী বলুন?

—একবার হাতটা দেখব দাদা?

—কার হাত?

—এই এঁর, একবার আয়ুটা দেখতাম!

সকলেরই কেমন একটা কৌতূহল হল। তা দেখতে আর ক্ষতিটা কিসের। ফটিক মড়ার ডান হাতটা নিয়ে চিৎ করে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ফটিকের কপালের মাংস কুঁচকে উঠল। যেন এতদিনের সব বিদ্যে সব গবেষণা তার গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আবার দেখতে লাগল। তখনও বিকেল হয় নি পুরোপুরি। সেই পড়ন্ত আলোর দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতটা দেখতে লাগল।

লোকরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে, কী দেখছেন অমন করে?

ফটিক বললে, মিলছে না যে।

—মিলছে না মানে?

ফটিক বললে, এর তো পরমায়ু আছে এখনও, এ তো মরতে পারে না!

—বলছেন কী মশাই? ডাক্তার এসে দেখে ডেথ্-সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে যে—

—উঁহুঁ, না মরে নি, এ মরতে পারে না, এ মরলে আমার ক্যালকুলেশান মিথ্যে,

আমার রিসার্চ মিথ্যে—আমি হাত দেখা ছেড়ে দেব। আপনারা ডাক্তার ডাকুন... চণ্ডীতলায় ডাক্তার আছে ভাল, আমি ডেকে আনছি, টাকা আমি দেব, ফটিক পালের ক্যালকুলেশান মিথ্যে হয় না কখনও।

তা সত্যিই তাই হল। ফটিক পাগলের কথাই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত। চণ্ডীতলায় শ্মশানে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই এসে ভিড় করলে শ্মশানে। লোকে লোকারণ্য একেবারে। ছোট, সাত-আট বছরের ছেলেটা। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললে, এখনও লাইফ আছে শরীরে! ফটিক পাগলের তখন রোখ দেখে কে! সেই শ্মশানে চিৎকার করতে লাগল, ফটিক পালকে তোমরা পাগলা বল আর যাই বল তার ক্যালকুলেশান কখনও মিথ্যে হতে পারে না! ফটিক পালের ক্যালকুলেশান যদি মিথ্যে হয় তো এই পৃথিবীটাই মিথ্যে! ব্যোম কালী—

সত্যি-সত্যিই শেষ পর্যন্ত লোকগুলো আবার ফিরে গেল বাড়ি। সেই ছেলে তার পর অনেক বড় হল। বড় হবার পর ছেলের বাপ-মা ফটিক পাগলাকে আশীর্বাদ করে গেল চণ্ডীতলায় এসে। বললে, আপনি আমাদের যা উপকার করলেন ফটিকবাবু তা আমরা জীবনেও ভুলব না, আবার আমরা জীবন ফিরে পেলাম—আমরা আপনার কেনা হয়ে রইলাম।

ফটিক পাগলা বললে, এসব আমাকে বলে কোনও লাভ নেই দাদা, এসব আপনি এই অবিশ্বাসীদের বলুন, এদের একটু চৈতন্য হোক। আরে আমার ক্যালকুলেশন যদি মিথ্যেই হবে তো তার জন্যে আমি এত মেহনত করি? আমার কি সত্যি-সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

এসব আমাদের নিজের চোখে দেখা ঘটনা! এরপর থেকে চণ্ডীতলায় ফটিক পাগলার প্রতিপত্তি দেখে কে? সকলেই হাত দেখাতে আসে ফটিক পাগলার কাছে। দশ-বিশ ক্রোশ দূর দূর থেকে গাড়ি করে লোক আসে। আশী-নব্বুই বছরের বুড়ো-বুড়ীরা এসে ফটিক পাগলার কাছে হাত দেখাত। কবে মারা যাবে, কত দিন তাদের পরমায়ু। ফটিক পাগলাকে তারা পয়সা-টাকা সোনা-রূপো প্রণামী দিতে চাইত। ফটিক পাগলা জিভ কেটে দু হাত পেছিয়ে যেত। বলত, আরে ছি ছি, এ কী করছেন আপনারা? আপনাদের প্রণামী নিয়ে কি আমি পাতক হব বলতে চান? ছিঃ! ওসব দিতে হবে না আমাকে। আমিও তো একদিন মরব, আমাকেও তো সবাই খাটে করে চণ্ডীতলার শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবে, তখন? তখন ভগবানের কাছে কী জবাবদিহি করব বলুন তো?

তার পর ফটিক পাগলা এক মহা দার্শনিক হয়ে উঠতো।

বলত—আসলে ধন-দৌলত-ঐশ্বর্য-বিলাস যা কিছু বলুন সবই তো ছাড়তে হবে, তখন কেউ আপনার সঙ্গে যাবে না দাদা, সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে; তখন সব শূন্য।

তা যতদিন আমি চণ্ডীতলায় ছিলাম ততদিন এই অবস্থাই দেখে এসেছি। দিনে দিনে ফটিক পাগলার ভক্ত বাড়ছে। কিন্তু নিতাইএর দোকানে এসে বসে চা খাওয়া ছাড়ে নি। সকাল বেলা বাড়িতে হাজার লোক এলেও ফটিক পাগলা নিতাইএর দোকানে এসে বসত। আর মড়া দেখলেই পেছন পেছন শ্মশানে যেত। শ্মশানে গিয়ে সকলকে চা-বিস্কুট খাওয়াতো, বিড়ি সিগারেট খাওয়াতো আর মড়ার হাতের পাতাটা পরীক্ষা করে দেখত।

আমাদের অত মনে ছিল না। কবে ফটিকের মৃত্যুর তারিখটা বলেছিল সেসব আমাদের মনে থাকার কথাও নয়। দু-তিন দিন ধরে আর ফটিকের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। কী হল? এমন তো করে না!

আমরা গেলাম ফটিক পাগলার বাড়ি।

ফটিক ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। আমরা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে তার!

ফটিকের মুখে হাসি ফুটল সেই আগেকার মত। বললে, এবার দিন ঘনিয়ে এসেছে দাদা।

—সে কী! আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

ফটিক পাগলা বলে, নিয়তি কে খণ্ডাতে পারে দাদা? আর তো দেরি নেই আমার, চললুম!

কথাটা শুনে আরো অবাক হয়ে গেলাম।

ফটিক পাগলা বললে, তাই তো কাউকে আর বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছি না দাদা, তোমরা এলে তাই কথা বলছি। শেষ কটা দিন একটু ভগবানের নাম করি মনে মনে—

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে?

ফটিক বললে, কিছুই হয় নি, কিন্তু হবে—এই তো আর চার দিন! এই উনিশ শো একান্ন সাল পড়েছে তো, আজকে জুন মাসের ন তারিখ, তেরো তারিখ রাত আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে মরে যাব, তখন আমার বয়েস হবে একত্রিশ বছর একুশ দিন —আর চারটে দিন!

বললাম, কিন্তু এখনও তো অর-জারি কিছু নেই, এই চার দিনের মধ্যেই মারা যাবে কী করে ?

ফটিক বললে, নিয়তি কেন বাধ্যতে দাদা—কে নিয়তিকে আটকাতে পারে ? হয়তো রাত আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ভাত খাচ্ছি হঠাৎ গলায় ভাত আটকে দম কেটে মারা গেলাম। কিছু কি বলা যায় ? এর কি কোনও নিয়ম আছে ? নিয়মটা বার করতে পারলে তো ভগবান হয়ে যেতাম আমি।

বাইরে হাসি নি। কিন্তু মনে মনে সেদিন ফটিক পাগলার কথা শুনে হেসে-ছিলাম। আর চারটে দিন। দেখাই যাক না কী হয়। চারটে দিন আমরা যে কী অস্বস্তিতে কাটালাম ! শেষ পর্যন্ত যদি ফটিক পাগলার কথাই সত্যি-সত্যি ফলে যায় ? আর শুধু আমরাই নয়। চণ্ডীতলার আশেপাশের সব গাঁয়ের লোক এসে ফটিকের বাড়ির সামনে জড়ো হতে লাগল। ফটিকের বুড়ী মা চার দিন ধরে কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে উঠল। ফটিক পাগলা মার কান্না শুনে মাকে কিছু বলত না। আমাদের বলত, মা তো বুঝবে না দাদা, মরতে আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে !

আমরা বললাম, মরতে তোমার আনন্দ হচ্ছে নাকি ফটিক ? বলছ কী তুমি ?

ফটিক বললে, তা আনন্দ হবে না ?

—কেন, মরতে তোমার এত আনন্দ কীসের ?

ফটিক পাগলা বললে, আমি না মরলে যে আমার ক্যাল্‌কুলেশান্ মিথ্যে হয়ে যাবে দাদা ! এতদিন ধরে আমি রিসার্চ করেছি, এত মেহনত করেছি, তাহলে কীসের জন্যে ? সব কি ওমনি ওমনি ?

সত্যিই সে চার দিন আমাদের কারো অশান্তির শেষ ছিল না। আমরা ভোর বেলা উঠে ফটিক পাগলার বাড়িতে যেতাম। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে আবার যেতাম। তার পর সন্ধ্যেবেলাও আবার যেতাম। শুধু আমরা নই, চণ্ডীতলার সবাই। দেখতাম ফটিক পাগলা চুপ করে শুয়ে আছে। কিছু হয় নি তার। জ্বরও হয় নি, পেটের অসুখও হয় নি। এমন কি মাথাও ধরে নি। মারা যাবার আগে যা-যা লক্ষণ হয়ে থাকে তার কিছুই হয় নি, বেশ দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। খাচ্ছে-দাচ্ছে আর খাটের ওপর শুয়ে পড়ে আছে।

শেষকালে উনিশ শো একান্ন সালের তেরোই জুন এল। সকাল হল। দুপুর হল। বিকেল হল। সন্ধ্যে হল। রাত আটটা বাজল। সাড়ে আটটা বাজল। আটটা-পঁয়ত্রিশও হল। তার পর রাত নটা বাজল, দশটা বাজল···

গ্রামের লোক সব বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত চণ্ডীতলাটাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সময়ও যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওৎ পেতে আছে।

আমরা ফটিক পাগলার বিছানার কাছে ছিলাম।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বললাম, আর কী? এবার বিপদ কেটে গেছে ফটিক, এবার ওঠ, উঠে পড়…

কিন্তু ফটিক পাগলার চোখ দুটো দেখে চমকে উঠলুম। দেখি ছল-ছল করে উঠেছে। তার পর হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। বললে, আমার ক্যাল্‌কুলেশান্ যে মিলল না দাদা!

আমরা সে অবস্থায় আর কিছু বললুম না। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ফটিকের মার কান্না তখন থেমে গিয়েছে, কিন্তু ফটিক পাগলার কান্না আর যেন থামতে চায় না। আমারা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বাইরে এসে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলুম।

এর পর চণ্ডীতলায় আর বেশি দিন থাকা হয় নি। কিন্তু যতদিন ছিলাম ততদিন আর ফটিক পাগলাকে দেখতে পাই নি। ফটিক পাগলা সেই দিন থেকেই অন্যরকম মানুষ হয়ে গেল। আর রাস্তায় বেরোয় না। কারো সঙ্গে কথা বলে না। নিতাইএর চায়ের দোকানেও আর আসত না। মড়ার পেছন পেছন শ্মশানেও আর কখনও যেত না। কেউ বাড়িতে গেলেও দেখা করত না। বলত, ওসব মেলে না—

তার পর কয়েক বছর আগে একবার কদিনের জন্যে চণ্ডীতলায় গিয়েছিলাম। গিয়ে ফটিক পাগলাকে দেখে অবাক। দেখি দামী সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে, মাথার চুলে ঢেউ-খেলানো তেড়ির বাহার, পায়ে পাম্পশু, গায়ে ভুর-ভুর করছে সেন্টের গন্ধ। আমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। আমাকে যেন দেখেও দেখতে পেলে না। আমিও প্রথমে চিনতে পারি নি, নইলে আমিই ডেকে কথা বলতাম।

যজ্ঞেশ্বর বললে, ওকে আর ঘাঁটিও না ভাই, ও বিয়ে-থা করে একেবারে গোল্লায় গিয়েছে।

ফটক পাগলা বিয়ে করেছে শুনে অবাক হওয়ারই কথা। শুনলাম সেই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই নাকি বিয়ে করে ফেলেছিল ফটিক। দুটো ছেলেও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কারো সঙ্গে মেলা-মেশা করে না। নিতাইএর চায়ের দোকানেও আসে না আর। আর শুধু তাই নয়, চণ্ডীতলার বাজারে মেয়েমানুষ রেখেছে ভাল দেখে।

রাত্রে সেখানেই পড়ে থাকে। মদ আর মেয়েমানুষই নাকি এখন তার একমাত্র সঙ্গী। পুরোন লোক কেউ কিছু বলতে গেলেই ফটিক বলে, ওসব কিছু মেলে না!

কিন্তু সব শুনে আমার যেন কেমন মনে হল সব মেলে। ফটিক পাগলার জীবনের সব কিছু যেন হুবহু মিলে গেছে। তার ক্যালকুলেশান একটুকু মিথ্যে হয় নি, তার রিসার্চ ব্যর্থ হয় নি। তার মৃত্যুই হয়ে গেছে। একত্রিশ বছর একুশ দিন বয়েসে তার মৃত্যু হবে ফটিক বলেছিল, সেই দিনই তার মৃত্যু হয়েছে। তার অতদিনের ক্যালকুলেশান নিখুঁত ভাবে কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছে।

মানুষ

বহুদিন আগে বছর কয়েকের জন্যে একটা খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করেছিলাম। খবরের কাগজের চাকরি একটু আলাদা ধরনের চাকরি। পৃথিবীর নানা খবরের মধ্যে বসেও নিজেকে সেখানে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। অভিজ্ঞতাটা অভিনব। অন্ততঃ আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা পৃথিবীর মানুষ খবরের কাগজ পড়ে যে-স্বাদ পায়, যারা খবর তৈরি করে, মানে খবর লেখে, ছাপায়, সাজায় তারা সে-স্বাদ পায় না। রেলের অফিসের কেরানীর কাছে যেমন ফাইল, খবরের কাগজের সহ-সম্পাদকের কাছে খবরও ঠিক তাই।

এই খবরের কাগজের অফিসে চাকরির সূত্রেই দুর্গাপ্রসাদের কথা আমি প্রথম জানতে পারি।

অনেকদিন পরে আবার সেই দুর্গাপ্রসাদের সংবাদ পেলাম।

সেদিন আমাদেরই একজন সহকর্মী এসে হঠাৎ খবরটা দিলে।

—শুনেছেন কাণ্ড?

—কী কাণ্ড?

—আপনাদের সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভার দুর্গাপ্রসাদ তো এ্যারেস্টেড্ হয়েছে। একটা ছোট মেয়ের গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়েছিল।

খবরটা আমিও দেখলাম। ছোট খবর হলেও আমার কাছে খবরটার গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। কারণ একদিন এই দুর্গাপ্রসাদেরই একটা খবর আমি খুব বড়

করে ছাপিয়েছিলাম আমাদের কাগজে। এবং সামনের পাতায় তার খবরটা দিয়ে ওপরে তার চেহারায় একটা ব্লকও ছাপিয়ে দিয়েছিলাম।

ঘটনাটা আমাকে বড় ভাবিয়ে তুললো। শেষকালে দুর্গাপ্রসাদ কিনা এই রকম একটা চুরির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লো।

আসলে কিন্তু আমি দুর্গাপ্রসাদকে চিনতামই না। দুর্গাপ্রসাদ যে আমাদের পাড়াতেই থাকতো তাও জানতাম না। দুর্গাপ্রসাদ এই কলকাতা সহরেই ট্যাক্সি চালাতো। আর পাঁচজন ট্যাক্সিওয়ালার মত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দিনে পাঁচ-দশ টাকা উপায় করতো।

কচিৎ কদাচিৎ আমার সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদের রাস্তায় দেখা হয়েছে। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার থাকলে এক হাত তুলে নমস্কার করেছে। আর যখন প্যাসেঞ্জার থাকতো না তখন আমার পাশে এসে গাড়িটা থামিয়েছে।

বলেছে—কোথাও যাবেন নাকি স্যার?

বলতাম—না তুমি যাও, আমি ট্রামেই যাবো—

রোজ রোজ ট্যাক্সি করে অফিসে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না বলে যে তার ট্যাক্সিতে চড়তাম না তা নয়। চড়তাম না এই কারণে যে দুর্গাপ্রসাদ আমার কাছ থেকে ট্যাক্সির ভাড়া নেবে না। অথচ ভাড়া না নেবার মত অবস্থা নয় দুর্গাপ্রসাদের।

দুর্গাপ্রসাদ ট্যাক্সি চালালেও নিজে ম্যাট্রিক পাশ। থার্ড ডিভিশন হলেও পাশ তো। সুতরাং ঠিক অন্য ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে নিজেকে সমগোত্রীয় ভাবতে পারতো না। দুর্গাপ্রসাদ ট্যাক্সি চালাতো বলে একটু দুঃখ ছিল তার মনে।

বলতো—দাদা, সেই যদি ট্যাক্সিই চালাবো তো তখন লেখা-পড়া শিখে টাকা আর সময় নষ্ট করলাম কেন কে জানে।

বললাম—লেখা-পড়া শিখে ভালোই তো করেছ দুর্গাপ্রসাদ, লেখা-পড়া লোকে করে কি শুধু টাকার জন্যে? লেখা-পড়ার অন্য দাম—

তা দুঃখ করবার কারণ তার ছিল বৈ কি! আমাদের পাড়ার কাছে একটা বস্তি-বাড়িতে দুর্গাপ্রসাদ থাকতো। বউ ছেলে-মেয়ে-মা-বাপ নিয়ে বড় কষ্টে দিন কাটাতো। দিন দিন জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছিল, কিন্তু আয় বাড়ছিল না। আর সেই সমস্তটা পরিবারকে ভরণ-পোষণ করবার জন্যে সে পরিশ্রম করতো গাধার মতন। আগে ভোর বেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেত, দুপুর দু'টোর সময় একবার বাড়িতে খেতে আসতো। শেষের দিকে আর তাও আসতো না। রাস্তাতেই কোনও হোটেলে রুটি-মাংস খেয়ে নিয়ে আবার ষ্টিয়ারিং ধরতো। এমনি করে

উদয়াস্ত খাটুনি খেটে যে-কটা টাকা রোজগার করতো তাতেই কোনও রকমে দু'বেলা দু'মুঠো জুটতো।

অবস্থা যখন তার এই রকম ঠিক সেই সময়েই আমার সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদের পরিচয় হলো।

আমাদের অফিসের একজন রিপোর্টার একদিন একজন মার্চেন্ট অফিসের এক সাহেবকে আমার কাছে নিয়ে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কী ব্যাপার?

বুঝেছিলাম যে একটা কিছু খবর ছাপানোর ব্যাপার নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা যে দুর্গাপ্রসাদ সংক্রান্ত তা বুঝতে পারিনি।

বেশ অবস্থাপন্ন সাহেব। খাস বিলিতি জাত। গায়ে এখনও বিলিতি গন্ধ কাটেনি।

ব্যাপারটা সব বিশদভাবে শুনলাম। সাহেব ডুমডুম এয়ার পোর্ট থেকে দুর্গাপ্রসাদের ট্যাক্সিতে আসছিলেন। এসে ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যথারীতি নেমে যান। রাত তখন প্রায় বারোটা। বোধহয় হুইস্কির নেশাটা মগজে একটু বেশি জোরদার হয়ে গিয়েছিল, তাই তখন আর খেয়াল ছিল না যে সঙ্গের মালপত্র ঠিকমত নামানো হলো কি হলো না। আর দুর্গাপ্রসাদও তাই অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে পারেনি।

তারপরে দুর্গাপ্রসাদ আর ভাড়া খাটেনি। খালি ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গ্যারাজে তুলে দিয়েছে।

পরদিন গ্যারাজের চাবি খুলে গাড়ি বার করতে গিয়েই প্রথম নজরে পড়লো। পেছনের সীটের এক কোণে একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ পড়ে আছে। বাহারে দামী হ্যাণ্ড ব্যাগ। বিলিতি চামড়ার তৈরি।

কী কৌতূহল হলো দুর্গাপ্রসাদের। মুখটা খুলে ফেললে। আর তারপরেই নজর পড়লো ভেতরের জিনিসপত্রগুলোর দিকে।

মিস্টার হপ্‌কিনস্ বললেন—তার ভেতরে আশি হাজার টাকার ভ্যালুয়েবল্ জিনিস ছিল, ইনক্লুডিং ক্যাশ্ এ্যাণ্ড কাইণ্ড্—আমার ওয়াইফের পার্ল নেকলেস ছিল তারই দাম প্রায় পনেরো হাজার টাকা, তা ছাড়া ছিল একটা আসল আইভরির ফাউন্টেন পেন। পরের দিন ভোরবেলা এই ট্যাক্সি-ড্রাইভারই আমার সব জিনিস ইনট্যাক্ট অবস্থায় ফেরত দিয়ে গেল—

দুর্গাপ্রসাদ পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি চেয়ে দেখলাম তার দিকে।

দুর্গাপ্রসাদকে সেই-ই আমি প্রথম দেখলাম। রোগা চেহারা দাঁতগুলো বড় বড় : মুখখানা সরলতায় মাখা।

মিস্টার হপ্‌কিনস্ বললেন—আমি ওকে ফাইভ হান্‌ড্রেস্ চিপস্ বখশিস দিতে চাইছি কিন্তু ও কিছুতেই নিতে চাইছে না—

আমি দুর্গাপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললাম—কেন, নিচ্ছ না কেন টাকা? সাহেব তো তোমাকে খুশী হয়ে বখশিস দিচ্ছে—

দুর্গাপ্রসাদ বলেছিল—হুজুর, ও আমি নিতে পারবো না। ভগবান ওঁর জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমি কে? ওই পাঁচশো টাকা নিয়ে কি আমার দুঃখ ঘুচবে? একমাত্র ভগবান ছাড়া আমার দুঃখ কেউ ঘোচাতে পারবে না।

আমি সেদিন দুর্গাপ্রসাদের মত একজন গরীব ট্যাক্সি ড্রাইভারের মহত্ব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

দুর্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার বাড়ি কোথায়?

দুর্গাপ্রসাদ বললে—বিহারের আরা জিলায়,—

—এখানে কলকাতায় কোথায় থাকো?

দুর্গাপ্রসাদ যে ঠিকানা বললে সেটা আমার পাড়া। আমি অবাক হয়ে গেলাম। খবর নিয়ে জানলাম বাড়িতে বাপ-মা-বউ-ছেলে-মেয়ে সবাই আছে। পাঁচজনের মত তারও অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কিন্তু অত অভাবের মধ্যেও যে সে সততা বজায় রাখতে পেরেছে এটা খুবই প্রশংসার।

রিপোর্টার বন্ধুটি বললে—মিস্টার হপ্‌কিন্সের ইচ্ছে যে এই রকম অনেষ্ট ট্যাক্সি ড্রাইভারের সততা সম্বন্ধে এই খবরটা আমাদের পেপারে ছাপালে ভাল হয়। তাতে অন্য লোকের একটা শিক্ষা হবে। পাবলিকের ধারণা এ যুগে মানুষের মর্যাল্‌স্ নষ্ট হয়ে গেছে, এ-ঘটনায় সে-ধারণা অন্ততঃ কিছুটা বদলাবে।

আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা ভাববার মত।

তখনই ফোটোগ্রাফার ডাকিয়ে দুর্গাপ্রসাদের একটা ছবি তুলিয়ে নিলাম। সেই ছবি ব্লক্ করে একটা নিউজ্ করে আমাদের কাগজের একেবারে সামনের পাতায় প্রথম কলমে ছাপিয়ে দিলাম। খবরটা বক্স করে ছাপানোর জন্যে বহু পাঠকের নজরে পড়লো। এবং প্রচুর চিঠিও এল দুর্গাপ্রসাদকে প্রশংসা করে। আমি আবার সেই সমস্ত চিঠি তার বাড়ির ঠিকানায় পিওন দিয়ে পাঠিয়েও দিলাম।

এর পর থেকেই দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার বাড়লো।

একদিন দুর্গাপ্রসাদ আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাপ-মা-বউ সকলের সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিলে। চা খেতে দিলে। দুর্গাপ্রসাদের ছেলে-মেয়েদের দেখলাম। কত দারিদ্র্যের চিহ্ন তাদের সকলের মুখে চোখে। বাড়িটাও ঠিক বাড়ি নয়। একটা তক্তপোষের দোকানের পেছন দিকে একখানা খুপ্‌রি ঘর। রাত্রে বাপ-মা ওই তক্তপোষের ওপরেই শুয়ে কাটায়। আর সকাল হলে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢোকে। দেখছিলাম আর ভাবছিলাম এই দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েও দুর্গাপ্রসাদ এত নির্লোভ হতে শিখলো কেমন করে? কে তাকে এই শক্তি দিলে? ভগবানের ওপর এই অচল অগাধ বিশ্বাসের শক্তি?

এই হলো সেদিনকার সেই দুর্গাপ্রসাদ!

এর পর দেখা হয়েছে মাঝে মাঝে। দেখা হলে আগের মতই আমাকে হাত তুলে নমস্কার করেছে। ট্যাক্সি চাই কিনা জিজ্ঞাসা করেছে।

কিন্তু দেখে আনন্দ হতো দুর্গাপ্রসাদের চেহারা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। স্বাস্থ্যের মধ্যে জৌলুষের ছাপ পড়েছে। গায়ে ভাল জামা কাপড় উঠেছে। সিগারেটও খেতে দেখেছি মাঝে মাঝে।

কিন্তু তাতে দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমার ধারণার কোনও ইতর-বিশেষ হয়নি। বরং আনন্দই হয়েছে এই ভেবে যে সৎপথে থেকে দুর্গাপ্রসাদ নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে।

একদিন দুর্গাপ্রসাদ দেখা করে বললে—দাদা, আপনি শুনে খুশী হবেন জেনে আমি একটা জমি কিনেছি—

খুব আনন্দ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় কিনলে?

—দাদা লেক্ গার্ডেনস্-এ!

—কত করে কাঠা পড়লো?

—আটশো টাকা। বেশি টাকা আর কোথায় পাবো! না খেয়ে না পরে যে টাকাটা জমিয়েছি সেইটে দিয়েই দেড় কাঠা জমি কিনলুম।

দুর্গাপ্রসাদকে খুবই সাধুবাদ জানালাম।

এর পরে দুর্গাপ্রসাদ একটা থাকবার ঘরও তৈরি করিয়েছিল সেখানে। সে খবরও এসে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কিন্তু দেখতে যাওয়া হয়নি। জায়গাটা দূরে হয়ে যাওয়াতে যোগাযোগও কমে গিয়েছিল তার সঙ্গে। তবে এইটুকু অনুমান করে নিয়েছিলাম যে সে সুখে স্বচ্ছন্দে সুস্থ চিত্তে বহাল তবিয়তেই আছে

কিন্তু তার গ্রেফতার হওয়ার খবরে সত্যি সত্যিই চমকে উঠলাম।

যে বন্ধুটি খবর দিলে সে-ই বললে—আমাদের বাড়ির কাছে তো ওর বাড়ি, তাই ওর বুড়ো বাপ এসেছিল ওর জামিনের জন্যে বলতে—

বললাম—কিন্তু হঠাৎ চুরি করতে গেলই বা কেন ?

—তা জানি না মশাই, আপনার জানা-শোনা লোক বলেই খবরটা আপনাকে বললাম।

—তার তো নিজের বাড়ি আছে ?

—তা তো আছে। এখন সেটা একতলা করেছে এই ক'মাস হলো।

—ছেলে-মেয়ে বউ ?

বন্ধু বললে—তারাও আছে।

—তাহলে কি নেশা-ভাঙ ধরেছিল ইদানীং।

বন্ধু বললে—না তা তো জানিনা! শুনলাম একজন মহিলার সঙ্গে তার একটি ছোট মেয়ে ওর ট্যাক্সিতে উঠে গড়িয়া যাচ্ছিল। রাত দশটা তখন বেজে গেছে। মহিলাটি যখন ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নেমে গিয়েছে ঠিক সেই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ নাকি ছোট মেয়েটার গলার সোনার নেকলেসটা ছিনিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিয়ে পালাচ্ছিল—

জিনিসটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না আমার। যেদিন গরীব ছিল সেদিন অতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পেরেছিল দুর্গাপ্রসাদ, আর আজ অবস্থা ভালো হবার পর সামান্য একটা ছোট মেয়ের হারের ওপর নজর পড়বে ?

ক'দিন বড় দুশ্চিন্তায় কাটালাম। ছটফট করতে লাগলাম অশান্তির তাড়নায়। মনে হলো দুর্গাপ্রসাদের এই দুর্ঘটনা যেন আমার নিজের জীবনেরই দুর্ঘটনা। দুর্গাপ্রসাদ যেন আমার বিশ্বাসের মূলে গিয়ে আঘাত দিয়েছে। যেন আমার এতদিনের ধ্যান-ধারণা বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনার ভিত্ একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আমি আর থাকতে পারলাম না।

একদিন গেলাম দুর্গাপ্রসাদের নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখলাম বেশ একতলা একখানা বাড়ি। পাশেই একটা গ্যারেজ।

গিয়ে ডাকতেই দুর্গাপ্রসাদের বুড়ো বাপ বেরিয়ে এল।

সব কথা বলে কাঁদতে লাগলো বুড়ো মানুষটা। তারপরে দুর্গাপ্রসাদও বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে মাথা নিচু করে রইল।

বললাম—যা শুনছি সব সত্যি ?

কোনও উত্তর দিলে না দুর্গাপ্রসাদ।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কবে কেস উঠবে কোর্টে ?

—আসছে পনেরো তারিখে।

আমি দুর্গাপ্রসাদের সেই চুপ করে থাকা দেখে সব বুঝতে পারলাম ! মনে হলো নিজের কাছেই যেন সে নিজে অপরাধী। নিজের মুখের দিকেই সে নিজে তাকাতে পারছে না তো আমার মুখের দিকে সে তাকাবে কী করে ?

আমি বললাম—সেদিন তো আরো গরীব ছিলে তুমি দুর্গাপ্রসাদ, তখনই তোমার টাকার বেশি দরকার ছিল, সেদিন সেই আশি হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারলে আর আজ সামান্য একটা সোনার নেকলেসের লোভ সামলাতে পারলে না ? কেন এমন হলো বলো তো ? কিসের জন্যে এমন করতে গেলে ?

দুর্গাপ্রসাদ তেমনি করেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম—কী হলো, কথা বলো ? কথার উত্তর দাও ?

তবু দুর্গাপ্রসাদ চুপ।

আমি আর কোনও জবাব আদায় করতে পারলাম না তার মুখ থেকে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তার বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম।

তার পরেও খবর রেখেছি তার। মামলা হলো যথারীতি। যথারীতি দুর্গাপ্রসাদ পয়সা খরচ করে ভালো উকিলও দিলে। মাসের পর মাস দিন পড়তে লাগলো। শেষে একদিন রায়ও বেরোল।

রায়ে একদিন বে-কসুর খালাসও পেয়ে গেল দুর্গাপ্রসাদ।

কিন্তু সেই থেকে আমার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রইল না দুর্গাপ্রসাদের। মামলায় দুর্গাপ্রসাদের জেল হলেই আমি যেন খুশী হতাম। আর আমার মনে হয় দুর্গাপ্রসাদও বোধহয় খুশী হতো। যেমন অনেকে রেস খেলতে গিয়ে হেরে খুশী হয়।

ইণ্ডিয়া

খবরের কাগজে একবার এক খুনের খবর বেরিয়েছিল। কোথায় কোন্ দেশে এক নাপিত একজনের দাড়ি কামাতে কামাতে তার গলাটা কেটে নাকি ছু' ভাগ করে দিয়েছিল। মাঝে-মাঝে এ-ধরণের খবর না ছাপা হলে খবরের কাগজের বিক্রী কমে যায়। লোকে বলতে আরম্ভ করে—আজকাল খবরের কাগজওয়ালারা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, কিছু খবর দিচ্ছে না।

খবর শুধু শুকনো খবরই। যে খবর প্রতিদিন পৃথিবীর চারিদিকে ঘটছে, তার একটা ছোট ভগ্নাংশও খবরের কাগজে ছাপা সম্ভব নয়। এমন খবরও ছাপা হয়, যা ছাপা হওয়া উচিত কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কিছু-না-কিছু মুখ রোচক খবর চাই। নইলে খারাপ লাগে। হয় কোনও দেশের প্রেসিডেণ্টের উত্থান, নয় পতন, নয় ভূমিকম্পের মৃত্যু-তালিকা, নয় আরো এমন কিছু যা নিয়ে সারাদিন রোমন্থন করতে পারি। এ-ও একরকম নেশার মতন। চিউইংগামের মত, বা পান-সুপুরির মত এ নেশাও আমাদের প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সেদিনও একটা খুনের খবর কাগজে ছাপা হয়েছিল। যে-দেশে খুনটা হয়েছিল, তার নাম-ধামও কারোর জানা ছিল না আগে। হয় চায়না, নয় জাপান, নয় কিউবা, এমনি একটা কোনও জায়গার মধ্যে একটা অখ্যাত জনপদের ঘটনা। কিন্তু খুনটা মজার খুন বলেই কলকাতার লোকের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল সেটা।

পাটিল সাহেব বললেন—আমি একবার এই রকম একটা খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম মশাই—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—আপনি?

—হ্যাঁ আমি। তখন আমি ফিলম্ লাইনে আসিনি। আমার অবস্থাও তখন এ-রকম ছিল না, আমি তখন চাকরি করতাম! বললে অবাক হয়ে যাবেন আমি দশ বছর সার্ভিস করেছি, গভর্মেণ্ট জব্!

পাটিল সাহেব যে আবার কোনও দিন গভর্মেণ্ট চাকরি করেছেন, তা আমার জানা ছিল না। বোম্বেতে কারোরই জানা ছিল না। সবাই জানে পাটিল সাহেবকে ফিলিম্-ডাইরেক্টর বলে! শুধু ডাইরেক্টর নয়, প্রডিউসার। ছোটখাট প্রডিউসার নয়।

বড়-বড় দামী-দামী ছবি করেন পাটিল সাহেব। সে-ছবি ফার-ইস্টে যায়, ফিলিম্-ফেষ্টিভ্যালে যায়। পাটিল সাহেব নিজেও দল বল নিয়ে বার কয়েক কন্টিনেন্ট ঘুরে এসেছেন। বাড়ি করেন নি, কিন্তু গাড়ি করেছেন দু'খানা। বাড়ি ইচ্ছে করেই করেন নি। ইচ্ছে হলে এই বোম্বাইতেই পাঁচখানা ফ্ল্যাট কিনতে পারেন এমন ক্রেডিট্ আছে বাজারে।

—এখানে চাকরি করতাম না, করতাম কলকাতায়। তখন চাকরি করা ছাড়া আর কিছু যে করবার ক্ষমতাও ছিল না আমার। কোনও দিন যে ফিলিম্-এর ছবি তুলবো, প্রোডিউসার হবো তা কল্পনাও করিনি! আসলে এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লে হয়ত এই সিনেমার লাইনে আসতামই না—

পাটিল সাহেবের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বললেন—আপনি তো কলকাতার লোক, আপনাকে বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন। কলকাতার মত ন্যাষ্টি প্লেস, আমি আর কোনও শহর দেখিনি। আপনি হয়ত শুনে মনে দুঃখ পাবেন, কিন্তু আমার জীবনে সেই দশটা বছর একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে, জানি না, এ-ও হয়ত আমার দুর্ভাগ্য! আমার ভাগ্যেই যত সব খারাপ খারাপ লোক জুটে গিয়েছিল। তা-ও হতে পারে—আর সেইজন্যেই আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল—

গল্পটা হচ্ছিল পাটিল সাহেবের বাড়িতে বসে। প্যারেলের পুরোন মহল্লায় পুরোন একটা ফ্ল্যাট। ঘরের ভেতরে আর কেউ ছিল না। সারাদিন স্ক্রিপ্ট্ লেখার পর অ্যাসিস্টেন্ট্‌রা চলে গেছে যে যার বাড়িতে। আমিও চলে যাচ্ছিলাম আমার হোটেলে। কিন্তু ড্রাইভার ছিল না বলে আমাকে বসতে বললেন। বললেন—আপনি একটু বসুন, ড্রাইভারকে পাঠিয়েছি বাংলা পান আনতে মাতুঙ্গাতে, এখনি এসে পড়বে।

তারপর গ্লাস এল। সন্ধ্যেবেলা তিন-চার গ্লাস হুইস্কি খাওয়া নিয়ম পাটিল সাহেবের। এতে কেউ অবাক হয় না। বোম্বের প্রোহিবিশন শুধু নাম-কা ওয়াস্তে। মদ খাওয়া সরকারী ভাবে বে আইনী। কিন্তু ওটা সব বাড়িতেই ভেতরে ভেতরে চলে। ও-নিয়ে কথা তুলতে নেই। সেই দু'একবার চুমুক দিতে দিতেই পাটিল সাহেব যেন বেশ পাতলা হয়ে আসতে লাগলেন। আর তার পরেই খুনের কথাটা উঠলো।

বললেন—তাহলে শুনুন—

বলে মৌজ করে পাটিল সাহেব গল্প আরম্ভ করলেন।

আমার এক মামার কাছে থেকে তখন আমি পড়ি। মামা আমার ভারি স্ট্রিক্ট

লোক। ক্লাশ এইট্ পর্যন্ত পড়ে আমার পড়া শোনা হলো না আর। তারপর হয়ত অন্ত লোকে যা করে আমিও তাই করতাম—ভ্যাগ্যাব্যাণ্ডাইজিং। কিন্তু তা করতে হল না। মামার এক বন্ধুর সুপারিশে আমার একটা চাকরি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা মাইনে! গভর্নমেণ্ট অফিস। রোজ চাকরি করতে যাই। যাই আর আসি, আসি আর যাই। শেয়ালদ থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার। এই চাকরিতে যদি আমি টিঁকে থাকতুম তো যখন আমার পঞ্চান্ন বছর বয়স হতো, তখন গ্রেডটা গিয়ে দাঁড়াতো একশো নব্বুই টাকায়। এই টাকায় আমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে হতো, মেয়ের বিয়ে দিতে হতো, ডাক্তারের খরচ জোগাতে হতো—আরো অনেক কিছুই করতে হতো, যা সব ক্লার্ককেই করতে হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে দশ বছর চাকরি করবার পর আমি মুক্তি পেলুম। মুক্তি পেলুম ওই খুনের জন্যে—

—কী রকম?

পাটিল সাহেব বললেন—তখন আমার মামা মারা গেছে। আমার রিলেটিভ্ যারা ক্যালকাটায় ছিল, সবাই পুনায় চলে গেছে। আমি একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া করে থাকি শেয়ালদা' অঞ্চলে। আপনি তো জানেন, শেয়ালদা লোক্যালিটিটা কী ডার্টি জায়গা! আর ক্যালকাটার কোন্ জায়গাটাই বা ডার্টি নয় বলুন? বাঙালীরা যে কী করে বেঁচে আছে এখনও সেইটেই আশ্চর্য—

পাটিল সাহেব গেলাসে আর একবার চুমুক দিলেন।

বললেন—ভাববেন না নেশার ঝোঁকে এ-সব কথা বলছি, নেশা আমার হয় না। নেশা যখন হতো, তখন নেশা করবার পয়সা জুটতো না আমার। সত্যিই বড় কষ্টে দিন কেটেছে আমার। একশো তিরিশ টাকা মাইনে পাই তখন। চাকরিতে ঢুকেছিলাম তিরিশ টাকায়। তখন যুদ্ধ বাধেনি। তখন তিরিশটা টাকা পেয়ে ভালোভাবেই কাটতো। কলকাতায় তখন তিন টাকা মন চাল, তিন আনা সের ডাল, টাকায় আড়াই সের দুধ। তারপর সেই কলকাতাতেই আবার চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মন চালের দর উঠলো, এক টাকা সের ডাল, টাকায় এক সের দুধ। কিন্তু সেই অনুপাতে মাইনে বাড়লো না। ক'বছর চাকরির পর জিনিষের দাম বাড়বার জন্যে তিরিশ টাকা থেকে বেড়ে আমার মাইনে হলো একশো তিরিশ টাকা। তবু কষ্ট করে চালাচ্ছিলুম, কিন্তু মুশকিল হলো আমার ছেলেকে নিয়ে। ছেলের টাইফয়েড—অসুখে অনেক টাকা লোন হয়ে গেল।

আমাদের অফিসের বস্ ছিল একজন বাঙালী। নাম, কী সাম্ মজুমদার। আমরা ডাকতুম মজুমদার সাহেব বলে। চাকরির জন্যে তার কাছেই দরখাস্ত করলুম।

একদিন অফিসে যেতেই ডেকে পাঠালে মজুমদার সাহেব। আমি গিয়ে তার টেবিলে হাতটা রেখে দাঁড়ালুম। খেঁকিয়ে উঠলো সাহেব।

বললে—স্ট্যাণ্ড ইরেকট্—

বেটার পেছনে দিল্লীতে লোক ছিল। তাদের তেল দিয়ে চাকরিটা পেয়েছিল সাহেব। তাই আমাদের কুকুর-বেড়ালের মতো দেখতো।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরোল না। দু'মাস ঘুমোইনি। দু'মাস খায়নি ভাল করে। দু'মাস ভাবনায় পাগল হয়ে গিয়েছি। তবু অফিসে ছুটি পাইনি। যখনই ছুটি চেয়েছি সাহেব বলেছে—ক্যান্ নট্ বি স্পেয়ার্ড।

ছুটি দেওয়া চলবে না—

সাহেব আবার-হাউ হাউ করে উঠলো—কেন ছুটি চাও তুমি?

খুব নিচু গলায় বললাম—আমার ছেলের খুব অসুখ স্যার, ম্যালিগ্ন্যান্ট টাইফয়েড—আমার বাড়িতে আর কেউ নেই, আমি একলা আর আমার ওয়াইফ, আমার ওন্‌লি সন্,—

সাহেব কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে—দ্যাটস নট্ গভর্মেন্টস্ লুক আউট। তোমার ছেলে মরুক বাঁচুক তা দেখা গভর্মেন্টের কাজ নয়। গভর্মেন্ট্ চায় কাজ, ওয়ার্ক ফার্স্ট এণ্ড্ ওয়ার্ক লাস্ট্। গভর্মেন্টের ফাইভ ইয়ার প্ল্যান মাস্ট্ বি গিভ্‌ন্ প্রাওরিটি, গভর্মেন্টের ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যদি সাকসেসফুল হয়, তখন লক্ষ-লক্ষ ছেলে মানুষ হবে, ইণ্ডিয়ার কোটি কোটি মানুষ বেনিফিটেড্ হবে—সেইটে বড় না তোমার একটা ছেলের লাইফ বড়ো? যাও—আমার সামনে থেকে চলে যাও—

কথাটা বলে মজুমদার সাহেব আবার নিজের ফাইলের দিকে নজর দিলেন।

আমি মরিয়া হয়ে তখনও দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাবলাম আজ যেমন করে হোক ছুটি আদায় করতেই হবে। আমি একশো তিরিশ টাকার ক্লার্ক জগদীশ পাটিল কিছুতেই ছুটি আদায় না করে ছাড়বো না।

—হঠাৎ ভাল্লুকের মত আবার খেঁকিয়ে উঠলো মজুমদার সাহেব।

—তবু দাঁড়িয়ে আছ? স্টিল্ ইউ আর হিয়ার?

বললাম—স্যার, একটু কাইণ্ডলি আমার কথাটা কনসিডার করুন—

—কল্ ইওর বড়বাবু, কল্ হিম্—কুইক্—

তারপর ঘটাং করে কলিং বেলটা বাজাতেই চাপরাশি ভেতরে এসে সেলাম করলে।

—বড়বাবু কো বোলাও—

সেকশানে প্রচুর ফাইলের স্তূপের মধ্যে বসে ছিলেন কান্তিবাবু। কান্তিবাবু পুরোন লোক। তিনিও বাঙালী। জীবনে পঁয়ত্রিশটা অফিসারকে চরিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি কোট গায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেন নিজের মনেই বললেন—আঃ জ্বালিয়ে খেলে বেটা—

অফিস সুদ্ধু লোক জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল সাহেবের অত্যাচারে। সারা অফিসের লোক জানতো মজুমদার সাহেবের দয়া-মায়ার কোনও বালাই নেই। কত লোকের চাকরি খেয়েছে মজুমদার সাহেব, কত লোকের পার্সোন্যাল ফাইল চিরকালের মত দাগী করে দিয়েছে। লোকে অভিশাপ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অফিস থেকে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। জীবনে মজুমদার সাহেব কারো উপকার করেছে বলে শোনা যায় নি। অথচ মজুমদার সাহেব যে কেমন চরিত্রের লোক তা জানতে কারো বাকি ছিল না। মজুমদার সাহেবের ঘরের সামনে লাল আলো জ্বলতো মাঝে-মাঝে। লাল আলো জ্বললে বুঝতে হবে সাহেব ভীষণ ব্যস্ত। কারো সঙ্গে তখন দেখা করবার সময় নেই তার। অথচ তখন হয়ত মিস্ চক্রবর্তী মজুমদার সাহেবের কোলে বসে···

পাটিল সাহেব আবার গ্লাসে চুমুক দিলেন।

বললেন—যাক্ গে, এ সব অফিসেই হয়। যেখানেই লাল-আলোর সিস্টেম্, বুঝবেন সেখানেই এই ব্যাপার হচ্ছে। ও নিয়ে আমরা ক্লার্করা কোনদিন মাথা ঘামাইনি। ধরে নিয়েছিলাম আমরাও ওই চেয়ারে বসলে ওই-রকমই করতাম।

—তারপর কী হলো বলুন।

পাটিল সাহেব বললেন—কান্তিবাবু তো এলেন। সাহেব বললে—কান্তি—

সাহেবের বাবার বয়েসী কান্তিবাবু।

তবু কান্তি বলে ডেকেই সাহেব নিজের গুরুত্ব জাহির করতে চাইতো।

বললেন—গভর্মেণ্ট্ কোটি-কোটি টাকা খরচ করছে, এই সব আইড্‌লারদের ফিড্ করবার জন্যে? তুমি কি চাও আমি অফিস ক্লোজ করে দিই? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? হোল্ ওয়ার্লড ইণ্ডিয়ার দিকে চেয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছো না? শুধু কেবল ছুটি আর ছুটি! আজ একমাসে থার্টি অ্যাপ্লিকেশনস্ এসেছে আমার কাছে ছুটির জন্যে। সকলকে যদি ছুটি দিই, তাহলে আমি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সাক্‌সেসফুল করবো কী করে শুনি? আমি একলা অফিস চালাবো? তাহলে ক্লার্কস রাখা হয়েছে কীসের জন্যে? বসে-বসে ঘুমোবার জন্যে?

কান্তিবাবু বললেন—না স্যার, ওর ছেলের সত্যিই টাইফয়েড, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে প্যাটিল এই সেদিন—আজকাল কলকাতা শহরে…

আর শেষ করতে দিলে না সাহেব। বলে উঠলো—তুমি আমাকে কলকাতা শহর দেখাচ্ছো কান্তি, আমি জানি না কলকাতার কি অবস্থা? তাহলে বোম্বের লোক কী করে অফিস চালাচ্ছে? দিল্লী ম্যাড্রাসের লোক কী করে অফিস চালাচ্ছে? আমি এই সেদিন ইউ-এস-এ থেকে কনফারেন্স করে এসেছি, তারাও তো মানুষ, সেখানে ফ্যাক্টরি থেকে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মটর ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে, তা জানো? সেখানে অফিসের ক্লার্কস্‌রা কত এফিসিয়্যান্ট, তা জানো? আর অত দূর গিয়ে দরকার নেই, ম্যাড্রাস কত এগিয়ে গিয়েছে দেখে এসো, বোম্বে কত এগিয়ে গিয়েছে দেখে এসো, তারা তোমাদের মতন সমান পে পাচ্ছে, দে ড্র সেম্‌ পে, দে গেট্‌ সেম্‌ ফেসিলিটিজ, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না হোয়াই বেঙ্গলীজ আর ব্যাকওয়ার্ড, বুঝতে পারি না বাঙ্গালীরা কেন এত পেছিয়ে যাচ্ছে, ইট্‌ ইজ্‌ এ সেম্‌ টু দি স্টেট্‌, আমাদের দেশের লজ্জা, আমাদের জাতের লজ্জা, আমার নিজেকেও বাঙালী বলতে লজ্জা হয়—ছিঃ—

কান্তিবাবু এ-কথার আর কী জবাব দেবেন? বললেন—স্যার, আমরা তো চেষ্টা করি—

—থামো তুমি কান্তি! কোনও এক্সকিউজ আমি শুনতে চাই না! আই ওন্ট্‌ গিভ হিম্‌ লীভ্‌—

—কিন্তু স্যার, এর ছেলে বোধহয় বাঁচবে না!

সাহেব টেবিলের ওপর বিরাট একটা কিল্‌ মারলে।

—বাট্‌ ইজ্‌ ইট্‌ গভর্মেণ্ট্‌স্‌ লুক আউট্‌? কার ছেলে বাঁচবে কি বাঁচবে না, তাও কি গভর্মেণ্টকে দেখতে হবে? ইণ্ডিয়ার প্রগ্রেস আগে না একজন ক্লার্কের ছেলে আগে, আমাকে বুঝিয়ে বলো তো? পণ্ডিত নেহরু কি আমাকে এইসব দেখবার জন্যে মাইনে দিচ্ছে, না অফিসের কাজের জন্যে মাইনে দিচ্ছে?

তারপর একটু থেমে মজুমদার সাহেব আবার বলতে লাগলো—জানো সমস্ত দেশ আজ বাঙালীদের দেখতে পারে না, কেন? হোয়াই? বাঙালীরা আইডল্‌, বাঙালীরা ডিজঅনেস্ট, বাঙালীরা ফাঁকিবাজ—যত রকমের ভাইস আছে, সব বাঙালীদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, আমি হোল্‌ অফিস স্টাফকে স্যাক্‌ করবো একদিন—আপনারা বাঙালী জাতের বদনাম করছেন—

পাটিল সাহেব বললেন—আমি মজুমদার সাহেবের কথায় তোড়ের মুখে বলতে

পারলাম না যে, আমি বাঙালী নই। কিন্তু সাহেবের ক..র প্রতিবাদ করা যায় না। সাহেবকে যা খুশি বলে যেতে দিতে হয়, এইটেই অফিসের ...ম... বড়বাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। মিস্ চক্রবর্তী ঘরে ঢুকলো টাইপ-করা চিঠি নিয়ে। লাল রং এর শাড়ি। মুখময় রুজ পাউডার স্নোর বাহার। ময়ূরের মত পেখম তুলে মজুমদার সাহেবের কাছে এল। মিস্ চক্রবর্তীকে দেখেই মজু..ার সাহেবের মুখখানা যেন আমূল বদলে গেল। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়লো আমরা ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দিকে চোখ কট-মট করে চেয়ে সাহেব গর্জে উঠলো—গো ব্যাক্ টু ইওর সেকশন্—গিয়ে কাজ করো—যাও—

আমরা চলে এলাম বাইরে। বাইরে আসতেই দেখলাম সাহেব লাল আলোটা জ্বেলে দিয়েছে। বোঝা গেল আর কেউ ভেতরে যেতে পারবে না। এখন সাহেব অফিসের ফাইলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কী করবো বড়বাবু?

কান্তিবাবু বললেন—আমি আর কী বলবো, সাহেব রেগে গেছে, এখন তো কিছুতেই ছুটি দেবে না, একবার যখন না বলেছে, তখন আর হ্যাঁ করানো যাবে না—

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলুম। কিন্তু কাজে মন গেল না। অফিসের মধ্যে বসে বসে বাড়ির কথাটাই মনে পড়তে লাগলো। তিন-ঘণ্টা অন্তর-অন্তর ওষুধ খাওয়াতে হবে। আগের দিন আমার ওয়াইফ আর আমি সারা রাত জেগে কাটিয়েছি আর ওষুধ খাইয়েছি আর টেম্পারেচার দেখেছি।

পাশেই বসতো ব্যানার্জিবাবু। অতি ভদ্রলোক। নির্ঝঞ্ঝাট-নির্বিবাদী মানুষ। আমার অবস্থাটা জানতো। নিজের মনেই ব্যানার্জিবাবু বললে—এত লোক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে আর মজুমদার সাহেব মরে না রে—

ওপাশ থেকে পরিতোষবাবু বললেন—কেউ খুন করতেও পারে না বেটাকে—

হরিসাধনবাবু বললেন—প্যাটেলবাবু, আপনি কামাই করুন, আমি বলছি আপনি কামাই করুন। কালকে অফিসে আসবেন না, যতদিন আপনার ছেলে না সেরে ওঠে, ততদিন আসবেন না, দেখি ও বেটা কী করতে পারে—

আমি আর কী বলবো—আমার চোখ দিয়ে সত্যিই তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। অথচ যত দোষ আমাদের বেলাতেই। অফিসের জন্যে বড় ঘড়ি এলে চলে যায় মজুমদার সাহেবের বাড়ি। সাহেবের টেবিলের ওপরকার বড় গ্লাসখানা হঠাৎ সাহেব গাড়িতে তুলে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল। কই, তার বেলায় তো কেউ কিছু বলবে না!

নেই। অফিসার ক্ব কি সাত খুন মাপ ? এর কোনও প্রতিকার নেই ? এই যে, কনফারেন্সের নামে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা ঘুরে আসে প্লেনে করে, আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করে, তাতে গভর্মেণ্টের কাজের কী সুবিধে হয় ? তার বেলায় তো ফরেন-এক্সচেঞ্জের কথা ওঠে না ? সাহেব অফিস থেকে ছ'মাস বাইরে থাকলে তো অফিসের কাজের কোনও ক্ষতি হয় না ? আর আমি ক'দিন কামাই করলেই গভর্মেণ্ট অচল হয়ে যাবে ?

পরিতোষবাবু যখন ভীষণ রেগে যেত তখন বলতো—ভগবান ফগবান সব বাজে কথা মশাই, সব মিথ্যে, ভগবান থাকলে কখনও এমন অন্যায় চলতো ?

পাটিল সাহেব আবার গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন।

বলতে লাগলেন—সে সব দিনের কথা আজ ভাবতে ভালোই লাগে আমার। সেদিনকার অভাব আর দারিদ্র্যের গল্প এখন লোকের কাছে বলতেও ভাল লাগে। অথচ বেশি দিনের কথাও নয়। আজ থেকে মাত্র দশ বছর আগের কথা। নাইনটিন্ ফিফ্‌টি-থ্রি-র কথা। মাত্র ছ'বছর হলো ইণ্ডিয়া তখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়েছে। মিনিস্টার আর ভি-আই-পিদের রাজত্ব সবে শুরু হয়েছে। সবাই দু'হাতে চুরি করতে শুরু করে দিয়েছে। যারা চিরকাল জেল খেটে এসেছে, হঠাৎ রাতারাতি তারা রাজা হয়ে বসেছে। ব্রিটিশ-আমলের অফিসাররা সেই সুযোগে হঠাৎ দেশ-ভক্তির কথা বলতে শুরু করেছে। লর্ড আরউইন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বদলে চক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারীকে গড বলে পুজো করতে আরম্ভ করেছে। ইণ্ডিয়ানদের তখন আর মানুষ বলেই মনে করে না। আমি ঘটনাচক্রে সেই সন্ধি-যুগের ইণ্ডিয়ান। মজুমদার সাহেবের কোপটা হয়ত সেই জন্যে আমার ওপরেই পড়লো। আমি না-হয়ে অন্য কারোর ওপরেও পড়তে পারতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই হয়ে গেলাম ভিক্‌টিম। কারণ ঠিক সেই সময়েই আমার ছেলের হলো টাইফয়েড।

যা হোক, অফিস বন্ধ হবার পরই আমি দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ি গেলাম। কিন্তু গিয়ে পৌঁছোবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। কিছু পাড়ার লোক, কিছু অন্য ফ্ল্যাটের লোক তখন জমে গেছে বাড়ির সামনে। তারপর যা হয় এসব ক্ষেত্রে তাই হলো। আমার স্ত্রী বিকেল থেকেই কাঁদছিল। আমিও খানিক কাঁদলুম। অর্থাৎ বাড়ির কর্তা হয়ে যতখানি কাঁদা যায় ততখানি। দুঃখটা ছেলের মৃত্যুর জন্যে হচ্ছিল কি নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে হচ্ছিল তা বলতে পারবো না। সে-সব আমার সিনেমার স্ক্রিপ্‌টে আমি অনেকবার ঢুকিয়ে দিয়েছি, বক্‌স্-অফিসের জন্যে

আমাদের সিনেমায় ওটা দরকার হয়। সে-সব আপনাকে শুনিয়ে আমি বিরক্ত করবো না। ঘটনাটা ঘটলো রাত্রে। আমি বারনিংঘাট থেকে ফিরে এলুম ন'টার সময়। সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আমার ওয়াইফকে আমি একলা ফেলে বাইরে বেরোলুম।

আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছো?

বললাম—তুমি শোও, আমি আসছি—

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না বোধহয়। রাত ন'টা বেজে গেছে। ক'দিন রাত জাগা, তারপর সমস্ত দিন অফিস করা, তারপর শ্মশানে আগুনের সামনে গরমে পোড়া, আমার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আমার কাঞ্চন-নগরের ছোরাটা জামার নিচে লুকিয়ে নিয়েছিলাম। শেয়ালদার রাস্তায় ট্রাম-বাসগুলো তখন ফাঁকা। একটাতে উঠে বসলাম। মৃত্যুর সামনে, মানুষ যেমন অসহায় বোধ করে, তেমনি আবার বেপরোয়াও হয়ে যায় বোধহয়। মৃত্যু যেমন বৈরাগ্য আনে, আবার সাহসও বাড়ায়। আমার শেষ ছবিটাতে আমি এ-সিন দেখিয়েছি। আমার হীরো কেমন করে যুদ্ধে গিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণ দিলে। এ-সিনটা দেখবার সময় অডিয়ান্স-এর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে, আমি নিজে গিয়ে অনেকবার দেখেছি। ওই সিনটার জন্যেই এ-ছবিটার সিলভার-জুবিলী হয়েছিল। কিন্তু তারা জানে না তো যে, এ আমার নিজের স্টোরি, এ আমার নিজের বায়োগ্রাফি। আমি নিজের রক্ত দিয়ে এ-ছবি করেছি। এ ছবিটাতে আমার প্রফিট্ হয়েছে পঞ্চাশ লাখ, কিন্তু সে-টাকা আমি ইনকাম করেছি আমার ছেলের মৃত্যুর বিনিময়ে।

যা হোক, আমি ট্রাম বদলে গিয়ে পৌঁছুলাম মজুমদার সাহেবের কোয়ার্টারের সামনে। মজুমদার সাহেব থাকতো অফিসের ফারনিশড্ ফ্ল্যাটে। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের আগে এই সব ফ্ল্যাটেই থাকতো ইউরোপীয়ানরা। তারা চলে গেছে। তাতে তখন ইণ্ডিয়ান অফিসাররা বাস করছে। সে-বাগান, সে-ফার্নিচার তখন আর নেই। বাগানের জন্যে মালী দিয়েছে গভর্মেণ্ট থেকে। কিন্তু মালীরা তখন সাহেবের অন্য কাজ করে। ঘর ঝাঁট দেয়। কাপড় কাচে। বাটনা বাটে বা রান্না করে। বাড়ির কাজ অফিসের দেওয়া চাপরাশিদের দিয়েই করে নেয় দিশী সাহেবরা।

বাড়ির সামনে অন্ধকার। আমি বেপরোয়া হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভয় করছিল না যে তা নয়। কিন্তু কোথা থেকে যে সেদিন আমার অত সাহস এসেছিল, তা এখন আর আপনাকে বোঝাতে পারবো না।